

বঙ্গদর্শন ।

[নবপর্যায়]

মাসিক পত্র ।

তৃতীয় বর্ষ ।

১৩১০ ।

তৃতীয় বর্ষের লেখকগণের নাম ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীজ্যোতির্বিদ্রনাথ
ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক) শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর
ত্রিবেদী, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীবিজয়-
চন্দ্র মজুমদার, শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'মজুমদার', শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার (সহঃ
সম্পাদক) শ্রীরমেশচন্দ্র বসু, শ্রীস্ববোধচন্দ্র মজুমদার,
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায়, শ্রীষতীন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীস্বরেশ-
চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ।

সহঃ সম্পাদক কর্তৃক

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত ।

সূচী ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অতিপ্রাকৃত	২২৫
অহুতাপিনী সন্ন্যাসিনী	১৭
অহুবাদ	১২৩
অপূর্ণ মিলন (কবিতা)	২৩২
অশ্রোকের অলুপাসন	৯
অগ্রা প্রান্তরে (কবিতা)	৫২৯
আচার্য্য বহুর আবিষ্কার	৩৭৫
আজিকার ভারতবর্ষ	১৮০, ২২৪, ৩৩১
আবাহন (কবিতা)	২৯০
আমাদের নিবাস	২৭৯
আমাদের ভাবী অবতার	৩৯১
আশ্রয় (কবিতা)	৩৪৪
উচ্ছা	৯৩
এমার্সন্	৩২৩
কৌশল্যা	২৭০
ক্ষান্তি	১৮৮
ক্ষীরের পুতুল	৪৩০
গণেশপূজা	৫৩৭
গণেশ প্রসঙ্গ	৬০২
গণেশের পূজা	৬০১
গ্রন্থ-সমালোচনা	৫২, ১০৪, ১৫১, ১৯৮, ৪৪১, ৫১৯, ৫৬৪, ৬০৪
গ্রাম (কবিতা)	১০৭
স্বাধুবি	২৪৮
চণ্ডালী (কবিতা)	৪৪৯
চান্দুন্দা	৩৪৬
চিঠি (কবিতা)	২১০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চীন-কাহিনী	১০০
চৈত্রেয় গান (কবিতা)	১৪
তপোমূর্তি (কবিতা)	১৮২
তাজমহল (কবিতা)	২৭
থিয়েটার	৪২৪
দিন ও রাত্রি	৫১১
ছন্দোরাগী (কবিতা)	৬৮
হর্ষল (কবিতা)	১৬
দৃষ্টিভঙ্গ	৩১২
ধর্মপ্রচার	৫২১
ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত	২৫৫
নারী (কবিতা)	৫১৮
নোকোভুবি (উপন্যাস)	৩২, ৫৫, ১২১, ১৫৫, ২০১, ২৬১, ৩০৩, ৩৬৯, ৩৯৭, ৪৫৯, ৫৩৯, ৫৬৫
পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়	৫২৩
প্যারীচরণ সরকার	১৪৫
প্রয়াণ (কবিতা)	৩০
প্রাচীন আশ্বেনীয়ায় হিন্দু-উপনিবেশ	১৯০
প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম ও প্রাচীন	
ভারতের গৌলব্যাকল্পনা	৮২
প্রাচীন-জবলপুর-প্রসঙ্গ	১৩৯
বজ্রিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়	২৩৩, ৩৪০, ৩৬২
বঙ্গমঙ্গল (কবিতা)	৫৫৪
বন্ধন (কবিতা)	৫৮০
বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন বিবরণ	২৭
বাজে থরচ	৭২
বিষ্ণুমাহাত্ম্য	৬৪
বীরকুণ্ড	২২৭
বুলাই (কবিতা)	৪২৮
বৃক্ষের স্বপ্নদর্শন (কবিতা)	১০৬
ভরত	১০৮

বিষয়।					
ভোরের পাখী (কবিতা)	১
মহুয়া	৫৪৯
মন্দিরের কথা	৪০৭
মুক্তি	৪৭১
মৃচ্ছকটিক	১১৬
মেঘচ্ছবি	২৯৩
মেঘোদয়ে (কবিতা)	১৩৬
যাত্রিণী (কবিতা)	৭৯
রাজকন্যা	৪৯
রাজকুটুম্ব	৩
রামচরিত	৩৮৩
রামায়ণ ও সমাজ	৫৮৬
লক্ষণ	২১২
শিলালিপি (কবিতা)	১৮৮
শিশু (কবিতা)	২৪৬
ঋশ্মনতলা	১৭৭
শ্রমণ	৪১১
সঞ্চিতবাণী (কবিতা)	১২০
সতীশচন্দ্র রায়	৫৯৩
সঙ্ক্যা (কবিতা)	৬২
সরলা দেবী (কবিতা)	২৫৪
সাগরমহন (কবিতা)	১৭৭
সার সন্তের আলোচনা	...	৪১, ১৪৮, ১২৫, ২৪১, ৩৩৩, ৩৭১, ৪৩৫,	৪৫৫, ৫৫৮, ৫৮১		
সাহিত্য-সমালোচনা	২৮৪
সাহিত্যের আদর্শ	৪৪৩
সাহিত্যের তাৎপর্য	৩৫৮
সাহিত্যের সামগ্রী	৩১৭
সিদ্ধিদাতা গণেশ	৩৮৭
স্ট্রীতা	১৬৫
স্বপ্নতত্ত্ব	১৩০

বিষয়

পৃষ্ঠা ।

হরগৌরী (কবিতা)

...

...

...

...

১৮৯

হিমালয় (কবিতা)

...

...

...

...

১৮৭

হে বিপদ, এস (কবিতা)

...

...

...

...

৫৩৬

হেমচন্দ্র

...

...

...

...

১৯৯

বঙ্গদর্শন ।

ভোরের পাখী ।

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে !
ভোর না হ'তে ভোরের খবর
কেমন করে' রাখে !
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালীবরণ পুচ্ছ-ভোরের
হাজার লক্ষ পাকে !
ভোরের পাখী সুপ্ত-বনে
তবু কোথায় ডাকে !

ওগো তুমি ভোরের পাখি
ভোরের ছোট পাখি !
কোন অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি !
কোমল তব পাখা'পরে
সোনার রেখা থরে থরে,
বাধা আছে ডানায় তব
উষার রাঙা রাখী !
ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোট পাখি !

রয়েছে বট, শতেক জটা
 ঝুলচে মাটি ব্যোপে,
 পাতার 'পরে পাতার ঢেউ
 উঠছে ফুলে' কেঁপে ।
 তাহারি কোন্ কোণের শাখে
 নিদ্রাহারা ঝাঁঝির ডাকে
 বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
 পাখায় মুখ কেঁপে !
 যেথায় বট দাঁড়িয়ে একা
 জটায় মাটি ব্যোপে !

ওগো ভোরের সরল পাখি
 কহ আমার কহ—
 ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
 যখন ঘুমে রহ,
 হঠাৎ তব কুলায়-পরে
 কেমন করে' প্রবেশ করে
 আকাশ হ'তে অঁধারপথে
 আলোর বার্তাবহ ?
 ওগো ভোরের সরল পাখি
 কহ আমার কহ !

কোমল তব বুকের তলে
 রক্ত নেচে উঠে,
 উড়বে বলে' পুলক জাগে
 তোমার পাখাপুটে !
 চক্ষু মেলি পূর্বের পানে
 নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
 অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তব
 উৎসসম ছুটে !

কোমল তব বুকের তলে
 রক্ত নেচে উঠে ।

এত আঁধারমাঝে তোমার

এত অসংশয় !

বিশ্বজনে কেহই তোরে

করে না প্রত্যয় !

তুমি ডাক—“দাঁড়াও পথে,

স্বর্ঘ্য আসে স্বর্গরথে,

রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,

‘রাত্রি নয় নয় !’

এত আঁধারমাঝে তোমার

এত অসংশয় !

আনন্দেতে জাগো আজি,

আনন্দেতে জাগো ।

ভোরের পাখী ডাকে যে ঐ

আর নিদ্রা না গো ।

প্রথম আলো পড়ুক মাথে,

নিদ্রাহীন আঁখির পাতে,

প্রথম উষা-কিরণের

আশীর্বাদ মাগো !

ভোরের পাখি-সাথে আজি

আনন্দেতে জাগো ।

রাজকুটুম্ব ।

“নিয়ু ইণ্ডিয়া” ইংরাজি কাগজখানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাভীর্ঘ্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংঘমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার

লেখা সাময়িক সংবাদেব তুচ্ছতাকে অনেক-দূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।

১২ই মার্চের পত্রে সম্পাদক “ভারতবর্ষে যুরোপীয় ক্রিমিনাল” নাম দিয়া একটি উপা-দেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৃথা অহুবাদের চেষ্টা না করিয়া ক্রিমিনাল-শব্দটা আখরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

‘ যুরোপীয় ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কেন যে সন্দিগ্ধতা হয় না, সম্পাদক বিচারকের মত ধীরভাবে তাহার নীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিনি বলেন, একপক্ষে অপরিণীত সহিষ্ণুতা ও আর একপক্ষে অপ্রতিহত শক্তি যেখানে সম্মুখীন হয়, সেখানে স্বভাবতই এইরূপ ঘটতে বাধ্য। এস্থলে আমরা হইলেও এমনই করিতাম—এমন কি, সম্পাদক টিপ্পনী দিয়া বলিয়াছেন, এসিয়াবাসী হয় ত সুর্যোগ পাইলে রিফাইণ্ড পাশবিকতায় যুরোপীয়কে জিনিতে পারিত।

— শুদ্ধমাত্র প্রসঙ্গক্রমে আমরাও একটি মনস্তত্ত্বের কথা বলিয়া লই। সম্পাদকের এই টিপ্পনীটুকুতে একটি দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজের বক্তব্যকে সবল করিবার জন্য অপক্ষপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বজাতির প্রতি অতিমাত্রা পক্ষপাতও যেমন স্থলবিশেষে একপ্রকার কৌশলমাত্র, জাতি-নির্বিশেষে একান্ত অপক্ষপাতও স্থলবিশেষে সেইরূপ কৌশল ছাড়া আর কিছু নহে। নিম্নোক্ত যুরোপীয় সম্পাদকের পক্ষে এটুকুর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি দুর্বল নহেন।

প্রাচ্যদের সম্বন্ধে ইংরাজদের কতকগুলি বাধিবুলি আছে, আমাদের “রিফাইণ্ড” নির্ভরতা তাহার মধ্যে একটা। পূর্বদিকটা একটা, মতদিক্—এইদিকে যাহারাই বাস করে, তাহাদের সকলকে এক নামের অধীনে এক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া ভূগোলবৃত্তান্ত রচনা করিলেই যে তাহারা দানা বাধিয়া এক হইয়া

যায়, তাহা নহে। বিদেশীরা সামান্য বাহ্য-সাদৃশ্যের ভিতর দিয়া বৈসাদৃশ্য ধরিতে পারে না। একজন চাষার চক্ষে এক গোরার সঙ্গে আর এক গোরার ভেদ সহজে ধর পড়ে না—ইংরাজের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে এক জন বাঙালিও যেমন, আর একজনও প্রা-সেইরূপ। এই কারণেই যুরোপীয়েরা সমস্ত প্রাচ্যজাতিকে একটা পিণ্ড পাকাইয়া দেবে এবং সকলের দোষগুণকে একটা নামের কোলার মধ্যে ভরিয়া “ওরিয়েণ্টাল” লেব-আঁটিয়া দেয়।

যুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু স্ততরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অল্পতটুকুও আমরা শিখিয়াছি। রিফাইণ্ড পাশবিকতায় এসিয় যুরোপীয়ের চেয়ে অধিক বাহাদুরী বি-পাইতে পারে, ইতিহাস যাঁটিয়া তাহা-প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতের অপবাদটুকু শিরোধার্য করিয়া একথা অন্তরের সহিত, দৃঢ় বিশ্বাসে সহিত বলিতে পারি যে,—হিন্দুকে অকর্মণ্য বল, অবোধ বল, দুর্বল বল, সহ্য করিয়া পাইব কারণ, সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে কিন্তু হিন্দুজাতির সত্য-মিথ্যা নানা অপযশের মধ্যে রিফাইণ্ড পাশবিকতার অপবাদট সব চেয়ে অত্যাচার। আর এসিয়াটিক-নামক বন্ধনবিহীন একটা প্রকাণ্ড বিচিত্র ব্যাপারের সহিত যুরোপীয় বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের গণ্ডস্থ, মল্লঘ্য বা দেবত্বের তুলনা একেবারেই অসঙ্গত, অনর্থক। একটা মান-কচুর সহিত একটা বাগানের তুলনা হইতেই পারে না।

এটা একটা অবাস্তব কথা । মোটের উপর, সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতেই হইবে । ইহার মধ্যে চাপা কথা ঢের আছে, তাহা চাপাই থাক ! আমরা কেবল একটি কথা যোগ করিতে চাই মাত্র ।

যাহার হাতে শক্তি আছে, সে যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মানুষের স্বভাব । ইংরাজও মানুষ, তাই সে ইংরাজ-ক্রিমিনালকে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না । যাহার হাতে শক্তি নাই, সে প্রবলের অত্যাচার বিচার অগত্যা সহ করে, ইহাও মানুষের স্বভাব । আমরাও মানুষ, তাই আমরাদিগকে ইংরাজের আক্রমণ চূপ করিয়া সহ করিতে হয় । এই এক জায়গায় মনুষ্যত্বের সমনিয়ন্ত্রণে ইংরাজের সঙ্গে আমরা-একত্রে মিলিতে পারিয়াছি ।

নূতন ইঙ্গল হইতে বাহির হইয়া যখন সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি বিদেশী বচন-গুলি বাংলায় তর্জমা করিবার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা এই জানিতাম যে, যুরোপ বাহুবলে প্রবল হইলেও মনুষ্যত্বের অধিকারসম্বন্ধে দুর্ব্বলের সহিত আপনার সাম্য স্বীকার করেন ! তখন আমরা ইঙ্গলের উত্তীর্ণ ছেলেরা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম । বলিয়াছিলাম, ইহারা দেবতা । আমরা চিরকাল ইহাদিগকে পূজা করিব এবং ইহারা চিরকাল আমাদের প্রসাদ বিতরণ করিবে—ইহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধই শাস্ত্রত । আমরা মনের ভিতর হইতে ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ হার মানিয়াছিলাম ।

আজ যখন বুঝিতেছি, ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে—আমরাও দুর্ব্বল, ইহারাও দুর্ব্বল—আমাদের অক্ষমের দুর্ব্বলতা, ইহাদের সক্ষমের দুর্ব্বলতা—তখন অভিভূতির ভার কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি । ইংরাজ ক্রমাগত আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ভাষ্যপরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের স্বশ্রেণীর কোন জাতির সহিত আমাদের তুলনাই হয় না । এক সময়ে ইংরাজ যেন এই ধর্ম্মশ্রেষ্ঠতার প্রেঙ্টিজ্ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল । যে ব্যক্তি অক্ষমের নিকট ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহার কাছে হার না মানিয়া থাকা যায় না—সেকালে আমাদের মন হার মানিয়াছিল । এখন ইংরাজ প্রতাপের প্রেঙ্টিজ্ সর্ব্বাগ্রগণ্য করিয়াছে—স্বদেশী ও এদেশীকে ধর্ম্মের চক্ষে সমান করিবার বল ও সাহস এখন তাহার নাই—এখন ইংরাজের কাছে ইংরাজ-গবর্নেন্ট দুর্ব্বল । এখন ম্যাক্‌গেটার্জ্ রাজা, -বার্মিংহাম্ রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেস্‌ক্স অফ্‌ কুমার্স্ রাজা,—তাই আজকাল আমাদের প্রতি ভয়-দেব-ঈর্ষার নানা লক্ষণ দেখিতে পাই । দেখি, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ্ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি, আপিস হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ডাক্তারিশিক্ষায় বাধা পাইতেছি, বিজ্ঞানশিক্ষায় গুচ্ছভাবে প্রতিহত হইতেছি । ইহাতে আমাদের অনেক শঙ্ক-বিধা আছে, কিন্তু এই শঙ্কনাটুকু পাইতে পারি যে, কর্ত্তারা আমাদের চেয়ে বেশি শঙ্ক নহে । ইহারা আমাদের অগ্রাহ করিয়া বাঁচেন না—ইহাদের মনে এ আশঙ্কাটুকু আছে যে, সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্রোহ, ক্ষমতায়

ইহাদের সমান হইয়া উঠিতে পারি। ইংরাজ-ক্রিমিনাল দেশীয়ে প্রতী অত্যাচার করিয়া অত্যাচারিত শান্তি পাইলে ইংরাজকে দেশীয় আপন সমতুল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, এই ভয়টুকু যখন ইংরাজের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার আত্মসম্মান নষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিন্তাও ইংরাজের কাছে নতিস্বীকারের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে—প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সম্পাদকমহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘৃষির পরিবর্তে ঘৃষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায়-ঘাটে ইংরাজকে অনেক অত্যাচার হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—ঘৃষিযোগের মত চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার গুটিকতক কারণ আছে।

একটি কারণ এই যে, আমরা একানবর্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি—পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন, সমস্তই শিশুকাল হইতে আমাদের দিগকে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘৃষাঘৃষি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একানবর্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘৃষি শিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকার তাহা নির্মিচায়ে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্ৰ-কারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না। নিজের

অনুবিধা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিবার ভাবই আমাদের স্বভাব ও অভ্যাস সঙ্গত—পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও ক্ষুণ্ণিত পাইবার স্থান পায় নাই।

এক, ইঙ্গুলের ছেলেদের মধ্যে যেটুকু বীররসের অবসর আছে, কর্তৃপক্ষ তাহা সহজে প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা কেবলি বলেন, আমাদের ছাত্রদিগকে বখেষ্ঠ শাসনে রাখা হয় না। তাঁহাদের স্বদেশে ছাত্রেরা যেভাবে মাদ্রাস হয়, এদেশের ছাত্রদের ব্যবহারে তাহার আভাসমাত্রও তাঁহারা সহ করিতে পারেন না। যাহা দলন করিতে হইবে, তাহা অনুরোধেই দলন করা ভাল, এ কথা ইংরাজ জানে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোন কলেজের ছাত্র ফুটবল খেলিতে খেলিতে আহত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা গুরুত্বার প্রয়োজনে কাছের একটি সরোবর হইতে কাপড়ে ভিজাইয়া জল লইয়াছিল। সেই সরোবর সাহেবদের পানীয়জলের জন্ত সুরক্ষিত ছিল। সেখানে ছাত্রকে নাবিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালার নিষেধ করে। সেই উপলক্ষ্যে উভয়পক্ষে বচসা, এমন কি, হাতাহাতিও হইয়া থাকিবে। ম্যাজিস্ট্রেট সেই ছাত্রকয়টিকে লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার ডিষ্ট্রিক্টের যত হুগুম স্থানে যে কোশলে ঘুরাইয়া-মারিয়া অবশেষে জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সেই ছাত্রগণ ও তাহাদের অতিভাবকেরা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। বাল্যলীলার এরূপ দণ্ডবিধি ইংরাজের নিজের দেশে যে নাই, সে কথা সকলেই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মত বিভাগেও, দেশীয় প্রিন্সিপালের বিচারেও,

ছাত্রদিগকে যে সকল লঘুপাণে গুরুদণ্ড সহ করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের পৌরুষচর্চা হয় না ।

এই ত গেল ঘরে এবং বিতালয়ে । তাহার পরেও যদি ইংরাজ-অত্মায়কারীর গায়ে ঘৃষি তুলিবার মত ক্ষুর্ভি কাহারো থাকে, তবে বিচারালয় আছে । দেশীয়দের বিরুদ্ধচারী ইংরাজ-ক্রিমিনালের প্রতি ইংরাজ-বিচারকের মানবস্বভাবসঙ্গত পক্ষপাত সম্পাদকমহাশয় স্বীকার করেন—সেই স্বাভাবিক পক্ষপাত দেশীয় অপরাধীর পক্ষে কি আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে । একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানযুব গড়ের মাঠে গাড়ি হইতে অস্ত্র গাড়ির একজন ইংরাজকে চাবুক মারিয়া জেলে গিয়াছিল মনে আছে—এলাহাবাদের সোমেশ্বর দাসের কথাও আমরা ভুলিতে পারি না । ইংরাজের গায়ে হাত দিতে গিয়া গ্রামস্থল দোষি-নির্দোষী বহুতর লোকের কিরূপ অসহ্য লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে । তাহার কারণ, এদেশে পোলিটিকাল নীতিতে অস্ত্র নীতিকে জটিল করিয়া ফেলে । এদেশে ইংরাজকে মারার মধ্যে ব্যক্তিগত মার এবং পোলিটিকাল মার, দুই আছে—ইঙ্গুলের ছেলের তুচ্ছ ক্রীড়ার মধ্যে ভাবিকালের পোলিটিকাল সঙ্কটের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে—অতরাং আমাদের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা হঠাৎ পোলিটিকালের মধ্যে পা দিয়া ফেলি—তখন সহসা কাঁধের উপরে যে দণ্ডটা আসিয়া পড়ে, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয় । দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব

করিয়া ইংরাজ অস্ত্র দণ্ড ও ইংরাজের গায়ে হাত দিয়া আমরা গুরুদণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মনুষ্যধর্ম আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রাজধর্মও যোগ দিয়াছে । এস্থলে ঘৃষি-তোলা কম কথা নহে ।

মনুষ্যস্বভাবে সাহসের একটা সীমা আছে । জাহাজের একজন কাপ্তেন হাজার অত্মায়কারী হইলেও তাহার অধীনস্থ যুরোপীয় নাবিকদল সংখ্যাধিক্যসম্বন্ধেও সকলপ্রকার অপমান ও দৌরাভ্য অগত্যা সহ করিয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা অনেক শুনা গিয়াছে । আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা শক্ত । জাপিস্ হিল্ ইংরাজ-ক্রিমিনালকে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তোমার স্বদেশীয় ভৃত্য তোমার এরূপ ব্যবহার সহ্য করিত না । না করিবার কারণ আছে । বিচারের চক্ষে স্বদেশীয় ভৃত্য ও স্বদেশীয় মনিব সম্পূর্ণ সমান । সে স্থলে মনিবের দ্রব্যবহার সহ্য না করিবার প্রভূত বল ভৃত্যের আছে । সে বল ভৃত্যের এক্কার বল নহে, তাহা তাহার সমস্ত স্বজাতির বল । এই বিপুল বলের সহিত একজন দেশীয় ভৃত্যের এক্কার বলের তুলনা করা ঠিক নহে ।

এখানেও একানবর্তী পরিবারের কথা পাড়িতে হয় । একজন ইংরাজের উপর অস্ত্র লোকেরই নির্ভর—আমরা প্রত্যেকেই বহুতর আত্মীয়ের সহিত নানাসম্বন্ধে আবদ্ধ । সেই সকল সম্বন্ধ আমাদের ত্যাগপরতা, সংযম, মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যধর্মের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে—সেই সকল সম্বন্ধই হিন্দুজাতিকে রিফাইণ্ড ও অকৃত্রিম পাশ-বিকতা হইতে দুঁরে রাখিয়াছে—আমাদের

পক্ষি হৃৎকারিতা সহজ হইতেই পারে না, আমাদিগকে জেলের দিকে আকর্ষণ করিলে অনেকগুলি শিকড়েই সাংঘাতিক টান পড়ে । অতএব আমাদের জীর্ণ-প্লীহা ইংরাজের বুর্জোয়ের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরাজের নাসাগ্র আমাদের বন্ধুগুণের পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে । সেজন্য ইংরাজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন ত করুন—কিন্তু আমরা কেন ইংরাজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি ? যেভাবে আমরা চিরকাল মনুষ্যত্বচর্চা করিয়া আসিতেছি, ইংরাজের সহিত সংঘাতে তাহাতে আমাদের অসুবিধা ও অপমান ঘটিতেছে । তা হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যত্বে আমরা খাট, এ কথা আমরা ত স্বীকার করিতে পারিব না । মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের ধর্মতা ঘটিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি লজ্জা পাইব ? রোমের সম্রাট নগ্ন-নিরস্ত্র খৃষ্টানদিগকে ক্রীড়াজ্বনে পণ্ড দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—ধর্মরাজ যদি তাহার বিচার করিয়া থাকেন, তিনি কি রোমরাজের পৌরুষকেই সম্মান দিয়াছেন ? আমরা যদি যথার্থভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জ্ঞান নিজেকে হেম বলিয়া অস্তায় লম্বনা করি, তবে ধর্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন । কিন্তু রচনারীতির খাতিরে বা যে কারণেই হউক, এ কথা আমরা যেন অনাগ্রাসেই উচ্চারণ

করিয়া না বসি যে, আমরা হইলেও ঠিক এইরূপ করিতাম বা ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতাম । না, আমরা হইলে একরূপ করিতাম না ! ইহাই আমাদের সত্যনা । আমাদের সমাজের, আমাদের ধর্মের যে আদর্শ, আমাদের শাস্ত্রের যে অনুশাসন, আমাদের স্বভাবের যে গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম । আমরা ভিক্ষুককে, দুর্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই ।

রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্বদের উৎপাত সহ্য করিতেই হয় । মৃচ্ছকটিকের রাজশ্রালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন । প্রভেদ এই যে, উক্ত কুটুম্ববর্গের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গেছে ।

মৃচ্ছকটিকের সেই রাজশ্রালকটি যতই উপদ্রব করুক না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে-মুখে পরিহাস-বিদ্রুপ করিতে ছাড়িত না । এখনকার রাজশ্রালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে-পরিমাণ হাস্যরস আদায় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহারা প্রত্যহ আমাদের কাছে যে পরিমাণে সজ্জন হারাইতেছেন, তাহা যেন আমাদের মাথা তুলিবার সহায়তা করে !

অশোকের অনুশাসন ।

বৌদ্ধধর্মই জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচার-
ধর্ম এবং বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যরাই
সর্বপ্রথম প্রচারক । বুদ্ধদেব জন্মজরামৃত্যুর
অতীত যে পরিপূর্ণ শান্তি, এই কর্মকোলাহল-
সঙ্কুল জীবনে নিজ আত্মার নিভৃত কন্দরে
যে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, সমস্ত জগৎকে তাহার
অবলম্বন দিবার জন্ত তিনি একান্ত ব্যগ্র
হইয়াছিলেন । বুদ্ধত্যাগির পর বারাণসী-
রাসের পাঁচমাস পরে তিনি তাঁহার ষাটটি
শিষ্যকে আদেশ করিয়াছিলেন—“হে ভিক্ষু-
গণ, তোমরা লোকহিতের জন্ত, তাহাদের
কল্যাণ ও শান্তির জন্ত দয়াপরবশ হইয়া
দিকে দিকে গমন কর এবং যে ধর্ম আত্মস্ত-
মধ্যে মহিমাবিত, যাহা সত্য এবং সুন্দর,
তাহাই লোকমধ্যে প্রচার কর । দুইজন
একদিকে গমন করিও না । লোকসমাজে
পরিপূর্ণ, নির্মল, পবিত্র, কল্যাণময় জীবনের
মহিমা কীর্তন কর ।” তাঁহার সেই
আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া-
ছিল এবং তাহার ফলে আজও পৃথিবীর এক-
তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী । কিন্তু
বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের প্রায় তিনশত বৎসর
পরে, মগধরাজ অশোক তাঁহার এই বাক্য
যেভাবে প্রতিপালন করেন, পৃথিবীতে আর
কোন রাজা যে, কোন ধর্মের জন্ত কখন সেরূপ
করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দেয়
না । দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে
পাওয়া যায় যে, তিনি কাশ্মীর, গান্ধার, মহিশা

(মহীশূর), বনবাস (রাজপুতানা), পাঞ্জাব,
য়োনালোক (বাক্টিয়া ও অন্ত্যান্ত গ্রীক
রাজ্য) এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচারক
প্রেরণ করেন । তাঁহার প্রস্তরলিপিতে
দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি অ্যাক্টিয়োকাসের
রাজ্যে এবং আরও পাঁচটি গ্রীকরাজ্যে
প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন । বিশেষত পুত্র
‘মহিন্দ’কে তিনি যে ধর্মপ্রচারের জন্ত সিংহলে
পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই তাঁহার উৎসাহ
কতকপরিমাণে অনুভব করা যাইতে পারে ।
কিন্তু যে ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি এবং
যেখানে এই ধর্ম প্রচারের জন্ত অশোক বহু-
সহস্র স্তূপ এবং প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া
দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের পবিত্র অনুশাসন-
সমূহ খোদিত করান, সেখানে আজ বৌদ্ধ-
ধর্মের কি অবশিষ্ট আছে, কতটুকু জীবিত
আছে ? আজ শুধু কয়েকটি মুক-কঠিন
শিলাখণ্ড তাহাদের জীর্ণদেহে অজ্ঞাত-
রহস্তময় নির্মাক লিপি লইয়া বৌদ্ধধর্মের
সমাধিস্তম্ভের স্থায় দাঁড়াইয়া আছে । ‘মহা-
রাজ অশোকের বহুসংখ্যক শিলালিপির
মধ্যে আজ পর্যন্তগাত্রে খোদিত চতুর্দশটি
এবং স্তম্ভে লিখিত আটটি মাত্র আমাদের
নিকট পরিচিত । উপস্থিত প্রবন্ধে তাহাদের
মধ্যে একটি আমাদের আলোচ্য ।

বর্তমান দিল্লী হইতে মথুরা যাইবার
পুরাতন পথের ধারে সহর হইতে প্রায় অর্ধ-
ক্রোশ দূরে ফিরোজাবাদের যে সবল ভগ্নাব-

শেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে এই সরল নিরলঙ্কার উন্নত স্তম্ভ সর্বোপরি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কানিংহামের মতে অশোকস্তম্ভের মধ্যে ইহাই ঐতিহাসিকের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এই স্তম্ভের দৈর্ঘ্যসম্বন্ধে অনেক বাদ-মুবাদ আছে—যাহা হউক, এখন সকলেরই মতে ইহা ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা সাধারণ বালুকা-প্রস্তরে (Sand Stone) নির্মিত, কিন্তু এই উপাদান লইয়া যে সকল হস্তকর ভ্রমপ্রমাদ ছিল, তাহার ছইএকটা উদাহরণ দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। Tom Coryat ইহাকে পিত্তলনির্মিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাঠে Edward Terry ইহাকে “Very great pillar of marble” বলিয়া ইহার গৌরব বাড়াইয়াছেন। বিশপ্ হিবর ইহাকে Pillar of cast metal” বলিয়াছেন। কানিংহাম সাহেবের মতে এই স্তম্ভের উপরের ব্যাস ২৫.৩ ইঞ্চি এবং নিম্নভাগের ব্যাস ৩৮.৮ ইঞ্চি। এই বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তর-নির্মিত গৃহের সর্বোচ্চ তলের ছাদের উপরে স্থাপিত। বাদশাহ আকবরের সময়ে ইহার অবস্থা ক্ষিপ্ত ছিল, তৎসম্বন্ধে মহম্মদ আমিনু রাজি তাঁহার ‘তাকুত-ই-খালিম’-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“এই লালপ্রস্তরনির্মিত উচ্চ স্তম্ভ ত্রিতল প্রাসাদের উপর দণ্ডায়মান।” এক্ষণে ইহার গঠনবর্ণনায় বেশী সময় ব্যয় না করিয়া অগ্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করা বাউক।

এই স্তম্ভ এখানে অশোককর্তৃক স্থাপিত

হয় নাই। ইহা পূর্বে মিরাতের নিকট যমুনাতীরবর্তী নাহেরা-নামক গ্রামে ছিল। ইহা দিল্লী হইতে প্রায় ১২০ মাইল দূরে। ১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বাদশাহ ফিরোজশাহ কর্তৃক এই স্তম্ভ নাহেরা হইতে তাঁহার নূতন রাজধানী ফিরোজাবাদের শোভাবর্দ্ধনার্থ আনীত হইয়াছিল। কিন্তু কিপ্রকারে এই স্তম্ভ হং প্রস্তরস্তম্ভ-এতদূর হইতে আনয়ন করা হয়—সৈয়দ আমেদখাঁ তাহার যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা অতিশয় কৌতুকপ্রদ। অপ্রাচ্যিক হইবে না বিবেচনায় আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন—সর্বপ্রথমে ইহার চতুর্দিক শিমুলতুল্য দ্বারা আবৃত করিয়া ইহার নিম্নের মাটি খুঁড়িয়া লওয়া হইল এবং ধীরে ধীরে ইহাকে তুলার বস্তার উপর শায়িত করা হইল। তৎপরে বিয়াল্লিশখানি-চক্র-বিশিষ্ট এক যানের উপরে এই বিশাল স্তম্ভকে উঠান হইল। প্রত্যেক চক্রের নিকট একগাছি করিয়া রজ্জু বাধিয়া বিপুল চেষ্টায় ও বহুসংখ্যক লোকের দ্বারায় ইহাকে যমুনাতীরে আনা হইল। এই স্থানে বাদশাহ স্বয়ং ইহার অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। এখানে অনেকগুলি স্তম্ভ নৌকা সংগৃহীত ছিল—বহু আয়াসে এই স্তম্ভকে তাহাদের উপর উঠাইয়া দিল্লীতে আনা হইল ও নূতন রাজধানী ফিরোজাবাদে স্থাপনের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল। প্রথমে এক স্তম্ভপ্রস্ত, নাতি-উচ্চ প্রস্তরভিত্তির উপর ইহাকে স্থাপিত করা হইল। এই প্রকারে এক একটি সোপানের পর সোপান নির্মাণ করিয়া ইহার মূলকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠাইয়া কৌশলে ইহাকে

দাঁড় করান হইল। ইহার পরেও বহু চেষ্টায় ও কৌশলে এই স্তম্ভকে বর্তমান উচ্চস্থানে স্থাপিত করা হইয়াছে।

একশ্রেণী ইহার গায়ে খোদিত লিপির আলোচনা করা বাউক। সর্বপ্রথমে Captain Hoare এই লিপির একটা প্রতিলিপি ১৮০১ সালের Asiatic Researches এ প্রকাশ করেন—কিন্তু তখন পণ্ডিতমণ্ডলীর কেহই ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই এবং ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত এই লিপি কেবল কোতুহলের সামগ্রী হইয়া তাঁহাদের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছিল। অবশেষে James Prinsep সাহেব এই লিপির অক্ষরপাঠের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি যখন সাঁচি-স্তূপের স্তম্ভে-খোদিত অক্ষর পড়িবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন লক্ষ্য করিলেন যে, যদিও তাহার অস্ত্রাঙ্গ সমস্ত অংশ পৃথক্, তথাপি ইহাদের শেষ দুই অক্ষর একই। তাঁহার মনে হইল যে, ধার্মিক বৌদ্ধগণ ধর্ম্মার্থে স্তম্ভ এবং স্তূপের শোভাবর্দ্ধক অস্ত্রাঙ্গ অলঙ্কার-সকল দান করিতেন। এরূপ হইতে পারে যে, এই শেষ অক্ষর দুইটি “দানম্” এবং তাহা ঐচ্ছিক হয়, তবে এই “দানম্”এর পূর্বে যষ্টি বিভক্তির চিহ্ন “জ” অক্ষর আছে। তাঁহার অনুমান যথার্থ হইল। তিনি এই অক্ষরকয়টি অবলম্বন করিয়া বিপুল চেষ্টায় একমাসের মধ্যে উক্ত সাঁচি-স্তূপের লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। তাঁহার এই অক্ষর-পরিচয় হইতেই অশোকস্তম্ভের পাঠোদ্ধারের স্বরূপাত। এই নব-আবিষ্কৃত পুরাতন ভাষার নাম হইল স্তম্ভলিখিত পালি বা ভারতবর্ষীয় পালি।

আলোচ্য স্তম্ভের গায়ে দুইপ্রকার শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি অশোকের খোদিত পালিভাষায়—দ্বিতীয়টি সংস্কৃত-ভাষায় চোহনবংশীয় রাজা বিশালদেবের জয়বার্ত্তা। শেষোক্তটি ১২২০ সংবতে অর্থাৎ ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ইহা আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত করিবার ইচ্ছা নাই। অশোকের লিপি এই স্তম্ভের চতুর্দিকে অতি পরিষ্কার এবং সুন্দর রূপে খোদিত এবং চারিদিকে ফ্রেমের মত অঙ্কিত। ইহার প্রত্যেকটিতে একএকটি পৃথক বিষয়ের আদেশ লিপিবদ্ধ আছে।

একশ্রেণী আমরা এই স্তম্ভোপরি খোদিত অনুশাসনলিপির আলোচনা করিব। প্রয়াগ, লৌরিয়া, সাঁচি প্রভৃতি স্থানে অশোকের যে সকল লিপি খোদিত আছে, তাহাতে মোটের মাধ্যম ছয়টি অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর এই স্তম্ভে এতদ্ব্যতিরিক্ত আর দুই অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই সকলের বিস্তৃত অনুবাদ না দিয়া বিষয়-বিশেষ-হিসাবে তাহাদের উল্লেখ করিব।

১। অশোক তাঁহার পুরোহিত ও প্রচারকদিগকে একান্ত মঙ্গলভাবে প্রণোদিত হইয়া কার্য করিতে আদেশ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহার অনুশাসনে আছে :—

“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—কল্যাণকর কার্য যাঁহা কিছু করিয়াছি, আমার অনুসরণকারিগণের পক্ষে তাহা কর্তব্যকার্যরূপে বিধিবদ্ধ হউক। পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের দ্বারা, ধর্ম্মাচার্যের সেবার এবং বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি সসন্মান ব্যবহারের দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, পিতৃমাতৃহীন

অনাথ এবং চারণগণের প্রতি দয়া এবং সৌজন্মের দ্বারা তাঁহাদের প্রভাব প্রকটিত হউক।

“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—ধর্মজ্ঞ পুরোহিতগণ সাহায্য-দানে সক্ষম ধনিগণের মধ্যে প্রবেশ করুন, অবিদ্বানদিগের মধ্যে প্রবেশ করুন, গৃহী এবং সন্ন্যাসী সকলেরই নিকট গমন করুন। আমার অনুরোধে সংঘসমূহের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করুন; ব্রাহ্মণ ও নিতান্ত দীনগণের মধ্যে আমার অনুরোধে তাঁহারা গমন করুন। যাহারা গৃহস্থধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, আমার অনুরোধে, তাঁহারা তাহাদের নিকটও গমন করুন। শুধু প্রবেশ করা নহে—এই সকল শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। * *

“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—আমার দানশীলা রাজ্যীগণ এবং ব্রাহ্মণ্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুণ্যকর্ম দীক্ষিত পুরোহিতগণ ও জ্ঞানিগণ ইহাদের ধর্মমতপ্রবর্তনের জন্ত শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাদের চেষ্টার সুব্যবহার করুন। বালকবালিকাগণের হৃদয়েও তাঁহাদের প্রভাব পূরোক্ত প্রকারে বিস্তার করুন।”

২। দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্যপ্রাণতা এবং পবিত্রতাই যে ধর্ম, তাহা তিনি তাঁহার অনুরোধে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই স্তম্ভের উত্তরদিকে লিখিত আছে :—

“ধর্মদৃষ্টি এবং ধর্মপ্রাণতা স্বর্ভূত ক্রমশ বৃদ্ধি হইবে। আমার প্রজাবর্গ, কি গৃহস্থ কি ভিক্ষু, সকল জীবই এক যন্ত্রে

প্রথিত, এবং সেই একই পথ নির্দেশ করিবে। সর্বোপরি, সকল রিপু জয় করিয়া তাহারাজ্ঞানী হইবে, কারণ ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে ধর্ম, পালন করে, যাহা পুণ্যশিক্ষা দেয় এবং যাহা একমাত্র প্রকৃত আনন্দ দান করে, জ্ঞান সেই ধর্মের দ্বারা রক্ষিত এবং সেই ধর্মের সহিত সংপ্রথিত।

“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—ধর্মই চরম উৎকর্ষ। সংক্রিয়া এবং পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তিই ধর্ম। দয়া, দান, পবিত্রতা, ইঞ্জিয়নিগ্রহ, এই সকলই আমার মতে সংস্কারের অভিষেক। যাহারা দরিদ্র, যাহারা আর্ন্ত, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, খেচর এবং জলচর, এই সকলেরই জন্ত আমি নানা হিতকর কার্য্য করিয়াছি। জড়ের প্রতিও রূপাপরবশ হইয়া আমি নানা সংকর্ম করিয়াছি। বর্তমান অনুরোধে এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল—সকলে অবধান কর; ইহা যেন সুদূর ভবিষ্যতেও থাকে; যে এই অনুরোধে কার্য্য করিবে, সে সুগতির সহিত মিলিত হইবে (অর্থাৎ অনন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইবে)।”

অন্তত্ৰ আছে :—“সমস্ত জগতে দয়া, দানশীলতা, সত্যানিষ্ঠা, পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য এবং সাধুতা বৃদ্ধি করাই ধর্মের যথার্থ উপাসনা।”

৩। আপনার কর্মের বিচার এবং যাহা কিছু পাপ তাহাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার উপদেশ অশোক, সকল স্থানেই দিয়াছেন। এই স্তম্ভে লিখিত আছে :—“সকলেই আপনার কর্মের মধ্যে যাহা ভাল, তাহাই দেখে ও বলে—‘আমি এই সংকর্ম করিয়াছি।’ কিন্তু নিজকৃত পাপানুষ্ঠান কেহ দেখে না,

কেহই বলে না—‘আমি এই ছক্কর করিয়াছি, ইহা পাপ।’ এরূপ আত্মবিচার কষ্টকর সন্দেহ নাই—কিন্তু এইপ্রকার বিচার করা ও বলা আবশ্যক—‘এই সকল কর্ম অসৎ, ইহা হিংসা, ইহা ঘেঘ, ইহা ক্রোধ, ইহা মাৎসর্য।’ আত্মহৃদয়কে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিতে হইবে—‘আমি হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দিব না, পরনিন্দা করিব না।’”

৪। বর্তমান স্তম্ভে লিখিত অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়—অশোক ধর্মপ্রচারার্থ রাজ্যসকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহারা বধনওজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনদিন সময় দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিয়া ছিলেন।—“তাহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে যে, তাহারা এই দিবসত্রয়মাত্র জীবিত থাকিবে। এইপ্রকার জ্ঞাত হইয়া তাহারা পরজন্মের হিতাকাঙ্ক্ষায় দান করিবে এবং অনশনব্রত গ্রহণ করিবে।”

৫। জীবহিংসাসম্বন্ধে অশোকের অনুশাসন এই যে—“জীবিত প্রাণীকে কেহ দধ করিবে না। অকারণ আনোদের জন্ত জীব-হিংসা করিবে না, এক প্রাণীকে বধ করিয়া কেহ অস্ত্র জন্তকে খাওয়াইতে পারিবে না। কয়েকটি নির্দিষ্ট পুণ্যতিথিতে কোনপ্রকার পক্ষী, মৎস্য, গো, মেঘ, ছাগ বা শূকর কেহ হিংসা করিতে পারিবে না।”

৬। অশোকের অনুশাসনের ষষ্ঠ বিষয়—তাহার সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি তাহার মঙ্গলভাব এবং তাহাদের কল্যাণকামনা। তিনি তাহাদের আত্মার কল্যাণকামনায় প্রণোদিত হইয়া সকলকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। “আমি

আমার প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছি। * * * এইজন্ত আমি আমার কর্মচারীদের উপর সর্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া থাকি। সকলেই জাতিনির্কিংশেবে আমার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয়—কিন্তু তাহাদের ধর্মমতের পরিবর্তন আমি প্রধান কর্তব্য মনে করি।”

৭। মহারাজ অশোক তাহার এই সকল ধর্মশাসনসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—
“* * তাহারা (প্রজাবর্গ) আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনন্ত মুক্তির অধিকারী হইবে। এইজন্ত আমার অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে এই ধর্মশাসন প্রচারিত হইল।” অতএব—“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—আমি ধর্মের বচন সকল প্রচার করাইয়াছি, ধর্মের বিধানসকল নির্দেশ করিয়াছি, সকলে তাহা শ্রবণ করিয়া সত্যপথে নীত হইবে।”

৮। এই স্তম্ভের চতুর্দিকে যে লিপি খোদিত, তাহা হইতে আমরা অশোক জনসাধারণ, এমন কি, পশুপক্ষীদিগেরও কল্যাণার্থ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ জানিতে পারি।

“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—বর্তমানকালে সংস্থাপনসমূহ আমার দ্বারা আহৃত হইয়াছে।—আমি ধর্মে সুপ্রবীণ ব্যক্তিসকলকে নিযুক্ত করিয়াছি এবং ধর্মপ্রচারের জন্ত বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছি।

“দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী পুনরায় বলিতেছেন—রাজপথসমূহের পার্শ্বে আমি স্তম্ভোৎসুকসকল রোপণ করাইয়াছি

—তাহারা পঞ্চশাস্ত্র মনুস্মৃতিগণকে এবং জন্তু-
দিগকে ছায়াদান করিবে।

“আমি বহু আশ্রয়ক রোপণ করাইয়াছি
এবং অর্দ্ধকোশান্তরে কুপ ধনন করাইয়াছি
—রাত্রিকালে বিশ্রামার্থ বাসভবনসমূহ
নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছি। মনুষ্য এবং পশুগণের
সুখস্বচ্ছন্দ্যের জন্ত আমি কত স্থানে কত
বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা
আছে কি? মনুষ্যগণ পথে এই নব বাস-
ভবনসমূহে নানাবিধ সুখ পাইয়া যেমন
আনন্দিত হইবে, তেমনি তাহারা যেন আমার
উদ্দেশ্য বুঝিয়া দয়াব্রত গ্রহণ করে।—ইহাই

আমার উদ্দেশ্য—এইরূপই আমি করিয়াছি।

* * এই সমস্ত বিধি এই উদ্দেশ্যেই প্রচা-
রিত হইল—আমার পুত্র—পুত্রের পুত্র পর্য্যন্ত
—যতকাল সূর্য্যচন্দ্র থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত
—ইহারা বর্তমান থাকিবে। * * আমার
রাজত্বকালের সপ্তবিংশ বর্ষে আমি এই
ধর্ম্মশাসন লিপিবদ্ধ করাইয়াছি। দেবতা-
দিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—
প্রসন্নফলক এবং শুভসমূহ নিৰ্ম্মিত হউক
এবং তদুপরি এই সকল ধর্ম্মশাসন খোদিত
হউক। সে সকল যেন অনন্তকাল পর্য্যন্ত
বর্তমান থাকে।”

অধ্যাপক—

শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

চৈত্রেয় গান।

ওরে আমার কর্ম্মহার!

ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া!

ওরে আমার মনরে আমার মন!

জানিনে তুই কিসের লাগি

কোন্ জগতে আছি জাগি,

কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন!

কোন্ পুরাণে যুগের বাণী

অর্থ যাহার নাহি জানি,

তোমার মুখে উঠে আজি ফুটে!

অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি

কোন্ ভাষাতে গাঁথছে স্মৃতি

শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে!

আজি সকল আকাশ জুড়ে

যাচ্ছে-তোমার পাখা উড়ে

তোমার সাথে চলতে আমি নারি!

তুমি যাদের চিনি বলে' টান্চ বৃকে নিচ্চ কোলে
আমি তাদের চিন্তে নাহি পারি !

আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু ।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু !

গভীর চিন্তে গোপন-শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া,
দেখে নিলেম্ কণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া !

ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তার চিরযুগের ঘুম ।
দেখতে লয়ে' মুহুর করে আঁকা তাহার লালাট'পরে
কোন্ জনমের চন্দন-কুসুম !

আজকে হৃদয় বাহা কহে' মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ !
খুলে গেছে কেমন করে' আজি অসম্ভবের ঘরে,
মর্চে-পড়া পুরাণো কুলুপ ।

সেখায় মায়াবীপের মাঝে যক্ষশালায় বীণা বাজে,
ফেণিয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মন্দিরিত-তমাল-ছায়ে ভিজ্জে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ !

শৈলভলে চরায় ধেম্ 'রাখালশিশু বাজায় বেণু
হুড়ায় তারা সোনার মালা পরে ।
সোনাল তুলি দিয়ে লিখা চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাদায় হিয়া অপূর্ণধন-তরে !

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মম কাঁপুতে সারাশ্রাণ !

কাঁপুচে দেহে কাঁপুচে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মন্দিরিয়া উঠে কলতান !

কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনিনে.গো,
মোর ঘারে কে করুচে আনাগোনা !

ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—

দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গারে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান !

শুনাসনে গো ক্লাস্ত বৃকের বেদনা যত হৃথের হৃথের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার !

শুনাও শুধু মুহম্মদ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু হৃরের আকুল ঝঙ্কার !

ধারায়ন্তে নান করি' যত্নে তুমি এস পরি'
পীতবরণ লঘুবসনখানি ।

ভালে আঁক ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
' কোলের 'পরে সেতার লহ টানি' !

দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীলছায়া গাছের সারে
নয়নছটি ময় করি চাও !

ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও !

দুর্বল ।

রে দুর্বল, বুঝিয়াছি হৃদয়ের কথা,

দুর্বল হারিয়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা !

আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়

তাই তোর এত ভয়, এত হায় হায় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

অনুতাপিনী সন্ন্যাসিনী ।

(ফরাসী-লেখক ইউজেন্-ডোরিয়াঙ্ক হইতে)

১

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়মাসের আরম্ভভাগে একটি রমণী টুলুজ্-নগরীর রাজপথ-দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছিল। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার জন্য, মধ্যে-মধ্যে থামিতেছিল, আকার চলিতেছিল। অবশেষে একটা মঠের নিকট উপনীত হইয়া বলিল :—“মঠ-ধাবিণীর সহিত আমি সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাই।” অমনি, লোহ-গরাদিয়া-বেষ্টনের প্রবেশদ্বার উদঘাটিত হইল।

একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া, একটা কামুরার মধ্যে লইয়া গেল। সেটি স্তবপাঠের স্থান ;— সুন্দর সজ্জার সুসজ্জিত, কুসুমগন্ধে আমোদিত। সেই অপরিচিতা সন্ন্যাসিনী তাহাকে সৈথানে একাকিনী রাখিয়া, একটি কথা না বলিয়া, প্রস্থান করিল। একটু পরেই, আর একজন, রমণী গর্জিত পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন করিল। পরে, আগন্তুককে একখানি আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, দুইজনেই উপবেশন করিল।

বিলাসের সামগ্রী বতদূর মূল্যবান্ ও ইন্দ্রিয়াকর্ষক হইতে পারে, সেই সব সামগ্রীতে এই কক্ষটি সুসজ্জিত ; এইরূপ সুসজ্জিত ঘরে, এই দুইটি রমণীকে যদি

কেহ এই সময়ে দেখিত, সে নিশ্চয়ই মনে-মনে কত-কি ভাবিত, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না।

এই দুই রমণীর মধ্যে, একজনের দেহের উচ্চতা, সচরাচর স্ত্রীলোকের ধরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ। যৌবনে ইহারই মধ্যে ভাঁটা-পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। পরিধানে মোটা ক্যুনেলের কাপড় ; গলার নীচের দিকে একটু খোলা ; মিহি-স্বতার “শেমিজ”-জামা ভিতর হইতে দেখা বাহিতেছে। চোখের তারা কৃষ্ণবর্ণ ও অগ্নিময়। কপোলের দুই দিকে পাকানো সলিতার ন্যায় দুইটি কৃষ্ণাভ অলকদাম লবিত ; তাহাতে তাহার মুখের শুভ্রবর্ণ আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়া রমণীর মুখশ্রী কঠোর, মহৎসূচক, গুরুগম্ভীর, রাজমহিমাদীপ্ত ; এবং তাহার সন্নিকর্ষের এরূপ প্রভাব যে, তাহারে অভিতূত হইয়া পড়িতে হয়। তাহার লৌকিক নাম ‘গ্যাব্রিয়েল্’, কিন্তু মঠের লোকেরা তাহাকে ‘মাতাজি-অ্যান্-মারী’ বলিয়া ডাকিত।

দ্বিতীয়ার অপেক্ষা, প্রথম বয়সে ২০ বৎসরের ছোটো ; লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, পাতলা ; বাতাহত নতশির কুসুম-কলিকার ন্যায় ইনি যেন সর্বদাই কাঁপিতেছেন ও নত হইয়াই আছেন। ইহার মুখশ্রী বাস্তব-পক্ষে সুন্দর হই-

লেণ্ড, চিত্র-বস্ত্রগার ছাপ্‌ বেন উহাতে মুদ্রিত । ইহার সুনীল নেত্রের চারিধারে সুদীর্ঘ পদ্ম-রাজি ; দুইএকটি মোটা-মোটা অশ্রুক্ষেঁটি বেন তাহাতে আটকাইয়া রহিয়াছে । তাঁহার চিকণ কেশগুচ্ছ, কক্ষ-প্রবাহিত স্নানীতল মুহুমন্ অনিলভরে, বকের উপরে ক্রীড়া করিতেছে । মাতাজি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে বলিলেন :—“ভদ্রে, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার নিকটে এসেছ ?”

তরুণীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে পরিপ্লুত ছিল, এক্ষণে চোখের জল মুছিয়া সে উত্তর করিল :—“মা, আমি আপনার কাছে সাহায্য পাবার জন্য এসেছি । আমি হতভাগিনী, আমি পাগিষ্ঠা ; কিন্তু আমার দুর্কর্মের জন্য আমি যথেষ্ট কষ্টও পেয়েছি । আমার মা-বাপ আমার কাছে সর্বদাই বলতেন, ‘অনু-তাপ করলে ঈশ্বর মার্জনা করেন ।’ কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনুতাপ যথেষ্ট নয়, আমা-দের মহাপ্রভু বলেন :—‘ষাদের ধন ঐশ্বর্য আছে, তাদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর ।’ যাতে আমার দোষের ফালন হয়, যাতে আমার প্রারশ্চিত সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য আমি ‘আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি বিসর্জন করে’, আপনার স্নেহময় কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি । মা, দয়া করে’ আপনার পবিত্র কন্যাদের মধ্যে আমাকে একটু স্থান দিন ।”

মাতাজি বলিলেন :—“প্রভুর শাস্তি-নিকেতনের দ্বার সকল পাপীর জন্যই উন্মুক্ত । তবু একটা কথা যদি তোমাকে বলি, কিছু মনে কোরো না । আমাদের আশ্রমে যে-সব ত্যাগস্বীকার করতে হয়, যে-সব কঠোর

সাধনা করতে হয়, সে-সব তুমি যে সহ্য করতে পারবে, তোমার শারীরিক অবস্থা দেখে তা’ মনে হয় না । তোমার শরীর দুর্বল, তোমার স্বাস্থ্য...”

তাঁহার কথা শেষ না হইতে-হইতেই আগন্তুক বলিল :—“হা ভগবান ! তা হ’লে পথহারা হয়েই কি এইভাবে আমার চির-কাল ঘুরে বেড়াতে হবে ? মাতাজি, আপনার দয়ার শরীর, আপনি মমতাময়ী ; আপনাকে আমি অহুন্নয় করছি, আপনার কাছ থেকে আমাকে দূর করে’ দেবেন না । এ সংসারে আমার আর কেউই নেই । এখন আর আমার স্বামী নেই—আর বোধ হয় পুত্রও নেই ।”

বেচারি বাস্তবিকই বড় কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া, মাতাজির হৃদয় আর্দ্র হইল । তিনি আগ্রহভরে আরও কাছে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং অতীব মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন :—“বাছা, তোমার চোখের জল মোছো । তোমাকে আমার কাছ থেকে দূর করার কোন অভিপ্রায় নেই । তোমার প্রতিজ্ঞা যদি অটল থাকে, অন্য কাজে লিপ্ত হবার যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে, আর যদি তোমার যথেষ্ট মনের বল থাকে, তা হ’লে আমাদের সঙ্গে তুমি থাকো । আমরা তোমাকে সাহায্য দেব । আর এ কথা ভরসা করে’ বলিতে পারি, তোমার প্রার্থনার সঙ্গে যদি আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তা হ’লে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবেন ।”

বলিতে বলিতে তিনি একবার থামি-লেন এবং খুব মনোযোগের সহিত সেই

আশ্রয়প্রার্থিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন; তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—“কিন্তু আমাদের আশ্রমের নিয়ম-অনুসারে, প্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক, তুমি কোথা হ’তে আস্চ। বোধ হচ্ছে তুমি বিদেশিনী। তুমি কে বল দিকি? তোমার কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? তুমি যে সঙ্গ করছ, তার জন্ত তাঁদের কাছে কি তোমার জবাবদিহি করতে হবে না?”

এই প্রশ্নগুলি পর-পর একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায়, আগন্তুক একটু ধতমত খাইয়া গেল। তাহার পাণ্ডুবর্ণ কপোল দ্রব্য রক্তিম-রঞ্জিত হইল।

কিন্তু একটু পরেই গাপনাকে সামলাইয়া লইয়া, অবিচলিত-প্রশান্তভাবে ও সম্পূর্ণ-দৃঢ়তা-সহকারে উত্তর করিল :—“লণ্ডনের পার্শ্ববর্তী কোন-এক পল্লিতে আমার জন্ম। আমার নাম, প্রশ্বেব্রীর ‘ক্যাথেরাইন’। আমি ডার্মুথের কোন্টেস্। আমি জন্মাবধি ক্যাথলিক-ধর্মাবলম্বী।”

এই কথাগুলি বলিয়া, ঐ আগন্তুক রমণী তাহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে একটি ইস্পাত-মণ্ডিত বাক্সো বাহির করিল। বলিল :—“মা, এই বাক্সোটি আপনি রাখুন, এর ভিতরে আমার ধোতুকের ধনরত্ন আছে। কিন্তু তার চেয়েও যে একটি মূল্যবান জিনিস আমার আছে, তার সন্ধান আপনি ওতে পাবেন। অবশ্য আপনার কাছে সেটি মূল্যবান নয়; কিন্তু এ সংসারে সেইটিই আমার একমাত্র ধন, সেইটিই আমার একমাত্র বন্ধন। আহা! আবার যে আমি তাকে দেখিতে পাব, সে আশা আর আমার নেই

... আমার শিশুটিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে; ফ্রান্সে নিয়ে যাবার জন্তে, তাকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে যদি এখনও বেঁচে থাকে, আর যদি কোনোদিন আপনি তার কথা শুন্তে পান, তা হ’লে আপনি এই বাক্সোটি তাকে দেবেন, আপনার কাছে এটি গচ্ছিত রইল। ওরই মধ্যে, সে তার মায়ের অন্তিমকালের ইচ্ছে জানতে পারবে।”

২

উপরে বাহা বিবৃত হইল, তাহার দুই বৎসর পরে, টুলুজ-নগরে সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, ডার্মুথের কোন্টেস্ মঠে গিয়া সন্ন্যাসিনীর অবশুষ্ঠন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে, মঠের ভজনালয় চিত্রিত পর্দায় ও অভৌব চুলভ এবং সদাঃপ্রস্ফুটিত কুসুমগুচ্ছে অসজ্জিত হইয়াছিল। সেখানে মঠগুলি যার-পর-নাই জম্‌কালো সাজসজ্জার ভূষিত হইত। তাহার কারণ, সম্ভ্রান্তবংশের ও রাজপরিবারের মহিলারাও সে সময়ে কখন-কখন মঠের আশ্রয় লইতেন। এই-জন্ত মঠের ধর্ম্মাচাৰ্য্যানের মধ্যেও রাজকীয় আড়ম্বর ও ঘটা পরিলক্ষিত হইত।

প্রথমে ১০ই আষাঢ় দীক্ষার দিন স্থির হয়, কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি পীড়িত হ ওয়ায়, দশদিন আরও পিছাইয়া যায়। কেন না, প্রজ্ঞাপদ-মাতাজি ভিন্ন দীক্ষাকার্য্য আর কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

আজ সেই দীক্ষার দিন। অর্হটানের একষষ্ঠী পূর্বে, শুভ্রবসনা অবশুষ্টিতা কুসুম-কিরীটিনী দীক্ষা-প্রার্থিনী, স্বীয় ধর্ম্ম-

রমাতা হস্তে সমর্পিত হইলেন । কারণ, নিজ পরিবারবর্গের অভাবে, সেই ধর্ম-মাতাই তাঁহাকে সঙ্গ করিয়া নগরে আনিয়াছিলেন । মঠের দ্বার উদঘাটন করিয়া, মঠধারিণী মাতাজি দীক্ষার্থিনীকে বলিলেন :—“যাও বৎসে, তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি ; সংসারে গিয়ে যদি সুখী হবার আশা থাকে, তা হ’লে, সেইখানেই থেকো, আর এখানে ফিরে এসো না ।”

খুব জম্‌কালো বহুশ্রম্য পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ডামুখের কোন্‌টেস্ সমস্ত সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন । উৎসবসজ্জার স্রায় সুসজ্জিত নগর-গিজা-গুলি পরিদর্শন করিলেন । কিন্তু সংসারের এই সমস্ত আড়ম্বর দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—তিনি বিনা-পরিতাপে মঠের ভজনালয়ে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং সুপবিজ বৈদী-স্থানের প্রবেশপথে তাঁহার জন্ত যে ‘প্রার্থনা-ডেস্কো’ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । তাঁহার বামপার্শ্বে তাঁহার ধর্ম-মাতা উপবিষ্ট হইলেন ।

তখন কোন্‌টেস্ দেখিলেন, সঙ্গীতের স্থানে অনেক মঠ-সন্ন্যাসিনী সমবেত হইয়াছেন । আরো দেখিলেন, দুটি ‘ক্রুশ্’—বাহার মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনে আবৃত ; কতকগুলি স্তোমবাতি—যাহা ‘স্মৃতি-ভোজ’ (communion) অঙ্গষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত ; একটা প্যাট্রা—বাহাতে সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ রক্ষিত ; একটি কাঁটার সুড়ুট ; একটি রুপার স্ক্রিনিং ; একখানি কাঁচি—যাহা-দিয়া পরে তাঁহার স্তন্যর কেশজঙ্ঘ কাটিয়া ফেলিতে

হইবে ;—এই সকল সামগ্রী সেইখানে স্থাপিত হইয়াছে ।

দীক্ষার্থিনীর সম্মুখে একটি বাতির ঝাড় রক্ষিত, তাহাতে একটি বাতি জ্বলিতেছে । ‘খৃষ্টদেহ-স্মৃতিভোজ’-সংক্রান্ত উপাসনা (mass) হইতে আরম্ভ করিয়া ‘নৈবেদ্য-উৎসর্গ-বন্দনা’ (offeratory) পর্যন্ত এই বাতিটি জলিবার কথা । একটু পরে, দীক্ষার্থিনী একাকিনী উঠিয়া পুরোহিতের হস্তে তাঁহার দেয় নৈবেদ্য অর্পণ করিলেন ।

‘মাস্’-উপাসনা শেষ হইলে, ক্যাথেরাইন্‌ স্মায় ধর্ম-মাতার সহিত বৈদী-স্থানে (sanctorium) গরাদিয়ার নিকট ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলেন । মঠধারিণী মাতাজিও স্মায় সহকারিণীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানে আগমন করিলেন ।

কোন্‌টেস্‌ নতজানু হইয়া বসিলেন । মঠধারিণী মাতাজি দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাকে বলিলেন :—“বৎসে, তুমি কি চাও ?”

ক্যাথেরাইন্‌ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন :—“আমি ঈশ্বরের কৃপা চাই ; আপনার মঠে দীক্ষিত হ’তে চাই ; এবং আপনি যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী, সেই সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করবার অঙ্গুমতি চাই ।” মঠধারিণী আবার বলিলেন :—“বিগুণ্ঠের যুগ-কাঁচ চিরকাল বহন করবে বলে’ কি তুমি দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়েছ ?”

—“হাঁ মাতাজি ।”

—“ধর্ম-জীবনের কঠোর-ব্রতাদি-সাধনের বল কি তোমার আছে ?”

“হাঁ মাতাজি, আমি ভয়না করি,

ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের প্রার্থনার বলে আমার পক্ষে কিছুই ছুড়র হবে না ।”

—“বৎসে, ঈশ্বরের প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক, তুমি যেন অবশেষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পার, ঈশ্বরের কাছে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা ।”

কতকগুলি অমুষ্ঠানের পর, দীক্ষার্থিনী মঠের দ্বার দিয়া মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেন । মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে, মঠের প্রথা-অনুসারে, তাঁহার কোন নিকটতম আত্মীয়কে তিনি আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না । কেন না, তাহার কোন আত্মীয় ছিল না । তিনি পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না ।

একটু পরেই, তিনি মাতাজির পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । মাতাজির সহকারীগণ তাঁহার লৌকিক বসন খুলিয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে একটি লম্বা জামা, একটি কালো ‘গাউন’, বক্ষ-পৃষ্ঠের একটি আচ্ছাদন-বস্ত্র এবং একটি জপমালা তাঁহাকে প্রদান করিল । তাঁহার দীর্ঘ-চিকণ কেশ-গুলু তখনও তাঁহার স্বপ্নের দুই দিকে বিভক্ত হইয়া •রিলখিত ছিল; কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি তাহা ছেদন করিতে তিলাদ্র বিলম্ব করিলেন না । ছেদন করিয়াই একজন সন্ন্যাসিনীকে তাঁহা পুড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন । তাহার পর, একটি শিরোবন্ধনের ফিতা, একটি সন্ন্যাসিনীর অংগুষ্ঠন, একটি কণ্টকময় কুন্তল-কিরীট দীক্ষিতাকে প্রদান করিলেন । যে তিনদিন তাঁহাকে বিজন-বাসে থাকিতে হইবে, সেই তিনদিন এই

কাটার মুকুটটি তাঁহার মাথা হইতে খুলিতে পারিবেন না ।

এইরূপ সাজে সজ্জত হইয়া, তাঁহার ব্রত-প্রতিজ্ঞা পষ্ট-পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গম্ভীর-ভাবে পাঠ করিলেন । কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার লৌকিক নাম ‘ক্যাথেরাইনে’র পরিবর্তে, ‘মারী থেরেস্’ এই নামে তাঁহার নামকরণ হইল, ঠিক সেই সময়ে একটা বিষম ছন্দেব উপস্থিত হইয়া অমুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মাইল । একজন বিদেশী ব্যক্তি—যে কিছুকাল হইতে “ইংরেজ” এই নামে নগরবাসীদিগের নিকট পরিচিত ছিল—সে সন্ধ্যা একটা বিকট চাৎকার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল ।

পার্শ্ববর্তী ভিন্ন-মঠের সন্ন্যাসীরা দল, বাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহাদের মঠে গুপ্তাবার জন্ত লইয়া গেল । তাহার সহিত একটি শিশু ছিল, সে-ও সঙ্গে গেল । সেই অবধি তাহার কিংবা সেই শিশু-টির কোন সংবাদ পাওয়া গেল না ।

৩

এই ভাবে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল । একদিন দেখা গেল, একজন সন্ন্যাসিনী পূর্ববর্ণিত মঠের সুরঙ্গ-গহবরের মধ্যে একটা প্যাচালো সিঁড়ি দিয়া নাবিতেছে ।

মঠধারিণীগণ যেখানে কবরস্থ হইয়া থাকেন, সেই কবরস্থানের শেষ কবরটির দিকে সেই সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিল ! এবং ছোটো-খোটো একটা প্রার্থনা শেষ করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল :—

“হে ঈশ্বর, আমি যদি কোন অজ্ঞান কাজ করে’ থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আর তুমি মাতাজি—পবিত্র জননি—আমার উপকারী বন্ধু—তোমাকে আমি কত ভালবাস্তেম, তোমার মৃত্যুতে আমার কি কষ্টই হয়েছিল; এখন যে আমি এসে তোমার শান্তিভঙ্গ করছি, তার জন্য আমাকে মাৰ্জ্জনা করবে। কিন্তু সেই গোপনীর কথাটা আমার বুকের ভিতর বোঝার মত চেপে রয়েছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই আমারও শীতল দেহ এই মাটির মধ্যে প্রবেশ করবে। তুমি বেঁচে থাকতে যে গুপ্তকথা সাঁহস করে’ তোমার কাছে বলতে পারি নি, সেই কথা আজ আমি তোমার কবরের সম্মুখে প্রকাশ করতে এসেছি। অনেকদিন ধরে’ আমার হৃৎ-কষ্ট বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম; এখন তা’ প্রকাশ করলে আমার বুকের বোঝাটা নেবে যাবে, আর, ঈশ্বরের সম্মুখেও পাপ হ’তে আমি একটু মুক্ত হ’তে পারব।”

এই মুহূর্তে সন্ন্যাসিনী কি-যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু আর কিছু শুনিতে না পাইয়া, আশ্বস্ত হইয়া, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—“আমি প্রশ্বেরি-ডিউকের কন্যা। আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাতেম। যে বায়ু আমি নিশ্বাসে গ্রহণ কর্তেম, যে আকাশ আমি চোখের দান্বে দেখতেম, তাতেই আমার আনন্দ হত; আমি আর কিছু চাইতেম না।……পরে ডায়ুথের কোন্ট

আমার প্রার্থী হলেন; অবশেষে আমাকে বিবাহ করলেন। তাতে আমার সুখের জীবনে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটল না; কেন না, আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম। তখন আমার কপালে একটুও ভাবনার রেখা পড়ে নি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলত, রূপবতী বলত; আমার চিকণ চুল পিঠের উপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলিয়ে যেত। এসব অতি তুচ্ছকথা, সন্দেহ নেই; কিন্তু গত-জীবনের এই ক্ষুদ্র কথাগুলি স্মরণ করলেও একটু সুখ হয়। এই কথাগুলি স্মরণ করে’ আমি ৩০বৎসর কাল যে অসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তার বর্ণনা করতে একটু বল পাব।

“একসময়, ‘বদান্ত-মণ্ডলী’ নামে একটি সভা লণ্ডননগরে স্থাপিত হয়। সেই সভার উদ্দেশ্য হুঃখী-কাঙালদের হুঃখ-মোচন। এই উদ্দেশ্যে ধন উৎসর্গ করার জন্য সর্বসাধারণকে আহ্বান করা হ’ত। তাই আমিও এই কাজে কিছু সাহায্য করব মনে করলেম। সভায় পাঠিয়ে দেবার জন্য কিছু টাকা আমাদের থাঞ্জাকি জর্জ রবিন্সনের হাতে রেখে দিলেম। আর, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আমাদের ভাণ্ডারীর জিহ্মা করে’ দিলাম। মনে করেছিলাম, সেইগুলি বিক্রয় করে’ যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা দরিদ্রদের বিতরণ করব।

“তার কিছুদিন পরে, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেম; তাতে সে লিখেছে, গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরে সে পত্রের কোন

উত্তর দিলেম না। তার দুইদিন পরে, আর এক পত্র আমার হাতে এল। পত্রখানা উদ্ধৃত আদেশের ভাবে লেখা; আর, তাতে ভয়প্রদর্শনও আছে। শেষে এই কথা লিখেছে :—‘তুমি যদি আমার না হও, তাহা হইলে তোমার স্বামীর মরণ নিশ্চয় জানিবে।’ এই পত্রখানা পেয়ে আমার অত্যন্ত ভয় হ’ল; কিন্তু পাছে আমার স্বামী উদ্বিগ্ন হন, এইজন্য আমি এই পত্রের কথা তাঁকে কিছুই বল্লম না।

“সেইদিন রাত্রে আমার জ্বর হ’ল। আমি প্রলাপে গুপ্তহত্যার কথা ক্রমাগত বলিতে লাগলুম। তার পরদিন, জ্বরের কিছু উপশ্রম হওয়ায়, মনে করলুম, একটু বাড়ীর বাহিরে যাই। এই মনে করে’ বার-দরজার চোকাঠে যেমনি পা দিয়েছি, অমনি কে-যেন এসে আমার জোর করে’ ধরলে, গুঁড়ি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে’ আমাকে একটা গাড়ির মধ্যে উঠিয়ে নিলে... আমি তখন অস্ত্রঃসজ্জা ছিলুম; আমার এই চূর্ণিল অবস্থাতেই সেই কাপুরুষ জন-টমসন্ আমাকে হরণ করে’ নিয়ে যায়। তখন থেকেই, আমি তাকে সর্বাস্ত্রঃ-করণে, ঘৃণা কর্তেম, ও ধার-পর-নাই হর্বাক্য বলে’ তাকে ক্রমাগত ভৎসনা কর্তেম। - কিন্তু এ সমস্ত ঘৃণা, অবজ্ঞা, ভৎসনা সত্ত্বেও, পুরো দুইমাস সে আমাকে তার কাছে আটকে রেখে দিলে। এই সময়ে আমার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হ’ল। তার নাম রাখলুম ‘হারি’। ..”

এই কথা বলিয়াই সে ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, কে-

যেন আবার হারির নাম উচ্চারণ করিল।

—“বোধ হয় আমার কথারই প্রতিধ্বনি।” এই বলিয়া, আবার জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া তাহার নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল :—“পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পর, আমি যেই স্নেহভরে তার মুখচূষন করব, অমনি আবার সেই হতভাগা নরাদম এসে আমার কোলের শিশুটিকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। জোর করে’ নিয়ে যাবার দরুণ, বাছার ছোটছোট হাতছুটি থেকে সে সময়ে ঝুঝুঝু করে’ রক্ত পড়েছিল।

“হা ভগবান! সেইদিন থেকে আমি কত কষ্টই পেয়েছি। কেঁদে-কেঁদে আমার চোখের জল যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাছাটি যখন বহুদূর চলে গেছে, তখনও আমি সেই প্রসব-শয্যা শুয়ে-শুয়ে, ‘হারি’ ‘হারি’ বলে’ ক্রমাগত ডেকেছি।” -

সেই সময়ে একটা পদশব্দ শুনিতে পাওয়ায় সন্ন্যাসিনী সহসা পিছন ফিরিয়া দেখিল—এক জন পুরুষ-সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

একটি প্রদীপ কবরের উপর জ্বলিতেছিল; সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে আগন্তুক দেখিল, সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্রাবিত।

সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিল :—“কে তুমি? যে গোপনীয় কথা আমি আর কারও নিকটে বলি নি— যা’ শুধু এই কবরের কাছে বিশ্বাস করে’ বলছিলেন, তা’ই আমার অজ্ঞাতে শোনিবার জন্য তুমি কি এখানে এসেছ?”

—“আমি একজন অযোগ্য সামান্য সন্ন্যাসি-ব্রাতা। তোমাদের একজন সন্ন্যাসিনী ভগিনী পীড়িত হওয়ায়, তাকে সাহায্য দেবার জন্ত এই স্বরঙ্গ-পথ দিয়ে তোমাদের মঠে আমি এসেছিলাম। তোমার কঠোর শুনে আমি এই গহবরে এসেছি। তোমার সমস্ত কণাও আমি শুনেছি, আমাকে ক্ষমা করবে। যেমন বলছিলে বলে’ যাও, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।”

সন্ন্যাসিনী মুহূর্তের জন্ত একটু ইতস্তত করিয়া, পরে আবার কথা আরম্ভ করিল :—

“আমার গুপ্তকথা (Confession) শোনার জন্ত নিশ্চয় স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। বোধ হয়, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে, এই কবর-স্থানে, আমার আলা-বস্ত্রণা ও চলনার কথা তোমার কাছে আমি প্রকাশ করে’ বলি। আচ্ছা, শোনো তবে সন্ন্যাসি-ভাই!

“শরীরে একটু বল পেয়েই আমি লগুনে ফিরে গেলাম। যেদিন আমাকে হরণ করে’ নিয়ে গিয়েছিল, সেই দিনই আমার স্বামী কোণ্ট ডামুথের বিষয়োগে মৃত্যু হয়। খাজাঞ্চি জর্জ-রবিন্সন ও ভাগুরী জন্-টমসন পক্ষাশলক্ষ টাকায় নিয়ে পলায়ন করে। পরে জর্জ ধৃত হয়, ও রিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যদিও সে নিজমুখে স্বীকার করে যে, এই চুরীর কাজে ও কোণ্টের গুপ্তহত্যার তাহারও কতকটা হাত ছিল, তবু লোকে বলাবলি করতে লাগল, আমিই আমার স্বামীকে হত্যা করেছি। ... লগুন তাই আমার পক্ষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল; তা ছাড়া, আমি

খবর পেলেম, সেই হতভাগা জন্-টমসন যুরোপের মহাদেশে পালিয়ে রয়েছে। আমি বিষয়কর্ণের একটা বন্দোবস্ত করে’ দিয়েই, যত শীঘ্র পারি, ইংলণ্ড থেকে চলে যাব স্থির করলেম। কেন না, ইংলণ্ডে যতদিন থাকব, আমার সেই কষ্টবজ্রণার কথাই ক্রমাগত মনে পড়বে।

“অনেক কাল ধরে’, আমি সমস্ত জ্ঞান্-ময় ঘুরে বেড়ালেম। যে হতভাগা, আমার বাছাটিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আমি তার অনেক সন্ধান করলেম। অবশেষে হতাশ হয়ে, এই টুলুজ্-নগরের মঠে এসে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেম। যদি এখানে থেকেও একটু শান্তি পাই—আমার এখন এই একমাত্র আশা।

“একটা বিষয়ের জন্ত আমার অত্যন্ত অসুস্থতা হয়—মনে মনে আপনাকে আপনি ধিকার দি। যাকে আমি ভালবাস্তেম—যিনি আমার স্বামী—কেন আমি তাঁকে সেই জঘন্য পত্রটা দেখাই নি? হায়! যদি দেখাতাম, তা হ’লে হয় তো এই সর্ব-হৃদিশা আমার কিছুই ঘটত না।

“এই বিজন আশ্রমে, এই বাক্সোটি এখন আমার একমাত্র সখল; যার এই কবর দেখে, তাঁর হাতেই আমি এই বাক্সোটি পূর্বে গচ্ছিত রেখেছিলাম; তার পর, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে, তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন; কোণ্ট ডামুথের বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পুত্রের যে স্বত্বাধিকার আছে, তারই দলিলপত্র এই বাক্সোটির মধ্যে রক্ষিত। আর, যখন আমার আর

কোন আশা-ভরসা ছিল না, আমার পুত্রটি আর বেঁচে নেই বলে' যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, তখনি আমি পূজনীয় মাতাজির কাছে এই বাক্যসোটি পুঙ্খিয়ে রাখি। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, আমাকে সুপরামর্শ দিতেন...এখন এই নাও, তোমাকে আমি সেই বাক্যসোটি দিচ্ছি; কেন না, বেশ বৃদ্ধিতে পার্শ্বে, তোমাকে ঈশ্বরই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার হাতেই তাই এটি বিশ্বাস করে' দিলেম। হয় তো তুমি কৃতকার্য হ'তে পারবে;—যার জন্য আমি কৈন্দে-কৈন্দে বেড়াচ্ছি, হয় তো তুমি তাকে সন্ধান করে' বের করতে পারবে।"

ঠিক এই সময়ে, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, সেই যুবক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—এই দুই-জনের মধ্যে আসিয়া দাড়াইলেন। ভয়ে দুইজনই কাঁপিতে লাগিল।

ইনি সন্ন্যাসি-বাবা 'জাঁ'। জাঁ গভীর কণ্ঠস্বরে বিড়বিড় করিয়া বলিলেন :—
“এখানে কি করচ সন্ন্যাসি-ভাই? আর তুমি ভগিনি, এত স্থান থাকতে বেছে-বেছে এই সুরঙ্গ-গহবরে স্তুতিপাঠের জন্য কেন এসেছ বল দিকি?” এই শেষ কথা-গুলি বলিবার সময়, বিজ্রপের একটু হাসি যেন তাঁর মুখে দেখা দিয়াছিল।

সন্ন্যাসিনী বিবীতভাবে উত্তর করিলেন :—“সন্ন্যাসি-বাবা, আমার কথা না শুনেই আমাকে অপরাধী করবেন না। আমাকে অবশ্য আপনি চেনেন না। কেন না, এই মঠে যখন আমি প্রথম প্রবেশ করি, তখন থেকেই আমি এখানে একলা থাক্‌বার

অনুমতি পাই। আমার দৈনিক কর্তব্য শেষ করে', আমার নির্দিষ্ট কোটরটির মধ্যে একলা থাকতে আমার ভাল লাগে। আমার যে-স্বামীকে শুণ্ডহত্যা করেছে, আমার যে-পুত্রটিকে আমার কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে, সেই দুঃখের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমার এখন একমাত্র সুখ ও সাধনা।

“আমাদের সেই মাতাজিকে হারিয়ে অবধি, এতদিনের পর আজ আমি তাঁর কবরের সম্মুখে আমার দুঃখ নিবেদন করতে এসেছি...সন্ন্যাসি-বাবা, আমার উপর কোন কু-সন্দেহ করবেন না! আমি সন্ন্যাসি-ভগিনী 'মারী থেরেশ'।”

সন্ন্যাসি-বাবা বলিয়া উঠিলেন :—“কি! তুমি মারী-থেরেশ?”

তাঁহার চোখে বিজ্ঞান ছুটিল; তাঁহার সমস্ত শরীরে 'খেলুনী'-রোগের ন্যায়-কম্প উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসিনীকে তিনি মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে, সহসা উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার হস্ত সজোরে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন :—
“তুমি 'কেটি'? (ক্যাথেরাইন-নামের অপভ্রংশ) সেই তুমি, যাকে আমি এত ভালবাসতাম? তুমি আমাকে কাপুরুষ বলে', হতভাগা বলে', নরাধম বলে' কঁতাই-না স্ফুণা করেছে, তবু তোমাকে আমি ভাল-বেসেচি। ছই বৎসর ধরে' তোমাকে আমি সমস্ত দেশময় খুঁজে বেড়িয়েচি। অবশেষে, যে সময়ে তুমি সন্ন্যাসব্রতের প্রতিজ্ঞা পাঠ করছিলে, সেই সময়ে তোমাকে আমি দেখতে পেলেম...কিন্তু যে সময়ে তোমাকে

পাবার জন্ত আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম, আমার প্রতি তোমার সেইসময়কার অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভৎসনা বই, আমার মনে, তোমার সহকে আর কোন স্মৃতি নেই। যে রমণী তার প্রেমোন্মত্ত নায়কের মর্মে এইরূপ আঘাত দেয়, তারও মর্ম্ম-ক্ষত যতক্ষণ না সে দেখতে পায়, ততক্ষণ সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, তার উন্মত্ততার উপশম হয় না। তাই আমি প্রতিশোধের জন্ত তৃষিত। যে শিশুর মুখশ্রীতে তোমারই সৌন্দর্যের ছায়া প্রতি-বিস্তৃত, সেই শিশুর জন্য তোমার পরিতাপ কর্ত্তে হবে, ক্রন্দন কর্ত্তে হবে,—এই কথা মনে করে আমার যে কি দুখ হয়েছিল, তা যদি জানতে! সেই শিশুটির উপর আমার যে একেবারেই ভালবাসা ছিল না, তা নয়। কিন্তু তবুও তার জন্ত কতকগুলি কষ্টের সৃষ্টি কর্ত্তে আমার কেমন একটা দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। মন্দের সম্মাস্রতে প্রথমে তার ক্রটি জন্মিয়ে দিলেম, কিন্তু তাকে কিছুতেই ব্রতের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর্ত্তে দিলেম না। কেন না, সে যখন আবার সংসারে ফিরে যাবে—ফিরে গিয়ে যখন তার নিজের পদ-মর্যাদা জানতে পারবে, তার পিতৃহস্তাকে জানতে পারবে, তখন সে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাবে। তাকে যে কষ্ট দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে কেবল তোমারই শরীরের অংশ মনে করে; তোমারই মুখশ্রী তাতে দেখতে পেতেম বলে’ ”

এই কথা বলিয়া বাবা-জাঁ তার হাত ধরিয়া সবেগে একটা ঝাঁকানি দিল। সম্মাসিনী জাঁর কথা শুনিয়া ‘এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটি কথাও উচ্চারণ

করিতে পারিল না। বাবা জাঁ আবার আরম্ভ করিলেন :—“তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তুমি যখন সম্মাসিনীর অবগুষ্ঠন গ্রহণ করিলে, একজন আগন্তুক একটা চীৎকার করে’ উঠে’ সেই অমুষ্ঠানের ব্যাঘাত করে’

.....“তুমি বোধ হয় দেখেছিলে, সেই আগন্তুকের সঙ্গে একটা শিশু ছিল; সেই শিশুই তোমার পুত্র। আর, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, কতকটা তার উপর দিয়েই আমার প্রতিশোধতৃষ্ণার নিবৃত্তি করেছি। তোমাকে পাবার জন্যই আমি চৌর্য্যবৃত্তি করেছি—গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করেছি; আর তোমার ঘৃণার প্রতিশোধ নেবার জন্তই আমি পাষণ্ড-হৃদয় হয়েছি—নিষ্ঠুর পিষাচ হয়েছি।”

পুনরাগত সম্মাসী যুবকটি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল; বাবা-জাঁ সহসা তাহার হাত ধরিয়া সম্মাসিনীর চক্ষের সম্মুখে তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এই কথা বলিল :—“এর হাতের এই ক্ষতচিহ্নটি একবার দেখ...তুমি অবশ্যই চিন্তে পারবে। কেন না, এই চিহ্নটি যে তোমাকে দেখাচ্ছে, সে আর কেউ না, সে স্বয়ং জন্ টম্‌সন্।”

দুইটি নাম একগুণে সেই স্মরণ-গহবরে প্রতিধ্বনিত হইল—হাঁরি, জন্-টম্‌সন্! ক্যাথেরাইন্‌ নিজ মনের আবেগ দমন করিবার জন্ত একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দুর্বল কণ্ঠস্বরে সে বলিয়া উঠিল :—“জন্-টম্‌সন্!” তুই শিশুর পিতাকে হত্যা করেছিস, তুই শিশুর জননীকে অবমানিত করেছিস, আর ত্রিশ বৎসরেরও অধিক আমার বাছাটিকে কষ্ট দিয়েছিস...তোমার

সর্বনাশ হোক !—তোর সর্বনাশ হোক !—
তোর সর্বনাশ হোক !”

এই কথা বলিয়া, সন্ন্যাসিনী হাঁরির উপর ঝাঁপাইয়া-পড়িয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেখে,—হাঁরি এদিকে মুহূর্তের মধ্যে নিজ পরিচ্ছদের বন্ধনরজ্জু নিঃশব্দে কোমর হইতে খুলিয়া বাবা-জাঁর গলায় জড়াইয়া সবেগে ও সজোরে টান দিতেছে ! একটু পরেই সে ক্ষান্ত হইল । হতভাগ্য জাঁর মৃতদেহ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল ।

কাথেরাইন্ নতজাহু হটয়া তার পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল ; তার হৃদয়দেশ বিষম বেগে স্পন্দিত হইতেছিল । হাঁরি মাতাকে হাত ধরিয়া ভূমি হুটতে উঠাইল ; মাতা পুত্রের মুখচূষন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; শুধু এই কয়েকটি কথা কোনও প্রকারে বলিতে সমর্থ হইল :—“বিদায়, বাচ্চাটি আমার ।” এই কথা বলিয়াই তার প্রাণব্যয় দেহ হইতে বহির্গত হইল । হাঁরি আবেগ-

ভরে মৃত মাতার গলা জড়াইয়া-ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

সেই হত্যাকারী জন্-টমসনের নিদারুণ কথাগুলি কি কুক্ষণেই ফলিয়া গেল । সে বলিয়াছিল :—“আর তুই তোর পুত্রকে দেখতে পাবি নে, যদি আবার কখন দেখা হয়, তখন তার মুখচূষন করতে তুই কিছুতেই পারবি নে ।”

তাহার পরদিন, সন্ন্যাসিনীদিগের সেই কবর-স্থানে, একটি সদোর্দ্যোগিত সমাধি-স্তম্ভের উপর এই স্মৃতিলিপিটি খোদিত হইল :—

এইখানে কবরস্থ

ভগিনী মারী-থেরেস্ সন্ন্যাসিনী—

বয়ঃক্রম ৫৫বৎসর জুইয়াস

এবং

সন্ন্যাসজীবনের কাল. ৩১বৎসর

৮দিন । •

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন বিবরণ ।

বঙ্গদেশে বরেন্দ্রভূমি অতি প্রাচীন স্থান । এই স্থানকে মহাজি হিমালয়ের পাদদেশে সংস্থাপিত বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । হিমালয়সামুদ্র কোচরাজ্যই উত্তরসীমা, পূর্বসীমা করতোয়া-নদী, দক্ষিণে পদ্মা-নদী, পশ্চিমসীমা গঙ্গা ও মিথিলারাজ্য । ফেরিস্তা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র-

নদ ও পশ্চিমসীমা মহানন্দা-নদী, এইরূপ নির্দেশ আছে । কিন্তু অতি প্রাচীনকালে পূর্বসীমায় করতোয়া-নদী থাকাই সম্ভবত বোধ হয় । কারণ করতোয়ার পূর্বভাগ তাদূশ প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয় না ।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নামগুলি প্রাচীন সময় হইতেই যেরূপ বিস্তৃতভাবে

ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, বরেন্দ্র-নাম তাদৃশ বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গোড় প্রভৃতি নাম পুরাণ ও তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও হুস্ম নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পিত্রাদেশে ইঁহারা যে যে স্থানে রাজত্ববিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামানুসারেই সেই সকল স্থানের নামকরণ হয়। উক্ত পুণ্ড্রনামক ভূপাল বরেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব স্থাপন করায় এই দেশের নাম পৌণ্ড্রদেশ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বরেন্দ্রশূর * ও প্রহ্লাদশূর দুই ভ্রাতা। বরেন্দ্রশূর এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই বরেন্দ্রশূর ভূপালের নাম হইতেই এদেশের নাম বরেন্দ্র-ভূমি হইয়াছে। প্রহ্লাদশূরের নির্মিত মন্দির বরেন্দ্রভূমিতে থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

বরেন্দ্রশূর-নৃপতি-কর্তৃক এদেশ “বরেন্দ্র”-

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, “বরেন্দ্র”-নাম-করণ বহু প্রাচীন নহে।

সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনারেল কানিংহাম-সাহেব বলেন যে, তারানাথের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিলে পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি গোপালের পুত্র দেবপালকর্তৃক বরেন্দ্রভূমি অধিকৃত হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু তখনও পালবংশীয় ভূপালগণ বরেন্দ্র-ভূমির রাজা বলিয়া পরিচিত হন নাই। প্রকৃতপক্ষেও, বৌদ্ধ নরপালগণ পৌণ্ড্র-বর্ধনের রাজা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তজ্জন্মই উক্ত জেনারেল মহোদয় অনুমান করেন যে, “বরেন্দ্র”নাম বারভূঞা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। †

সুপ্রসিদ্ধ জেনারেল মহোদয়ের বারভূঞা-সম্বন্ধ একটি প্রবাদ আছে। জেলা বগুড়ার নিকটবর্তী মহাখান-গড়ের নিকট পৌষ-নারায়ণদেবের স্থানের উক্ত ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম হয়। একদা

* বরেন্দ্রকলাচাৰ্য্য গ্রন্থে লিপিত আছে—

প্রহ্লাদশূর বরেন্দ্রশূর দ্বৌ স্তৌ নিভুজত চ।

প্রহ্লাদা যোগমাগে চ বরেন্দ্রা রাজাশাসনে।

ইঁহাদিগের মতে আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরশূর। ধরশূরের পুত্র প্রহ্লাদশূর ও বরেন্দ্রশূর। তাঁহাঁর পর অহুশূর। তৎপুত্র বিজয়সেন ও বল্লালসেন।

† As for the name of the Barendra the people have no derivation of the kind. * * The old name of the county was certainly Paundrades. * * * The name of the Barendra may be connected to the establishment of the twelve chiefships of “Bara Bhuihars.” * * * That the common tradition of the county is that twelve persons of very high distinction and mostly named Pal, came from the west and settled at “Mahastan. মহাখান জেলা বগুড়ার নিকটবর্তী এবং করতোয়া-তীরে অবস্থিত।

The first notice of Barendra that I have been able to find is in Tarnatha's accounts of Pal Kings. To Gopal the first king he assigns the conquest of Behar and Magadha and to his son Deva Pala, the subjugation of Barendra and Orrissa. * * * The name is never mentioned in any of the inscriptions, the kings being only called the Lord of Gauda and Paundrades. This omission, is, I think rather favourable to my suggestion of its abeing a popular name from the Barabhuir chiefs.

দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় রাজা ওই যোগে স্থান করিতে আইসেন। কিন্তু পথিমধ্যেই যোগের সময় অতিবাহিত হইয়া যায় বলিয়া, তাঁহারা উহার পুনরারম্ভকাল পর্যন্ত করতোয়ার * নিকটবর্তী স্থানসমূহে বাস করেন। প্রতি দ্বাদশবর্ষের পর এই পোষনারায়ণীযোগ উপস্থিত হয়। পদ্মপুরাণ ও ভূতীতে এই যোগের নানাবিধ বর্ণিত আছে।

উক্ত জনপ্রবাদের দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় নরপালের বসতিতেই নামকরণ হইলে এষ্ট প্রদেশের নাম বরেন্দ্র না হইয়া বরেন্দ্র হইতেন্তে। বরেন্দ্রবংশের পালবংশীয় নরেশ্বরগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রবাদ সত্য হইলে উক্ত দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় নরপতি বৌদ্ধ নহেন। কেন না, তাঁহারা পোষনারায়ণীযোগে স্থানান্তরিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নরপালগণের রাজবংশে হিন্দুধর্মাবলম্বী নরপালবর্গ বিতাড়িত হইবার পরপক্ষে স্থানবংশীয় গোড় ভূপাল, চন্দ্রবংশীয় পোণ্ড্র ও কাঞ্চোজবংশীয় নৃপালগণের রাজত্ব কল্পিত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল কারণে ঐ জনপ্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

ঐক্যপক্ষেও বরেন্দ্রনাম সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় অধিকতররূপে প্রচলিত হয়, এইরূপ অসম্ভব করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বলালসেন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্ত এষ্ট পণ্ড্র নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, এইজন্ত ইহার 'বরেন্দ্র' এই

নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু এই অসম্ভব ও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

এই প্রদেশের প্রাচীন স্থানসমূহের মূর্তিকা "বরীণ" নামে অভিহিত হয়। বরীণ শব্দ ভূমির শ্রেষ্ঠতা ও বর্ণবিশেষ প্রতিপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাকালে এই প্রদেশের ভূমিতে উৎকৃষ্ট রেশমের উপকরণ তুঁত এবং ধাতু, যব, গোধূম ও ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। এই রেশমের জন্য চীন প্রভৃতি নানা জাতি এ দেশে আগমন করিত। সুতরাং ভূমির শ্রেষ্ঠতাবোধক বরীণ হইতে এই প্রদেশ বরেন্দ্র-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই নির্দেশ করা সম্ভব।

পুনেই কথিত হইয়াছে যে, একদা পোণ্ড্র নামক ভূপাল এ প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন বলিয়া ইহার নাম পোণ্ড্র হইয়াছিল। পদ্মপুরাণের উত্তরপোণ্ড্রীয় স্ততসনকসংবাদে লিখিত হইয়াছে—

"নন্দ্রঃ হ্রতঃ শুক্লঃ সল্যচারবিধায়কঃ।

পোণ্ড্রকোটিশযাদীপে মহাপুণ্যতি বিখ্যতঃ॥"

উত্তরকালে এই পোণ্ড্রপণ্ড ও শিলাদ্বীপের পাশ্ববর্তী স্থানসমূহ বরেন্দ্রনামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে করতোয়াতটস্থ যে স্থানকে পোষনারায়ণীযোগের একমাত্র পবিত্র স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বগুড়া-জেলার নিকটবর্তী "মহাস্থান" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

পুরাকালে ক্ষত্রিয়বংশজ রাজা মাক্ষাতার দৌহিত্র গোড়নানদেয় এক মহাবলপরাক্রান্ত

* ইয়গোয়ীর বিবাহকালে করতল হইতে পতিত ভোর। স্মার্তগণ শ্রাবণমাসে নদীদিককে রজস্বলা বলেন। "অপার্কো কর্কটে দেবী ত্রাহং গঙ্গা রজস্বলা। সর্বা রজস্বলা নদাঃ করতোয়াস্ববাহিনী ॥"

ভূপাল এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গোড়নগর সংস্থাপন করেন। তৎপুত্র একদা এদেশ গোড়রাজ্য নামে কথিত হইত। সুবিখ্যাত গ্রীক টলেমীর কথিত Gangia regea নামক মহাজনপদ ও গোড়নগর একই স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইলে, খৃষ্টের ৭৩০ বৎসর পূর্বে গোড়নামক মহাজনপদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়ংসং গোড়নগরের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন হইয়া কামরূপ যাত্রা করেন। সম্ভবত তৎকালে গোড়নগর শ্রীহীন, সম্পন্ন হইয়া পৌণ্ড্রবর্ধন নামে প্রসিদ্ধ ও প্রধান জনপদে পরিণত হইয়াছিল। পরিব্রাজকের

বর্ণনানুসারে রাজমহলের পূর্বদিকে ১০০শত মাইল দূরে পৌণ্ড্রবর্ধন। সুতরাং উহা বরেন্দ্রভূমিরই মধ্যগত এবং বরেন্দ্রখণ্ড এক এক সময়ে এক এক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্তমান প্রস্তাবে বরেন্দ্রভূমির কতিপয় প্রাচীন বৃত্তান্তের বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে যে সকল কীর্তি-কলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্বের প্রাধান্তের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার ।

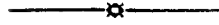
প্রয়াণ ।

চাহিয়ঃ ও মুখপানে দুখনিশি-অবসানে
উষ্ণিয়াছি জাগি'
অদয়ের তঙ্গীরাজি ঝড়ারে উঠেছে বাকি'
দরশন লাগি' ।
নূতন আনন্দলোক ডুবিয়েছে সব শোক
তব প্রেমমাঝে,
দূরে ভূমি ঐবতারা হেথা আমি লক্ষ্যহারা ।
ছিহু মিছাকাজে ।
অন্ধকারে চির দীন এ হৃদয় অর্থহীন ।
ছিল একাকার ।
আজি মিতি তব দেখা প্রথম আলোকরেখা
সুটল তাহার ।

ওই মুখে চাহি' চাহি' দীর্ঘ এ জীবন বাহি'
করিব ভ্রমণ ।
বাড়িবে গৌরবদীপ্তি বিশ্বহৃদে চিরতৃপ্তি
করি বিতরণ ।
দিব প্রেম স্বার্থহীন দীর্ঘাঘ্রহেব হবে লীন
চির-অন্ধকারে !
সহস্র কিরণ দিয়া সযতনে মুছাইয়া
দিব অশ্রুধারে ।
প্রীতির কুসুমরাজি নবীন আলোকে সাজি'
কুটিয়া উঠিবে ।
মধ্যাহ্ন-তপন-সম এ আলো সকল তম
দূর করি দিবে ।

তার পরে দিনশেষে বিদায় মাগিব হেসে
দিগন্তের মাঝে ।
আপন ছয়ার খুলি গেহ মোরে লবে তুলি
অভিনব সাঁঝে ।
হে সুন্দরি ! তুমি আসি বিদায়ের তাঁরে হাসি'
দিবে না কি দেখা ?
তোমার প্রেমের তরে চির অমুরাগভরে
ঘুরিতেছি একা ।
সারাহের মূছ ঘোরে বিদায় লইতে মোরে
হবে কি বিফল ?
বিশ্ময়িয়া হেন প্রীতি তব উদাসীন স্মৃতি
রবে অচঞ্চল ?
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

নৌকাডুবি ।



১

রমেশ এবার বি.-এ. এবং আইন পরীক্ষা একসঙ্গেই দিয়াছিল। সে যে পাস্ হইবে, সে-সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ ছিল না। পরীক্ষায় পাস্ হয় নাই, রমেশের জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল্ দিয়া আসিগাছেন—ফলার্শিপ্ও কখনো ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ী যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিত্তা শীঘ্র বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার কল বাহির হইলেই সে বাড়ী যাইবে। শিশুকাল হইতে মাতৃহীন রমেশ পিতার আদেশের উপর কখনো বিরক্তি করে নাই—এবারকার পত্রটা তাহার পক্ষে অভূতপূর্ব।

যাই হোক্, রমেশ তাহার পিতাকে চিনিত। সে মনে মনে বসিয়াছিল, তাহাকে শীঘ্রই বাড়ী যাইতে হইবে।

অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের লহাধ্যায়ী। পাশের বাড়ীতেই সে থাকে। অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার কঁজা হেমলিনী এবার এফ্.-এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদাবাবুর

বাড়ী চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত। যোগেন্দ্রের সহিত বন্ধুত্বই যদি এই যাতায়াতের একমাত্র কারণ হইত, তবে পিতার পত্রের উত্তর না দিয়া রমেশ বাড়ী যাইতে বিধা করিত না।

রমেশ ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে যাইত, কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গেও দেখা হইয়া পড়িত—সেজন্যহলে যোগেন্দ্র কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলেও রমেশ অত্যন্ত হতাশ হইত না।

ফোনলিনী স্থানের পর ঢল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত। রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জন ছাদে চিল-কোঠার একপাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে একপ স্থান অসুকুল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠকদের বুদ্ধিতে বিলম্ব হইবে না যে, বাঘাতও যথেষ্ট ছিল।

এপর্যন্ত বিবাহসম্বন্ধে কোন পক্ষ হইতে কোন প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক্ হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ্য আছে। বিলাত যাইবার পূর্বে হেমলিনীর দিকে ছেলোট একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাইয়াছিল, সেটুকু শেষপর্যন্ত টিকিবে কি না, সে সন্দেহ ছিল। এইজন্য অন্নদাবাবু রমেশকে হাতছাড়া করিতে পারেন নাই। রঙের

কাগজ ছুধানিই অন্নদাবাবু হাতে রাখিয়া-
ছিলেন, কোন্টিতে হাতের-পাঁচ রক্ষা হইবে,
খেলা শেষের দিকে আসিবার পূর্বে তাহা
ঠিক বুঝা যাইতেছে না ।

রমেশ বুঝিয়াছিল, স্পষ্টকথা না হইলেও
সে যেন পণে আবদ্ধ । সাহিত্য পড়িয়া
তাহার যতটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহাতে
সে বুঝিয়াছিল, হেমলিনী তাহার প্রতি বিমুখ
নহে । কবি বলেন, শ্রুত রাগিণীর চেয়ে
অশ্রুত রাগিণী মিষ্টতর—হেমলিনীর সম্বন্ধে
রমেশের সেই রাগিণীরই চর্চা বেশি
করিয়া হইতেছিল । উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার
চেয়ে অল্পচারিত প্রতিজ্ঞার বাঁধন লোক-
বিশেষের কাছে দৃঢ়তর—রমেশ সেই ধাতুর
লোক ।

দেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক
উঠিয়াছিল । অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস্
করিতে পারে নাই । কিন্তু তাই বলিয়া সে
বোঁরার চা-পানের এবং অত্যন্ত শ্রেণীর তৃষা
পাস্-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা
নহে । স্বতরাং হেমলিনীর চায়ের টেবিলে
তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত । সে
তর্ক তুলিয়াছিল যে, মেয়েদের পাস্-করাটা
বিড়ম্বনা । মেয়েদের পক্ষে লজিক্ মুখস্থ
করা বুঝা—কারণ, স্বভাবে বাহা নাই, শিখিয়া
তাহা হয় না, অন্ধের পক্ষে আলোক অনা-
বশ্যক । মেয়েরা হাজার পাস্ করুক, তবু
একজন অল্প-পাস্-করা পুরুষ তাহাদিগকে
সকল বিষয়েই নির্ভর দিতে পারে । কারণ
পুরুষের বুদ্ধি ধড়োয়ার মত, শান বেশি না
দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে
পারে ; মেয়েদের বুদ্ধি কলমকাটা ছুরির মত,

যতই ধার দাও না কেন, তাহাতে কোন বৃহৎ
কাজ চলে না—ইত্যাদি । হেমলিনী
অক্ষয়ের এই প্রগল্ভতা নীরবে উপেক্ষা
করিতে প্রস্তুত ছিল । কিন্তু জীবুদ্ধিকে খাট
করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি
আনয়ন করিল । তখন রমেশকে আর
ঠেকাইয়া রাখা গেল না । সে উত্তেজিত
হইয়া উঠিয়া জীজাতির স্তবগান করিতে
আরম্ভ করিল । সে এই কথা বলিল যে,
একসময় পৃথিবীতে ম্যাষ্টডন, ডাইনোসরাস্
প্রভৃতি বিপুলদেহ জন্তর প্রাচুর্য্য ছিল,
এখন কোমলকায় স্তম্ভনায়ু মানুষের রাজত্ব ।
তেমনি সভ্যতার যত উন্নতি হইবে, ততই
পুরুষের প্রভাব বর্ধি হইয়া জীজাতির প্রভাবই
বাড়িতে থাকিবে । জীলোককে ছোট মনে
করা তাহার মতে বর্বরতার লক্ষণ । মানুষের
সভ্যতা ক্রমশই নারীপূজার দিকে অগ্রসর
হইতেছে ।

এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছৃ-
সিত উৎসাহে অন্তর্দিনের চেয়ে হৃ-পেয়ালা চা
বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন-সময় বেহারা
তাহার হাতে একটুকরা চিঠি দিল । বহির্ভাগে
তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা ।
চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ
শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল । শব্দে—জিজ্ঞাসা
করিল, “ব্যাপারটা কি ?” রমেশ কহিল, “বাবা
দেশ হইতে আসিয়াছেন ।” হেমলিনী
যোগেন্দ্রকে কহিল, “দাদা, রমেশবাবুর
বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আন না কেন,
এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে ।”

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আজ থাক,
আমি যাই ।”

রমেশ জানিত, তাহার পিতার চা খাইবার অভ্যাস নাই, অকারণে অভ্যাস করিবার কোন উত্তেজনাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

অক্ষয় মনে মনে খুসি হইয়া বলিয়া লইল, “এখানে খাইতে তাঁহার হয় ত আপত্তি হইতে পারে।”

রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, “কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।”

রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিশেষ কোন কাজ আছে কি?”

ব্রজমোহন কহিলেন, “এমন-কিছু গুরুতর নহে।”

তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্ত রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌতুহল নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যিক বোধ করিলেন না।

ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। ‘শ্রীচরণকমলেশু’ পর্য্যন্ত লিখিষ্ঠা লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, “আমি হেমনলিনী-সদ্বন্ধে থৈ সন্তোষ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোন-মতেই উচিত হইবে না।” অনেকগুলি চিঠি অনেককরম করিয়া লিখিল—সমস্তই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ীর ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীর দিকে তাঁকাইয়া নিশাচরের

মত সবেগে পাখচাষি করিতে লাগিল। পুরাকালে যেমন কুন্নিগীহরণ, স্তম্ভদ্রাহরণ ঘটয়াছিল, এখন যদি তেমনি কোন বীরাজনা-বিশেষ সবলে রমেশহরণ করিত—যদি এই নিশীথে ছাদের উপরে এই চলচিত্ত যুবকটির হাত ধরিয়া কোন মৃণালবাছ তাহাকে পুষ্পক-রথে টানিয়া তুলিত এবং এই তারাঞ্চলিত অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাহাকে হঠাৎ একটা বিবাহসভার মাঝখানে লইয়া উপস্থিত করিত, তবে সে-আপত্তিমাত্র করিত না এবং তাহার চশ্মার মধ্য হইতে একবিন্দু অশ্রু কাহারো জন্ত বিগলিত হইত না।

পুষ্পকরথ আসিল না—প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল—রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল—রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে-বাড়ীর কক্ষে কক্ষে স্তম্ভভীর স্তম্ভুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পরদিন ভোয়ের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহনবাবুর সতর্কতায় গাড়ি কেল করিবার কোনই সুযোগ উপস্থিত হইল না।

২

বাড়ী গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতী করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভাল ছিল না—ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান

যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশু কন্তাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্তাটি আজ বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারি সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভাল নয়। ব্রজমোহন কহিলেন, “ও-সকল কথা আমি ভাল বুঝি না—মানুষ ত ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভাল দেখার বিচারটাই সর্ব্বাগ্রে তুলিতে হইবে! মেয়েটির মা যেমন সতী-সাম্বী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য, বলিয়া জ্ঞান করে!”

শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিকৃতিলাভের নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সঙ্কোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, “বাবা, এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য।”

ব্রজমোহনবাবু মনে মনে আগুন হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “তোমাকে সেজ্ঞা কিছুই ভাবিতে হইবে না, আমি সর্ব্ববিষয়েই সুসাধ্য করিয়া দিব—সে ভার আমার উপরে রহিল।”

রমেশ। আমি অল্পস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।

ব্রজমোহন। বল কি! একেবারে পাণ-পত্র হইয়া গেছে?

রমেশ। না, ঠিক পাণপত্র নয়, তবে—

ব্রজমোহন। কতাপেক্ষের সঙ্গে কথাকর্ত্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?

রমেশ। না, কথাকর্ত্তা যাহাকে বলে, তাহা হয় নাই—

ব্রজমোহন। হয় নাই ত! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর ক’টা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে!

রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, “আর কোন কন্তাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অত্যাশ হইবে।”

ব্রজমোহন কহিলেন, “না করা তোমার পক্ষে আরো বেশি অত্যাশ হইতে পারে। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে দৈব ক’ কি করিব! ত্যায়-অত্যায়ে বিচারভারও আমার উপরেই থাক, তুমি অধিক চিন্তা করিয়ো না।”

রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, “ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে।” রমেশের কোষ্ঠী-পত্রে বিশ্বাস ছিল। সে গ্রামের একজন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিল, “বিবাহস্থানটা কিরূপ দেখিতেছে?” সে কহিল, “যথেষ্ট ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে।”

রমেশ কহিল, “বিবাহ যদি না ঘটে, তোমাকে পুরস্কার দিব।”

দৈবজ্ঞ কহিল, “না হইবারই গতিক বটে।”

এইটুকুতেই রমেশ অত্যন্ত সান্বিতা অনুভব করিল। তাহার কর্ত্তব্য দৈব সম্মত করিয়া দিবেন, ইহা সে চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করিল এবং বিবাহের আয়োজনসম্বন্ধে কোন কথাটি কহিল না।

রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে একবৎসর অকাল ছিল—সে ভাবিয়াছিল, কোনক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার একবৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।

কস্তুর বাড়ী নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে—নিতান্ত কাছে নহে—ছোট-বড় ছোটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিনচারদিন লাগিবার কথা। ব্রজমোহন দৈবর জন্ত বৎসে পথ ছাড়িয়া দিয়া একসপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

যাত্রার পূর্বে রমেশ দৈবজ্ঞকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কই ঠাকুর, তোমার গণনা ফলিল কই?”

দৈবজ্ঞ করিল—“শুভকর্মে বাধা না পড়ুক—কিন্তু বাধা পড়িবার সময় এখনো অনেক আছে। কেবল ‘শতঞ্চ গৃহমাগতঃ’ নহে, বধুর সখকেও সেই কথা।”

রমেশ ইহাতেও আরাম পাইল। নৌকা যখন পাল ফুলাইয়া ছুটিল, রমেশ মনে মনে বলিতে লাগিল—“গ্রহ পালের নৌকার আগে-আগে ছুটিতে পারে।”

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত পথ কোথাও কোন বিঘ্ন হয় নাই—বরাবর বাতাস অমূল ছিল। সিমুলবাটায় পৌঁছিতে, পুরা তিনদিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো চারদিনেরি আছে।

ব্রজমোহনবাবুর ছ’চারদিন আগে আসি-বাগ্নই, ইচ্ছা ছিল। সিমুলবাটায় তাঁহার বেহান্দীন অবস্থার থাকেন। ব্রজমোহন-বাবুর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, ইহার বাসস্থান তাঁহাদের স্বগ্রামে উঠাইয়া লইয়া ইহাকে

স্বখে-স্বচ্ছন্দে রাখেন ও বহুদণ শোধ করেন। কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকিতে হঠাৎ সে প্রস্তাব করা সম্ভব মনে করেন নাই। এবারে বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁহার বেহান্দিকে তিনি বাস উঠাইয়া লইতে রাজি করাইয়াছেন। সংসারে বেহানের একটিমাত্র কস্তা,—তাহার কাছে থাকিয়া মাতৃহীন জামাতার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, “যে যাহা বলে বলুক, যেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকিবে, সেখানেই আমার স্থান।”

বিবাহের কিছুদিন আগে আসিয়া ব্রজমোহনবাবু তাঁহার বেহানের ঘরকন্না তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করাই তাঁহার ইচ্ছা। এইজন্ত তিনি বাড়ী হইতে আত্মীয় স্ত্রীলোক কয়েকজনকে সঙ্গেই আনিরাহিলেন।

এইরূপ বন্দোবস্তই সমস্ত হইল। যতই একে একে দিন কাটিতে লাগিল, গ্রহনক্ষত্রের প্রতি রমেশের বিশ্বাস ততই শিথিল হইয়া আসিল। আকাশে এতগুলো জ্যোতিষ্ক কি প্রয়োজন ছিল, যদি তাহারা রমেশের এই অতি সামান্য কাজটুকুর সখকেও লিখিত সত্য ভঙ্গ করিল? আকাশের ঐ অবিখ্যাসী আলোক-গুলার চেয়ে যদি ধূলিবিহারী নির্জের পা-ছটোর উপর সে বেশি আস্থা স্থাপন করিতে পারিত, তবে একদোড়ে কোন্‌কালে বিবাহের লগ্ন পার হইয়া যাইত। তবু এখনো সময় আছে। যুগযুগান্তর যে সকল গ্রহতারা জাগিয়া থাকে, তাহাদের কোন তাক্কা নাই—তাহারা একমুহূর্তে, এমন কি, শেষ মুহূর্তেও ললাটের

লিখনকে সফল করিতে পারে। এই ভাবিয়া রমেশ নৌকার ছাদে বসিয়া চশমা আঁটিয়া বই পড়িতে লাগিল। পাড়ার কুতূহলী নারীগণ কলসকক্ষে ঘোমটার ভিতর দিয়া রমেশকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইত—তাহাতে সে জ্ঞান্বেপমাত্র করিত না। কোন অবগুষ্ঠিত দৃষ্টির সহিত তাহার চশমাবৃত চক্ষুর সংঘাত ঘটে নাই। ধোঁটার বাঁধা গোঁর যেমন অদূরে সরস-শ্রামল মটর-কলাইয়ের ক্ষেত থাকা সঙ্গেও শুকনো খড় চিবাঁইয়া রোমন্থন করিতে থাকে, তেমনি রমেশ তাহার সমস্ত কোতূহলকে কেবল ছাপা-বহির গুরুপত্রেরই অপরূপ করিয়া রাখিয়াছিল, তীরবর্তী কলালাপপরায়ণ নারীসম্প্রদায়ের দিকে তাহাকে বিক্ৰিষ্ট হইতে দেয় নাই। এইরূপে রমেশ আপন খুঁটির প্রতি সম্মানরক্ষা করিল। হেমনলিনীর চা-পান-মণ্ডপে স্থান পাইবার যোগ্যতা সে অতি যত্নে বাঁচাইয়া চলিয়াছিল!

৩

বিবাহের শুভলগ্নকে পৌছিয়া দিবার তার যে গ্রহের উপর ছিল, সে নিজের কর্তব্যে কোন ক্রটি করিল না। প্রাতঃকালে ঢোল-রত্ননটোঁকি বাজিয়া গ্রামের কাকগুলোকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। তাহারা চীৎকারশব্দে চিত্তাভার লব্ধ করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু একটি উচ্চশ্রেণীর স্থিগ্ন ছিল, বর্তমানক্ষেত্রে তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কা পক্ষীদের চেয়ে অনেক বেশি হইলেও আকাশময় শব্দ করিয়া বেড়াইবার অবারিত ক্ষমতা ও অসঙ্কুচিত অধিকার তাহার ছিল না। যদি সেই শক্তি থাকিত, তবে সে অল্প প্রত্যুষে অন্তগামী

গ্রহতারকাকে তারবরে ধিকার দিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিত।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রমেশের উদ্বাহবন্ধন। তাহার পূর্বে যথাস্থানে বিদায়পত্র লিখিয়ার জন্ত সে কাগজকলম লইয়া বসিল। কি লিখিবে, কেমন করিয়া লিখিবে! যে হৃদয় বন্ধনবাক্যের দ্বারা কখনো জড়িত হয় নাই, ভাষা যাহাকে আজ্ঞা স্পর্শ করে নাই, বাক্যের দ্বারা আজ তাহার গ্রন্থি খুলিবে কি উপায়ে? নীরব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে, বাক্যের পক্ষে সেখানে পদার্পণ স্পর্ধামাত্র। রমেশ লিখিল, “দেবি, অপরাধ করিতে চলিলাম! ক্ষমা প্রার্থনা করিবার এবং ক্ষমা আশা করিবার অধিকার আমার নাই। যে হৃৎকথার আজ হইতে বহন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি, দণ্ডব্রাতা বিধাতা তাহা অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ আমাকে দিতে পারেন না। তোমাকে যদি বেদনা দিয়া থাকি, চিরজীবনের বেদনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।” এ কথা শুনিয়া তোমার কোন স্মৃতি আছে কি না, জানি না—কিন্তু বলিয়া আমার তৃপ্তি হয় যে, হৃদয়ের যে অংশ তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছি, সেখানে কোনদিন আর কেহ পদার্পণ করিবে না।”

এই চিঠি রমেশ অনেক ক্রাটাকুটি করিয়া লিখিয়া বহুদূরে ভাল কাগজে নকল করিয়া খামে পুরিয়া হেমনলিনীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া গালা দিয়া মুড়িয়া একবার অনেক-ক্ষণ দক্ষিণহন্তে ধরিয়া রাখিল। তাহার পরে বাস্তব ভিতর রাখিয়া দিল। এ চিঠি রমেশ কখনো ডাকে দেয় নাই। ইহা হেমনলিনীর উদ্দেশে লিখিত মাত্র। জীবনটাকে রমেশ যে

বলি দিতেছে এবং হুঃখকে সে যে চিরসহচর করিয়া লইতেছে, ইহা অস্ত্র নিশ্চয় স্থির করিয়া কঠিন-ব্রত-মাহাত্ম্যে সে একটা সাধনা লাভ করিল।

সন্ধ্যাবেলায় রমেশকে চতুর্দোলার চড়িতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আলোকমালা চলিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, পথের দুই ধারে কুটীরদ্বারে উলঙ্গ ছেলে ও ঘোমটাবৃত বধূরা বাহির হইয়া আসিল, কুকুরগুলি অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তি জানাইয়া মুখ তুলিয়া ডাকিতে লাগিল,—রমেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাকে বিবাহ করিতে বাইতেছে, তাহাকে কোনকালে সে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করিবে না।

বিবাহকালে রমেশ ঠিকমত মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাতোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ করিল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রকৃতবে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। স্বপ্নরপল্লীর প্রগল্ভা প্রোচাগণ বরের এইরূপ নির্বাক নিরীহতায় রাগ করিল, কিন্তু মুখচোরা ভালমাহুষ বলিয়া ক্রীসমাজে রমেশের একটা খ্যাতিও জন্মিল। সকলেই বলিল, “আমাদের স্ত্রীলা বরকে যেমন ইচ্ছা চালাইতে পারিবে।”

বিবাহ সম্পন্ন হইলে ফিরিবার উদ্দেশ্যে হইল। মেয়েরা এক নৌকার, বৃদ্ধেরা এক নৌকার, বর ও বরস্তগণ আর এক নৌকার যাত্রা করিল। অস্ত্র এক নৌকার রত্ননটোকির দল যখন-তখন যে-সে রাগিণী যেমন-তেমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিল। হুই তীরের ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের অনেক জায়গা হইতেই

বিচিত্র বেহুরের বাজ ঘন তরুপন্নব ভেদ করিয়া গ্রাম্য উৎসবের উৎসাহ জগতে ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিল। বর্ষব্যাপী অকালের পূর্বে সেবার বাংলার গ্রামে গ্রামে বিবাহব্যাপার অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল—বরযাত্রের হরস্ত্র বন্যার প্লাবনে এমন পল্লী ছিল না যে, আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

সমস্তদিন অসহ গরম। আকাশে মেঘ নাই, অথচ একটা বিবর্ণ আচ্ছাদনে চারিদিক ঢাকা পড়িয়াছে—তীরের তরুশ্রেণী পাণ্ডুবর্ণ। গাছের পাতা নড়িতেছে না। দাঁড়িমাঝিরা গলদঘর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমিবার পূর্বেই মাঝারা কহিল, “কর্তা, নৌকা এইবার ঘাটে বাধি—সম্মুখে অনেকদূর আর নৌকা রাখিবার জায়গা নাই।” ব্রজমোহনবাবু পথে বিলম্ব করিতে চান না। তিনি কহিলেন, “এখানে বাধিলে চলিবে না। আজ প্রথম-রাত্র জ্যোৎস্না আছে, আজ বালুহাটার পৌছিয়া নৌকা বাধিব। তোরা বক্শিস পাইবি।”

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। একদিকে চর ধুঁ করিতেছে, আর একদিকে ভাঙা উচ্চপাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্কুর মত অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন-সময় সেই দৈবজ্ঞকথিত দুর্ভাগ্যের হঠাৎ হুঁস হইল, তাহার কান্ধে মূলতবি পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি কোনমতে কর্তব্য সারিয়া লইবার জন্য সে তাহার একটা ক্রান্তগারী দূত পাঠাইল! আকাশে মেঘ নাই কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে

দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ সম্ভারজনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ড-বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ‘রাথ রাথ, সামাল সামাল, হায় হায়’ করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল পরে কি হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণী হাওয়া একটি সঙ্গীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত-বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কি করিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। পার্শ্বত্যানদীপথে অকস্মাৎ জলপ্রাবনের স্থায় মুহূর্ত্তের বড় মুহূর্ত্তের মধ্যে—অন্তর্ধান করিল—কিন্তু তাহার সেই পথ-টুকুতে পূর্ব্বের সহিত পরের আর কোন সাদৃশ্য রহিল না।

৪

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্খল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মত আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে-স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রমেশ দেখিল, সে বালির কুটে পড়িয়া আছে। বড়ের বেগ তাহাকে এক পলকের আঘাতে মৃত্যুর মধ্যে ফেলিয়া আবার অবলীলাক্রমে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কি ঘটয়াছিল, তাহা মনে করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় গেল—তাহার পরে ধীরে ধীরে চঃস্থলের মত সমস্ত ঘটনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতা ও অশ্রান্ত আত্মীয়গণের কি

দশা হইল, সন্ধান করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারো কোন চিহ্ন নাই। বালুতটের তীর বাহিয়া সে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল।

পদ্মার হই শাখাবাহর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উল্লস শিশুর মত উর্জ্জ্বল শয়ান রহিয়াছে। রমেশ যখন একটি শাখার তীর-প্রান্ত ঘুরিয়া অশ্রু শাখার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন কিছুদূরে একটা লাল কাপড়ের মত দেখা গেল। ক্রমপদে কাছে গিয়া রমেশ দেখিল, লাল-চেলী-পর্য্য নববধূটি প্রাণহীন-ভাবে পড়িয়া আছে।

জলময় মুমূর্ষুর শ্বাসক্রিয়া কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, রমেশ তাহা জানিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া রমেশ বালিকার বাহুহুটি একবার তাহার শিরের দিকে প্রসারিত করিয়া পরক্ষণেই তাহার গেষ্টের উপরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বধুর নিশ্বাস বহিল এবং সে চক্ষু মেলিল।

রমেশ তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকাকে কোন প্রশ্ন করিবে, সেটুকু শ্বাসও যেন তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

বালিকা তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে নাই। একবার চোখ মেলিয়া তখন তাহার চোখের পাতা মুদ্রিয়া আসিল। রমেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার শ্বাসক্রিয়ার আর কোন ব্যাঘাত নাই। তখন এই জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবনমৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

কালিদাস প্রথম বয়সে মূৰ্খ ছিলেন, পশ্চাৎবয়সে অসামান্য কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই জানা কথা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পণ্ডিতের এবং মূৰ্খের আছি'র মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলিবার আছে; তাহা এই :—

কালিদাস যখন মূৰ্খ ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, তাঁহার নাম “কালি” এই এক-কথায় পরিসমাপ্ত। তাহার পরে যখন তিনি আপনার নামাক্ষর বানান করিতে শিখিতেছেন, তখন তিনি সেই এক কথার জায়গায় দুই কথা দেখিতেছেন;—দেখিতেছেন (১) কএ আকার কা, (২) লএ ইকার লি। আরো কিছুদিন পরে যখন তাঁহার প্রথম পাঠ সাক্ষ হইল, তখন তিনি দুই কথার জায়গায় তিন কথা দেখিলেন;—দেখিলেন (১) কএ আকার কা + (২) লএ ইকার লি = (৩) কালি।

তৃতীয় বয়সের তিন কথা আর-কিছু না—দ্বিতীয় বয়সের দুই কথার সহিত প্রথম বয়সের এক কথার যোগ-বন্ধন;—কা এবং লি এই দুই কথার সহিত “কালি” এই এক কথার যোগ-বন্ধন। এই গেল উপমা—উপমের হ'চ্ছে এই :—

• সহজ জ্ঞান “আছি” এই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত। মনোবিজ্ঞান এই এক কথার পর্দার আড়ালে দুই কথা দেখিতে পান; দেখিতে পান—আছি এবং আছে

এই দুই যমক সহোদর পিঠোপিঠি জোড়া লাগানো। তার সাক্ষী—আমাকে দেখিয়া কেহ যদি বলে “এ ব্যক্তি আছে”, তবে সে ব্যক্তি যাহাকে বলিতেছে “আছে”, তাহাকেই আমি বলিতেছি “আছি”। তা ছাড়া—আমার আপনার নিকটেও আমার শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে; আমি সেই আছে'র সহিত জড়িত-ভাবে আছি—এরূপ জড়িতভাবে যে, আমার শরীর-মন প্রভৃতি যত-কিছু পদার্থ আমার সাক্ষাতে আছে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই যদি আমার জ্ঞান হইতে সরিয়া পালায়, তবে আছিও সেই সঙ্গে সরিয়া পালায়;—যেমন অসুস্থিকালে। এইজন্য বলিতেছি যে, সহজ জ্ঞান যেখানে দেখেন শুধুই কেবল আছি, মনোবিজ্ঞান সেখানে দেখেন আছে-আছি একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞান আবার মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাও হৃদয়দর্শী। মনোবিজ্ঞান আছে'র একপিটেই কেবল আছি দেখিতে পান; তত্ত্বজ্ঞান আছে'র এ-পিট ও-পিট দুই পিঠেই আছি দেখিতে পান। তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরের কথা কিরূপ—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিজে প্রণিধান করা হোক :—

তত্ত্বজ্ঞানের একটি অন্তরের কথা।

তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলি যে, “ইনি আছেন”—আমার ভাষায় আমি বলি “ইনি আছেন।” তোমার ভাষায় তুমি “ইনি আছেন” বলা না—তুমি বলা “আমি আছি।” একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া আমার ভাষায় আমি বলিতেছি “ইনি আছেন”, তোমার ভাষায় তুমি বলিতেছ

“আমি আছি।” হুই কথার ভাবার্থ একই। ভাবার্থ একই বটে—কিন্তু তজ্জাচ তোমার ভাষায় তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, এইটিই মূল কথা; আর, আমার ভাষায় আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা সেই মূলের অনুবাদ। ওটাকেই বা মূল বলি কেন—এটাকেই বা অনুবাদ বলি কেন? কেন যে বলি, তাহার কারণ দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কারণ আর-কিছু না—তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, এটা তোমার হওয়া-কথা; আর, আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা শুধু আমার দেখা কথা। তত্ত্বজ্ঞান বলেন যে, দেখা-কথার মূল যদি হওয়া-কথা না থাকে, তবে দেখা-কথা শুধুকেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই বলিতে হয় যে, তুমি যে বলিতেছ “আমি আছি”, সেইটিই মূল কথা; আর, আমি যে বলিতেছি “ইনি আছেন”, এটা তাহারই অনুবাদ। তুমি হয় তো বলিবে যে, দেয়াল তো বলে না “আমি আছি”—তুমিই বলিতেছ “দেয়াল আছে”, —“দেয়াল আছে” ইহার ভিতরে দেখা-কথা ছাড়া হওয়া-কথা কোন্‌খানটায়? ইহার উত্তর এই যে, তুমি যখন বলিতেছ যে, দেয়াল আছে, তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার দেখা-কথার ও-পিটে দেয়ালের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে—যদিচ দেয়াল তাহা মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না। দেয়াল যদি মনুষ্যের ভাষায় কথা কহিতে জানিত—তাহা হইলে দেয়াল নিশ্চয়ই বলিত “আমি আছি।”

দেয়াল নিতান্তই পর-দেশের লোক;—দেয়াল তোমার দেশের ভাষায় কথা কহিতে জানে না; তাই সে মুখে বলিতে পারে না যে, “আমি আছি।” তুমি দেয়ালের উকিল। দেয়াল আপনার অন্তরের কথা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম—তাই তুমি দেয়ালের হইয়া এইরূপ ওকালতি করিতেছ যে, দেয়াল আছে; ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, “আমি আছি” এটা দেয়ালের অন্তরের কথা; যদিচ দেয়াল সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে জানেও না—বলিতে চাহেও না। দেয়ালকে মারো-ধরো—দেয়ালের তাহা গায়ে লাগে না; কাজেই “আমি আছি” এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্ত তাহার মাথাব্যথা হয় না; প্রকাশ করিয়া না বলুক—ঠারেঠারে বলিতে ছাড়ে না; এমন কি—দেয়াল তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে “আমি আছি”; দেয়ালের অঙ্গুলি হ’চ্ছে খেতাংশু-প্রতিক্ষেপণী শক্তি; সেই তাহার অব্যর্থ শক্তি তোমার চক্ষের ভিতরে ঢালাইয়া দেয়াল মুখে না বলুক—কাজে বলিতেছে “আমি আছি।”

তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই যে, তুমি দেয়ালই হও, আর মনুষ্যই হও—তাহাতে আইসে যায় না;—যাহাই তুমি হও না কেন—তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি যদি বলি যে, “ইনি আছেন”, তবে সেই “ইনি আছেন” কথাটির দুই পারেরই “আমি আছি” বিরাজমান। এপারের “আমি আছি” আমার অন্তরের কথা—ওপারের “আমি আছি” তোমার অন্তরের কথা; আর

তোমার। সেই অন্তরের কথাটিকে আমি আমার ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতেছি যে, “ইনি আছেন” অথবা “এটা আছে।”

আছি’র সহিত আছি’র ঐক্য যে কাহাকে বলে, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল। দেখিতে পাওয়া গেল যে,

প্রথমত, দেখা-কথা’র দুই পারেরই হওয়া-কথা থাকা চাই। এপারে দ্রষ্টার, অর্থাৎ আমার, আমি আছি থাকা চাই—ওপারে লক্ষ্য বস্তুর, অর্থাৎ তোমার, আমি আছি থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, দেখা কথা’র এপারের হওয়া-কথা’র সহিত ওপারের হওয়া-কথা’র ঐক্য থাকা চাই।

তৃতীয়ত, এপারের হওয়া-কথার সহিত ওপারের হওয়া-কথার সেই যে ঐক্য, তাহারই নান আছি’র সহিত আছি’র ঐক্য।

আছি’র সহিত আছি’র ঐক্যের

স্থূল দৃষ্টান্ত।

“আমি তোমাকে দেখিতেছি” এই যে একটি দেখিতেছি-ব্যাপার, এই দেখিতেছি’র এপারে আমি বলিতেছি “আমি আছি”, ওপারে তুমি বলিতেছ “আমি আছি।” “আমি তোমাকে দেখিতেছি” এ কথাটি একটি বই কথা নহে, অথচ সেই একটিমাত্র কথা’র দুই পারের দুই আছি বিরাজমান।

দুইটি কথা দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা এই যে, দেখিতেছি’র এপারে ঠাড়াইয়া আমি যে বলিতেছি “আমি আছি”, তাহার অর্থ এই যে, দেখিতেছি = দেখিতে + আছি অর্থাৎ দেখিতেছি-রকমে আছি।

তবেই হইতেছে যে, দেখিতেছি আছি’রই রকমভেদ বা প্রকারভেদ। রূপকের ভাষায়—দেখিতেছি আছি’রই তরঙ্গ-ভঙ্গ। দার্শনিক ভাষায়—দেখিতেছি একপ্রকার পরিবর্তনশীল গুণ; সেই পরিবর্তনশীল গুণের অপরিবর্তনীয় আধার-বস্তু থাকা চাই; সে আধার-বস্তু কে? না, আছি। কেন না, গোড়ায় আছি না থাকিলে, ব্যবহারক্ষেত্রে দেখিতেছি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, “আমি তোমাকে দেখিতেছি” বলিলেই বুঝায় যে, তুমি আমার চক্ষুরজ্বিরের উপরে কার্য্য করিতেছ, তাই আমি তোমাকে দেখিতেছি। সে কার্য্যের কারণ আমি নহি—সে কার্য্যের কারণ তুমি। ফলে, দেখিতেছি-ব্যাপারটি এপারের আছি’র একপ্রকার গুণপরিবর্তন;—“পূর্বে দেখিতে-ছিলাম না—এক্ষণে দেখিতেছি” এইরূপ একটা গুণপরিবর্তন; এই গুণপরিবর্তনের উপরে ওপারের আছি’র কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে স্পষ্ট।

এই দুইটি কথা পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি এই যে, “আমি তোমাকে দেখিতেছি” এই কথাটির সঙ্গে দুই পারের দুই আছি’র সম্বন্ধ রহিয়াছে। এপারের আছি’র সম্বন্ধ বাহ্য রহিয়াছে, তাহা বস্তুগুণের সম্বন্ধ; ওপারের আছি’র সম্বন্ধ বাহ্য রহিয়াছে, তাহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ। বস্তু-গুণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে এপারের আছিতে অবতরণ করি; কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে ওপারের আছিতে আরোহণ করি। দুই পারের দুই

আছি'র ঐক্যের নামই আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য ।

প্রকৃত কথা এই যে, সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য অবশ্যসত্তাবী । আমি যদি বলি যে, “তোমার সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই”, তবে তাহার অর্থই এই যে, তোমাতে আমাতে ঐক্য নাই । পুত্র একসময়ে মাতার শরীরেরই অঙ্গের সামিল ছিল—তাই মাতার সহিত পুত্রের একরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । মনুষ্যমাত্রই জগতের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্ত মনুষ্যে মনুষ্যে একরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । সম্বন্ধের মূলে ঐক্যই যদি নাই—তবে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিবে কিসের উপরে ? শূন্যের উপরে ? না, বালির বাধের উপরে ? অতএব এটা স্থির যে, সম্বন্ধ-মাত্রেরই মূলে ঐক্য রহিয়াছে । এমন কি, তেলে-জলের সম্বন্ধের মধ্যেও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় । একটা কাচ-পাত্রে যদি তেল আর জল একাধারে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ের সন্ধিস্থানে উভয়ের ঐক্য একরূপ স্পষ্ট আকার ধারণ করে যে, সে স্থানের চক্রাকৃতি রেখটিকে তৈল-রেখা বলিব কি জল-রেখা বলিব, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না । ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, আছি'র সহিত দেখিতেছি'রও ঐক্য রহিয়াছে ; আছি'র সহিত আছি'রও ঐক্য রহিয়াছে । আছি'র সহিত দেখিতেছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় বস্তুগুণের সম্বন্ধ-স্থানে ; আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-স্থানে ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, হুই পারের হুই আছি'র ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই

পূর্বপ্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে সাঁটে-সোঁটে বলা হইয়াছিল—“আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যই স্বাধীনতার ভিত্তিমূল ।”

অতঃপর, আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের সঙ্গে স্বাধীনতার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্ ।

মনে কর, দেবদত্ত-নামক একজন বলবান্ যুবা পুরুষ কয়েক-ভরি সোণার গহনা বোঁচকায় বাধিয়া লইয়া একাকী পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছেন । হুই গ্রামের মধ্যে ১৫ক্রোশের ব্যবধান । প্রত্যুষে যখন তিনি রওনা হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, তিনি গন্তব্যপথ এক-নিম্বাসে গ্রাস করিয়া ফেলিবেন । তিনি ভাবিলেন “একঘণ্টার মধ্যেই আমি ১৫ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পার হইব—কাহার সাধ্য আমার গতিরোধ করে—আমি স্বাধীন !” একরূপ যে তাঁহার মনে হইল, তাহা হইবারই কথা ; কেন না, একটি-আধটি নহে—তিন-চারিটি—মাথালো-গোচের কারণ একঘোটা হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে একরূপ একটা মহোত্তম-শালি-স্বাধীনতা-বোধের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে ।

প্রথম কারণ হ'ছে স্তম্ভ শরীরের বল-ক্ষুণ্ণি ।

দ্বিতীয় কারণ হ'ছে নিঃশব্দ মনের আনন্দ-ক্ষুণ্ণি ।

তৃতীয় কারণ হ'ছে গম্যস্থানে বাইবার জন্ত আগ্রহের আতিশয্য ।

চতুর্থ কারণ হ'ছে—কর্তব্য-কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়া-গতিকে অন্তরাঙ্গার (conscience) এর প্রসন্নতা ।

দেবদত্ত স্বাধীনতায় ভর করিয়া দশ-ক্রোশ পথ অকাতরে অতিবাহন করিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাঁহার স্বাধীনতা মন্দা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কায়-ক্লেশে তিনি আর ছই-ক্রোশ পথ কথঞ্চিৎ প্রকারে অতিবাহন করিলেন; কিন্তু এখনো তিন-ক্রোশ গন্তব্যপথ তাঁহার সম্মুখে দিগন্তর-হইতে দিগন্তরে প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহার পদদ্বয় বেবোরে পড়িয়া—নিতান্ত না চলিলে নয় তাই চলিতেছে। যে স্বাধীনতা বোধের নূতন ক্ষুণ্ণির সময় ১৫ক্রোশ পথ দেবদত্তের চক্ষে এক-ক্রোশের বেশ ধারণ করিয়াছিল, সেই স্বাধীনতা-বোধের এখন অন্ত-গমনের কাল উপস্থিত; এখন তাই এক-ক্রোশ পথ তাঁহার চক্ষে শত-ক্রোশ বা ততোধিক। দেবদত্ত এখন মনে করিতেছেন যে, “আমার স্বাধীনতায় কাজ নাই—মাঠের মধ্যে কোথাও যদি একটা বটগাছের আড়াল পাই, তবে তাহার সুস্বাদু ছায়ায় মুহূর্ত্তকের জন্ত হতিপা ছড়াইয়া বাঁচি।” পূর্বে দেবদত্তকে দেবদত্তের মন তিন-সত্য করিয়া বলিয়াছিল “তুমি স্বাধীন”; এখন অমান-বদনে বলিতেছে “তুমি পরাধীন।” মনের ছই কথাই কিছু আর সত্য হইতে পারে না; হয় এটা সত্য—নয় ওটা সত্য। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের তখনকার সেই যে স্বাধীনতা-বোধ এবং এখনকার এই যে পরাধীনতা-বোধ—ছইই তাঁহার ছই বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ছইপ্রকার মনের ভাব, তা বই আর-কিছুই নহে। তাহার পরে মনে কর, অন্ত-নিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার স্বাধীনতাবোধ অন্তর্মিত হইল, তখন তিনি সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ

দেখিয়া তাহার তলে বোঁচকা হেলান দিয়া বসিলেন—বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতেছেন, ইতিমধ্যে জনৈক অপরিচিত পথিক তাঁহার ছই-হাত অন্তরে সেই বটবৃক্ষের আর-এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল।

দেবদত্তের মনোমধ্যে ছইটি কথা কাঁধ ধরাধরি করিয়া উপস্থিত হইল। একটি কথা এই যে, বোঁচকার ভিতরে চারি-পাঁচ-ভরি স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে; আর-একটি কথা এই যে, পার্শ্বের লোকটির মুখের আকার-প্রকার ভাল নহে; তা ছাড়া, তাহার হাতের লাঠির আয়তনের পরিমাণ কিছু যেন মাত্রাতীত। দেবদত্ত যে, স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবেন—সে শক্তি তাঁহার নাই; তাহাতে আবার, নিদ্রার আকর্ষণে তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। কিন্তু “নিদ্রাকে কোনোমতেই আসিতে দেওয়া হইবে না” এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাঁহার মনের ভাব এই যে, “কি জানি! হাতের যষ্টির সহিত মুখের চেহারার অমন যখন মিল, তখন “বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ!” কিন্তু নিদ্রাকুহকিনীকে তিনি কত ঠেকাইয়া রাখিবেন! যেই একটু ফাঁক পাইতেছে—অমনি নিদ্রা চুপিচুপি আসিয়া চক্ষুর কপাটে কুলুপ আঁটিয়া মস্তকের ভার বোঁচকার দিকে ঢুলাইয়া দিতেছে; মস্তক বটবৃক্ষের গারে ঠোকর খাইয়া সচকিতভাবে স্বস্থানে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে; আর তৎক্ষণাৎ দেবদত্তের তদ্রূপ ভাঙিয়া যাওয়াতে দেবদত্ত বোঁচকাটিকে আপনায় আয়ত্তের মধ্যে সরাইয়া আনিয়া স্রাবধান করিয়া রাখিতেছেন। নিদ্রা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে—নিদ্রা অপ্রতিহত উত্তমের সহিত

আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিতেছে । এমন-সময় দেবদত্তের একজন পুরাতন বন্ধু সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি দেবদত্তকে দেখিয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন । দেবদত্ত সেখানে গিয়া চির-পরিচিত বন্ধুবর্গের মাঝখানে স্বাধীনতার স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন—মনের স্মৃতি ঘুমাইয়া বাঁটিলেন । দেবদত্তের যাত্রারম্ভ হইতে বন্ধুত্ববনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাধীনতা-বোধের পথের সমাচার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই :—

যাত্রাকালে দেবদত্ত আপন শরীরে বলের ক্ষুণ্ণি এবং মনে আনন্দের ক্ষুণ্ণি প্রচুর-পরিমাণে অনুভব করিয়াছিলেন । ক্ষুণ্ণিই অনুভব করিয়াছিলেন—ক্ষুণ্ণির বাধা অনুভব করেন নাই । তিনি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, আমার এ ক্ষুণ্ণি বাহিরের কোনো-কিছুর বশতাপন্ন নহে—ইহারই নাম স্বাধীনতা-বোধ । দেবদত্তের এই প্রথম উদ্ভবের স্বাধীনতা-বোধের প্রধান কারণ—শরীরের স্বাস্থ্য । শরীর যদি কোনো অংশে অসুস্থ হয়, তবে যে অংশে তাহা অসুস্থ, সেই অংশে তাহা দেহী ব্যক্তির পর । পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে দেহী ব্যক্তির আপনার তো বটেই—তা ছাড়া তাহা একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি । শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, শরীর আছে এবং আমি আছি, এ দুয়ের ভিন্নতা-বোধ থাকে না । সুস্থ শরীরে দেহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি বলিয়া—সুস্থ শরীরের পরিধির মধ্যে দেহী ব্যক্তি একপ্রকার সহজ স্বাধীনতা অনুভব করে । এই যে সহজ স্বাধীনতা,

ইহার মধ্যে আছি'র সহিত আছি'র একা কৌন্থানটায়, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এইরূপে :—

দেহী ব্যক্তি দেহ-বোধের এপারে থাকিয়া বলিতেছে যে, আমি আছি এবং আমার দেহ আছে । দেহী ব্যক্তি যে বলিতেছে “আমি আছি”, এইটিই দেহী ব্যক্তির হওয়া-কথা ; পক্ষান্তরে—“দেহ আছে”, এটা দেহী ব্যক্তির দেখা-কথা ; দেহী ব্যক্তির এই দেখা-কথা ব্যতীত—দেহের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে । কেন না, দেহ একপ্রকার অশাস্ত্রিক ভাষায় বলিতেছে যে, আমি আছি ; আর দেহী শাস্ত্রিক ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া বলিতেছে যে, দেহ আছে । এখন বক্তব্য এই যে, একদিকে অশাস্ত্রিক ভাষায় দেহ বলিতেছে আমি আছি, এবং আর-একদিকে শাস্ত্রিক ভাষায় দেহী বলিতেছে আমি আছি ; এই যে দুই দিকের দুই আছি—সুস্থ-শরীরে এই দুই আছি এক আছি'রই সামিল হইয়া দাঁড়ায় ; কাজেই—এ-আছি ও-আছি-কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় না ; আর, বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া দেহী ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুভব করে । এইরূপে দেহ-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম ভূতাত্মা) এবং দেহি-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম বিজ্ঞানাত্মা) এই দুই আত্মা যখন একাত্ম হইয়া যায়, তখন সেই একাত্মতাব হইতে একপ্রকার অব্যবহিত ক্ষুণ্ণি জন্মগ্রহণ করে ; আর, দেহ-দেহীর সেই যে একাত্মতাব, তাহাই এখানে দেহের এপিটের আছি'র

সহিত ও-পিটের আছি'র ঐক্য বলিয়া নির্দেশিত হইতেছে।

প্রথম উত্তমে দেবদত্ত শরীরকে যতটা আপনার মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে দেখিলেন—শরীর ততটা আপনার নহে। পরিশেষে যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পদ-দ্বয় তাঁহার কথার অবাধ্য হইয়া—তিনি যত বলিতেছেন “চলো”, সে ছই ব্রাতা ততই বলিতেছে “চলিতে পারি না”, তখন তাঁহার স্বাধীনতাবোধের বন্ধ একেবারেই দমিয়া গেল। তাহার পরে যখন তিনি বটবৃক্ষ-ভলে নিবদ্ধ হইয়া বাহিরের লাঠিয়াল এবং অন্তরের নিদ্রা ছয়ের কাহাকে সামলাইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন কত যে তিনি পরাধীন, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল। তাহার পরে তিনি যখন বন্ধু-ভাবে সুবিশুদ্ধ-চিত্তে মনের কপাট খুলিয়া স্মৃতি শয়ন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার চারিদিকের লোকেরা সকলেই তাঁহার আপনার লোক—কেহই তাঁহার পর নহে। তা ছাড়া—ধনঞ্জয়-নামক গৃহকর্তা তাঁহার পরম বন্ধু—একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি। এই সকল ক্রমবর্তনে—পথের মাঝখানে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন সেই যে তাঁহার আদরের ধন স্বাধীনতা, এক্ষণে তাহা তিনি শুধুমাত্র ফিরিয়া পাইলেন। এক্ষণে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। বন্ধুপ্রাপ্তির এ-পারে দেবদত্তের আমি আছি এবং ওপারে ধনঞ্জয়ের আমি আছি, এই দুই আছি একীভূত হইয়া দেবদত্তের অন্তঃকরণে স্বাধীনতার কপাট

উন্মুক্ত করিয়া দিল। দেবদত্ত যাত্রাকালে যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার গোড়া'র কথা দেহের আছি'র সহিত দেহীর আছি'র ঐক্য; এক্ষণে বন্ধু-ভাবে তিনি যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিতেছেন, তাহার গোড়া'র কথা বন্ধুবর্গের আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য। কিন্তু এ দুইপ্রকার প্রাচীরের ঘের-দেওয়া স্বাধীনতা ব্যতীত আর-একপ্রকার স্বাধীনতা আছে—যাহার পদবী অতীব উচ্চ; এত উচ্চ যে, বর্তমান কালের সভ্যতার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে তাহাকে নাগাল পাওয়া সূক্ষ্মকর। সেটি হ'চ্ছে পারমাণবিক স্বাধীনতা—যাহার আর-এক নাম মুক্তি। দেহ যেমন দেহীর আপনার, গেহ যেমন গেহীর আপনার, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি ভগবদন্তঃ সাধু পুরুষের আপনার। পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনরা যেমন গৃহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি, পরমাত্মা তেমনি ভক্ত জীবাত্মার দ্বিতীয় আপনি। জীবাত্মা সূত্র ব্রহ্মাণ্ডের আছি, পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আছি—এই দুই আছি'র ঐক্যের ভিত্তরে সমস্ত আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য সম্বন্ধ রহিয়াছে; আর, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাধীনতা-বোধ সেই ঐক্যের অক্ষুট আভাস। এই অক্ষুট স্বাধীনতার ভাব, যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে-ভিতরে কার্য্য করিতেছে, তাহাই লৌকিক ধর্মের ভিত্তিমূল; আর, তাহা যখন ভগবদন্তঃ সাধু ব্যক্তির মনো-মধ্যে সুপরিষ্কৃত আকার ধারণ করে, তখন তাহাই পারমাণবিক ধর্মের ভিত্তিমূল এবং মুক্তির সোপান। লৌকিক ধর্ম বলিতেছি

কাহাকে? যে-ধর্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার উর্কে ওঠে না, তাহারই নাম লৌকিক ধর্ম। পারমার্থিক ধর্ম বলিতেছিঁ কাহাকে? যে-ধর্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিয়া নিকাম-ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ হয়, তাহারই নাম পারমার্থিক ধর্ম। লৌকিক ধর্মের গোড়া'র কথা হ'চ্ছে মল্লব্যের স্বভাব-সিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস; এক কথায়—ঈশ্বর-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান। পারমার্থিক ধর্মের গোড়া'র কথা হ'চ্ছে—ঈশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জানা; এক কথায়—পরম-প্রীতিভক্তি-সহকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ধর্মতত্ত্ব প্রায়শই ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়া থাকে, আর, সেই গতিকে ধর্মতত্ত্ব এরূপ

একটা গোড়া-নাই-আগা-রকমের ধরিজে ছুঁতে-পাওয়া-নাই-বাইবার কথা হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহা 'ন দেবার ন ধর্ম্য' অর্থাৎ কাহারো কোনো উপকারে আসে না। আমাদের দেশে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রে ভগবদভক্তি এবং ধর্মনীতির (piety এবং morality) হয়-গৌরীর স্তায় যুগলাভাবে অমূল্যলিত হওনের প্রথা চির-প্রচলিত। বারান্তরে আমি দেখাইব যে, আমাদের দেশে ধর্মতত্ত্ব প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) সাকাম ধর্মতত্ত্ব এবং (২) নিকাম ধর্মতত্ত্ব; আর সেই সঙ্গে দেখাইব যে, সাকাম ধর্মের মূল স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞান; নিকাম ধর্মের মূল বিশিষ্ট-রূপ ঈশ্বর-ভক্তি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান।

শ্রীবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

রাজকথা।

এক ছিল রাজকথা। কই, তাহাকে ত আর দেখিতে পাই না। একখানি গল্পের বই লই—একি!—কেবলি যত সুরবালা, কমলমণি, ললিতা, নলিনী, নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র, মনো-মোহনের গল্প! কলিকালে কাংস্তপাত্রে ভোজন শাস্ত্রে লিখিত আছে—কলির শেষে কি অবশেষে এই সব সুরবালা-পুরবালা রাজকথার সিংহাসনও অধিকার করিয়া দিবে? সে রাজকথা কি পক্ষিরাজ বোড়ার ডিরা রাজপুত্রের সঙ্গে সাতসমুদ্র পার হইয়া

চিরদিনের জন্ত পলায়ন করিয়াছে? না, এই রেলগাড়ি-ষ্টীমার প্রভৃতির আক্রমণে সাতসমুদ্র সাতটি কুপমাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে—রাজকথাগণের গোপনভবনগুলির পাশ দিয়া ইলেকট্রিক ট্রাম চলিয়াছে এবং এই যে ললিতা-গলিতা প্রভৃতি নান্নিকাগণ, ইহা-দিগকেই এখন রাজকথা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? রাজকথাগণের ইতিহাস হঠাৎ কেন বন্ধ হইয়া গেল? আমি ত ঐজন্তে ইতিহাসের এক পৃষ্ঠাও পড়িতে পারি না—এবং নিশ্চয়

বলিতে পারি, তারাবচিত কৃষ্ণসন্ধ্যার মত
সুন্দরী কাক্সরাজকুমারী ক্রিয়োপেট্রার
কাহিনীসংবলিত রোমের ইতিহাস পাঠ্য না
থাকিলে আরি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের
পরীক্ষাবিশেষে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না ।

এক ছিল রাজকন্ডা । কবে ছিল কেউ
জ্ঞানে না, কিন্তু তাহার ইতিহাস ত লিপিতে
এবং শ্রুতিতে এতকাল চলিয়া আসিতেছিল !
“সাল-সরল-ব্যালোল-বল্লীলতাচ্ছন্ন” তপোবনে
রক্তাশোকতরুর মূলে বসিয়া বৃদ্ধ ঋষি শ্রুতি
শুনাইতেন—শিষ্যমণ্ডলীর বুক ধরধর
করিয়া কাঁপিয়া উঠিত—বৃদ্ধা দিদিমাও
কোমলতম বর্ণমিশ্রণের মধ্যে সন্ধ্যাকালে
ছাদে বসিয়া রাজকন্ডার শ্রুতি কীৰ্ত্তন
করিতেন, নাতি-মণ্ডলীর বুক কি করিয়া
উঠিত, এই প্রবন্ধই তাহার পরিচয়রূপে গণ্য
হোক ।

বাস্তবিক পুরাতন ইতিহাসবেত্তাদের
পরে বৃদ্ধা দিদিমাই রাজকন্ডার শ্রুতি ধারণ
করিয়া আসিতেছিলেন । তখন সমস্ত পায়া-
গুলি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের
পাথার ঘোর ঝটপটি এবং তুমুল বক্‌বকম্
শেষ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে যে যার আপন
থোপে বসিয়া গিয়াছে ;—দূরে সন্ধ্যার অন্ধ-
কার হইতেও ঘনতর শীতলরসে চক্ষুকে সিক্ত
করিয়া দেবদারুগাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে,
তাহাদের পশ্চাতে গীতপাণ্ডুরবর্ণের বর্ষা
ছাড়িয়া দিয়া ক্রতবেগে চাঁদ উঠিতেছে ;
পশ্চিমাকাশের সিন্দূরাতা ক্রমেই বৃদ্ধের চক্ষুর
মত অন্ধকারের মধ্যে ঘোলা হইয়া যাইতেছে ;
উপরে একটিমাত্র তারা ; আমার মাথার
মধ্যে দিদিমার একটি জ্বালাল শিথিলভাবে

চরিয়া বেড়াইতেছে—তখন দিদিমা আরম্ভ
করিলেন, এক ছিল রাজকন্ডা ।

দিদিমার সেই শ্রুতি মনে লইয়া ক্রমে
আমাদের রাজকবিগণের সঙ্গে পরিচয় হইয়া-
ছিল । দিদিমার এবং রাজকবিদের বর্ণনা-
গুলি মিলাইয়া দেখি, রাজকন্ডার কি মহিমা !
কত বিচিত্র নদনদী, কত রহস্যময় প্রাসাদ-
কক্ষ, কত অদ্ভুত মন্ত্রতন্ত্র, কত করুণা, কত
অহুন্নয়, কত দীর্ঘভ্রমণান্তে মিলন, কত পলা-
য়ন !—কত পুরাতন প্রাসাদের পশ্চাৎস্থিত
শুণ্ড অলিন্দে সহচরীসহিত রাজকন্ডা এই
সাক্ষ্যপাত্তের নেত্র হরণ করিয়াছিল,—হার,
প্রতীক্ষাপরা ধৈর্য্যশীলা রাজবালিকা,—তোমার
প্রাসাদবলভিকার কুলায়-প্রত্যাগত শুভ পায়া-
বতের মত, আমার হৃদয়ের সঙ্করুণ আশীর্বাদ-
গুলি সেই অনতিদূসর সন্ধ্যার মধ্য দিয়া, পত্র-
পুষ্পতরুর আড়াল দিয়া, শুভ পাথা উড়াইয়া
তোমার দেহবল্লরীর চারিদিকে গিয়া ভিড়
করিয়াছিল ।

কত মরুভূমির প্রান্ত ধরিয়া রাজ্যের অব-
সানসময়ে ধূতূরখেত তারাসন্ধ্যামের নিয় দিয়া
অসিলতার মত কৃশা সুন্দরী অসিলন্দধারী
তাতারকুমারের ঘোড়ার পাশাপাশি ষোড়া
ছুটাইয়া, দীর্ঘ গ্রীবা দীর্ঘতর করিয়া কালো
গর্জনের উপত্যাকাভিমুখে ধাইয়া চলিয়াছিল
—হার, পলায়নপরা উদ্ধাম সম্রাটমুতা,
আমার হৃদয়ের উৎসাহ বিদ্যাকীর্ণ ধারণ
করিয়া তোমার নেত্রবিদ্যুতের ধরধর পথে
নিঃশ্রুত হইয়া গিয়াছিল । বর্ষার মেঘ কাঁদিয়া
নিঃশেষ হইয়া গেল, উচ্চ প্রাসাদকক্ষে রাজ-
বালিকার অশ্রু শব্দ—হেমন্ত শীত-বসন্তের
অবসানেও সমান ঋণিতেছে । সহস্র ভক্ত পূজা

স্নান করিয়া, বর লইয়া, কল লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল—তবু এই বিজন শরৎরাত্রির অশ্রুস্রাত অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া সরোবর-তটে একাকিনী রাজকন্যা কুল তুলিতেছে ! তরলান্ধি, তুমি যখন সৈরিকীরবেশে এক রাজ-ভবন হইতে আর এক রাজভবনে ফিরিয়া তোমার হারান ধনের অন্বেষণ করিতেছিলে—মধ্যাহ্নে বিশ্রামতরায় রাজপুরী নীরব—তখন বাগানের বৃক্ষশাখার ভিতর হইতে আমিই শুকের মত রক্তচক্ষুটি বাহির করিয়া, বিশ্রু-ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তোমার অনিমেষ অশ্রু-কলুধিত চক্ষুহুটি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম । চপলান্ধি, তুমি যখন প্রগল্ভ বণিক্কুমারের বেশে নিউনের বন্দরে আপণ হইতে আপণান্তরে ফিরিয়া, মণিতরল করনখে মণিমুক্তার প্রতিবিম্ব ধরিয়া জ্বরৎ-কেনার ছলনা করিতেছিলে—তখন আমিই আপন দ্বারস্থিত উচ্ছ্রা-কিত রঞ্জিত গ্রীকমৃৎপাত্রোপরি—পার্শ্বে ভল্ল রাখিয়া অ্যাপোলো-প্রতিম গ্রীকযুবার দৃঢ়হৃদয় মূর্তিতে দাঁড়াইয়া তোমার বেগী-গোপন উকীষটিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলাম । আমি দেশে-বিদেশে রাজকন্যাগণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, আমি তাহাদের রহস্ত জানি । বাল্যকালে, যখন মুখের গঠন ভাল করিয়া ফুটে নাহি—ভাব তরল জলের মত সর্বদা ছলছল করিয়া বেড়াইত, তখন হইতে রাজ-কন্যার প্রতিবিম্ব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পড়িয়াছে । আমাদের ভাবোন্মোহিত যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা অমর—তাহা কোনদিন যাইবে না । রাজকন্যা সেইরূপ আমাদের একটি চিরদিনের জিনিষ । ব্যবধানই ইহার সৌন্দর্য্যের চারিদিকে ইচ্ছাকালের ঘের টানিয়া

দিয়াছে । রাজকন্যাগণ কোন-একটি দুর্ বাগানের মধ্যে প্রানাদের কক্ষে চিরকাল বাস করিতেছে ! জ্যোৎস্না এবং রৌদ্রে স্পর্শ-স্পর্শ ছায়া ফেলিয়া সে বাগানের চারিদিক যেমন বৃক্ষমালা, শুভ্রতা এবং মর্ম্মরে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তেমনি তাহাদের চতুর্দিকে আরও কত বেড়া ! রাজকন্যাকে ঘিরিয়া তাহার নিজ হৃদয়ের প্রণয়লজ্জার বেঠন, সখীমণ্ডলীর বেঠন, খোজা পাহারার বেঠন, পিতার আদেশের বেঠন, কুলমর্যাদার বেঠন ! পৃথিবীর বলবান রাজপুত্রগণের হৃদয়গুলির পক্ষে এই সব মধুর এবং কঠোর বেঠন ভেদ করিবার প্রলোভন কি হুঃসাহসোদ্দীপক ! অদৃষ্ট রাজকন্যার মোহে শতশত নদীপর্বত পিছে ফেলিয়া রাজপুত্র চলিয়া যায় ।—আবার একএকদিন সন্ধ্যাকালে নদীতীরে . ঘোড়া বাঁধিতেই, তারাবিশ্বখচিত নদীজল দেখিয়া রাজকন্যার চক্ষুহুটির কারুণ্য রাজপুত্রের হৃদয়ের মধ্যে গলিয়া আসে । তখনি আমরা হঠাৎ রাজকন্যাকে আর এক ভাবে দেখিতে পাই । দেখিতে পাই, রাজকন্যা একাকিনী । নানা বেঠনের মধ্যে উপগৃঢ় রাজকন্যা ব্যবধানের জন্য বাহিরের সকলের কাছে যেমন চিরবিশ্ময়কর এবং বলবান রাজপুত্রের কাছে যেমন হুঃসাহসোদ্দীপক, তেমনি আশ্রয়নার কাছে সেই ব্যবধানের জন্তই কি নিতান্ত করুণ নহে ? জানি, তাহার অলঙ্কার শিজিহ্নভাবে তাহার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবের স্ততি গাইয়া থাকে ; জানি, সখীগণ তাহার কানে, সর্বদাই মধুরালাপ বর্ষণ করিয়া থাকে ; বুঝি, তাহার নিভৃত মর্যাদাময় অবস্থানে তাহার সঙ্গোপ-সুখকে অব্যাহত করিয়া দেয়—তবু কি হঠাৎ

একদিন আয়ত্তির সন্ধ্যায় রাজকন্ডার বৃক্কের মধ্যে সন্ধ্যাতারা কুটিয়া উঠে না? মনে হয় না, এই ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য তাহাকে চিরকাল এক কাম্যলোকের মধ্যে নির্দ্বন্দ্বিত করিয়া রাখিবে? হঠাৎ রাজ্যের অন্ধকারে রাজার হস্ত্য এবং দরিদ্রের কুটীর এক সমান অস্পষ্টতায় মিলিয়া গেলে, মনে হয় না, ঐ ধরণীর পথ স্তম্ভর, উচ্চারি মধ্যে বাহির হইয়া পড়ি, ঐ পথে সহজেই হৃদয়বানের সন্ধান পাইব? কিন্তু থাক্—তাহাতে কাজ নাই। রাজবালিকার চিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইয়া স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হোঁক্। তুমি তোমার হৃৎকোষে বেটনার বালীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া বলদর্পিত রাজকুমারগণকে অদ্ভুত হুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত কর, এবং আমরা রাজপুত্র না হইয়াও তোমাদের কাহিনী পড়িয়া হুঃসাহসিকতা এবং প্রেমের জটিল ব্যুহমধ্যে আপনাদিগকে একবার ছুটাইয়া দি। রাজকন্ডা চিরকাল পরে

পরে তাহার স্তম্ভ এবং বেদনা লইয়া বাস করুক—প্রাসাদশিখর হইতে নামিয়া পৃথিবীর উপরে বাহির হইয়া না পড়ুক—সুরবালা এবং পুরবালাতে কাব্যজগৎটি পরিপূর্ণ হইয়া না ঘাউক। আমি সুরবালা-পুরবালাদের অধিকার সন্নিবেশিত করিতে চাই না, তাহাদের আমি অভক্তও নহি—কিন্তু সেই পুরাতন রাজকবিগণ এবং বৃদ্ধা দিদিমাদের আশ্রয় বর্ণনার আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী রাজকন্যা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে—হঠাৎ বাল্যসন্ধ্যার বর্ণপ্রবাহের অন্তরাললক্ষ্য তাহার ঐ সৌধচূড়া হইতে দৃষ্টি নামাইয়া, আধুনিক কাব্যজগতের দিকে চাহিলেই অনিবার্য্যে প্রশ্ন উঠে—এক যে ছিল রাজকন্যা? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই চতুরা সখীবর্গ! কোথায় গেল তাহাদের পিজরহু ক্ষুটবাক্ পাখী, কোথায় গেল সেই হুঃসাহসী অস্বারোহী রাজকুমার!—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সমাজ-জঙ্ঘ।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।
মূল্য ১০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

সমাজ-তত্ত্বের আলোচনাস্থলে সচরাচর আমরা ইউরোপীয়দিগের সঙ্কলিত তথ্য ও তর্ককৃতির প্রণালী অবলম্বন করিয়া—এমন কি, ইউরোপীয় সমাজপদ্ধতিকে উচ্চতম-আদর্শরূপে মানসনেত্রের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া—বিচার করি। ইহার ফল এই হয়

যে, আমরা সুবিচার করিতে পারি না। এক ত, একটা আদর্শ স্থির করিয়া লইলেই স্বাধীন বিচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়—সেই আদর্শের সহিত যাহা মিলে, তাহারই আমরা প্রশংসা করি; যাহা মিলে না, তাহারই নিন্দা করি—বিচার করিয়া করি না; গড়লিকা-বৃত্তির প্ররোচনাতেই করি। উদ্যতীত ইউরোপীয় সমাজপদ্ধতি আদৌ আদর্শস্থানীয় নহে।

বালাকাল হইতে ইংরেজিভাষার অল্প-শীলন করিয়া এবং ইউরোপীয়ভাবে শিক্ষিত হইয়া আমরা সেই ভাবে অভিতূত হইয়া পড়ি। সামাজিক রীতি, পদ্ধতি, ব্যবস্থা, অর্থনীতি, যাহা কিছু ইউরোপীয় তাহাই ভাল, আর যাহা কিছু স্বদেশীয় তাহাই মন্দ—ইংরেজদিগের সবই বিজ্ঞানানুসৃত এবং আমাদের সবই কুসংস্কারাজ্জ্বল—এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমরা প্রায় সকলেই কলেজ হইতে বাহির হই। ইহা যে নিত্য হৃৎকষের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বেকার অবস্থা, তাহাতে অনিবার্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহারা সোভাগ্যশালী, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া ভূয়োদর্শন, অধ্যয়ন ও চিন্তার দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই নেশার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাহারা বিধাতার বিধানে বিড়ম্বিত, তাঁহাদের নেশাটা চিরদিন থাকিয়া যায়। পরম আত্মাদের বিষয় যে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় এই নেশার ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন—তিনি ইংরেজি-সাহিত্যে ক্লান্তবিশ্রুত, অথচ তিন-দিনের বিলাসী সভ্যতার মোহে অভিতূত নহেন—তাই এমন একখানি স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ, উপদেশ পুস্তক আমাদের সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

সকল বিষয়ে সকলের সহিত মতের ঐক্য হইবে, এমন প্রত্যাশা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না, করিতে পারেন না। কোন বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষের মতামত নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই সংসারে সেই নানা-বিষয় সকলের পক্ষে একরূপ হয় না—সুতরাং মতের পার্থক্য ঘটিবেই। পূর্ণবাবুর মতের

সহিত যদি আমাদের মতের দুইএকস্থলে না মিলে, তাহাতে তাঁহার পুস্তকের উপদেশ-তার কিছুমাত্র লাঘব ঘটে না।

এই পুস্তকের প্রথমেই “সৃষ্টি-তত্ত্বের” আলোচনা। পূর্ণবাবু বলিতেছেন, শাস্ত্রানুসারেই বলিতেছেন—“সৃষ্টি ও প্রলয় ধারাবাহিকক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য নিয়ম। একবার সৃষ্টির প্রবাহ, আবার প্রলয়-প্রবাহ, আবার তা-ই। অনাদিকালই সংসারের এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ম প্রবাহরূপে নিত্য। অতএব জগৎসংসারের ধ্বংস কখনই নাই। তাহার অবস্থান্তর ঘটে মাত্র। কখন তাহার বিলীনাবস্থা, কখন বিকাশাবস্থা। বিকাশাবস্থাই সৃষ্টি ও স্থিতি, এবং বিলীনাবস্থাই প্রলয়।”

ইহর সহজ অর্থ এই যে, সচরাচর লোকে সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝে—অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি—তাহা কখন হয় নাই। মূল-প্রকৃতি অনাদি এবং অনন্ত—সৃষ্টি নহে। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে আমরা বিমত হইলাম, কেন না, তাহা করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-প্রণালী ও ধর্ম-মতের কথা আসিয়া পড়ে। তাহা শ্রীতিবিরুদ্ধ নহে, বর্তমান উপলক্ষে প্রয়োজনীয়ও নহে।

ইহার পর মনুষ্যোৎপত্তি ও সমাজসৃষ্টি, বর্ণভেদ ও যুগান্তর-পরিণাম, বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর-পরিণাম, ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ, কৌলীক, বালিক-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানা গুরুতর সামাজিক বিষয়ের আলোচনা আছে। এই আলোচনায় পূর্ণবাবু যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত এবং স্বাধীন ও গভীর

চিন্তার, পরিচায়ক। কিন্তু এই আলোচনার একটা গুরুতর অভাবও আছে। যে সকল যুক্তি তাঁহার মতের অমূলক, পূর্ণবাবু কেবল তাহারই অবতারণা করিয়াছেন; প্রতিকূল যে সকল যুক্তি আছে, তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই। সুতরাং এমন কথা যদি কেহ বলে যে, এই পুস্তকে বিচারকের লেখনী অপেক্ষা উকীলের জিহ্বা সমধিক জাজল্যমান, তাহা হইলে সে কথা আমাদের কাছে ঘাড় পাতিয়া নীরবে শুনিতে হইবে।

পূর্ণবাবু এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার “নিবেদনে” লিখিয়াছেন—“প্রাচীন হিন্দুসমাজ যে উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই আদর্শের প্রতি লোকলোচনের দৃষ্টি কিরান এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।” আমরা অগ্নানবদনে মূল্যকণ্ঠে বলিতে পারি যে, পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। যে কেহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নহে, যে কেহ অন্ধ নহে, যে কেহ অমানুষ নহে; সে-ই পূর্ণবাবুর এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর সমাজপ্রতিষ্ঠার আদর্শের উচ্চতা উপলব্ধি করিবে। কিন্তু “সমাজ-তত্ত্ব”-বিষয়ক গ্রন্থের পক্ষে ইহাই মাত্র প্রমাণ করিলে যথেষ্ট হয় না। যে সমাজ এমন উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার এমন অধঃপতন ঘটিল

কেন, এ বিষয়েরও বিচার হওয়া আবশ্যিক। আচার, বিনয়, বিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সঙ্গ্রহের ভিত্তির উপরই ত আমাদের কোলীজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তবে আমাদের কুলীনেরা শেষে নর-প্রোত হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? অবশ্যই আমাদের কোলীজ-পদ্ধতিতে, পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় বা আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু ছিল, যাহার জন্ত আমাদের এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছিল। এই সকল কথা না বুঝিলে, কেবল আদর্শের উচ্চতা বুঝিয়া আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই; কেন না, যদিই কোন দেবতা প্রসন্ন হইয়া সেই উচ্চাদর্শে আবার আমাদের পৌছাইয়া দেন, তাহা হইলেও আবার যে আমাদের সেইরূপ অধঃপতন ঘটিবে না, তাহা কেমন করিয়া জানিব।

মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার কোন সঙ্গ্রহেরই যথাযথ পরিচয় হইতে পারে না; এই গ্রন্থেরও হইল না। ভাল গ্রন্থের যথার্থ ও সম্যক পরিচয়, কেবল সেই গ্রন্থ। যাহাদের সাধ্য আছে, তাহারা এক এক খণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া ইহার পরিচয় লয়ন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। তাহাতে সময় ও অর্থ, উভয়েরই সব্যবহার হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৫

সকালবেলায় জেলেডিঙির শাদা-শাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহারই একটিকে ডাকাডাকি করিয়া লইয়া জেলেদের সাহায্যে একখানি বড় পান্সি ভাড়া করিল এবং নিরুদ্দেশে আত্মীয়দের সন্ধানের জন্ত পুলিস নিযুক্ত করিয়া বধুকে লইয়া গৃহে রওনা হইল।

গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁছিতেই রমেশ খবর পাইল যে, তাহার পিতার, শান্তুড়ির ও আর কয়েকটি আত্মীয় বন্ধুর মৃত-দেহ নদী হইতে পুলিস উদ্ধার করিয়াছে। জনকয়েক মাল্লা ছাড়া আর যে কেহ বাঁচিয়াছে, এমন আশা আর কাহারো রহিল না।

বাড়ীতে রমেশের বৃদ্ধ ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি বধুসহ রমেশকে ফিরিতে দেখিয়া উচ্চকলরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার যে সকল বয়যাত্রী গিয়াছিল, তাহাদেরও ঘরে ঘরে কান্না পড়িয়া গেল। এইরূপ প্রবল শোকের ঝড়তুফানের মধ্যে বধুটি যেন একখানি নুতন-তৈরি ছোট নৌকার মত ভয়ে, হুঃখে, সঙ্কোচে আপনার প্রথম অপরিচিত সংসারযাত্রা

আরম্ভ করিল। পাঁখ বাজিল না, হলুধ্বনি হইল না, কেহ তাহাকে বরণ করিয়া লইল না, কেহ তাহার দিকে তাকাইল না মাত্র।

রমেশ মৃত আত্মীয়দের সংকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, তাহাদের বাড়ীতে যে ছইচারিজন প্রাচীন আত্মীয়া অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা বধুকে সকল অকল্যাণের কারণ স্থির করিয়া তাহার প্রতি একেবারে বিমুখ হইয়াছেন। তাঁহাদের তারস্বরে বিলাপোক্তির মধ্যে দুর্লক্ষণা বধুর প্রতি আক্রোশ যথেষ্ট ছিল। ইহাতে আত্মীয়-শোকের মধ্যেও রমেশ তাহার এই হতভাগিনী স্ত্রীর জন্ত বিশেষ করিয়া বেদনা বোধ করিল। এই স্বজনপরিত্যক্ত বালিকাটির সামান্য সুখস্বচ্ছন্দ্যের প্রতিও কাহারো দৃষ্টি ছিল না। সে যে কি খাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে, কোথায় বসিবে, বধু তাহাও জানে না। মৃত্যুমুখ হইতে সে যে মরুভূমিতে উঠিয়াছিল, এ গৃহ তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ মরুভূমি। চিরকালের জন্ত এই গৃহকেই তাহার গৃহরূপে বরণ করিয়া লইতে হইবে, একথা মনে করিয়া তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

তখন রমেশ তাহার সমস্ত ভার লইল। যাহাতে যথাসময়ে তাহার স্নানাহার হয়, বসন-ভূষণের কোন অভাব না ঘটে, রমেশ তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিল। প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন ঘর ছিল না, যে ঘরে রমেশের বিবাহ উপলক্ষ্যে শোকের কারণ না ঘটয়াছে। সেইজন্য পাড়া হইতে বধূর সঙ্গিনী কেহ জুটিল না। রমেশের বিশেষ অহুসে বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি বালিকার কাজকর্ম করিয়া দিত, কিন্তু নববধূই যে এই পরিবারটিকে ধ্বংস করিয়া দিল, এই বিশ্বাস সে সর্বদাই তাহার সম্মুখে এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তাহার সাহ্যনালাভের এই উপায়টি নববধূর পক্ষে শাস্তিজনক হয় নাই। এ বাড়ীতে তাহার খাওয়া, শোওয়া, বসা অভিশাপের কণ্টকে আকীর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ যেখানে বসত ইংরাজি ছবির বই ও বাংলা গল্পের বই সংগ্রহ করিতে পারিল, সমস্ত তাহাকে আনিয়া দিল। বালিকার এ বয়সে সমবয়স্ক-মাতৃ-সঙ্গের অভাব বইয়ে মিটাইতে পারে না। কিন্তু অগত্যা শোকাচ্ছন্ন সুদীর্ঘ দিন তাহাকে বইয়ের পাতা উন্টাইয়া কাটাইতে হইত।

শ্রাদ্ধশাস্তি শেষ হইবার পরেই রমেশ বধূকে লইয়া অস্ত্র ঘাইবে স্থির করিয়াছিল— কিন্তু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার গীত্র নড়িবার জো ছিল না। পরিবারের শোকাভূত জীলোক-গণ তীর্থবাসের অস্ত্র তাহাকে ধরিয়া পড়িয়াছে, তাহারও নিধান করিতে হইবে।

এই সকল কাজকর্মের অবকাশকালে রমেশ প্রণয়চর্চায় অমনোযোগী ছিল না। বালিকার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি-এ-পাস্কারা ছেলেরা তাহার কোন পুঁথির মধ্যে সে উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়াই জানিত। কিন্তু তবু কোন বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য্য এই যে, তাহার উচ্চ-শিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোট মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বিলাতি নভেলে যাহাকে প্রেম বলিয়া বর্ণনা করে, এই ভাবটি ঠিক তাই কি না, সে কথা বলা শক্ত। কিন্তু ইহাকে যে নামই দেওয়া যাক্, ইহাও মনকে অপূর্ণ, মাধুর্য্যে অভিবিক্ত করিতে পারে। রমেশ ইহাকে দিকার দিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

এই স্বকুমারী তরুণ-মেয়েটি যে তাহারি বধূ, এ যে তাহারি ঘরের লক্ষ্মীপদ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, ইহার এই সরল নন্দীন জীবনটি ধীরে ধীরে প্রতিদিন বর্ধিত হইয়া তাহার সমস্ত পরিবারকে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখকে পল্লবে-পুষ্পে কল্যাণে-মাধুর্য্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, এই ক্ষুদ্রটির মধ্যে গেই বিস্তৃত ভবিষ্যতের প্রীতিরসসিক্ত মঙ্গল-ইতিহাস অলুধান করিয়া রমেশের হৃদয় সহসা আঘাতের নবাম্বুমেহের প্রথম মেঘাগমের মত আপনার সমস্ত সরগতা লইয়া ইহার উপরে বাপ্ত হইয়া গেল। রমেশ আজকাল আপনার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাগুলি সহজে স্মরণ করিতে চায় না। স্মরণে পড়িলেও সে এখন

আপনাকে আর দৃষ্টিভঙ্গী বালিকা স্বীকার করে না। এখন রমেশ মনকে এই কথা বলে যে, কি অপরাধে বাল্যবিবাহকে একেবারে নির্দোষদণ্ড দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝিতে পারি না। মিলনের, বাৎসল্য হইতে সখ্যে, সখ্য হইতে প্রদায়, লীলা হইতে প্রণয়ে, প্রণয় হইতে মঙ্গলে পরিণত হইবার প্রত্যেক সোপানটি মধুর, এবং প্রত্যেকটিই অত্যাশ্চর্য্য। পরস্পরের জীবন এইরূপ ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে নানারসের মধ্য দিয়া মিশিয়া গেলে তবেই সে মিলন সম্পূর্ণ হয়। জীক্রে যে আপনার সহিত ও আপনার পরিবারের সহিত একাত্ম করিতে চায়, সে দাম্পত্যসম্বলনের গঙ্গোত্রী হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত অভিব্যক্তির কোন পর্য্যায়কেই উপেক্ষা করিতে পারে না।

এমনি করিয়া রমেশ নিজেকে বেশ করিয়া বুঝাইল। না বুঝাইলেও বধুর প্রতি আকর্ষণ কিছুমাত্র কম হইত, তাহা নহে। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার জী একই কালে বালিকা বধু, তরুণী প্রেমসী, এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্ভা মাতা রূপে তাহার ধমনীতে সন্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া ভাবী প্রেমসীকে—কল্যাণীকে পূর্ণমহীময়ী মূর্তিতে

হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল। • নিজের জীবনের একটি সুদূরব্যাপী ছবি তাহার মনের সন্মুখে জাগিয়া উঠিল। দেখিল, ম্যালেরিয়া-প্রাপ্ত বাংলাদেশের বাহিরে খণ্ডপ্রস্তরে আকর্ণ একটি ছোট নদীর ধারে গিরিবন্ধুর প্রান্তরের প্রান্তে শালবনের ছায়ায় তাহাদের নূতন-বাঁধা গৃহ;—সহরে কাছারির কাজ সারিয়া এইখানে যখন সে ফিরিয়া আসে, তখন অপরাহ্ন বনশ্রেণীর মধ্যে সন্ধ্যার রক্তিমায় মিলাইয়া যায়, নীড়প্রত্যাগত নীরব পাখীদের বিশ্রামের মধ্য দিয়া ছায়াপথে তাহার গাড়িটি বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের বাড়ীর অদূরে শৈলমূলে ছুটি একটি গ্রাম আছে—সেখানকার সরল গ্রাম্যনারীরা ডালায় করিয়া ক্ষেতের ফলমূল-শাকসবজি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে; তরুণী গৃহকর্ত্রী পিঠের উপরে শাড়ীর আঁচলটি তুলিয়া বারান্দায় টবের গাছগুলির মধ্যে একখানি ছোট মোড়া লইয়া বসিয়া গেছেন; যাহার একপয়সা দাম, তাহা দুপয়সা দিয়া কিনিতেছেন, এবং এই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে গ্রাম্য হিন্দিতে আলাপের খুব ধুম পড়িয়া গেছে। রমেশ আসিয়া পৌছিতেই পিঠের আঁচলটি কবরীর প্রান্তভাগে টানিয়া দিয়া গৃহিণী ঈষৎ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমেশ একটু পরিহাস করিয়া বলিল, “ঠাকরুণ, তুমি যে সওদাগরী আরম্ভ করিয়াছ, আমাকে ফেল করিবে দেখিতেছি।” ঠাকরুণ তাহার উত্তর না দিয়া রমেশের আহ্বানের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। এই কেনা উপলক্ষ্য করিয়া রমেশানী পল্লীর মেয়েদের আপনায় করিয়া বসিয়াছেন—তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক

তাহাদের কাছে ছুচার পয়সা করিয়া ঠকিয়া থাকেন। এইরূপ দয়ার বাণিজ্যদ্বারা তিনি, কেবল শাক্সবজি-নহে, চারিদিকের গ্রামগুলির হৃদয় কিনিয়া লন। রমেশ এই-রূপে তাহার জীবনচিত্র নানারঙে রাঙাইয়া তাহার মাঝখানটিতে একটি মধুর মুক্তি নানা অবস্থায় নানা ভাবে দাঁড় করাইয়া দিত। দূরব্যাপী ভবিষ্যতের রঙ্গভূমিতে এই বধুটি রমেশের নব নব কল্পনালীলার নায়িকারূপে বিচিত্র সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল।

হায় মায়াবিনী কল্পনা! বেশিদিনের কথা মনে, এই মৃদু যুবকটি গোলদীঘির ধারে পায়-চারি করিতে করিতে উর্দ্ধমুখে আর এক রঙের মরীচিকা স্বজন করিতেছিল। তখন সে দেখিতেছিল, কলিকাতার রাজপথপার্শ্বে তাহার ঘরের একতলায় চায়ের টেবিল পড়িয়াছে; চিন্তাশীল ভাবুক বন্ধুরা চারিদিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে; সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতির চর্চায় বাহিরের ট্রামের শব্দ আর শুনা যাইতেছে না। দেবী সরস্বতী তরুণী বধুর রূপে তাহার স্বর্ণবীণা ছাড়িয়া ভক্তগণকে চা পরিবেষণের ভার লইয়াছেন; মাঝে মাঝে সময় বুঝিয়া তিনি ছুটি-একটি বা কথা বলিতেছেন, তাহাতে মন্দবেগ আলোচনা তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে এবং উন্মত্ত-তর্ক মত্তমুগ্ধ সর্পের জায় শান্ত হইয়া যাইতেছে। ইত্যাদি আরো কত কি! সে সমস্ত ছবির রেখা স্নান হইয়া গেছে, আজ আবু তাহাদের কোন মূল্য নাই!

কিন্তু কল্পনালোকে রমেশের বৈকুণ্ঠ বিপুল আয়োজন-উদ্যোগ, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার

তদনুরূপ তৎপরতা দেখা যায় না। বালিকার সঙ্গে কেমন করিয়া হাসিখেলা-বাক্যালাপ করিতে হয়, তাহা সে কিছুই জানে না। তাহার কথাবার্তা গভীর—চর্য্যোচ হইয়া পড়ে। বধুর কাছ হইতে উত্তর না পাইলে তাহার কথার স্রোত বন্ধ হইয়া আসে। বালিকা সঙ্গ-অভাবে ক্রান্তর বলিয়া রমেশ বিশেষ করিয়া, বেশি করিয়া সঙ্গদান করিতে চায়, কিন্তু সেই সঙ্গবাহুল্যে বধুকে ক্লিষ্ট করিয়াই তোলে। রমেশ বুকিতে পারে ঠিকটি হইতেছে না, তাহাতে তাহার মনের আবেগ বাড়িয়া ওঠে, অথচ কোন উপায়ও খুঁজিয়া পায় না। বালিকার সহিত এই যুবকের সম্পূর্ণ-মিলনের দরজাটা বন্ধ আছে, রমেশ কোথাও তাহার চাবি হাতড়াইয়া পায় না।

পরিবার যেখানে পরিপূর্ণ, বালিকা বধু সেখানে আপনার চিত্তের উপযোগী খোরাক পায়। সখীদের সহিত স্নেহে, সখ্যে, খেলাধুলায় দেখিতে দেখিতে সে সরস হইয়া বাড়িয়া উঠে, পরিবারের মধ্যে তাহার ডাল মেলিয়া যায়, তাহার শিকড় ছড়াইয়া পড়ে। একানবর্তী ঘরে নারীর যখনকার যাহা, তখন সে তাহা পায়, এইজন্ত তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়া একদিন সে যথার্থ গৃহিণী হইতে পারে ও হৃদয়ের নানা সম্বন্ধ দ্বারা নানা লোককে আপনার করিয়া লইবার শক্তি-লাভ করে।

কিন্তু একলা স্বামী বধুকে গৃহিণী করিতে পারে না—সে তাহাকে প্রেমের দ্বারা নষ্ট অথবা দোন্নাঙ্গ্য দ্বারা দলিত করিতে পারে। শুভদানের সময় অন্ন দিয়া শিশুকে মাতুল করা যায় না, রমেশ সেইরূপ বালিকাকে যে

সঙ্গ দিতে পারে, তাহা তাহার পক্ষে পুষ্টিকর নহে। শিক্ষিত যুবক বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি প্রেমসীর মত আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিলে, তাহাতে বিলাতি ফেশানের স্ত্রীও গঠিত হয় না, হিন্দু-ঘরের গৃহিণীও বিকাশ পায় না।

এইরূপে ছোট এই একটুখানি হৃদয় বশ করিবার চেষ্টায় রমেশের সমস্ত মন খাটিতে লাগিল। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরপুত্র বাল্যকাল হইতে কেবল পঁড়া-তৈরি করিয়াই আসিয়াছে, চিন্তাবৃত্তির স্বাধীনচর্চায় কোন অবকাশই পায় নাই, তবু তাহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই নষ্ট হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই রমেশ বেশ বৃত্তিতে পারিল যে, সে এই বালিকার স্বামী বটে, কিন্তু সে খেলেনা নহে। স্বামীর চেয়ে খেলেনার অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে; তাহাকে ছুট্ট মনে করিয়া শাসন করা যায়, শিষ্ট মনে করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া চলে, তাহাকে বালকের সাজ করাইয়া পাঠশালা বসানো যায়, আবার আবশ্যকমত বালিকার বেশ পরাইয়া উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের আয়োজন করিলে তাহার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে না। স্বামীর ব্যবহার ঠিক তাহার উদ্দীপ্ত। কোন কথা না কহিলেও সে কথা কহে, তাহার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক পাতাইবার পূর্বেই সে বালিকাকে খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করে—তাহাকে বাস্কট মধ্যে চাপা দিয়া রাখাই শক্ত। অতএব এই স্বামি-পদার্থকে লইয়া অধিক সময় কাটানো চলে না, পুতুলকে লইয়া সমস্ত দিন কাটিতে পারে।

লোকে শুনিয়া হাসিবে, কিন্তু রমেশ সাহেববাড়ী হইতে একটি বাস্কটের বিচিত্র খেলনা আনাইয়া দিল। সহধর্মিণীকে খেলনা কিনিয়া দিতে হইবে, আর কিছুদিন আগে এ কথা রমেশকে বলিলে, সে বোধ হয় বস্ত্রার প্রতি ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিত না। আজ খেলনালাভে বালিকার আনন্দ দেখিয়া রমেশের মুখে স্নেহকোমল কোতুকের হাস্য দেখা দেয়। সময়ে সময়ে সে নিঃশব্দপূর্বে পশ্চাতে আসিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বধুর খেলা দেখে; যদি এ-বিভায় তাহার কিছুমাত্র দখল থাকিত, তবে সে খেলায় যোগ দিতেও পারিত।

কিছুদিন পরে লোকমারফৎ কলিকাতা হইতে একখাচা নানাজাতীয় ছোট ছোট পাখী উপস্থিত হইল। বধু তখন তাহার পুত্রিকাকে পালক্ষে শোয়াইয়া রোদন করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিতেছিল, মাঝে মাঝে ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে ভৎসনা করিতেও ছাড়িতেছিল না, অবশেষে বাহুপাশে তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে যখন তাহাকে স্তনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন-সময় রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকা তাড়াতাড়ি তাহার পুতুল ফেলিয়া দিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া বসিল। রমেশ কাছে আসিয়া কহিল, “আজ তোমার জন্ম কি আনিয়াছি বল দেখি।” লুকা বালিকা নূতন পুতুলের আশ্বাসে ঘোমটার ভিতর হইতে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ তখন ঘরের বাহির হইতে খাচাটি আনিয়া বধুর সামনে রাখিল এবং তাহার কাপড়ের আবরণটি তুলিয়া দিল। ছোট ছোট

পাখিগুলিকে দেখিয়া বউ খুঁসি আর চাপিয়া রাখিতে পারে না ! এমন উপহার সে কখনো কাহারো কাছ হইতে পায় নাই। স্বামী যে অনাবশ্যক নহে, তাহা এইরূপ উপায়ে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যায়।

এই পাখিগুলি লইয়া রমেশের সঙ্গে তাহার বধুর পরিচয় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিদেশী পাখীদের খাইবার উপযুক্ত বীজশস্ত্র রমেশ কলিকাতা হইতে আনাইয়া খলিতে করিয়া নিজের কাছেই রাখিয়াছিল। প্রত্যহ দুইবেলা যথাপরিমাণ আনিয়া সে পাখীদিগকে পরিবেষণ করিত। কি করিয়া মান্নের আয়োজন করিতে হয়, বধুকে সে-সম্বন্ধে রমেশ উপদেশ ও সাহায্য করিত। রমেশ এমনি কৌশল অবলম্বন করিল, যাহাতে পক্ষিপালনকার্যে সর্বদা তাহার সাহায্য বাতীত চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই উপায়ে কথাবার্তা শুরু হইল। উভয়ে মিলিয়া অনেক আলোচনা করিয়া প্রত্যেক পাখীর নামকরণ করিল। কোন্ পাখীটা পুরুষ, কোন্টা স্ত্রী, তাহা লইয়া তর্ক এতদূর বাইত যে, রমেশ এবং তাহার প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞা যদি হার না মানিত, তবে ঝগড়া হইতে পারিত ! যে পাখীর ডানার রং বেশি ও সুন্দর দেখিতে, তাহাকে বালিকা কোনমতেই পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিত না—দুর্বল স্বামী বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া পাখিগুলির শাস্ত্রবিরুদ্ধ নামকরণই শিরোধার্য্য করিয়া লইত।

বধু একএকদিন অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে চোখ ছলছল করিয়া রমেশকে আসিয়া বলিত, “পুণ্ডরীক আজ কিছুই খাইতেছে না,

ও বোধ হয় মরিয়া যাইবে !” কোনদিন বা তাহার মহাশ্বেতা বিকাল হইতে ডানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইত, সেটা তাহার পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিত। রমেশ এইরূপে তাহার অনেক স্নেহভঞ্নের ভাগী হইয়া উঠিল !

তাহাদের বৃহৎ বিজপরিবারে ইতিমধ্যে দুইএকটা শোকাবহ ঘটনাও ঘটিয়াছে। দুইএকটা পাখী মারাও গিয়াছে। বালিকা আহার ভাগ করিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে। তখন সাময়িকভাবে রমেশকে অনেক সময় দিতে হইয়াছে।

৬

এইরূপে প্রায় তিনমাস অতীত হইয়া গেল। বৈবাহিক ব্যবস্থা সমস্ত সমাধা হইয়া আসিল। প্রাচীনরা তীর্থবাসের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশিমহল হইতে দুইএকটি সঙ্গিনী নববধুর সহিত পরিচয়স্থাপনের জন্ত একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল। রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে ছজনে মাত্র পাতিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, “তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে, বধু যখন রাত্রি অধিক না হইতেই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রমেশ তখন তাহাকে ললাটে চুষন করিয়া জাগাইতে চেষ্টা করে, বালিকা এই মুহূর্ত্ত উপায়ে, না জাগিলে নানাবিধ উপদ্রবে তাহাকে সচেতন করিয়া তাহার বিরক্তি-তিরস্কার লাভ করে। ক্রমে তাহাকে অল্পে

অল্পে সাহিত্যরসের নেশা ধরাইয়া দিবে, এরূপ উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় ছুগ্রাহ হঠাৎ আর একবার জাগিয়া উঠিল ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় রমেশ বালিকার ধোঁপা ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, “সুশীলা, আজ তোমার চুলবাধা ভাল হয় নাই ।”

বালিকা বলিয়া বসিল, “আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন ?”

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

বধু কহিল, “আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে ? আমি ত শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত—না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুটিবে না !”

হঠাৎ রমেশের বুক ধক্ করিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল—কোণার কি একটা প্রমাদ ঘটিয়াছে, এ সংশয় হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল । রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “শিশুকাল হইতেই তুমি অপয়মন্ত কিসে হইলে ?”

বধু কহিল, “আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা মরিয়াছেন, আমাকে জন্মদান করিয়া তাহার ছয়মাসের মধ্যে আমার মা মারা গেলেন না, আমার বাড়ীতে অনেক কষ্টে ছিলাম । হঠাৎ শুনিলাম, কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে পছন্দ করিলে—দুইদিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, তার পরে দেখ, কি সব বিপদই ঘটিল ! এই দেখ, আমি তিন-মাস এখানে থাকিতে থাকিতে তিনটি পাখী আমার মরিয়াছে ! আমি জানি, ওর একটাও বাঁচিবে না !”

রমেশ নিশ্চল হইয়া তাকিয়াই উপরে শুইয়া পড়িল । আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালী হইয়া গেল । রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল । যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকু সে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া স্নদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায় । পাছে নিদারুণ কোন সত্যকে আর চাপিয়া রাখা না যায়, পাছে স্মৃতি ন সত্য এখনি কুহলিকামুক্ত-স্ববিপুল-পর্কত-সমান অল্পভেদী হইয়া উঠে, এই ভয়ে রমেশ চূপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল । সংজ্ঞা-প্রাপ্ত মুচ্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মত গীর্ঘের দক্ষিণ হাওয়া বহিতে লাগিল । জ্যোৎস্নালোকে নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিতেছে—অদূরে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার ছাদ হইতে শাবিদের গান আকাশে জ্যোৎস্নার মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে । অনেকক্ষণ কোন সাড়া না পাইয়া বধু অতি ধীরে ধীরে রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, “ঘুমাইতেছ ?”

রমেশ কহিল, “না ।”

তাহার পরেও অনেকক্ষণ রমেশের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না । বধু কখন আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল । রমেশ উঠিয়া-বসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । কি সুন্দর মুখখানি ! ফুলের মত অগ্নান-কোমল ! তরুণ হৃদয়ের মুহু স্নগন্ধটুকু যেন ঐ সরল স্নকুমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া উঠিতেছে । বিধাতা ইহার ললাটে যে গুণলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজো এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই । এমন সৌন্দর্য্যের ভিতরে সেই ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে !

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। আহারের সময় নামিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, তেমনি রমেশের উত্তীর্ণ হইয়া যায়—আজ আর রমেশ তাহার সমস্ত ক্লক্ জন্ম একবার ঐ অশু মুখখানির লগাট চুষন করিল না, তাহাকে স্পর্শ করিল দিকে-অগ্রসর হইয়া আবার আপনার অভ্যন্তর না। জোয়ারের টানে সমুদ্রের সমস্ত তরঙ্গ দিকে হতাশ হইয়া নামিয়া পড়িতে যেমন একবার পূর্ণচন্দ্রের দিকে উঠে, আবার লাগিল।

ক্রমশঃ।

সন্ধ্যা।

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো ভূমি এলে!
একলা আমি বসে আছি
অন্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে ছাটি নয়ন মেলে'
অতি সূদূর দীর্ঘপথে'
আকুল তব আঁচল হ'তে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জালা বনের শেষে
কখন্ এলে ছয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি'!

তোমার সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পাছবিহীন পথের বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে শুক্ল কলকথা
শৈলতটের পায়ের 'পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তারি আনলে বহন করি',

কত বনের সাথে সাথে
পাখীর যে গান স্তব্ধ থাকে
এনেছ তাই মোন নুপুর ভরি' !

ভালে তোমার কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্যমিথ্যা ভালমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান !
অঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্য' পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোর সর্ব্বহৃদয় ভরি' !

যেমনি তব দখিনপাণি
তুলে ল'য়ে প্রদীপধানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে
গৃহ আমার একনিমেষে
বাপ্ত হ'ল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে ।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কা'রা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাশ্বরে ঢাকি' !
আজি আমার দ্বারের কাছে
আদিম নিশা স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার অঁধি !

এই মুহূর্ত্তে আধেক ধরা
ল'য়ে তাহার অঁধার-ভরা ;
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি

আমার বাতায়নে এসে
 দাঁড়িয়েছে আজ দিনের শেষে,
 শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি !
 চক্ষে তব পলক নাহি,
 ঋবতারার দিকে চাহি
 তাকিয়ে আছ অনাদিকালপানে !
 নীরব ছুটি চরণ ফেলে .
 অঁধার হ'তে কে গো এলে
 আমার ঘরে আমার গীতে গানে !

কত মাঠের শূন্যপথে,
 কত পুরীর প্রান্ত হ'তে,
 কত সিদ্ধবালুর তীরে তীরে,
 কত শাস্ত নদীর পারে,
 কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
 কত স্তম্ভ গৃহছয়ার ফিরে'
 কত বনের বায়ুর 'পরে
 এলোচুলের আঘাত করে'
 আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে !
 বহু দেশের বহু দূরের
 বহু দিনের বহু স্ররের
 আনিলে গান আমার বাতায়নে !

বিষ্ণুমাহাত্ম্য ।

সংসার অনিত্য ; দেবতাদিগের সৌভাগ্যও
 ক্ষণস্থায়ী । বৈদিক যুগে যে সকল দেবতা
 মহিমাময় ছিলেন, পৌরাণিক যুগে তাঁহাদের
 ভেদন অদর-অভ্যর্থনা দেখিতে পাওয়া যায়
 না । অবহা মন্দ হইলে, কেবল বনিয়াদি

বলিয়া যে সম্মানটুকু পাওয়া যায়, বৈদিক
 দেবতাদিগের মধ্যে কেবল জনকতকের
 ভাগ্যে ততটুকুই অবশিষ্ট রহিয়া গেল । নব
 দেবতাদিগের পূজার পূর্বাঙ্ক, কোনরূপে
 ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণ এজমালিতে একটি

কুল পাইতে লাগিলেন। বিষ্ণু প্রাচীন-কালেও নামজাদা ছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি ইন্দ্রের তুলনায় ক্ষুদ্র দেবতামাত্র। বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের সন্ধিকালেও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের একটি ; মহাভারতেরও স্থানে স্থানে সে কথা পাই। কিন্তু ঐ মহাভারতেই উঁহাকে আবার বড় ক্ষমতা-শালী দেখিতে পাওয়া যায় ;—একবারে স্বয়ং নারায়ণ। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে দেব-গণের জন্মপরিগ্রহের সময়ে দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের এক একটি আদিত্যরূপে উৎপন্ন হইলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ, ১৫শ অধ্যায়, ১০০—১০৩ পর্য্যন্ত) ঐ বিষ্ণুপুরাণেই আবার বিষ্ণু ইন্দ্রাঙ্কুজ বলিয়া আখ্যাত। তৎপরেই আবার দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রের নন্দনবনের পারিজাতগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু ইন্দ্রকে পরাস্ত করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ, ৩০তম অধ্যায়) কৃষ্ণের নন্দনানিত প্রভাবমহিমায় হউক, অথবা বিষ্ণুর স্বীয় প্রভাবেই হউক, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রের ক্ষমতালোপ করিয়া, তাঁহার রাজচিহ্ন (ধ্বজ), অস্ত্র (বজ্র) এবং ঐরাবতের জন্ত বাবহৃত অশ্বশ, নব-দেবতা স্বীয় শরীরে আয়ত্বেশ্বররূপ গ্রহণ করিলেন। মহাভারতের বনপর্বে লিখিত আছে যে, কেশী নামক একটা দৈত্য প্রজাপতির একটি কন্তা হরণ করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছিল বলিয়া, ইন্দ্র ঐ দৈত্যকে পরাভূত করেন। বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ কেশীনিধন করিয়াছিলেন, পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্রের মহিমা লুপ্ত করিয়া বিষ্ণুর ক্ষমতা বাড়াইবার জন্তই পুরাতনের উপর এই সকল নূতন সংস্কারণ।

বহুদিন হইতে বৈদিক পূষা, হয় ত বিষ্ণুর তাড়নায়, অজ্ঞাস্থের গাড়িখানি হাঁকাইয়া দেশতাগী হইয়াছিলেন ; এবং বিষ্ণু হয় ত তাঁহারই গদাটি কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। পূষার যে একটি গদা ছিল এবং বিষ্ণুর যে তাহা ছিল না, বেদ তাহার সাক্ষী। বিষ্ণু ও পূষা, দুইজনেই দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন ; এবং পরে বিষ্ণু বড় হইয়া উঠেন। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া বড়ই সন্দেহ হয় যে, গদাধরের হস্তে পূষার গদা। পূষার গদার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লই। পূষা বৈদিককালে 'কপর্দী' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কপর্দ অর্থে কড়ি এবং কড়ির মত বিহস্ত কেশজটা। উত্তরকালে রুদ্র কপর্দী হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানা আছে ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৌরাণিক যুগের প্রধান দেবতা, তাহাও জানি। পূষা যখন তাড়িত হন, রুদ্র এবং বিষ্ণু উভয়েই তখন তাঁহার প্রতিপক্ষ। জাতিবিবাদের সময় বিষ্ণু যখন গদাটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মহেশ্বরও বে তখন বেচারার কেশাকর্ষণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না।

পৌরাণিক বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত এবং তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসলাঞ্জন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ এবং গদার ইতিহাস বোধ হয় পাওয়া গিয়াছে ; বাকি রহিল শঙ্খ, পদ্ম এবং বক্ষের চিহ্ন। গোরবের আভরণগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস না পাইলে উঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা

হইবে না। একে একে সেই কথা বলিতেছি।

(১) চক্রটি বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি; ওটি নিশ্চয়ই আদিত্যের চক্র। তবে এ চক্রটি বড় স্নন্দরদর্শন এবং ইন্দ্রের দস্তোয়ালি অপেক্ষাও ক্ষমতাসম্পন্ন।

(২) পদ্মটি জাতিকুলের বা পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি নহে। শিবপূজাপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে, পৌরাণিক যুগের সূত্রপাত বৈদিক বৌদ্ধ এবং অনার্যধর্মের মিশ্রণে। বৌদ্ধেরা যে বুদ্ধদেবকে ত্রিমূর্তিবিশিষ্ট করিয়াছিল, সে কথাও কিঞ্চিৎ বলিয়াছিলাম; বজ্রপাণি বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ এবং পদ্মপাণি বুদ্ধ লইয়া এই ত্রিমূর্তি। শিব বা মহেশ্বর যে বজ্রপাণি বুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত, সে কথা পূর্বে লিখিয়াছি। পৌরাণিক ত্রিমূর্তিকল্পনা যখন বৈদিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তখন ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর যে ঐ ত্রিমূর্তির অল্পরূপ নব দেবতা, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বিষ্ণু যে পদ্মপাণি বুদ্ধের পদ্মটি হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাঁহার শাস্তিময়-স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মার সম্বন্ধেও ঐ কথা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ঘাতপ্রতিঘাত প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ বিবৃতি আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, “অমিতাভ বুদ্ধ, কিনা অপরিমিত জ্যোতি—ইহাকে :সুবর্ণজ্যোতি হিরণ্যগুর্ভ ব্রহ্মা বলিলেও চলে।” এ সকল কথার পর পদ্মের অস্ত্র উৎপত্তি স্বীকার করা সুসাধ্য নহে।

(৩) শঙ্খের ইতিহাসঃ একটু জটিল। ইন্দ্র বেচারার একটা শঙ্খ ছিল; অর্জুন

সেই দেবদত্ত শঙ্খ লইয়া দৈত্যবধ করিতে গিয়াছিলেন। বিষ্ণু কি ইন্দ্রের শঙ্খটাও লইয়া আসিয়াছিলেন? পুরাণে দেখিতে পাই যে, একবার আর্য্যবিষ্মবী একটা দৈত্য আর্য্যদিগের অনেক স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি চুরি করিয়া সমুদ্রগর্ভে চলিয়া গিয়াছিল। অস্থাবর সম্পত্তি কুবেরের শঙ্খনিধি এবং স্থাবর সম্পত্তি বেদ। বিষ্ণু তখন মৎস্ত হইয়া বেদ উদ্ধার করিলেন এবং শঙ্খটাও লইয়া আসিলেন। শঙ্খটি কি পুরস্কারের হিসাবে হাতেই রহিয়া গিয়াছিল? এখানে বলিয়া রাখি যে, বিষ্ণুর অবতারকল্পনার জন্ত জলপ্লাবনের মৎস্তের কথাটা এখানে নূতনভাবে রচিত। আবার অস্ত্র দেখিতে পাই যে, এক একটি জাতি বা বংশ এক একটি বিশেষ রণযাত্তর যন্ত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন অস্ত্রকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্ত শঙ্খ লাভ করিয়াছিলেন। এখন কথা এই যে, বিষ্ণুর হস্তে একটা শঙ্খ ছিল বলিয়া কৃষ্ণকে একটি শঙ্খ দেওয়া হইয়াছে, অথবা যদুকুলে শঙ্খ ছিল বলিয়া বিষ্ণুর হস্তে ইন্দ্রের শঙ্খ দিয়া বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের অভেদ কল্পিত হইয়াছে?

(৪) শ্রীবৎসলাঞ্ছন বড় সহজ রকমের জিনিষ নহে। যাত্রার দলের কৃষ্ণ যে কুল-কিনারা না পাইয়া “খড়িমাটিরে বলদেব” বলিয়াছিল, তাহাতে আর বিশ্বাস হয় না। পুরাণকর্তারা বলেন যে, একটা বিশেষ আকৃতিতে কুঞ্চিত শুক্রবর্ণের বক্ষোরোমের নাম শ্রীবৎস। জৈনদিগের দশম জিনের বন্ধেও ঐ চিহ্ন ছিল। জৈনের চিহ্ন বিষ্ণু লইয়াছেন কিংবা বিষ্ণুর চিহ্ন জৈন লইয়াছেন, তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে; কারণ,

পৌরাণিক যুগের সময়ে জৈনেরা অনেক হিন্দুপুরাণকে জৈন করিয়া লইয়াছিল ।

শ্রীবৎসের আর একটি অর্থের কথা বলিতেছি । শ্রী অর্থে লক্ষ্মী এবং বৎস অর্থে প্রিয় ; এই সূত্র ধরিয়াও বিষ্ণুকে শ্রীবৎস বলা হইয়াছে । এ অর্থটা যে শব্দের নানা অর্থের সাহায্যে নূতন কল্পনা, তাহা লক্ষ্মী-দেবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাই-তেছি । শ্রী বা লক্ষ্মী প্রথমত অশরীরী সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যমাত্রই ছিলেন ; কেবল-মাত্র কথার রূপকে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-শ্রী সান্তোষ করিতেছিলেন । শ্রী কোন আস্ত দেবীর নাম ছিল না । পুরাণে দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র দুর্কাসার অভিশাপে ত্রৈলোক্য-শ্রী হারাইয়াছিলেন ; এবং পরে সমুদ্র-মন্থনের সময় যখন পুনরুত্থিত হইলেন, তখন একেবারে গিয়া বিষ্ণুর বক্ষশোভা হইয়া বসিলেন । এখানেও যেন রূপক চলিয়াছিল ; এবং সেইজন্তই প্রথমত লক্ষ্মী-দেবীর প্রতিষ্ঠা বা পূজা দেখিতে পাই না । অগ্নিপুত্র স্বন্দদেবের ইতিহাসে মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত আছে যে, স্বন্দপত্নী দেব-সেনাই শ্রী । পঞ্চমী তিথিতে ঐ হার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া শুক্লপঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে আখ্যাত হইয়া ঐ সময়ে শ্রীর পূজা হইত । এখন কিন্তু শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা হয় । শ্রীঠাকুরাণীকে লইয়া বড়ই গোলে পড়া গেল । কতকগুলি ভীমরূপিণী মাতৃকা স্বন্দের অনুরূপী ছিলেন । স্বন্দকে যখন মহাদেবের পুত্র বলিয়া নূতন পুরাণ হইল, তখন ‘মাতৃকা’কথাটার অত্ররকম অর্থের সুবিধায়, নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া, কতকগুলি

মাতৃকাকে পার্শ্বতীর নামান্তর বা রূপান্তর বলিয়া মহেশ্বরের পত্নী করা হইয়াছিল । এটা তাত্ত্বিকধর্ম্মপ্রবর্তনের পূর্বে হয় নাই । শিশু স্বন্দকে মাতৃকাগণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ষষ্ঠীনাম্নী মাতৃকা নবজাত সন্তানের কল্যাণ-কামনায় পূজিতা হইতেছিলেন । কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থেও ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ দেখিতে পাই । এই সকল দেবীগণ এত পূজ্যা এবং যথার্থ দেবী বলিয়া স্বীকৃতা যে, কোন শাস্ত্রে বা সাহিত্যে শাপভ্রষ্টা করিয়াও ইহাদিগের নরসহবাস কল্পিত হয় নাই । কিন্তু লক্ষ্মীকে কথায় কথায় বীরপুরুষ এবং রাজাদিগের পত্নীরূপে বর্ণিতা হইতে দেখা যায় । ‘অম্বা’ দেবী লইয়া এপ্রকার কল্পনা বা রূপক-যোজনাও মহাপাপ । শাপভ্রষ্টা সরস্বতী নরসহবাসে বাণভট্টের পূর্বপুরুষের স্বজন-কারিণী । কমলার সহিত ঋষিসহবাসের কথা কাদম্বরীতে কল্পিত আছে । এইজন্ত মনে হয় যে, রূপকের দেবীটি কোনরূপে বিষ্ণু-ঠাকুরের বক্ষে বসিয়া ঠাকুরের গৃহশূণ্যতার অপবাদ মোচন করিয়াছেন । শ্রীবৎস প্রথমত বক্ষের চিহ্নবিশেষই ছিল, পরে শ্রীর প্রণয় হইতে ঐ কথাটার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে ।

নূতন বিষ্ণু নূতন মহেশ্বরের মত নানা দেবতা ভাঙিয়া গঠিত । শিবের মত বিষ্ণুও অনেক অনার্য্য দেবতাদিগকে অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন । বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, মহারাষ্ট্রদেশীয় বিঠল, তৈলঙ্গ-দেশীয় ভেঙ্কট প্রভৃতি অনার্য্যদেবতা বিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর বক্ষে অচলা করা হইয়াছে ; তবুও বিষ্ণুর সৌভাগ্য চিরস্থায়ী

হয় নাই। পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতেই খ্রীষ্টিয় বিষ্ণুপূজার পরিবর্তে কৃষ্ণরূপ বিষ্ণুর পূজা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুরাণের বিষ্ণু কৃষ্ণমাত্র। কৃষ্ণের দেহে আপনার অবতার সংক্রমণ করিয়া দিয়া, বিষ্ণু একবারে নাগরবক্ষে গিয়া নিদ্রিত হইলেন। একএকবার পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া উত্তরায়ন-দক্ষিণায়ন করেন, এইমাত্র। এই পার্শ্বপরিবর্তনের কথায়ও বিষ্ণুর আনিত্যস্বরূপ, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর যথার্থ ইতিহাস, সূচিত, হয়। যাহাই হউক, ঠাকুর একবারে কৃষ্ণের হাতে রাজ্যসমর্পণ করিয়া দিয়া কোন প্রকারে অসন্তুষ্টতার উপর নড়াচড়া করিতেছেন, কিন্তু পূজার ভোগ থাইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ৌরাণিক বিষ্ণুর বিশেষত্ব অবতারবাদে; অথচ ঐ অবতারবাদই তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। মংস্ত, কুর্ম, বরাহ জলে-জললেই আছেন; পূজা আছে কেবল শ্রীকৃষ্ণের। এইজন্ত অনেক অহুমান করেন যে, অবতারবাদটা সর্বপ্রথমে কৃষ্ণকে বিষ্ণু সাজাইবার জন্তই হইয়াছিল। মংস্তকথার সহিত বিষ্ণুর কোন সম্পর্ক নাই, পূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। ব্রহ্মা বরাহ হইয়া মাটি তুলিয়া ছিলেন, ইহাই প্রাচীন পুরাণ। বৌদ্ধদিগের অবতারবাদের সহিত টকর দিতে গিয়া যখন নূতন অবতারবাদ সৃষ্ট হয়, তখন প্রাচীন ছচারিটি কথা জুড়িয়া না দিতে পারিলে স্রবিশা হয় না। বলিয়াই যেন মংস্তাদি অবতারের কল্পনা হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

হুয়ো-রাণী।

ঘুঁটে কুড়াইয়া, পথে ঝাড়ু দিয়া,
সারাদিন ধরি' ব্যাথাভরা-হিরা,
বারবার, অঁখি মুছিয়া মুছিয়া,—
হুয়োরাণী আসি' সাঁঝের বেলায়
বসেছে বাগানে তরুর তলায়—
জীর্ণকুটার কাছে দেখা যায়!
ওই-ই তার ঘর—হোথা নিতি রাতে
ঘুম যায় হুয়ো তৃণশয্যাতে,—
ঘুঁটে কুড়াইতে জাগে রোজ প্রাতে।
আজি সায়াহ্নে একটি তারকা
নভোজানালায় খুলিয়া স্বরবধা
উঁকি দিল যবে—(বুঝি বা ঝড়

সাধ হল তার সাঁঝ এল কি না)—
তখন একলা হুয়ো বিমলিনা
তরুর তলায় হইলা আদীনা।
চুপে চুপে, মনে নিলা মুহূনাম
একটি ফুলের, করিলা প্রণাম
দীপশিখা-অঁকা দূর দেবধাম—
শঙ্খবট্টা বাজিছে যেথায়—
নটীগণে মিলি' নাচিছে যেথায়—
সখীগণে ল'য়ে রাজিছে যেথায়,
ঠাকুরহারাে স্রবী স্রয়োরাণী
পরিয়া তাহার চেলবাসধানি!—
দাঁড়ায়েছে রাজা জুড়ি' ছই পাণি

করি' পরিধান কোষেবাস—
ললাটে তাহার চন্দনাভাস ।
উঠিছে সুরভি ধূমের রাশ
চারিদিক্ ঘিরি',—প্রদীপার্চনা
হেরিতেছে পুরবানী সবজনা ।
এদিকে বাগানে, অঁধার-মগনা
জোনাকী মালিকা লতিকার পাশে
একাকিনী ত্যো চুপ্ বসি' আছে—
কোমল অঁধার সকল আঁকুশে !
কি ভাবিছে ছয়ো ?—ভাবিয়া না পায়—
ব্যথিত পরাণ তার কি যে চায় !—
'স্বপনের মত মনোমাঝে ভায়
সকল অতীত জীবন তাহার !
এই মনে পড়ে এক বালিকার
মুঢ় খেলাল্লা,—হাদিরাশি, আর
ছথরাশি যত,—এই মনে পড়ে
ব্রতমঙ্গল কোন্ সে বছরে ।
দুর্গা ও ফুল-রাখি' থরে থরে
কত দেবতার পূজা-আরাধনা—
হারু কত মুঢ় মনের কামনা !
—পতিবর মাগা, পুত্র-ঘাচনা !
“হায় না বুঝিয়া কত-কি যে বলি
বালিকা-বয়সে !—ছলনা কেবলি !
—সেই সব দিন কোথা গেছে চলি' !
*অবশেষে এল বিবাহের রাত্রি ।
—এরি মাঝে মোর কত খেলাসার্থী
পতিবতী হ'য়ে, সুখ-স্বর পাতি'
“বসেছিল,—তারা জানাত আশার
অঁখি নীচু করি' চোখের আভার—
—পতিবতী নারী কত সুখ পায় !—

“সুখ ? হায় সুখ !—সুখই বটে ! সুখ !
খালি করি' ফেলি' বাপমার বুক,—
ভাইভগিনীর বিসরিয়া মুখ,
“পিছু ফেলি আসি খেলার কানন,
একখনি কোন্ অচেনা আনন
বুকে ভরি' ল'য়ে ভাবা অল্পখন—
“সুখ বটে তাই ?—সুখই বটে হায় !
ঐ ত, রমণী ঐ ত রে চায় !—
—যাহা আছে তার তাহা ফেলে যায় !
“—তার তরে শুধু ব্যাপিয়া হৃদয়
সুগভীর স্নান ছায়া লেগে রয়—
যাহা নাই তারি অভিমুখে বয়
“নদীর মতন বনছায়া দিয়া
আপনার মাঝে আপনি কাঁদিয়া !
নিজে সে কি ধায় ? হায়, মুঢ় হিয়া !
“বিধাতাই তারে গড়েছে এমন—
কালে কালে তার নূতন বেদন,
জাগায় পরাণে নূতন চেতন,
“নূতন করিয়া করয়ে অধীর ।
—স্থির নাহি রয় সুখ ধরণীর—
যাতনা কেবল অবলা নারীর ।
“মনে পড়ে সেই নূতন বেদন—
মনে পড়ে সেই নূতন চেতন—
মনে পড়ে রাজরথের কেতন
“বেলাশেষকালে দেখা দিল দূরে—
ততখন আমি হস্ত্যের চূড়ে
সখীগণে ল'য়ে, নৃপুংর কেয়ূরে
“মালাকুণ্ডল চেলবাসে সাজি'
বসেছিহু—হায় ঐ স্বপন সে আজি !
দেখিতেছিলাম ঝাঙা মেঘরাজি

“আমারি মতন হরষে ও লাজে
 কারে অপেক্ষি’ চুপ্ করে’ আছে—
 কত বরণের চেউ তার মাঝে
 “উঠিছে পড়িছে, আমারি হিয়ায়
 ভাবগুলি যথা আসে আর যায়।
 সহসা অমনি কাঁপাইয়া কায়
 “বাজিয়া উঠিল মধুর বাজনা—
 রাজ-আগমের জাগে ঝঙ্কনা—
 কে ও রথ’পরে ?.....বিধি বঞ্জন
 “করিলা আমায় !—অরিয়া কি ফল ?
 ওরে বারি, তোর নয়নের জল
 যেথা হ’তে আসে—সে নদী অতল !
 * শুধু যদি সুখ দুখ হ’য়ে যেত—
 নারী যদি শুধু এই দুখ পেত,—
 তবে ভাল, সেই এক গান গেত
 “জীবন ভরিয়া,—অমার মতন
 রহিত সূচির অঁধারে মগন।
 কিন্তু আবার একি এ লিখন
 “হায়, হতবিধি, কেন নব চাঁদ
 আন্দোলি’ তার হরষ অগাধ,
 নব নব দিনে বিতরে প্রসাদ—
 “বাড়ায় দ্বিগুণ বেদনার ব্যথা ?
 অজানা মূতন’আবেগ, মমতা
 কেনগো নোয়ায় তা’র হৃদিলতা ?
 “রাজগৃহস্থ, সোয়ামিপ্রসঙ্গ
 হয়েছে, আমার হয়েছে ভঙ্গ।
 অথবা রাণীর সোণার অঙ্গ—
 “কে চায়, বিধাতা !—নাহি চাই চাই—
 প্রিয় প্রেমসুখ—যা গিয়াছে তাই—
 তার লাগি’ মোর কোন খেঁদ নাই !

“উদ্দেশে নমি’ প্রাণেশের পায়
 বলেছি—‘হে নাথ দিলাম তোমায়
 ‘ধাধা দিয়েছিলে হেলার খেলায়—
 “সকল আদর, সুখচুষন,
 ‘কতই সোহাগ, প্রেমালিঙ্গন—
 ‘সকলেরি মাঝে যে প্রেমরতন
 “‘দিয়েছ, তা’ পায় নিবেদিসু, বসি’
 ‘স্বতিঘরে, প্রেম-চন্দনে রসি’ !
 ‘যে কটি অশ্রু পড়িতেছে থসি’
 “‘তাও মুছিলাম—তুমি সুখে রহ—
 ‘নব সুখ আনি’ কোলে তুলি’ লহ।
 ‘পালিব আজ্ঞা—যাহা তুমি কহ,
 “‘যু’টে কুড়াইয়া কাটাব জীবন’—
 —জান বিধি, আমি হেন নিবেদন
 করিয়াছি কি না !—তবে, এ, এখন—
 “এখনো আবার কেন এ বেদনা ?
 কেন জননীর এ নব চেতনা ?
 কেন নিশিদিন রয়েছে বিমনা—
 “কারে পাব যেন বুঝ ভরি’ মোর—
 কারে পাব যেন ভরি’ এই ক্রোড় !—
 এ কণ্ঠে যেন কার বাহুডোর
 “কোমল-পরশে ফুটাইবে ফুল !
 কেন নিশিদিন চিত্ত আকুল
 ব্যথায় লালসে—এ কেমন ভুল !
 “বাদের লাগিয়া এই দীন দশা—
 তাদের লাগিয়া কেনরে’ বিবশা !
 তাদের লাগিয়া—আঁখির বরষা !
 “হায় !.....না না, মোর বাছাধনগুলি—
 তেমনি কি ? হায়, চোখে দিয়া ঠুলি,
 রেখেছিল মোরে ! অঁধারে আঁগুলি’

“রেখেছিল তারা জিভুবন মোর !
হায় লো সতীন মোর ধন-চোর,
কি করেছি আমি কি করেছি তোর !

“বাছারা আমার—নত্য কি তাই ?
কেমনে জানিব ? কিছু দেখি নাই !
না না, আমি মনে অল্পভবে পাই

“সুন্দর তারা—রাজার কুমার !
কিংক-ঠোটে হাসি সুধাধার !
জ্যোতিমাখা দেহ—বরণ চাঁপার !

“গভীর অঁধার ওগো উপবন,
জোনাকী নিভায়ে জালি’ খনে-খন,
কি খেলিছ তুমি ? অঁধার-গগন,

“তারা-মেয়েগুলি ছাদে দিয়া সারি
বসেছে যে—ওরা কাহার ক্লিয়ারী,—
কোন রূপকথা বড় মনোহারী

“শুনিতেছে ওরা ?—তোমাদের কাছে
হে বন গগন, চলি’ কি গিয়াছে
বাছারা আমার অপরূপ সাজে

“খেলা খেলিবারে ? তাহারা কেমন ?
আমি ত দেখিনি ।”—যুদিয়া নয়ন,
ভাবি’ ভাবি’ হেন হুয়ো নিমগন ।

নিমগন হুয়ো হৃথময় নিদে
তরুণি ভল্লম্ব, কঠিন ভূমিতে—
তরু অঁধার বসি’ চারিভিতে !

হায় হুয়োরাগি একি ছল তোর ?
কি নবীন ন্বেহে হইলি বিভোর
না জেনে না শুনে ? একি মোহধোর !

মোহে ঘুমাইয়া প’ল হুয়োরাগী ।
ছুটে পড়ে তারা, রাগে রেখা টানি—
মুছি’ কৈলে রেখা করা কার পানি !

কন্ত তারা ম’ল—রে’খা নাই কোনো—
অঁধার আকাশ !—ওকি ?—ওই শোনো
দ্বিতীয় প্রহর বাজিছে !—এখনো

ঘুমাইছে হুয়ো ?—রজনী গভীর !
এই সে প্রহর কুহকী রাতির
যবে নামে আসি’ তীরে ধরণীর

যত দেবদূত যত পরীদল—
ফুলমাঝে তুলে গড়াইয়া ফল ;—
দিবসের কাজে শিখিল বিকল

ফুল-লতা-তরু-প্রাণের মাঝার
বরষিয়া যায় ন্বেহসুধাধার ;
মধুর স্বপন নিয়ে আসে আর

ক্রান্ত পুরুষ নারীর লাগিয়া ।
তাই সবে ওঠে সকালে জাগিয়া *
নূতন উষার বরণে রাঙিয়া !

দেখে হুয়ো দেখে হরবস্বপন !
দেখে হুয়ো দেখে মধুর স্বপন :—
জাগ-জাগ’ যেন রাজ-উপবন

ভোর গোধূলীতে—‘মা-মা—’ এ ডাক
কোথা হ’তে আসে ? ডাকিছে কি কাক ?
অই ! ‘মা— !’ হুয়ো শুনিছে অবাক !

তাড়াতাড়ি ছুটে পুরুরের তীর
এল হুয়ো—তার চোখে বহে নীর ! *
অই ! ‘মা—মা—’ চাঁপা-বনানীর

আড়াল হইতে ডাকিছে মধুর !
‘মা-মা—’ উঠিছে সাতখানি সুর !
পাকল একটি দাঁড়ায়ে অদূর—

সেখার হ’তেও ‘মা—’ কে ডাকিছে ?
হুয়ো চারিদিকে চমকি চাহিছে—
চাহিছে—সঘনে হৃদয় কাঁপিছে !

একি অদ্ভুত ! একি এ আবার !
 বুক হ'তে তার ছুটি ক্ষীরধার
 পড়িছে চম্পাকুঞ্জমাঝার,
 কেন বা ছুটিছে পারুলের পানে ?
 —এবার পড়িল দুয়ের নগ্নানে—
 বাছাগুলি তার আছে কোন্‌খানে !
 কিবা সুন্দর বালকবালিকা !
 কোনো দেবতার যেন ছবি লিখা !
 পারুলচম্পাফুলেরি কলিকা !
 দাঁড়াইছে দুয়ো খামি' স্নেহভরে
 বিমুচুসমান—চরণ না সরে !
 সাত চাঁপা আর পারুল অধরে
 বর্ষিছে ক্ষীর ।—ক্রমে মুখ'পরে
 দুয়ের, উষার নবরূপ বরে,
 হাসি থেমে রয় ! ক্রমে পাখিস্বরে
 আগে চারিধার—চলে লোকজন—
 প্রভাত ! প্রভাত !—চমকি তখন...
 —হায় দুয়ো হায়, ভেঙেছে স্বপন !

কোথায় ? কোথায় ?—গভীর তিমির !
 দ্বিগুণ আঁধার !—বুকে বরে ক্ষীর,
 হুচোখে দুয়ের বাহি' পড়ে নীর !
 কোথায় ? কোথায় ?—কেবল জোনাকী
 বুজিতেছে আর মেলিতেছে আঁখি—
 নিজমনে বন খেলিছে একাকী !
 আকাশের 'পরে দীপ্ দীপ্ করি'
 তারা-বালিকার। খেলে লুকোচুরি—
 গভীর আঁধার আঁকাশ আবরি !
 কোথায় ? কোথায় ?...হায় দুয়েরাণী !
 ধৈরজ ধর সাধনা মানি' ।
 কালি প্রভাতের কিরণ-মেলানি
 বন বন ভরি' ফুটাইবে ফুল !—
 তোমারো এ নব স্নেহের মুকুল
 বিকসিবে । নাহি, নাহি তাহে ভুল !
 এ গভীর ব্যথা, আশা অশুট
 দীর্ঘি' বাহিরিবে পরিয়া মুকুট,
 নবীন কুমার স্ববর্ণকুট !

রাণীদলমাঝে হ'য়ে গরবণী
 শুনলো চম্পা-পারুল-জননি,—
 উজলিবে তব বাছারা ধরণী ।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় ।

বাজে খরচ ।

আমাদের বাজে খরচটা বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে । কোনপ্রকারে তাহাকে না কমাইলে আর আমাদের উপায় নাই । একে ত এই ভয়ানক প্রতিযোগিতার দিনে অর্থ উপার্জন করাই কঠিন, তাহার উপর যদি এই কষ্টার্জিত

অর্থটা বাজে খরচে ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে ত সোনার সোহাগা ।

আজকাল অনেক স্বদেশহিতৈষী, বাহাতে আমাদের ধনবৃদ্ধি হয়, অর্থোপার্জনের পথ প্রসারিত হয়, সেজন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া

আমাদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। পতিত জমীতে আবাদ করিয়া, জঙ্গলজাত দ্রব্যকে ব্যবহার্য্য করিয়া এবং সামান্য সামান্য শিল্পোন্নতি করিয়া তাঁহারা ধনাগমের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু কেবল অর্থোপার্জননের অভাবেই কি লোকে দরিদ্র হয়? সঞ্চিত বা অর্জিত অর্থের বৃদ্ধি ও সংপাত্রে দান (অথবা সন্ধ্যায়) করাও অবশ্য-কর্তব্য।

বার্তাশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

“অলঙ্কষ্টেব লিপেত লকঃ রক্ষদবেক্ষয়া।

রক্ষিতং বন্ধয়েৎ সম্যক বুদ্ধং তীর্থে নিক্ষিপেৎ ॥”

অর্থাৎ অলঙ্কৃত ধন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, লঙ্কৃত যত্নে রক্ষা করিবে; রক্ষিত ধন সম্যক-প্রকারে বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন সংপাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

আহার্য্য দুগ্ধল্য হওয়াতে আমাদের দেশের গৃহস্থগণের অর্থকষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আহার্য্য আমরা যত দুগ্ধল্য মনে করি, তত দুগ্ধল্য হয় নাই।

রোপ্যমুদ্রা পূর্ক্যাপেক্ষা যথেষ্ট সুলভ হওয়াতে অশ্রান্ত দ্রব্যকে আমরা অতিশয় দুগ্ধল্য বলিয়া মনে করি। ত্রিশবৎসর পূর্বে যে রাজমিস্ত্রি চারআনা পরসায় সমস্তদিন কাজ করিত, আজ সে আটআনা পরসায় কাজ করিতে ইতস্তত করে; কিন্তু যখন সে চার আনায় কাজ করিত, তখন একমন চাউলের দাম ছিল ২৮ টাকা অথবা ২৯ টাকা, আর এখন সেই চাউলের দাম ৪৮ টাকা অথবা ৫৮ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ তখন

সে সমস্তদিনের পরিশ্রমে ৪৮সের চাউলের মূল্য সংগ্রহ করিত, এখনও সে সেই সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া ৪৮সের চাউলের মূল্য সংগ্রহ করে; কিন্তু পূর্ক্যাপেক্ষা তাহার আর্থিক কষ্ট অনেক অধিক, কারণ তাহার বাজে খরচটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বাজে খরচটা যদি পিতলকাঁসার তৈজসপত্র অথবা সোনার নথ, রূপার পৈঁচাতে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে বরং মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম যে, তাহার একটা অসময়ের সংস্থান হইল; কিন্তু বাজে খরচটা কি সেদিকে হয়? তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহার সংসারে হাহাকার কেন ঘোচে না।

আমাদের পোষাকে আজকাল কত বাজে খরচ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। লেখকের পরিচিত এক কায়স্থসন্তান মাসিক ৩৫ টাকা বেতনে কলিকাতার কোন আপিসে কর্ম্ম করেন। সে বৎসর তিনি পূজার সময় তাঁহার ৭বৎসরের কন্যার জন্ম মল্লিক কোম্পানির দোকান হইতে ২২ টাকা কর একটা জামা ক্রয় করিয়াছিলেন। এত টাকা কেন খরচ করিলেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “একটা মেয়ে, আর প্রতি বৎসর ত দিতে পারিব না, তাই একবার কষ্ট করিয়া দিলাম।” যেন ৩৫ টাকার কেবলগীর কন্যার ২২ টাকার জামা একটা অপরিহার্য্য পরিচ্ছদ, তাই কায়ক্লেশে কোনরকমে একবার একটা দিলেন। না দিলে তাঁহার ৭ বৎসরের কন্যা সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না! যাহার্কৈ সাজাইবার জন্ম এই দরিদ্র অর্দ্ধভুক্ত কেরাণীর একমাসের অর্দ্ধেকেরও অধিক কষ্টার্জিত

বেতন' ব্যয় করিয়া লক্ষপতির কত্তার ব্যবহার্য্য পোষাক ক্রয় করা হইল, সে কি এই জামার মর্যাদা জানে, না, জানা সম্ভব ?

আজকাল দুর্গোৎসবের সময় পুত্রকত্তাদির পোষাকের ব্যয় দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে একটা ভয়ানক আতঙ্কের কথা হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন ? মিত্রজার কত্তার ২২ টাকার জামা দেখিয়া আমার পুত্রকত্তাও সেইপ্রকার পাইবার জন্ত আমার কাছে আদ্য করিবে, তাহার উপর যদি আবার গৃহিণীর নথনাড়া থাকে, তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই। ছেলে অথবা ছেলের গর্ভধারিণীকে প্রবোধ দিবার জন্ত ২২ টাকার সাঁচা পোষাকের পরিবর্তে অন্তত ৫ টাকা দিয়া সেইপ্রকার একটা সুঁটা জামাও আমাকে কিনিতে হইবে। কিন্তু এই পাঁচটাকা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়'। আমরা যখন বালক ছিলাম, তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা এখনকার অপেক্ষা হীন ছিল না। অথচ আমরা পূজার সময় কেন্দ্রিক ছিটের জামা পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতাম, আর আমাদের ছেলেরা এখন রেশমী জামা গায়ে দিয়াও তত সন্তুষ্ট নহে; প্রতিবাসী সমবয়স্কের রেশমী জামায় কেমন জরীর কাজ করা, তাহার জামায় ত তেমন জরী নাই ! আমাদের বাল্যাবস্থায় আমাদের সমবয়স্কগণের মধ্যে কাহাকেও বড় সাটিনের বা মধ্যমলের পোষাক পরিতে দেখি নাই, কিন্তু এখন সাটিনের কোর্ট-জ্যাকেট ও বোম্বাই কাপড়ের জালায় দেশ ছাড়িয়া পালাইতে ইচ্ছা করে। তখনকার অভিভাবকদিগের অপেক্ষা এখনকার অভিভাবকদিগের রুচি কত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তখনকার

অভিভাবকেরা বুঝিতেন যে, দরিদ্র বা মধ্য-বিভের জন্ত সাটিন-মধ্যমল নহে। বাহার সর্বদা গাড়ি চড়িয়া যাতায়াত করিতে পারেন, ভূত্যেরা বাঁহাদের পোষাকের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, তাঁহাদের জন্তই সাটিন-মধ্যমল ; কিন্তু আমরা কি তাহা বুঝি ? আমাদের আত্মমর্য্যাদার কি হ্রদশা !

পূজার সময় কলিকাতার বাজারে কত টাকার জার্মেনীজাত নকল রেশমী পোষাক বিক্রয় হয়, তাহার একটা তালিকা পাইলে বুঝিতে পারিতাম, বাঙালী কেমন বুদ্ধিমান। বস্তুত বাঙালীর বুদ্ধির দোড় যে "কতদূর, তাহা এই পোষাকের রুচিতেই বুঝিতে পারা যায়।

পূজার পর শীতবস্ত্র। আমাদের বাল্যাবস্থায় কক্ষটার কিনিতে পাওয়া যাইত না। যদি বা পাওয়া যাইত, তাহা বোধ হয় আমাদের পক্ষে হুস্ত্রাপ্য ছিল, কারণ আমরা তাহা কখন পাই নাই। তখন শিক্ষিতা-ভিমাত্রী রমণীগণ নানাপ্রকার উলের মোজা-কক্ষটার বুনিয়া স্বামিপুত্রের আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিতেন। কিন্তু এই পশমের কাজ সকলে জানিত না, তাই সকলের পক্ষে মোজা-কক্ষটার মূল্য ছিল না। অথচ বাল্যকালে মোজা-কক্ষটার বিহনে যে বিশেষ কৌন-রূপ পীড়ায় ভুগিতাম অথবা অকালে পঞ্চম পাইবার সম্ভাবনা পাঁড়াইত, তাহা ত মনে হয় না। আমরা বাল্যকালে দোলাই গায়ে দিতাম। বার আনা বা চৌদ্দ আনা একখানা দোলাই, তাহাতে বেশ শীত ভাঙিত ; এখন কিন্তু এই বিলাতি "আলোয়ান," জার্মেনী,—ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার পাটের চাদর ভিন্ন আর শীত ভাঙে

না। দোলাইগুলা মলিন হইলে সাধারণ কাপড়ের সহিত রজকালয়ে পাঠাইয়া ধোয়াইয়া লইলেই হইত, কিন্তু “আলোগান” কাচিবার জন্ত আবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

এখন জিজ্ঞাসা করি, শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত প্রতি বৎসর এত টাকার বিলাতী পাট ক্রয় করা কি একান্তই আবশ্যক? সময়ের পরিবর্তনের সহিত রুচির পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী, কিন্তু সে পরিবর্তনটা যদি অবনতির দিকে হয়, তাহা হইলে সেটা আমাদের বড় গোরবের কথা নহে।

সেদিন লেখকের একজন বন্ধু মানভূম-অঞ্চল হইতে একখানা গরদ আনাইয়া জামা প্রস্তুত করিবেন বলিয়া তিনদিন কলিকাতায় যাতায়াত করিলেন। কলিকাতায় কে একজন নাকি ভাল দরজী আছে, তাহার দ্বারা জামার ছাঁট শুদ্ধ করাইয়া লইবার জন্ত এই কর্মভোগ করিয়া তিনতিনদিন কলিকাতায় গমনাগমন! জামাটি যদি আমাদের দেশী পিরাণ বা পাঞ্জাবী হইত, তাহা হইলে এত কর্মভোগ হইত না; সে গরদে কোট হইবে। বাবুও কোট ধরিয়াছেন জামাটি ছাঁটশুদ্ধ হওয়া চাই, তা যতই কেন খরচ হউক না; অবশেষে সাহেববাড়ী পর্য্যন্ত দেখিবেন। বীটুটি শিক্ষিত,—একজন হাকিম।

কলিকাতা ও নিকটবর্তী ভদ্রযুবকদিগের পোষাকের কতটা দেশী ও কতটা বিলাতী, তাহার পরিমাণ করিলে দেখিতে পাই যে, এক পরিধানের ধুতি ছাড়া আর সমস্তই বিলাতী। জুতা ও মোজা এখন বিলাতী হইয়াও দেশী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু গেঞ্জি, শার্ট, ওয়েস্ট-কাট, কোট, কলার, নেকটাই, আল্‌ষ্টার,

এমন কি ধুতির উপর একটা নাইটক্যাপ, যে দিক দিয়া দেখি, সেই দিকেই অনাবশ্যক বিলাতী পোষাক। কেবল ধুতির জন্তই বাবুকে ফিরিঙ্গী হইতে বিভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এই সকল পোষাক ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কেবল আল্‌ষ্টারটা শীতকালেই (তাও মধ্যাহ্নেও বাদ যায় না) দেখিতে পাই। একদিন হাবড়াষ্টেশনে একজন প্রাচীন বাঙালী ভদ্রলোককে দেখিলাম, তাঁহার স্তন্যদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু দেখিয়া বোধ হয় তিনি ষাট ছাড়াইয়া সন্তরে পদ্যপর্ণ করিতে উদ্ভূত। তাহার সমস্ত পোষাক খাঁটি দেশী ধরণের;—ধুতি, পিরাণ, উড়ানী; কিন্তু মাঝে হ’তে মাথায় এক নাইটক্যাপ! এমন অদ্ভুত বিসদৃশ!

এই ত গেল পোষাকবিভ্রাট। তাহার উপর আবার আচারব্যবহার লোকলৌকিকতা আছে। কলিকাতায় নাকি পোষ-সংক্রান্তির সওগাদের পূর্বে আবার বড়দিনের সওগাদ দেখা দিয়াছে। কন্যার বিবাহের ব্যয় একটা অপরিহার্য্য-প্রলয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সে সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু বিবাহের আশুযজ্ঞিক ব্যয়গুলা, যেগুলি আমাদের বৈবাহিকেরা জেদ করিয়া খরচ করান না, সেগুলিও আমরা কত বিক্রত করিয়া ফেলিয়াছি। বিবাহের পূর্বে গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস এবং পরে ফুলশয্যা উপলক্ষ্যে আজকাল যে কিপ্রকার অদ্ভুত আদানপ্রদান হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রায় তিনচার বৎসর হইল, লেখকের পরিচিত কোন বি. এ.-ফেল-করা যুবকের

বিবাহ হয়। যুবকের অবস্থা অত্যন্ত হীন। অতি জীর্ণ হুইট কুদ্ৰ শয়নকক্ষ ও একটি তৃণাচ্ছাদিত রন্ধনশালা তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তি। যুবার বিবাহের পূর্বে তাঁহার ভাবী শ্বশুর পাত্রকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়া ভাবী জামাতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া যান, অথচ কুলশয্যাতে যুবার শ্বশুরালয় হইতে প্রায় ৪০।৪৫ জন লোকে সওগাদ লইয়া আসিল। শ্বশুরবাটীর দাসী, যে এই সওগাদ-বাহক-দিগের সর্দার হইয়া আসিয়াছিল, তাহার স্থলকণ্ঠেবরে যে অলঙ্কার ছিল, জামাতার মাতার শরীরে তাহার শতাংশের এক অংশও ছিল না। গৃহিণী তাহাদিগকে বসিবার স্থান দিতে না পারায় যার-পর-নাই লজ্জিত হইয়াছেন, এমন-সময় সেই দাসীকুলশিরোমণি বলিল, “গাড়ির রাস্তা, তাতে পাড়াগাঁ (দাসী কলিকাতা হইতে সওগাদ লইয়া আসিলেও তাহার কথার স্বর মেদিনীপুরজেলার পরিচয় দিতেছিল), সেইজন্ত মা অনেক জিনিষ পাঠাতে পারলেন না”, ইত্যাদি ইত্যাদি। কুলশয্যার সওগাদ যাহা আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে আহাৰ্য্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য ছাড়া এত অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য দ্রব্য ছিল যে, তাহার ব্যবহার দূরে থাক্, জামাতা সে সকল দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। জামাতা কখন চা-পান কিংবা চুরুট-সেবন করিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার পিতৃতুল্য শ্বশুরমহাশয় পুত্রতুল্য জামাতার ব্যবহারের জন্ত চার পেয়ালা, চামচ, রেকাব, চুরুটের বাস্, চুরুটের ছাই ঝাড়িবার পাত্র ইত্যাদি দ্রব্য দিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন

নাই। কুলশয্যার সওগাদ দেখিতে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত জনতা করিয়াছিলেন বলিয়া ভাল করিয়া সমস্ত দেখিতে পাই নাই। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে দেখিব যে, সওগাদের মধ্যে স্লাম্পেন্-গ্রাস ও ডিকাটর্ থাকে কি না। কলত মুরগী-হাটার দোকানে যাহা-কিছু কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই সেই সওগাদের মধ্যে ছিল। সেগুলি রাখিবার স্থান জামাতার গৃহে না থাকায় এক প্রতিবাদীর গৃহে সে সমস্ত সাজাইয়া রাখা হইল। সে সকল দ্রব্য কেহ কত্য়াকর্তার নিকট প্রার্থনা করে নাই, বরং তিনি দেওয়াতে জামাতাকে বিশেষ অনুরোধ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই-প্রকার শত শত টাকার অব্যবহার্য্য বিলাতী আসবাব ও খেলনা বিবাহ উপলক্ষে আদান-প্রদান হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, আজ-কাল কায়স্থসম্প্রদায়মধ্যে বিবাহ প্রভৃতিতে লৌকিকতা প্রদান ও গ্রহণ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এইপ্রকার অনাবশ্যক আদানপ্রদান বন্ধ করিতে কোন জাতি অগ্রসর হইবেন ?

আহাৰ্য্যবিষয়ে ঠিক এইপ্রকার। ৫।৬ বৎসর পূর্বে লেখকের প্রতিবাদী এক দরিদ্র গোপকন্ডার বিবাহ হয়। কন্ডার পিতা কোন ধনবানের গৃহে মাসিক দশটাকা বেতনে খানসামার কার্য্য করিত বলিয়া তাহার নজরটা মনিবের স্থায় উদার হইয়া পড়িয়াছিল। কন্ডাটি স্ত্রী বলিয়া কলিকাতার এক ধনবান গোপ নিজের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে। বিবাহের রাত্রে সেই কন্ডাতারগ্রস্ত লোকটি আহাৰ্য্যাদির যেপ্রকার আয়োজন

করিয়াছিল, তাহার প্রভুর কন্যার বিবাহে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আয়োজন হয় নাই। কলিকাতার বরযাত্রীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত সেদিন লুচি, কচুরি, পাঁপর, মাছের তিনচাররকম তরকারী এবং ক্ষীর-দধি ভিন্ন কলিকাতা বড়বাজার হইতে আনীত নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন আহারার্থি-গণের পত্নের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই কন্যাকর্তার নিজের বিবাহে বোধ হয় চিঁড়ে-মুড়কি ও দধির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১৫১৬ বৎসরের মধ্যে কাচির কি পরিবর্তন ! এই ধনি-জনে চিত্ত ভোজের ফল এই হইল যে, মনে করিলেই আমি আমার প্রতিবাসীদিগকে লইয়া আমোদ করিয়া আহাৰাদি করিতে পারিব না। আদর্শ এত উন্নত হইয়া পড়িল যে, তাহা সাধারণের পক্ষে “প্রাণ্ডলভো ফলে লোভাং” গোছ হইয়া উঠিল। কোন ক্রিয়াবশে সাদাসিধা লুচি, কুয়াণ্ডের তরকারী ও দধি-সন্দেশের আয়োজন করিলে কি প্রতিবাসীরা সন্তুষ্ট হইবেন ? তাঁহারা আমার বাড়ী কুয়াণ্ডবট খাইতে খাইতে সেই দরিদ্র গোয়ালার বাটীর কালিয়া স্মরণ করিয়া আমাকে ধিকৃত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কি ? পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব বা অন্যান্য পূজার সংখ্যা-হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ আদর্শের বিকৃতি বা কচির বিকৃতি। এখনকার পূজায় ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত শাকার খাইয়া দেবতা সন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু প্রতিবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সেইজন্য পূজায় লোকের আর প্রবৃত্তি নাই। পূর্বে লোকে ব্রাহ্মণ-বাটীতে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইত, কিন্তু আজকাল মধ্যাহ্নভোজনটা

একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। মধ্যাহ্নটা প্রায় রাত্রি ৯টা-১০টার উপনীত হইয়াছে, কারণ অধিকাংশ স্থলেই এখন অম্নের পরি-বর্তে পলাম্নের প্রচলন দেখা যায়। প্রায় সকল বাটীতেই অজ্ঞাতচরিত্র, উপবীতী ও ব্রাহ্মণনামধারী পাচকগণই রন্ধন-কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবাটীর বর্ষীয়সী গৃহিণীরা এখন আর ব্রাহ্মমূর্ত্তে গাত্রোথান করিয়া প্রাতঃস্নানসমাপনান্তে পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া পবিত্রচিত্তে প্রতি-বাসীর গৃহে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইতে যান না। পূর্বে প্রত্যেক ক্রিয়াশালী ব্রাহ্মণের বাটী একএকপ্রকার রন্ধনের জন্ত প্রতিবাসি-মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিত। গাঙুলী-দের বাটীর নিরামিষ, মুখুয্যেদের বাটীর মাছের তরকারী এবং চক্রবর্তীমহাশয়দের বাটীর পায়সের নামে নিকটবর্তী ২১১খানা গ্রামের ভোক্তাদের রসনায় জলসঞ্চার হইত। কিন্তু আজকাল মুখুয্যে, গাঙুলী, চক্রবর্তী, ঘোষাল, সকলের বাটীতেই সেই এক বিহারি-ঠাকুর সদলবলে হাতা-খুস্তি-ঝাঁজরা-হস্তে অধিষ্ঠিত হইয়া একইপ্রকার রন্ধনে সকলের তৃপ্তিসাধন করে। আমাদের খাটি দেশী শিল্পের সকলপ্রকারই প্রায় গিয়াছে,—রন্ধনশিল্পও যাইতে বসিয়াছে। এই রন্ধনশিল্পের অন্ত-র্দানে কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি না হওয়াতে দেশহিতৈষী মহাত্মারা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু তাহাতে আমাদের একটা অত্যাবশ্যক স্বত্বপ্রদ শিল্প ধ্বংস হইতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা যদি নিমন্ত্রণকর্তাকে বলেন যে, “আপনার বাটীতে আমরা বাজারে ব্রাহ্মণের

স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য গ্রহণ করিব না, আপনার পরিবারস্থ জীলোকদিগের হাতের শাকান্নও সমাদরে ভোজন করিব”, তাহা হইলে বোধ হয় রন্ধনশিল্প রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে ।

আজকাল কলিকাতা ও তৎসম্মিহিত স্থান-সমূহে অন্নরোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । এই রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভকল্পে চেষ্টার ক্রটিও লক্ষিত হয় না । ইহার কল্যাণে অনেক পেটেটওষধওয়ালা বেশ দশটাকা কামাইয়া লইয়াছেন । রোগের নিদাননির্ণয় করিতে গিয়া সকলেই নিজ নিজ ধারণার অম্লরূপ কারণ দেখাইয়া থাকেন । কারণ বাহাই হউক না, অন্নরোগের একটা সহজ প্রতিকার “মুড়ি” খাওয়া । বাজারের মিষ্টানে যে সকল স্নাত ব্যবহৃত হয়, তাহা যতদূর অপকৃষ্ট হইতে পারে, সে পক্ষে দোকানদারদিগের শৈথিল্য নাই । অভিমানী বাঙালীবাবুৱা জলযোগের জন্ত এই জঘন্য স্নাতের মিষ্টান্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন । অন্নরোগের অন্ততম কারণ এই মিষ্টান্ন-সেবা । বাহারা নিত্য “মুড়ি” খাইয়া থাকেন, অন্ন তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না । এক পয়সার মুড়ি খাইলে যে রূপ উদরপূর্তি হয়, একপোয়া মিষ্টানে সেরূপ হয় কি না, সন্দেহ ; অথচ মুড়ি খাইলে কোন পীড়ার সম্ভাবনা নাই । অনেকের ধারণা যে, মুড়ি খাইলে উদরাময় হইয়া থাকে । আমরা কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সুস্থশরীরে মুড়ি খাইয়া কখন উদরাময় হয় না । তবে উদরাময় থাকিতে মুড়ি খাওয়া না চলিতে পারে, কিন্তু মুড়ি যে সহজ শরীরে উদরাময় আনিয়া

থাকে, এ কথা অস্বীকৃত । মুড়ি খাইলে বাহাদের উদরাময় হয়, তাঁহারা যে বাজারের মিষ্টান্ন জীর্ণ করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস হয় না । অনেকে বালকগণের জন্ত বিলাতী বিস্কুট ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন । বিলাতী বিস্কুট যতদিন টিনের বাস্তুবন্দী থাকে, ততদিন বোধ হয় মন্দ থাকে না ; কিন্তু বাস্তু খুলিবার পর বাহিরের বায়ু লাগিয়া ক্রমশ তাহা খারাপ হইতে থাকে । বাসী লুচি অথবা কুটি যদি অপকারী হয়, তাহা হইলে বাসী বিস্কুটও যে অপকারী কেন হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । একটাকা-পাঁচসিকা দিয়া একবাক্স বিস্কুট কিনিয়া তাহা ১৫দিন ধরিয়া রোগীকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা যে কতদূর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম । সাধারণত বাহারা পীড়া হইবার ভয়ে বালকদিগকে বিস্কুট খাইতে দিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি বিস্কুটের পরিবর্তে তাহাদিগকে মুড়ি খাইতে দেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বালকগণের স্বাস্থ্যের অবনতি না হইয়া বরং উন্নতিই হইতেছে । কিন্তু মুড়ি পল্লীগ্ৰামের লোকে এবং দরিদ্র লোকে ব্যবহার করে বলিয়া সহরবাসী বাবুদের তাহা বড়ই ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে । একবার একজন কবিরাজ কোন ধনবানের অন্নরোগের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন । তিনি নানাপ্রকার ব্যবহার পর বলিলেন, “আপনি জলযোগ করিবার সময় কোনপ্রকার মিষ্টান্ন ব্যবহার না করিয়া মুড়ি ও নারিকেল ব্যবহার করিবেন ।” কবিরাজের ব্যবস্থা শুনিয়া বাবুর পারিষদবর্গ বলিয়া উঠিল, “বাবু মুড়ি খাইবেন ? কি বলেন আপনি ? বাবু মুড়ি

খাইবেন ?” চিকিৎসকমহাশয় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “বাবু মুড়ি খাইলে তোমরা বাবুর মাথা খাইবে কিপ্রকারে ? বাবু বিলাতী পনির খাইতে পারেন, ফিবার-মিক্‌চার ও কুইনাইন-মিক্‌চার খাইতে পারেন, কিন্তু মুড়ি খাওয়া কি বাবুর সাজে ?” সেদিন কোন বাড়ীতে দেখিলাম, একটা রাজ-মিস্ত্রি বেলা ১টার সময় জলপান খাইবার ছুটি পাইয়া এক পরসার গজ্বু কিনিয়া খাইল। কারণ মুড়ি ছোটলোকে খায় ! টাটকা মুড়ি ঈষৎ-মিষ্ট-মহযোগে খাইলে উৎকৃষ্ট বিলাতী বিস্কুট অপেক্ষা সুস্বাদু হয়।

“চা”-পান করাও আজকাল বড় প্রচলিত হইয়াছে। এই “চা”জিনিষটা বাংলার জায় উষ্ণপ্রধান দেশের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। হিমালয়-অঞ্চল অথবা শীত-প্রধান দেশে চা উপকারী হইতে পারে, কিন্তু বাংলায় এই শীতলদেশোচিত নেশা কেন প্রচারিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। যাহারা নিয়মিতরূপে প্রত্যহ চা-পান করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অজীর্ণ বা শর্দীর চির-আশ্রয় হইয়া থাকেন।

অনেক চা-সেবী অজীর্ণরোগীকে চা ছাড়িয়া দিয়া সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

বালকদিগের খেলাতেও ক্রমে ক্রমে ব্যঙ্গ-বাহুল্য দেখিতে পাইতেছি। পূর্বে “গুলি-দাণ্ডা” ছিল, এখন ক্রিকেট হইয়াছে ; পূর্বে “কপাটি” ছিল, এখন “ফুটবল” হইয়াছে। আবার আমেরিকায় (Push ball) “পুশ-বল” নামে নূতন খেলা দেখা দিয়াছে, তাহার নাকি আইনকানুন সমস্তই ফুটবলের ন্যায় ; কেবল বলটা নারিকেলের মত না হইয়া একটা সুবৃহৎ জালার মত, চার-হাত-বেধ-বিশিষ্ট। এক একটা বলের দাম ২০শত টাকা। দরিদ্র বাঙালীর ঘরেও এই খেলা শীঘ্রই দেখা দিবে, আমাদের একুপ আশঙ্কা আছে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্ না কেন, বাজ-খরচ আমাদের বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। ত্রিশবৎসরের মধ্যে যেকুণ বাড়িয়াছে, তাহাতে আর ত্রিশবৎসর পরে যে কি দাঁড়াইবে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। সমাজ-হিতৈষীদিগকে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অহুরোধ করি।

শ্রীবোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

যাত্রিণী ।

মস্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা হতো,
বাঁধন দিয়েছিল হাত,
আজ কি আছে সেটি সাথে ?

বিদায়-বেলা এল মেঘের মত ব্যোমে,
গ্রহি বেধে দিতে ছ'হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুহুটি ছেপে

ভরে' যে এল জলধারা।

আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাसे,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে

ভ্রমর যেন পথহারা ;—

সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাশী

আধেক রাঙা, সোনা আধা,

আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি

কিছুই নাহি জানি,

মাঠের গেছে কোন্ শেষে,

চৈত্রফসলের দেশে !

যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে

দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে',

মালাখানি গাঁথা সঁঝের কোন্ ফুলে

লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।

একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে !

নতুন ফুলে দেখ কানন ওঠে মেতে,

দিতেন দ্বারা করে' নবীন মালা গাঁথে

কনকচাঁপা-বনছায়ে।

মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি

প'ল কি বেণী হ'তে খসে ?

আজকে ভাবি তাই বসে !

নুপুর ছিল ঘরে

গিয়েছ পায়ে পরে:

নিরেছ হেথা হ'তে তাই,

অঙ্গে আর কিছু নাই।

আকুল কলতানে শতেক রসনার
চরণ ঘেরি' তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ ।

জানি না কি এত যে তোমার ছিল স্বরা,
কিছুতে হ'ল না যে মাথার ভূষা পরা,
দ্বিতম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ !

হেলায় বাঁধা সেই নুপুর-ছটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে কথা ভাবি তরুণে !

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সঁজ্ঞে
অনেক অবসরে কাজে !

তাহারি শেষ গান আধেক ল'য়ে কানে
দীর্ঘপথ দিবে গেছ সুদূরপানে,
আধেক জানা স্বরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুণ্ণু স্বরে ।

কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে !

ষাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ স্বর,
যে গান নিয়ে গেলে শেষে
ভাবি যে তাই অনিমেষে !

প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম ও প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যকল্পনা ।*

“কমলিনী মলিনী দিবসাতয়ে
* শশিকলা বিকলা ফণনাক্ষয়ে ।
ইতি বিবিধদধে রমণীমুগং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥”

দিবসাপগমে কমলিনী মলিনী হয়, আর
নিশাশেষে শশিকলা বিকলা হইয়া পড়ে । এই-
জন্মই বিধাতা রমণীমুখের সৃষ্টি করিয়াছেন ।
লোকের ক্রমে ক্রমেই বিজ্ঞতন হয় ।

কোন অজ্ঞাত লেখক এই উদ্ভট শ্রোকের
রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্থির জানা যায়
না ; কাজেই সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে এই ধারণা কোন
সময়ের, তাহাও নিশ্চয় জানিবার উপায়
নাই । রমণীমুখ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম ;
ইহাতে স্রষ্টার ক্রমশ বিজ্ঞতালভের পরিচয়
পাওয়া কবিকল্পনা ; কিন্তু যুরোপীয় হিসাবে
ইহা সৌন্দর্য্যকল্পনার ক্রমবিকাশ ; ধারণার
অভিব্যক্তির হিসাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।

অভূতসন্ধান ও অধ্যয়নের ফলে জানা
গিয়াছে, রমণীর মুখ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম বা
সৌন্দর্য্যের আধার, প্রাচীন গ্রীকদিগের এ
ধারণা ছিল না । এখন ইংরাজীতে Beauty
বলিলে সুন্দরী বুঝায় । গ্রীক সৌন্দর্য্য-
কল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । শারীরিক গুণের
সমন্বয়েই গ্রীকদিগের মতে প্রকৃত সৌন্দর্য্য ।
সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙ্গে মুক্তাকলের কাস্তিত্বের
মত স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট
প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত ।

গ্রীকগণ ব্যায়ামচর্চানিপুণ ছিল । তাহা-
দিগের নিকট বিকলাঙ্গ ঘৃণ্যস্পদ । খণ্ডরাজ্যে
শতধা বিভক্ত গ্রীস আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদাই
সশস্ত্র থাকিত । স্পার্টায় এই সৈনিকবৃত্তি
সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও পরিপূর্ণ ছিল । স্পার্টায়
রাজনীতিবিদ, দার্শনিক বা সাহিত্যিকের
আদর ছিল না ; বীরই সম্পূর্ণ হইতেন ।
শিশু বিকলাঙ্গ বা ঢর্কল বলিয়া বিবেচিত
হইলে তাহাকে বিনষ্ট করাই দেশের প্রচলিত
বিধি ছিল । সপ্তবর্ষবয়স্ক বালককে
জননার ক্রোড়চ্যুত করিয়া শিক্ষাগারে প্রেরণ
করা হইত । সেখানে তাহাকে বলবান ও
কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্ম চেষ্টার অন্ত ছিল না ।
শীতগ্রীষ্মে একই বেশ ; শিকার করিয়া
আহার্য্য সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল করিবার
অভিপ্রায়ে অপর্ণ্যাপ্ত আহার—এ সকল
নিয়মের মধ্যে ছিল । বালকের কষ্টসহিষ্ণুতা
পরীক্ষা করিবার জন্ম তাহাকে ডায়েনার
বেদীতে বেত্রাঘাত করা হইত । তাহার
উচ্ছ্বসিত শোণিতে বেদী সিক্ত, না হওয়া
পর্য্যন্ত সে বেত্রাঘাতের নিবৃত্তি ছিল না ।
বালিকাদিগকেও ব্যায়ামচর্চা করিতে হইত ।
বিংশতিবর্ষের পূর্বে যুবতীরা প্রায় বিবাহ
করিত না । যুবকগণও ত্রিশবর্ষের পূর্বে
বিবাহ করিতে পারিত না । কিন্তু যুবকে
তখনও সাধারণ আগারে আহার করিতে

ও নিদ্রা যাইতে হইত। ষষ্টিবর্ষবয়ঃক্রম-
কালে পুরুষ সৈনিককর্তব্যাবসানে গার্হস্থ্য-
জীবনধাপনের অবকাশ পাইত। তখন
বার্ককোর হিমবাতে যৌবনবসন্তের মুকুল
লান। শারীরিক বিকাশের যজ্ঞানলে
দাম্পত্যসুখ, গার্হস্থ্যজীবন ও জন্মের কোমল-
বৃত্তি আচ্ছাদিত প্রদত্ত হইত। গ্রীকের শরীরে
স্বাস্থ্যলাভ্য যেন ফাটিয়া পড়িত। শারী-
রিক প্রেমের ফলে তাহার অঙ্গসঞ্চালনে বা অঙ্গ-
ভঙ্গিতে অনায়াসলব্ধ সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক
হইয়া দাঁড়াইত। গ্রীসের যে সকল রাজ্যে
শারীরিক বিকাশ চরম লক্ষ্য বলিয়া
পরিগণিত হইত না, সে সকল রাজ্যেও
ব্যায়ামাগারের অভাব ছিল না। গ্রীকগণ
গ্রহকোণে বন্ধ থাকিতে ভালবাসিত না।
সূর্য্যকিরণ, মুক্তবায়ু, অনন্তপ্রসারিত গগন,
এ সকল যেন গ্রীকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও
অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ভারতবর্ষের সংসার-
বিরাগী সন্ন্যাসীদিগের মত সক্রটিস্ পথে
পথে জ্ঞান বিলাইতেন। বৃক্ষবাটিকায় প্লেটোর
শিক্ষাদানকাণ্ড সম্পন্ন হইত। দিবসে সূর্য্য-
করোজ্জ্বল নীলাশ্রতলে ও সন্ধ্যায় বিকশিত-
জ্যোতিষ্কজ্যোতি গগননিম্নে বসিয়া গ্রীকগণ
রঙ্গমঞ্চে অভিনয়দর্শন করিত। গ্রীকদিগের ভিন্ন
ভিন্ন শাখার মধ্যে সর্বপ্রধান বন্ধন—
ব্যায়ামপ্রদর্শনী। স্বাস্থ্য, বল, সৌষ্ঠবসুখমা
ও লাভ্যে প্রাচীন গ্রীকের সৌন্দর্য্যকল্পনা
নিবন্ধ ছিল। এই শারীরিক বিকাশেই তাহার
বিবেচনায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। রমণীর
সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালস্থায়ী; প্রাক-
ৃতিক নিয়মে তাহার অস্থায়িত্ব নিশ্চিত;
জীবন্তোত্ত প্রবাহিত রাধিবার জন্ত রমণীকে

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতির বেদিমূলে অর্ঘ্যদান
করিতে হয়, সেই আয়দানেই রমণীর মহত্ব
ও দেবীত্ব। কাজেই গ্রীকসৌন্দর্য্যের আদর্শ
নারীতে মিলিত না। গ্রীকগণের বিবেচনায়
শারীরিক বিকাশেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভি-
ব্যক্তি বলিয়া অনিন্দ্যসুন্দর আলিসিরাইডিসের
দোষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত না,
ঊহার সৌন্দর্য্যের কারণে ঊহার দোষের
অন্ধকাররাশিও যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত।
প্রাচীন গ্রীকের সৌন্দর্য্যকল্পনা সাগরসম্ভার
অল্পপম সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত হইত না; সে সৌন্দর্য্য-
তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্ত আপোলোর আরম্ভক
হইয়াছিল।

এই আপোলো-মূর্তি-কল্পনায় যে কত
শিল্পীর জীবনসাধনা ব্যয়িত হইয়াছে; কর্ম-
হীন দিবস ও নিদ্রাহীন নিশায় নিফল
প্রয়াসে কত শিল্পীর জীবনগ্রাসি শিথিল হইয়া
গিয়াছে; তাহা জানিবার আর উপায় নাই।
কিন্তু সেই সাধনার যে ফল—এই সুদীর্ঘ-
কালের ব্যবধানেও বর্তমান তাহা অতুলনীয়।

আপোলো সূর্য্যদেবতা। গ্রীসে সূর্য্যের
প্রভাব নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ। মহাভ্যতির
কনককিরণে জীবজগতে নিত্য জীবনসঞ্জীবিত
হইয়া উঠিত, হরিৎ প্রান্তরে কবিতাকাঞ্চন
উৎপন্ন হইত, তরু-লতা-নির্ব্বর শুষ্ক হইয়া
যাইত, কখন বা চারিদিকে বাধি বিকীর্ণ হইয়া
পড়িত, আবার কখন বা বায়ুমণ্ডল দূরীকৃত-
দূষিতপদার্থ, নির্মূল হইত। সভ্যতার
প্রথম অবস্থায় মানব যখন প্রাকৃতিক
শক্তিতে বিম্বিত হইয়া পড়ে, তখন সেই
শক্তির ক্রিয়া যে স্বতঃপ্রণোদিত, স্বতঃপরি-
চালিত ও স্বতঃসংশোধিত, ইহা তাহার

ধারণায় আইসে না। তাই সে প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাতা কর্তা করে। আবার যে দেশে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব প্রবল, সে দেশে সেই প্রাকৃতিক শক্তির কল্পিত অধিষ্ঠাতৃদেবতার পূজা সমধিক সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই নিয়মে বিচার করিয়া কেহ কেহ বলেন, হিমব্রাতা অগ্নির পূজক আর্য্যগণ হিমপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া বজ্রধর ইন্দ্রের উপাসক হইয়া পড়েন; তখন বর্ষণ ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব—শস্তোৎপাদন, গোমেষাদির আহাৰ্য্যসংগ্রহ, সবই বর্ষণের উপর নির্ভর করে। ঋগ্বেদের অগ্নির আহ্বান :—

“তুমিই আহ্বান কর যত দেবগণ,

সিদ্ধকর্মা, কীর্তিময়, সত্যপরায়ণ ;

দেবগণসাথে কর যজ্ঞ আগমন ।” (১।১।১।১।)

ইন্দ্রের আহ্বান :—

“আমাদের এই ক্ষতি করিতে গ্রহণ

হে ইন্দ্র, আপনি তুমি আইস হেথায় ;

অভিবৃত্ত হইয়াছে এ যজ্ঞে সর্বন

কর পান তৃষ্ণাতুর-গৌরমুগ-প্রায় ।” (১।১।১।১৬)

কেহ কেহ এই দুই আহ্বানের মধ্যে আর্য্যগণের হিমপ্রধান স্থান হইতে প্রান্তরে আগমনের পরিচয় পাইয়াছেন বা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, যে দেশে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব যত প্রবল, সে দেশে সেই শক্তির পূজাও তত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই প্রাচীন গ্রীসে আপোলোর পূজায় বিশেষ সমারোহ ছিল। আপোলো-নামের দুই অর্থ :—এক অমঙ্গলবিনাশক; অপর সংহর্তা। সূর্য্যদেবতা হইতে আপোলো ক্রমে নানাভাবে

পূজিত হইতেন। সূর্য্যাকিরণ অবাধগতি—সূর্য্য সর্পজ; সেইজন্য পাপশাস্তির নিমিত্ত তাঁহার পূজা হইত। সূর্য্যের সর্পজতা হইতে আপোলোর ভবিষ্যৎরক্ষাখ্যাতি। আবার সূর্য্যের জীবনাশ ও জীবনক্ষার ক্ষমতা হইতে আপোলো ঔষধের দেবতাপদে উন্নীত এবং প্রভাতাগমে জীবজগতের আনন্দকলরব হইতে ক্রমে সঙ্গীতের দেবতা বলিয়া গণিত। গ্রীকপুরাণে আপোলোর জন্মকথা এইরূপ :—খণ্ডিতা হীরার (স্কুনোর) ক্রোধানলভীতা লীটো বহুস্থানপর্য্যটনের পর ডেলসে আশ্রয়লাভ করেন। তখন জিউস্-(জুপিটার্)-পুত্র আপোলো তাঁহার গর্ভে। নয়দিন প্রসববেদনা ভোগ করিয়া লীটো আপোলোকে প্রসব করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আন্টিয়ামের নিকটে প্রাপ্ত আপোলোমূর্তি (Apollo Belvedere) বিশেষ প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় জুলিয়াস ইহা ক্রয় করিয়া পোপগদে উন্নীত হইবার পর পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিকানে সংস্থাপিত করেন। এই মূর্তি ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসগণকর্তৃক গৃহীত ও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃপ্রদত্ত হয়। অতিজগণের বিশ্বাস, এই মর্ম্মরমূর্তি দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত একটি গ্রীকমূর্তির অনুলকরণ।

গ্রীকশিল্পীর রচনার স্বন্দর মুখের স্মৃতি-বিষয়ে মনোযোগ বা চোটা দৃষ্ট হয় না। সুস্বস্ত মস্তক, দেহের সর্পজ সামঞ্জস্য, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাহ্য ও বলের শ্রী—এই সকলের সমাবেশই গ্রীকশিল্পীর সৌন্দর্য্যকল্পনার আদর্শ। সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতা—এতদ্ব্যতীতই গ্রীকশিল্পরচনার সৌন্দর্য্য। প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীকশিল্পীদিগের রচিত নারীমূর্তিতেও এই

একই কল্পনা বিকশিত । নারীমূর্তিতে পুরুষ-মূর্তির দৃঢ়তা ও শক্তিচিহ্নের অভাব ; কিন্তু আদর্শ একই—গঠন, সামঞ্জস্য ও মাধুরী (grace), ইহাতেই সৌন্দর্য্যকল্পনা নিবদ্ধ ।—সুন্দর মুখে বা অঙ্গবিশেষের বিশেষ বিকাশে বা গঠনবিশেষেই সৌন্দর্য্যকল্পনা প্রাচীন গ্রীকশিল্পরচনার লক্ষিত হয় না । প্রাচীন গ্রীসে নিম্নস্তরের শিল্পে শেষোক্ত সৌন্দর্য্যকল্পনার আদর্শ দেখা যায়—উচ্চ-স্তরের শিল্পে তাহার প্রবেশাধিকার নাই । যুগপক্ষে এই নিম্নস্তরের শিল্প বিকশিত । কিন্তু গ্রীসিক শিল্পীর রচনায় ও কল্পনায় উচ্চ-স্তরের শিল্পে সুন্দর মুখই সর্ব্বশ্রম নহে—দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ—গঠনসামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত ।

যে জাতি ব্যায়ামচর্চার সর্ব্বোচ্চ পুরস্কারই চরম বশ বলিয়া বিবেচনা করিত, যে জাতি ব্যায়ামচর্চাকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল, যে জাতির নারীরাও উলঙ্গ হইয়া ব্যায়ামচর্চা করিত, সে জাতির পক্ষে সৌন্দর্য্যের এই আদর্শই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ।

কীটস্ এই কল্পনাই কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—“যে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ, সে যে শক্তিতেও শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহাই সনাতন নিয়ম ।”

প্রাচীন গ্রীস হইতে প্রাচীন রোমের সৌন্দর্য্যকল্পনার আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, প্রাচীন রোমের সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ হইতে যে-পরিমাণ ভিন্ন, বর্তমান আদর্শের দিকে সেই-পরিমাণ অগ্রসর । শারীরিক বিকাশের যে আদর্শ প্রাচীন গ্রীসে দেখা গিয়াছে, সে আদর্শ তখনও অক্ষুর ; প্রভেদ

এই যে, গ্রীকগণ নরদেহে ও নারীদেহে সেই আদর্শের বিকাশপ্রয়াসী হইত ; প্রাচীন রোমানদিগের নিকট তাহা নারীদেহেই নিবদ্ধ—পুরুষের শারীরিক বলই সর্ব্বশ্রম, শারীরিক সৌন্দর্য্য অনাবশ্যক । প্রাচীন রোমানগণের মতেও মুখই সৌন্দর্য্যভাণ্ডার নহে ;—কোন বিশেষগঠনের আনন সমধিক আদৃত নহে । রোমান স্থাপত্যের পদে পদে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, মৈশরী ক্রিওপেট্রার সুন্দরী-খ্যাতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক । নবীনচন্দ্র ক্রিওপেট্রার কথায় বলিয়াছেন—“কল্পনা-অতীত রূপ নহে চিত্রণীয় ।” প্রতীচ্য সাহিত্যে পদে পদে ক্রিওপেট্রার সুন্দরী-খ্যাতি । “অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে” সে রূপ লিখিত । কিন্তু সমসাময়িক মুদ্রায় মৈশরীর যে প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়—তাহাতে তাহার সুন্দরী-খ্যাতি একান্তই ভিত্তিহীন—নিতান্তই কবিকল্পনা । বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, সিজারের মত নারীসৌন্দর্য্যভিজ্ঞও তাহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই ; আন্টনীর মত বহু-ভোগরত, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীনও তাহার মোহ-মুগ্ধ হইয়া তাহার আলিঙ্গনকে স্বর্গস্থ বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“Let Rome in Tiber melt, and the
wide arch
Of the rang'd empire fall ! Here is my
space.
Kingdoms are clay : our dungy earth
alike
Feeds beast as man : the nobleness of
life
Is, to do thus ; when such a mutual
pair

And such a twain can do't, in which,
I bind,
On pain of punishment, the world to
weet,
We stand up peerless.”

সুটে অঙ্কিত চিত্রাদির মত যে সকল চিত্রে মৈশরীকে সুন্দর মুখের অধিকারিণী বলিয়া বোধ হয়, অভিজ্ঞদিগের মতে সে সকল চিত্রের প্রাচীনত্বগোরব ভিত্তিহীন।

রোমান্ ভাস্কর্য্য সন্ধান করিয়া অভিজ্ঞগণ যে আননে সৌন্দর্য্যাদীপ্তি দেখিয়াছেন, সে, জ্ঞানন নারীর নহে—বালক আটিনোয়াসের। এই মূর্ত্তিও পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিকানে রক্ষিত।

প্রাচীন শিল্পে মুখে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ইটালুকান শিল্পীর রচনা। অরভিটোর নিকটে ভূগর্ভে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের যে মুখের চিত্র দেখা গিয়াছে, তাহার সহিত ফরাসা শিল্পীর সৌন্দর্য্যকল্পনায সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

প্রাচীন রোমান্গণ সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে ঐক্য আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল; কেবল নারীতে সেই আদর্শের বিকাশদর্শনপ্রয়াসী হইত। তাহাদের মতে দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ। ক্রমে যখন, রোম বিলাসপ্লাবনে প্রাবিত হইয়া গেল—নিত্য নব উপাদানে রোমানের বিকৃত বিলাসবাসনা তৃপ্ত হইতে লাগিল, তখন কচিরও বিকার আরম্ভ হইল। তথাপি তখনও রোমে গ্রীসের সৌন্দর্য্যকল্পনার ভিত্তি অপমৃত হইয়া যায় নাই।

প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোম হইতে প্রাচীন ভারতে শিল্পে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সন্ধান করিলে, বিক্ষিপ্ত উপাদান ও বিরোধী

মতের মহারণ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। মনীষী মেকলে আপনার অভ্যস্ত মূললিত ভাষায় হিন্দুশিল্পের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, “হিন্দুর পৌরাণিককাহিনী (Mythology) এতই অসম্ভব যে, তাহাতে জন্মের বিকার অবশ্যস্বাভাবী। হিন্দু ধর্ম্মমত,—বিজ্ঞান বা শিল্প কিছুই অমূল্য নহে। হিন্দুর দেবসমষ্টির (Pantheon) মধ্যে সন্ধান করিলে কুতাপি প্রাচীনগ্রাক্‌মন্দিরদ্বাসী সুন্দর ও মহাবপূর্ণ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে না। All is hideous, and grotesque and ignoble.” অনাস্ত সমালোচনার অমূল্যবীক্ষণতলে মেকলের আপাতরম্য রচনার বহু ত্রুটি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ফ্রেডরিক্ হ্যারিসন্ বলিয়াছেন, “মেকলের মতে ইতিহাস,—কবিতা ও দর্শনের সংমিশ্রণ; কিন্তু কার্য্যত তিনি কবিতার পরিবর্তে বাক্য-বিস্তার ও দর্শনের পরিবর্তে কিংবদন্তীর ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার ইংলণ্ডের ইতিহাস “is a compound of historical romance and biographical memoir.” হিন্দুর পুরাণসম্বন্ধে মেকলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্থান নষ্ট করা অনাবশ্যক। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সত্ত্বেও একটি অতি প্রাচীন বিশ্বাস সম্বন্ধে যে নিঃসঙ্কোচ কথ্যতা দিয়াছেন, তাহা Missionary slanderকেও পরাভূত ও নিশ্চত করিয়াছে। হিন্দুশিল্পের নিন্দাবাদ করিবার সময় মেকলে যে যথেষ্ট স্নানসন্ধান ও আলোচনা না করিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের স্বতন্ত্র বিকাশ বিশেষ প্রশংসনীয়

নহে ; তত্ত্বভেদের সংমিশ্রণনৈপুণ্যেই ভারতীয় শিল্পের কৃতিত্ব । প্রাচীন যুগে পার্থেনন ও মধ্যযুগে রিমস কেথিড্রাল যে শিল্পের আদর্শ, প্রাচীন ভারতে সেই শিল্পই সম্যক বিকশিত হইয়াছিল । যে শিল্পবিকাশ গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া বেলজিয়াম পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তাহার যথেষ্ট আলোচনা ব্যতীত যুরোপীয়ের পক্ষে প্রাচ্যশিল্পের রসগ্রহণচেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র । কিন্তু মেকুলে যে গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন, উপহৃত উপাদানের উপা-গম্যতা ও অনাবিল অভিজ্ঞতার অনধি-গম্যতা বিবেচনা করিয়া তাহা ওয়েষ্টমেকট ও ম্যাক্সমুলারে মার্জ্জনীয় হইলেও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক Lubke'র মত ব্যক্তিতে নিতান্ত নিন্দনীয় । একান্ত হৃৎখের বিষয়, অধ্যাপকও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, হিন্দু-ধর্ম্ম যখন নিন্দনীয়, তখন ভারতীয় plastic শিল্পও নিন্দনীয় । ব্রাহ্মণগণ যখন জগৎকে মায়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন কোন্ উত্তেজনার উদ্ভেজিত হইয়া শিল্প দৈনিক-জীবনের বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইবে ? প্রশ্নের স্থানে অধ্যাপক দশমুণ্ড রাবণকে হিন্দুর দেবতা (!) বলিয়াছেন । যেখানে অভিজ্ঞতার অভাবে কল্পনার শরণ লইতে হয়, সেখানে একরূপ ভ্রম বোধ হয় অনিবার্য্য । যুরোপীয় লেখকদিগের এইরূপ অভিজ্ঞতার অভাব যেস্তারতর্ঘ্যসম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । আরও হৃৎখের বিষয়, যথেষ্ট আলোচনার অভাবে এই সকল ভ্রান্ত মত যুরোপীয়প্রভাবপুষ্ট আমাদের নিকটও প্রবলতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ।

গ্রীকশিল্প ও হিন্দুশিল্পের একটি প্রধান প্রভেদ এই যে, গ্রীক যেখানে অভ্রান্ত ও সুবিস্তৃতের প্রতি দৃষ্টিশীল, হিন্দু সেখানে বৈচিত্র্য ও বাহ্যিক রচনায় সচেষ্ট ।

ভারতীয় শিল্প হইতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ নির্ধারণের শূর্বে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । একদল শিল্পসমা-লোচক ভারতীয় শিল্পকে বিদেশীয়-প্রভাব-পূর্ণ পরাক্ষপুষ্ট প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট । তাহাদের মতের আলোচনার স্থান এন নহে । তবে একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী শিল্পের প্রভাবলেশশূন্য ভারতীয় শিল্পের অভাব নাই । সে সকলে বিদেশী প্রভাব কল্পনা করিবার অবসরমাত্র নাই । অভিজ্ঞ ভক্তার ফাগুসনের মতে ভারতীয় স্থাপত্য খাদীন বলিয়া এবং ভিন্নদেশীয় স্থাপত্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের বলিয়া নিদ্রিষ্ট হইয়াছে । তিনি প্রাচীন হিন্দুশিল্পকে পঞ্চদা বিভক্ত করিয়াছেন—(১) স্তম্ভ, (২) স্তূপ, (৩) রুতি, (৪) চৈত্য, (৫) বিহার । এই পঞ্চ বিভাগের মধ্যে কোন্ ভাগ বিদেশীপ্রভাব-পুষ্ট ? কোন্ ভাগে বিজাতীয় প্রভাব মুদ্রিত ? ভিন্নভিন্নদেশীয় শিল্পের সহিত তুলনার পর সুধা রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, "Whatever the origin or the age of ancient Indian architecture, looking to it as a whole it appears perfectly self-evolved, self-contained and independent of all extraneous admixture. It has its peculiar rules, its proportions, its particular features,—all bearing impress of a style that has

grown from within,—a style which expresses in itself what the people, for whom and by whom, it was designed, thought, and felt, and meant, and not what was supplied to them by aliens in creed, colour and race.” হিন্দুশিল্পগ্রন্থের প্রাচুর্য ও বিবিধ গ্রন্থে তাহার শিল্পরচনার নিয়মের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক পাঠককে রামরাজের *Architecture of the Hindus* এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Antiquities of Orissa* গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বুদ্ধগয়া ও বারহতের বৃত্তিতে (২০০ খৃঃ পূঃ) বিকশিত ভারতীয় বিজাতীয় প্রভাবের লেশ-মাত্রবজ্জিত—হিন্দুশিল্পের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নাক্তিত। সাক্ষীর তোরণ বিচিত্রভাস্কর্যভারাক্রান্ত। বুদ্ধের জীবনের ইতিহাসের বহু চিত্র ব্যতীত, সেই সকল তোরণে আহাৰ, পান বা প্রেমালাপে রত মানব ও মানবীরও অভাব নাই। গাঙ্কার ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শিল্পে যদিবা বিজাতীয়-প্রভাবকল্পনার অবকাশ থাকে, বোধাই হইতে উড়িয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশের শিল্প বিজাতীয় বা বিদেশীয় প্রভাবলেশ বর্জিত। এই সকল শিল্পস্থিতিতে বিজাতীয় বা বিদেশীয় প্রভাব কল্পনার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এই সর্বত্র শিল্পরচনার আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের আদর্শ বুঝিবার চেষ্টা করাই সম্ভব।

এই সকল শিল্পরচনা হইতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের আদর্শ বুঝিতে বিলম্ব ঘটে না। রমণীই যে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের আদর্শ, তাহাতে আর সন্দেহ

করিবার অবকাশ নাই। পুরুষমূর্তি-রচনায় শিল্পী কোথায়ও স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই, সর্বত্রই স্বভাবের অনুগমন করিয়াছেন। কিন্তু নারীমূর্তিরচনায় তাহা হয় নাই, সেখানে সৌন্দর্যরচনার সচেতন চেষ্টার কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াছে, কবিত্বসিক্তির মায়াশিল্পীকে দেখে কোন কোন অংশের রচনাকালে প্রাকৃতিক স্ফাটনের প্রতি অন্ধ করিয়াছে। হিন্দু-শিল্পীর নারীমূর্তিতে স্তন স্বাভাবিক হইতে পীনতর, নিতম্ব স্বাভাবিক হইতে পণ্ডতর, কট স্বাভাবিক হইতে ক্ষীণতর এবং নয়ন স্বাভাবিক হইতে দীর্ঘতর। এই সকল বিশেষত্ব কোথাও অপেক্ষাকৃত অল্প, কোথাও অত্যন্ত অধিক—কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান।

রাজা রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার শিল্পসম্বন্ধে একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে সকল শিল্পরচনায় এই সকল আতিশয্য লক্ষিত হয়, সে সকল উড়িষ্যার শিল্পের উৎকৃষ্ট রচনা নহে। কিন্তু তিনি যাহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার সংখ্যা একান্ত অল্প। এইরূপ আতিশয্য প্রায় সকল নারীমূর্তিতেই বিদ্যমান; তবে কোথাও তাহাকে “Full swelling luxurious softness of forms” বলিয়া গ্রহণ করা যায়—অল্পতম তাহাকে স্বভাবের ব্যতিক্রম ব্যতীত অল্প কিছু বলা হুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বাক্ষমচন্দ্র উড়িষ্যার এই সকল নারী-মূর্তিকে “পাবরযৌবনভারাবনতা” বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই পাবরতা স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

বন্ধের অতিপীনতাসম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার জলবায়ুর প্রভাবে শিলামূর্তিতে যাহা সহসা অস্বাভাবিক বোধ হয়, প্রকৃত জীবনে তাহা প্রকৃতই স্বাভাবিক । কিন্তু রাজার মত স্বদেশের প্রাচীন কীর্তিতে অসাধারণপ্রকৃতিবান্ ব্যক্তিও নিত্যের পৃথুতা, কটির ক্ষীণতা ও নয়নের অতি-বিস্তৃতি সম্বন্ধে উড়িষ্যার শিল্পীর ক্রটি অস্বীকার করিতে পারেন নাই ।

আবার উড়িষ্যার জলবায়ুর প্রভাব ও মহারাষ্ট্রদেশের পূর্বসীমার জলবায়ুর প্রভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । অথচ উড়িষ্যার শিল্পসম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সে সকল অঙ্গণ্টার শুভাচিত্রসম্বন্ধেও প্রযোজ্য । সেখানেও পুরুষচিত্রে অনায়াস স্বাভাবিকতা ও নারীচিত্রে সৌন্দর্য্যরচনার সচেত্বে চেষ্টা পরিস্ফুট—সেখানেও নারীমূর্তিতে উড়িষ্যার নারীমূর্তিতে লক্ষিত বিশেষত্বসকল বর্তমান । সে সকল চিত্রেও নারীমূর্তিতে নয়ন অত্যন্ত বিস্তৃত । ভারত গভর্মেণ্টের আদেশে কৈম্বাই শিল্পবিজ্ঞানায়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিষ্টার গ্রিফিথ্‌স্ অঙ্গণ্টাশুভা-চিত্রাবলী-সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—“An exaggeration of the feminine hip and breasts has ever been a snare to the Hindu sculptor, who seems to think more of the conventional phrases of poetry than of the actual form.” এই সকল চিত্রে শিল্পী কি স্থলরূপে মানবহৃদয়ের শত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । শিল্পীর ক্ষমতায় অবিশ্বাস করিবার অবকাশমাত্র নাই । কিন্তু

সৌন্দর্য্যরচনার পরিস্ফুট চেষ্টার কল্পনা বাস্তবকে অবহেলে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ।

এই নারীমূর্তিতে সৌন্দর্য্যবিকাশকল্পনার প্রভাব ভারতে শিল্পীকে এমনই অভিভূত করিয়াছিল যে, পুরুষের দেহে সৌন্দর্য্যরচনাকালে তিনি দেহের গঠন নারীস্বকুমার করিয়াছেন । প্রমাণস্বরূপে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে কার্ত্তিকেয়মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে । কার্ত্তিকেয়ের অলঙ্কার, মালা ও বসন বিষয়ে শিল্পী অসাধারণ মনোযোগ দান করিয়াছেন ; কিন্তু দেবসেনাপতির দেহ নারীদেহেরই মত । বাহু, চরণ, বক্ষ ও স্বন্ধ সবই পরিপূর্ণ-কোমল, মাংসল । শিল্পীর পক্ষে নারীদেহে সৌন্দর্য্যবিকাশের চেষ্টা এতই অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, নরদেহে সৌন্দর্য্যবিকাশের চেষ্টা করিবার সময় তিনি নারীদেহে অভ্যস্ত আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন—দেবসেনাপতির দেহে শক্তির ও পুরুষের বিকাশের কথা বিস্তৃত হইয়াছেন ।

সাক্ষী ও অমরাবতী উভয়স্থানেই উল্লঙ্গ পুরুষমূর্তির গঠন সম্বন্ধে বর্জিত, ভুবনেশ্বরেও নগ্ন পুরুষমূর্তির সংখ্যা অধিক নহে । কিন্তু এই তিন স্থানেই প্রায়-সকল নারীমূর্তি নগ্ন । শিল্পী যে স্থানে সৌন্দর্য্যস্বজনে ব্যস্ত, সে স্থানে আবরণ দিয়া তিনি সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা ফুট করিতে অসম্মত ; শিল্পীর মানসকল্পিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ কেবল “সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ” ধারণ করিয়া আপনার পূর্ণতা ও লাভ্য নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছে । এই সৌন্দর্য্যকল্পনার বিকাশ কেবল নারীমূর্তিতে—নরদেহে নহে ।

মূলের সহিত পরিচয়ের অভাবে আমরা প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের সৌন্দর্য-কল্পনার আলোচনাকালে সাহিত্যের আলোচনা করি নাই। সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা করিলে লক্ষিত হইবে, প্রাচীন ভারতের শিল্পে যে সৌন্দর্য্যকল্পনা লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শিল্পের অঙ্গে ও পুস্তকের পত্রে—শিল্পীর রচনায় ও কবির কল্পনায় একই আদর্শ পরিস্ফুট। বেদে উষার বক্ষ অব্যবহিত করিবার দৃষ্টান্ত অনেকেরই স্মরণ হইবে। সংস্কৃতসাহিত্যে পুরুষের বর্ণনা যে নাই, এমন নহে—

“বৃটোরকো বৃষস্বকঃ শালগ্রামশুমহাহুজঃ।

আয়কর্ষক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাস্রিতঃ ॥”

কিন্তু পুরুষের পক্ষে দেহের সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য নহে, সঙ্গুণই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। একটি শ্লোকের একটি চরণে দিলীপের রূপ বর্ণনা করিয়া, কবি পুরবর্তী সপ্তদশ শ্লোকে তাহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষের রূপ-বর্ণনার অপেক্ষা নারীর রূপবর্ণনায় যে কবির আনন্দ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি পুরুষের গুণবর্ণনায় ও নারীর রূপ-বর্ণনায় বর্ণনা ছইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পুরুষের গুণ ধ্বংসার যোগ্য, নারীর রূপ চিত্তবিমোহন।

ঃরঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় বহুদিগ্দেশাগত রাজা ও রাজপুত্রদিগের বর্ণনা আছে। সমাগত প্রার্থীদিগের বর্ণনায় “পুংবং প্রগম্ভা” মনন্দা যে তাহাদের রূপের বর্ণনা করে নাই, এমন নহে। অঙ্গ-অধীশ্বর “সুরাজনাপ্রার্থিতযোবনক্ৰী”। তাহার পর—

বিশাল-উরস হের অবন্তি-ঈশ্বরে
সুগোল হক্ষীণ কটি, দীর্ঘবাহুধর;
বিষকম্পা শানবস্ত্রে শানিলে ভাস্করে
হয়েছিল শোভা তাঁর এমনি হৃদয়।

অনুপরাজ “প্রিয়দর্শন”; নাগপুরপতি “রূপে দেবতাসমান”; অঙ্গ “সর্দীবয়বানবন্ত”। কিন্তু ইহাদের বংশ, যশ ও শৌর্য্যবীৰ্য্যাদি গুণাবলীর বর্ণনার নিকট সৌন্দর্য্যবর্ণনা নিস্ত্রভ।

গভীরস্বভাব এই মগধের পতি,
শরণাগতের ইনি আশ্রয়ের স্থান;
প্রজার রক্তনে লক্ষপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতি,
সার্বক ধরেন রাজ্য ‘পরম্প’ নাম

* * * *

“অবিশ্রান্ত যজ্ঞ বত অশুষ্ঠান করি
আনেন নিরত রাজা ইন্দ্রে আহ্বানিয়া,
ইন্দ্রাণীর পাতুবর্ণ-কপোল-উগরি
“মন্দারবিহীন কেশ রহে ছড়াইয়া।

অঙ্গ-অধীশ্বর-সম্বন্ধে :—

এই রাজ্য অরিকুলে করিলে সহায়
মুক্তাকল কেলি কাদে তাহাদের নারী,
বিনাহুত্রে গাথা যেন মুক্তার হার
শোভিল তাদের বক্ষে কিবা মনোহারী।

অবন্তি-ঈশ্বর :—

মুক্কার্ধে যখন রাজ্য করেন গমন
অবধুরে ধূলিরাশি উড়ি ঘনাকারে
সামন্তবৃপতিদিগে মণি হুশোভন
লুপ্ত করে প্রভা তাঁর ঘন অন্ধকারে।

অনুপরাজ—

বেদজপতিতসেবী এই নরপতি;
লক্ষ্মীর ‘চকলা’ আখ্যা আধারকারণ—
সে কলঙ্ক দূর তাঁর করিয়া হুহুতি।

* * *

মুক্তকালে অগ্নিদেব সহায় ইহার।

যজ্ঞাহুষ্ঠানতৎপর শূরসেন-অধিপতি—

হিমাংশুর সম কান্তি নরনরঞ্জন
বিস্তার করেন রাজা শোভি নিজপুর ;
অসহস্রতাপে রিপু করে পলায়ন—
বিজন ভবনে তা'র জন্মে তৃণাহুর ।

* * *

গরুড়ের ভয়ে মণি দিয়া উপহার—
কালিয় যমুনাবাসী লইল শরণ ;
শোভিতেছে সেই মণি বস্কেতে ইহার
লাঞ্ছিয়া মাধববস্কে কোম্পিতরতন ।

কলিঙ্গরাজের—

হেরি' মোকর্বাচিল করে এই হয় মনে
রিপুরাজলক্ষ্মী যবে জিনিলা নৃপতি—
সকলজল অশ্রুধারা ফেলি হুলোচনে
কাদিয়াছে মনোহরখে বন্দীকৃত্য সতী ।

নাগপুরপতি—

হরকাছে দিয়া অস্ত্র লভিলা রাজন ;
জনহানি-আক্রমণ শঙ্কিয়া অন্তরে
রাজা সনে সন্ধি অগ্রে স্থাপিয়া রাবণ
হরেশ্বরে জিনিবারে গিয়াছিল পরে ।

যাঁহার জন্ত এই রাজসমাগম, কালিদাস
ঊহা'র বর্ণনা করেন নাই—কেবল কোথাও
অনন্দের সম্বোধনে, কোথাও বা কোন
রাজার নিকট হইতে গমনশীলার প্রতি একটি
সুপ্রযুক্ত বিশেষণে—কয়টি রেখার—মনোজ-
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । তিনি—
তরী, রক্তাক্র, তামরসান্তরাভা, সুদতী,
সুন্দরী, আবর্ভমন্ডোজনাভি, অবালেন্দুখী,
চকোরাকী, রোচনাগৌরশরীরবষ্টি, ইন্দু-
প্রভা, অরালেক্ষী, করভোপমোক্ষ । ইহার
পর অষ্টম সর্গে নারদের বীণাপ্রচ্যুত
মালা ইন্দুমতীর সুজাতোক্তনকোটিতে
স্থিতিপ্রাপ্ত হইল । শোককাতর অজের

বিলাপেও এই সকল কথা গুনরক্ত
হইয়াছে ।

রাজকাক্সন্তের অকুণ্ঠিত আদরে পালিতা
ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভা হইতে স্বচ্ছন্দবর্দ্ধিত-
তরুলভাশ্রিত, হোমধূমগন্ধামোদিত তপোবনে
প্রবেশ করিলেও এই আদর্শ দৃষ্ট হইবে ।
সেখানেও প্রিয়ংবদা অতিপিনক বকল-বন্ধন-
পীড়িতা শকুন্তলাকে সে পীড়ার জন্ত যৌবনা-
রসের প্রতি তিরস্কার করিতে বলিতেছে ।
আর বৃকাস্তরালবর্তী ছয়স্ত সেই বকলবসনা-
বৃত্তাকে পাণ্ডুপত্রোদরপিনক কুমুমের সহিত
তুলনা করিতেছেন ।

মানবসমাজ ত্যাগ করিয়া কবিকল্পিত
ভিন্ন জীবজগতে প্রবেশ করিলেও এই আদর্শ
লক্ষিত হইবে । শাপাঙ্গগমিতমহিমা বিরহ-
তাপক্লিষ্ট যক্ষের বিরহকে অবলম্বন করিয়া
কালিদাসের প্রতিভা যে সৌন্দর্য্য রচনা
করিয়াছে, জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা
নাই । জগতে নিত্যসত্য বিরহবেদনার
এই সঙ্গীত সর্বত্র আদৃত । মেঘদূতের তিন-
খানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ;
বঙ্গানুবাদ আটখানি দেখিয়াছি, সম্ভবত
আরও আছে । এই অমর বিরহকাব্যের
প্রাণস্বরূপিণী, পতিবিয়োগরিধুরা, শিশির-
মথিতা পদ্মিনীর দশাগ্রস্তা, প্রবলরুদিতোচ্ছূন-
নেত্রী, বিরহবিশীর্ণা যক্ষবনিতার বর্ণনা বিরহ-
বিধুর পঙ্কীধ্যাননিরত যক্ষের কথায়—

পক-বিষাধর-ওষ্ঠী, তনু, স্ত্রামা, শিখরদলনা,
কীর্ণমধ্যা, নিরনাভি, চকিতহরিণীমনমনা,
জ্যোতীভারমলা গতি, স্তোকনত্রা স্তনযুগভারে ;
প্রথম রচনা বৈ বতনে স্থজিলা ধাতা ভারে ।

এখানে সেই একই কল্পনা পরিফুট ।

প্রাচীন ভারতের কবিকল্পনা দেবীকেও এই সৌন্দর্য্যসম্বন্ধিতা করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছে। মানব দেবতার কল্পনাতেও বড় সহজে আপনাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক টেন বিখ্যাত Paradise Lost কাব্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা মানবের সীমাবদ্ধ কল্পনার দেবতা ও দেবত্ব রচনার প্রয়াসের উপর তীব্র কশাঘাত—“The Hindoo sacred poems, the Biblical prophecies, the Edda, the Olympus of Hesiod and Homer, the visions of Dante, are glowing flowers from which a whole civilisation blooms, and every emotion vanishes before the lightning thought by which they have leapt from the bottom of our heart.” কিন্তু মিশ্টনের জিহোভা যেন প্রথম জেম্‌স্‌! মিশ্টনের ঈশ্বর “a business man, a schoolmaster, a man for show!” দেবদূতগণ পর্যায়ক্রমে তাঁহার সিংহাসন-সমীপে তাঁহার যশোগান করে। ঈশ্বর বেচারার কি ছুঁই জীবন! অনন্তকাল ধরিয়া আপনায় যশোগান প্রবণ করা কি কষ্টকর!

কালিদাস “কুমারসম্ভব”কাব্যে ভবেশ-ভাবিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। যৌবনাগমে পার্কীতীর দেহ স্বর্যাংগভিন্ন শতদলের শোভা ধারণ করিল। তাহার পর পার্কীতীর রূপ-বর্ণনায় হিন্দুশিল্পীর সকল রচনার বিশেষত্ব বর্তমান। অকুণ্ঠনখপ্রভা রক্তিমোদগারিণী, তাহাতে চরণদ্বয় স্থলপদ্মের ত্রী আহরণ করিতেছে; গতি

মরালগতির মত; উরুর উপমা নাই, কারণ কবিকরচর্য্য কর্কশ—কদলীতরু বড়ই শীতল-স্পর্শ; কাকীপুণহান—মহেশের অঙ্কলক্ষ্মীরই উপযুক্ত; মধ্যদেশ বেদির মত; উরোজঘুগলের মধ্যে যুগলসুত্র পর্য্যন্ত সঙ্করিতে পারে না; বাহুযুগ শিরীষাধিকমুকুমার; নয়ন হরিণীর নয়নেরই মত; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পর উপাসিকা পার্কীতী উপাসিতের সমীপ-বার্তিনী হইতেছেন। উপাসিত সংসারবিরাগী শত্ৰু—যাহার সামান্য চিন্তাচঞ্চল্য উৎপাদনের পাপে কাম ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই মহেশ্বর। কাজেই কালিদাস সঙ্গীর্ণবুদ্ধির মত এস্থলে পার্কীতীর রূপবর্ণনার প্রবৃত্তি হন নাই। কিন্তু “প্রিয়েষু সৌভাগ্যকলা হি চাক্রতা”—এইজন্ত কোথাও আভরণের বর্ণনায়, কোথাও বাসের বর্ণবর্ণনে, কোথাও স্নগন্ধিনিধাসলুক ভ্রমরের শীলার কথায়—সে রূপের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতেই সে রূপরাশি বর্ণিত হইয়াছে—

বাসন্তকুহুম দেখে শোভে হুকুমার—
পদ্মরাগ উপেক্ষিয়া অশোক উজল,
স্ববর্ণের ছাতিসম শোভে কর্ণিকার,
সিদ্ধুবার লতিয়াছে মুকুতার হল।

শুনতারে দেহলতা ঈষৎ আনতা।
বালার্ক-বরণ বাস শোভে অন্নপূর্ণের
পর্যাপ্তকুহুমরা পরলিতা লতা
সঙ্করিছে দুই যেন পবনের ভরে।

কেশের রচিত কাকী নিভেছের পয়ে,
প্রত হ'লে করে বাল্য করিছে ধারণ,
উপযুক্ত স্থান যেন বিচারি অন্তরে
অজ্ঞতার গুণ কাম করিয়া রক্ষণ।

হুসনি নিখালবারে পিরানী প্রবল
বিষাধরসন্নিহিতে সঙ্করে চক্করী
কণে কণে চমকিছে নয়ন চক্কল
নিবারে তাহারে বালা লীলাপন্ন ধরি ।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্য উভয়ের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে—প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যকল্পনা নারীদেহকে অবলম্বন করিয়া শিল্পে ও সাহিত্যে—দেবালয়-প্রাচীরে ও রত্নমঞ্চে,—শিলা-অঙ্গে ও পুস্তক-পত্রে অজস্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে ! প্রাচীন ভারতের স্নন্দরের আদর্শ পুরুষে নহে—নারীতে ।

ইহা ভারতীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্য—এবং ভারতীয় শিল্পের মৌলিকতা—তাহার দেশজ-রসের প্রমাণ । অবাস্তব হইলেও এইস্থানে আর একটি কথা কহিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না ; প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে স্নন্দরমুখ সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া বিবেচিত হইত না ; প্রাচীন ভারতে স্নন্দরমুখ রচনার ও বর্ণনার যথেষ্ট চিত্র বিদ্যমান ।

• ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পের আদর্শও ভিন্ন

ভিন্ন । দেশকালপাত্রভেদে শিল্পের আদর্শও পরিবর্তিত হয় । শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজের প্রভাবে শিল্পীর সৌন্দর্য্যকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয় । ফরাসীলেখক গীদ মৌপাসা বলিয়াছেন, জনসাধারণ শিল্পীকে বলে—এ দাঁও, ও দাঁও ; কেবল জনকয়েক chosen spirits বলেন, তোমার স্রবিধা বুঝিয়া যে কোন আকারে স্নন্দর কিছু দাঁও । বাস্তবিক শিল্পী আপনার সমাজ, সময়, শিক্ষা ও সংস্কার অনুসারে যে আকারে আপনার মানসবিকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার উৎকর্ষসাধনই তাঁহার জীবনসাধন হইয়া দাঁড়ায় ; সেই উৎকর্ষেই তাঁহার বিচার যুক্তিযুক্ত—তাহাই প্রকৃত পছন্দ । প্রকৃত শিল্পপ্রতিভা যে আকারেই আপনার কল্পনাকে বিকশিত ও সার্থক করিতে চেষ্টা করে, সফল হইলে তাহাকেই দিব্যদীপ্তিসমুজ্জ্বল—স্নন্দর করিয়া তুলে । তাহার সাফল্য তাহাতেই । সৌন্দর্য্য-কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সার্থক সৌন্দর্য্য-মাত্রই উপভোগ্য—চিন্তাবিমোহন—“ A thing of beauty is a joy for ever.”

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ।

ইচ্ছা ।

কর্ম মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম । মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন কোন-না-কোন-প্রকার কর্মসম্পাদন করিয়া যায় । আমরা বাহ্যকে বিশ্রাম বলি, তাহাতেও কর্ম-শীলতা বর্তমান আছে । শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদয়ের

স্পন্দন, মস্তিষ্কের ক্রিয়া, হস্তপদসঞ্চালন প্রভৃতিও কর্ম । সুতরাং জীবনে কর্মশ্রোত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে । সেই কর্ম-শ্রোতের উল্লুখ চেউগুলি কেবল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই সেগুলি

আমরা 'কর্ম' নামে অভিহিত করি। আর যে অন্তঃপ্রোত আমাদের নিবিড় বিশ্রামের মধ্যেও অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে, তাহার দিকে সহসা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। মানুষ যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তখন সে স্রুগমীন হ্রদের জায় প্রতী মান হইতে থাকে। কিন্তু সে হ্রদের মুহূর্তকাল্পন কখনও একবারে তিরোহিত হয় না। চিন্তার সময়ে মস্তিষ্কের যন্ত্র অনবরত ফ্রিয়া করিতে থাকে। নিদ্রার সময়েও সে ফ্রিয়ার বিরাম নাই। স্বপ্নদর্শন ত নিদ্রার নিত্যসহচর। তত্ত্বিন্ন হস্তপদাদিসঞ্চালন, পার্শ্ব-পরিবর্তন এবং মশকনিবারণ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, নিদ্রিতাবস্থায় চৈতন্ত্যের একেবারে বিলোপ হয় না। চৈতন্ত্য তখনও ফ্রিয়া করিতে থাকে। ঘুমন্তশিশুর হাসি এবং অভিমানফুরিতাধর দেখিলে মনে হয়, ঘুমের ঘেন একটি রাজ্য আছে। আত্মা সেখানে জাগ্রত জীবনের পুনরভিনয় করিয়া হাসি ও অশ্রুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কর্ম এক জীবনব্যাপী সাধনা—জীবনে তাহার ইয়ত্তা নাই, শেষ নাই, বিনাশ নাই। কর্ম জীবনের ধর্ম। কর্মময়ই জীবন অথবা জীবনই কর্ম। কর্মশৃঙ্খলপন্নপায় জীবন গাঁথা; কর্মবন্ধনে জীবন বাধা; এই কর্মগ্রন্থি যেদিন টুটিয়া গেল, সেদিন জীবনের গ্রন্থও সমাপ্ত হইল। অনন্তজীবনের কথা বলিতেছি না। পার্থিব জীবন এবং পার্থিব কর্ম একই সময়ে শেষ হয়। সুতরাং জীবন কর্ম বই আর কি? জীবনে কর্মের বিশ্রাম নাই; পূর্ণবিশ্রাম,—চিরবিশ্রাম মরণে।

জীবন কি? জীবজগতের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যে অবিচ্ছেদ্য

জীবজগৎ বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাথেরই মনে উদ্ভিত হয়। কিন্তু এ তত্ত্বের মীমাংসা বড়ই কঠিন। হার্বাট স্পেন্সার 'জীবনের' সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—“বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই জীবন।” জীবজগতে এই সামঞ্জস্যস্থাপনের জন্ত সন্তের সমীকৃত সংগ্রাম। জীবন পাসিত সংসারবিরাম্যার (Environments) মধ্যে বহিত স্তননধ-মিত হয়। শিশু যে মানসিক, নৈতিক এবং আধিভৌতিক অবস্থার মধ্যে তাহার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহার প্রভাব সে জীবনে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ফলত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা জীবন গঠিত। তাহার সহিত চিরবৈরিতা করিয়া জীবন বহে না। যে কোন উপায়ে ইউক, জীব তাহার অবস্থাকে, হয় আপনায় অন্তর্কুল করিয়া লইবে, না হয়, আপনাকে সেই অবস্থার অন্তরূপ করিয়া তুলিবে। রোসে বাস করিতে হইলে যেমন রোমীয়দিগের মত হইতে হয়, সংসারে থাকিতে হইলে,—বাঁচিতে হইলে, তেমনি সংসারের উপযোগী প্রকৃতি গঠন করিতে হইবে। নাহিলে জীবন বহিবে কেন? সংসারের উপযোগী হইতে পারিল না বলিয়া যে অসংখ্য জীব বিলয়-প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবী কেবল সবচেয়ে হৃদয়ের অন্ততলে তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। অতএব জীবনধারণ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অন্তর্কুল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। কোন কোন জীবগু এমন অবস্থার মধ্যে বাস করে যে, সামান্য চেষ্টা-

তেই সে বাঁচিতে পারে ; কিন্তু একটু অবস্থান্তর ঘটিলেই তাহার বিনাশ । জীবজগতের স্তর দিয়া যতই উপরে উঠি, ততই দেখিতে পাই, অবস্থা পরিবর্তনশীল, এবং জীবনধারণ ক্রমশই জ্ঞান ও পরিশ্রম সাপেক্ষ । মানুষ জীবজগতের রাজা, সংসারও তাহার পক্ষে অশেষ পরিবর্তন ও জটিলতার আগার । আমাকে বাঁচিতে হইলে জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, সংসারের সহিত বনাইয়া চলিতে হইবে । যদি তাহা না পারি, তবে এ সংসারে আমার স্থান হইবে না । মংস্ত জ্বলের সহিত অমুকুল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে, তাহার অবয়ব, তাহার প্রকৃতি, সমস্তই জলজীবনের অমুকুল হইয়া গিয়াছে । তাহাকে জল হইতে বাহির করিলে সে কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবে বায়ুজগতে থাকিবার জন্ত — মরিতে কে চায় ? কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইবে না । কারণ তাহার অন্তঃ-প্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির সহিত বনাইয়া উঠিতে পারিল না । যেখানে এই প্রকৃতিদ্বয়ের অসামঞ্জস্য, বিরোধ বা প্রতিকূলতা, সেখানেই বাধি, সেখানেই বিপদ, সেখানেই বিনাশ । কেহ ট্রামগাড়ি হইতে পা ফসাইয়া পড়িয়া আহত হইল, কেহ নোকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইল, কেহ বা আপনার বন্ধুকের গুলিতে আপনি হত হইল, এ সকলই বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির অসামঞ্জস্যের ফল । যেমন করিয়া ট্রামগাড়িতে উঠিতে হয়, তাহা উঠ নাই.; সম্ভরণ অভ্যাস কর নাই; যে সাবধানতার সহিত বন্ধুক ধরিতে হয়, তাহা শিক্ষা কর নাই; তুমি তাহার কলভোগ করিবে । এইখানেই

বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অমুকুল সম্বন্ধের অভাব হইল ।

স্পেন্সারকর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি ঠিক সংজ্ঞানামের উপযুক্ত না হইলেও, তিনি প্রকৃত তত্ত্ববিদের হ্রাশ জীবনের সমগ্র স্বরূপ প্রাণধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সামঞ্জস্যস্থাপনের যে চেষ্টা, তাহাকেই আমরা কর্ম বলিয়াছি । বাচিয়া থাকিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হইবে । আত্মশক্তির সহিত অপরা শক্তির (Non-Ego) সংগ্রামে যে কোন উপায়ে হউক, অপরা শক্তিকে অমুকুল করিয়া লইতে হইবে । ইহাই জীবন এবং কর্ম । জীবন এবং কর্ম উভয়েরই সংজ্ঞানির্দেশ করা আয়াসসাধ্য । বাচিয়া থাকিলে যেমন জীবন কি তাহা বুঝা যায়, তেমনই কর্ম করিতেই কর্ম কি তাহা বুঝা যায় । সংজ্ঞার দ্বারা এ উভয়ের বোধসাধন হওয়া কঠিন । আমরা স্পেন্সার মহোদয়ের পদবী অনুসরণ করিয়া বলিয়াছি যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার সমবায়সাধনের নামই কর্ম ।

উপলব্ধি হইয়া থাকিলে যে, কর্মশব্দ সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে তদপেক্ষা প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিয়াছি । আশা করি, এ স্বাধীনতা মার্কজনীয় হইবে । কর্তার দিক্ ছাড়িয়া থাকিলে, বাহ্যজগতের যে-কোন পরিবর্তনের নামই কর্ম । আমরা বাহ্যজগতে যে কোন পরিবর্তন সাধিত করি, তাহা আমাদের কর্ম । আমাদের নিষ্কাশে বায়ুমণ্ডলে যে সামান্য কম্পন হয়, তাহাও আমাদের কর্ম । সমস্ত পরিবর্তনের মূলে

শক্তির বিকাশ। সমস্ত বিশ্বসংসার কর্ম-
স্রোতে প্রাবৃত, স্মৃতরাং সমস্ত বিরাট বিশ্ব
শক্তির দ্বারা অল্পপ্রাণিত। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-
ব্যাপিনী প্রাণধরুণা মহাশক্তি জগতের
আদিকারণ বলিয়া আত্মা শক্তি নামে পূজিতা
হইয়া থাকেন। সে বিশ্বশক্তি এ ক্ষুদ্র
প্রবকের বিষয়ীভূত নহেন। সেই অনন্তশক্তি-
মহাসমুদ্রের একটি বিন্দু—মানবশক্তি—বর্ত্ত-
মান প্রবন্ধে আলোচ্য। মানবশক্তি মহাশক্তি-
সমুদ্রের তুলনায় জলবিন্দুসদৃশ। কিন্তু তাই
বাগরা মানবশক্তি তুচ্ছ নহে। ইহা জল-
বিন্দুর জ্ঞায় ক্ষুদ্র, আবার সৃষ্টিকারণসম্পর্কে
হৃদয়ধর বর্ণবৈচিত্র্যময়ী। চৈতন্যরূপ-
আলোকসংস্পর্শে মানবের কর্মে যেমন
বৈচিত্র্যতা, আমাদের বোধ হয় এত বিচিত্রতা
আর কোথাও নাই। কর্মে চৈতন্যের যে
আলোকপাত হয়, তাহাকে ইচ্ছা বলা যাইতে
পারে। মনুষ্যের সকল কর্মে চৈতন্যের
আভাস পাওয়া যায় না। স্মৃতরাং কর্মকে
প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইষ্ট
কর্ম এবং নেষ্ট কর্ম (voluntary and
non-voluntary actions)।* যে সকল
কর্ম ইচ্ছাপ্রণোদিত, তাহাদিগকে ইষ্টকর্ম
এবং যে সকল কর্ম ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে,
তাহাদিগকে নেষ্ট কর্ম বলা যায়। শেষোক্তের
উদাহরণ দ্বয়—অধিকারের উন্মেষ এবং
নিষেধ, স্বাধের পদন, এবং শিশুর অ-
শ্রুত অবসরকালীন প্রহৃতের উল্লেখ করা
বাহ্যে পারে। বাড়তে চাবি দিতে হইবে
মনে পড়িল। অনান পকেট হইতে বাক্সের

চাবি বাহির করিয়া বাক্স খুলিলাম, তাহার
পর ঘড়িটি বাহির করিয়া তাহাতে চাবি দিয়া
পুনরায় বন্ধস্থানে রাখা করিলাম। এত-
গুলি কার্য একমাত্র মননের দ্বারা—
ঘড়িতে চাবি দিব, কেবলমাত্র এই
ইচ্ছার দ্বারা—সম্পাদিত হইল। এইপ্রকার
জটিল, পরস্পরাযুক্ত এবং চেতনাপ্রভূত
কর্মই ইষ্ট কর্ম। নেষ্ট কর্ম অতি সরল,
তাহাতে জটিলতা এবং চৈতন্যের লেশমাত্র
নাই। শিশুর হস্তপদসঞ্চালন দেখিলেই
তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। একই ভাবে কলের
মত যেন শারীরিক ক্রিয়াগুলি নিষ্কর্ম হই-
তেছে। ইষ্টকর্মে ফলের স্পৃহা বর্তমান।
এই ফলের স্পৃহাকে আমরা মনন বলিব।
মানুষ ফলের স্পৃহা হইতেই কর্ম করিবার
জন্ম প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান বা চৈতন্য না
থাকিলে ফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না।
জ্ঞানের দ্বারা অতীত ফলের অভিজ্ঞতা
জন্মে। এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদ্ভূত
হইলে, সে ফলের প্রাপ্তিবিশেষ উপায়ভূত
(means) যে সকল শারীরিক ক্রিয়া আবশ্যিক,
সে সকলের আকাঙ্ক্ষাও উদ্ভূত হয়। স্মৃতরাং
এক একটি আকাঙ্ক্ষা বহু আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি
করিয়া দেয়। ফললিপ্সা জীপ্ত কন্দের জননী।
নেষ্টকর্মে ফললিপ্সার অভাব। কিন্তু এই
পাথক্যসংঘে উভয়বিধ কন্দের মধ্যে অতি
নিকট সংঘ। নেষ্টকর্ম—অশ্রুত অঙ্গসঞ্চালন
প্রভৃতি—ব্যতীত ইষ্টকন্দের উৎপত্তি সম্ভব
নহে। ইচ্ছা মনের শক্তি। ইচ্ছাশক্তির
দ্বারা প্রথমত শরীরধরকে এবং পরোক্ষভাবে

* ইষ্ট এবং নেষ্ট বলিতেই অধিকার উন্মেষ ইত্যাদি ইষ্ট। কিন্তু ইষ্ট এবং নেষ্ট সঙ্গতের অর্থ অর্থ
ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইষ্ট এবং নেষ্ট পদ ব্যবহার করিবারি

বাহুজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় । কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সময়সাপেক্ষ । জীবনের প্রথম কতিপয় সপ্তাহে কেবল উদ্দেশ্যহীন অঙ্গসঞ্চালন প্রত্যক্ষ হয় । সে চঞ্চলতা জীবনী শক্তির কার্য্যমাত্র । তাহাতে ইচ্ছার লেশ নাই । ক্রমে সেই অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গির সহিত বালকের সুখদুঃখ সম্পৃষ্ট হয় । হাতখানি নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ তাহার বুকের উপর ঠেকিল, বালকের তাহাতে আরামবোধ হইল । এইরূপ অনেকবার করিয়া বালকের মনে এ দুয়ের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল । বালক সেই আরাম আবার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল । তাহার হস্ত যেমন নড়িতেছিল, তেমনি নড়িতেছে, কিন্তু এবার সে একটু অবশিত । হস্তখানি কেমন করিয়া ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে, সে তাহা একটু মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল—তাহার মনে সেই আরামের স্মৃতি । সুখদুঃখ কে না বুঝে ? সুখদুঃখবোধ সহজাতসংস্কারাধীন । সুতরাং সুখকে পাইবার জন্য এবং দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য জন্মাবধি মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । এই সহজাত সংস্কার, সুখের উপলব্ধি ও স্মৃতি ও তাহার অভাববোধ যখন মনোমধ্যে একত্র হইল, তখনই ইচ্ছার উদ্বেগ । সময়ে তাহার পূর্ণবিকাশ হয় । অতঃপরেই বুঝা যাইতেছে যে, নিরর্থক, উদ্দেশ্যবিহীন, জীবনশক্তিজনিত সহজাত নৈক কৰ্ম্ম হইতেই ইচ্ছার উৎপত্তি । যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসঞ্চালন ইচ্ছার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা ইচ্ছার স্মৃতি নহে, পরন্তু তাহা ইচ্ছার অগ্রজাত ও উপাদানকৃত ।

আমরা কৰ্ম্মকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি ; ঈর্ষ্যাসিত ও অনীর্ষ্যাসিত । কিন্তু এ দুয়ের মাঝামাঝি আর একপ্রকার কৰ্ম্ম আছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে । মধুমক্ষিকা মধুচক্রনিৰ্ম্মাণে অদ্বৃত শিল্পকৌশলের পরিচয় দেয়, কোন কোন পক্ষিশাবক ডিঙ্গ হইতে বহির্গত হইবামাত্র খাত্তাবেষণ ও সন্তরণ করিয়া থাকে, এবং পক্ষিগণের কুলায়নিৰ্ম্মাণচাতুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় । মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই স্তম্ভপান করিতে আরম্ভ করে, শিশু ইহার জন্ত শিক্ষার অপেক্ষা করে না । সহজদৃষ্টিতে স্তম্ভপান অতি তুচ্ছ ব্যাপার । কিন্তু ইহাই বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সহিত এবং দার্শনিক ভক্তির সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন । তত্ত্ববিদগণ এই সীকল কৰ্ম্মকে প্রাক্তনসংস্কার বলিয়া নির্দেশ করেন । অর্থাৎ কুলায়নিৰ্ম্মাণকৌশল এবং পক্ষিশাবকগণের আহার্য্যগ্রহণ পক্ষিগণের বহুযুগ এবং বহুজন্ম ব্যাপী কৰ্ম্মপরম্পরার ফল । মানব সহস্র চেষ্টায়ও পক্ষীর ত্রায় স্কন্দর কুলায় নিৰ্ম্মাণ করিতে পারে না । মানব এইখানে পক্ষীর নিকট পরাজিত । কিন্তু এইজাতীয় ক্রিয়াকে যদি 'ইষ্টকৰ্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করিবে তাহা হইলে তদুপযোগী জ্ঞানও এইরূপ প্রাণীর আছে, স্বীকার করিতে হইবে । ঐক্য ইহাদের অস্ত্রাত্মক কার্য্যকলাপ হইতে, সৌরূপ কেন, তাহার শতাংশের একাংশ বৃদ্ধিরও অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না । পরন্তু সংস্কারজ কৰ্ম্ম এবং ইষ্টকৰ্ম্মের মধ্যে আর একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় । সংস্কারজ কৰ্ম্ম ইষ্টকৰ্ম্ম ত্রায় চৈতন্যসম্বন্ধিত, জটিলতাপূর্ণ, বহুযুগ-ব্যাপী এবং উদ্দেশ্যপূৰ্ণ বলিয়া প্রতীয়মান

হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইষ্টকর্মের বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণতা। সংস্কারজ কর্মে যদি সেই উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই সকল কর্ম ইচ্ছাপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থানে এক সমস্তা উপস্থিত হয়। ইতর প্রাণিগণ যে ভাবে জীবনের লক্ষ্য অনুসরণ করে, তাহা একই ভাবে সম্পাদিত এবং অব্যর্থ। তাহাদের প্রতি কার্য্যে আত্মরক্ষা ও জাতিরক্ষার প্রবৃত্তি বর্তমান। আত্মরক্ষা অবশ্য জীবমাত্রেরই বুদ্ধি, কিন্তু এই আত্মরক্ষার জন্য তাহারা যে-প্রকার উপায় অবলম্বন করে—বিপদ আগত দেখিলে তাহারা যেমন শীঘ্র তাহা বুঝিতে পারে এবং যেমন চতুরতা ও সত্বরতার সহিত তাহার প্রতীকার করিতে সচেষ্ট হয়, তাহা বহিষ্কার কল বলিয়া বোধ হয়। একজন্মে কেন, বহুজন্মেও সে শিক্ষা, সে সত্বরতা লাভ হয় কি না, সন্দেহ। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কর্ম করি, তাহাতে যে বিতর্ক, যে সতর্কতা এবং যেরূপ আয়াস, প্রাণিগণ আত্মরক্ষাবিষয়ে যদি সেরূপ বিচার করিয়া প্রবৃত্ত হইত, তবে আত্মরক্ষা যে নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আত্মরক্ষাপ্রণোদিত এই সকল কর্মে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে উদ্দেশ্য জ্ঞানস্বরূপ না হইয়া একলক্ষ্য অন্ধপ্রবৃত্তির মত জীবগণকে পরিচালিত করে। আমাদের মারিবার জন্য একজন ঘটি উত্তোলন করিয়াছে, দেখিলামাত্র নিমেষমধ্যে আমরা হস্ত উত্তোলিত হইল—সেই আঘাত ঠেকাইবার জন্য। পতনোন্মুখ ঘটির দর্শন

এবং আমার হস্ত উত্তোলনের মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র পর্য্যবসিত হইল কি না, সন্দেহ। অবলম্বনীয় কর্মের সকল দিক বিচার করা ইচ্ছার ধর্ম। কিন্তু এখানে সকল দিক বিচার করিয়া যদি আমার হস্ত উত্তোলন করিতে হইত, তাহা হইলে তাহার বহুপূর্বে আমার বিচারপূর্ণ মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। যেন কোন অদৃশ্য দেবতা প্রাণিগণের অন্তরে বিরাজ করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষার দিকে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত করিতেছেন। এইজন্য ডাঃ মার্টিনো বলেন যে, অসহায় অজ্ঞান প্রাণীদিগের সহায় ভগবান। আত্মরক্ষাকার্য্যে মানুষও কিয়ৎপরিমাণে অসহায় এবং অজ্ঞান। পক্ষান্তরে মানুষ ভাবিয়া কাজ করে, মানুষের স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মানুষের পদে পদে সংশয় এবং পদে পদে তাহাকে আপনার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইতর প্রাণিগণ জ্ঞান এবং স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। কাজেই তাহাদের ভাবনা ভগবান ভাবিয়া দেন।

সংস্কারজ কর্ম ইষ্টকর্মের তিত্তিস্বরূপ। পূর্বে বলিয়াছি, নেষ্ট কর্ম ইচ্ছার উপাধানভূত এবং ইষ্টকর্মের সহিত সংস্কারজ কর্মের বহু সাদৃশ্য থাকিলেও, শেষোক্ত কর্ম নেষ্টকর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এক শ্রেণীর কিংবা আছে, যাহা অনেক বিষয়ে সংস্কারজ কর্মের অনুরূপ। সেগুলির নাম অভ্যাস। পুনঃপুন এক কিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে শরীরবস্ত্র ক্রমাগত সেই কিয়ার দিকে এত প্রবণতা লাভ করে যে, সেই কিয়া সাধনের নিমিত্ত আর আমাদের মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। এই প্রবণতার নাম অভ্যাস। অভ্যাস

ইচ্ছার পরিণতিমাত্র। পুনঃপুন আবৃত্তি-বশত সমস্ত কৰ্ম অত্যন্ত হইয়া যায়। মনো-যোগ আর সে সকল কৰ্মে আবদ্ধ হইয়া না। সেইজন্য নূতন নূতন কৰ্ম করিবার এবং নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার সুবিধা হয়। স্পেন্সার এই অভ্যাসজনিত কৰ্মকে সংস্কারজ কৰ্মের দলে ফেলিয়াছেন, অবশ্য ইহাদের সৌদাদৃশ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমার বোধ হয় অত্যন্ত ক্রিয়াকে ইষ্ট-কৰ্মের মধ্যে গণ্য করা উচিত। কারণ কোন কৰ্ম নিতান্ত অত্যন্ত হইলেও কৰ্ত্তার ইচ্ছা জাহা হইতে একেবারে তিরোহিত হয় না। আমি যখন প্রথম ক, খ, লিখিতে লিখি, তখন প্রতি অক্ষরের প্রত্যেক ভঙ্গীট আমাকে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হইত। এখন লিখনব্যাপার আমার অত্যন্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাতে আমার মনোযোগের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখনও একটি অক্ষর লিখিতে যদি অল্প একটি অক্ষর লিখিয়া বসি, অথবা একটি অক্ষরের মাত্রা যদি অল্পরূপ হইয়া যায়, তবে তখনই আমার মনোযোগ তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, অত্যন্ত কার্যে একেবারেই ইচ্ছার সাহচর্য নাই।

মনিবের মনোরাজ্যে ইচ্ছা কতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা বিচার করিতে গেলে আর একটি বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যিক। আমরা এতদূর কৰ্মরাজ্যে ইচ্ছার প্রভাবের কথা বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ ইচ্ছার দ্বারা শরীরবত্ত্ব কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, অল্পখা লক্ষ্যহীন জড়পিণ্ডের মত শরীর ইচ্ছার স্পর্শে কেমন সজীব হইয়া উঠে, তাহাই আমরা সংক্ষেপে

আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞানের রাজ্যে ইচ্ছার প্রভাবসম্বন্ধে ছোট একটি কথা বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। “ইঞ্জির জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।” দ্রব্যাদির গুণসকল—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—যখন ইঞ্জিরের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে নানাপ্রকার ক্রিয়ার উৎপাদন করে, তখন মনে তত্তৎ দ্রব্যের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। কিন্তু দ্রব্য ইঞ্জিরসমীপবর্তী হইলেই যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা নহে। যেমন, আমরা কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মুক্ত আকাশের দিকে যখন চাহিয়া থাকি, তখন তাহার নীলিমা বা অলসমূহ আমরা দেখিয়াও দেখি না। মন তখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ সকল দেখিবে কে? চক্ষু দর্শনের উপায়ভূত, দর্শনের কৰ্ত্তা মন। তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সকলই উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু মনোযোগের অভাবে তুমি কিছুই দেখিতে, শুনিতে বা ভ্রাণ করিতে পাইবে না। অতএব দেখা বাইতেছে, মনোযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। মনোযোগ ইচ্ছার অধীন, ইচ্ছার শাসনে পরিচালিত। ইচ্ছা ব্যতিরেকে, মনোযোগ এবং মনোযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। তোমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া একটি পাখী উড়িয়া গেল, চক্ষুরিঞ্জিরের দ্বারা সে অন্তর্ভুক্তি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইল। কোতুল উদ্দীপ্ত হইল। তখনই তুমি চক্ষুর দ্বারা সেই পক্ষীর গতি লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে। অতএব দেখা গেল, আমাদের দর্শনে ও শ্রবণে, কল্পনে ও মননে, স্মৃতি ও ভ্রূতি, চিন্তায় ও কার্যে, সর্বত্র এই সর্বব্যাপিনী ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান।

এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে মনো-তত্ত্ববিচার হিسابে ইচ্ছার মূল্য কত, বিজ্ঞানে ইচ্ছার স্থান নির্দেশ করিতে তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রয়াস পাইয়াছি। চরিত্রনীতি এবং রহিল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

চীন-কাহিনী।

লামা টেম্পল্ ও পঞ্চামুনি।

২০শে জানুয়ারি। অদ্য শীত কিছু কম। তিনমাসকাল অসহ শীত ভোগ করিয়া আজ শীতলাঘবে বিদেশীয় সৈন্তদল কিছু সুস্থ বোধ করিয়াছে। শীতভয়ে নীরবকাকলি বিহীন বহুদিন পরে আজ আবার সুমধুর সঙ্গীত-লহরীতে প্রভাতাকাশ বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে।

পিকিন অঞ্চল লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। যে সকল দোকানদার রণারস্ত্রে সহর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা আবার আসিয়া দোকান সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদেশীয় সৈন্তদলের পদভরে ধরণী কম্পিত হইতেছে। পিকিনে আসিয়া তুনিয়া-ছিলাম যে, সেখানকার জাপানী বাজারের অর্ধমাইল ব্যবধানে লামা টেম্পল্। এই লামা টেম্পলে হিন্দুর দশমহাবিদ্যামূর্তি বিরাজিত এবং পঞ্চামুনির প্রকাণ্ড বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং বিদেশে হিন্দুর পরমারাধ্যা দেবী-মূর্তি দর্শনে যে হিন্দুসন্তানের স্বভাবত প্রবল কৌতুহল জন্মিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এতদিন সুযোগ ঘটিল উঠে নাই। আজ সুযোগ বুঝিয়া আমি হইজন পঞ্চাবী

হুপিটাল্ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও একজন ভবানী-পুরনিবাসী বাঙালীবাবুর সমভিব্যাহারে লামা টেম্পল্ অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যখন আমরা মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় ১০।০টা। সাতটি মন্দির সমভাবে সারিবদ্ধি সম্মিবেশিত—শেষেরটি সর্বোচ্চ। বড় বড় বাড়ী মন্দির-সাতটিকে ঘেরিয়া তাহাদের প্রাচীরের কার্য করিতেছিল। মন্দিরগুলি কাঠনির্মিত এবং আকারে কতকটা আমাদের রথ ও মুসলমানদের গোয়ারার তাজিমার মত। মন্দিরের বাহিরে মিশ্রিত সংস্কৃতভাষায় কি লিখিত। গুলিলাম, উহা বেদভাষা। মন্দিরের অভ্যন্তরে বহু প্রাচীন তৈলচিত্র। মন্দিরদ্বারের একজন চীনবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি একজন পাণ্ডা। পাণ্ডা আমাদের সম্ভাষণ করিয়া মন্দিরে লইয়া গেলেন। এইটি প্রথম মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে চারিজন লামা বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। লামাগণ তিব্বতবাসী। ইহাদের আচারব্যবহার হিন্দুর মত।

মুণ্ডিত এবং শরীর গৈরিক আলখাল্লায় আবৃত । শীতাদিক্যবশত আলখাল্লার নীচে একটি করিয়া বনাতের পায়জামা । কর্তৃদেশে কাষ্ঠমালা বিলম্বিত—কাহারও হস্তে পিতলের বলয় এবং কাহারও বা মস্তকে রেণশী বস্ত্রের উষ্ণীয় পরিশোভিত ।

লামাগণ সংস্কৃতভাষার সহিত মিশ্রিত একপ্রকার ভাষার সাহায্যে আমাদিগকে মন্দিরসম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন । বহুকষ্টে আমরা বুঝিলাম যে, আমরা যে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছি, হিন্দু-স্থানের “তারা”দেবী তাহার অধিষ্ঠাত্রী । পর পর মন্দিরগুলিতে “কমলা”, “বগলা”, “ভুবনেশ্বরী”, “ছিন্নমত্তা”, “বোড়শী” ইত্যাদি হিন্দুস্থানের দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ।

প্রথমেই তারামূর্তি । চীনশিল্পী ইহার অমধ্যাদা করে নাই । ইহার সমস্ত বস্ত্রভরণ অদক্ষ শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যে কাষ্ঠ হইতে খুঁদিয়া খুঁদিয়া বাহির করিয়াছে । দেবীর হস্তস্থিত পদ্মফুল সদাঃপ্রস্তুতিত প্রকৃত পদ্ম বলিয়া প্রথমে আমাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল—পরে দেখিলাম, ইহাও শিল্পীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক ।

বহুদিন পরে অদূর বিদেশে স্বদেশীয় দেবীমূর্তি-সম্পর্শনে যে মাতৃভূমিচ্যুত সন্তানের চক্ষে তাহার জন্মভূমির বিশাল মহিমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । ভারতভূমি বৌদ্ধদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার সময়েও বুদ্ধি জননীর প্রসাদ কিছু তাহাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন ।

প্রথম মূর্তি দর্শন করিয়া আমরা দ্বিতীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । এই মন্দিরে

“বগলা”মূর্তি প্রতিষ্ঠিত । দেবী কিছু রূপান্তরিতা । দেবী একাকিনী রুদ্রমূর্তিতে দণ্ডায়মান । আকৃষ্যমানজিহ্ব গদাপ্রহারভীত অসুর দেবীর সঙ্গে আসিতে সাহস করে নাই । ইহারও অলঙ্কারাদি সমস্তই খোদিত । মূর্তির সম্মুখে ধূপধূনার ধূম সমুখিত—মন্দিরটি তাহার গন্ধে আমোদিত । মন্দিরবাসী লামা ধ্যানমগ্ন । লামাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া আমরা তৃতীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম ।

এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী “কমলা”দেবী । শাস্তিময়ী কমলাসনা কমলার মূর্তি যেন কিছু উরুতা বলিয়া বোধ হইল । চতুর্ভুজা দেবীকে প্রণাম করিয়া আমরা চতুর্থ মন্দিরে গেলাম ।

মন্দিরের দ্বারদেশে কতকটা সংস্কৃতের মত অক্ষরে দেবীর নাম লিখিত । তিনটি অক্ষর “ভুব.....রী” পড়া গেল । অচ্যুতানে বুঝিলাম, দেবীর নাম ভুবনেশ্বরী । একজন সংস্কৃতজ্ঞ চীনবাসীও আমাদের কথা সমর্থন করিলেন । ভুবনমোহিনী ভুবনেশ্বরীমূর্তিও চীনকারিকরের হস্তে কিছু রূক্ষতাপ্রাপ্ত । মূর্তির সম্মুখে তজন লামা উপবিষ্ট ও একজন পূজার আয়োজনে নিয়োজিত । মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীকে ৫ সেন্ট (৪ পয়সা) প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলাম । তদদর্শনে প্রধান লামা দেবীর শিরঃস্থিত মুকুট স্পর্শ করিয়া আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন ।

আমরা পঞ্চম মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । এখানেও দ্বারের উপরে তিনটি অক্ষরে দেবীর নাম লিখিত । অক্ষরগুলি পড়িতে পারিলাম না । জনৈক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি হিন্দুস্থানের “বোড়শী”দেবী ।

মন্দিরের মধ্যস্থলে দেবীমূর্তি। মূর্তির মস্তক-
স্থিত অত্যুজ্জল গিল্টি-করা মুকুট হইতে স্রবর্ণের
স্তায় ভাস্বর আভা উদ্ভাসিত হইয়া মন্দির-
টিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

মন্দিরের সর্বত্র পুরাতন চিত্রপট। দেবীর
অলঙ্কারগুলি ধাতুনির্মিত—কণ্ঠে কাঠগুচ্ছের
মালা, কপালে সিন্দূরতিলক। মন্দিরাত্য-
স্তরে হইজন লামা উপবিষ্ট। পূজার আরো-
ঞ্জন সমস্তই প্রস্তুত—ধূপধূনার গন্ধে চতুর্দিক
আশোদিত। দেবীকে প্রণাম করিয়া আমরা
সে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঠ মন্দিরে
প্রবেশ করিলাম।

ইহার সম্মুখে তিনজন লামা বস্টা,
কাঁসর ও শব্দ বাজাইতেছেন—পূজা আরম্ভ
হইয়াছে। সম্মুখেই দেবীমূর্তি। মুক্তকেশী
ছিন্নকণ্ঠ। রক্তধারাবিভিন্তা ভয়ঙ্করী মূর্তি
দেখিয়া ইহাকে ছিন্নমস্তা বলিয়া চিনিয়া
লইতে কোনই কষ্ট হইল না।

এখানকার ছিন্নমস্তামূর্তিও ভারতের
ছিন্নমস্তামূর্তি হইতে কিছু পৃথক্। ভারত-
বর্ষের মত দেবীর মস্তক স্বকবিচ্যুত ও হস্ত-
স্থিত নহে। অর্ধবিচ্ছিন্ন কণ্ঠদেশ হইতে
রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। এই পরি-
বর্তনে চীনকারিকরের রুচির নিন্দা করিতে
পারিলাম না। এই মূর্তি কতকটা স্বাভাবিক
বলিয়া ইহার ভীষণতা আরও বদ্ধিত হই-
য়াছে।

দেবীর সর্বাঙ্গ উজ্জল রক্তবর্ণে চিত্রিত।
পদতলে চীনে ফুল ও আমাদের বিষপত্র
অপেক্ষা সুপ্রাকৃতি একপ্রকার বিরপাক্ষের
রাশি স্তূপীকৃত। সম্মুখে দুইটি ছিন্নকণ্ঠ মেঘ-
শিশু নিপতিত।

পূজা শেষ হইল। প্রধান লামা প্রসাদ-
বণ্টন করিলেন। পূর্বে আমার প্রসাদ-
সপক্ষে যেরূপ বিভীষিকা জন্মিয়াছিল, এখান-
কার প্রসাদ দেখিয়া সে ভাব আর রহিল না।

এখানকার প্রসাদ আমাদের দেশেরই
মত—পুষ্পসংযুক্ত চিনির ডেলা—তেলাপোকা
বা শূকরের তরকারি নহে। ভক্তিতরে
প্রসাদ ভোজন করিলাম। কিন্তু প্রসাদপূত
হস্ত মস্তকে মুছিলাম না বলিয়া লামারা কিছু
বিরক্ত হইলেন, মনে হইল। এমন-সময় গভীর
নিকণে চড়চড়া বাজিয়া উঠিল। সানাই
আনন্দের সুর ধরিল—মুহমুহ শব্দ ধ্বনিত
হইতে লাগিল অবিশ্রান্ত ঘণ্টারব শুনা
যাইতে লাগিল। আমরা চম্কিয়া উঠিলাম।
দেখিলাম, একএকজন লামা স্বরিতপদে
সপ্তম মন্দিরের দিকে ধাবিত হইতেছেন,
আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সপ্তম
মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। বঠ মন্দিরের
পশ্চাতেই সপ্তম মন্দির। মন্দিরের সম্মুখেই
বাগধ্বনি হইতেছে। অভ্যস্তরে প্রবেশ
করিয়া আমরা অতিশয় বিম্মিত হইলাম।
এমন একাণ্ড মূর্তি আমি আর কখনও
দেখি নাই। শুনিলাম, ইহা পঞ্চামুনি নামক
বিখ্যাত মুনিবরের মূর্তি। মূর্তিটি লম্বায় প্রায়
৫০ হাত এবং বিস্তারে প্রায় ৭ হাত। শুনি-
লাম, এই মুনিমূর্তি একটি অঞ্চল শালবৃক্ষ
খোদাই করিয়া গঠিত।

অত্যন্ত দূরতাবশত নীচে দাঁড়াইয়া
মূর্তির নাক, মুখ, চোখ, কান, কিছুই ভাল
দেখা যায় না।

বৃক্ষটির দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া অহ-
রূপ হস্তপাদাদির সংযোজনে চীনশিল্পী যথেষ্ট

কমতার পরিচয় দিয়াছে। মূর্তি চতুর্ভুজ। প্রত্যেক হস্ত হইতেই ২৫১০০ হাত করিয়া কাঠগুচ্ছের মালা লব্ধমান। গলদেশেও মুণ্ডমালার জায় গুচ্ছগুচ্ছ কাঠনির্মিত মালাদাম।

সুন্দর কাঠনির্মিত রং-করা একটি বেদীর উপর মুনি দাঁড়াইয়া আছেন—মস্তক প্রায় গগন স্পর্শ করিতেছে। যেন মহাপুরুষ মস্তক উন্নত করিয়া বিজুত সাম্রাজ্যের সর্বত্র দর্শন করিতেছেন। মুনির অঙ্গে একটি গেরুয়া বর্ণের আলখালা। আমি প্রথমে উহা বস্ত্র-নির্মিত ভাবিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম, উহাও কাঠনির্মিত—এবং উহার উপরিভাগ কাঠ-নির্মিত মনোরম পুষ্পসমূহে শোভিত। মুনির চরণতলে একটি কাঠনির্মিত পদ্মফুল রহিয়াছে, ফুলটি সদাসর্বদা মুনিবন্দের চরণামৃতে অভিষিক্ত। অগণিত ভক্তবৃন্দ আসিয়া আনন্দের সহিত প্রভুর চরণামৃত লইতেছে—কেহ লইয়া চলিয়া লইতেছে, কেহ বা তথায় পান করিতেছে।

একজন লামা কৃপাণবশ হইয়া আমাকেও একটু চরণামৃত দান করিলেন—আমিও উহা ভক্তিতরে পান করিলাম। মনে হইল, এই চরণোদক তুলুচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত। চরণামৃত পান করার পর লামা দর্শনী চাহিলেন, আমি তাঁহাকে ৫ সেন্ট দিতে গেলাম। তিনি প্রধান লামাকে দেখাইয়া দিলেন। এক এক মন্দিরে এক একজন ভারপ্রাপ্ত লামা থাকেন। সেই সেই মন্দিরের প্রণামীতে কেবল তাঁহারই অধিকার।

পঞ্চামুনির এই অপূর্ণ মূর্তি দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক বিবরণ শুনিতে আমাদের

সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। একজন সংস্কৃত ও ইংরাজী জানা লামা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—“পুরাকালে এক চীনদেশীয় নরপতি পিকিনের দক্ষিণে বহুদূরব্যাপী এক অরণ্যের মধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সমস্ত দিবসের পর অপরাহ্নে এক মৃগের অনুসরণ করিয়া মহারাজ ঐ অরণ্যের পথহীন নিবিড়তার মধ্যে উপস্থিত হন। ক্রমে চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নরপতি অবসন্ন হইয়া-ছিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া এক বিশাল-শালবৃক্ষ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িলেন।

“নিদ্রাঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক দীর্ঘশ্রু জটাজুটধারী ভীমকায় তাপস আসিয়া বলিতেছেন, ‘রাজন, তুমি যে বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়াছ, সেই বৃক্ষই আমি। আমার নাম ‘পঞ্চামুনি।’ মহীরুহ-রূপে বহুদিন তপস্তা করিয়া আমি নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। অল্প-দেহ-পরিগ্রহেরও কাল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং, তুমি আমার জনসমাজে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। আমি আপনা হইতেই আমার শাখাপ্রশাখারূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্যাগ করিতেছি! ত্যাগান্তে যে দেহ থাকিবে, দৈর্ঘ্যো-প্রস্থে তাহার কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া আমার প্রতিষ্ঠিত করিবে।’

“মহারাজ স্বপ্নযোগে এই আদেশ পাইয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সত্যসত্যই বৃক্ষের মোটা মোটা সরস শাখা-গুলি বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে।

দেখিয়া রাজা স্বপ্নের সত্যভাসস্বপ্নে নিঃসন্ধি হইলেন।

“পরদিন প্রভাতে তিনি রাজধানীতে বাইরা লোকজন ও সৈন্তসামন্ত লইয়া আসিয়া বৃক্ষটিকে সমূল তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং মুনিবরের অহুজ্জামত যথাযথ তাঁহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার রক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। সেই শালবৃক্ষই বর্তমান পঞ্চামুনি।”

লামার মুখে পঞ্চামুনির এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। শেষে বেলা প্রায় ৪টার সময় চীনে হিন্দুদেবতা ও মহাকায় পঞ্চামুনি সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে বাসার ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীঃ—

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সেনার কমল।—উপহাস। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২২ টকা।

দামোদরবাবু উপহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবং আমাদের ধারণা এই যে, তিনি কেশোলাভের যথার্থ অধিকারী। বর্তমান ঘটনা-প্রধান উপহাস-লেখকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, চিত্তাকর্ষক, অথচ গ্রাম্যতা-দোষের সংস্পর্শশূন্য। তাঁহার ভাব মার্জিত, সংস্কৃত, গাভীরাসম্পন্ন, অথচ কোথাও একটা ভাগ নাই। বর্তমান উপহাসখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম। ইহা ডিটেক্টিভের গল্পের ভাণ্ড কোঠুহলোদীপক। বলিতে কি, ইহাও একখানি ডিটেক্টিভেরই গল্প। তবে ডিটেক্টিভের গল্পে কেবল ঘটনারই বৈচিত্র্য থাকে; ইহাতে ঘটনাবৈচিত্র্যও আছে, অথচ ভাবসম্ভিবেশও আছে।

বড় ছাংখের বিষয় এই যে, একটু নিন্দা করিতেও হইতেছে! বাঢ়ীর বধূরা ঠাকুর-

ঝিকে যে সম্পর্কবিরুদ্ধ ও কদর্যা তামাসা করিয়া থাকেন, তাহা আমরাও অবগত আছি। কিন্তু গ্রন্থকারের হাতে পড়িয়াও যদি ঠাকুরঝির সংস্কৃত এবং মার্জিত হইতে না পারেন, সে অপরাধ ঠাকুরঝিদের নহে, গ্রন্থকারের নিজের। গডডলিকা-প্রবাহের জন্ত ত গডডলিকাই আছে, মানুষ কেন? বড়বড় কুৎসিত তামাসার আমরা অহুম্মদন করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত দামোদর-বাবুর এই পুস্তক যে ভালই হইয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

আমিষের প্রসার।—প্রথম খণ্ড। কল্পচিং পরিব্রাজকত্ব। শ্রীযত্ননাথ মজুমদার এম্. এ. বি. এল্. কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫০ বার আনা মাত্র।

পুস্তকখানির নাম ‘আমিষের প্রসার’; কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়, আমিষের ধ্বংস। বাস্তবিকই আমি ও তুমি এই যে ভেদজ্ঞান, ইহাই ত সংসারবন্ধন। এই

ভেদজ্ঞান লোপের অর্থই মুক্তি। মানুষ যেদিন সর্বভূতে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে, সেইদিনই তাহার কর্তব্যকন ছিন্ন ও মুক্তিলাভ হয়। সমাজপদ্ধতিই সে পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সকলেই শৈশবে ও বাল্যে বড় স্বার্থপর, বড় আত্ম-সর্বস্ব থাকি। বিবাহ হইলেই পরের ভাবনা আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ আশ্রয়ের সঙ্কোচ হয়। সন্তানাদি হইলে আশ্রয়টা আরও কমিয়া যায়। এইরূপে মানুষ উন্নত হইতে উন্নত-তর হয়। স্মৃতি থাকিলে, শেষে আত্মা-সুস্থান ও আশ্রয়নিষ্ঠা বিলুপ্ত হইতেও পারে। তাহাই মুক্তি।

এই পুস্তকে সেই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানির জন্ত বহুবাক্যে শত ধন্যবাদ দিতেছি। সরল ভাষায় লিখিত সন্-যুক্তিপূর্ণ এমন গ্রন্থের আদর হওয়া সঙ্গত। বাঞ্ছনীয়।

পাক-প্রণালী।—সম্পূর্ণ। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২।০ আড়াই টাকা।
মিস্ত্রী-পাক।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১। এক টাকা।

আমরা ব্রাহ্মণজাতি—উদরের সহিত সম্পর্কিত—আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ, ইহা চির-প্রসিদ্ধ এবং সর্বজনবিদিত। অতএব এই পুস্তক-দুইখানির ● আমরা শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। পুস্তকের সঙ্গে বিপ্রদাসবাবু যদি কিছু-কিছু নমুনা পাঠাইতেন, তাহা হইলে সহস্রমুখে প্রশংসা করিতাম।

‘মহাদেবকে দিয়া মহাকবি বলাইয়াছেন—
“শরীরমাংসং খলু ধর্মসাধনম্।” শরীররক্ষা

করিতে হইলেই জীবধর্ম্মানুসারে আহারের প্রয়োজন হয়। আর এমন-সকল উপাদেয় আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি যে পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে যদি আমরা ধর্ম্ম-পুস্তক বলি, তাহা হইলে, ভরসা করি, উৎকট ধর্ম্মব্যবসায়ীরা আমাদের জাতি স্মরণ করিয়া আমাদের মার্জনা করিবেন।

রংস্ত বাউক। বাস্তবিকই পুস্তক-দুইখানি দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহাতে নানাবিধ আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি এমন সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, রন্ধনবিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান বাহার ‘আছে, সে-ই ইচ্ছানুসারে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নিজের ও বন্ধুবান্ধবের তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিবে। দ্রব্যাদির গুণ-গুণ, উৎকৃষ্ট দ্রব্য নিকাচনের উপায়, পাক-শালা, পাকপাত্র, উনান ও জাল সহজীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদ হওয়ায় পুস্তক-দুইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের অগ্ন্যতন বিবেচনা করিলে মূল্যও কিছু অধিক নিকারিত হয় নাই। ভরসা করি, পুস্তক-দুইখানির আদর হইবে—অন্ততঃ হওয়া উচিত।

রামদাস-গ্রন্থাবলী।—প্রথম ভাগ। ঐতিহাসিক রহস্য। ৬ রামদাস সেন প্রণীত। মূল্য ২। দুই টাকা মাত্র।

ইতিপূর্বে রামদাসবাবুর প্রস্তরনির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বহরমপুর তাহার গুণ-গ্রাহিতা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে। এক্ষণে রামদাসবাবুর পুত্রগণ স্বর্গীয় পিতার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়া প্রকৃষ্ট পিতৃভক্তির পরিচয় দিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে

দেশের ও দেশীয় সাহিত্যের মহত্বপূর্ণ সাধন করিতেছেন।

রামদাসবাবুর গ্রন্থাবলীর এই উপাদেশ সংস্করণ তিন খণ্ডে শেষ হইবে। এই প্রথম খণ্ডে তিন ভাগ ‘ঐতিহাসিক রহস্য’ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের রচনা বঙ্কিমবাবুর অমরোদ্ধৃতিময় আরম্ভ হয়, এবং অনেকগুলি প্রবন্ধ ‘বঙ্গদর্শনেই’ প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রবন্ধে কত যে শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায়, বিদ্যাহুঁরাগ, গবেষণা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা যিনি এই গ্রন্থ পাঠ না করিবেন, তাঁহাকে বুঝান ষাইতে পারে না—মাসিকপত্রের পাঁচছত্র সমালোচনায় তাহা বুঝান যায় না। তবে, এ কথা বলিয়া দিতে পারা যায় যে, এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের পর যে-কেহ ভারত-বর্ষের পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাকেই এ সকল পড়িতে—শুধু পড়িতে নহে, অধ্যয়ন করিতে—হইবে। নতুবা তাঁহার আলোচনা অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে। গ্রন্থ বৃহৎ; আকারের হিসাবে ইহার মূল্য ও অল্প—বঙ্গালীর যদি বিদ্যাহুঁরাগ থাকে, তাহা হইলে এই উপাদেশ পুস্তক যে বহুলপরিমাণে বিক্রীত হইবে, এরূপ ভরসা করা যায়। তবে হুঃখ এই যে, বঙ্গালীর বিদ্যাহুঁরাগ—প্রায়

অশ্বভিষেক মতনই জিনিষ। তথাপি রামদাসবাবু যে নিজস্বগেই চিরস্মরণীয় হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মজার কথা।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

বালকদিগের চিত্তবিনোদনোদ্দিষ্ট ‘Fairy Tales’ নামধেয় অনেকগুলি পুস্তক ইংরেজিতে আছে—ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই আছে। এই পুস্তকের গল্পগুলি প্রধানত এই সকল পুস্তক হইতে সংকলিত। কেবল দুইটি গল্প—‘মূর্খ পণ্ডিত’ ও ‘ভূতের বোকা’—কোন বৈদেশিক সাহিত্য হইতে গৃহীত নহে। এই দুইটি আমাদের দেশেরই প্রচলিত গল্প এবং এই পুস্তকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আমোদজনক। দেশীয় এবং বিদেশীয় জিনিষে প্রভেদ এইখানেই। যাহা দেশীয়, তাহা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে আগে হইতেই মিলিয়া বসিয়া থাকে; যাহা বিদেশীয়, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া মিলাতে হয়।

পুস্তকখানির সম্বন্ধে বলিতেছি, ভাল হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। ইহা মুখ্যত বালকদিগের জন্য লিখিত; কিন্তু শুধু বালক কেন, বালকদিগের পিতামহ-মাতামহের পর্য্যন্ত ইহা পড়িয়া আমোদিত হইবেন—অন্তত আমরা হইয়াছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ।

গ্রাম ।

আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে,
বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে ।

কে জানে এই গ্রাম,

কে জানে এর নাম,

ক্ষেতের ধানের মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে !

ওধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে !

বেগুনাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশপানে

কত সাঁঝের চাঁদ-ওঠা সে দেখেছে এইখানে !

কত আষাঢ়মাসে

ভিজে মাটির বাসে

বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে ।

সে সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে ।

এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,

এই আঙিনা ডাক-নামে তার জানে পরিচয় ।

এই পুকুরে তারি

সাঁতার-কাটা বারি ;

ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময় !

এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয় ।

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি'
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।

কুশল পুছি তারে

দাঁড়াত তার দ্বারে

লাঙল কাঁধে চলে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষী।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি' দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে,

পারের যাত্রিদলে

খেদার ঘাটে চলে,

কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙাঘাটের বায়ে !
আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গায়ে !

ভরত।

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকরীকে বলিয়াছিলেন—“রামাদপি হি তং মন্ত্রে ধর্মতো বলবন্তরম্।” ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন করিলে তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র ও স্বীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্যের অবোগ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। এমন নির্দোষ—শুধু নির্দোষ বজ্রিলে ঠিক হয় না, রামায়ণ-কাব্যের একমাত্র আদর্শচরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরাঃখিত হই। পিতা তাঁহাকে অন্তায়ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাঁহাকে আনিবার স্ত্রম্ভ যে সকল দূত কেকয়রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল

তাহারাও অযোধ্যার কুশলসদ্বক্ষীয় প্রব্রের উত্তরে যেন ঈষৎ ক্রুর বাঙ্গসহকারে বলিয়াছিল—“কুশলান্তে মহাবাহো যেষাং কুশলঃ মিচ্ছসি”—আপনি যাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না—তিনি কৈকরী ও সহরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। রামবন-বাসোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে তরানক বাগবিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও ইহা একবার এই নির্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্তায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্তায় লাহনা প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাসিতেন যে, “মম প্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ” বলিয়া তিনি বায়ংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাণকে রাম বলিয়াছিলেন—“ধর্মপ্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।” অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি ছই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়া-
ছিলেন, “তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না—ঋদ্ধিবৃদ্ধ পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।” এই সন্দেহের মার্জনা নাই। পিতা দশরথ রামাভিষেকের উল্লেখের সময় ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, “ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও ভরত ধার্মিক ও তোমার অঙ্গুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ!” ইক্ষাকুবংশের চিরাগতপ্রথা অনুসারে সিংহাসন কোষ্ঠদ্বারাই প্রাপ্য, এমত অবস্থায় ধার্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্রমাহাভা এত বুঝিলেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরতদ্বাভা-
শ্রম হইতে হনুমানকে ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—“আমার প্রত্যা-
গমনসংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।” এই সন্দেহও একান্ত অমার্জনীয়। জগতে অপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শধার্মিকের প্রতি

এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষণ বায়ংবার “ভরতস্ত বধে দোষঃ নাহং পশ্যামি রাঘব” বলিয়া আশ্বালন করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্রুজলকণ্ঠে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন—“সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রিষশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশুতি রামস্ত রাজীবাক্ষঃ মহাত্ম্যতিম্।” প্রকৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিবিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এত বড় বড় যন্ত্রণা হইয়া গেল, ভরতের ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সূত্রচালনা করিয়া কৈকয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত বিসম্ভ্র অবস্থায় কৈকয়ীকে বলিয়াছিলেন—“যখন অযোধ্যায় প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।” কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, সেই সকল বাক্যে ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যে রূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুলাচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত বিপুল বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্টকামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড় ধারণপূর্বক দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন কি ভরতবাক্য শ্রুতি পর্যন্ত তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“আপনি সেই নিম্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাপ

অভিপ্রায় বহন করিয়া ত বাইতেছেন না ?”
প্রত্যেকের নিকট কৈকিয়ৎ দিতে দিতে
ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরত
কৈকয়ীকে “মাতৃরূপে মমামিত্রে” বলিয়া
সম্বোধন করিয়াছিলেন—বাস্তবিকই কৈকয়ী
মাতারূপে তাঁহার মহাশত্রুরূপ হইয়া
দাঁড়াইয়াছিলেন—বিশ্বময় এই যে সন্দেহ-
চকুর বিধবাণ ভরতের উপর পতিত হইতে-
ছিল, তাহার মূল কৈকয়ী।

কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলতাব ধারণ
করুক না কেন, ভরতের অপূর্ব ভ্রাতৃত্বের
সমস্ত জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল।
রামকে আমরা নানা অবস্থায় স্মৃতি হইতে
দেখিয়াছি। যখন চিত্রকূটের পুষ্পোদ্ভান-
নিভ এবং কচিং ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রাস্ত অধিতা-
কায় বিলম্বিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুষ্প-
সম্ভারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাম সীতাকে
বলিয়াছিলেন, “এই স্থানে তোমার সঙ্গে
বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজপদ
অকিঞ্চিংকর মনে করিতেছি,” তখন দম্পতির
নির্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের চক্ষে
বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিদায়ক মনে হইয়াছে।
রামচন্দ্রের আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন
প্রসন্ন। কিন্তু ভরতের চিরবিষয় চিত্রটি
মর্শাস্তিক করণার যোগ্য। রামকে যখন
ভরত ফিরাইয়া লইতে আসেন, তখন
তাঁহার জটিল, ক্লম ও বিবর্ণ মূর্তি দেখিয়া
রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, কষ্টে
তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অস্তি-
প্রায়ে কবিগুরু যখন সর্বপ্রথম যবনিকা
উন্মোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্তি

বিষমতাপূর্ণ। এইমাত্র দৃশ্য দেখিয়া তিনি
প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, নর্তকীগণ তাঁহার
শ্রমোন্মত্ত জন্ত সম্মুখে নৃত্য করিতেছে,
সংগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে-
ছেন, ভরতের চিত্ত তারাজ্বল, মুখখানি
শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বা-
ভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া
রহিয়াছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ হইতে
পারিতেছেন না।, এই সময়ে তাঁহাকে
লইয়া যাইবার জন্ত অযোধ্যা হইতে দূত
আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযো-
ধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,
দূতগণ দ্ব্যর্থবাক্যক উত্তরে বলিল—“কুশ-
লাস্তে মহাবাহো যেযাঃ কুশলমিচ্ছসি।” কিন্তু
গতরাত্রের দৃশ্য ও দূতগণের ব্যগ্রতা
তাঁহার নিকট একটা সমস্তার মত মনে হইল।
এই ছই ঘটনা তিনি একটি দৃষ্টান্তের সূত্রে
গাথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন—“বভূব হস্ত
হৃদয়ে চিন্তা স্তমহতী তদা। স্বরয়া চাপি
দূতানাং স্বপ্নস্তাপি চ দশনাত্।”

বহু দেশ, নদনদী ও কাস্তার অতিক্রম
করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চির-
শ্রামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং
আতঙ্কিতকণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন
—“এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না,
নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি
না কেন? বেদপাঠনিরন্ত্র ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠ-
ধ্বনি ও কার্য্যপ্রোতে প্রবাহিত নরনারীর
বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে
শ্রমোন্মত্তানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র
বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত।
রাজপুত্রা চন্দন ও জলনিবেকে পবিত্র হয়

নাই । রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই । অসংখ্য কবাট ও শ্রীহীন রাজপুত্রী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অবোধ্যা নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য ।”

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে । চাঁদের হাট ভাঙিয়া গিয়াছে । ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্তি মহারাজ দশরথ পুত্র-ণ্যোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; অভিষেক-মধ্যে পাদোত্তোলনোচ্ছত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিদিশাপে অভিষিক্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন ; বলয়কঙ্কণকেয়ুর সখীগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনী-বেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন ; যাহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাতব্ধ অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ব ভূষণ ধারণের যোগ্য—“নেই সুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণ ভ্রাতাও বধূর পনাক অমুসরণ করিয়াছেন । অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্ত কঙ্কণ ক্রন্দনের উৎসব চলিতেছে । বিপণী বন্ধ, রাজপথ পরিভ্রান্ত । সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুহরীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না । তিনি মৌন প্রতিহারীদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পিতার একোষ্ঠে গেলেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না । “রাজা ভবতি ভূরিষ্টমিহাশ্রয়া নিবেশনে ।” কৈকয়ীর গৃহে রাজা অনেকসময় থাকেন,— পিতাকে খুঁজিতে ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন ।

সন্তোষবিধবা কৈকয়ী আনন্দে ফুলা, পতি-বাতিনী পুত্রের তাবী অভিষেকব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী

হইতেছিলেন । ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত জটী হইলেন । ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—“যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ ।” এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বস্ত্রবৃকের জায় ভরত ভুলুপ্তিত হইয়া পড়িলেন । “ক স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাত্তাক্লিষ্টকর্মণঃ”— অক্লিষ্টকর্মী পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব ?”—বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন । রাজহীন রাজস্বায়া তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত, বোধ হইল । তিনি কৈকয়ীকে বলিলেন, “রাম কোথায় আছেন ? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাহার দাস,—সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্ত আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে ।” রাম, লক্ষণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্রণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিত্রসংঘর্ষে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন, —“রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে আসক্ত হইয়াছেন —এই নির্বাসনদণ্ড কেন হইল ?” কৈকয়ী বলিলেন—“রাম এ সকল কিছুই করেন নাই ।” শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—“ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশতি ।” শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী কামনার কৈকয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের শ্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন ।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া । ধর্মপ্রাণ বিধবু ভ্রাতা

এই হুঃসহ সংবাদের মর্ম্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহা-দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সম-য়োগযোগী মনে করি। “তুমি ধার্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্ম্মবংশল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।” যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে-ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা স্ত্রীজাতকে বলিলেন—“ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আনিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।” কৃশাক্ষী স্ত্রীজা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও।” এই কটুক্তিতে মর্ম্মবিক্ত ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন; তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিদগুণ্ড জ্ঞানিতেন না,—বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জার অতিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে শোকে মুহমান হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্ম্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহাকে জুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। অশ্রুধারাতে মৃত পিতার কণ্ঠস্বর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

“পিতা, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?” অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোক-বিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের জায় ছুটিয়া তাহা-দিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। “ইক্ষাকু-বংশের প্রথাহুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনা-গীতি গাহিতেছ?” রাজমৃত্যুর চতুদশ দিবসে বশিষ্ঠপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন—“রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুদশ বৎসরের জন্ত আমিও বনবাসী হইব।”

শত্রুগ্ন মহরাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকয়ীকে তর্জন করিয়া অমুসরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে কিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শূন্যবেশপুরীতে শুহকের সঙ্কট ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে শুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইন্দ্রদ্রুম্যে, তৃণশয্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাজ্যব্যাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহনপাঁড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল,

সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু ত্বণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শক্রয় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে লাগিলেন,—রাণীগণ এবং সচিব-বৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুগয়ে ভরত জ্ঞানলাভ করিয়া স্নানক্রমেণে বলিলেন, “এই নাকি তাঁহার শয্যা,—যিনি আকাশ-স্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত, যাহার গৃহ পুষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত, যে গৃহশেখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি, ও গীতবাদিত্রিশঙ্কে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাকনভিত্তিসমূহ কারুকাণ্ডের আদর্শ,—সেই গৃহপতি ধূলি-লুপ্তিত হইয়া ইজুদীমূলে পড়িয়া ছিলেন, এ কথা শ্রবণের শ্রায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্ত। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব, ভোগবিলাসের দ্রব্য আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে ভটাবকল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনধারণ করিব।”

এবার ভটাবকলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরতাজমুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অঙ্গসন্ধান করিয়াছিলেন। এই সর্বত্র ধ্বিও প্রথমত সন্ধেহ করিয়া ভরতের মনঃপিড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরতাজের আশ্রমে আতিথ্যাগ্রহণ করিয়া মুনির নির্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্রকূটান্তিমুখে রওনা হইলেন। ভরতাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন—

ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, “ভগবন, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণ-দেহা সৌম্যমূর্তি দেবতার শ্রায় দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা, উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুকপুষ্প কর্ণিকারতরুর শ্রায় শীর্ণাঙ্গী—ইনি লক্ষণ ও শক্রয়ের জননী সুমিত্রা। আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতি-ঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা প্রজ্ঞা-মানিনী ও রাজ্যাকামিকা—এই হর্ভাগ্যের মাতা।” বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের শ্রায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সমিহিত হইয়া ভরত জননী-বৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আশ্র ও লোহদল পক্ষ হইয়া শাখাগ্রে হুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাত্মি পুষ্পসম্ভারে প্রেমোদ-উজ্জানের শ্রায় সুন্দর, কোথাও পর্কতগাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশৃঙ্গ উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চূষন করিয়া আছে—অদূরে মন্ডাকিনী,—কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীমমান। ভরতরাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের শ্রায় বায়ুর্জুক ঘন আকোলিত হইতেছিল, কোথার পার্শ্বত ফলরাশি শ্রোতো-

বেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—“রাজ্য-নাশ ও অস্থিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাইতেছে না, আমি এই পার্শ্বতা দৃশ্য-বলীর নির্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেছি।”

এই কথা শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুলিত হইয়া উঠিল, সৈন্তরেণুতে দিয়াগুল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে পশুপক্ষী চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র যুগয়ার জন্ত এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তর আগমনে এই সৌম্যানিকেতনের শান্তি এভাবে বিঘ্নিত হইতেছে?” লক্ষণ দীর্ঘপুশিত সাগরকর অগ্রে উঠিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ক-দিকে সৈন্তশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, “অগ্নি নির্ঝাঁপ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন।” “কাহার সৈন্ত আসিতেছে, কিছু বুকিতে পারিলে কি?” এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষণ বলিলেন, “অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রান্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্নিত রথধ্বজ দেখা যাইতেছে,—অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমোরখ হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্ত ভরত আমাদের বধ-শুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।”

রামচন্দ্র বলিলেন—“ভরত আমাদেরকে কিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। সকল

অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহ-পরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অত্যাঘ সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রুরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজ্যলোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব।” ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অনশনক্লশ ও শোকের জীবন্ত-মূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের স্নায় উচ্চকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন—“হেমছত্রাধার মন্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জল নিরোদশে আজ ভটাতার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু ধারা মার্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কাস্তি ধূলিধূসর। দিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্ত্র, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,—আমার জন্তই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোক-গর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!” বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই ছই ত্যাগী মহা-পুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথার জটাকট, দেহে চীরবাস, তিনি কৃতাকলি

হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুপ্তিত । রামচন্দ্র বিবর্ণ ও ক্লেশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মন্তকোত্তরপূর্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—“বৎস, তোমার এ বেশ কেন, তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে ।”

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন—“আমার জননী মহাবীর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসদাস্য, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, ক্রাপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন ।” বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল—ভরত বলিলেন, “আমি চতুর্দশবৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্তব্য ।” কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনরত ধারণ করিয়া কুটীরধারে তৃপ্তিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন । রামচন্দ্র এই অবস্থার সাদরে উঠাইয়া নিজের পাত্ৰকা তাহাকে প্রদান করিলেন । জটাবার শোভাধিত করিয়া ভ্রাতৃপাদরজে বিহ্মিত পাত্ৰকা তাহার মুকুটের স্থানীয় হইল । সহস্র ভূষণে বে শোভা নিতে অদম্য, এই পাত্ৰকা সেই অপূর্ণ রাজ্যে ভরতকে প্রদান করিল । ভরত বিনয়কালে বলিলেন, “রাজ্যভার এই পাত্ৰকা নিবেদন করিয়া চতুর্দশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিব ।” অযোধ্যায় সন্নিকটবর্তী হইয়া ভরত বলিলেন, “অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহাসন ওহার প্রবেশ করিতে পারিব না ।” নন্দিগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল,

উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম । সচিববৃন্দ জটাবকলপরিহিত কলমূলাহারী—রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহারথ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাহারা সকলে কাষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন । সেই কাষায়বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দে পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে ক্লান্ত, ভাগী রাজকুমার পাত্ৰকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দশবৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন ।

ভরতের এই বিষয় সুদীর্ঘানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া ছিল । যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্নতবেশে পম্পা-তীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—“এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্যাবলি সীতার বিরহে ও ভরতের চঞ্চল মন করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না ।” আর একদিন লঙ্কার রামচন্দ্র স্বগ্রীবকে বলিয়াছিলেন, “বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইবে ?”

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই পাত্ৰকা দ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “দেব, তুমি যে অযোগ্য করে রাজ্যভার স্তম্ভ করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর । আমি তোমার রাজ্য যতপূর্বক রক্ষা করিয়াছি, রাজ্যকোষে যে অর্থ সঞ্চিত ছিল, এই চতুর্দশবৎসরে তাহা দশগুণ বেশী হইয়াছে ।”

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র । সীতা লঙ্কাকে যে কটুক্তি করিয়াছিলেন, তাহা অমার্জন্য নহে । রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্যই সমর্থন করা যায় না । লঙ্কণের কথা অনেকসময় অতি

কক্ষ ও' ছবিবিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, “কোন কোন জল-জন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।” কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাত্ৰকার উপর হেমছত্রধর জটাবকলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামারণে এক অধিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সতাই বলিয়াছিলেন—“রামা-দম্পি হি তং মন্ত্রে ধন্যতো বলবন্তরম্।”

কৈকয়ীর সহস্রদোষ আমরা ক্ষমাই মনে করি, যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি শুভকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি—

“ধন্যবঃ ন ভয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অথত্বাদাগতং রাজ্যং যৎ তাত্তুমিহেচ্ছসি।”

অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্ত, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মুচ্ছকটিক।

মুচ্ছকটিকের রচনাকালসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে, এই নাটকখানি অতি প্রাচীন, অর্থাৎ কালিদাসের সময়ের বহুপূর্ব-বর্তী; আবার অন্তপক্ষীয়েরা বলেন যে, এই নাটকখানি শকুন্তলারচনার বহুপূর্ববর্তী সময়ে রচিত। যথাসাধ্য এ বিষয়ের একটা মীমাংসা কুরিতে চেষ্টা করিব।

রাজশেখর প্রভৃতি আধুনিক নাটককার-দিগের পূর্বসময়ের যে সকল নাটক পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বিশাখদত্ত এবং ভট্টনারায়ণের গ্রন্থই প্রাচীন এবং প্রধান। বাণভট্ট স্বকবি হইলেও, তাহার পার্শ্ববর্তীপরিণয় নাটক (সম্ভবত কবির বাণ্যরচনা বলিয়া) কাব্য এবং নাট্যকৌশলের হিসাবে, এত অকিকিৎসকর যে, সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনায় উহার উল্লেখ না করিলেও চলে। কালিদাস বহু

শতাব্দীর কবি বলিয়াই অনুমিত হইতেছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছি; তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে আরও দুইচারিটি কথা বলিব। হুনেরা যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে ভারত-বর্ষে আগমন করে নাই, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাসের কাব্যে এই হুনদিগের কথা আছে, সুতরাং ইনি যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বসময়ের কবি নহেন, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না। ৪০১ হইতে ৪১৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কাল; কিন্তু ইহার সময়ে যে হুনেরা আগমন করে নাই এবং হুনদিগের সহিত যুদ্ধ যে ইহার সময়ের পরে, তাহাও জানিতে পারা যায়। ইহার পৌত্র বাল্মীকি হুনদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন; এবং হরত কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের সময়েও হুনদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। ৪১৫ হইতে ৪৫৪ পর্যন্ত

কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ; এবং স্বন্দগুপ্তের রাজত্ব ৪৫৫ হইতে ৪৬৮ পর্য্যন্ত । যাহারা কালিদাসকে খুব প্রাচীন করিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাকে এই যুগে, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া নির্দেশ করেন । এই অল্পমানের সপক্ষে যাহা বলা হয়, তাহা এই যে, স্বন্দগুপ্ত যখন কবি এবং কাব্যপ্রিয় ছিলেন, তখন হুনযুদ্ধের সমসাময়িক কবি কালিদাসের তাঁহারই সভায় থাকিবার কথা । চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত এবং স্বন্দগুপ্ত উচ্ছিন্ননীতে রাজত্ব করিতেন না ; এবং মালবদেশে তখন তাঁহাদের শাসনকর্তাদিগের দ্বারা শাসিত হইত । কিন্তু কালিদাস উচ্ছিন্ননীতে বসিয়া কবিতা লিখিতেন এবং তত্রত্য মহাকাব্যের উৎসবে স্বরচিত নাটক অভিনয়ের জন্ত উপস্থাপিত করিতেন ; অতএব তাঁহাকে কবিপ্রিয় স্বন্দগুপ্তের সভাপণ্ডিত বলিতে পারি না । চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত অথবা স্বন্দগুপ্তের সময়ে গুপ্তরাজপ্রতিনিধিশাসিত মালবদেশে একজন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অবস্থিনাথ কদাপি বণিত হইতে পারিতেন না । পৌরাণিক আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ হইতে এ বিষয়ে একটি প্রমাণ দিতেছি । মহাভারতে মদনভঙ্গের গল্প নাই ; রামায়ণে ঐ গল্প আছে বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হইতে সমুদায় বিবরণ পাওয়া যায় না । পুরাণের গল্পে মদনের একটিমাত্র স্ত্রী, তিনি রতি । কালিদাসের কাব্যেও এই কথা পাওয়া যায় । কিন্তু কুমারগুপ্ত এবং স্বন্দগুপ্তের সময়ে ঐ পৌরাণিক গল্পটি যে ভাবে প্রণীত ছিল, তাহাতে মদনের দুইটি পত্নীর নাম পাই ;—রতি এবং প্রীতি । কুমারগুপ্তের

মালবদেশের শাসনকর্তা বজ্রবর্ম্মা পশ্চিম-মালবের দশপুরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার উপলক্ষে ৪৭২ খৃষ্টাব্দে যে প্রস্তরলিপি খোদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দুইটি নদী দ্বারা বেষ্টিত দশপুরনগরের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে :—

যদ্ভাত্যতিরম্যসরিদ্বয়েন চপলোদ্বিগ্ধা সমুপগৃঢ়ম্ ।

রহসি কুচশালিনীভ্যাং প্রীতিরতিভ্যাং স্মরাদমিব ॥

অর্থ :—এই (দশপুর) নগর চঞ্চলতরঙ্গশালী অতিরমণীয় নদীদ্বয়ে আলিঙ্গিত হইয়া, কুচশালিনী প্রীতি এবং রতি কর্তৃক নিৰ্জ্জনে আলিঙ্গিত স্মরের মত শোভা পাইতেছে ।

কালিদাসের সময়ের পুরাণ যে ইহার পরবর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই । অশ্রান্ত কারণ অন্তর প্রদর্শিত হইয়াছে ; এবং তদ্বারা কালিদাস যে ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । খ্রীঃপূঃ এবং বাণভট্ট যে পঞ্চম শতাব্দীর কবি, তাহা রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রস্তরলিপি এবং বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতেই প্রমাণিত । ঠিক সময়টি যখনই হউক, ভবভূতিও এই যুগের কবি ; এবং ইহাদের পরবর্তী হইলেও বিশাখদত্তও এই যুগের কবি । বেণীসংহারকর্তা ভট্টনারায়ণের একখানি দানলিপি পাওয়া যায়, সেখানি ৮৪০ খৃষ্টাব্দের । যে যুগ কালিদাস হইতে ভট্টনারায়ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহারই মধ্যে ভারবি, হুবহু, ধাবক, ভর্তুহরি প্রভৃতি কবিগণের অভ্যুদয় । মুচ্ছকটিক যে এই আলংকারিক সাহিত্যযুগের মধ্যে রচিত না হইয়া বহুপূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে দৃঢ় প্রমাণের প্রয়োজন হয় । গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে যে

আলঙ্কারিক সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষুণ্ণতা হইয়াছিল, তাহা তাত্‌কালিক প্রত্নরূপি পড়িয়াও বুঝিতে পারা যায়। হইতে পারে যে, মুচ্ছকটিক অতি প্রাচীন না হইলেও, কালিদাসাদির পূর্বে ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এ অসুমানস্থাপনার অসম্ভব কোন প্রমাণ পাই নাই; বরং যত ভাবিয়া দেখি, ততই মনে হয় যে, মুচ্ছকটিক অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণগুলি এই :—

১। নাটকব্যবহৃত-প্রাকৃতভাষা-সংবলিত যে সকল গ্রন্থের সময় একপ্রকার নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিই ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। যে সাহিত্য ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার কোনখানিতেই এই প্রাচীন প্রাকৃতভাষা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতভাষা যে ঐ সময়ের পূর্বে গ্রন্থে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হয় নাই, তাহা ১৩০২ সালের পৌষমাসের প্রবাসীতে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখিয়াছি। এরূপ হলে যদি প্রমাণ করিতে পারা না যায় যে, চতুর্থ শতাব্দীতে অথবা তৎপূর্বে এই ৪র্থ শতাব্দীর প্রাকৃতভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে মুচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা যায় না।

২। পালির সহিত প্রথমতঃ সংস্কৃতের যত নৈকট্য ছিল, প্রাকৃতের সহিত ততটা ছিল না। যে প্রাকৃত যত একালের, তত তাহার সহিত সংস্কৃতভাষার দূরত্ব। মুচ্ছকটিক যদি কালিদাসের সময়ের পূর্ববর্তী হয়, তাহা হইলে মুচ্ছকটিক-ব্যবহৃত প্রাকৃতের, সংস্কৃতের অধিক অসুস্থরূপ হইবার কথা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই যে, কালিদাসের সময়ের প্রত্যেক প্রাকৃত-শব্দেরই একটি অসুস্থরূপ ব্যুৎপাদক সংস্কৃত-শব্দ আছে; কিন্তু মুচ্ছকটিকে এমন অনেক প্রাকৃতশব্দ পাওয়া যায় যে, যাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিতে হইলে, স্বতন্ত্র একটি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। ছিনালিয়াপুত্র (পুংস্‌চলীপুত্র), গোড় (পদ), মগ্গিহং (প্রাথয়িতুম্), বেলহ (ক্ষিপ্ত), পোট (উদর), হড়ক (হৃদয়), পিটহ (বাংলা পেটো বা মারো) প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন শব্দ—কালিদাস, ভবভূতি বা ত্রিহর্ষে পাওয়া যায় না। যে সকল সংস্কৃতভাষা শব্দ প্রাকৃতে ব্যবহৃত, তাহাতে এই একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দগুলি যত প্রাচীন সময়ের, তত সেগুলি সংস্কৃতশব্দের কাছাকাছি। কালিদাসের সময়ে আয়া, আয়নঃ প্রভৃতির স্থলে অন্না, অন্তন প্রভৃতি দেখিতে পাই; কিন্তু ৪র্থ শতাব্দীর রসাবলীতে অন্না, অন্তন প্রভৃতি একালের ‘আপন’-শব্দের কাছাকাছি শব্দ পাই। মুচ্ছকটিকেও তাহাই; বরং সংস্কৃতের ‘ত’এর স্থলে ‘প’ খুব বেশীপরিমাণে ব্যবহৃত। ‘কর্তন করিব’ কথার প্রাকৃতে ‘কন্নেম’ দেখিতে পাই। তাহার পর বুড়া (বৃদ্ধ), হলয়ঃ (হৃদয়ঃ), বইয় (বলীবর্দ) প্রভৃতি শব্দ দেখিলে এই প্রাকৃত যে রসাবলীর প্রাকৃতেরও পরবর্তী, এইরূপই মনে করা সম্ভব। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, মুচ্ছকটিকের যে সকল প্রাকৃতশব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সকলগুলিই একালের বাংলা, উড়িয়া, মারাঠা প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সম্পূর্ণ নিকট-

বর্তী। ‘দয়িসং’ কথাটা বাদ দিয়া ‘ভুভুম্বে গোড়ং দয়িসং’ বলিলে, খাঁটি উড়িয়া বলিয়া মনে হয়। ‘ভূহ বগ্ন কেলকে পবহণং’—তোর বাপের কেলো গাড়ি—কথাটার গায়েও একালের গন্ধ আছে।

৩। মহাভারতের কোন্ অধ্যায়গুলি প্রকৃষ্ণ বা পরবর্তী সময়ের, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু ঐ গ্রন্থের যে অংশ সন্দেহবিক্ষিত, তাহাতে এমন শব্দের ব্যবহার নাই, যাহা স্বভাবজশব্দের অমুহুর্তিমূলক। খটখট, ঠংঠং, ঝন্ঝন্ প্রভৃতি শব্দ আদৌ নাই। ‘প্রকৃষ্ণ অংশেও বড় জোর কোলাহল প্রভৃতি ছুইচারিটি শব্দ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ের রামায়ণেও তিনচারিটি ব্যতীত এই প্রকারের শব্দ নাই, যথা—হলহলা, গদগদ এবং হস্তা (গাভীর শব্দ)। রামায়ণের সময়ে অমুহুর্তিমূলক শব্দ প্রায় নূতনব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। কারণ পার্বী প্রভৃতির সঠিক ডাক অন্ত কোন গ্রন্থে স্থান পায় নাই। অরণ্যকাণ্ডের ২৩শ সর্গে আছে :—

চীতকৃষ্ণাতি ব্যস্তস্তো বহুবুত্র সারিকাঃ ।

পঞ্চম শতাব্দীর পঞ্চতন্ত্রেও তৎপূর্ব সময়ের অমুহুর্তিমূলক শব্দগুলি কেবল বিশেষ্য-(সংজ্ঞা)-রূপে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। ‘মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যে ঐ শব্দগুলি ক্রিয়াক্রমে ব্যবহৃত হয় নাই। ভারবি এবং কালিদাসে ঐ শব্দগুলির আদৌ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, বড় বড় কাব্যে ভাল ওনার না বলিয়া, ওগুলি কেবল নাটকাদিতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ষর, ঝড়ার,

হাজার প্রভৃতি লিখিলে যে ভাষার গৌরব কমিয়া যাইত, তাহা মনে হয় না। পরবর্তী সময়ে যখন ঐগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন আলঙ্কারিকেরা ভাষার গ্রাম্যতাদোষ নির্দেশ করেন নাই। বরং ঐ কথাগুলিতে যে যথেষ্ট তেজ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। কালিদাস যেন রঘুবংশ বা কুমারসম্ভবে ঐ সকল শব্দ কাব্যগৌরবের জন্য ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু শকুন্তলাদিতোও উহার ব্যবহার নাই কেন? কথা এই যে, প্রথমে বিস্তৃত সংস্কৃত চলিয়াছিল, তাহার পর প্রাকৃত-ভাষা দিন দিন প্রবলতা লাভ করিলে নিম্ন-ব্যবহৃত শব্দগুলি ধীরে ধীরে সংস্কৃতভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে।

সুবন্ধুর সময়েও এই শ্রেণীর শব্দগুলি ক্রিয়াক্রমে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার পরবর্তী সময়ে ভবভূতি, বাণভট্ট ও শ্রীহর্ষের রচনায় যথেষ্টরূপে উহার ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত। প্রাচীন যে সকল শিলালিপি এবং তাম্র-শাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতেও সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী লিপিতে ঐপ্রকার ক্রিয়-পদের ব্যবহার দেখা যায় না। এটা খুব বিশেষ রকমের কথা নহে কি? কাজেই যখন মুচ্ছকটিকে খটখটায়তে, ফুফুঁরায়তি, মড়মড়ায়ি স্ব প্রভৃতির প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাই, তখন ঐ গ্রন্থখানি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয় না। পাণিনির সহিত আমার পরিচয় নাই; পরিচয়লাভ করিবার অধিকারও নাই। অনিবার্য, ঐ ব্যাকরণের কোন হুজুয়ারা ঐপ্রকার ক্রিয়-পদ সাধিবার উপায় আছে। ঐ হুজু কোন সময়ে রচিত, তাহাও জানি না; কিন্তু কোন

শ্রেণীর একটি শব্দ প্রচলিত থাকিলেও, ব্যাকরণে তাহার জন্ত স্থান রচিত হইত। অতীতকালে যখন ধারাবাহিকভাবে একটা শব্দব্যবহারের পদ্ধতি পাওয়া গেল, তখন বিপরীত মত সমর্থন করা সহজ নহে।

৪। মূর্খ শকার যেখানে পাণ্ডিত্য দেখাইতেছে, সেখানে বলিতেছে—

কিংশে শকে বালিপুস্তে মহিলে

লভাপুস্তে কালগেমী সুবন্ধু।

লুপ্তে লাক্ষা লোণপুস্তে জটউ

চাণক্যো বা ধুন্ধুমালে তিশঙ্কু।

এখানে চাণক্য, ধুন্ধুমার প্রভৃতি সকল নামই মূর্খ শকারের নিকট পৌরাণিক। সে যত বড় বড় নাম শুনিয়াছিল, সবগুলিই একনিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়াছে। ঐ নামগুলির মধ্যে চাণক্য এবং সুবন্ধু ব্যতীত সকলগুলিই রামায়ণ এবং মহাভারতে পাওয়া যায়। “চাণক্যো যথা সীতা” হইতে চাণক্যকেও যে মূর্খ শকার পৌরাণিক বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা জানা যায়। সুবন্ধু নামটি কবি সুবন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও নামে পাওয়া যায় না। সকল নামগুলিই যখন প্রকৃত নাম, তখন একটা বৃথা নাম উচ্চারিত হইয়াছে, বলা যায় না। কবি কৌশল করিয়াই নানাশ্রেণীর নাম একসঙ্গে গাথিয়া হস্তুরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি সুবন্ধুর খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল এবং মূর্খ শকার ঐ নামটি পৌরাণিক করিয়া লইয়াছিল, এইরূপ মনে করাই সম্ভব। এ স্থানে একথাও বলিয়া রাখি যে, রাজশালকের শকার নাম যখন অলঙ্কারগ্রন্থের আদর্শস্বরূপ নাম হইতে গৃহীত, তখন নিশ্চয়ই মুচ্ছকটিক পুরাতন গ্রন্থ নহে।

৫। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও কামদেবের জন্ত মন্দিরসৃষ্টি হয় নাই। এপর্যন্ত অনেক মন্দিরের লিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কামদেবের মন্দিরের কথা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর অন্ত নাটকে যাহা পাই, মুচ্ছকটিকেও তাহাই পাইতেছি; ইহাতে কামদেবের আদ্যতনের কথা আছে। গৃহে দেবতারা বলি পাইতেছেন এবং দেউলে দেবী প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, এ সকলগুলি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কদাপি মুচ্ছকটিক দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ হইতে পারে না।

৬। মুচ্ছকটিকে গভাক বা বিকল্পকাহিনী নাই দেখিয়া উহাকে প্রাচীন বলা যায় না। মুদ্রারাক্ষসেও দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্ক ব্যতীত গভাক-বিকল্পকাহিনী নাই। মুচ্ছকটিকের প্রতি অঙ্কের শেষে যেমন শ্রব্য কাব্যের মত ‘ইতি অমুক নান, অমুক অঙ্ক’ আছে, ভবভূতির তিনখানি নাটকেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তখন ঐ প্রথাও প্রাচীনতার পক্ষে বলিয়া কেহ নিদেশ করিতে পারেন না।

মহু-যাজ্ঞবল্ক্যাদির অনুশাসনে যাহাই থাকুক, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে লোক-ব্যবহারে যে প্রকৃত প্রস্তাবে অনার্য রমণীকে বিবাহ করিয়া আখ্যোরা তাহাকে আখ্যসমাজ-ভুক্ত করিতেন, দশকুমারচরিতে অশ্বরোহিত-নন্দিনীর কথা তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ যে কদ্রিয়রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর ভগবদ্গোবিন্দের পিতা রবিকীর্তি তাহার দৃষ্টান্ত। ক্রীষ্টসাহেবের প্রাচীন লিপিসংগ্রহে এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত আছে। এরূপ স্থলে অন্ত কোন সমাজচিত্রসংবলিত

নাটকের অভাবে, মুচ্ছকটিকে বসন্তসেনার বিবাহের কথা দ্বারা, ঐ গ্রন্থের সময়নির্ণয় হয় না। যখন অল্প প্রমাণের বলে মুচ্ছকটকের কাল নিরূপিত হয়, তখন ঐ প্রকার লোকব্যবহার তৎসময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার সুবিধা হয় মাত্র।

সত্য নির্ধারিত হউক। যে সকল কারণে মুচ্ছকটিক ৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা লিখিলাম। আমার সিদ্ধান্ত ভ্রাম্যক বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমি কিছুনাও দুঃখিত হইব না; বরং যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নৌকাডুবি।

৭

বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে, এ কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী, তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কি মনে হইল?”

বালিকা কহিল, “আমি ত তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নীচু করিয়া ছিলাম।”

রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই?

বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল। তোমার নাম আমি শুনিই নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাটিয়াছেন। আমি খুব দুঃখী ছিলাম, আমি তাহাকে কেবল আলাতন করিয়াছি।

রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখ দেখি!—

রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেন্সিল দিল। সে বলিল, “তা বুঝি আমি আর পারি না! আমার নাম বানান করা খুব সহজ।”—বলিয়া বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম লিখিল শ্রীমতী কমলা দেবী।

রমেশ। আচ্ছা, আমার নাম লেখ।

কমলা লিখিল, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল—“কোথাও ভুল হইয়াছে?”

রমেশ কহিল—“না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখ দেখি!

সে লিখিল, খোবাপুকুর।

এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত

আবিকার করিল, তাহাতে বড়-একটা সুবিধা হইল না ।

তাহার পরে রমেশ কর্তব্যসম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল । খুব সম্ভব, ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে । যদি-বা শ্বশুরবাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহার ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না, সন্দেহ । মামার বাড়ী পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না । এতকাল বধূভাবে অন্তের বাড়ীতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কি গতি হইবে, কোথায় ইহার স্থান হইবে ? স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে ? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে, সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে ।

আর একটি কথা । রমেশকে এই বালিকা স্বামী বলিয়া জানিয়াছে । সমস্ত সংসারের অতিকূলতার মধ্যে রমেশের আদরযত্ন পাইয়া তাহার প্রতি সে ভালবাসার সঙ্গে নির্ভর করিতেও শিখিয়াছে, এখন ইহাকে কেমন করিয়া রমেশ বলিবে যে, ‘আমি তোমার স্বামী নহি, তুমি বিধবা !’ তা ছাড়া, ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্তকোনরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্ততঃও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই । কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না । রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানাবর্ণের স্নেহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে

হইল । মস্তের দ্বারা যে সম্বন্ধ পবিত্র হয় নাই, তাহা দিয়া গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠা চলে না । পরের স্ত্রী, এ কথা মনে করিবামাত্র রমেশের সেই কল্পনাচ্ছবির হস্ত হইতে তাহার ঘরের প্রদীপটি খসিয়া পড়িল—তাহার চিরজীবনের ঘরটি অন্ধকার হইয়া গেল ।

রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না । কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া একটা কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল ।

কলিকাতা দেখিবার জন্ত কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না । প্রথমদিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানুয়ারি গিয়া বসিল—সেখান হইতে জনশ্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কোতূহলে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল । ঘরে একজন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন । সে বালিকার বিষয়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল—“হাঁগা, হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ ? বেলা যে অমেক হইল, ‘চান’ করিবে না ?”

ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ী চলিয়া যাইবে । রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না । রমেশ ভাবিতে লাগিল—“কমলাকে এখন ত এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না—অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কি করিয়া রাত কাটাইবে ?” কমলা তাহার নিজের ধন নয়, এইজন্য কমলা রমেশের পক্ষে এক বিয়ম

তৃতীয় সংখ্যা।]

তার হইরা উঠিল—তাহাকে কোলাও যায় না,

তাহাকে রাখাও শক্ত। সম্পূর্ণ পর এবং

সম্পূর্ণ আপনের মাঝখানকার এই

অপূর্ণ সম্বন্ধ-সমতা রমেশের জীবন

হুসুহ কঁাসের মধ্যে জড়াইয়া বাঁধি

কি উপায়ে ইহার নিষ্কৃতি, ও

ভাবিয়া পাইল না। না এ প্রাণটুকু,

রমেশ কমলাকে আছে হে এ ধরায়,

কহিল, এ কোন্ জন?

হইলোরে বিধি, এ হেন পরানী কেন

করিলে সৃজন!

বুঝে মিষ্ট কথা, নিস্ত্রিতের স্বপ্ন মত,

তনিত্তে হৃদয়।

ভোরের বেলায় রমেশ জাগিয়া চমকিয়া

উঠিল। দেখিল, নিস্ত্রিত কমলার ডান হাত

সকলি হৃদয়ের যার, মস্তকপের 'পরে আপন বিশ্বত

বল দরায়;

বতনে সর্বাঙ্গ গঠি, অনাদরে কেন বল,

স্বজ্বিলে হৃদয়।

হারের সংসার তোর, পরম পীযুষ বাহা,

করেছি সেবন।

হারের সংসার তোর, অমূল্য রতন বাহা,

দেখেছি সে ঘন।

পীযুষে গরল তোর, রতনে ভুলজফনা,—

তাও—আধ আধ!

এ প্রাণ হৃদয়ে যার, তোমার ভাঙারে তার,

মিটে না রে সাধ!

শ্রী ঈঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দু-বংশ-চরিত অর্থাৎ কাকি-

পতি মহোদয়গণের বংশের সং-

গ্রহণ। জীবনওয়ারিচরিত চৌধুরী-

মোহাম্মদহুসুহ বংশচরিত লি-

খিত কবিরাজের, ভাল ছবিরাছে।

চরিত মোহাম্মদহুসুহ ০ লেখা

গাথ আমরা নিষ্ঠুর জানি না।

প্রথমতঃ “কাকিনীরাধিপতি মহোদয়-

গণ” এই করুণী কথা পড়িয়া আমাদের

সন্দেহ হয়। কাকিনীয়ার একঘর অধি-

পতি আছেন, এ কথা আমরা এ

পর্যন্ত জানিতাম না; এক্ষণে জানিলাম

যে, গ্রন্থকারের ভুল ইহা। যদি

উপর্যুক্ত ব্যক্তিব্যায় বংশচরিত লিখিত

হয়, তাহা হইলে উপকার আছে

‘বংশ’ কাকি

পাখা কারে

কমলা রমেশের

আশ্রয় করিয়া আরামে ঘুমাইরা পড়িল।

অন্যকার

বক্ষপট

এতবড়

মেরে

হইরা

আমি

ইহুলে

যাইব ?

ফমলা,

গাহিয়া

তা ও

লি।

কমলা

গামাকে

কমলার এই বয়োমর্যাদার অভিমানে রমেশ জ্বলন্ত হাসিয়া কহিল, “তোমার চেয়েও অনেক বড় মেয়ে ইকুলে যায়।”

কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া একদিন রমেশের সঙ্গে ইকুলে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ী—তাহার চেয়ে অনেক বড় এবং ছোট কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিজ্ঞানলের কর্তার হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, “কোথায় আসিতেছ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।”

কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, “তুমি এখানে থাকিবে না?”

রমেশ। আমি ত এখানে থাকিতে পারি না।

কমলা রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চল।”

রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল—“ছি কমলা।”

এইধিকারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোট হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীতমুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

৮

এইবার আলিপুরে ওকালতীর কাজ শুরু করিয়া দিবে, রমেশের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেছে। চিন্তা স্থির করিয়া কাজে হাত দিবার এবং প্রথম কার্য্য-

রম্ভের নানা বাধাবিষয় অতিক্রম করিবার মত ক্ষুণ্ণ তাহার ছিল না। সে এখন কিছুদিন গঙ্গার পোলের উপর এবং গোলদীঘিতে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার মনে করিল কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া আসি, এমন-সময় অন্নদাবাবুর কাছ হইতে একখানি চিঠি পাইল।

অন্নদাবাবু লিখিতেছেন, “গেজেটে দেখিলাম তুমি পাস্ হুইয়াছ—কিন্তু সে খবর তোমার নিকট হইতে না পাইয়া হুঃখিত হইলাম। বহুকাল তোমার কোন সংবাদই পাই নাই। তুমি কেমন আছ এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিত ও স্মৃণী করিবে।”

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অন্নদাবাবু যে বিলাতগত ছেলেটির 'পরে তাঁহার এক চক্ষু রাখিয়াছিলেন, সে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক ধনিকতার সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে। সুতরাং হঠাৎ রমেশের উপরেই অন্নদাবাবুর হুই চক্ষুর দ্বিধাবিহীন প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইল।

ইতিপূর্বে হেমলিনীর স্মৃতি বিদ্যাতে মত রমেশের মনে মাঝে মাঝে খেলিয়া গেছে। কিন্তু রেখাপাত করিয়া দিবার সময় পায় নাই। কমলা যখন বিজ্ঞানলে চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ অন্নদাবাবুর এই চিঠি পাইয়া তাহার শ্রুতমনে পূর্ব্বেকার কথা সমস্ত জাগিয়া উঠিল। তখন অধ্যয়নপরা তাহার সেই পূর্ব্বে প্রতিবেশিনীর মুখচ্ছবি তাহার মনের মধ্যে জোয়ারের টান ধরাইয়া দিল।

কিন্তু পাঠকগণ রমেশের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে এটুকু বুঝিয়া থাকিবেন, কর্তব্যসম্বন্ধে রমেশের বোধশক্তি অত্যন্ত সচেতন। যেখানে কোনপ্রকার দ্বিধার কারণ আছে, সেখানে সে অতিশয় সন্মত করিয়া চিন্তা করে। প্রবৃত্তি যখন তাহার প্রবল হয়, তখন তাহার চিন্তার প্রবলতাও বাড়িয়া উঠে। এইজন্ত যেটা সে অত্যন্ত বেশি চায়, সেইটেতে প্রবৃত্ত হইতেই তাহার সব চেয়ে বিলম্ব ঘটে।

ইতিমধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটয়াছে, তাহার পরে হেমনলিনীর সহিত পূর্বের স্থায় সাক্ষাৎ করা তাহার কর্তব্য হইবে কি না, তাহা সে কোনমতেই স্থির করিতে পারিল না। মনে মনে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ বাধিয়াছিল, সে বন্ধন সে কি পিতার আদেশে ছিন্ন করে নাই? সে যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এ সংবাদটুকুও সে হেমনলিনীর কর্ণগোচর হইতে দেখে নাই। যদিচ দৈবক্রমে তাহার সে বিবাহ হইয়াও না হইবারই মত হইল, তথাপি তাহার অদৃষ্টজাল যথেষ্ট জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কমলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, সে কথা কাহাকেও বলা সে কর্তব্য বোধ করে না। নিরপরাধা কমলাকে সে সংসারের কাছে অপদস্থ করিতে পারে না। অথচ সকল কথা স্পষ্ট না বলিয়া হেমনলিনীর নিকট সে তাহার পূর্বের অধিকার লাভ করিবে কি করিয়া?

কিন্তু অন্নদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করা আর ত উচিত হয় না। সে লিখিল, “গুরুতর কারণবশত আপনাদের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়াছি, আমিাকে মার্জনা করিবেন।” নিজের নূতন ঠিকানা পত্রে দিল না।

এই চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া তাহার পরদিনেই রমেশ শামলা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল।

একদিন সে আদালত হইতে ফিরিবার সময় কতক পথ হাঁটিয়া একটি ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন-সময় একটি পরিচিত ব্যগ্র-কণ্ঠের স্বরে শুনিতে পাইল—“বাবা, ঐ যে রমেশবাবু!”

“গাড়োয়ান, রোখো, রোখো!”

গাড়ি রমেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন আলিপুরের পশুশালায় একটি চড়ি-ভাতির নিমন্ত্রণ সারিয়া অন্নদাবাবু ও তাহার কন্যা বাড়ী ফিরিতেছিলেন—এমন সময়ে হঠাৎ এই সাক্ষাৎ।

গাড়িতে হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরণের সেই শাড়ীপরা, তাহার চুল বাধিবার পরিচিত ভঙ্গী, তাহার হাতের সেই প্লেন্ বালা এবং তারাকাটা ছইগরছি করিয়া সোনার চুড়ি দেখিবামাত্র রমেশের সেই ছাত্রাবস্থার পূর্বজীবন তাহার মনোবাজ্যের রসাতল হইতে কারা-মুক্ত হইয়া একমুহূর্তে তাহার হৃদয়মন্ডলের উপর চড়িয়া বসিল—তাহার বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“এই যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল! আজকাল চিঠি-লেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি-বা লেখ, তবু

ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায় ?
বিশেষ কোন কাজ আছে ?”

রমেশ কহিল—“না, আদালত হইতে
ফিরিতেছি।”

অন্নদাবাবু। তবে চল, আমাদের
ওখানে চা খাইবে চল !

রমেশের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল—
সেখানে আর বিধা করিবার স্থান ছিল না।
সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল। একান্ত চেষ্টায়
সক্কোচ কাটাইয়া হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা
করিল—“আপনি ভাল আছেন ?”

হেমনলিনী কুশলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়াই
কহিল, “আপনি পাস্ হইয়া আমাদের যে
একবার খবর দিলেন না বড় ?”

রমেশ এই প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজিয়া
না পাইয়া কহিল—“আপনিও পাস্ হইয়াছেন
দেখিলাম।”

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “তবু ভাল,
আমাদের খবর রাখেন !”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“তুমি এখন বাসা
কোথায় করিয়াছ ?”

রমেশ কহিল—“দর্জিপাড়ায়।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“কেন, কলুটোলায়
তোমার সাবেক বাসা ত মন্দ ছিল না !”

উত্তরের অপেক্ষায় হেমনলিনী বিশেষ
কৌতূহলের সহিত রমেশের দিকে চাহিল।
সেই দৃষ্টি রমেশকে আঘাত করিল—সে
তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, “হাঁ, সেই বাসাতেই
ফিরিব স্থির করিয়াছি।”

তাহার এই বাসা বদল করার অপরাধ
যে হেমনলিনী গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রমেশ
শেষ বুঝিল—সাক্ষাৎ করিবার কোন উপায়

নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে
লাগিল। অল্প পক্ষ হইতে আর কোন
প্রশ্ন উঠিল না। হেমনলিনী গাড়ির
বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ
আর থাকিতে না পারিয়া অকারণে আপনি
কহিয়া উঠিল—“আমার একটি আত্মীয়
হেছয়ার কাছে থাকেন, তাঁহার খবর লইবার
জন্ত দর্জিপাড়ায় বাসা করিয়াছি।”

রমেশ নিতান্ত মিথ্যা বলিল না, কিন্তু
কথাটা কেমন অসঙ্গত শুনাইল। মাঝে
মাঝে আত্মীয়ের খবর লইবার পক্ষে কলু-
টোলা হেছয়া হইতে এতই কি দূর ? এ
প্রশ্ন কি উপস্থিত কাহারো মাথায় উঠিতে
পারে না যে, আত্মীয় ছাড়া এ সহরে আর
কি কাহারো খবর লইবার নাই ? অতএব
রমেশ যাহা বলিল, সেটা জবাবদিহীস্বরূপে
কোন কাজেই লাগিল না, বরঞ্চ উন্টাই
হইল। হেমনলিনীর হৃদে চক্ষু গাড়ির বাহিরে
পথের দিকেই নিবিষ্ট হইয়া রহিল। হত-
ভাগ্য রমেশ ইহার পরে কি বলিবে, কিছুই
ভাবিয়া পাইল না। একবার কেবল জিজ্ঞাসা
করিল, “যোগেনের খবর কি ?” অন্নদাবাবু
কহিলেন, “সে আইনপরীক্ষায় ফেল্ করিয়া
পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গেছে।”

গাড়ি যথাস্থানে পৌঁছিলে পর পরিচিত
ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর মন্ত্রজাল
বিস্তার করিয়া দিল। স্নেহের দিন ছিল !
তখনকার প্রত্যেক দিনই সোনার আভার
মণ্ডিত, স্নেহের স্বাক্ষরে স্পন্দিত হইয়া রজনীর
স্বপ্নস্বপ্নের মধ্যে বিলীন হইয়া গেছে।
রমেশের বৃকের মধ্য হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস
উথিত হইল।

চায়ের আয়োজন প্রস্তুত হইলে হেম-
নলিনী একটু যেন দ্বিধার ভাবে রমেশকে
জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাকে চা দিব কি ?”

রমেশ এই অকারণ প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে
পারিল। তখন যে ধারা চলিয়া আসিতে-
ছিল, তাহা যদি সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে,
তবে আর কি চা দিতে হইবে ? সবই
যদি গিয়া থাকে, তবে এটুকু কি আর
আছে ?

রমেশ কহিল, “চা দিবেন বৈ কি !”

হেমনলিনী কহিল, “এ অভ্যাস বুঝি
আপনার যায় নাই ?”

বড় বড় ব্যাপার বিপর্যস্ত হইয়া যায়,
কিন্তু এটুকু থাকে ! বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়,
কিন্তু চায়ের নেশা বরাবর টিকে ; চোখে
চোখে যে ছিল, সে চিরদিনের মত অন্তরালে
পড়িয়া যায়, কিন্তু ধূমপানের ছঁকাটি কোন-
দিন কাছছাড়া হয় না—মানবজীবনের
মধ্যে এই যে একটি বেদনাময় কোতুক
আছে, হেমনলিনীর ঐ তুচ্ছ প্রশ্নের মধ্যে
গূঢ়ভাবে হয় ত তাহারই প্রতি লক্ষ্য
ছিল।

রমেশ কিছু না বলিয়া চা খাইতে
লাগিল। অন্নদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি-
লেন, “এবার ত তুমি অনেকদিন বাড়ীতে
ছিলে, কাজ ছিল বুঝি ?”

রমেশ কহিল, “বাবার মৃত্যু হইয়াছে—”

অন্নদাবাবু। অঁ্যা, বল কি ! সে কি
কথা ! কেমন করিয়া হইল ?

রমেশ। তিনি পদ্মা বাহিয়া নৌকা
করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ে
নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন
অকস্মাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার
হইয়া যায়, তেমনি এই শোকের সংবাদে রমেশ
ও হেমনলিনীর মাঝখানকার ম্লান মুহূর্তের
মধ্যে কাটিয়া গেল। হেমনলিনী এতক্ষণ যে
ঔনাসীন্ত দেখাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা
আর টিকিল না, তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে
করণা জাগিয়া উঠিল। সে অশ্রুতাপসহকারে
মনে মনে কহিল, “রমেশবাবুকে ভুল
বুঝিয়াছিলাম,—তিনি পিতৃবিয়োগের শোকে
এবং গোলমালে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।
এখনো হয় ত তাহাই লইয়া উন্নয়ন হইয়া
আছেন। উঁহার সাংসারিক কি সঙ্কট ঘটিয়াছে,
উঁহার মনের মধ্যে কি ভার চাপিয়াছে, তাহা
কিছুই না জানিয়াই আমরা, উঁহাকে দোষী
করিতেছিলাম।”

হেমনলিনী এই পিতৃহীনকে বেশি করিয়া
যত্ন করিতে লাগিল। রমেশের আহ্বারে
অভিষ্কৃতি ছিল না, হেমনলিনী তাহাকে
বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইল।
কহিল, “আপনি বড় রোগী হইয়া গেছেন,
শরীরে অযত্ন করিবেন না !” অন্নদাবাবুকে
কহিল—“বাবা, রমেশবাবু আজ রাত্রেও এই-
খানেই খাইয়া যান না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “বেশ ত।”

এমন-সময় অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত।
অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে কিছুকাল অক্ষয়
একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। পূর্বকথিত
ব্যাপ্তিটারটি যখন এ পরিবারের আকর্ষণ
হইতে স্থলিত হইয়া গেল এবং হঠাৎ দীর্ঘকাল
ধরিয়া যখন রমেশের সাড়াসল পাওয়া গেল
না, তখন হইতে অক্ষয় অন্নদাবাবুর চায়ের

টেবিলে 'দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নিজেকে অভিযুক্ত করিয়া তুলিতেছিল। আজ সহসা রমেশকে দেখিয়া সে থমকিয়া গেল। আশ্চর্যসংবরণ করিয়া হাসিয়া কহিল—“একি! এ যে রমেশবাবু! আমি বলি, আমাদের বুঝি একেবারেই তুলিয়া গেলেন।”

রমেশ কোন উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিল। অক্ষয় কহিল, “আপনার বাবা আপনাকে যেরকম তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি এবার আপনার বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না—কাঁড়া কাটাওয়া আসিয়াছেন ত?”

হেমনলিনী অক্ষয়কে বিরক্তিদৃষ্টিদ্বারা বিদ্ধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয়, রমেশের পিতৃবিরোধ হইয়াছে।”

রমেশ বিবর্ণমুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে বেদনার উপরে ব্যথা দিল বলিয়া হেমনলিনী অক্ষয়ের উপর মনে মনে ভারি রাগ করিল। রমেশকে তাড়াতাড়ি কহিল, “রমেশবাবু, আপনাকে আমাদের নৃতল অ্যালবমখানা দেখান হয় নাই।” বলিয়া অ্যালবম আনিয়া রমেশকে টেবিলের একপ্রান্তে লইয়া গিয়া ছবি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং একসময়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, “রমেশবাবু, আপনি বোধ হয় নৃতল বাসায় একলা থাকেন।”

রমেশ কহিল, “হাঁ।”

হেমনলিনী। আমাদের পাশের বাড়ীতে আসিতে আপনি দেরি করিবেন না।

রমেশ কহিল, “না, আমি এই সোমবারেই নিশ্চয় আসিব।”

হেমনলিনী। মনে করিতেছি, আমাদের বি.-এ.র ফিলজফি আপনার কাছে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া লইব।

রমেশ তাহাতে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিল। ওদিকে অন্নদাবাবু অন্তমনস্ক অক্ষয়কে ধরিয়া তাঁহার অজীর্ণরোগের নানাপ্রকার লক্ষণ বিস্তারিত করিয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অক্ষয় অন্নদাবাবুকে এমনি করিয়াই বশ করিয়াছিল। প্রায়ই দেখা হইবামাত্র সে উৎকণ্ঠিতভাবে অন্নদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিত—“আপনাকে অত্যন্ত কহিল দেখিতেছি যে।”

তৎক্ষণাৎ অন্নদাবাবুরও স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিত। তিনি রাত্রের অনিদ্রা, সকালের স্বপ্নাহার, তিনচারিদিনের শ্রানবন্ধ উল্লেখ করিয়া নিজের বর্তমান অবস্থাকে অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া তুলিতেন। অক্ষয় মাথা নাড়িয়া বলিত, “কিছু দিন আপনার বায়ুপরিবর্তন করা একান্ত দরকার হইয়াছে—এখানে আপনার শরীর কিছুতেই সারিবে না।”

তাঁহার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এইরূপ নৈরাশ্রজনক কথা শুনিয়া অক্ষয়ের উপরে তিনি খুব খুসি হইতেন—হেমনলিনীর প্রতি অঙ্গুকিনির্দেশ করিয়া বলিতেন—“বায়ুপরিবর্তনেই বা যাই কেমন করিয়া।”

অক্ষয় বিমর্ষ হইয়া কহিত, “তাও ত দেখিতে পাইতেছি—আপনি গেলে এদিক্কার চলে কি করিয়া।”

এইরূপে নিজের শরীরসম্বন্ধে সমস্ত আশা এবং উপায়ের পথ অবরুদ্ধ সপ্রমাণ

করিয়া অন্নদাবাবু অক্ষরকে খাইয়া যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতেন । অধিক পীড়া-পীড়ি করিতে হইত না ।

৯

রমেশ পূর্বের বাসায় আসিতে বিলম্ব করিল না ।

ইহার আগে হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরত্ব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না । দেখিতে দেখিতে উভয়ের মধ্যে স্বজন-জ্বলন্ত অসঙ্কোচসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল । রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক । হাসি-কৌতুক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব জমিয়া উঠিল ।

অনেককাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্বে হেমনলিনীর চেহারা এক প্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল । মনে হইত, যেন একটু জ্বরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙিয়া পড়িতে পারে । তখন তাহার কথা অল্প ছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিতেই ভয় হইত পাছে সামান্য কিছুতেই সে অপরাধ লয় ।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে । তাহার তনু দেহ-লতা যেন কোন্‌ গৃহ বসন্তের-বাতাসে পল্লবিত মুকুলিত হইয়া উঠিল । তাহার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মন্থণতা দেখা দিল । তাহার ছটি চক্ষু এখন কথায় কথায় হাস-চ্ছটায় নাচিয়া উঠে । আগে সে বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়ারকে চাপলা, এমন কি, অস্ত্রায় মনে করিত । এখনকার বেশবাহলা-বিন্যাসিতা-সম্বন্ধে সে অনেকসময়ে তীব্র-ভাষায় আপনার প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অন্নদাবাবুর প্রশংসাজ্ঞান হইয়াছে ।

এখন কারো সঙ্গে কোন তর্ক না করিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মত কিরিয়া আসি-তেছে, তাহা অন্তর্গামী ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না । এখন তাহার জামায়-কাপড়ে রেশমের আভা ও রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার চুলবাঁধায় নূতন নূতন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এমন কি, কোন কোন বিশেষ দিনে তাহার বস্ত্রাঞ্চলসঞ্চলিত বায়ুহিল্লোলে বিলাতী কুঞ্জকাননের পুষ্পদোরভঙ্গুতি ভ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিয়া যায় । নদী যেমন নববর্ষায় ভরিয়া উঠিতে থাকে এবং তাহার তটভূমি শ্রামল তৃণ-গুন্মো বিচিত্র হইয়া উঠে—হেমনলিনী হঠাৎ আজকাল ভাবের আবেগে, স্বাস্থ্যের বিকাশে ও সাক্ষসজ্জার পারিপাট্যে তেমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে কলেজপাঠ্য ফিল-জফিগ্রহের অর্থ বুঝাইয়া গইতে গিয়া যে মানুষের এমনতর অভূতপূর্ব রূপান্তর-ভাবা-স্তর ঘটিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বোধ করি কৌতুক অনুভব করিবেন ।

কর্তব্যাবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত রমেশও বড় কম গম্ভীর ছিল না । বিচারশক্তির প্রাবল্যে তাহার শরীরমন যেন মন্থর হইয়া গিয়াছিল । আকাশের জ্যোতির্ময় গ্রহঁতারা চলিয়া-ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মানমন্দির আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে—রমেশ সেইরূপ এই চলমান জগৎসংসারের মাঝখানে আপনার পুঁথিপত্র যুক্তিতর্কের আরোজনভারে স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তাহাকেও আজ এতটা

হাঙ্গা করিয়া দিল কিসে ? সেও আজকাল সব সময়ে পরিহাসের সহস্র দিতে না পারিলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চুল এখনো চিরুণি উঠে নাই বটে, কিন্তু তাহার চাদর আর পূর্বের মত ময়লা নাই। তাহার দেহে-মনে এখন যেন একটা চলৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

এত-বড় শক্তির লীলা যেখানে চলিতেছে, তাহার পাশেই চাহিয়া দেখ, সেখানে সমস্ত যেমন, তেমনিই আছে। অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বারকরসের অভাবে পূর্বের মতই দৃশ্টিস্তা ও দৃঃস্বপ্ন রচনা করিতেছে। তাঁহার অতি নিকটেই যে মাধুর্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। পিতার অবর্তমানে রমেশের বিষয়-সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ও হওয়া উচিত, তিনি তাহারই আলোচনা করিতে-

ছেন। রমেশকে অমুরোধ করিয়া কাগজপত্র আনাইয়া লইয়াছেন—একটি খাতা করিয়া তাহাতে সমস্ত নোট করিয়া লইতেছেন এবং যেখানে খটকা ঠেকিতেছে, উকীল বন্ধুর কাছে তাহার মীমাংসার জন্ত ছুটিতেছেন।

আর অক্ষয়! একই হাওয়ায় একদিকে ফুল ধরিতেছে, আর অক্ষয়ের দিকে কেবল কণ্টক উদগত হইতেছে। তাহার চক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল, তবু সে রমেশ ও হেম-নলিনীর দিক্ হইতে তাহার চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না।

আগে অক্ষয়ের প্রতি হেমনলিনীর একটু স্নেহবিশেষ ছিল, এখন আনন্দের ঔদার্যে হেমনলিনী তাহার সঙ্গেও হাসিয়া কথা কয়, কিন্তু এইটুকু অমুরোধের উত্তেজনায় যে ক্ষুধা বাড়িয়াছে তোলে, তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।

ক্রমশ।

স্বপ্নতত্ত্ব।

স্বপ্ন নিদ্রার চিরসহচর। নিদ্রার আবেশে শরীর যখন বিবশ ও অবসন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন বাহ্যজগতের জ্ঞান অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ বিলীন হইয়া যায়, অবসাদভরে ইন্দ্রিয়সকল অবশ ও স্তব্ধ হইয়া আইসে, সুতরাং বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বিলুপ্ত হইতে থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত পদার্থের যোগ্যতা না হইলে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান জন্মে না। নিদ্রার কোমলস্পর্শে যখন বাহিরের চঞ্চলতা শাস্ত

হইয়া যায় এবং শারীরিক ও মানসিক রাজ্যের নিয়ন্ত্রী ইচ্ছাশক্তি সাময়িক অবসাদে অভিভূত হইয়া পড়ে, সেই অবসরে স্বপ্ন মনোমঞ্চে বাস্তবের এক বিকৃত অভিনয় করিয়া লয়। কিন্তু এই দীন অভিনয়ের জন্তও চৈতন্য আবশ্যক। শরীরযন্ত্র নিদ্রার প্রভাবে নিষ্ক্রিয় হয়, কিন্তু মন নিষ্ক্রিয় হয় না। নিদ্রা—শরীরের জন্ত, মনের জন্ত নহে। তবে প্রভেদ এই যে, জাগ্রদবস্থায় মন ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা নিয়মিত, নিদ্রিতাবস্থায় এই

নিয়ামিকা শক্তির অভাবে মন স্নগ্ধরশ্মি অথের স্থায় ইত্যন্তত সঞ্চালিত হইতে থাকে। এইজন্তই স্বপ্নে নানাবিধ অদ্ভুত চিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নসকল কিরূপে নিয়মিত হয়, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

স্বপ্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ দার্শনিক সালির (Sully) স্থান অতি উচ্চে। যে সকল কারণে স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে, সালি তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:— প্রান্তজ (Peripheral) ও কেন্দ্রজ (central)। অর্থাৎ অনেক স্বপ্ন বহিরিঙ্গ্রি-য়ের উত্তেজনার দ্বারা (প্রান্তজ) এবং অনেক স্বপ্ন স্নায়বিক যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কম্পন ও গতির (movements) দ্বারা (কেন্দ্রজ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের বহিঃ-প্রদেশে উত্তেজনা হইলে নানাবিধ স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। ডাঃ মরে এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তিকে নিদ্রিত করাইয়া তিনি তাহার শরীরে বিভিন্ন প্রকারের উত্তেজনা প্রয়োগ করিতেন; প্রতি উত্তেজনার পরেই নিদ্রিতকে জাগ্রত করিয়া তাহার স্বপ্ন অবগত হইতেন। ডাঃ গ্রেগরি, পায়ের নিকট উষ্ণজল থাকায়, স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন তিনি ভীষণ এত্নার মুখোদগীর্ণ অগ্নিময় পদার্থের উপর ভ্রমণ করিতেছেন। অস্ত্র এক ব্যক্তি নিদ্রাকালে জাহ্নু অনাবৃত থাকায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি গাড়িতে ভ্রমণ করিতেছেন (গাড়িতে বেড়াইবার সময় জাহ্নুদেশে ঠাণ্ডা লাগে)। যে সকল উত্তেজনার কথা এস্থলে বলা হইল, তাহা বাহ্যপদার্থকর্তৃক উৎপন্ন।

কিন্তু প্রান্তজ উত্তেজনা বাহ্যপদার্থকর্তৃক উৎপন্ন না হইতেও পারে। মনোবিজ্ঞান-বিদগণের মতে বাহ্য উত্তেজনা ব্যতিরেকেও অনেকসময় স্নায়বিক যন্ত্র উত্তেজিত হয়। নিদ্রাগমের অব্যবহিত পূর্বে শরীর যখন তন্দ্রাভরে অবশ হইয়া পড়িতে থাকে, তখন, অনেকে স্বরণ করিতে পারিবেন, নানাপ্রকার দৃশ্য যেন চক্ষুর সমক্ষে উপনীত হয়। অতীত ইঙ্গ্রিয়ার অপেক্ষা চক্ষু-রিস্ক্রিয়ই তখন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে। কারণ জাগ্রদবস্থায় চক্ষুই সকল ইঙ্গ্রিয়ার অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় এবং অল্পেই তাহার উত্তেজনা ঘটে। এইজন্তই নিদ্রার অব্যবহিত পূর্বে এবং সুষুপ্তাবস্থায় নানাবিধ “দৃশ্য”-দর্শন ঘটিয়া থাকে। অতএব বাহ্য উত্তেজনার অভাবেও স্নায়বিক যন্ত্রের প্রান্তদেশ (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি) উত্তেজিত হইতে পারে। নিদ্রাকালে শরীরস্থ পেশীসমূহের বিশেষ বিশেষ অবস্থাবশত অনেক প্রান্তজ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তৎকর্তৃক অনেক স্বপ্ন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় অঙ্গসঞ্চালন এবং শরীরের স্নখকর . অথবা অস্নখকর সংস্থানহেতু শারীরিক শ্রমের স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তি অনেক শ্রমসাপেক্ষ কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দেখেন। শরীরযন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনেক প্রান্তজ উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং এই সকল উত্তেজনা হইতে বিভিন্ন স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তৃপ্তিকর ভোজের স্বপ্ন দেখে। পাক-স্থলীর অবস্থাবিশেষে এই স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। স্বপ্নের সহিত শরীরযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

থাকায়, রোগীর স্বপ্ন অনেক সময়ে রোগ-নির্ণয়ে সহায়তা করে।

কেন্দ্রজ উত্তেজনা দুইপ্রকার :—নিরপেক্ষ (direct) এবং সাপেক্ষ (indirect)। নিরপেক্ষ কেন্দ্রজ উত্তেজনায় দ্বারা যে সকল স্বপ্ন উৎপাদিত হয়, তাহা বহিরিঙ্গ্রিয়ের উত্তেজনায় অপেক্ষা করে না। এই সকল স্বপ্ন মস্তিষ্কের স্বপ্রবর্তিত (automatic) ক্রিয়ার ফল। কখন কখন বহুকালবিস্মৃত লোক বা ঘটনা স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই নিরপেক্ষ উত্তেজনায় দৃষ্টান্ত। স্নায়বিক যন্ত্র মস্তিষ্ক ও বাহ্যপদার্থের মধ্যে সংযোগ-সাধন করে,—বাহ্যবস্তু স্নায়বিক যন্ত্রকে উত্তেজিত করে, স্নায়বিক যন্ত্র উত্তেজিত হইয়া মস্তিষ্কে উত্তেজিত করে—তার পর উক্ত বাহ্যপদার্থের জ্ঞান হয়। স্নায়বিক যন্ত্রের স্বভাব এই, একবার উত্তেজিত হইলে সে উত্তেজনাশাস্তির পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত সমগ্রবিশেষে বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকেও একই ভাবে পুনরায় উত্তেজিত হইতে চাহে। দিনের বেলায় একটি জিনিস দেখিলাম। উক্ত জিনিসটি আমার নয়নস্থ স্নায়ু ও তন্মধ্যস্থ কোষসমূহকে উত্তেজিত করিল। কিছুক্ষণ পরে উক্ত উত্তেজনায় শাস্তি হইল। কিন্তু স্নায়বিকযন্ত্র যে সকল কোষ (cells) উত্তেজিত হইল, কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের আপনিই উত্তেজিত হইবার দিকে ঝোঁক (tendency) থাকে। রাত্রিতে যখন কোন প্রতিবন্ধক থাকে না, তখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত পদার্থটির স্বপ্ন উৎপন্ন করে।

দুইটি পদার্থ একই সময়ে অথবা উপর্যু-পর্যুপরি আমাদের গোচর হইলে, উভয়ের ভিতর

এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একটি পদার্থ ইঙ্গ্রিয়গোচর হইবামাত্র দ্বিতীয়টির স্মরণ হইতে থাকে। মেঘ এবং বৃষ্টি, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ফুলের রূপ ও গন্ধ এই-ভাবে সম্বন্ধ। এতদ্ব্যতিরেকে মধ্য একরূপ সাহচর্য্য যে, দূরে একটি পরিচিত পুষ্প দেখিলে, তাহার গন্ধ আমাদের নাসিকায় না পৌঁছাইলেও, সেই গন্ধের কথা আমাদের মনে পড়ে। আবার পুষ্পটি আমাদের নয়ন-পথে পতিত না হইলেও, গন্ধ পাইবামাত্র তাহার আকৃতি আমাদের মনশ্চকুর সমীপে উপস্থিত হয়। এই একত্রানুভবজনিত সম্বন্ধকে ভাবানুবন্ধিতা (association of ideas) বলে। মনে যেমন ভাবসমূহের ভিতর পরস্পরানুবন্ধিতা স্থাপিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বিক প্রদেশের ভিতরও একরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এক প্রদেশের উত্তেজনা হইলে অপর প্রদেশের উত্তেজনাও তৎসঙ্গেই হইয়া থাকে। পদার্থের বিভিন্ন-গুণকর্তৃক বিভিন্ন স্নায়ুর উত্তেজনা হয়। পদার্থের রূপের দ্বারা যে স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়, গন্ধের দ্বারা সে স্নায়ু উত্তেজিত হয় না, তজ্জন্ত স্বতন্ত্র স্নায়ু নিষ্পত্ত আছে। আলোক-রশ্মি চকুর স্নায়ুদমুদরকে উত্তেজিত করে, শব্দতরঙ্গ কর্ণস্থ স্নায়ুসমূহে আঘাত করে। গন্ধানুভূতির উৎপাদক অণুসমূহ নাসিকাস্থিত স্নায়ুরাজির উত্তেজনা করে। যখন বিভিন্ন গুণ সর্বদা একত্রাবস্থান করে এবং একত্র বা উপর্যুপরি অনুভূত হয়, তখন সেই অনুভূতিবহ স্নায়ুসমুদয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে একটি স্নায়ুর উত্তেজনা হইলে অপর স্নায়ুসমূহ

একেবারে উত্তেজিত হয়। যেমন পাচক-বাহিত স্নাত্ত দূর হইতে দর্শন করিলে, কেবল যে চক্ষুর স্নায়ু উত্তেজিত হয় এমন নহে, তৎসঙ্গে নাসিকার স্নায়ু, রসনার স্নায়ু এবং হস্ততালু স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠে। কেন না, এই সমস্ত স্নায়ু ভোজনের সময় একত্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। ভোজনের সময় দর্শন, শ্রাণ, আশ্বাদন এবং খাত্তগ্রহণ-ব্যাপার যুগপৎ নিষ্পন্ন হয়। ভাবসমূহের ভিতর এইরূপ অমুখ্যতা এবং স্নায়বিক প্রদেশের এই একত্র উত্তেজনার প্রবৃত্তি হইতে “স্নাপেক্ষ” উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া অনেক স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। বাহ্য উত্তেজনা অথবা নিয়পেক্ষ কেন্দ্রজ উত্তেজনার দ্বারা স্বপ্ন প্রবর্তিত হয়। অতঃপর, স্বপ্নযোগে মনোমধ্যে যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, ঐ সকল ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট অজ্ঞাত ভাবপরম্পরা স্বত মনকে অধিকার করে। এই কারণেই জাগ্রদবস্থায় যে বিষয় স্মরণ করা যায় না, অনেকসময় স্বপ্নকালে তাহার স্মরণ হয়।

অনেক স্বপ্নে পূর্বাপরের সহিত সঙ্গতাব লক্ষিত হয়। এইরূপ অসম্বন্ধ অর্থশূন্য স্বপ্নের কারণ এই যে, জাগ্রদবস্থায় ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করে, বিভিন্নপদার্থজাত বিভিন্ন অমুভূতির ভিতর মন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া লয়। জাগ্রদবস্থায় মনোযোগ ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা পক্ষিপালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া বাহ্যবস্তুজ্ঞানের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা স্থাপন করে। স্বপ্নে ইচ্ছাশক্তির অভাব, স্তবরাং মন স্বপ্নের বিষয়সমূহের মধ্যে শৃঙ্খলাসঞ্চার করিতে পারে না, পরন্তু নিজেই তদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছা-

শক্তির অভাবে মন উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ নানা বিষয় হইতে সঙ্কলিত এক অদ্ভুত, অসম্বন্ধ ও অর্থশূন্য স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। এই সকল অসম্বন্ধ স্বপ্নের দর্শন-কালে যে আমাদের দেশকালের জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে। স্বপ্নে বাহ্য-পদার্থকে আমরা স্থানব্যাপী বলিয়াই মনে করি এবং ঘটনাবলীও সময়ে ঘটতেছে বলিয়াই জ্ঞান হয়। কিন্তু দেশ ও কালের মধ্যে কোন একটি পদার্থের নির্দিষ্ট স্থান বা সময় সৰ্ব্বদাই আমরা ভুল করি। পদার্থটি অসীম দেশের (space) কতটুকু ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং ঘটনাটি অনন্তকালের (time) কতটুকু অধিকার করিয়া আছে— তাহাই আমাদের ঠিক ধারণা হয় না। অসম্বন্ধ স্বপ্নে প্রধানত কার্যাকারণসম্বন্ধের অভাব লক্ষিত হয়। কার্যাকারণসম্বন্ধজ্ঞানে বিচারশক্তির (reasoning) প্রয়োজন। স্বপ্নে বিচারশক্তি স্তম্ভ, কাজেই কার্যাকারণ-সম্বন্ধের ধারণাও অন্তর্হিত।

অনেক স্বপ্নে পূর্বাপরের ভিতর বেশ সম্বন্ধ থাকে। কাডওয়ার্থ প্রভৃতি অনেকে বলেন যে, মানবাত্মার গুপ্তশক্তি (occult power) আছে, তদ্বারাই এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। জাগ্রদবস্থার জ্ঞান স্বপ্নেও আমাদের চিন্তার ভিতর অনেকসময় শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। স্বপ্নের বিষয়সমূহ অনেক সময়ে আপনা হইতেই শৃঙ্খলাবিশিষ্ট ও সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যায়। ক্যান্ট বলেন, স্বপ্নের উপাদান-বলীর উপর মনের ছাপ (forms) পড়ে— তাই শৃঙ্খলার উৎপত্তি। কিন্তু নিদ্রাকাশে

ইচ্ছাশক্তি যখন বিলুপ্ত, তখন এই ছাপ দেয় কে ? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না হওয়ায়, কেহ কেহ ভাবানুবক্তিতার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । যে সকল ভাব নিত্যসংশ্লিষ্ট, স্বপ্নকালে মনে তাহার কোন একটি ভাবের আবির্ভাব হইলে, সেই সকল ভাবপরম্পরা আপনা হইতেই আবিভূত হয় । স্বপ্নে চিরপরিচিত কোন বস্তুর মুখখানি মনশ্চকুর সমীপে উপস্থিত হইল, অমনি তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার ব্যবহার, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় যুগপৎ মনে পড়ে ।

উপরে স্বপ্নাবস্থায় মন নিশ্চেষ্ট থাকে, ধরা হইয়াছে । কিন্তু অনেক সময়ে মন ক্রিয়াশীল থাকে । ক্রিয়াশীল থাকে বটে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির অধীনে নহে—প্রবল ভাবের (সুখঃখ, ভয়-ক্রোধ ইত্যাদির) কর্তৃত্বাধীনে । স্বভাবতই শৃঙ্খলা ও নিয়মের দিকে মনের কোঁক আছে । ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও শৃঙ্খলাহীনতার ভিতর শৃঙ্খলা এবং নিয়ম-বিহীনতার ভিতর নিয়মের প্রতিষ্ঠা করার জন্ত মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে । ইংরেজিতে ইহাকে বলে—Feeling for unity বা একত্বের আকাঙ্ক্ষা । এই একত্বের আকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক সুসম্বন্ধ স্বপ্নের সৃষ্টি হয় । অনেক স্বপ্ন স্মরণ করিবার সময় আমাদের মনে পড়ে,—শৃঙ্খলাবিহীন ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা শৃঙ্খলার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম । একত্বাকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে আরও একটি প্রবৃত্তি স্বভাবত স্বপ্নসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে । তাহাকে বলে Emotional harmony—প্রবলভাবের সামঞ্জস্য-

বিধান । স্বপ্ন কখন সুখের, কখন দুঃখের, কখন ভয়ের, কখন অভিমানের । এইরূপ এক একটি প্রবল ভাবকে আশ্রয় করিয়া অনেক সময়ে স্বপ্নসকল সম্মতিত হইয়া থাকে । যে প্রবল ভাবটি যখন মনে জাগে, মন তাহার বিপরীত ভাবকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া, কেবল সেই প্রবল ভাবের সহিত সমঞ্জসীভূত ঘটনাই দর্শন করিতে থাকিবে । কেহ যদি সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাকে, তবে কেবল সুখের স্বপ্নই তাহার মনে আসিবে । এই যে মনোমধ্যে একই ভাব সংরক্ষণের প্রবৃত্তি, ইহার দ্বারাও অনেক সুসম্বন্ধ স্বপ্নের উৎপত্তি হয় ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থাপেক্ষা স্পষ্টতররূপে পদার্থসমূহের অল্পভূতি হয় । হাটলি ইহার দুই কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—(১) দর্শনীয় বিষয়ের স্বাভাবিক অধিক স্পষ্টতা । চকুর দ্বারা যেরূপ স্পষ্টভাবে পদার্থের অল্পভূতি হয়, অল্প কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেরূপ হয় না । স্বপ্নে সাধারণত দর্শনীয় বিষয়ই অধিক থাকে । আমরা ‘স্বপ্ন দেখাই’ বলি—‘স্বপ্ন শোনা’ বলি না । এই দর্শনীয় বিষয়ের আধিক্যবশতই আমাদের নিকট স্বপ্ন খুব স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় । (২) জাগ্রদবস্থায় মানসিক ভাবকে আমরা বাহ্যপদার্থ হইতে পৃথক করিতে পারি । কেন না, তখন উভয়ই বর্তমান । স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যপদার্থের অভাববশত আমরা মানসিক ভাবকেই প্রকৃত বলিয়া মনে করি । মানসিক ভাব স্বভাবত স্পষ্ট নহে । কিন্তু বাহ্যপদার্থের অল্পপস্থিতিবশত যখন মানসিক ভাব খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন মানসিক ভাবকেই আমরা প্রকৃত

বহিঃস্থ পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি। নিদ্রাকালে স্বায়ম্‌গুলী অল্পেই উত্তেজিত হয়। স্বপ্নের স্বাভাবিক স্পষ্টতার ইহাও কারণ। এই কারণেই স্বপ্নে ছোট জিনিসকে বড়, অল্প স্থানকে প্রশস্ত স্থান এবং অল্প কালকে দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রদবস্থায় ওষ্ঠদেশে আস্তে হস্তস্পর্শ করিলে স্বায়ম্‌গুলী সামান্য উত্তেজিত হয় মাত্র, কিন্তু নিদ্রাকালে ওষ্ঠস্পর্শ করিয়া ডাঃ মরে ভয়ানক দৈহিক কষ্টের স্বপ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন।

পরিশেষে এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণের মতে, স্বপ্ন জাগ্রদবস্থারই বিস্তৃতিমাত্র। মানবাত্মার স্বরূপ চৈতন্য উভয়ত্রই বর্তমান। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কাণ্ট বলেন, জীবনের অবসানেই স্বপ্নের বিরতি সম্ভব। দেকার্ত (Descartes) হইতে আরম্ভ করিয়া হ্যামিল্টন (Sir W. Hamilton) পর্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিকই বলেন, মানবমন কখনই নিদ্রিত হয় না, নিদ্রা কেবল বাহ্যিকের জন্ত। মানবাত্মার স্বরূপ চৈতন্য; নিদ্রাবস্থায়ও মন ক্রিয়াশীল। যদিও সকল সময়ে আমরা স্বপ্ন স্মরণ করিতে না পারি, তথাপি নিদ্রিত হইলেই মানবমন স্বপ্ন দেখিতে থাকে। পরন্তু লক্ (Locke) প্রভৃতি সন্দেহবাদিগণ বলেন, যদি স্বপ্ন স্মরণ করিতেই না পারি, তবে স্বপ্ন দেখি কিরূপে বলিব? কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, স্বপ্নদর্শনের সমস্ত বাহুল্যকণ প্রকাশ করিয়াও অনেকে জাগিয়া স্বপ্নের বিষয় আদৌ স্মরণ করিতে পারে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে হস্ত করিতে দেখিলে অথবা কথা

কহিতে শুনিলে, সে যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু অনেক সময়ে সে জাগ্রত হইয়া তাহার স্বপ্ন স্মরণ করিতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই, সকল নিদ্রাই কি স্বপ্নময়ী?—অথবা স্বপ্নশূন্য নিদ্রা কি অসম্ভব? হ্যামিল্টন বলেন যে, নিদ্রাগমের অব্যবহিত পূর্বে এবং নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরে যখন মন কোন-না-কোন বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে দেখা যায়, তখন ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নিদ্রাবস্থায়ও চৈতন্যের বিলোপ হয় না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে অনেকে এই আপত্তি করেন যে, নিদ্রাভঙ্গের সময় অর্থাৎ জাগরণের অব্যবহিত পূর্বে যে স্বপ্নের মত চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়, তাহা জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থা—অর্থাৎ নিদ্রার অচৈতন্য হইতে স্বপ্নের অর্দ্ধচৈতন্যের, এবং সেই অর্দ্ধচৈতন্য হইতে জাগরণের পূর্ণ-চৈতন্যের উদ্ভব হয়।

বর্তমান সময়ে শারীরতত্ত্বের যথেষ্ট উন্নতি এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত শারীরতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব শারীরবিজ্ঞানের প্রতিকূল হইলে এখন আর তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। এখন প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অল্পরূপ স্বাভাবিক অবস্থা পরীক্ষাদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে। মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের যে অতি নিকট সম্বন্ধ, তাহা বহুপ্রমসাদ্য পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করি, তখন মস্তিষ্কে এবং স্বায়ম্‌গুলীতে নানারূপ ক্রিয়া চলিতে থাকে। স্মরণ

যখন স্বপ্নদর্শন হয়, তখন মস্তিষ্কের কোনরূপ ক্রিয়া অবশ্য লক্ষিত হইবে। ট্রিপন- (Trepan)-নামক অস্ত্রের দ্বারা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছে। উক্ত উপায়ে দেখা গিয়াছে, যখন স্বপ্নদর্শনের কোন বাহুলক্ষণ থাকে না, তখন মস্তিষ্কের পদার্থ পাণ্ডুর (pale), সঙ্কুচিত এবং রক্তশূন্য থাকে। কিন্তু যখন স্বপ্নের বাহুলক্ষণ বিद्यমান, তখন মস্তিষ্ক বর্দ্ধিতায়তন হইয়া আধার হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং রক্তপূর্ণ হয়। নিদ্রাবস্থায় সকল সময়ে মস্তিষ্কের এইরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। স্বপ্ন নিদ্রার নিত্যসহচর হইলে, মস্তিষ্কের শেথোক্ত-রূপ অবস্থা সকল সময়েই দৃষ্ট হইত। অতএব মস্তিষ্কের রক্তহীন অবস্থা যদি স্বপ্নহীন নিদ্রার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে স্বপ্নহীন নিদ্রা সম্ভব মনে করিতে হইবে।

শারীরতত্ত্বের যুক্তির দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, স্বপ্নদর্শনসময়ে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন হইয়া থাকে। অতএব মস্তিষ্কে শোণিতসঞ্চালন ও স্বপ্নদর্শনের ভিতর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিद्यমান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন এই, এতদূত্থের মধ্যে কোন্টি কারণ এবং কোন্টি কার্য? জড়বাদিগণ বলেন, স্বপ্ন মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফল। অধ্যাত্মবাদী বলিবেন, স্বপ্নদর্শনের ফলেই মস্তিষ্কে শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে। জড়বাদিগণের মতে চৈতন্য কেবল ভায়াবিক ক্রিয়ার ফল। জড়বাদি এবং অধ্যাত্মবাদি গণের মতসমালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে জড়ের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া জড়বাদিগণ আত্মার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন, সে জড়ের কোন অস্তিত্বই নাই।

বারাস্তরে জড়বাদিগণের মত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

মেঘোদয়ে।

দেখ চেয়ে গিরির শিরে

মেঘ করেছে গগন ঘিরে,

আর কোরো না দেরি।

ওগো আমার মনোহরণ,

ওগো বিন্দু ঘনবরণ

দাঁড়াও তোমায় হেরি।

দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,

দাঁড়াও আমার হৃদয়দোলে,

দাঁড়াও গো ঐ শ্রামলতৃণ'পরে।

আকুল চোখের বারি বেয়ে
 দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
 দাঁড়াও আমার জন্মজন্মান্তরে !
 অম্নি করে ঘনিয়ে তুমি এস,
 অম্নি করে তড়িৎহাসি হেস,
 অম্নি করে উড়িয়ে দিয়ে কেশ !
 অম্নি করে নিবিড় ধারাজলে
 অম্নি করে ঘন তিমিরতলে
 আশ্রয় তুমি কর নিরুদ্দেশ !

ওগো তোমার দরশ লাগি',
 ওগো তোমার পরশ মাগি',
 গুমরে মোর হিয়া !
 রহি রহি পরাণ ব্যোপে
 আশ্বিনরেখা কেঁপে কেঁপে
 যায় গো বলকিয়া !
 আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
 বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে
 জানিনি কোন্ দূর সমুদ্রপারে !
 সজলবায়ু উদাস ছুটে,
 কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
 পথবিহীন গহন অন্ধকারে !
 ওগো তোমার আঁন খেয়ার তরী,
 তোমার সাথে যাব অকূল'পরি,
 যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা ।
 ঝড়ের বেলা তোমার স্নিগ্ধহাসি
 লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
 তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা !

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
 তড়িৎ হানে ঋণে ঋণে
 বিজল উপকূলে,

তটের পায়ে মাথা কুটে'
 তরঙ্গদল কেনিয়ে উঠে
 গিরির পদমূলে,
 ঐ যেখানে মেঘের বেণী
 জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
 মর্ম্মরিছে নারিকেলের শাখা,
 গরুড়সম ঐ যেখানে
 উর্দ্ধশিরে গগনপানে
 শৈলমালা তুলেছে নীলপাখা,
 'কেন আজ আসে আমার মনে
 ঐখানেতে মিলে' তোমার সনে
 বেঁধেছিলেম বহুকালের ঘর,
 হোথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে
 চেউয়ের সুরে আজো বাজে
 যুগান্তরের মিলনগীতিধর ।

কেগো চিরজনম ভরে'
 নিয়েছ মোর হৃদয় হরে'
 উঠছে মনে জেগে !
 নিত্যকালের চেনাশোনা
 কর্ণে আজি আনাগোনা
 , নবীন ঘনমেঘে !
 কত প্রিয়মুখের ছায়া
 কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
 ছড়িয়ে দিল সুখহৃথের রাশি,
 আজকে যেন দিশে দিশে
 ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে
 কত জন্মের ভালবাসাবাসি !
 তোমায় আমার যতদিনের মেলা,
 লোকলোকান্ত্রে যত কালের খেলা
 একমুহূর্তে আজ কর সার্থক ।

এই নিমেষে কেবল তুমি একা
জগৎ জুড়ে দাও আমাদের দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক!

পাগল হ'য়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
হৃদে বরিষণ,
জানি না দিগ্দিগন্তের
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চলছে আয়োজন!
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে
তরলী সব বাধা ঘাটের কোলে,
আজি পথের চুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে!
শান্ত হ'রে শান্ত হ'রে প্রাণ,
ক্ষান্ত করিস্ প্রগল্ভ এই গান,
স্তব্ধ করিস্ বুকের দোলাহুলি!
হঠাৎ যদি ছয়ার খুলে যায়,
হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়
তখন চেয়ে দেখিস্ আঁখি তুলি!

প্রাচীন-জব্বলপুর-প্রসঙ্গ।

মধ্যভারতের প্রাচীন ইতিহাস তিমিরে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনস্থলীতে অনেক মহর্ষির আচ্ছন্ন। যে প্রকাণ্ড জনপদ রামায়ণে আশ্রম ছিল। তন্মধ্যে জাবালি অল্পতম। দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত, তাহা কোন্ তাঁহার তপোবন হইতেই 'জাবালিপট্টন' সময়ে প্রথমে লোকালয়ে পরিণত হইতে নামকরণ হয়। আধুনিক জব্বলপুর সেই আরম্ভ হয়, ইহা নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। জাবালিপট্টনের অপভ্রংশমাত্র। মহর্ষি ও রামায়ণে জ্ঞাত হওয়া যায়, এই ভয়াবহ তাঁহার শিষ্যগণের অন্তর্ধানের বহুকাল পরে

এ প্রদেশে বল্লভী ও প্রমার বংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রস্তর-ফলকাদি হইতে যতদূর জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, এই ভূখণ্ড একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে হৈহয়বংশীয় রাজপুতগণের করতলগত ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে গোন্দওয়ানারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে মধ্যভারতে গোন্দরাজপুত সংগ্রামসাহের শ্রায় প্রবলপ্রতাপশালী নরপতি কেহ ছিলেন না। তিনি বাহুবলে জব্বলপুরের শ্রায় অর্দ্ধশত গড় বা প্রদেশে রাজ্যবিস্তার করেন। সেই সময় হইতে জব্বলপুরের ইতিহাস গোন্দরাজপুতগণের অভ্যুত্থান ও পতনের সহিত লিপ্ত।

ইতিহাসপাঠক অনেকেই অবগত আছেন যে, গড়মণ্ডল (যাহা এক্ষণে মণ্ডলা নামে খ্যাত) পূর্বে অসভ্য গোড় বা গোন্দজাতির রাজধানী ছিল। বিখ্যাত ঠগীদমনকারী সার উইলিয়াম শ্লিম্যান্ বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এ রাজ্যের কথঞ্চিৎ ইতিহাস সংগ্রহ করেন।* কিরূপে এই প্রদেশ পার্শ্ববর্তী গোন্দজাতির নিকট হইতে রাজপুতদিগের হস্তগত হয়, তাহা নিয়ে তাঁহার বর্ণিত একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। যাদব রায় নামে এক সামান্য রাজপুত হৈহয়বংশীয় নরপতিদিগের অধীনে কর্মচারী ছিল। একদা সতি পাঠক নামক জনৈক জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলেন

যে, সে কোনকালে নিশ্চয়ই রাজা হইবে। উক্ত ব্রাহ্মণের উপদেশক্রমেই যাদব রায় পুরাতন প্রভুদিগকে পরিত্যাগপূর্বক গোন্দরাজ নাগদেবের অধীনে নিযুক্ত হয় এবং ক্রমে তাঁহার বিলক্ষণ প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্তার পাণিগ্রহণ করে। নাগদেবের পুত্রসন্তান হইল না; পুত্রকামনায় যোগযজ্ঞের অহুষ্ঠান করায় দৈববাণী হইল যে, যাদব রায়ই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে। তদনুসারে, ৩৫৮ খৃঃ অব্দে (সংবৎ ৪১৫) নাগদেব গতাস্ব হইলে যাদব রায় নিবিবাদে গোন্দওয়ানার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, এবং সমগ্র গোন্দজাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। সতি পাঠক তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীর পুরস্কারস্বরূপ মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই যাদব রায়ের বংশধরগণই গোন্দরাজপুত নামে বিখ্যাত। তাঁহারা প্রায় চতুর্দশ শতাব্দী গড়মণ্ডলের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এবং এতাবৎকাল উক্ত সতি পাঠকেরও উত্তরাধিকারিগণ মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাত্মা শ্লিম্যানের চেষ্টায় রামনগরের কোন দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রস্তরফলকে খোদিত যাদবরায়প্রমুখ প্রায় অর্দ্ধশত নরপতির নাম ও নির্দিষ্ট রাজত্বকাল পাওয়া গিয়াছিল।

এই বংশের মদনসিংহ সুপ্রসিদ্ধ মদনমহলের নির্মাতা। আধুনিক জব্বলপুরের

* *Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol. VI. pp. 621—646; also the *Gazetteer of the Central Provinces of India* edited by Charles Grant, 1870 A. D.

অনতিদূরে গিরিশৃঙ্গের উপর অद्याপি এই রমণীয় ভবন বিद्यমান রহিয়াছে। জব্বল-পুররাজী প্রায় সকলেই এই স্থান দেখিতে যান ; কিন্তু কাহার দ্বারা বা কোন্ সময়ে ইহা নির্মিত হইয়াছিল, অনেকেই তাহার অল্পসন্ধান করেন না। প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের স্তূপরাশি ভেদ করিয়া সর্পের শ্রায় বক্রগতি পথ অবলম্বনে এখানে আরোহণ করিতে হয়। অনেকদূর এই গিরিপথ অতিক্রম করিলে প্রস্তররাশিবেষ্টিত এক রমণীয় ক্ষুদ্র সরোবর ও তাহার সমীপে একটি সামান্য গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পূর্বে বোধ হয় দ্বাররক্ষকের আবাস-স্থান ছিল। আরও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মদন-মহলের সোপান। এই ত্রিতল প্রাসাদ অষ্ট শতাব্দীর ঝঙ্কাবাত ও ভূমিকম্প মস্তকে বহন করিয়া এখনও অভয় অবস্থায় কেবল-মাত্র একখানি শিলাখণ্ডের উপর সমভাবে দণ্ডায়মান আছে। প্রস্তরখণ্ডও সমতল নহে, গোলাকার বর্তুলের শ্রায় ; তাহার উপরে অপূর্ণ কোশলে মূলভিত্তিশূন্য এই অট্টালিকা স্থাপিত। এরূপ নির্মাণপ্রণালী বোধ হয় আধুনিক স্থাপত্যবিদের বুদ্ধির অগম্য। গৃহের ছাদ ও দেওয়াল ইষ্টক ও প্রস্তরে মিশ্রিত। যে শিলাখণ্ডের উপর অট্টালিকা গ্রথিত, তাহার সংলগ্ন আর একটি স্তূবহং শিলার উপরেও বাটীর কিয়দংশ বিস্তৃত। এই দুই শিলার সন্ধিস্থলে কয়েকপংক্তি সোপান এখনও পূর্ববৎ রহিয়াছে। ইহা অবলম্বনে এক সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া কয়েক পদ অতিক্রম করিলে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হয়।

সোপানসাহায্যে আবার দ্বিতলে আরোহণ করিলে সম্মুখে স্তূপশ্রেণী ছাদ, তাহার পর বারান্দা ও একটি বৃহৎ ঘর। স্নানাগার ইহারই সংলগ্ন ও তাহার পশ্চাতে আর একটি ক্ষুদ্র ঘর। ছাদ হইতে ত্রিতলে উঠিবার সোপান। ত্রিতলের কক্ষটি সর্বাংগে বৃহৎ ; দৈর্ঘ্যে বিংশতি ফুটের অধিক এবং প্রস্থে প্রায় দশফুট হইবে। তাহার সম্মুখে আবার একটি দালান। উর্দ্ধে নীল অনন্ত আকাশ—সম্মুখে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, বিক্ষাচলের শৈলশ্রেণী বিস্তৃত—নিম্নে স্তূপের ক্ষুদ্র নগরী ও সংসারের কোলাহল!

প্রবাদ এইরূপ যে, গড়মণ্ডলের নৃপতিগণ দারুণ গ্রীষ্মের সময় মদনমহলে আসিয়া বাস করিতেন। এখনও এই অট্টালিকার চতুর্দিকে ভগ্নাবশেষ নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা পূর্বে গিরিশৃঙ্গের শ্রায় স্তূপরূপে রক্ষিত ছিল। 'কোন কোন স্থলে ভগ্ন পাষাণময় প্রাচীর ও সিংহদ্বার এখনও বর্তমান রহিয়াছে। চারিদিকে প্রাচীরসংলগ্ন রক্ষাদিগের আবাসগৃহ এখনও কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। প্রাচীরের নিকটে একটি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ ও উহাতে অবতরণ করিবার সোপান এখনও ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। ইহা বোধ হয় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 'তয়-খানা'র শ্রায় রাজাদিগের মধ্যাক্ষকালীন বিশ্রামাগার ছিল। পাষাণময় প্রদেশে এরূপ হর্ম্যরাজি নির্মাণ করা কিরূপ ব্যয় ও আয়াস সাধ্য, তাহা এস্থান দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। কিন্তু পুরিতাপের বিষয়, ইহা এক্ষণে জনশূন্য—বহুজন্তুর বাসস্থান।

যে পর্বতশৃঙ্গোপরি মদনমহল নির্মিত,

তাহার পদতলে প্রায় দুইমাইল বিস্তৃত এক প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় । ইহা এককালে গড়মণ্ডলরাজ্যের রাজধানী ছিল । যে গ্রাম এক্ষণে সেই ভগ্নাবশেষের উপর গঠিত হইয়াছে, তাহা অত্‍যাপি ‘গড়’ বলিয়া খ্যাত । এখনও এখানে সহস্রাধিক বাস-গৃহ আছে ও পঞ্চসহস্র লোক বসতি করে । কোন্ সময়ে এই পুরাতন নগরী নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; তবে প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা দুইসহস্র বৎসরের অধিক বৃহত্তম আছিল । রাজা দলপতিসাহ এখানে হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া সিন্ধোরগড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন । সেই সময় হইতেই এই নগরীর অবনতির সূত্রপাত হয় । এখানে পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও গঙ্গাসাগর ও বাইসাগর নামে রাজগণের খনিত দুইটি স্নানদেবীর সরোবর রহিয়াছে । ডানিয়েল লর্কি সাহেব যখন ১৭৯০ খৃঃ অব্দে এই পথে পর্য্যটন করেন, তখনও এই নগরী সমৃদ্ধিশালী ছিল । তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, এই নগরে প্রস্তুত বালাসাহী মুদ্রা সমস্ত বৃন্দেলখণ্ডে ব্যবহৃত হইত ।

মদনসিংহের বংশধরগণের মধ্যে সংগ্রাম-সাহের রাজত্বকালেই এখানকার রাজপুত-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল । ইহারই বাহুবলে জব্বলপুর, দামো, সাগর, নরসিং-পুর, সিউনি, হোসেনাবাদ, ভূপাল প্রভৃতি দ্বিপঞ্চাংশ গড় বা প্রদেশ গড়মণ্ডল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

ইহার পর দলপতিসাহ । ইনি ১৫৪০ খৃঃ অব্দে জব্বলপুর হইতে প্রায় ২৬মাইল উত্তরপশ্চিমে সিন্ধোরগড়নামক গিরিহর্গে

রাজধানী স্থাপিত করেন । প্রাতঃস্মরণীয় হুর্গাবতী ইহারই রাণী ।

দলপতিসাহের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র বীরনারায়ণ নিতান্ত নাবালক ছিলেন । সুতরাং তাঁহার পঞ্চদশবর্ষব্যাপী রাজত্বকালে রাণী হুর্গাবতীর হস্তেই শাসনভার হস্ত ছিল । এই সময়েই গড়মণ্ডলের উন্নতির চরম সীমা । রাণী হুর্গাবতী কঠোর অধ্যবসায় সহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি সম্যক-প্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন । অপত্য-নিবিশেষে প্রজাপালন করিয়া তিনি যে অক্ষর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালের করাল স্রোতে ধ্বংস হইবার নহে । অত্‍যাপি চরণদিগের কীর্ত্তিকবিতায় তাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । এতদেশ-বাসিগণ এ বংশের অত্‍যাত্ত নরপতিগণের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাণী হুর্গাবতীর যশঃকাহিনী এপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই । প্রজাদিগের জলকষ্টনিরাকরণের জন্য এই পাক্ততীর প্রদেশে তিনি যে বিশাল দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অত্‍যাপি রাণী-তলাও নামে প্রসিদ্ধ ।

রাণী হুর্গাবতীর অমূল্য জীবন ভারতের ইতিহাসে উজ্জল রহ । অহল্যাবাইএর ছায় রাজ্যশাসনে তিনি যেরূপ দূরদর্শিতা ও কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেও সেইরূপ চাঁদাবি ও লক্ষ্মীবাইএর ছায় অমানুষিক সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন । এখনও আদর্শ বীররমণীর দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে ।

১৫৬৪ খৃঃ অব্দে কারা মাণিকপুরের মুসলমান শাসনকর্তা আমফ খাঁ দিল্লীর

বাদশাহের আজ্ঞামুসারে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া গড়মণ্ডল আক্রমণ করে। রাণী দুর্গাবতী তৎকালে সিঙ্গৌরগড়ে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা যবনবাহিনীর অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। তথাপি তিনি অসমসাহসে মুসলমানসেনাপতির সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তাঁহার রাজধানী আত্মরক্ষার্থে তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না বিবেচনা করিয়া মণ্ডলার নিকট একটি সুদৃঢ় গিরিবন্ধে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। প্রথমদিনের যুদ্ধে আসফ খাঁ পরাজিত হইল; কিন্তু পরদিন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বহুসংখ্যক কামান লইয়া রাণীকে আক্রমণ করিল। রাজপুতসেনা অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু অসংখ্য যবনের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। রাজ্ঞী স্বীয় যোদ্ধৃবর্গকে আত্মরক্ষার সময়প্রদানের জন্য হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গিরিদ্বকের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার সহচরগণ তাঁহাকে পলায়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে বহুবিধ অমুনয় করিল; কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার কমনীয় দেহ শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল; যবনের তীক্ষ্ণতীর তাঁহার চক্ষে বিদ্ধ হইল; তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিন্তু দুর্ঘটনা একাকী আইসে না; যে গিরিপথে তিনি সৈন্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাৎভাগে একটি শীর্ণা গিরিনদীর বালুসৈকত পড়িয়াছিল। কয়েকদণ্ড পূর্বে তথায় বিন্দুমাত্র জল ছিল না। কিন্তু যখন রাজপুত বীরগণ আত্মরক্ষার্থ সেই নদীমুখে

ধাবিত হইল, তখন মুহূর্তমধ্যে কোথায় হইতে বহুর ছায় সলিলরাশি আসিয়া পড়িয়া দুই কুল প্রাবিত করিয়া দিল;—সমুদ্রগণেও নদী পার হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। তখন স্বীয় সৈন্যগণের আসন্নমৃত্যু চিন্তা করিয়া দুর্গাবতীর বীরহৃদয়ও বিচলিত হইল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজপুতরমণীর চিরপ্রচলিতপ্রথা অনুসারে সতীত্ব ও কুলগৌরব রক্ষার্থ হস্তিচালকের নিকট হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গা গ্রহণপূর্বক সেই খড়্গা স্বহস্তে নিজ বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাণী দুর্গাবতীর অমূল্য জীবনের সহিত গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। আসাফ খাঁ রাজ্যলুপ্তন করিয়া আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়াছিল; কথিত আছে, সহস্রাধিক হস্তী এই সময়ে তাহার হস্তগত হয়। যবন এই সম্পত্তিরাশির স্পর্শায় এরূপ ক্ষীণ হইয়া উঠিল যে, সে গড়মণ্ডলের স্বাধীন রাজা হইয়া প্রজাশাসন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোগলগৌরবরবি আকবরশাহ উপবিষ্ট। তাঁহার দোদাঁড় প্রতাপে ক্ষুদ্র সেনাপতির প্রগল্ভতা অচিরে দমিত হইল। অগত্যা আসাফ খাঁ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া বাদশাহের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। দিল্লীস্থর. সংগ্রামসাহের সুবিস্তৃত রাজ্যের দশটি বিভাগ করকবলিত করিয়া দলপতিসাহের ভ্রাতা চঙ্গসাহকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই দশটি বিভাগই পরে ভূপালরাজ্যে পরিণত হয়। আইনি আকবরীতে গড়মণ্ডলরাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী মালবপ্রদেশের অংশ-

বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ খয়ের অধীনতা নামমাত্র স্বীকার করিয়া প্রাক্ক
অন্ধ পর্য্যন্ত রাণী দুর্গাবতীর বংশধরগণ দিল্লী- স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নথনাথ দে।

স্বপ্নের স্বপ্নদর্শন।*

একরাতে দেখিছ স্বপন
বড় সাধ পাইতে যৌবন—
নিমেষের উদ্দাম আত্মলাভ
খুব ভাল হ'তে অবসাদ।
পৃথকেশে রাজ্যলাভ চেয়ে
সুখ আছে কৃষ্ণকেশে ধৈর্যে।

যাক ঘুচে' কালের সম্মান,
যাক খ্যাতি বলিয়া বিদ্বান,
ছিঁড়ে ফেল জীবনের পাত
জ্ঞান, জয় যাহে অন্ধপাত;
ভেঙে ফেল বিজয়পতাকা,
মুছে ফেল ললাটের টাকা।

হৃদয়ের উদ্দাম শোণিত
ক্ষণতরে হোক প্রবাহিত
যৌবনের জ্বালাময় স্রোতে
নাহি মানি বাধা কোনমতে।
স্বপ্নময় মাদক জীবন
নিমেষেরো, কর সমর্পণ।

—শুনিল তা দয়াল দেবতা,
মুহু হাসি কহিলেন কথা—
“ছুঁই যদি তব শুভ্রকেশ
নিমেষে ফিরিয়া যাবে বেশ।
জীবনযাত্রায় পিছুপানে
ফিরে যাবে গোপনে গোপনে।

“কিন্তু দেখে দেখি পথ চেয়ে
কিছু যদি লও সাথে ব'য়ে;
জীবনের তীর্থযাত্রা হ'তে
কেহ কিগো বারিছে ফিরিতে?
যদি থাকে এই বেলা দেখ,
যতক্ষণ কাছাকাছি থাক।”

—আহা, রমণীর শিরোমণি
তোমা বিনা জীবন না গণি!
এক সাধ পারি না ছাড়িতে,
হে দেবতা, লব সাথে সাথে
সরবস্ব, অপর জীবন—
প্রিয়া, যার অভাব মরণ!

—অগ্নিময় লেখনী লইয়া
ইন্দ্রধনুবর্ণে তিজাইয়া
লিখিলেন নীলিমার গায়
“এই জন ছোট হ’তে চায়,
এতখানি জীবনেতে নামি’
তবু তা’র হ’তে হ’বে স্বামী ।”

হাঁ হাঁ, আছে ; পুত্রকথাগণ
ফেলে গেলে জনকের মন
শোকভরে হইবে চঞ্চল,
মুছি’ স্নেহ দিবে অশ্রুজল ।
আরো জীবনের উপার্জন,
ন’ব সাথে তাদের কারণ ।

—“বল দেখি খুঁজিয়া হৃদয়
হাতাড়িয়া নিভৃত নিলয়,
আরো যদি কিছু থাকে সাধ
তাড়াতাড়ি পড়ে’ গেছে বাদ ।
জীবনের ফিরে গেলে গতি
ফিরে দিতে রবে না শক্তি ।”

—হাসিয়া দেবতা ফেলি’ লেখা
বলিলেন—“কোথাকার বোকা,
ছেলে হ’তে সাধ গেছে মনে
‘বাপ’ হওয়া সাজিবে কেমনে,
সাথে লবে বার্ককেয়ার সাধ . . .
জরাটুকু শুধু দিবে বাদ ?

“অবিমিশ্র স্নেহ চাও তুমি
যাহা শুধু জানে স্বর্গভূমি !”
হাসিলাম অপ্রস্তুত-হাসি,
দিল মোর স্নেহনিদ্রা নাশি ।
প্রাতে উঠে লিখি স্নপন
পঙ্ককেশ-বালক-কারণ !

শ্রীস্বকুমারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্যারীচরণ সরকার ।

[জীবনবৃত্ত ।] *

বাঙলাভাষায় দুইএকখানি করিয়া বাঙালীর বঙ্গশিশু বলণ্টাইন্ জামিরে ডুবালের জীবন-
জীবনচরিত লিখিত হইতেছে; এখন চরিত পাঠের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পাইবে ।
আশা করা অসম্ভব নহে যে, অচিরাত্ আমরা বালককালে বুঝিয়াছিলাম যে, ডেন্ট

* জীবনবৃত্ত যোষ বি. এ. বিরচিত । সাহিত্যসেবকসমিতি হইতে প্রকাশিত । বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের কল্পকমলে
সমুৎপিত । ২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্য । মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা ।

নগরের সারসপাখীর আচরণ দেখিয়া সন্তান-বৎসলতা শিখিতে হয়; আর পরিশ্রম, মি-
হার, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের দৃষ্টান্ত—
বলন্টাইন্ জামিরে ডুবাল প্রভৃতি কোন
অজ্ঞাত সমাজের অজ্ঞাত-আচার ব্যক্তির
নিকট হইতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোন
কোন বিষয় সমগ্র মনুষ্যসমাজ হইতেও
শিখিবার উপায় নাই; আর আমাদের
বঙ্গসমাজ হইতে কোন সদৃশের শিক্ষাই
হইতে পারে না। তাহাতেই বলিতেছিলাম,
যদি ছুইএকখানি করিয়া বাঙালীর জীবন-
চরিত্র লিখিত হয়, তাহা হইলে ঘোরতর
আত্মাবমাননারূপ শিক্ষাবিড়ম্বনা হইতে
ক্রমে বাঙালী বালকেরা রক্ষা পাইতে পারে।
ঐহারা এইরূপ রক্ষক, তাঁহারা ধন,—
নবরুক্ষবাবু ধন।

আমি প্যারীবাবুকে বড়ই ভক্তি করি।
ভক্তি করিতাম, লিখিতে পারিলাম না;
ভক্তি করি। তাঁহার জীবনবৃত্তের এখনকার
কালের মত সমালোচনা, আমার দ্বারা
হইতেই পারে না। সিন্ধুক খুলিলেই মায়ের
অলঙ্কারগুলি অতি সমুপগে দেখিয়া আবার
মুড়িয়া-সুড়িয়া রাখি, সেগুলির শিল্পচাতুর্য্যের
সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই।
প্যারীবাবুর জীবনচরিত্রও আমি সমালোচনা
করিতে পারিব না—এর সবটুকুই ভাল,
পবিত্র, প্রচেষ্টা।

প্যারীবাবুর কাঁঠ বুক প্রভৃতি আমরা
পড়ি নাই। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে ইংরাজিতে
লিখিত তাঁহার ভারতবর্ষের ভূগোল পড়িয়া-
ছিলাম। প্যারীবাবুর সহিত সেই আমাদের
প্রথম সম্পর্ক। সেই অবধিই ভক্তির সৃষ্টি।

বি. এ. পাস্ করিয়া কলিকাতায় গিয়া—
তাঁহার স্থাপিত হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম,
প্রতি সপ্তাহে তাঁহার দর্শন পাইতাম, তাঁহার
সহানুভবদের অমিয়মধুর কথা শুনিতাম,
তাঁহার সরল প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইতাম।
কৈশোরের সেই ভক্তির অঙ্কুর যৌবনের
প্রারম্ভেই শাখাপ্রশাখাসম্বিত পাদপে
পরিণত হইল।

আমরা কলেজ ছাড়িতে না ছাড়িতে,
শ্রামনগরে রেলগাড়ির সজ্জ্বর্ণব্যাপার
লইয়া মহাগুণগোল হইল। প্যারীবাবু
নিজসম্পাদিত এডুকেশন গেজেট পত্রে
এই ছুঁটনার যেরূপ ভাবে আলোচনা করি-
লেন, এবং পরে যেরূপ ভাবে ঐ পত্রের
সম্পাদকতা ত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাঁহার
চরিত্রের কঠোর অংশ দেখিয়া তাঁহার উপর
ভক্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল। পূর্বে দেখিয়া-
ছিলাম, তিনি সরলে কোমল—এখন
বুঝিলাম, তিনি আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবার
জন্ত কঠোর দৃঢ়ত এবং স্বপদে নির্ভর
করিতে সক্ষম। (গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে
জীবনবৃত্তের এই ভাগ পরিষ্কৃত হইয়াছে।)

১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন ৫০বর্ষ বয়সে
প্যারীবাবু মানবলীলা সংবরণ করেন।
কার্তিকমাসে আমরা সাধারণীতে লিখিয়া-
ছিলাম :—

“আজিকালি এমনই কাল পড়িয়াছে
যে, যথার্থ ভদ্রলোকের উন্নতি অতি অল্পই
দেখিতে পাওয়া যায়। দেবান্নয়ের সেবা
না করিয়া এই বিচিত্র ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ
করা অতীব সুকঠিন। এখন প্রকৃত ভদ্র-
লোককে প্রায়ই নিস্তেজ, নির্জীব ও নিস্ত্রত

হইয়া কালাতিপাত করিতে হয়। এহেন সংসারে, এ হেন সময়ে, প্যারীবাবু অতি ভদ্রলোক হইয়াও নামঘশ লাভ করিয়াছিলেন। সকলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কৃতিত্ব উপার্জন করিয়াছেন। প্যারীবাবু ভদ্রলোকের ভরসা, দেশের যথার্থ মুখোজ্জলকারী। প্যারীবাবু আমাদের ভদ্রতার জয়পতাকা ছিলেন। আমরা এই বয়সে ভদ্রতায় ভর করিয়া সংসারের সহিত যে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে বাবু প্যারীচরণকে সেই সময়ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে একজন শক্তিশ্বর সেনানীরূপে বরণ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আজি একজন নেতার অভাব উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের এই শোকাবেগের কে শান্তিসাধন করিবে ?

“১৮২২ সালে বাবু প্যারীচরণ সরকার জন্মপরিগ্রহ করেন। ৫৩বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি হেয়ার-সাহেবের স্কুলে সাহেবের অতি প্রিয়ছাত্র ছিলেন। ক্রমে হিন্দুকলেজে ৪০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ মধ্যে বাষ্পবলে নৌচালনসম্বন্ধে প্যারীবাবু একটি প্রবন্ধ লেখেন, তৎকালে তাহা বিলাত পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে প্যারীবাবু আমাদের হুগলী ব্রাঞ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন; এখান হইতে বারাসতের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান; সেই অবধি বারাসতের প্রসিদ্ধ মিত্রগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সৌহার্দ। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া, এক যোগে

এক পরামর্শে অনেক সদনুষ্ঠানে ত্রুতী হইলেন। বারাসতের উন্নতির মূল এই সকল মহাত্মার।

“বারাসত হইতে প্যারীবাবু কলিকাতা হেয়ার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সকলেই জানেন, তাঁহার সময়ে হেয়ারস্কুল (বা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল) বাঙ্গালার সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে। ক্রমে গবর্ণমেন্ট প্যারীবাবুর যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারি-ইংরাজি-অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করেন। প্যারীবাবু এই সম্মানের কণ্ঠ গৌরবে সাধন করিতে করিতে ইহলোক হইতে অবস্থত হইয়াছেন।

“প্রথমপাঠ্যপযোগী ইংরাজী গ্রন্থসকল প্যারীবাবুকর্তৃক সঙ্কলিত। বিনা অল্পরোধে সেই সকল গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালার বিদ্যালয়-সমস্তে প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেল প্যারীবাবুর স্থাপিত। একরূপ ছাত্রবাস এখন গবর্ণমেন্টের অঙ্গমোদিত হইয়াছে। প্যারীবাবুর সদনুষ্ঠানের সফল এখন সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে।

“মত্তপাননিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীবাবু। তাঁহার উদ্যোগে কতশত অন্ধ যুবক অকাল নরকভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। অনন্তকাল অনন্তধামে প্যারীবাবুর এই সকল কীর্তির কীর্তন হইবে।”

প্যারীবাবুকে আমরা অন্তরের সহিত ভক্তি করি; তাঁহার প্রতিমূর্তিচিত্র শূন্যঘরে

রাখিয়াছি—প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া থাকি।

প্যারীবাবুর কীর্তি প্রচুর; কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রধান কীর্তি তাঁহার চরিত্র। এখনকার দিনে কীর্তিমন্তের চরিত্র প্রায়ই বিচিত্র। তাঁহার ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-সম্মুখে নতশিরে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই পরম-পুরুষসকলের পদসেবা করিতেছেন, আর হুজপুষ্ঠোপরি বৃহৎ ঢকা লইয়া বামহস্তে নিয়ত তাহাই বোরতর শক্তি করিয়া ইতর-ভদ্র সকলকে স্তম্ভিত বিস্কৃত করিতেছেন। কিন্তু প্যারীবাবুর চিত্র অশ্রুপ, তিনি

সোজা দাঁড়াইয়া কর্তব্যপথে ধীরে গম্ভীরে চলিয়াছিলেন। তাঁর না ছিল ঢাক, না ছিল জাঁক। তাহাতেই বলিয়াছিলাম, তিনি-ভদ্রলোকের শক্তিদর সেনানী। তাঁর সহজ সতেজ সরল চরিত্রই তাঁহার প্রধান বল; তাঁহার চরিত্রই তাঁহার প্রধান সহায়; আর তাঁর চরিত্রই তাঁর প্রধান কীর্তি।

আবার বলি, নবরুক্ষবাবু এমন জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া নিজে ধৃত হইয়াছেন, এবং স্বদেশীয়ের সন্দেহান্ত বন্ধীয় ছাত্রবৃন্দের সম্মুখে ধরিয়া অত্ৰকে ধৃত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সার সত্যের আলোচনা।

শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য। গতবারের আলোচনায় আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের কথা যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা সত্তা-ঘটিত ঐক্য। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই সত্তা-ঘটিত ঐক্যের ভিতরে আর-দুইপ্রকার ঐক্য সম্ভুক্ত রহিয়াছে;—একটি হ'ছে শক্তি-ঘটিত ঐক্য; আর-একটি হ'ছে জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

শক্তি-ঘটিত ঐক্য কি?—না, কর্তা-কর্ম্মের ঐক্য। জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য কি?—না, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য। আমি এবং তুমি উভয়ে যখন সম্মুখাসম্মুখি দণ্ডায়মান থাকিয়া পরস্পরের চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছি, তখন আমার কার্য্যের তুমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তোমার

কার্য্যের তুমি কর্তা; তথৈব তোমার কার্য্যের আমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং আমার কার্য্যের আমি কর্তা। এরূপ অবস্থায় তুমিও যেমন, আমিও তেমনি, উভয়েই কর্তা এবং কর্ম্ম দুইই একাধারে। ইহারই নাম কর্তাকর্ম্মের ঐক্য। তেমনি আবার, তোমার জ্ঞানের তুমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়; আমার জ্ঞানের আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়। উভয়েই আমরা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই একাধারে। ইহারই নাম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য।

উভয়াক্ষর ঐক্যের স্পষ্টরূপে ঠিকানা-নির্দেশ করিবার জন্ত দুই আমিকে দুই দিক্ হইতে ঘোটপাট করিয়া আনিয়া মুখামুখি দাঁড় করানো হইল। কিন্তু দুই আমিকে

ছুই দিক্ হইতে ডাকিয়া আনা বাড়ার
ভাগ ;—এক আমি'র ভিতরেই আমি এবং
তুমি, এই দুই আমি মুখামুখি দণ্ডায়মান,
আর, সেই সঙ্গে দৌহার মধ্যে শক্তি-ঘটিত
এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়-
মান । তার সাক্ষী—রামপ্রসাদের এই একটি
গীত :—

“মন তুমি কৃষি-কাজ জান না ।
এমন মানব-জমিন্ বুল পড়ে,
আবাদ ক'রে ফলতো সোণা ।”

এখানে এক আমি'র ভিতরে দুই আমি'র
অর্থাৎ আমি এবং তুমি'র, দৌহার সহিত
দৌহার বোঝাপড়া চলিতেছে ।

কর্তাকর্মের ঐক্য ।

মনে কর, একজন গায়ক গান করিতেছে ।
গাওনা হ'চ্ছে একটি ক্রিয়া, তাহার মূল হ'চ্ছে
গায়ক স্বয়ং এবং তাহার ফল হ'চ্ছে গীতধ্বনি ।
এইরূপ যে মূল এবং ফল, কর্তা এবং কর্ম,
দুয়ের ঐক্য ব্যতিরেকে গাওনা-ক্রিয়া চলিতে
পারে না । গাওনা-ক্রিয়ার বীজ গায়কের
কণ্ঠনলীর পথ দিয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং গাওনা-
ক্রিয়ার ফল গায়কের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ
দিয়া ফলিত হয় । দুই পথই উন্মুক্ত থাকা
চাই, তবেই গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে । যদি
গায়কের শ্রবণদ্বারে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা
হইলেও যেমন ; আর যদি কণ্ঠনলীতে কপাট
পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও তেমন ; দুয়ের
একটিতে কপাট পড়িলেই গাওনা-ক্রিয়া
তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায় । এখন জিজ্ঞাস্য
এই—কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার বীজাধান
হইয়াছে, আর, কোন্‌খানেই বা গাওনা-
ক্রিয়ার ফলাধান হইতেছে ? স্পষ্টই দেখিতে

পাওয়া যাইতেছে যে, গায়কের অন্তঃকরণেই
গাওনা-ক্রিয়ার বীজ রোপিত হইয়াছে,
গায়কের অন্তঃকরণ হইতেই গাওনা-ক্রিয়ার
বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, গায়কের অন্তঃ-
করণেই গাওনা-ক্রিয়ার ফল ফলিত হইতেছে ।
একই অন্তঃকরণক্ষেত্রে কর্তার কর্তৃত্ব এবং
কর্মের ফল একযোগে অভিব্যক্ত হইয়া একীভূত
হইয়া যাইতেছে ; আর, সেই কারণে গায়কের
মনে দুইভাবেই আনন্দ গঙ্গাধরমুনার ত্রায়
দুই দিক্ হইতে আসিয়া দুয়ে মিলিয়া এক
আনন্দে পরিণত হইতেছে ; এক ভাবের
আনন্দ হ'চ্ছে কর্ম্মানন্দ, আর-এক ভাবের
আনন্দ হ'চ্ছে ভোগানন্দ । কর্ম্মানন্দের
সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্ছে কর্তার কর্তৃত্বক্ষুণ্টি,
ভোগানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্ছে কর্ম্মের
ফলাস্বাদন । গীতধ্বনির উৎসারণে কর্তার
কর্তৃত্ব ক্ষুণ্টি পাইতেছে, গীতধ্বনির রসা-
স্বাদনে কর্ম্মের ফল ফলিত হইতেছে ।
গায়কের অন্তঃকরণে গাওনা-ক্রিয়ার বীজ
এবং ফল (কর্তার কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল)
একীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মানন্দ এবং
ভোগানন্দ একীভূত হইয়া ভোগানন্দে
পরিণত হইতেছে । বলিলাম “ভোগানন্দ” !
তাহার অর্থ আর-কিছু না—কর্তার কর্তৃত্ব-
ক্ষুণ্টি এবং কর্ম্মের ফলভোগ, এই দুয়ের
যোগজনিত আনন্দ । ফলেও এইরূপ দেখা
যায় যে, গায়ক যখন ভাবে মশগুল হইয়া
গান করে, তখন গাওনা-ক্রিয়ার কর্তা যিনি
গায়ক, এবং গাওনা-ক্রিয়ার কর্ম্ম যে গীতধ্বনি,
দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া গিয়া
দুয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় । এমন কি,
তেমন একজন প্রতিভাশালী গায়ক যখন

চতুর্দিকের শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত একাধা হইয়া গান করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী মনে মনে তাঁহার সহিত গানকার্য্যে যোগ না দিয়া কাস্ত থাকিতে পারে না; আর, তাহাতে রঙ্গশালা দেখিতে আশ্চর্য্য এইরূপ—যেন সমস্ত মণ্ডলী একই গায়ক এবং একই শ্রোতা, এবং প্রত্যেক শ্রোতা যেন সমস্ত মণ্ডলী একাধারে। এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় এক গায়ক একশত শ্রোতার সঙ্গে মিলিয়া একা একশত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করে, এবং একশত শ্রোতা এক গায়কের সঙ্গে মনে মনে গানে যোগ দিয়া এক গায়ক হইয়া উঠে; কাচপোকাক প্রভাবে আশ্রুলা যেমন কাচপোকা হইয়া উঠে, একের প্রভাবে অনেকে তেমনি এক হইয়া উঠে। কর্তা-কর্ম্মের মধ্যে এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যেও উভয়দ্বয় একের ক্ষুধি ঠিক সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞাতা-জ্ঞানের এক্য।

গায়ক যখন গান করিতেছে, তখন গায়ক জানিতেছে যে, আমিই গান করিতেছি।

এরূপ স্থলে গায়ক কাহাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে? জ্ঞেয় কে? গায়ক আপনাকেই গায়ক বলিয়া জানিতেছে—গায়ক আপনিই জ্ঞেয়। কে আপনাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে—জ্ঞাতা কে? গায়ক আপনিই জ্ঞাতা। গায়ক আপনিই জ্ঞেয়, আপনিই জ্ঞাতা। তা ছাড়া, গায়ক যখন গীতরসের বিদ্যাপ্রবাহে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে গলাইয়া আপনার মনের সহিত একীভূত করিয়া ফালে, তখন গায়কের জ্ঞানে আপনি এবং আপনার শ্রোতৃমণ্ডলী, এ দুয়ের মধ্যস্থিত প্রভেদের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গিয়া জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়দ্বয় এক্য সমস্ত ঘরময় ব্যাপিয়া ক্ষুধি পাইতে থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ যখন উভয়দ্বয় এক্য ক্ষুধি পায়—কর্তা-কর্ম্মের মধ্যে ক্ষুধি পায়—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যে ক্ষুধি পায়, তখন সে এক্য কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা যাহা ইতিপূর্বে প্রস্তুত ছিল, তাহাই জাগ্রত হইয়া উঠে? বারান্তরে এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।*

শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন।—গ্রীষ্মের প্রকোপবশত সার সত্যের আলোচনা গতমাসে ফাঁক দেওয়া হইয়াছিল এবং বর্তমান মাসে তাহার আয়তন হ্রাসীকৃত হইল। খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধপরম্পরায় মধ্যে কিরূপ যোগসূত্র চলিতেছে, তাহার সন্ধান পাইবার জন্য পাঠক ব্যস্ত হইবেন না। গম্যস্থানের যতই নিকটবর্তী হওয়া যাইবে, ততই সমস্তের সহিত সমস্তের যোগ স্পষ্টাকারে অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। লেখক।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

নিরদ-নীরজা ।—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত । মূল্য ॥০ আট আনা ।

এখানি নাটক ; কেন না, ইহা কথোপ-
কথনের আকারে লিখিত । বোধ করি
আমাদের ইহা একটা রোগ দাঁড়াইয়াছে যে,
কথোপকথনের হিসাবে ছাইভস্ম লিখিয়া
অম্বরা মনে করি যে, নাটক প্রণয়ন
করিলাম । পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে । গ্রন্থকার
বাঙ্গলা-ভাষা, কি রবীন্দ্রবাবু, কাহার উপর
অধিক অত্যাচার করিয়াছেন, বলা যায় না ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ।—

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত । মূল্য ৬
ছয় টাকা ।

জগতে গৌরবলাভ করিতে যাহার
সমর্থ হন, তাঁহাদের শত্রুও থাকে, मित्रও
থাকে । নেপোলিয়ানের জীবনচরিত শত্রুতেও
লিখিয়াছে, मित्रতেও লিখিয়াছে । मित्रের
লেখা জীবনচরিতই ভাল হয় । তাহার
কারণ এই যে, যেখানে সহানুভূতি
নাই, সেখানে চিত্রসৌন্দর্য্য হইতে পারে
না । পৃথিবীতে যত জীবনচরিত লিখিত
হইয়াছে, তাহার মধ্যে বোধ হয় যে বসুওয়েল-
লিখিত জনসনের জীবনচরিতই সর্বোৎকৃষ্ট ।
আমাদের দেশেও তাহার পরিচয় পাইয়াছি ।
শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষের অমিয়
নিমাইচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু-

মাত্রই নাই, কিন্তু পড়িতে অতি উপাদেয় ।
যেখানে ভক্তি নাই, সেখানে জীবনচরিত
লিখিত হইতে পারে না । জীবনচরিত
কেবল ভক্তেই লিখিতে পারে ।

আবটসাহেব শুধু ভক্ত নহেন, তিনি
অন্ধ উপাসক । নেপোলিয়ানের যে কার্য্য
কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, তাহাও
তিনি সমর্থন করিয়াছেন । এতটুকু বুঝিবার
ক্ষমতাও তাঁহার হয় নাই যে, জোশেফিনের
পরিত্যাগ তাঁহার রাজ্যনাশের একটা কারণ ।
এমন কি, জোশেফিনকে পরিত্যাগ করা
যতটুকু সমর্থিত হইতে পারে, তাহা তিনি
করিয়াছেন । তথাপি তাঁহার লিখিত পুস্তক
উপাদেয় হইয়াছে ।

নেপোলিয়ান যে অসাধারণদীর্ঘজীবীসম্পন্ন
ও প্রতিভাশালী ছিলেন, এ কথা আমরা
স্বীকার করি ; কিন্তু তাঁহাকে মহাপুরুষ
বলিয়া স্বীকার করা যায় না । যে দিন
ফ্রান্স তাঁহার হাতে আসিয়াছিল, ফ্রান্সকে
তিনি সে অবস্থায়ও রাখিয়া যাইতে পারেন
নাই । আসিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, যাই-
বার সময় ফ্রান্স তদপেক্ষা ক্ষীণতর, দুর্বলতর,
নিঃস্বতর । ইহাকে মহাপুরুষ বলিতে পারি
না । আবটসাহেব ইহাকে মহাপুরুষরূপে
পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । সে
চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্তু দেখিতে পাই
যে, নেপোলিয়ানের জীবনচরিতের মধ্যে

এই পুস্তকখানিরই আদর আমাদের দেশে সর্কাপেক্ষা বেশী। ভক্তের লেখা বলিয়াই ইহা আদৃত হইবার উপযুক্ত।

দীনেন্দ্রকুমারবাবু অম্ববাদ করিয়াছেন মাত্র। পুস্তকের যাহা কিছু দোষ, তাহা আবটসাহেবের, দীনেন্দ্রবাবুর নহে। এ কথা আমরা স্বীকার করিতেছি, অম্ববাদ ভাণই হইয়াছে। তবে দুইএকস্থলে এমন ভুল আছে, যাহা থাকা উচিত ছিল না। তাঁহার পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, “তিনি ইউজিন্ ও হরতেন্স নামক পুত্রদ্বয় লইয়া।” দীনেন্দ্রবাবুর মত উপযুক্ত লোকের জানা উচিত ছিল যে, হরতেন্স কন্যা, পুত্র নহে। এমন ভুল আরও দুই-একটা থাকিলেও এ পুস্তকের মোটের উপর প্রশংসা করিতেছি এবং বলিতেছি যে, ইহা সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

রঞ্জিনা।—শ্রীস্বরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৮ এক টাকা।

এই গ্রন্থকর্ত্রীর আর একখানি কবিতা-পুস্তকের সমালোচনাস্থলে এই ‘বঙ্গদর্শনেই’ তাঁহার ভাষা ও ভাব, উভয়েরই প্রশংসা করিয়াছিলাম। এই পুস্তকের সমালোচনায় সেই প্রশংসা গাঢ়তর করিয়া করিতে পারি। ভাষা প্রাঞ্জলতর, স্মৃতিতর হইয়াছে; ভাব গভীরতর, উদারতর হইয়াছে; উচ্ছ্বাস চিত্তিতর, সংযততর হইয়াছে; স্মৃত্যায় বলিতে হয় যে, ‘সঙ্গিনীতে’ যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—অধিকতর পরিণত ও বিকশিত হইয়াছে। দুইএকটি কবিতার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমরা বুঝাইতেছি।

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ ব্রতহোমাদি পুণ্যাহুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া জীবনযাপন করেন। একদিন প্রভাতে এক স্নেচ্ছ ভিখারিণী তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। প্রভাতে অপবিত্র মৃষ্টি দেখিয়া ক্রোধাক্র ব্রাহ্মণ কমণ্ডলু লইয়া ভীতিবিহ্বল। ভিখারিণীকে তাড়না করিলেন। কল্যাণী ব্রাহ্মণী কিন্তু সেই অনাথাকে আদর করিয়া, তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, তাহার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তখন—

“বিপ্র উঠে গরজিয়া—

ছু ইলি ববনী?—ত্যাগ্য। তুই আজ হ’তে,

যাবৎ না হ’স শুদ্ধ ফিরি পথে পথে

পুণ্য কাণ্ডধামে?—ব্রাহ্মণী কাঁহলা হাসি—

পতিপুঞ্জা দীনসেবা, তাই মোর কাণ্ডি!”

কি সুন্দর, উদার, মনোহর ভাব! কোন পুরুষকবি লিখিলেও ইহা প্রশংসার হইত; উচ্চজাতীয় হিন্দুমহিলা যে চিরপোষিত সংস্কারের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া এমন উদারতায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তাহা ত ভাবের উপাদেয়তা শতগুণ বৃদ্ধিত হইয়াছে। যেখানে বাহ্য প্রত্যাশা করা যায় না, সেখানে তাহা পাইলে বড়ই আশ্চর্য হয়।

‘নির্বাসিতা সীতা’ দীর্ঘক কবিতাটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। লক্ষ্মণ যখন রামচন্দ্রের কঠোর আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, তখন সীতা মুচ্ছাও গেলেন না, ভাঙিয়াও পড়িলেন না। মহর্ষের জ্ঞান তাঁহার সতী-গর্ভ, নিরপরাধে দণ্ডিতার অভিমান, জলিয়া উঠিল। তিনি লক্ষ্মণকে সন্মোহন করিয়া বলিলেন—

আপনার মন্দভাগ্য, জেনো, নাহি গণে
নির্দাসিতা সীতা । ভাবিতেছি শুধু মনে—
ধর্ম কি সহিবে, হায়, আজি অস্বাভাবিক
রাজহস্তে অপমান ?”

বড় ভয়ঙ্কর কথা ; কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক ।
বিনা মেঘে বজ্রপাতের ছায়া অকস্মাৎ এই
নিদারুণ নির্দাসনাজ্ঞা শুনিয়া সীতা যদি
কিছুমাত্র বিচলিতা না হইতেন, তাহা হইলেই
অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক হইত । এই স্থলে
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উপরের কয়
ছত্রে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে সীতা কেবল ‘রাজা’
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন — ‘স্বামী’ শব্দ ব্যবহার
করেন নাই । কিন্তু ক্ষণমধ্যেই সীতা আত্ম-
সংবরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন । তখন
‘রাজা’ প্রায় ডুবিয়া গেল ; ‘স্বামীহ’ প্রবল
হইল । সীতা বলিলেন—

“ব'লো আত্মপূত্রপদে দীন জানকীর
এই নিবেদন,—রাজা তিনি, তিনি স্বামী ;
তার কিছু নাহি দোষ ; অভাগিনী আমি !
শুনেছি অনলে স্বর্ণ ধরে উজ্জলতা ;
স্বর্ণ নহি—চুঁচিল না নিল্লা-মলিনতা ;
কিন্তু না হইমু ছাই ! তাহার সম্মান
ধরেছি যে গর্ভে আমি, যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃগুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব বাছারে ।
আর এক কথা আছে, বলিও তাহারে—
সাধিব চুস্তর তপ লয়ে মনস্কাম,
জন্মে জন্মে পতি যেন হ'ন মোর রাম !”
ইহার সৌন্দর্য্য ধ্যানগম্য, বচনীয় নহে ।

আমাদের বর্তমান বাজারে কবিদিগের হাতে
পড়িলে সীতা যে এই স্থলে কত ‘হা হতান্নি,
হা দন্ধান্নি’ করিতেন ; কত যে বন্ধে করাঘাত,
কেশোৎপাটন, ভূপতন, মুচ্ছা প্রভৃতির অব-
তারণা হইত, তাহা মনে করিলে বিভীষিকার
সুখার হয়—কিন্তু একবিন্দু করুণারসের

সঞ্চার হইত না । আর উপরকার এই কয়
ছত্রে কত যে মর্ম্মস্তদ যাতনা, কত যে সতীত্বের
গৌরব, কত যে স্বামিভক্তি, কত যে আত্ম-
বিসর্জনের সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে,
তাহা ভাবিয়া বৃত্তিতে হইবে, আমরা বলিয়া
বুঝাইতে অসমর্থ ।

‘বঙ্গজননী’ শীর্ষক কবিতা হইতে আরও
একটু উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই সমালোচনা
শেষ করিব ।

“তাই ত ধিকার উঠে

হৃদয়মাঝারে,

মা যাহারে ছেড়ে আছে,

মিছে গর্ভ তার !

তাই ছিন্ন হীনবল, তোমার সম্মানদল !

নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান-অপমান ;

আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ্যকোটি ভাণ !”

পুরুষের হাতে এমন লাঞ্ছনা আমরা
অনেক পাইয়াছি, এবং ভাল ছেলের মতন
অমানবদনে হজম করিয়া ফেলিয়াছি—চৈতন্য
হয় নাই, ধিকার হয় নাই । আজ স্ত্রীলোকের
নিকটও লাঞ্ছিত হইয়া ধিকার হইবে কি ?

ভাষাগত প্রাদেশিকতা দুইএক স্থানে
লক্ষ্য করিয়াছি । দুইএকটা, কবিতা
আবেগশূন্য ; দুইএকটা কবিতা পূর্নপ্রকাশিত
কবিতার প্রতিধ্বনিমাত্র । কিন্তু যে পুস্তক
পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহার ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র দোষ ধরিব না !

হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র ।—ত্রিবিধনিবন্ধ
রায়, ওরফে বি, এন, রায় প্রণীত । মূল্য
কাগজে ১।।০ দেড় টাকা, ঐ বাধাই ২। হই-
টাকা ।

পুস্তকখানি খুব বৃহৎ না হইলেও, ক্ষুদ্র
নহে । সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিনশত পাতা ।

কাগজ ভাল, অক্ষর ভাল, ছাপা ভাল—
অর্থব্যয়ের যে ক্রটি হয় নাই, ইহা সহজেই
অনুমেন। টাকাটা যে জলে ফেলা হইয়াছে,
দিল্লীর দরবারের পর এমন কথা বলিতে
আমরা অসমর্থ। যাহার নাই, সে-ও যখন
ধার করিয়া জলে ফেলিতে পারেন,
তখন, যাহার আছে, বা আছে বলিয়াই
আমরা ধরিয়া লইতে পারি, সে কেন পারিবে
না? ত্রিযুক্ত বিশ্বনিন্দুক রায় মহাশয় অর্থ-
শালী বটেন কি না, তাহা আমরা অবগত
নহি।, হউন, বা, না হউন, তিনি মহা-
জনের—আমাদের দেশের মহাজন—পদানু-
সরণ করিয়াছেন। স্মরণ্য তাঁহার অবলম্বিত
পথকে কুপথ বলা চলে না।

গ্রন্থের নাম দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন
যে, ইহাতে বিজ্ঞানের কোন কথা আছে,
তাহা হইলে তিনি নিজে ত ভুল করিবেনই,
তদ্যতীত গ্রন্থকারের উপর অবিচার ও অত্যা-
চার করা হইবে। তবে, এই পুস্তকে ষাট
বা ততোধিক পাতা ব্যাপিয়া গ্রন্থকারের
বংশের যে যেখানে আছেন, তাঁহাদের বিবরণ
দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিজের কথার
উপর নির্ভর করিয়াই আমরা স্বীকার করিতে
প্রস্তুত যে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই
তথ্যের জন্ত যদি পুস্তকখানিকে বিজ্ঞান
বলিতে হয়, তাহাতে আপত্তি করিবার কোন
কারণ ত দেখা যায় না।

গ্রন্থকার শেষে লিখিয়াছেন—“পাঠক-
বৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্বাদ ইত্যাদি।
হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র সমাধা হইল।” আমাদেরও
ঘাম দিয়া জর ছাড়িল।

এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে একটা
কথা আমাদের বারবার মনে হইয়াছে,
গ্রন্থকারের মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি নাই ত ?
আমাদের অনুমানটা সত্য কি না, গ্রন্থকারের
বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতেরা তাহা নির্ণয় করিবেন।
গ্রন্থকার যদি বর্তমান বঙ্গের গ্রন্থকারদিগের
অধিকাংশের নজির দেখাইয়া প্রমাণ করা-
ইতে চান যে, মস্তিষ্কবিকৃতিই গ্রন্থকারের
প্রধান লক্ষণ, তাহা হইলে আমরা যে নিরন্তর
হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। “কারণ—

এক ভ্রম, আর ছার
দোষগুণ কব কার।”

নৈবেদ্য।—শ্রীজলধর সেন প্রণীত।
মূল্য ৯০ আট আনা।

এই পুস্তকখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্পের
সমষ্টি। গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য নাই বটে;
কিন্তু সরসতা বিলক্ষণ আছে। ঘটনাবৈচিত্র্য
না থাকিলেও, গল্পগুলি পড়িতে কোথাও
একটুমান ইতস্তত করিতে হয় না—সহজে
পড়িয়া যাইতে হয়, এবং আন্তরিকতার
সহিতই পড়িয়া যাইতে হয়। “অন্ধের
কাহিনী”টি আমাদের বড়ই স্নানর লাগিয়াছে।
যিনি এমন মিষ্ট করিয়া ছোট গল্প লিখিতে
পারেন, তিনি বড় গল্প লেখেন না কেন ?

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

১৬

প্রণয়ীদের জন্ত কাব্যে যে সকল আয়ো-
জনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতাসহরে তাহা
মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক-বকুলের
বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন
লতাবিতান, কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকি-
লের কুহকাকলী? তবু এই শুককঠিন
সৌন্দর্যাহীন আধুনিক নগরে ভালবাসার
জাহ্নবিতা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না।
এখানকার কঙ্করকঠোর পথে কর্মচক্রের
অবিশ্রাম ঘর্ষরশকের মধ্যেও তাহার অপূর্ণ
রাগিণী কেমন করিয়া বাজিয়া উঠে।
এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহ-
নিগড়বন্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর
প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন
করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ
দিয়া কতরাতে কতদিনে কতবার কত
ঠিকানার যে আনুগোনা করিতেছেন, তাহা
কে জানিতে পারে!

রমেশ ও হেমনলিনী চামড়ার দোকানের
শাম্বে মুদির দোকানের পাশে কলুটোলার
ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেছিল বলিয়া
প্রণয়বিকাশসম্বন্ধে কুঞ্জকুটীরচারীদের চেয়ে

তাহারা যে কিছুমাত্র পিছাইয়া ছিল, এমন
কথা কেহ বলিতে পারে না। অন্নদা-
বাবুদের চা-রস-চিহ্নিত মলিন ক্ষুদ্র টেবিলটি
পদ্মসরোবর নহে বলিয়া রমেশ কিছুমাত্র
অভাব অনুভব করে নাই। হেমনলিনীর
পোষা বিড়ালটি কৃষ্ণসারু যুগশাবক না
হইলেও রমেশ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার গলা
চুলকাইয়া দিত—এবং সে যখন ধনুকের মত
পিঠ ফুলাইয়া আলমুত্যাগপূর্বক গাত্র-
লেহনদ্বারা প্রসাধনে রত হইত, তখন রমে-
শের মুগ্ধদৃষ্টিতে এই প্রাণীটি গৌরবে অস্ত
কোন চতুষ্পদের চেয়ে নূন বলিয়া প্রতিভাত
হইত না। দোতলার বসিবার ঘরে বেতের
এবং কাঠের জীর্ণ এবং নূতন প্রত্যেক
চৌকি-কেদারা সহকারমাধবীকুঞ্জেরই মত
রমেশের মনে মোহাবেশ সঞ্চার করিয়া
দিতে লাগিল।

স্বর্গাস্তের পর হেমনলিনী ছাদে উঠিয়া
পদচারণা করিত। রমেশের পক্ষে গোল-
দীঘি, ইডেনগার্ডন, গঙ্গাতীর, সমস্তই স্বগম
ও অব্যবহিত ছিল, তবু নিজের বাসাবাড়ীর
সকীর্ণ ছাদের হাওয়াই তাহার স্বাস্থ্যের
পক্ষে অমূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ছাদের

মধ্যে দিচ্ছু ব্যবধান ছিল, কিন্তু সায়াঙ্কের আকাশ এই দুই ছাদের ছুটি নরনারীর মাথার উপরে শুভদৃষ্টির একটিমাত্র নীলাঞ্জন প্রসারিত করিয়া ধরিত। দুই ছাদে দুইটি হৃদয় জ্যোতিষ্কসভাতলে অনন্তকালের মুক-সাক্ষী গ্রহতারকাদের অনিমেঘনেত্রের সম্মুখে নীরবে মিলনের আসন গ্রহণ করিত।

হেমলিনী পরীক্ষা পাস করিবার ব্যগ্র-তার সেলাইশিক্ষায় বিশেষ পটুতা লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার এক দীর্ঘপটু সখীর কাছে একাগ্র-মনে সে সেলাই শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেলাইবাপারটাকে রমেশ অত্যন্ত অনা-বশ্যক ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। হেম-লিনীকে সে বরাবর সাহিত্যদর্শনের চর্চা করিতেই দেখিয়া আসিয়াছে, সেই ছবিটাই তাহার মনে অঙ্কিত হইয়া গেছে,—সাহিত্য-দর্শনে হেমলিনীর সঙ্গে তাহার দেনা-পাওনা চলে—কিন্তু সেলাইবাপারে রমেশকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্ত সে প্রায়ই কিছু অধীর হইয়া বলিত, “আজ-কাল সেলাইয়ের কাজ কেন আপনার এত ভাল লাগে! ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির ধোঁন চর্চা হয় না, কেবল একঘেয়ে কাজে যন্ত্রের মত আঙুল ঢালাইয়া যাইতে হয়। বাহাদের সমস্ত কাটাইবার আর কোন সহ্য নাই, তাহাদের পক্ষেই ইহা ভাল।” হেমলিনী কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘ হস্তমুখ ছুঁতে রেশম পরাইতে থাকে। অক্ষর তীব্রত্বের বলে, “মেয়েরা কেবল মার্টিনোর এথিক্স এবং টেনিসনের কবিতা পড়িবে, যে সকল কাজ সংসারের কোন প্রয়োজনে লাগে,

রমেশবাবুর বিধানমতে সে সমস্ত তুচ্ছ! মশায় যত বড়ই তত্ত্বজ্ঞানী এবং কবি হোন না কেন, তুচ্ছকে বাণ দিয়া একদিনও চলে না।” রমেশ উত্তেজিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার জন্ত কোমর বাধিয়া বসে; হেমলিনী বাধা দিয়া বলে, “রমেশবাবু, আপনি সকল কথারই উত্তর দিবার জন্ত এত ব্যস্ত হন কেন? ইহাতে সংসারে অনাবশ্যক কথা যে কত বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক নাই।”—এই বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া ঘর গণিয়া সাবধানে রেশমখুঁচা ঢালাইতে প্রবৃত্ত হয়।

একদিন সকালে রমেশ তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর রেশমের ফুলকাটা মধ্যমলে বাধানো একটি বুটিংবই সাজানো রহিয়াছে। তাহার একটি কোণে “র” অক্ষর লেখা আছে, আর এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বইখানির ইতিহাস ও তাৎপর্য বুঝিতে রমেশের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। সেলাই-জিনিষটা যে বিশেষ অবস্থায় তেমন তুচ্ছ নহে, তাহা তাহার অন্তরাঙ্গা বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া গইল। বুটিংবইটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে অক্ষরের কাছেও হার মানিতে রাজি হইল। সেই বুটিংবই খুলিয়া তখন তাহার উপরে এক-খানি চিঠির কাগজ রাখিয়া সে লিখিল— “আমি যদি কবি হইতাম, তবে কবিতা লিখিয়া প্রতিদান দিতাম, কিন্তু প্রতিভা হইতে আমি বঞ্চিত। ঈশ্বর আমাকে দিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু গইবার ক্ষমতাও

একটা ক্ষমতা । আশাতীত উপহার আমি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্তর্ধর্মী ছাড়া তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না । দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতরে লুকানো ! ইতি । চিরঞ্জীবী ।”

এই লিখনটুকু হেমনলিনীর হাতে পড়িল । তাহার পরে এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না ।

বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল । বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে সহস্রে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে—ওটা আরণ্যপ্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী । সহরের বাড়ীগুলো তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ও ছাদ লইয়া, পথিক তাহার ছাতা লইয়া, ট্রামগাড়ি তাহার পর্দা লইয়া বর্ষাকে কেবলি নিষেধ করিবার বার্থ চেষ্টায় ক্রৈদান্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে । নদী, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর বর্ষাকে সাদর কলরবে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করে । সেইখানেই বর্ষার যথার্থ সমারোহ—সেখানে শ্রাবণে ছ্যলোকভুলোকের আনন্দ-সম্মিলনের মাঝখানে কোন বিরোধ নাই ।

কিন্তু নূতন ভালবাসার মানুষকে অরণ্য-পর্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয় । অবিশ্রাম বর্ষার অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তক্ষুণ্ণির কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না । মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের দুইজনের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিয়া । মার্টিনো আর কোনমতেই চলিল না । সাহিত্যও আর অবাধে অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে নানা বাজে কথা আসিয়া পড়ে । বৃষ্টির উপলক্ষ্যে রমেশের

আদালতবাতায় প্রায়ই বিয় ঘটিতে লাগিল । একএকদিন সকালে এমনি চাপিয়া বৃষ্টি আসে যে, হেমনলিনী উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, “রমেশবাবু, এ বৃষ্টিতে আপনি বাড়ী যাইবেন কি করিয়া ?” রমেশ নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বলে, “এইটুকু বই ত নয়, কোনরকম করিয়া যাইতে পারিব ।” হেমনলিনী বলে, “কেন ভিজিয়া সর্দি করিবেন ? এইখানেই থাইয়া যান না ।” সর্দির জ্ঞাত উৎকণ্ঠা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না ; অল্পেই যে তাহার সর্দি হয়, এমন কোন লক্ষণও তাহার আত্মীয়-বন্ধুরা দেখে নাই, কিন্তু বর্ষণের দিনে হেমনলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাহাকে কাটাইতে হইত,—দুইপামাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অশ্রায় দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত । কোনদিন বাদ্লার একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলেই হেমনলিনীদের ঘরে প্রাতঃকালে রমেশের খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে ভাজাভুজি খাইবার নিমন্ত্রণ জুটিত । বেশ দেখা গেল, হঠাৎ সর্দি লাগিবার সম্বন্ধে ইহাদের আশঙ্কা যত অতিরিক্ত প্রবল ছিল, পরিপাকের বিভ্রাট-সম্বন্ধে ততটা ছিল না ।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল । এই আত্মবিস্মৃত হৃদয়াবেগের পরিণাম কোথায়, সে কথা রমেশ স্পষ্ট করিয়া ভাবে নাই । কিন্তু অন্নদাবাবু ভাবিতেছিলেন এবং তাঁহাদের সমাজের আরো পাঁচজন আলোচনা করিতেছিল । অন্নদাবাবু মনে মনে তাঁহার কন্ঠার উপর একটু বিরক্ত হইতেছিলেন ; ভাবিতেছিলেন, হেমনলিনীর উচিত, এই গা-পান ও খিচুড়িসেবনকে সুকৌশলে বিবাহের নিমন্ত্রণযজ্ঞের মধ্যে

আকর্ষণ করিয়া আনে। কিন্তু অবোধ বালিকার সে সম্বন্ধে কোন তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। একে রমেশের পাণ্ডিত্য যতটা, কাণ্ডজ্ঞান ততটা নাই, তাহাতে তাহার বর্তমান মুগ্ধ অবস্থায় তাহার সাংসারিক বুদ্ধি আরো অস্পষ্ট হইয়া গেছে। অন্নদাবাবু প্রত্যহই বিশেষ প্রত্যাশার সহিত তাহার মুখের দিকে চান, কিন্তু কোন জবাবই পান না।

১১

বিবাহের দিনে বরকনে যেমন রাজমর্যাদা লাভ করে—যে ছুটি নরনারী পরস্পরকে ভালবাসিতেছে, প্রকৃতির কাছে তাহাদের আদর তেমনি। তাহারাজা,—সূর্য্যচন্দ্রতারা বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্ত আলো জ্বালে, এবং বিশ্বের সমস্ত সঙ্গীত বিশেষরূপে তাহাদেরই কর্ণ লক্ষ্য করিয়া নহবৎ জমাইয়া তোলে। ইচ্ছুক অনিচ্ছুক সকলেরই কাছ হইতে ইহার আশ্রয়লাভের রাজকরটুকু আদায় করিয়া নেয়। হতভাগ্য অক্ষয়কেও এই নব প্রেমের রসদ জোগাইতে হইয়াছে।

অক্ষয়ের গলা বিশেষ ভাল ছিল না, কিন্তু সে যখন নিজের বেহালা বাজাইয়া গান গাহিত, তখন অত্যন্ত কড়া সমজদার ছাড়া সাধারণ শ্রোতার দল আপত্তি করিত না, এমন কি, আরো গাহিতে অল্পরোধ করিত। অন্নদাবাবুর সঙ্গীতে বিশেষ অল্পরক্তি ছিল না, কিন্তু সে কথা তিনি কবুল করিতে পারিতেন না—তবু তিনি আশ্রয়কার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন। কেহ অক্ষয়কে গান গাহিতে অল্পরোধ করিলে তিনি বলিতেন—“ঐ তোমাদের দোষ! বেচারী গাহিতে পারে বলিয়াই

কি উহার 'পরে অত্যাচার করিতে হইবে?”

অক্ষয় বিনয় করিয়া বলিত—“না না অন্নদাবাবু, সেজন্ত ভাবিবেন না—অত্যাচারটা কাহার 'পরে হইবে, সেইটেই বিচার্য্য!”

অল্পরোধের তরফ হইতে জবাব আসিত, “তবে পরীক্ষা হউক!”

সেদিন অপরাহ্নে খুব ঘনঘোর করিয়া মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অক্ষয় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেমনলিনী কহিল, “অক্ষয়বাবু, একটা গান করুন।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“এমন বাদলার দিনে কি গলা কাহারো ভাল থাকিতে পারে? দেখ না, সন্দিগ্ধে আমার গলা দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। আজ এই যে একহণ্টা ধরিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না। প্রথম আরম্ভ হয়, যেদিন প্রবোধের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম। যখন গেলাম, তখন বেশ রোজ উঠিয়াছিল, তার পরে—”

হেমনলিনী। বাবা, তুমি মিথ্যা ভয় করিতেছ, অক্ষয়বাবুর ত সন্দিগ্ধ কোন লক্ষণ নাই, গলা বেশ আছে। অক্ষয়বাবু, এই বেহালাটা মিলাইয়া নিনু।

এই বলিয়া হেমনলিনী হার্মোনিয়মে সুর দিল। অন্নদাবাবুর রোগোৎপত্তির ইতিহাস ভাবী সুযোগের অপেক্ষায় অসমাপ্ত হইয়া রহিল।

অক্ষয় বেহালা মিলাইয়া লইয়া হিন্দুস্থানী গান ধরিল—

“বায়ু বহী পুরবেঞা, নীদ নহী বিন সৈঞা।”

গানের সকল কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না— কিন্তু একেবারে প্রত্যেক কথার কথার বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। মনের মধ্যে যখন বিরহমিলনের বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, তখন একটু আভাসই যথেষ্ট। এটুকু বোঝা গেল যে, বাদল বরিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং একজনের জন্ত আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

অক্ষয় নিজের দরদেই সমস্ত মন দিয়া গান গাহিতেছিল। সুরের ভাষায় সে নিজের অব্যক্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু সে ভাষা কাজে লাগিতেছিল আর ছুইজনের। ছুইজনের হৃদয়ভরঙ্গ সেই স্বরলহরীকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরকে আঘাত-অভিঘাত করিতে ছল। জগতে কিছু আর অকিঞ্চিৎকর রহিল না। সব যেন মনোময় হইয়া গেল। পৃথিবীতে এপর্যন্ত যত মানুষ যত ভালবাসিয়াছে, সমস্ত যেন ছুটিমাত্র হৃদয়ে বিভক্ত হইয়া অনির্কচনীয় স্নেহ-হুঃখে আকাঙ্ক্ষা-আকুলতায় কম্পিত হইতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “অক্ষয়, একটা বাংলা গান গাও না, তোমার ঐ হিন্দিগান আমি বুঝি না।”

হেমলিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কেন বাবা, হিন্দিগানই ত বেশ—আমার বেশ লাগে।”

বাংলা গান বড় বেশি স্পষ্ট—তাহার সমস্তই বোঝা যায়। তাহাতে আত্ম থাকে না। প্রেম অন্তঃপুরচারী, বেশি প্রকাশ্যতা তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। সে কতকটা প্রকাশ না হইলেও বাঁচেনা, আবার কতকটা

আড়াল না হইলেও মরিয়া যায়। তাহার পক্ষে কথার চেয়ে সুরই ভাল, এবং লোকজনের মধ্যে বাংলার চেয়ে হিন্দিই ভাল। ‘প্রাণনাথ’ যখন কানে বড় বেশি ঠেকে, তখন ‘সৈয়া’ বেশ অনায়াসে চলিয়া যায়, এবং ‘প্রিয়া’ বলিতে যখন বাধে, তখন ‘পিয়া’ কথাটা কাজে লাগিতে পারে। বৈষ্ণবপদাবলী এইজন্তই আজ পর্যন্ত সাদা বাংলা ব্যবহার করিতে পারিল না।

সেদিন মেঘের মধ্যে যেমন ফাঁক ছিল না, গানের মধ্যেও তেমনি হইয়া উঠিল। হেমলিনী কেবলি অশ্রু নয় করিয়া বলিতে লাগিল—“অক্ষয়বাবু, থামিবেন না, আর একটা গান, আর একটা গান!”

উৎসাহে এবং আবেগে অক্ষয়ের গান অবধি উৎসারিত হইতে লাগিল। গানের সুর সুরে সুরে পুঞ্জীভূত হইল, যেন তাহা স্ফুটিল হইয়া উঠিল, যেন তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া বিছাৎ খেলিতে লাগিল—বেদনাভূর হৃদয় তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন-আবৃত হইয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাত্রে অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ বিদায় লইবার সময় যেন গানের সুরের ভিতর দিয়া নীরবে হেমলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। হেমলিনীও চক্ষিতের মত একবার চাহিল, তাহার দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।

রমেশ বাড়ী গেল। বৃষ্টি ঋণকালমাত্র ধামিয়াছিল, আবার ঝুপঝুপশব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রমেশ সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। হেমলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি-

পতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল—

বাধু বহী' পুরবৈঞা, নীদ নহী' বিন সৈঞা।

পরদিন প্রাতে রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, “আমি যদি কেবল গান গাহিতে পারিতাম, তবে তাহার বদলে আমার অন্ত অনেক বিত্তা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। গানের যেটুকু সফলতা, সেটুকু ত অন্তের মারফৎ আদায় করিয়া লইয়াছিল, তবু গান গাহিবার যেটুকু পরিতৃপ্তি, সেটুকুর স্লেভও ছাড়া যায় না। মনে মনে সে বলিতেছিল, “অক্ষয়, তুমি ধন্ত, তুমি গান গাহিতে পার!”

অক্ষয় যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তবে বলিত, “রমেশ, তুমিই ধন্ত! গান শুনিবার সুখ তোমারই!”

কিন্তু কোন উপায়ে এবং কোন কালেই সে যে গান গাহিতে পারিবে, এ ভরসা রমেশের ছিল না! সে স্থির করিল, “আমি বাজাইতে শিখিব।” ইতিপূর্বে একদিন নির্জন অবকাশে সে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালা-খানা লইয়া ছড়ির টান দিয়াছিল—সেই ছড়ির একটিমাত্র আঘাতে সঙ্গীতের সরসভাটী এমনি আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার পক্ষে বেহালায় চর্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে আশা সে পরিত্যাগ করে। আজ সে ছোট দেখিয়া একটা হার্মোনিয়ম কিনিয়া আনি। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে অঙ্গুলিচালনা করিয়া যেটুকু বুঝিল যে, আর বাই হোক, এ যন্ত্রের সহিকৃত্য বেহালায় চেয়ে বেশি।

পরদিনে অন্নদাবাবুর বাড়ী যাইতেই

হেমনলিনী রমেশকে কহিল, “আপনার ঘর হইতে কাল যে হার্মোনিয়মের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল!”

রমেশ ভাবিয়াছিল, দরজা বন্ধ থাকিলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমন কান আছে, যেখানে রমেশের অবরুদ্ধ ঘরের শব্দও সংবাদ লইয়া আসে। রমেশকে একটুকু লজ্জিত হইয়া কবুল করিতে হইল যে, সে একটা হার্মোনিয়ম কিনিয়া আনিয়াছে এবং বাজাইতে শেখে, ইহাই তাহার ইচ্ছা।

হৃদয়ের কোন্ বেদনার মধ্যে এই ইচ্ছার মূল কারণটি, হেমনলিনীর তাহা অগোচর ছিল না। হেমনলিনী কহিল—“ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজে নিজে কেন মিথ্যা চেষ্টা করিবেন! তাহার চেয়ে আপনি আমাদের এখানে অভ্যাস করুন—আমি যতটুকু জানি, সাহায্য করিতে পারিব।”

রমেশ কহিল, “আমি কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি, আমাকে লইয়া আপনার অনেক হুঃখভোগ করিতে হইবে।”

হেমনলিনী কহিল, “আমার যেটুকু বিত্তা, তাহাতে আনাড়িকে শেখানই কোন-মতে চলে।”

ক্রমশই প্রমাণ হইতে লাগিল, রমেশ যে নিজেকে আনাড়ি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিনয়নহে। এমন শিক্ষকের এত অবাচিত সহায়তাসত্ত্বে স্বরের জ্ঞান রমেশের মগজের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন সন্ধি খুঁজিয়া পাইল না। সত্তরগমুচ জলের মধ্যে পড়িয়া যেমন উন্নতের মত হাতপা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশ সঙ্গীতের হাঁটুজলে তেমনিভর ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার কোন্

আঁতুল কখন কোথায় গিয়া পড়ে, তাহার ঠিকানা নাই,—পদে পদে ভুল স্র বাজে, কিন্তু রমেশের কানে তাহা বাজে না, স্র-বেস্রের মধ্যে সে কোনপ্রকার পক্ষপাত না করিয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে রাগরাগিণীকে সর্বত্র লজ্বন করিয়া যায়। হেমনলিনী যেই বলে, “ও কি করিতেছেন, ভুল হইল যে,”—অমনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ভুলের দ্বারা প্রথম ভুলটা নিরাকৃত করিয়া দেয়। গম্ভীর-প্রকৃতি অধ্যবসায়ী রমেশ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নহে। রাস্তাটেরির ষ্ট্রাম্রোশার যেমন মন্থরগমনে চলিতে থাকে, তাহার তঁলায় কি যে দলিতপিষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি ক্রক্ষেপমাত্র করে না, হতভাগ্য স্বর-লিপি এবং হাস্যোনিয়মের চাবিগুলার উপর দিয়া রমেশ সেইরূপ অনিবার্য অন্ধতার সহিত বারবার যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

রমেশের এই মূঢ়তায় হেমনলিনী হাসে, রমেশও হাসে। রমেশের ভুল করিবার অসাধারণ শক্তিতে হেমনলিনীর অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। ভুল হইতে, বেস্র হইতে, অক্ষমতা হইতে আনন্দ পাইবার শক্তি ভালবাসারই আছে। শিশু চলিতে আরম্ভ করিয়া বারবার ভুল পা ফেলিতে থাকে, তাহাতেই মাতার স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। রাজন্যসম্বন্ধে রমেশ যে অদ্ভুত-রকমের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, হেমনলিনীর এই এক বড় কৌতুক।

রমেশ একএকবার বলে, “আচ্ছা, আপনি যে এত হাসিতেছেন, আপনি যখন প্রথম বাজাইতে শিখিতেছিলেন, তখন ভুল করেন নাই ?”

হেমনলিনী বলে—“ভুল নিশ্চয়ই করিতাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি রমেশবাবু, আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না।”

রমেশ ইহাতে দমিত না, হাসিয়া আবার গোড়া হইতে স্র করিত। অন্নদাবাবু সঙ্গীতের ভালমন্দ কিছুই বুঝিতেন না, তিনি একএকবার গম্ভীর হইয়া কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেন—“তাই ত, রমেশের ক্রমেই হাত বেশ পাকিয়া আসিতেছে।” হেমনলিনী বলিত, “হাত বেস্রায় পাকিতেছে।”

অন্নদা। না না, প্রথমে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আমার ত বোধ হয়, রমেশ যদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার হাত নিতান্ত মন্দ হইবে না। গানবাজনার আর কিছু নয়, খুব অভ্যাস করা চাই। একবার সারোগামার বোধটা জন্মিয়া গেলেই তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া আসে।

এ সকল কথার উপরে প্রতিবাদ চলে না। সকলকে নিকন্তর হইয়া গুণিতে হয়।

১২

প্রায় প্রতিবৎসর শরৎকালে পূজার টিকিট বাহির হইলে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু জব্বলপুরে তাঁহার ভগিনীপতির কৰ্মস্থানে বেড়াইতে যাইতেন। পরিপাকশক্তির উন্নতিসাধনের জন্ত তাঁহার এই সাংবৎসরিক চেষ্টা।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হইয়া আসিল, এবারে পূজার ছুটির আর বড় বেশি বিলম্ব নাই। অন্নদাবাবু এখন হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় রমেশ আজ-
কাল খুব বেশি করিয়া হাঙ্গোনিয়ম শিখিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিন কথায় কথায়
হেমনলিনী কহিল, “রমেশবাবু, আমার বোধ
হয়, আপনার অন্তত কিছুদিন বায়ুপরিবর্তন
দরকার। না বাবা?”

অন্নদাবাবু ভাবিলেন কথাটা সঙ্গত বটে,
কারণ ইতিমধ্যে রমেশের উপর দিয়া শোক-
হুঃখের দুর্ধোগ গিয়াছে। কহিলেন, “অন্তত
কিছুদিনের জন্ত কোথাও বেড়াইয়া আসা
ভাল। বুঝিয়াছ রমেশ, পশ্চিমই বল আর
যে দেশই বল, আমি দেখিয়াছি, কেবল কিছু-
দিনের জন্ত একটু ফল পাওয়া যায়। প্রথম
দিনকতক বেশ ক্ষুধা বাড়ে, বেশ খাওয়া যায়,
তাহার পরে যে কে সেই! সেই পেটভার
হইয়া আসে, বুকজালা করিতে থাকে, যা
খাওয়া যায়, তা-ই—”

হেমনলিনী। রমেশবাবু, আপনি নন্দা-
করণ দেখিয়াছেন?

রমেশ। না, দেখি নাই।

হেমনলিনী। এ আপনার দেখা উচিত,
না বাবা?

অন্নদা। তা বেশ ত, রমেশ আমাদের
সঙ্গেই আসুন না কেন? হাওয়া-বদলও
হইবে, মার্কেল-পাহাড়ও দেখিবে।

হাওয়া-বদল করা এবং মার্কেল-পাহাড়
দেখা, এই দুটিই যেন রমেশের পক্ষে সম্প্রতি
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—অতরাং রমেশকেও
রাজি হইতে হইল।

সেদিন রমেশের শরীরমন যেন হাওয়ার
উপরে ভাসিতে লাগিল। অশান্ত হৃদয়ের
আবেগকে কোন-একটা রাস্তায় ছাড়া দিবার

জন্ত সে আপনার বাসার ঘরের মধ্যে
ঘাবল করিয়া হাঙ্গোনিয়মটা লইয়া পড়িল।
আজ আর তাহার যত্নগত্জ্ঞান রহিল না—
যন্ত্রটার উপরে তাহার উন্নত আঙুলগুলো তাল-
বেতালের নৃত্য বাধাইয়া দিল। হেমনলিনীর
দূরে যাইবার সম্ভাবনায় কয়দিন তাহার
হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হইয়া ছিল—আজ উল্লা-
সের বেগে সঙ্গীতবিশ্বাসকে সর্বপ্রকার আন-
অস্থায়-বোধ একেবারে বিসর্জন দিল।

এমন-সময় দরজায় দ্বা পড়িল—“আ সব-
নাশ, থামুন, থামুন রমেশবাবু, করি-
তেছেন কি?”

রমেশ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আরক্তমুখে
দরজা খুলিয়া দিল। অক্ষয় ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করিয়া কহিল, “রমেশবাবু, গোপনে
বসিয়া এই যে কাণ্ডটি করিতেছেন, আপনা-
দের ক্রিমিনাল কোডের কোন দণ্ডবিধির
মধ্যে কি ইহা পড়ে না?”

রমেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, “অপরূপ
কবুল করিতেছি।”

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, আপনি যদি
কিছু না মনে করেন, আপনার সঙ্গে আমার
একটা কথা আলোচনা করিবার আছে।”

রমেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে আলোচ্য-
বিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অক্ষয়। আপনি এতদিনে এতকু বুঝিয়া-
ছেন, হেমনলিনীর ভালমন্দের প্রতি আমি
উদাসীন নহি।

রমেশ হাঁ-না কিছু না বলিয়া চূপ করিয়া
গুনিতে লাগিল।

অক্ষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার
অভিপ্রায় কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার

অধিকার আমার আছে—আমি অন্নদাবাবুর বন্ধু ।

কথাটা এবং কথার ধরণটা রমেশের অত্যন্ত খারাপ লাগিল । কিন্তু কড়া জবাব দিবার অভ্যাস ও ক্ষমতা রমেশের নাই । সে মুহূর্ত্তে কহিল—“তাহার সম্বন্ধে আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে, এ আশঙ্কা আপনার মনে আসিবার কি কোন কারণ ঘটিয়াছে ?”

অক্ষয় । দেখুন, আপনি হিন্দুগরিবারে আছেন, আপনার পিতা হিন্দু ছিলেন । আমি জানি, পাছে আপনি ব্রাহ্মধর্মে বিবাহ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনাকে অশুভ বিবাহ দিবার জন্ত দেশে লইয়া গিয়াছিলেন ।

এই সংবাদটি অক্ষয়ের জানিবার বিশেষ কারণ ছিল । কারণ অক্ষয়ই রমেশের পিতার মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছিল । রমেশ ক্ষণকালের জন্ত অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না ।

অক্ষয় কহিল, “হঠাৎ আপনার পিতার মৃত্যু ঘটিল বলিয়াই কি আপনি নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছেন ? তাহার ইচ্ছা কি—”

রমেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল—“দেখুন অক্ষয়বাবু, অশ্বের সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবার অধিকার যদি আপনার থাকে, তবে দিন, আমি শুনিয়া যাইব—কিন্তু আমার পিতার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তাহাতে আপনার কোন কথা বলিবার নাই ।”

অক্ষয় কহিল, “আচ্ছা বেশ, সে কথা তবে থাক্ । কিন্তু হেমলিনীকে বিবাহ করিবার

অভিপ্রায় এবং অবস্থা আপনার আছে কি না, সে কথা আপনাকে বলিতে হইবে ।”

রমেশ আঘাতের পর আঘাত খাইয়া ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল,—কহিল, “দেখুন অক্ষয়বাবু, আপনি অন্নদাবাবুর বন্ধু হইতে পারেন, কিন্তু আমার সহিত আপনার তেমন বেশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই । যাঁহাদিগকে আমি একান্তমনে প্রজ্ঞা করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে লইয়া আপনার সহিত আমার এইরূপ সওয়ালজবাব চালানো আমার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কোচজনক । দয়া করিয়া আপনি এ সব প্রশ্ন বন্ধ করুন ।”

অক্ষয় । আমি বন্ধ করিলেই যদি সব কথা বন্ধ থাকে এবং আপনি এখন যেমন ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতেছেন, এমনি বরাবর কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না । কিন্তু সমাজ আপনাদের মত নিশ্চিন্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে সুখের স্থান নহে । যদিও আপনারা অত্যন্ত উঁচুদের লোক, পৃথিবীর কথা বড় বেশি ভাবেন না, তবু চেষ্টা করিলে হয় ত এটুকুও বুঝিতে পারিবেন যে, ভদ্রলোকের কষ্টার সহিত আপনি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এরূপ করিয়া আপনি বাহিরের লোকের জবাবদিহী হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন না—এবং যাঁহাদিগকে আপনি একাগ্রমনে প্রজ্ঞা করেন বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে লোকসমাজে অপ্রজ্ঞাভাজন করিবার ইহাই উপায় ।

রমেশ । আপনার উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম । আমার যাঁহা কর্তব্য, তাহা আমি শীঘ্রই স্থির করিব

এবং পালন করিব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হইবেন—এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অক্ষয়। আমাকে বাঁচাইলেন রমেশ-বাবু! এত দীর্ঘকাল পরে আপনি যে কর্তব্য স্থির করিবেন এবং পালন করিবেন বলিতেছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চিত হইলাম—আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার সখ আমার নাই। আপনার সঙ্গীতচর্চায় বাধা দিয়া অপরাধী হইয়াছি—মাপ করিবেন। আপনি পুনরীকৃত শুরু করুন, আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরে অত্যন্ত বেগুরো সঙ্গীতচর্চাও আর চলে না। রমেশ মাথার নীচে দুই হাত রাখিয়া বিছানার উপরে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। হঠাৎ ঘড়িতে টংটং করিয়া পাঁচটা বাজিল শুনিয়াই সে দ্রুত উঠিয়া পড়িল। কি কর্তব্য স্থির করিল, তাহা অন্তর্ধানীই জানেন—কিন্তু আগু প্রতিবেশীর ঘরে গিয়া যে পেয়ালা-হুংক চা খাওয়া কর্তব্য, সে সম্বন্ধে তাহার মনে দ্বিধামাত্র রহিল না।

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, “রমেশ-বাবু; আপনার কি অসুখ করিয়াছে?”

রমেশ কহিল—“বিশেষ কিছু না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“আর কিছুই নয়, হজমের গোল হইয়াছে—পিত্তাধিক্য। আমি যে পিল্ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার একটা খাইয়া দেখ দেখি—”

রমেশ কহিল—“না, পিল্ খাইবার মত কিছুই না—”

অন্নদা। না না, একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না, ইহাতে অনিষ্ট ত কিছু হইবে না, ভালই হইতে পারে।

অগত্যা রমেশকে পিল্ খাইতে হইল।

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, “বাবা, তোমার ঐ পিল্ খাওয়াও নাই, তোমার এমন আলাপী কেহ দেখি না—কিন্তু তাহাদের এমন কি উপকার হইয়াছে?”

অন্নদা। অনিষ্ট ত হয় নাই। আমি যে নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—এপর্যন্ত যতরকম পিল্ খাইয়াছি, এইটাই সব চেয়ে উপকারী।

হেমনলিনী। বাবা, যখন তুমি একটা নূতন পিল্ খাইতে আরম্ভ কর, তখন কিছুদিন তাহার অশেষ গুণ দেখিতে পাও—এমন কত রকমের পিল্ তুমি তোমার কত নিরোগী বন্ধুকে খাওয়াইয়াছ বল দেখি।

অন্নদা। তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না—আচ্ছা, অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, আমার চিকিৎসায় সে উপকার পাইয়াছে কি না।

সেই প্রামাণ্য-সাক্ষীকে তলবের ভয়ে হেমনলিনীকে নিরস্তর হইতে হইল। কিন্তু সাক্ষী আপনি আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই অন্নদাবাবুকে কহিল—“অন্নদাবাবু, আপনার সেই পিল্ আমাকে আর একটি দিতে হইবে। বড় উপকার হইয়াছে। আজ শরীর এমনি হালকা বোধ হইতেছে।”

অন্নদাবাবু সগর্বে তাহার কন্ঠার মুখের দিকে তাকাইলেন।

সীতা ।

রাম কৈকয়ীর নিকট স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, “বিদ্ধি মামৃষিভিস্তল্যাং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্ ।” তিনি বনবাসাজ্ঞা অবিকৃত-মুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে শাস্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্তু “ইন্দ্ৰিয়নিগ্রহ” করিয়া যে হৃৎখ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, কোশল্যার নিকট আসিবার সময় তাহা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি পরিশ্রান্ত হস্তীর ভায়ে গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন,—“নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ” । মাতার নিকট এই মর্ম্মচ্ছেদী সংবাদ বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ শব্দান্বিত ও কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার কথার সূচনা পরিতাপব্যাঞ্জক—“দেবি নুনং ন জানীষে মহত্ত্বমুপস্থিতম্ ।” মাতার অশ্রু ও শোকের উচ্ছ্বাস তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া সহ্য করিয়াছিলেন ; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তাঁহার কথাগুলিতে এক মহতী নৈতিকসম্পদ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না। চিরানুরক্তা জীকে সন্তো-গোবনের অতৃপ্তকামনার দারুণ হৃৎখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন, এ কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সীতা অভিষেকসম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রহিয়াছেন, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ভায়ে নিদারুণ সংবাদে কুসুমকোমলা রমণীর প্রাণকে কিরাপে চকিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন,

ভাবিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। সীতা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুকিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। “অস্ত শতশলাকামুক্ত জলফেনগুত্র রাজচ্ছত্র তোমার মাথার উপর শোভা পাইতেছে না। কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষন্ন, কি ভাবনায় তুমি ক্লিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ।” কোথায় রামচন্দ্রের সেই স্বভাবসৌম্য প্রশান্ত ভাব! রমণীর অকলংকার্শ্ববর্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংঘম ও তাঁহার সর্বজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসন্ন পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা পাইলেন ; তিনি বনে গেলে সীতা কি ভাবে রাজগৃহে জীবন-যাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে নানানৈতিক-উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বৃথা—সীতা সে সকল কথা উপহাস করিয়া বলিলেন, “তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথে পাদচারণ করিয়া আমি বনে যাইব ।” ষাঁহারারামের বনগমনের কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার

প্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা একটি আক্ষেপের কথা বলিলেন না, একবার দশরথকে স্নেহ বলিলেন না, কৈকয়ীর প্রতি কটাক্ষনিষ্ক্ষেপ করিলেন না, এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবকুল পরিবেন, ইহা শুনিয়াও শোকে বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন না। পরন্তু তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক সুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুপুণ্ডিত পদ্মিনীসঙ্কুল সরোবর, ফেন-নির্মলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তলীন শৈল-খণ্ড, এই সকল দেখিয়া স্বামীর পার্শ্বে সোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই সুখের আশায় বেনে আফুল হইয়া উঠিলেন। বয়ঃসন্ধির সময়ে একটি হাসির মূলা সাত্রাজ্য বিলাইয়া দিতে পারা যায়, স্বর্ণ ও হীরকখণ্ড অপেক্ষা একটু সঙ্গসুখ বেশী স্পৃহণীয় মনে হয়, তাহা আমাদের বৈষ্ণবকবিগণ গাহিয়া গাহিয়া আমাদের অভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে গিরিনিব্বর দেখিয়া ও বনের মুক্তবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই আনন্দের উৎসাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সুরম্য অঘোষ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়া হইতে স্বামীর পাদচ্ছায়াই সীতার নিকট বেশী প্রশংসনীয় বোধ হইতে লাগিল। এই আনন্দ শুধু অনভিজ্ঞতার ফল, পুরনারীগণ তীর্থগমনের জন্ত সময়ে সময়ে যেক্রপ উৎকর্ষ প্রকাশ করেন,—এই ইচ্ছা সেই প্রকারের; রামচন্দ্র ভাবিলেন, সীতার নিকট

বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়া বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইবেন। কিন্তু ইহা সামান্য পুরনারীর আকার নহে, ইহা আকারই নহে—স্থির প্রতিজ্ঞা। যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের সুর মনে করিয়াছিলেন—তাহা সাধবীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাঁহাকে সহস্রপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা তীর্থোন্মুখী রমণীর বৃথা ঔৎসুক্য নহে, স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধবী থাকিতে পারিবেন না—এই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের ভীষণতার একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন; ক্রুঞ্চ সর্প, বনতরুর কণ্টকপূর্ণ ব্যাকুল শাখাগ্র, ফলমূলজীবিকা এবং অনশন, পক্ষিল সরোবর, ব্যাঘ্র, সিংহ ও রাক্ষসগণের উৎপাত প্রভৃতি শত শত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন। সীতা ঘৃণার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বালিয়া উঠিলেন, “তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শয্যাসজ্জিনী মনে করিয়াছ, আমি কুলপাংশনী নহি।—“হ্যামংসেনসুতং বীরং সত্যব্রতমহুব্রতাম্। সাবিজীমিব মাং বিকি।” পরে বলিলেন, “আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তোমার সঙ্গে বনে পর্যটন করিব। যাহারা ইন্দ্রিয়সক্ত, তাহারা ইহা প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন কষ্ট পাইতে যাইব?” রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াসী হইলেন; সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বলিলেন—“নিজের জীকে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়া-

ছেন ?” ইহা হইতেও তিনি অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন :—“শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ।”—ক্রীজনমূলভ অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এখানে দৃষ্ট হয়—“তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার ক্রীমুখ দেখিলে, আমার সকল আলা দূর হইবে, পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের তুলাজিন অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে করিব ।” এইরূপ নানা বিনয় ও প্রেমসূচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; তাঁহার পদ্মদলের ছায় ছুটি চক্ষু জলভারে আচ্ছন্ন হইল ; তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া ব্রততীর ছায়া রামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া বিমনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । সাধবীর এই অশ্রুত-পূর্ণ দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে ।” এবং তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অহুমতি দিয়া বলিলেন, “তোমার ধনরত্ন যাহা কিছু আছে, তাহা বিতরণ করিয়া প্রস্তুত হও ।” রমণীর অলঙ্কারপেটিকা শত শত অদ্ভুত ও মৌন যক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হঠমনে হারকেয়ুর সখীগণকে বিলাইয়া দিতেছেন, তাহা দেখিবার যোগ্য । বশিষ্ঠপুত্র সুষজ্ঞের পত্নীকে তিনি হেমসূত্র, কাঞ্চী ও নানা মহার্ঘ দ্রব্য প্রদান করিলেন । সখীগণকে স্বীয় পর্য্যঙ্ক, হেমথচিত আস্তরণ এবং নানা অলঙ্কার প্রদান করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরাভরণা স্কন্দরী বনবাসের জন্ত প্রস্তুত হইলেন । যখন রাম পিতামাতা ও

সুহৃদগণের সমক্ষে জটাবকল পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্ত কৈকয়ী তাঁহার হস্তে চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও ।” সুমন্ত্র যেদিন রথ লইয়া গঙ্গাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেদিন তিনি সীতাকে বলিয়াছিলেন—“অযোধ্যায় কোন সংবাদ কি আপনার দিবার আছে ?” সীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই, ছুটি চক্ষু হইতে তাঁহার অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল । এই সকল অবস্থায় সীতার মূর্ত্তি লজ্জাবতী লতাটির ছায়া, কিন্তু এই বিনয়নম্রা মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে প্রেথরতেজ ও দৃঢ়-সঙ্কল্প বিद्यমান, তাহার পূর্বাভাস ইতিপূর্বেই আমরা পাইয়াছি ।

তার পর রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন । যিনি রাজান্তঃপুরীর অব-রোধে সযত্নে রক্ষিতা, যাহার গৃহশিখরে শুক ও ময়ূর নৃত্য করিত ও হেমপর্য্যঙ্কে সুকোমল-চন্দ্রাচ্ছাদনশোভী আস্তরণ বিরাজিত থাকিত, নিদ্রিত হইলে যাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণদীপ-রাশি নির্নিমেঘনেত্রে চাহিয়া দেখিত, আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী, পদত্রেজে কণ্টকা-কীর্ণ পথে চলিতেছেন, পদ্মপ্রস্থনের মত পাদ-যুগ্ম,—তাহাতে অলঙ্কররাগ মলিন হয় নাই, সেই পাদযুগ্ম লীলানুপুরশঙ্কে এখনও বন-প্রদেশ মুখরিত করিয়া চলিতেছে, চিত্রকূটের প্রান্তবর্ত্তিনী হইয়া সীতা স্বাপদসঙ্কল গহনে রুক্ষা রজনীতে ভীতা হইলেন, রামের বাহ-আশ্রিতা সীতার ভীত ও চকিত পাদক্ষেপ

ক্রমশঃ মন্দির হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ইন্দ্রদীপ্তে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন ভূশয্যাশায়িনীর স্বপ্নের বর্ণ আতপক্লিষ্ট ও অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষমতা দেখিয়া রামচন্দ্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু কষ্ট স্বামী হয় না,— প্রভাতে চিত্রকূটের শৃঙ্গে বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়া রামচন্দ্র সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন,—সীতা সেই আদরের ও সোহাগে পুনরায় ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মল্লিকানীসলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্মারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাঁহার নিকট সখীর আস্থানের শ্রাব্য মুহূ-মনোরম বোধ হইতে লাগিল,—তিনি স্বামীর পার্শ্বে শ্রবণের রম্যশোভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার সুখ অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধু বনদেবতার মত বহুফল পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন; কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শাস্ত্র বনভূমির চাক্ষু্য দেখিয়া সাংখ্যী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “তুমি অহেতুবৈর ত্যাগ কর; তুমি পারিত্রাজ্য অবলম্বন করিয়া বনে আসিয়াছ, এখানে রাক্ষসদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; তোমার নিকলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্ন্তে, আশঙ্কা এই আশঙ্কা।—“কদর্যকন্যা বুদ্ধিজায়তে শত্রু-সেবনাং। পুনর্গত্বা যুযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিত্যসি।”

কখন ঋষিকচ্ছা অনহয়ার নিকট বসিয়া সীতা কথাবার্তায়া নিযুক্তা থাকিতেন, কখন গঙ্গাদিনাদী গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে শ্রুত-

মন্তক মৃগয়াশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্রের মুখে ব্যজন করিতেন, কখন সুকেশী তাঁহার কর্ণান্তলম্বিত চূর্ণকুন্তল কর্ণকারপুষ্পদামে সাজাইয়া দিতেন, —অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বনলক্ষ্মীর বেশে এইভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সুতীক্লষ্ণবির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিলেন। তখন শীত-কাল আসিয়া পড়িয়াছে—ভুষারমিশ্র জ্যোৎস্না ও মুহূর্ত্ত্য, নিম্পত্র তরু ও যবগোধূমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে, বিরোধরাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের নিম্ন-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তীব্র বন্যাপিঙ্গলীর গন্ধে বহুবায়ু আকুলিত হইতেছিল; শালিধাত্তসকল খর্জুরপুষ্পাকৃতি পূর্ণতুল্ল লীর্ঘসমূহে আনন্দ ও কনকপ্রভ হইয়া শোভা পাইতেছিল। বনোন্মত্তা মৈথিলী নদীপুলিনের হিমাচ্ছন্ন প্রান্তরে, কাশকুম্ভমশোভিত বনান্তে মুক্তবেণী পৃষ্ঠে দোলাইয়া ফলপুষ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন বা তাপসকুমারীগণের নিকট স্পর্শা করিয়া বলিতেন, “আমার স্বামী পরশ্রীমাত্মকেই মাতৃবৎ গণ্য করেন।” ধর্মপ্রাণ স্বামীর গুণ-কীর্তন করিতে তাঁহার কণ্ঠ আবেগে-উচ্ছ-সিত হইয়া উঠিত। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে স্নানীশ্রুতা হইয়া পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন ঋষির আশ্রম ছিল না। এই স্থানে সূর্য্যগোধার নাসা-কর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে ধনুঃধ্বনি চতুর্দশ-সহস্র রাক্ষস নিহত হইল। দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণের মধ্যে অকৃতপূর্ব্ব মহাব্যতয়ের

সঙ্গার হইল। অকম্পন রাবণের নিকট বলিয়াছিল,—“ভয়প্রাপ্ত রাক্ষসগণ যে স্থানেই পলাইয়া যায়, সেই স্থানেই তাহারা সম্মুখে ধুমুস্পাণি রামের করাল মূর্তি দেখিতে পায়।” মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল—“বৃক্ষের পত্রে পত্রে আমি পাশহস্তযমসদৃশ রামমূর্তি দেখিতে পাই।” স্বীয় অধিকারস্থ জন-স্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্তে সীতাহরণোদ্দেশে দণ্ডকারণ্যভিমুখে প্রহান করিল।

সীতা লক্ষ্মণকে তীব্র গল্পনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।” মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠধ্বনির অবিকল অম্লকরণ করিয়াছিল; সেই আর্ন্ত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হইলেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, স্তবরাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষ্মণের মৌন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প কোন গৃঢ় ও কুংসিত অভিপ্রায়ের ছদ্মবেশ বলিয়া মনে করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে “কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ” এই আর্ন্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উদ্ভ্রান্তা মৈথিলী লক্ষ্মণকে “প্রচ্ছন্নচাত্রী ভরতের দূত, কুঅভিপ্রায়ে দ্রাতৃজ্ঞায়ার পশ্চাৎ অম্লবর্তী” প্রভৃতি কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন। “আমি রাম ভিন্ন অল্প কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিব।” এই সকল দুর্ভীক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ একবার উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন এবং রোষফুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রামের সন্ধানে

চলিয়া গেলেন। তখন কাবায়বস্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী ও উপানহী পরিব্রাজক “ব্রহ্ম”নাম কীর্তন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা কহিল, তাহা ঠিক ঋষিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রকৃতি সীতা অতর্কিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাবণের নিকট আশ্রয়প্রার্থনা দিলেন এবং অতিথিবোধে তাঁহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“একশত দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ।” রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল—“আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিকূটশীর্ষে লঙ্কা আমার রাজধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের ‘অগ্রমহিষী’রূপে বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাজা মন্দবীৰ্য্য জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই। ত্রিকূটশীর্ষস্থিতা বনমালিনী লঙ্কার সুপুষ্পিত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে বাস করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।” সীতাকে আমরা তাপসপত্নীগণের নিকট একটি সুকুমারী ব্রতভীরু ণয় দেখিয়াছি। তাঁহার সলজ্জ সুন্দর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ স্নান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লজ্জিত ও মুহুভঙ্গীর মধ্যে যে প্রখর তেজ লুকায়িত ছিল, তাহার পূর্বাভাস আমরা সীতার বন-বাসসঙ্কল্পে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইল। রাবণ

অমিততেজা মহাবীর—তাহার ভয়ে পঞ্চ-
বটীর তরুপত্র নিক্ষেপ হইয়া গিয়াছে, পার্শ্বে
গোদাবরীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে,
অন্তচূড়াবল্লী স্বর্ষ্যও যেন রাবণের ভয়ে
দিখলয়ের প্রান্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই
ভয়ানক অস্তুর যখন পরিব্রাজকবেশ ত্যাগ
করিয়া সহসা রক্তমালা পরিয়া তাহার ঐশ্বর্য
ও শক্তির গর্ব করিতে লাগিল,—তখন সীতা
লুক্ৰেশিয়ার ছায় কিংবা ছিন্নলতার ছায়
ভুলুপ্তিত হইয়া পড়িলেন না। যিনি লতিকার
ছায় কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়া
যিনি সাক্ষ্যনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে
চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যিনি
মৃদুভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া
রামের কর্ণে অমৃতনিবেশ করিতেন,
সেই তরঙ্গী পুষ্পালঙ্কারশোভিনী সীতা
সহসা বিদ্রোহিতার ছায় তেজস্বিনী হইয়া
উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী
তাহার ভীতিদায়ক হইয়া উঠিলেন। কে
তাঁহার ফুলকুসুমকোমল রূপে এই বিজয়শ্রী,
এই তেজ প্রদান করিল? কে তাঁহার ভাষায়
এই ক্রুদ্ধ অগ্নির ছায় জালাময় কথা বিচ্ছুরিত
করিয়া দিল?—“আমার স্বামী মহাগিরির
ছায় অটল, ইন্দ্রতুলা পরাক্রান্ত, আমার
স্বামী জগৎপুঞ্জ্যচরিত্রশালী, জগদ্বীতিদায়ক-
তেজোদৃশ, আমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ,
পৃথুর্কীর্তি; রাক্ষস, তুমি বস্ত্রদ্বারা অগ্নি
আহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, জিহ্বা দ্বারা
স্বর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাসপর্বত
হস্তদ্বারা উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ।
রামের জীকে স্পর্শ কর, এমন শক্তি তোমার
নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে

প্রভেদ, রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষা
অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শটীকে হরণ করিয়াও
তোমার রক্ষা পাইবার সুযোগ থাকিতে
পারে, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয়
তোমার মৃত্যু।” বক্র কেশকলাপ সীতার
তেজোদৃশ মুখের চতুর্দিকে তরঙ্গিত হইয়া
পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া,—ফুলকমল-
প্রভ রক্তিম বদনমণ্ডল উন্নত করিয়া সীতা
যখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভৎসনা করিলেন,
তখন আমরা সতীর মূর্তি দেখিলাম।
ভারতের শ্মশানের প্রদূষিত অগ্নিচ্ছায়ায়
স্বামীর পার্শ্বে বনফুলসুন্দর স্থিরপ্রতিজ্ঞ
বদনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের
চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভয়-
ভূত করিতে পারে নাই, ভারতের প্রত্যেক
গ্রাম—প্রত্যেক নদীপুলিনকে এক অশরীরী
পুণ্যপ্রবাহে চিরতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে, মরণে
যে গরিমা সীমন্ত উদ্ভাসিত করিয়া হিন্দু-
রমণীর সিন্দুরবিন্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য প্রদান
করিয়াছে—আজি জীবনে সীতার সেই চির-
নমস্ত সতীমূর্তি আমরা দেখিয়া কৃতার্থ
হইলাম।

রাবণ এই মূর্তির জন্ত প্রস্তুত ছিল না;—
সে যতগুলি রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া সর্ব-
নাশিনী লঙ্কাপুত্রীতে লইয়া আনিয়াছে,
তাহাদের প্রত্যেকেই কত কাতরোক্তি ও
বিনয় করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি
ভিক্ষা করিয়াছে,—দ্রীলোকের করুণ কণ্ঠ-
ধ্বনি শুনিতে রাবণ অভিযত। কিন্তু এই
অলৌকিক রূপলতার তাদৃশ মৃদুতা কিছু-
মাত্র নাই,—পলাশদলসুন্দর চক্ষে একটি
অশ্রু নাই। রাবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে

এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশকে ভয় করিবে, কিন্তু সীতা স্বীয় নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “বন্ধনই কর বা বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড় ;—রাক্ষস, এ দেহ বা এ জীবন রক্ষা করা আমার আর উচিত নয়।”

বিস্মিত হইয়া “লগাটে ক্রকুটিং কৃদ্ধা রাবণঃ প্রত্নবাচ হ।”—সে কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পকরথ আনিয়াছে,—জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাকে যত্নের তুল্য ভয় করে, “অকুলা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মাধুষঃ” প্রভৃতি অনেক কথা বলিল, কিন্তু বাধ্যতায় বৃথা সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উরুদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে রথের উপর লইয়া গেল। সহসা সেই পঞ্চবটীর বনশ্রী যেন মলিন হইয়া গেল, তরুগুলি যেন নীরবে কাঁদিতে লাগিল, পক্ষিগুলি অবসন্ন হইয়া উড়িতে পারিল না,—বনলক্ষ্মীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল অম্লগোদপ্রদেশের বনরাজি হতশ্রী হইয়া পড়িল। সীতার আর্ন্ত চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া সেই নির্জনে শুধু এক মহাজন লগুড় লইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেশকলাপ হংসপক্ষের স্তায় শুভ্র হইয়া গিয়াছে, দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর দ্রাস করিয়া বার্কিক্যে তিনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন,—তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়া রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। ধনু জটায়ু, আজ এই হিন্দুস্থানে এমন কে আছেন—যিনি অস্ত্রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন ?

সীতা আর্ন্তনাদ করিয়া বলিলেন—
“রাম, তুমি দেখিলে না, বনের যুগপক্ষীও আমাকে রক্ষা করিতে ছুটিতেছে।” যে কর্ণিকারপুষ্প সংগ্রহের জন্ত তিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।” হংসসারসময়ী আবর্ত-শোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বলিলেন, “ক্ষিপ্রং রামায় শংস স্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।” দিগঙ্গনাদিগকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, “ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।”
রথ ক্রমশ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন—তাঁহার চরণের নুপুর বিদ্যুতের মত, বক্ষোলম্বিত শূভ্র মুক্তাহার ক্ষীণ গঙ্গারোথার স্তায়, আকাশ হইতে পতিত হইল, রাবণের পার্শ্বে তাঁহার মুখখানি দিবসে উদ্ভিত চন্দ্রের স্তায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকোষেয় বস্ত্রের একাধিক রাবণের রথের পার্শ্বে উড়িতেছিল। সেই শোক-বিমূঢ়া সতীর ছরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন ক্রুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে প্রকাশ করিল—“যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, সেখানে ধর্মের জন্ম নাই,—সেখানে পুণ্য নাই।”

রাবণ সীতাকে লক্ষাপুরীতে লইয়া আসিল। লঙ্কায় জগতের বিলাসসম্ভার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুর্গের পরিতৃপ্তির জন্ত যাহা কিছু কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সন্মিলিত ; এই ঐশ্বর্য্য-ময়ী পুরী সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল—
“তুমি আমার প্রতি প্রীত হও, এই সমস্ত

ঐশ্বর্য তোমার পদপ্রান্তে,—তোমার অশ্রুক্রিয়
সুখপঙ্কজ আমাকে পীড়াদান করিতেছে।
তোমার সুন্দর মুখ কেন শোকাক্ত হইয়া
থাকিবে? তোমার সিদ্ধ পল্লবকোমল পাদ-
মুগ্ধের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ
এমনভাবে এপর্যন্ত কোন রমণীর প্রেম-
ভিক্ষা করে নাই। তুমি আমার প্রতি
প্রসন্ন হও।” সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত
করেন নাই। তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িয়া-
ছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষদীপ্ত
বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্তগণ্ডে ও
শূরিত অধরে তাহাকে বলিলেন—“যজ্ঞমধ্য-
স্থিত ব্রাহ্মণের মন্ত্রপুত স্রগ্ভাওমণ্ডিত বেদী
স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? রাক্ষস,
তুমি নিজের মৃত্যু আকাজক্ষা করিতেছ।”
রাবণের দিকে ঘৃণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া সীতা
মোনী হইয়া রহিলেন, অনবত্যাঙ্গীর সমস্ত
শরীর হইতে ঘৃণা ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছ-
রিত হইতে লাগিল। রাবণ অনন্তোপায় হইয়া
রাক্ষসীদিগকে বলিল—“ইহাকে অশোকবনে
লইয়া যাও, বলে হউক, ছলে হউক,
মিষ্টবাক্যে হউক, ভয়প্রদর্শনে হউক, ইহাকে
আমার বশীভূত করিয়া দাও।

সেই অশোকবনের পুষ্পস্তবকনয় শাখা
যেন ভূমিচুষন করিতে চাহিতেছে—অদূরে
বিশাল চৈত্রেপ্রাসাদ; তাহার সহস্র ক্ষটিক-
স্তম্ভের প্রত্যেকটির উপরে এক একটি
ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্তি। নানা-বিচিত্র-প্রতিমূর্তি-
শোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিদ্ধবার
ও কোবিদার রক্ত অজস্র পুষ্পসঙ্কেতে সেই বনটি
সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর সুন্দর মণি-
খচিত সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ কৃত্রিম সরোবর

তটান্তশোভী বস্ত্রভর পুষ্পপাতে ঐযং
কম্পিত। এই রমণীর উদ্ভানে সীতার আবাস-
স্থান স্থির হইল। এই আরণ্যদৃষ্টের পার্শ্বে
বিষমমলিনত্ৰী সীতাদেবীর যে মূর্তি বাস্তবিক
আঁকিয়াছেন, তাহা একান্ত মোনতার, উৎকট
রাক্ষসীগণের সাহচর্যে, অটল সতীত্বগর্বে
এবং করুণ সৌন্দর্য্যে আমাদের চিত্ত
একান্তরূপে আকৃষ্ট করে।

তাহার সহচারিণীগণ কোন হঃস্বপ্নদৃষ্ট
যমালয়ের চরের শ্রায়,—তাহারা বিভীষিকার
জীবন্ত মূর্তি—কেহ একাক্ষী, কেহ লম্বিতোষ্ঠী,
কেহ শঙ্কুর্কা, কেহ ক্ষীতনাসা, কেহ বা
“ললাটোচ্ছাসনাসিকা”—নাসার মুখ ললাটের
দিকে—তাহাদের পিঙ্গলচক্ষু অবিরত সীতাকে
ভীতিপ্রদান করিতেছে। বিনতানাসী রাক্ষসী
বলিতেছে—“সীতে, তোমার স্বামিস্নেহের
পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োজন নাই,
এখন ‘রাবণং ভজ ভর্তারম্,’ সম্মত না হইলে
‘সর্কাসাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্।’” লম্বিতস্তনী
বিকটা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে
ভর্জন করিতেছে, আর বলিতেছে—“ইন্দ্ৰের
সাধ্য নাই, এ পুরী হইতে তোমাকে রক্ষা
করে,—স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী—যতদিন
যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, ততদিন
সুখভোগ করিয়া লও,—রারণের সঙ্গে সুরম্য
উদ্যান, উপবন ও পর্বতে বিচরণ কর।
অস্বীকৃত হইলে ‘উৎপাটা বা তে হৃদয়ং
ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি।’” জুরদর্শনা চণ্ডোদরী
এ সময়ে বিপুল শূল সীতার সম্মুখে ঘুরাইয়া
বলিল—“এই আসোৎকম্পগম্যোধরা হরিণ-
শাবাক্ষীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ
হইতেছে—ইহার যক্ং, গ্ৰীহা ও ক্রোড়দেশ

আমি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করি ।” প্রথমা রাক্ষসীও এই কথার অহুমোদন করিল এবং অজায়ুধী বলিল, “মন্ত নইয়া আইস, আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়া খাই ।” তৎপরে শূর্ণপথা তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বলিল—“ঠিক কথা,—‘স্বরা চানীয়তাং ক্ষিপ্তম্ ।’”

এই বিভীষিকাপূর্ণ রাজ্যে উপবাসক্লশা মৈথিলী এই সকল তর্জ্জন শুনিয়া “ধৈর্য্যমুৎসজ্জা রোদিতি ।”—নেত্রহুতি জলভারে আকুল হইল, স্নন্দরী ধৈর্য্যহীনা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ।

সীতার স্নন্দর মুখ অশ্রু-কলঙ্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়, তিনি ভূষণহীনা, যিনি চিরসুখাভ্যস্তা, তিনি চির-দুঃখিনী—“সুখার্হা দুঃখসম্ভ্রা, মণ্ডনার্হা অম-
ভিতা ।” একখানি ক্লিন্ন কোষেয়বাস তাঁহার উপবাসক্লশ ত্রীভঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে । পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নার স্তায় তিনি সমস্ত জগতের অভীষিতা । শোকজ্বলে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—ধূমজাল-সংস্কৃত অমিশিখার স্তায় তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না, সন্দিগ্ধ স্থতির স্তায় সে রূপ অস্পষ্ট । অশোকবৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজ্ঞদেহে ধ্যানমগ্নী কি চিন্তা করিতেছেন ? লঙ্কার এই বিষম তেজোবিক্রম, এই অসামান্য ঐশ্বর্য্য,—শত-যোজন দূরে জুটাবলধারী ব্রাহ্মমাজ-সহায় রামচন্দ্র এই দুর্গম স্থানে আসিবেন কিরূপে ? রাক্ষসীরা একবাক্যে বলিতেছে, তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব । রাবণ তাঁহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়াছিল, তাহার দশমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আর দুই-

মাস পরে পাচকগণ রাবণের প্রাতঃরাশের (breakfast) জন্ত তাঁহার দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিবে । সীতা এই নিঃসহায় রাক্ষস-পুরীতে স্বর্ণগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল রাক্ষসীরা তাঁহাকে নানাবিধ অশ্রাব্য বিজ্ঞপ ও তাড়না করিতেছে । এদিকে রাবণ প্রায়ই সেখানে আসিয়া কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় বলিতেছে—“তোমার স্নন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, সেখানেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে,—তোমার মত সর্ব্বাঙ্গস্নন্দরী আমি দেখি নাই ; তোমার চারু দন্ত এবং মনোহারী নয়নদ্বয় আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে । তোমার ক্লিন্ন কোষেয়বাসখানি আমার চক্ষুর পীড়া-দায়ক, লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার পদতলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হও ।” কিন্তু এই অনশনক্লশা, শোকাশ্রুপূরিতনেত্রী, ক্লিন্ন-কোষেয়বসনা তাপসী ক্রোধরক্তিমমুখে বলিলেন, “আমার প্রতি যে ছষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহা এখনও কেন উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল না ! দশরথ রাজার পুত্রবধূ পুণ্যলোক রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যে জিহ্বায় এই সকল পাপ কথা বলিলে,—তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন ? তোমার কালরূপী রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রেমের-ঐশ্বর্য্যালিনী লঙ্কা অচিরে চির-অন্ধকারে লীন হইবে ।” এই বলিয়া ক্ষুরিতাধরা সীতা সম্বর্ণ উপেক্ষার সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠলব্ধিত একবেণী রাক্ষসকুলসংহারক মহাসর্পের স্তায় অকুণ্ঠিত হইয়া রহিল ।

রাবণ ক্রোধাক্ত হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্বৃত্ত হইল, তখন স্থলিতহেমস্রুতা, মদবিহ্বলিতাক্ষী, ধাতুমালিনীনাক্ষী রাবণের স্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া গেল ।

ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষসীগণের ষেক্ষণ তীব্র শাসন চলিল, তাহা অল্পভব করা যাইতে পারে । কিন্তু সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন সহিতে হইবে বলিয়া কে এই ক্রিম-দেহা কোমল ব্রততীকে এই অসাধারণ ব্রত-তেজে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল ? কে এই ফুলসম রমণীকে শূলসম কাঠিন্ত প্রদান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল ? কে এই অনশন, এই ছিন্নবাস, এই ভূশ্যাক্রিষ্ট নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপূর্ণ অলৌকিক বিদ্যাতের শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল ? কোন স্বর্গীয় আশা অসম্ভব রামাগমন ও রাক্ষস-ধ্বংসের পূর্বাভাস তাঁহার কর্ণে গুঞ্জিত করিয়া অশান্তির মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তিকণা প্রদান করিয়াছিল ? কে এই বিলাস-ঐশ্বর্যকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া সীতাকে পবিত্র যজ্ঞায়ির ত্রায় সমুদ্বীপ্ত করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে ? এই সকল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমাদের ভ্রমের আশঙ্কা নাই । এই দৈত্যের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য, এই কোমলতার মধ্যে এই অসম্ভব দৃঢ়তা যদ্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বাস । বিশ্বাস-ব্রতের ফল অবশুস্তাবী, সীতা সেই বলে যেন দূর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুণ্যের জয় প্রত্যক্ষ করিয়া এত তেজস্বিনী হইয়াছিলেন ।

কিন্তু অসামান্যবিপৎসঙ্কুল অবস্থার নিপীড়ন সহ করিয়া ধৈর্য্যরক্ষা করা সকল-সময় সম্ভবগণ হইবে না । কখন কখন সীতা ভূতলে পড়িয়া অজস্র কাদিতে থাকিতেন ; তিনি দুঃখের সীমা দেখিতে না পাইয়া কত-কি ভাবিতেন । কখন মনে হইত, রাবণ-কথিত দুইমাস চলিয়া গিয়াছে, স্থপকারগণ তাঁহার দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া রাবণের ভোজনের উপযোগী করিতেছে । কখন মনে হইত, চতুর্দশ বৎসর ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাম হয় ত অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন ; বিশালনেত্রা রমণীগণের সঙ্গে তিনি আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন । এই কথা ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিত । তিনি বিগতযুগী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াও যেন প্রকাশ পাইত না—“পদ্মিনী পঙ্কদ্বন্দ্বের বিভাতি ন বিভাতি চ ।” কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাঁহার জন্ত শোকাবুল হন নাই—তাঁহার হৃদয় যোগীর ত্রায়—সংসারের সুখদুঃখের উর্দ্ধে, তিনি পুত্রা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও জন্ত কখন ব্যাকুল হন নাই—এই ভাবিতে তাঁহার হৃদয় দ্রুত-দ্রুত করিয়া উঠিত, তিনি আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন । কখন বা রাক্ষসী-গণের তাড়না অসহ্য হইলে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিতেন—“রাক্ষসীগণ, তোমরা অধিক কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন বা রিদ্দিণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছু-তেই রাবণের বশীভূতা হইব না ।” এই ভাবে তিনি একদিন দুঃখের প্রান্তসীমায়

উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতে-ছিলেন,—তঁাহার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তঁাহাকে শিশুপা-বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে চিরমধুর রামনাম শুনাইল, সেই নাম শুনিয়া অকস্মাৎ তঁাহার চিত্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রু-কণা দেখা দিল। তিনি সজলচক্ষে বক্র কেশ-রাশির ভার এক হস্তে অপসৃত করিয়া উর্দ্ধ-মুখে চিরেন্দ্রিত-দয়িতনাম-কীর্তনকারীকে দেখিতে লাগিলেন। অনাবৃত্তিসমস্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর জন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করে, মধুর রামকথা শুনিবার জন্ত তিনি সেইরূপ ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিলেন।

হুম্মান্ কৃতাজলি হইয়া বলিলেন, “হে ক্লিন্নকোষেয়বাসিনি, আপনি কে, অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন? আপনার পদ্মপলাশচক্ষু জলভারে আকুলিত হইয়াছে কেন? আপনি কি বৃশ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী,—স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া এখানে আসিয়া-ছেন, কিংবা চন্দ্রহীনা হইয়া চন্দ্রের রমণী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন? আপনি যক্ষ, রক্ষ, বসু, ইহাদের কাহার রমণী? আপনি ভূমিস্পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার অশ্রু-জল দেখা যাইতেছে, এজন্ত আমার আপনাকে দেবতা বলিয়াও বোধ হই-তেছে না। যদি আপনি রামের পত্নী সীতা হন, দুরাত্মা রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়া আপনার এ হৃদশা করিয়া থাকে, তবে সে কথা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।” সীতা সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হুম্মান্কে সমীপবর্তী হইতে আজ্ঞা করিলে দূত

নিম্নে অবতরণ করিলেন। তখন হুম্মান্কে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন,—সহসা মনে হইল, এ ত ছদ্মবেশধারী রাবণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাদপ্রাপ্তির আশায় কণপূর্বে উৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সহসা ভয়বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাহুলতা স্থলিত হইয়া পড়িল, তিনি মুক্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন—“যথা যথা সমীপং স হনুমানুপসর্পতি। তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে ॥”

কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হুম্মানের পক্ষে সহজ হইল। রামের সংবাদ পাইয়া সীতার মুখ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল, কুশাদ্বীপ চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হুম্মানের নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন—রাম তঁাহার জন্ত শোকাতুর হইয়া-ছেন কি না? হুম্মান্ তঁাহাকে জানাইলেন, “যিনি গিরির শ্রায় অটল, তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তঁাহার গাভীর্ঘ্য চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিব্যরাত্রি তঁাহার শাস্তি নাই,—কুসুমতরু দেখিলে উন্মত্তভাবে তিনি আপনার জন্ত কুসুম তুলিতে যান,—পদ্ম-প্রহ্ননগন্ধি মন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা আপনার মুহু নিশ্বাস, জীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে তিনি উন্মত্ত হইয়া আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে আপ-নার কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত হইলেও ‘সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে।’ তিনি প্রায়ই উপবাসে দিন-যাপন করেন—‘ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।’” এই কথা শুনিতে শুনিতে

সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, শাশু-
চক্ষু বলিয়া উঠিলেন, “অমৃতং বিষসংপৃক্তং
হুয়া বানর ভাবিতম্।”

তৎপরে হুমায়ূন রামের করভূষণ অঙ্গুরীয়
অভিজ্ঞানস্বরূপে সীতাকে প্রদান করিলেন—
“গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তৃঃ করবিভূষিতম্।
ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তা সা। সীতা মুদিভাবৎ।”
তখন সেই চাক্রমুখীর বহুদিনের দুঃখ ঘুচিয়া
যে আনন্দরেখায় গণ্ডরয় উল্লসিত হইয়া
উঠিয়াছিল, তাহা আমরা চিত্রিত করিতে
পারিব না, সেই অঙ্গুরীয় স্পর্শবশত বহুদিনের
স্বাভাবিক, বহু স্বখদুঃখ, সেই গঙ্গাদনাদি গোদা-
বরীগুলিনের রামসঙ্গ, কত আদর ও মেহের
কথা মনে পড়িল, তাঁহার কৃষ্ণপদ্মাস্ত চক্ষুর
কোণ হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে
লাগিল। হুমায়ূন সীতাকে গৃষ্ঠে করিয়া
রামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে সীতা
স্বীকৃতা হইলেন না। “রাক্ষসেরা পশ্চাৎ
অভ্যসরণ করিলে আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া
যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্বক আমি পরপুরুষ স্পর্শ
করিব না।”

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,—রাক্ষস-
গণ নিহত হইয়াছে, সীতাকে বিভীষণ
রামের নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন। নানা
রত্ন ও বিচিত্র বস্ত্র দেখিয়া পাণ্ডুগুপ্তিত-
সর্মাঙ্গী সীতা বলিলেন—“অম্বাতা দ্রষ্টুমিচ্ছামি

ভর্তারং রাক্ষসেশ্বর।” হুমায়ূন সীতার সঙ্গিনী
রাক্ষসীদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমাশীলা
সীতা বায়ণ করিয়া বলিলেন, “প্রভুর নিয়োগে
ইহারা বাহা করিয়াছে, তজ্জন্ত ইহারা দণ্ডার্থী
নহে।”

তাহার পর বিশাল সৈন্যসংঘের সম্মুখে রাম
সীতাকে অতি কঠোর কথা বলিলেন, লজ্জায়
লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, কিন্তু তেজ-
স্বিনীর মহিমা ক্ষুরিত হইয়া উঠিল;—রামের
কঠোর উক্তি প্রাকৃতজ্ঞানোচিত, ইহা বলিতে
সাম্বীর কণ্ঠ দ্বিধাকম্পিত হইল না—তিনি
পতির পদে অশেষ প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর
জন্ত প্রস্তুত হইলেন এবং উদ্ধৃত অশ্রু মার্জনা
করিয়া অধোমুখে হিত স্বামীকে প্রদক্ষিণ-
পূর্বক অলস্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন।

তৎপরে কথিতস্বর্ণপ্রতিমার স্তায় এই
দেবীকে উঠাইয়া অগ্নি রামের হস্তে অর্পণ
করিয়া বলিলেন,—“যিনি আজন্মশুভা,
তাঁহাকে আর আমি কি শুদ্ধ করিব!”

এই সতীচিত্র বাস্তবিক চিরজীবন্ত
করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার বিশাল আলেখ্য
হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে এখনও সূশো-
ভিত রহিয়াছে, অলক্ষিতভাবে সীতার পত্নীত্ব
হিন্দুস্থানের পত্নীকুলের মধ্যে অপূর্ব সতীত্ব-
বুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের দেশকে প্রবিত্ত
করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সাগরমহন ।

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাম্ মহনে
অনন্ত বরষ ধরি' ! দেবদৈত্যদলে
কি রত্নসন্ধান লাগি' তোমার অন্তলে
অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে পুণ্যে স্থখে হুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
ফেনিল কল্লোলভঞ্জে ? ওগো দাও দাও
কি আছে তোমার গর্ভে — এ ক্ষোভ থামাও !
তোমার অন্তরলক্ষ্মী যে শুভপ্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি' হাতে
বিস্মিত ভুবনমাঝে,—লয়ে বরমালা
ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা
সেদিন হইবে কান্ত এ মহামহন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্ধ এ ক্রন্দন ।

শ্মশানতলা ।

কাটোয়া-অঞ্চলে শ্মশানতলা-নামক স্থান
আছে । যোগেশ্বরমন্দির তথায় প্রসিদ্ধ এবং
তাহার সমুন্নত ত্রিশূলাক্রিত চূড়া জাহ্নবীবক্ষ
হইতে আজিও নৌকাযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ
করে । দেবস্থানের চারিদিকে চক্রাকারে
প্রাচীন বটবৃক্ষের সারি, দেখিলে মনে হয়
মূলের বিপুল তরু অনেকদিন অন্তর্হিত
হইয়াছে এবং বর্তমান পাদপশ্রেণী তাহারই
জটাজালোৎপন্ন সন্ততিধারা ।

এই শ্মশানতলার সঙ্গে ভূতপ্রেতের

অনেক কাহিনী জড়িত আছে । অতএব
সচরাচর এখানে লোকসমাগম বড় বিরল ।
বৎসরের মধ্যে দুইবার এখানে মেলা বসিয়া
থাকে, ফাস্তনে শিবচতুর্দশীতে, আর চৈত্র-
সংক্রান্তি উপলক্ষে । শিবরাত্রির ধুমধাম দুই
দিনের বেগী থাকে না, কিন্তু গাজন উপলক্ষে
দশদিন সমান ভিড় । তাহাতে বীরভূম-
প্রদেশের সাঁওতালেরা পর্য্যন্ত যোগ দিয়া
থাকে ।

চল্লিশবৎসর পূর্বে অরবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন। গাঙুলি-মহাশয় বলিলে চারিদিকে দশক্রোশের ভিতর তাঁহাকেই বুঝাইত, কেন না, লোকে বিশ্বাস করিত যে, তিনি সিদ্ধতান্ত্রিক। বাস্তবিক তাঁহার সুদীর্ঘ সুগৌর তনুতে, সুপ্রশস্ত ললাটতলে প্রৌঢ়বয়সেও যে যুবজনোচিত আনন্দজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইত, সচরাচর বিশ্বাসসক্ত লোকে তাহা নিতান্ত ছন্দিত। তাহার উপর অনন্তসাধারণ কতকগুলি শক্তি তাঁহাতে বিকশিত হইয়াছিল। ফলিত জ্যোতিষে এবং করকোষ্ঠিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার টোটকা ঔষধ কখন ব্যর্থ হইত না। সকলের উপর সর্পচিকিৎসায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি দেখা যাইত না। সর্পদষ্ট বিস্তর লোককে মস্ত্রোষধিবলে বাচান ছাড়া সর্পভয়নিবারণের নানা উপায় গাঙুলি-মহাশয়ের জানাশুনা ছিল। তন্মধ্যে সসর্প গৃহ স্বচক্ষে না দেখিয়াও কেবলমাত্র লোক-মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া খড়্গিগণনাপূর্বক বিষধরের অবস্থানস্থান নির্দেশ করার ক্ষমতা সর্বপ্রধান এবং প্রধানত এই গুণে তিনি সকল শ্রেণীর পূজনীয় ছিলেন।

দয়াদাক্ষিণ্যের জন্তও গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় লোকপ্রিয় ছিলেন। ধনীর দ্বারে স্বেচ্ছায় বড় যাইতেন না এবং তাঁহার নিয়োগ-কর্তা মন্দিরের সেবাইত জমিদারের গৃহেও গতিবিধি তেমন ছিল না। কিন্তু ঋশান-তলার চতুঃসীমায় চারিপাঁচক্রোশের মধ্যে এমন দীনহীনে কেহ ছিল না, যাহার ধবর তিনি না রাখিতেন। ইহাতে তাঁর কোন ভেদজ্ঞান ছিল না। পাপপুণ্যের গৃহে সমভাবে তিনি কৰুণা বিতরণ করিয়া আসিতেন।

পল্লীর ভদ্রসমাজে ইহাতে কথা না উঠিত, এমত নহে, কিন্তু তিনি বলিতেন যে, দেবতার বৃষ্টি উর্বর অম্বর্ষর ভূমি বিচার করে না। পাপী তাপী সকলকে সমভাবে প্রেমবিতরণের মত ধর্ম আর নাই। সিদ্ধতান্ত্রিক নামে পরিচিত লোকের মুখে প্রকারান্তরে বৈষ্ণবের সাধুবাদ শুনিয়া সকলেই অবাক হইত। তাহাতে গাঙুলিমহাশয় কেবল হাসিতেন।

নিবিড়বটচ্ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া বৈশাখজ্যেষ্ঠের দিনে তাঁহার প্রাণ প্রধর-রোদ্রক্লিষ্ট জীবমাজের জন্ত পুড়িত। এবং প্রকৃতপক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির পর হইতেই পরের জন্ত তাঁর ছুটাছুটি শুরু হইত। নিজের অভাব নিতান্ত সামান্য, কাজেই মন্দিরের আয়ের যে অংশ তিনি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু সঞ্চয় হইত। এই অর্থ গাঙুলিমহাশয় নববর্ষের প্রথমদিন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যেষ্ঠের শেষ পর্যন্ত জলছত্রের ব্যবস্থায় ব্যয় করিতেন। লোকে দেখিত, ঋশানতলার অদূরে কাটোয়ার রাজপথে গাঙুলিমহাশয় গঙ্গাজলপূর্ণ অনেকগুলি কলস, গুড় ও ভিজা ছোলার রাশি লইয়া বসিয়া আছেন এবং সহায়মুখে প্রায় সমস্ত-দিন তৃষ্ণার্ত পথিকদের ধরিয়া ধরিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় গঙ্গাদির জন্ত বড় বড় ডাবায় পথক্ ভাবে জল রক্ষিত হইত, পক্ষীদের জন্ত প্রত্যেক বৃক্ষমূলে নিজে তিনি তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া দিতেন। তাহা ছাড়া প্রত্যুষে স্নানান্তে যাতায়াতের পথে স্বহস্তে ছোটবড় সকল গাছের গোড়ায় অন্নবিস্তর জলসেচন, এই সময়ে তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত। যখন-তখন

বলিতেন, “যোগেশ্বর আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, বৎসরের মধ্যে অন্তত দুইটি মাস আছে, যখন জড় জীব সকলের হৃৎ একই রকমের। শীতল বটের ছায়ার বসিয়া বসিয়া প্রাণ আমার সর্বভূতের জন্ত হ্রহ করে, তাই যথাসাধ্য এ তৃষ্ণানিবারণের ব্রত লইয়াছি।” প্রাত্যহিক জলদানব্রত নিষ্ঠার সহিত সমাধান করিয়া স্বর্ঘ্যাস্তের পর গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় এই সময়ে পুনরায় গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন এবং তার পর স্বপাক হবিষ্যায় গ্রহণ করিতেন।

নিজের জন্ত তাঁহাকে কেহ কখন অন্নগ্রহ-ভিক্ষা করিতে দেখে নাই, কিন্তু কোন গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে শুনিলে ঘারে ঘারে ভিক্ষা করিয়াও তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। কাটোয়া-অঞ্চলে ছোটবড় অনেকগুলি দীর্ঘিকা গাঙুলিমহাশয়ের ভিক্ষা এবং যত্নের ফল, তাঁহার স্বর্গারোহণের পর গাঙুলিদীঘি নামে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার জীবিতমানে কেহ তদীয় নামের সহিত তাহাদিগকে সংযুক্ত করিলে তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। বিনীতভাবে বলিতেন, “বাপুসকল, মাহুষের নাম করদিন টিকিবে? তোমরা যোগেশ্বরের নাম কর।”

ঐতিবয়স্ক গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয়কে কখন-কখন পল্লীগ্রামের পাঠশালায় এবং স্ববক-দের খেলার আড্ডায় দেখা যাইত। তাহাদিগকে শ্রামাবিষয়ক এবং সঙ্কীর্ণত্বের গানে উৎসাহিত করা তাঁর একটি প্রিয় কার্য ছিল। তিনি বলিতেন, “পরচর্চায় যে আমোদ পায়, কাজে না হইলেও মনে সে পাপী,—একটুতে পক্ষে ডুবিতে পারে।” বিশেষত জীপুরুষের

নীতিচরিত্রযুক্তি অপবাদ রটাইয়া যাহারা আমোদ পায়, তাঁহার কাছে সহজে তাহাদের নিন্দার ছিল না। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর জীবেরা সংসারের যত অনিষ্টকারী, আর কেহ তত নহে। বলিতেন, “নিন্না, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। সন্দেহমাত্র সঞ্চল করিয়া যাহারা অন্তের চরিত্রে দোষারোপ করে, এই তিনকেই লঘু করিয়া তাহারা নিন্দিতের ভিতর সম্মের ভাব কমাইয়া আনে। তখন পাপে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপবাদপ্রচার আগে, কার্য্যত পাপ পরে।” সচরাচর খেলা ও গানের আড্ডায়—বিশেষত এই বাঙলাদেশে—এই শ্রেণীর কলনা-জলনা যত মুখরোচক, আর কিছুই তেমন নয়। কাজেই গাঙুলিমহাশয়ের এই প্রকারের উপদেশ অধিকাংশ স্থলে হাত্তরস উদ্বিক্ত করিত মাত্র এবং ইহা লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে তদীয় যৌবনকালের অজ্ঞাত ইতিহাসের যেরূপ সমালোচনা হইত, একালের গবেষণাপূর্ণ অনেক পুরাতত্ত্ব তাহাতে লজ্জা পাইতে পারে।

১২৭০ সালের শারদীয়া মহাষষ্ঠীর রাত্রি বাঙলাদেশে চিরস্মরণীয়। অভূতপূর্ব প্রবল ঝটিকার সে ভয়ানক রাত্রি গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয়ের পক্ষে অনেকের মত কাল হইয়া আসিয়াছিল। দিবাবসানে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মা হুর্গা সেবার প্রলয় ঘটাইতে আসিতেছিলেন। যোগেশ্বরমন্দির যথাসাধ্য সুরক্ষিত করিয়া ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং অস্পষ্টাঙ্গকে নৌকা বা মহুম্যদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিলেই নিজের প্রাণের

মারা ত্যাগ করিয়া উত্তাল ভাগীরথীতরঙ্গে
ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন। তাহাতে স্ত্রীপুরুষের
অনেকগুলি দেহ তীরে উঠিল বটে, কিন্তু
হৃর্ভাগ্যবশত কোনটিতেই প্রাণ ছিল না।
মধ্যাহ্নরাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়বুড়িতে এইরূপ
পরিশ্রান্ত হওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁহার মনে
হইল, যোগেশ্বরমন্দিরচূড়া ভূমিসাৎ হইয়াছে।
গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় দ্রুতগতি ফিরিয়া চলি-
লেন। দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার অমু-
মান কতকটা সত্য। মন্দিরশীর্ষ ভাঙিয়া

পড়ে নাই বটে, কিন্তু ভগ্ন বটের ডালে প্রাক্ষণ
ছাইয়া গিয়াছে। তখন দেবমূর্তির অনিষ্ট-
আশঙ্কায় তিনি মন্দিরদ্বারাভিমুখে ছুটিয়া
চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, গঙ্গোপা-
ধ্যায়মহাশয়ের জীবনশূন্য দেহ মন্দিরদ্বার
রোধ করিয়া পড়িয়া আছে—এবং এক
প্রকাণ্ড ভগ্ন বটশাখা অপ্রতিহত বেগে
আসিয়া দেউলের কিয়দংশসহিত তাঁহার
উত্তমাত্র চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

আজিকার ভারতবর্ষ।

১

কোন অপ্রকাশিতনামা দাতার অর্থে, পৃথিবী-
প্রদক্ষিণ-উদ্দেশে, প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি
বৃত্তিভাণ্ড স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের
পুস্তকাগারে, কোন-বিদেশ-সম্বন্ধে তথ্য-
সন্ধান আরম্ভ করিয়া, যদি কোন অধ্যাপক
সেই দেশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বীয় আরম্ভ
গবেষণার চূড়ান্ত করিতে চাহেন, তাহা হই-
লেই তিনি এই বৃত্তির অধিকারী হইবেন। এই
বৃত্তিভাণ্ডের সাহায্যে, অধ্যাপক “অ্যানুয়ের
মেত্যা” ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া, ভারতবর্ষীয়
সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে, “আজিকার ভারত-
বর্ষ” এই নামে একটি অতীব উপাদেয় গ্রন্থ
সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের
যে অংশগুলি আমাদের কৌতুহলজনক অথবা

শিক্ষাপ্রদ, তাহার সারমর্ম এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত
করা যাইবে। আর-একটি কথা এখানে
বলা আবশ্যক। সর্বপ্রকার পূর্বসংস্কার
মন হইতে বিদূরিত করিয়া, প্রত্যক্ষ দেখিয়া-
শুনিয়া গ্রন্থকারের যেরূপ ধারণা হইবে, ঠিক
তাহাই তিনি নিরপেক্ষভাবে লিখিবেন, বৃত্তি-
সংস্থাপক মহোদয়ের এইরূপ সুস্পষ্ট অভিপ্রায়
ছিল। অধ্যাপক মেত্যাঁর লিখিবার ধরণ-
ধারণ দেখিয়া মনে হয়, তিনি সেই-অভিপ্রায়-
অনুযায়ী লিখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।
তবে, কোন বিদেশীয় পর্য্যটক, কোন দেশে
স্বল্পকাল অবস্থিতি করিয়া, সেই-দেশ-সম্বন্ধে
সব কথা ঠিক-মতো বলিতে পারিবেন, এরূপ
আশা করা যায় না।

গ্রন্থকার,--হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী

প্রভৃতির সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ২০,৭৭,৩১,৭২৭ ;
শিখদিগের সংখ্যা ১৯,০৭,৪৩৩ ; মুসলমানের
সংখ্যা ৫,৭৩,২১,১৬৪ ; আদিমবাসীদিগের
সংখ্যা ৯২,৪০,৪৬৭ ; খৃষ্টানদের সংখ্যা
২২,৮৪,৩৪০ ; পার্সিদের সংখ্যা ৮৯,৯০৪ ;
এবং ইহুদির সংখ্যা ১৭,০০০ ।

হিন্দু ও মুসলমান, এই দুইটিই ভারত-
বর্ষের সর্কাপেক্ষা বৃহৎ জাতিবিভাগ ; এই
দুই জাতিই সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত ;
এবং এই উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিদ্বেষবহ্নি
প্রজ্বলিত রহিয়াছে। হিন্দু কিংবা মুসল-
মানেরা—এমন কি, তাহাদের মধ্যে যাহারা
শুশিক্ষিত, তাহারাও যুরোপীয়দিগের সহিত
যে কখন মিশিয়া যাইবে, তাহার কোন
সম্ভাবনা নাই। সে-পক্ষে তাহাদের ধর্মই
বিষম প্রতিবন্ধক। কেবল পার্সীদের মধ্যে
যাহারা শিক্ষিত, তাহারা ইংরাজ হইয়া
যাইতেছে। তবে কি না, পার্সীদের সংখ্যা
নিতান্তই অল্প ; কিন্তু সংখ্যার অল্প হইলেও,
উহার উচ্চশীল, উদ্যোগী ও ধনাঢ্য।

বোম্বাইনগরে তুলার যে-সকল কলকার-
খানা আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বত্বাধি-
কারী পার্সী। আবার, উহাদের মধ্যে অনেক-
কেই উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক ; বোম্বায়েয়
সাহিত্যসভায়, রাষ্ট্রীয় সভায়, পৌরকার্য-
নির্বাহক সভায় উহাদের দেখিতে পাওয়া
যায় ; এমন কি, ভারতবর্ষের যে প্রতিনিধীরা
দল ইংরাজের নিকট সমান অধিকারলাভের
জন্ত ও উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার জন্ত দাবী
করে, কখন-কখন উহাদিগকে ঐ দলেরও

অগ্রণীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এ-
দেশীয় যে ছইজন পার্লামেন্টের সভ্য, তাহারা
উভয়েই পার্সী ;—একজন রক্ষণশীল ও আর-
একজন উদার দলের অন্তর্ভুক্ত। কি রাষ্ট্র-
নীতি, কি বিজ্ঞাবুদ্ধি, কি বাণিজ্যব্যবসায়—
সকল বিষয়েই পার্সীরা হিন্দুদিগকে ছাড়াইয়া
উঠিয়াছে। হিন্দুরাও বুদ্ধিমান, কার্যক্ষম
ও সুশিক্ষিত বটে, কিন্তু বর্ণভেদের শৃঙ্খলে
আবদ্ধ থাকায়, তাহারা যুরোপীয়দিগের সহিত
মিশিতে পারে না। ইহার বিপরীতে,
পার্সীরা পাশ্চাত্য আচারব্যবহার গ্রহণে
উন্মুখ। উহাদের ধুচনি-টুপি ক্রমশ উঠিয়া
যাইতেছে, তাহার স্থলে একপ্রকার গোল-
কার শিরোবেষ্টন প্রচলিত হইতেছে। ওনা
যায়, একজন ধনাঢ্য পার্সী সিপাহি-বিদ্রোহের
সময়, যুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধানের দৃষ্টান্ত
সর্বপ্রথমে প্রদর্শন করেন। কেন তিনি
বেশ পরিবর্তন করিলেন, জিজ্ঞাসা করায়,
তিনি নাকি বলিয়াছিলেন :—“হিন্দুদের
জানা আবশ্যক, আমরা চিরকাল ইংরাজের
পক্ষেই থাকিব, কখনই তাহাদের প্রতিকূলে
যাইব না।” অনেকদিন হইতেই সঙ্গতি-
সম্পন্ন পার্সীরা ইংরাজের পরিচ্ছদ পরিধান
করিতেছে ; ইংরাজের আস্বাবে গৃহ সজ্জিত
করিতেছে ; ও ইংরাজি ধরণে অভ্যর্থনাদি
করিতেছে। কতিপয় ধনাঢ্য পার্সীর গৃহ
দর্শন করিতে গিয়া, চারিদিকে সতৃষ্ণনয়নে
অমুসন্ধান করিয়াও, মিনার কাজ, কাঠের
খোদাই কাজ, তাঁবার জিনিস, গালিচা
প্রভৃতি চমৎকার দেশীয় শিল্পসামগ্রী দেখিতে
পাইলাম না।’ গৃহের সর্বত্রই ইংরাজি
আস্বাব, ইংরাজি কাগজ, ইংরাজি কাপড়।

একজন পার্সী যুবক স্বীয় খুল্লতাতে গৃহ
আমাদিগকে দেখাইতেছিলেন ; তিনি খুব
ভারি ক্রিয়া একটি “ক্রোমোলিথোগ্রাফ”
আমাকে দেখাইয়া বলিলেন :—“এই ছবিটি
কি সুন্দর !”—ছবিটি হ’লে হাইডপারকে
“চৌঘুড়ি-ক্লবের” সম্মিলনের একটি প্রতিকৃতি।
এই “জেন্টলম্যান্টি” বিলক্ষণ ধনী ও যথেষ্ট
শিক্ষিত ; ঐ ক্লবের সভ্য হইবেন বলিয়া
তিনি অনায়াসেই আশা করিতে পারেন ;
তবে কি না, শ্রামবর্ণের প্রতিকূলে ইংরাজের
যে রূপ কুসংস্কার, তাহাতে সে আশা পূর্ণ
না হইতেও পারে। ভদ্রবংশীয় পার্সীযুব-
কেরা ইংরাজসমাজে মিশিবার জন্ত যথাসাধ্য
চেষ্টা করিয়া থাকে ; শিক্ষা শেষ করিবার
জন্ত তাহারা প্রায় সকলেই ইংলণ্ডে যাত্রা
করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খুব দেশ-
পর্যটন করিয়াছে, এবং অনেক ভাষায় কথা
কহিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ
খৃষ্টধর্মাবলম্বী ; আবার অনেকেই পাশ্চাত্য-
দেশের সংশয়বাদ গ্রহণ করিয়াছে ও স্বীয়
প্রাচীন আচারব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা
প্রদর্শন করিয়া থাকে। পার্সীদের প্রাচীন-
শাস্ত্রানুসারে ধূমপান নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।
জোরোয়াষ্টার একথা স্বীকার করেন যে, শুধু
রন্ধনের জন্ত অগ্নি ব্যবহার করা যাইতে
পারে, কিন্তু বলেন, বিনা-প্রয়োজনে,
পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা সর্কোপেক্ষা বিপজ্জ,
সেই অগ্নিকে নিশ্বাসের স্পর্শে দূষিত
ও অপবিত্র করা—ইহা অপেক্ষা দেবাবমাননা
আর কি হইতে পারে ? পার্সী-ধূমপায়ীর
নিকট এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি
তাহার উত্তরে এইরূপ কটুতর্ক করেন যে,

জোরোয়াষ্টারের সময় তামাক-সামগ্রীটা
অজ্ঞাত ছিল ; অতএব পার্সী-ধর্মের নিষিদ্ধ
সামগ্রীর তালিকার মধ্যে উহাকে ধরা যাইতে
পারে না। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় শুধু
পার্সীরাই স্বীয় পত্নীদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে
এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশস্থানে
লইয়া যায়। সঙ্গতিসম্পন্ন পার্সী-মহিলারা
ঘিচক্র-রথারোহণে ও টেনিস-ক্রীড়ায় ইংরাজ-
ললনাদিগের সহিত টক্কর দেয়। উহাদের
মধ্যে অনেকে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষ-
য়িত্রীর পদে নিযুক্ত। এই সকল পার্সী-
মহিলারা খরস্রোতি, ক্রশ, চোখে-চন্মা ;
উহাদের মুখে জাগ্রৎ-জীবন্ত ভাব ক্ষুণ্ণিত পায় ;
হিন্দুমহিলাদিগের ঔৎসুক্যহীন নিতান্ত সরল
মুখের ভাব ইহার ঠিক বিপরীত। যাহা
হউক, পার্সী-মহিলারা এখনও দেশীয় ধরণে
শাড়ী পরিধান করে। পার্সীদের স্থাপিত
বালিকাবিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যপ্রভাব সর্বাংশে
প্রবেশ করিয়াছে। ছাত্রীরা ইংরাজিতে গান
গাহে, “God save the King”—এই সুর
পিয়ানোয় বাজায়। পার্সীরা সংখ্যায় নিতান্ত
অল্প না হইলে, উহারা যে রূপ সর্বপ্রকার
পাশ্চাত্যপ্রভাব গ্রহণে উন্মুখ, তাহাতে
উহারা ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় জাপান—কিংবা,
অন্তত স্বতন্ত্রশাসনাত্মক একটি উপনিবেশ
করিয়া তুলিতে পারিত।

ভারতবর্ষীয়-ধর্ম-সঙ্গন্ধে গ্রহণকার এইরূপ
বলেন :—

বহু প্রাকাল হইতে, ভারতবর্ষ স্ক্রু-
বহু নানাবিধ দেবালয়ে সমৃদ্ধ। কোন
প্রতিমূর্তি তরুতলে, কোন স্থলধরণে গঠিত
প্রস্তরমূর্তি কোন উৎসের নিকট কিংবা

কোন শৈলপার্শ্বে স্থাপিত । ঐ মূর্তিগুলি পদে-পদে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, দেবতার সর্বত্রই অদৃশ্যভাবে বর্তমান, এবং কোন পদার্থ যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, তাহাদের মধ্যেও তাঁহাদের আত্মা বিরাজমান । হিরোডোটাস্ প্রাচীন মিসরবাসীদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে বিলক্ষণ খাটে । অর্থাৎ, “মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ইহার সর্বাপেক্ষা ধর্মপরায়ণ ।” এদিকে আবার শাক্যমুনি প্রচার করেন :— “জীবন যন্ত্রণাময়, আত্ম-অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া অনন্তে বিলীন হওয়াই মনুষ্যের পরম সুখ ।” যদিও তাঁহার পূর্ববর্তী ও তাঁহার সমকালীন হিন্দুসম্মান্যসীদিগেরও এই মত ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত এইমাত্র প্রভেদ যে, শাক্য-মুনি দেবতার অস্তিত্ব ও বর্ণভেদ মানিতেন না । খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টোত্তর পঞ্চ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রবল ছিল । তাহার পর, ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে আবার ব্রাহ্মণ-ধর্মের পুনরুত্থান হয় । আধুনিক হিন্দুধর্ম প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই রূপান্তরবিশেষ ; উহার মধ্য বৌদ্ধধর্মের প্রভাবচিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত কিছু-কিছু লক্ষিত হয় । পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের মধ্যে এক্ষণে বুদ্ধদেব স্থান পাইয়াছেন ; তিনি এক্ষণে বিষ্ণুর একটি অবতার বলিয়া পরিগণিত ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তিই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থল । ইহার মধ্যে ব্রহ্মা তেমন লোকপ্রিয় হইতে পারেন নাই । সমস্ত ভারতের মধ্যে তাঁহার একটিমাত্র মন্দির বিদ্যমান । ব্রাহ্মণ্যধর্মের অর্থ

ব্রহ্মার ধর্ম বুঝার না ; ব্রাহ্মণ্যধর্মের অর্থ— ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম । শিব ও বিষ্ণুই ভারতবর্ষের লোকপ্রিয় দেবতা । উত্তর-ভারতে বিষ্ণুর ও দক্ষিণ-ভারতে শিবের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাব । ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম অতীব বিস্তৃত—একপ্রকার সর্বধর্মের সার-সংগ্রহ বলিলেও হয় । হিন্দুধর্ম যে-কোন দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে—কোন দেবতাকেই বর্জন করে না । যেমন একদিকে, “ক্যাথলিক্” খৃষ্টসম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকেরা খৃষ্টানধর্মে নবদীক্ষিত হিন্দুদিগকে দেবালয়ে যাইতে কিংবা তৎসংক্রান্ত কোন কাজ করিতে নিষেধ করেন, তেমনি তাহার বিপরীতে, স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরা খৃষ্টধর্মের কোন উৎসব-যাত্রায় কিংবা কোন খৃষ্টগির্জার সম্মুখে আরাধনায় যোগ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না । অষ্টাদশ শতাব্দীর কতিপয় খৃষ্টধর্মপ্রচারক, যাহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সহজে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে যে-সময়ে যে-ত-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, বাইবেল-গ্রন্থকে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, ব্রহ্মা আত্রাহামের অপভ্রংশ, কৃষ্ণ খৃষ্টের অপভ্রংশ, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদ ব্রাহ্মণেরা করে নাই,—ইহার প্রতিবাদ খৃষ্টানেরাই করিয়াছিল ; সাধারণ খৃষ্টানদিগের নিকট এই সব কথা অখৃষ্টানোচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল । ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর্মমতসম্বন্ধে যে তেমন বাঁধাবাঁধি নাই, তাহার কারণ, তাহাদের মধ্যে সেরূপ কোন ধর্মসম্বন্ধীয় শাসনতন্ত্র নাই—পোপ নাই, বিশপ্ নাই, বিচারসভা নাই, সকলে

সমবেত হইয়া সর্বসাধারণের জন্ত কোন কার্যের মীমাংসা ও শেবানিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় নাই।

মুসলমানদিগের সম্বন্ধে গ্রহকার এইরূপ বলেন :—

যতই বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই কাটা-ছাঁটা পরিচ্ছদের পরিবর্তে সেলাই-হীন খুতি-কাপড়ের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দজির শিন্নি; বুটাদার কাজ, এদেশে মুসলমানকর্তৃকই প্রথম প্রবর্তিত হয়। শীতদেশের উপযোগী লম্বা জামা বা চাপ্কান এবং রেশমি কিংবা মধুমলের জরির-কাজ-করা আঁটা-সাঁটা কতুয়া এখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা প্রথম এদেশে পাগড়ি প্রবর্তিত করে। এক্ষণে হিন্দুরাও বর্ণ ও শ্রেণী ভেদে বিবিধ-আকারের পাগড়ি গ্রহণ করিয়াছে। দাড়িরাখা অভ্যাসটি মুসলমানেরাই এদেশে আনিয়াছে। এই অভ্যাসটি এখন আর মুসলমানজাতির মধ্যে বদ্ধ নাই।

যদিও ছই বৃহৎ মুসলমান-সম্প্রদায় মুসলমান-ধর্মের সারাংশ ভারতবর্ষে অবিকৃত-ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং যদিও তাহারা মুখে পৌত্তলিকতার প্রতি ঘোরতর ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের ধর্মের বাহু অহুষ্ঠানে—বিশেষত শিয়াসম্প্রদায়ের মধ্যে—হিন্দুধর্মের প্রভাব কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ধর্ম আসলে যার-পর-নাই সাদা-সিধা এবং পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অতীজিয় ও হৃদয়ধারণী-সাপেক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া উহা মৃত্যবশেষ-চিহ্ন-পূজা

ও মূর্তিপূজার সহিত যেন একটু জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান ককির ভারতে আসিয়া কতকটা হিন্দুসম্মানসিীর ধরণধারণ অবলম্বন করিয়াছে। শিয়ারা মোহরম্-উৎসবের সমস্ত “তাজিয়া” বাহির করে এবং পরিশেষে উহা গুড়াইয়া হিন্দুদিগের জ্ঞান নদীজলে বিসর্জন করে। আহমদাবাদের সন্নিকটে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি পুণ্যবৃক্ষ আছে, মুসলমানেরা তাহার অত্যন্ত ভক্ত; তাহারা সেই বৃক্ষের তলায় বলয়াদি স্থাপন করে; এবং তাহাদের বিশ্বাস, রাত্রিবোগে বৃক্ষটি শাখাহন্ত বাড়াইয়া ঐ বলয়গুলি গ্রহণ করে। কোন কোন মুসলমান-পীরের সমাধিমন্দিরে হিন্দুরা তীর্থ-যাত্রা করে। আজমীরে এইরূপ একটি সমাধি-মন্দির আছে; সেখানে ছইটি উৎসব-মেলা হইয়া থাকে;—একটি হিন্দুদিগের, আর একটি মুসলমানদিগের। অজ্ঞাত নৈবেদ্য-সামগ্রীর মধ্যে পুষ্পমুকুটসকল সেখানে অর্পিত হয়। হিন্দুমন্দিরের প্রবেশদ্বারে বেক্রপ দীপাবলী দৃষ্ট হয়, তাহারি অহুকরণে ঐ মসজিদের বহিঃস্থিত “মিনার”স্তম্ভের ধুমলিন কুলুঙ্গিসমূহে দীপ জালানো হইয়া থাকে; ধনী তীর্থযাত্রীদিগের ব্যয়ে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কড়ার চাউল, ছদ্ম, ফল ও গরম-মশলাদি মিশ্রিত একপ্রকার পায়স প্রস্তুত করিয়া মসজিদের রক্ষিবর্গকে বিতরণ করা হয়। ইহাতে লক্ষটাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে কোন-কোন অংশে যে এইরূপ সংস্পর্শ ও সংস্রব দৃষ্ট হয়, উহা আসলে আভ্যন্তরিক নহে—উহা বাহ্যিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের আরম্ভ হইতে

এখন-পর্যন্ত উভয় ধর্মের মধ্যে শত্রুতাই চিরজাগরুক রহিয়াছে।

কি ভারতবর্ষে, কি অশ্রদ্ধ, মুসলমান-দিগের মধ্যে যে অভিন্নভাব দেখা যায়, উহাই উহাদের মহাশক্তি। হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার ঠিক বিপরীত;—উহারা বিবিধ বর্ণে বিভক্ত। ভারতবর্ষে, মুসলমানদিগের মধ্যে যে শ্রেণী-বিভাগ একবারে নাই, তাহা নহে; তাহাদের মধ্যেও মহম্মদের বংশধর, ভারতবিজেতার বংশধর ও মুসলমানীকৃত হিন্দু—এই তিন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইজিপ্ট কিংবা তুর্কিস্থানের মুসলমানদিগের স্থায়, ভারতবর্ষীয় মুসলমানসমাজে যদিও ব্যবহারে ততটা অভিন্নভাব দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তথাপি, “সকল মুসলমানই সমান”—এই মূলতত্ত্বটির সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। শুধু ভারতবর্ষে কেন—সমস্ত মুসলমানরাজ্যেই বংশ, জাতি, উৎপত্তি ইত্যাদিবিষয়ক ভেদাভেদ ততটা গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হয় না; বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে যে প্রভেদ, উহাই মুসলমানদিগের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর। মুসলমানসমাজে সকল মনুষ্যই ব্রাহ্মণানীয়, অন্তত ব্রাহ্মরূপে গৃহীতব্য। মুসলমান-ধর্ম্মাধিষ্ঠিত সর্বদেশীয় রাজ্যমণ্ডলীই তাহাদের স্বদেশ—ইহা-ছাড়া তাহাদের আর-কোন স্বদেশ নাই। ধর্ম্মাধিষ্ঠিত সীমা ভিন্ন তাহাদের দেশের আর-কোন সীমাচিহ্ন নাই।

ভারতবর্ষে মুসলমানেরা রাষ্ট্রসম্বন্ধে যুরোপীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন অধিকার তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় নাই। এ বিষয়ে তাহাদের কতটা সঙ্কোচ, একটা দৃষ্টান্ত দিলে

বুঝা যাইবে। টিচিনাপলি-নগরে, জেঙ্গাইট-সম্রাটের খুটানেরা, শিবমন্দিরাধিষ্ঠিত একটি শৈলের পাদমূলে, জম্কালা একটি “কালেজ” নির্মাণ করিয়াছে। সেটি হিন্দুদিগের একটি পুণ্যস্থান;—তাহার চারিপার্শ্বেই বহু দেবালয়। হিন্দুধর্ম্মের এই প্রধান ছর্গটিকে অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে, জেঙ্গাইটেরা ধৈর্য্যসহকারে অনেক কৌশলে ঐ স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে। তাহারা গির্জার জন্ত একটি দেবালয় হিন্দুদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে। তাহাদের অভিপ্রায় বৃদ্ধিতে পারিয়া বিক্রেতারা তাহাদের নামে আদালতে মোকদ্দমা আনে; কিন্তু জেঙ্গাইটেরা যখন বলিল যে, উচ্চবর্ণের হিন্দু-খুটানদিগের জন্ত সেখানে ভজনাগার স্থাপন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, তখন হিন্দুরা সন্তুষ্ট হইল, আর আপত্তি করিল না। কিন্তু কালেজ-সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমির মধ্যে মুসলমান-পীরের একটা সামান্য লক্ষ্মীছাড়া সমাধিমন্দির ছিল; তাহা উঠাইয়া অশ্রদ্ধ স্থানে লইবার জন্ত, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ জেঙ্গাইটেরা মুসলমানদিগের নিকট অনেক টাকা কবুল করে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই সম্মত হয় নাই।

বাঙালী মুসলমান-চাকর এদিকে স্বভাবত এত চাপা, কিন্তু ভারতের সীমান্তপ্রদেশে কোন ধর্ম্মাধিকারবুলী কোন ইংরাজকে গুপ্ত-হত্যা করিয়াছে, কোন যুরোপীয়ের মুখে সে যদি শুনিতে পায়, অমনি সে বিচলিত হইয়া উঠে; সেই বর্ণিত বৃত্তান্তের মধ্যে যদি কোন ভুলচুক থাকে, অমনি সে শুধরাইয়া দেয়; হত্যাকারীদের ‘ছোরার গঠন’ কিরূপ ছিল, তা-পর্যন্ত তাহারা বলিয়া দেয়। ইহাতেই

বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর কথা-চালাচালি হইয়া থাকে। ভারতের সীমান্তপ্রদেশের পরপারে যে-সকল ঘটনা সম্ভটিত হয়, অতীব নিরক্ষর মুসলমানও তাহার খবর রাখে; কাবুলের আমীর যে তাহাদেরি সহধর্মী;—এমন কি, আরো দূরে—রুশসৈন্তমধ্যে মুসলমানেরা যে, সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছে—এই সকল বিষয়ে তাহারও কতকটা অস্পষ্ট ধারণা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে মুসলমানরাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতি মুসলমানদিগের মধ্যে জাগরুক রহিয়াছে। একজন সামান্ত মুসলমান-ভৃত্য, সে-ও জানে, একসময়ে মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজা ছিল এবং তাহাদের বাদশারা দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে জম্‌কালো স্মৃতিচিহ্নসকল রাখিয়া গিয়াছেন।

তবে কি মুসলমানদিগের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা আছে?—পূর্বরাজত্ব আবার তাহাদের হস্তগত হইবে, এরূপ আশা কি তাহারা এখনও করিয়া থাকে?—ইহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। কেন না, দেখা যায়, মুসলমানেরা সর্বত্রই স্বল্পভাবী; খৃষ্টানদিগের নিকট কোনো কথা উহার বিশ্বাস করিয়া বলে না। তবে, যতক্ষণ তাহাদের চাক্রি করে, ততক্ষণ তাহাদের প্রতি একপ্রকার মুকসন্মান প্রদর্শন করে মাত্র। মুসলমানেরা স্বীয় অবিচলিত গাঙ্গীর্ঘ্য-আবরণের মধ্যে নিজ মনোভাব গোপন করিয়া রাখে। এই বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত

তাহাদের প্রভেদ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। মুসলমানদের নিকট হইতে এইটুকুমাত্র জানা যায় যে, তাহাদের বিশ্বাস—তাহারা হিন্দু কাকেরদের অপেক্ষা অনন্ততঃ শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ যে “জ্ঞানশাল কংগ্রেসে” প্রতিবৎসর সমবেত হইয়া থাকেন, সেই কংগ্রেস-সভায় একজন পরগণেশ্বরের বংশধর বলিয়াছিলেন যে, “অনতিকাল পূর্বে, হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের স্বাভাবিকপ্রিয়তা, কার্যোত্তম, উৎসাহ-বীৰ্য্য অধিক ছিল।” আরো তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, “পূর্বতন জেতুবংশের ষাঁহারা প্রতিনিধি, সেই প্রকৃত মুসলমানদিগের আন্তরিক সাহায্য না পাইলে, কংগ্রেস কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমাদের পূর্বতন যোদ্ধাদিগের বংশধরেরা যদি কংগ্রেসের কাজে অন্তরের সহিত যোগ দেন, তবেই কংগ্রেস সফলতা লাভ করিতে পারিবে।”

যাহারা এইরূপ ধরণের কথাবার্তা কহে, তাহাদের কথা শুনিয়া হঠাৎ যাহা মনে হয়, আসলে তাহা নহে—ইংরাজরাজত্বের বিদ্রোহী হইতে তাহারা আদৌ প্রস্তুত নহে। মনে হয়, আকবর-রাজত্বের পুনরুদ্ধার করিবার আশা আপাতত তাহারা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের আশাভরসা ভারতের সীমা-ছাড়াইয়া সমস্ত মুসলমানরাজ্যের উপর স্থিত। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এক সময়ে মহম্মদের ধর্ম সমস্ত পৃথিবী জয় করিবে। যদিও আপাতত ক্ষণকালের জন্য উহার গতি স্তম্ভিত হইয়াছে, কিন্তু কোন-এক-সময়ে ভূমণ্ডলের অপর-

কোন অংশে মহম্মদীয় ধর্মের জয়পতাকা লইয়া একজন মহাবীর নিশ্চয়ই সমুখিত হইবেন। এই সর্বদেগীয় মুসলমানের একতা-মূলক আন্দোলন, যাহা আপাতত দেখা দিয়াছে, এবং যাহা মৌলবীগণ ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তুর্ক-মুলতানের অমুকুলে সর্বত্র উত্তেজিত করিয়া দিতেছে, ভারতবর্ষে সুন্নি-সম্প্রদায়ের কোন কোন মুসলমান ঐ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। কি ভাঙিত-বার্তাবহ, কি লোহবর্ষ, কি মুদ্রাযন্ত্র—

এই সমস্ত যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক কার্যোপায়-সকলের বিস্তারে, মহম্মদীয় ধর্মের ধ্বংস হওয়া দূরে থাক, বরং উহার প্রচারের আরো সুবিধাই হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, যুরোপের নবোদ্ভাবিত কলকৌশল ও পদ্ধতি-সমূহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যসমাজে সমানীত হইলে, পাশ্চাত্যাব জাগরিত হওয়া দূরের কথা, আপাতত তো তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের নূতন উপায়সকল উহাদের হস্তে অর্পিত হয়।

ঐজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয়।

হে নিস্তর গিরিরাজ, অজ্ঞেয়ী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অমৃত উদাস্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
হুর্গম হরুহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে !
হুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষপ্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারিয়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব স্মর,—সামগীত শব্দহার
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নিরুপরিধায়া !

হে গিরি, যৌবন তব যে হৃদম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারিয়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্ধে চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষণ !
পেরেছ আপন সীমা, তাই আজি যৌন শাস্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া !

কান্তি ।

—:—

কান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেন আজি
তোমার সৰ্ব্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্রাম শম্পরাজি
প্রক্ষুটিত পুষ্পজালে ; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবৰ্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জ তার
বকুলে শৈবালে জটে ; সুহৃগম তোমার শিখর
নির্ভর বিহঙ্গ যত গীতোল্লাসে করিছে মুখর ।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশব্দ কুটীরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিতটে ।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য্য করিবারে গ্রাস,—
সে দিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয় ;
যখনি ধেমেছ তুমি বলিয়াছ, “আর নয়, নয়,”
চারিদিক্ হ’তে এল তোমা’পরে আনন্দ-নিধাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস !

শিলালিপি ।

—:—

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমালয়, গভীর নির্জনে
পাঠকের মত তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অক্ষ’পরে ।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে,
পড়িতেছ একমনে । ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ !
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা ?
নিরাসক্ত নিরাকাজ্জ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা অকোমল হৃদয় স্নেহ
বাহর করণ আকর্ষণে ? কিছু নাহি চাহি ষার,
তিনি কেন চাহিলেন—ভাল বাসিলেন নির্বিকার,—
পরিণে পৰিণয়পাশ ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা ?

হরগৌরী ।

—:~:—

হে হিমালয়, দেবভাষা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনায়ে যেন বারম্বার
শূদ্ধে শূদ্ধে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূর্তি !
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব পশুপতি,
হৃগম ছঃসহ মৌন ;—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়ান্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাৰ্ঘ্যপদ্মদল ! কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর !
হের তাঁরে অন্ধে অন্ধে একি লীলা করেছে বেটন—
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধে করেছে আলিঙ্গন
সফেনচঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেদের ওই চুম্বে
কোমল শ্রামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুম্বে
ছায়াবোঁদ্রে মেঘের খেলায় ! গিরিশেখরে রয়েছেন ঘিরি
পার্কর্তা মাধুরীছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি !

তপোমূর্তি ।

—:~:—

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঙ্কিত
তপস্তার মত ! স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমানকিত
নিবিড় নিগূঢ় ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিফলক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসৰ্জনে !
তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহ তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—“শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি !” যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হ’তে
আদিঅস্তবিহীনের অথও অমৃতলোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে !
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমামি-আহতি
ভাষাহারা মহাবাক্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শূদ্ধে শূদ্ধে কোন্ মন্ড্রে উচ্ছ্বসিছে মেঘধ্বজ স্তূপে !

সন্ধিতবাণী ।

ভারতসমুদ্র তার বাস্পোচ্ছ্বাস নিঃসরে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,
অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ !
উর্দ্ধবাহ হিমাচল, তুমি সেই উৎসাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—গুনকীর উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে,
অসীমজিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিত্তে !
সেইমত ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ উর্দ্ধপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিষ্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে-
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাদ্রি তুমি শুকশিরে !
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শাস্ত শিব অধৈতের সনে !

প্রাচীন আর্মেনীয়ার হিন্দু-উপনিবেশ ।

পুরাকালে সিরিয়াদেশের ইন্নাকিনান্-
(Innakinan)-মঠের প্রধান ধর্মযাজক
মহাত্মা “জিনোবিয়াস্” (Zenobius)
তাঁহার সিরিয়াভাষায় লিখিত ইতিহাসে
“প্রাচীন আর্মেনীয়ার হিন্দু-উপনিবেশ”
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন ।
কয়েক বৎসর গত হইল, মিঃ আবদাল
নামে জনৈক লেখক “জর্জাল অব্ দি
এসিয়াটিক সোসাইটী” নামক পত্রে ইংরা-
জিতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন ।
উক্ত প্রবন্ধই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ভিত্তি ।

পাদরী “জেনোবিয়াস্” বলেন, এখানকার
(আর্মেনীয়ার) অধিবাসীরা দেখিতে অসা-
ধারণ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদের শরীর আবক্ষ লবিত,
আকৃতি অতি কুৎসিত । তাহারা আপনা-
দিগকে হিন্দুবংশসম্বৃত বলিয়া পরিচয় দেয় ।
“দেমিতর্” (Demeter) ও “কেশিনী”
(Keisaney) তাহাদের উপাস্ত দেবতা ।
ভারতবর্ষেরই কোন রাজ্যের বংশধর
হই ভ্রাতা সম্ভবত অতি প্রাচীনকালে
আর্মেনীয়ার উপস্থিত হয় । ঐ রাজ্যের
নাম “দিনাকী” (Dinaskey) । ভ্রাতৃ

দ্বয় রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলিয়া রাজা তাহাদের দমনার্থ অস্ত্রশস্ত্রে অসজ্জিত কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। উহারা পলাইয়া আর্মেনীয়াদেশে ভালারসেসেস্ (Valarsaces) রাজ্যের রাজ্যে যাইয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। উক্ত রাজা তাহাদের আশ্রয়দান করিয়া “তারণ”-(Taron)-নামক দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। এই স্থানে তাহাদের চেষ্ঠায় বিশাপ্ (Bishap), বর্তমান ড্রাগন (Dragon), নামে নগর স্থাপিত হয়। তাহার পর তাহারা “অশ্টিশত”-(Ashtishat)-নামক স্থানে যাইয়া ভারতবর্ষীয় কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে তথাকার রাজা তাহাদিগকে নিহত করিলে কুয়র (Kaur), মেঘ্তী (Meghti) এবং হোরেন (Horain) নামে তাহাদের তিনটি বংশধর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। কুয়র তাহার স্বনামে একটি নগর স্থাপন করে। ঐ নগর এখনও কুয়রনামে বর্তমান। মেঘ্তীও নিজ নামে একটি গ্রাম স্থাপন করে। হোরেন পালুনীস্ (Paluniss)-প্রদেশে স্বনামে “হোরেন”গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল। যাহা হউক, কিছুকাল পরে স্থানান্তরে বাস করিতে তাহাদের ইচ্ছা হয়। তথাকার পার্শ্বপ্রদেশের “কার্কী”-(Karki)-নামক স্থানই উহাদের বাসস্থান নির্ধারিত হইল। ঐ স্থান অতি রমণীয়,—প্রকৃতির চিরসৌন্দর্য্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। উহার মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াই তাহারা ঐস্থানে বাস করে।

“কেশিনী” ও “দেমিতর” দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইলে দেবদ্বয়ের পূজার বন্দোবস্তের জন্ত জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ বিবরণ দিয়া লেখক বলিতেছেন যে, উপরি-উক্ত রাজপুত্রদ্বয় ঠিক কোন সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া আর্মেনীয়ায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে খৃষ্টজন্মগ্রহণের প্রায় দেড়শত কি দুইশত বর্ষ পূর্বে তাহারা আর্মেনীয়ায় আগমন করে, এইরূপ বলিয়া থাকেন। খৃষ্টজগতের সুপ্রসিদ্ধ পাদরী-পুত্রব “সেন্ট গ্রিগরী” (St. Gregory) এই সময়ের লোক। তিনি আর্মেনীয়াপ্রদেশে হিন্দু পৌত্তলিকের বসবাসের কথা শুনিয়াছিলেন। শান্তিসেবক যিশুখৃষ্টের হিন্দুধর্ম্মী বীরশিষ্য “সেন্ট গ্রিগরী” মহামদীয় নীতির চিরন্তনপ্রথা অনুসারে পালুনীস্-প্রদেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির-লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদের তায় খৃষ্টশিষ্য পাদরী সেন্ট গ্রিগরী পালুনীস্-প্রদেশের হিন্দুদেবদেবীধ্বংস মনস্থ করেন। হিন্দুরা পূর্বেই হস্তিআশ-(Hastus)-রাজপুত্রের প্রযুক্ত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইদিবস গভীর নিশীথে তাহারা অতি সতর্কভাবে দেবমূর্ত্তিসকল স্থানান্তরিত করে এবং দেবসেবায় নিয়োজিত অস্থাবর সম্পত্তি—টাকাকড়ি প্রভৃতি সমস্তই নিরাপদে ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলে।

এই সমস্ত কার্য্য সেই রাত্রির মধ্যেই বিশেষ সাবধানে সমাধান করিয়া তাহারা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, হয় এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আপনাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবে, না হয় যত্নাকে আলিঙ্গন করিয়া চিরশাস্তি-নিকেতনে গমন করিবে! এই যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইল বটে—কিন্তু তাহারা স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্ত যে অপূর্ণ বীরত্ব দেখাইয়া আপনাদের দেহবিসর্জন করিল—বস্তুত তাহা সর্ব্বদেশেই সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও বিষ্ময়কর। পালুসীসবাসী পরাজিত হিন্দুরা নিরাশ্রয় হইয়া একে একে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা নাকি প্রায় ১০৩৮। অবশিষ্ট অধিবাসী হতসর্ব্বশ ও বিভাঙিত হইল। অবশেষে সেন্নিসের (Sennises) রাজপুত্র সন্ধিস্থাপন করিলেন। প্রধান পুরোহিতবংশধর আর্শেনীরাজের নিকট মৃত হিন্দুগণের দেহ সমাহিত করিবার অনুমতি চাহিলেন। রাজপুত্র অনুমতি দিলে, তিনি ঐ সমস্ত মৃতদেহ পুঞ্জীকৃত করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সমাহিত করিলেন। অবশেষে সেই সকল সমাধিস্তম্ভে জেতুপক্ষ হইতে সিরিয়া, হেলেনীয়া ও ইস্রাইল ভাষায় নিম্ন-লিখিত কয়েকছত্র লিপিবদ্ধ হইল :—

“প্রথম যুদ্ধ অতি ভীষণভাবে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের প্রধান পাণ্ডা (সেনাপতি) অর্জম্-(Arzam)-নামক জনৈক হিন্দু-পুরোহিত।

“ইহার সহিত এক হাজার আটত্রিশ জন এইস্থানে সমাহিত হয়।

“আমরা প্রভু যিশুখৃষ্টের পক্ষ হইয়া ‘কেশিনী’ দেবতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণা করি।”

লেখক “জেনোবিস্” স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নাকি এই বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহা ইউক, সন্ধি স্থাপিত হইলে পাদরী “সেন্ট গ্রিগরী” পরাজিত হিন্দুদিগকে (প্রায় ৫০৫০ জনকে) বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সকল হিন্দুদের ভিত্ত অধিকাংশই পুরুষ; তাহার পরে তাহাদের স্ত্রী-কন্যাগণও দ্রুত খৃষ্টানের অত্যাচার হইতে আপনাদের মানসম্মতমর্য্যাদা পতিপুত্রের অনুসরণ করে। যাহারা খৃষ্টান হইতে অস্বীকার করিয়াছিল, মস্তকমুণ্ডন করিয়া তাহা-দিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। মস্তক-মুণ্ডনটা “কেশিনী”-উপাসক হিন্দুগণ অত্যন্ত অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন। কারাগারে নিক্ষিপ্ত এই সকল স্বধর্ম্ম-নিরত হিন্দুর সংখ্যা প্রায় চারিশত।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

অনুবাদ ।*

এক শ্রেণীর কাব্যানুবাগী লোক আছেন, কাব্যের অনুবাদের উপর তাঁহারা নিত্যক বিরূপ। অনুবাদমাত্রকেই তাঁহারা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন যে, উৎকৃষ্ট কাব্যের রস ও সৌন্দর্য অনুবাদে রক্ষিত হইতে পারে না—রস বিস্মাদ হইয়া যায়, সৌন্দর্য নান ও বিকৃত হইয়া পড়ে। সেইজন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যদি উৎকৃষ্ট কোন কাব্যের রস, সৌন্দর্য ও গৌরব যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তবে তাহা মূলে অধ্যয়ন কর—অনুবাদপাঠ পণ্ডিতমাত্র।

স্বীকার করি, এইরূপ উপদেশ একদিন সমীচীন ছিল। যখন সাহিত্যের সংখ্যা অল্প ছিল; তাহার অনুশীলন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষে নিবদ্ধ ছিল এবং সেই সম্প্রদায় বা শ্রেণী অনন্তকর্মী ছিল, তখন এইপ্রকার উপদেশের সার্থকতা ছিল। ইউরোপে একদিন গ্রীক ও ল্যাটিন ব্যতীত অন্য সাহিত্য ছিল না। তাহার অনুশীলন কেবলমাত্র ধর্ম-যাজকদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। জ্ঞানার্জন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কার্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না। আমাদের দেশেরও ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলিতে পারা যায়। এই সকল জ্ঞানার্থী-

দিগকে উদরের চিন্তা করিতে হইত না; সে ভার সমাজ লইয়াছিল। অস্তিকে সরস্বতী এবং সর্বত্র ভগবান, ইহাই তাঁহাদের সর্বস্ব ছিল। ইহাদিগকে দুইটার স্থলে পাঁচটা ভাষা শিখিতে বলিলেও অসম্মত হইত না। এক দিন ছিল, যখন এই উপদেশের সমীচীনতা ছিল।

কিন্তু আজ? এই কঠোর ও নিদারুণ জীবনসংগ্রামের দিনে, এই সাধারণ্যে সাহিত্য-প্রসারের দিনে, এই উপদেশ কি চলে? ইউরোপে গ্রীক ও ল্যাটিনের স্থলে এখন কত সাহিত্য হইয়াছে, এবং তাহার প্রত্যেক-টিতে উপাদেয় গ্রন্থের সংখ্যাই বা কত। আমাদের দেশে পূর্বে সংস্কৃত ও পালি ছিল; এখন বাঙ্গালা, উর্দু, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাতি, হিন্দী, উড়িয়া—কত ভাষায় কত সঙ্গ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উপর পারসী আছে, আরবী আছে; আরও যে নাই, এমন নহে। সকল বা কতকগুলি সঙ্গ্রহও মূলে পড়িতে হইলে কত ভাষা শিখিতে হয়, ভাব দেখি। তার পর, জীবনসংগ্রাম—আমরা সকলেই উদরারের জন্ত, দ্রীপুত্রের, আত্মীয়স্বজনের জন্ত, দিবারাত্র ক্ষিপ্ত সারমেয়ের ভায় ইত্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছি। এত করার পর নানা ভাষা শিক্ষার সময় হয় কখন?—হয় কয়-

* শ্রীযুক্ত জ্যোতির্জনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক অনুবাদিত নটকনিচয় উপলক্ষে লিখিত। লেখক।

জনের? বাহাদের হইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমতা আছে কয়জনের? লক্ষী এবং সরস্বতীর একত্রাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায় কত স্থলে? এমন অবস্থায় এমন আদেশ যিনি করেন, তাঁহাকে—পাগল না হয় না—ই বলিলাম।

অতএব বুঝা গেল যে, এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে পাঁচটা ভাষা শিক্ষা করা পৌনে ষোলআনা লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট-কাব্যরসাস্বাদে বঞ্চিত থাকিতে হইবে? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ত অমুবাদের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই।

তার পর, অমুবাদ হইলেই যে তাহাতে মূলের রস, সৌন্দর্য্য ও গরিমার অপচয় ও বিকৃতি ঘটে, ইহা কি সত্য? অবশ্যই, সকল বিষয়ের স্থায়, অমুবাদ ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। যেখানে অমুবাদ উপহারের উদ্দেশ্যে বা পুস্তকবিক্রেতার আদেশে কৃত হয়, সেখানে তাহা মন্দ হওয়াই সম্ভব। আজকাল আমাদের দেশে তাহার পরিচয়েরও অভাব নাই। কিন্তু যেখানে ক্ষমতা আছে, ভাষার উপর আধিপত্য আছে, কাব্যরসপ্রাণিণী শক্তি আছে, আন্তরিকতা আছে, সেখানে অমুবাদে মূলের মাহাত্ম্য অনেকটাই রক্ষিত হয়। হয় যে, আলোচ্য গ্রন্থনিচয়ই তাহার প্রমাণ—অত্র প্রমাণ নির্দেশ করা নিম্নয়োজন।

অনেকে বলেন, কাব্যের বাহা উৎকৃষ্টাংশ, তাহার অমুবাদ হইতে পারে না। আমরা বলি, কাব্যের বাহা উৎকৃষ্টাংশ, তাহাই অমুবাদসহনশীল। যেখানে মূলে স্থানকালের

সীমাবদ্ধতা আছে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গীর্ণতা আছে, সেখানে অমুবাদ সার্থক না-ও হইতে পারে, না হইবারই কথা। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্ব লুপ্তপ্রায় এবং প্রকাণ্ড মানবত্বের বিশালতা সপ্রকাশ—যেখানে আমি নাই, আমরা আছে; ব্যক্তিত্ব নাই, মানবত্ব আছে; তোমার আমার ছুঃখের কথা নাই, মনুষ্য-জাতির অন্তর্বেদনার কথা আছে; খণ্ড সত্য নহে, বিরাট সত্যের অভিব্যক্তি আছে—তাহার স্তূনর অমুবাদ হইতে পারে; হইয়াও থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আমি দেখিয়াছি;—দেখিয়াছি যে, মূলের গরিমা সর্বত্র এবং সর্বথা রক্ষিত হইয়াছে। বাইবেলের অমুবাদসম্বন্ধে এমার্সন্ লিখিয়াছেন যে—কোথাও মূলভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। অতএব বুঝা গেল যে, বাহা ভাল, তাহাকে লোকের কাছে উপস্থাপিত করা যায়; বাহা ভাল নহে, তাহাকে—বাক্ত না করিলেই ভাল হয়।

যে সকল পুস্তকের উপলক্ষে এত কথা বলিলাম, তাহার থানিকটা বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। তাহা দিতেছি। ভবভূতি লিখিয়াছেন—

“ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ষির্নিয়নমো-

রসাবস্তাঃ স্পর্শো বপুৰি বহলশল্লসনরসঃ।

অয়ং কঠে বাহঃ শিলিরমস্থগো মৌক্তিকসরঃ

কিমত্তা ন প্রেরো যদি পুনরসহো ন বিরহঃ।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু অমুবাদ করিয়াছেন—

“ইনি লক্ষী গৃহে মোর

নয়নের অমৃত-অঞ্জন

ও-অঙ্গ-পরশে গাজে

মাথা হয় স্নিগ্ধ চন্দন।

ওই বাহু কণ্ঠে মোর

মুক্তাহার, মনঃ-শীতল

প্রিয়ার বা সবই প্রিয়

অসহ্য সে বিরহ কেবল ।”

ইহা অতি সুন্দর অমুবাদ । মূলে ‘অজ্ঞানের’ কথা নাই; কিন্তু অমুবাদে ‘বর্ত্তি’র স্থানে ‘অজ্ঞান’ ব্যবহার করায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ অধিকতর হইয়াছে ।

কোন কোন স্থানে অমুবাদ ঠিক হয় নাই । কালিদাস লিখিয়াছেন—

“সরসিজমহাবিক্রম শৈবলেনাপি রম্যম্”—ইত্যাদি ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু অমুবাদ করিয়াছেন—

“হুচার শৈবালে ঢাকা যথা সরোজিনী”—ইত্যাদি ।

‘অমুবিক্রে’র অর্থ কি ‘ঢাকা’ ?

আরও একটু উক্ত করি । রাজা হুমন্ত দক্ষিণবাহুস্পন্দন উপলক্ষে বলিতেছেন—

“শান্তমিদমাজ্রমদং কুরতি চ বাহুঃ কুতঃ কলমিহান্ত”
ইত্যাদি ।

ইহা আশার কথা ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু লিখিতেছেন—

“প্রশান্ত আশ্রমদেশ—বাহু কেন তবে

স্পন্দন করিতে হেন ?—না জানি কি হবে ।”

ইত্যাদি ।

ইহা বে নিরাশার কথা । ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু এ সব সামান্য ভুল সংশোধন করিবেন ।

কাব্য বা নাটকের যথাযথ অমুবাদ যতটা সহজসাধ্য বলিয়া সাধারণের ধারণা আছে, বাস্তবিক তাহা তত সহজ নহে । মূলভাষার রস ও সৌন্দর্য্য বোলআনা সর্বত্র অমুবাদে রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব—তবু যতটা সম্ভব, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু তাহা করিয়াছেন, অমুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত । বঙ্গসাহিত্যে জ্যোতিবাবু ছাড়া এই দুর্লভ ব্যাপারে এরূপ কৃতকার্য্য বোধ হয় আর কেহই হইতে পারিতেন না । তিনি বঙ্গভাষার অপূর্ণ ভাঙারে এইপ্রকার “রত্নরাজি” উপহার দিয়া বঙ্গীর পাঠক-সমাজকে চিরঞ্চণী করিয়াছেন—সেজন্ত তিনি সাধারণের নিকট হইতে অবজ্ঞাই অনেক ধন্যবাদ পাইতেছেন ও পাইবেন । এক্ষণে প্রবন্ধ-শেষে আমার ব্যক্তিগত কথা এই যে, আমি তাঁহার উপহার এই অমুবাদ-গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি ও সেজন্ত তাঁহাকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতেছি,—তিনি ইহা গ্রহণ করিলে সুখী হইব ।

ত্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

সার সত্যের আলোচনা ।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ।

গত মাসের প্রবন্ধে কর্ত্তা-কর্ম্মের এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়দ্বক ঐক্য কিরূপ, তাহা প্রদর্শন করিয়া শেষে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত

হইয়াছিল এই যে, সে যে উভয়দ্বক ঐক্য, তাহা কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা, পূর্বে বাহা প্রস্তুত ছিল, তাহাই আশ্রিত হয় । এ প্রশ্নের রীতিমত মীমাংসা

করিতে হইলে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঐক্য কিরূপ, এবং সে ঐক্য বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কিরূপেই বা সংক্রামিত হয়, তাহার প্রতি বিধিমতে অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্তব্য ।

আমরা প্রত্যেকে এক-একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ; এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ক্রোড়ে করিয়া যে এক নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বর্গমর্ত্যপাতাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, তাহাই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড । কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথাসর্ব্ব সাহা কিছু আছে, সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ধার করিয়া পাওয়া । তার সাক্ষী মহুঘোর উদরভাণ্ডে যে তণ্ডুলায় রহিয়াছে, তাহা ধাতুক্লেত্রেরই তণ্ডুল ; মহুঘোর রক্তে যে জল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রেরই জল ; মহুঘোর শরীরে যে তেজ রহিয়াছে, তাহা অগ্নিরই তেজ ; মহুঘোর নাসিকাপথ দিয়া যে বায়ু যাতায়াত করিতেছে, তাহা বহিরাকাশেরই বায়ু । এ তো সকলেরই এক-প্রকার দেখা কথা ; তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন এই যে, প্রথমে পৃথিবী উচ্ছৃঙ্খল ভৌতিক শক্তিসকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল । ক্রমে পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তির উন্নত নৃত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন অগ্ন করিয়া জীবনী শক্তির উন্মেষ হইতে লাগিল । উদ্ভিদ জন্মিবার পূর্বে পৃথিবীতে শুদ্ধকেন্দ্র ভৌতিক শক্তির দল, সংক্ষেপে—ভূতের দল, দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যখন উদ্ভিদের আদিম স্তর পঙ্কশযা হইতে অগ্নে অগ্নে গাত্ৰোত্থান করিয়া জলহলের অক্সিজেন প্রদেশসকল শ্রামলচ্ছদে আবরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পরে সেই নূতন ব্যাপারটি যখন

জলের কিনারা হইতে ক্রমে ক্রমে ডাঙা বাহিয়া উঠিয়া দেশবিদেশ ব্যাপিয়া দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন পৃথিবী একবিধ শক্তির পরিবর্তে দ্বিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি, এই দুইপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল । তাহার পরে যখন উদ্ভিদশ্রেণী নানা বর্ণের ফলফুলপল্লবের বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল এবং জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি নানা জন্ত পক্ষ হইতে, অণু হইতে, জরায়ু হইতে, কালে-কালে বাহির হইয়া পালে-পালে বিচরণ করিতে লাগিল, আর, সেই সঙ্গে গিরি-গুহা-অরণ্য গর্জ্জনরবে এবং সুহিত-রবে, গহন বন ঝিল্লী-রবে, পুষ্পমঞ্জরী গুঞ্জরিত রবে, লতাকুঞ্জ কুজিত রবে, তৃণ-ভূমি হুসারবে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর হুসারবে শঙ্কায়মান হইতে লাগিল, তখন পৃথিবী দ্বিবিধ শক্তির পরিবর্তে ত্রিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি, এই তিনপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল । সর্ব্বশেষে যখন মহুঘা বাহির হইয়া প্রথমে হামাগুড়ি দিতে লাগিল, এবং ক্রমে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল এবং তাহার পরে যখন বিচারবিবেচনা এবং যুক্তি খাটাইয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন পৃথিবী ত্রিবিধ শক্তির পরিবর্তে চতুর্বিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং বীশক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র হইল । এই যে চারিপ্রকার শক্তি—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং বীশক্তি, এ

চারিপ্রকার শক্তির প্রথমে প্রথমটি একাকী, তাহার পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় যুগ বাধিয়া, তাহার পরে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘোট বাধিয়া, পৃথিবীতে যথাক্রমে পরে পরে আবির্ভূত হইল, এবং পরিশেষে যখন প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের উপরে চতুর্থ আবির্ভূত হইল, তখন সর্বপ্রকার শক্তি একত্র সমবেত হইয়া মনুষ্যশরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার শক্তি আছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—সমস্তেরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পুঞ্জীভূত হইল; কোনো প্রকারেরই সংগ্রহকার্য অবশিষ্ট রহিল না। শেষরাতে প্রত্যুষের হ'ব হ'ব সময়ে পক্ষিকুলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই দেখা কথা। সেই দিবা এবং রাত্রির সন্ধিস্থানে সূর্যের উদ্বোধনী শক্তি (অর্থাৎ ঘুমভাঙানি শক্তি) একাকী অভিব্যক্ত হয়; ছোতনাশক্তি, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার কিছুকাল পরে যখন প্রত্যুষ ফুটিয়া বাহির হয়, তখন সূর্যের উদ্বোধনী শক্তির উপরে আর-একটি শক্তি অভিব্যক্ত হয়—সেটি হ'ছে ছোতনাশক্তি। এই সময়টিতে অর্থাৎ প্রত্যুষের দিবালােকে সূর্যের দুই-প্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং দুইপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে;—উদ্বোধনী শক্তি এবং ছোতনাশক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। মধ্যাহ্নদিবালােকে সূর্যের তিনপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয়—একপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে; উদ্বোধনী শক্তি, ছোতনাশক্তি এবং তাপনী শক্তি অভিব্যক্ত হয়—দাহিকা

শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার পরে যদি প্রদাহক কাচের (Burning glassএর) মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মিকে বস্তাদির উপরে পুঞ্জীভূত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীভূত সূর্যরশ্মিতে সূর্যের সর্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হয়—উদ্বোধনী শক্তি, ছোতনাশক্তি, তাপনীশক্তি এবং দাহিকা শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি একযোগে অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তেমনি (অর্থাৎ মনুষ্যরাজ্যে তেমনি) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি, এবং ধীশক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'ছে (১) ভৌতিক শক্তির আধার—ভূতকোষ; (২) ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—উদ্ভিদকোষ; (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—পশ্বাদিকোষ; (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চতুর্বিধ শক্তির একাধার—মানবকোষ। তেমনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'ছে (১) ভৌতিক শক্তির আধার অস্থিমাংস প্রভৃতি অন্নময় কোষ; (২) ভৌতিকশক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—প্রাণময় কোষ (বলা যাইতে পারে Vegetative system); (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনীশক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—মনোময় কোষ (Animal system বা Nervous system); (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—এই চতুর্বিধ শক্তির একাধার—বিজ্ঞানময় কোষ (Brain)। ইহাই হিরণ্ময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ

হ'চ্ছে জগতের আদিম-প্রকাশ বা আদি-সূর্য্য।* তা ছাড়া, চতুর্বিধ শক্তির সামঞ্জস্যের এবং ঐক্যের একটি কেন্দ্রস্থান বা সন্ধিস্থান বা লয়স্থান বা সমাধিস্থান আছে—সেটা হ'চ্ছে আনন্দময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এইরূপ খাপে-খাপে মিল রহিয়াছে—মিল যখন রহিয়াছে, আর, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথাসর্বস্ব যাহা কিছু আছে সমস্তই যখন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, তখন, পঞ্চকোষের একত্র সমাবেশজনিত যে এক জাতুজৈবের

এবং কর্তাকর্মের উভয়দ্ব্যক ঐক্য অল্পভূত হয় ও সেই ঐক্যে ভর-দিয়া যে এক “আমি আছি” দণ্ডায়মান হয়, সেই যে উভয়দ্ব্যক ঐক্য এবং সেই যে “আমি আছি”, হুইই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্বস্বিক ঐক্য এবং সর্বব্যাপী আমি আছি হইতে আসিয়াছে—তা বই, তাহা অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয় নাই—ইহা বুদ্ধিতেই পারা যাইতেছে। এবায়ে যাহা অতীব সংক্ষেপে বলা হইল, আগামী বারে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক ভাঙিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

নারীধর্ম্ম—ধর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা প্রভৃতির কবি শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত। এ গ্রন্থখানি যে কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা গ্রন্থ-কর্ত্তার ভূমিকা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

“সংসারে রমণীগণ প্রেম-প্ৰীতির আকর-রূপ। তাঁহাদেরই স্নেহ-মমতা-পবিত্রতার সংসার শান্তিময়। এইজন্যই হিন্দুসংসারে

রমণীগণ দেবীবাৎ পূজনীয়। কিরূপে রমণীগণ নিজ নিজ কর্তব্য পালনপূর্ব্বক নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া—সংসারে অমৃতশ্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, কিরূপ নারীচরিত্রে প্রকৃত দেবীচরিত্র প্রতিভাত হইতে পারে, এই নারী-ধর্ম্মে তাহারই আলোচনা করিয়াছি।”

উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত আলোচনাই হই-
রাছে—গ্রন্থকর্ত্তা নিজে একজন শিক্ষিত

এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা ভাঙিয়া বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়; বর্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থানসম্বলান হওয়া দুর্ব্বিট। উপনিষদে আছে—“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজঃ ব্রহ্মনিদ্রলম্। তচ্ছরৎ জ্যোতিষাং জ্যোতি-শুদ্ধবদান্নবিশো বিদুঃ॥” হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ অর্থাৎ ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি—বাহাকে আশ্রয়িতারা জানেন। ইহাতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দুয়েরই হিরণ্ময় কোষে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন, যেহেতু তিনি অখণ্ড। এটাও ভাবে বলা হইয়াছে যে, হিরণ্ময় কোষ এক হিসাবে যেমন সর্বজনগতের কেন্দ্রস্থান, আর-এক হিসাবে তেমনি সর্বজনগতের পরিবাণ্ড। কলে, উহা সেইরূপ-এক অনিবন্ধনীয় জ্যোতির্মণ্ডল, বাহার উপলক্ষে পাক্‌ভাষ্যদেশীয় Augustine ষড়ি বলিয়াছেন—“whose centre is every-where but circumference nowhere” কেন্দ্র বাহার সকল স্থানেই—পরিধি বাহার কোনো স্থানেই নাই।

নবীনা—নব্যবঙ্গের রমণীর প্রতি তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বেশ সমরোপযোগীই হইয়াছে। অস্তঃপুরের উপদেশে পুরুষের মন যে সহজে বিচলিত হয়, ইহার অনেক প্রমাণ ইতিহাস ও সংসারে দেখা গিয়াছে; কিন্তু পুরুষের চেষ্টার শুদ্ধান্তের শোধন সচরাচর বড় একটা দৃষ্টিপথে পড়ে না—সেখানে গৃহিণী-কুলেরই প্রাধান্য, সুতরাং অস্তঃপুরের সংস্কার অস্তঃপুর হইতেই সহজে সম্ভব। আমাদের রমণীকুলের চরম ও স্বাভাবিক বিকাশ মাতৃষে, যে কারণেই হোক, নব্যবঙ্গের মহিলাকুলের সে মাতৃভাব ক্রমে হাস্যপ্রাপ্ত হইতেছে, কবে বা একেবারে লয় পায়, সত্তপ্ত বঙ্গসন্তানের জুড়াইবার স্থান অল্পে অল্পে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, বাঙালীর গোড়া অদৃষ্টের গুণে না জানি কবে বা তাহা একেবারে পুড়িয়া যায়। এই ছঃসময়ে সময় বুঝিয়া সরস্বতী মহাশয়া নবীনাদিগকে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত, ইহা বড় সুখের কথা—আশার কথাও বটে।

তবে এখানে একটি কথা বলিবার আছে, এ গ্রন্থে নবীনা গ্রন্থকর্ত্রীর বক্তব্যে তাঁহার মাতৃভাবটা মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় ফুটিয়াছে, যেন কিছু উপরে উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে এই দোষে একটুআধটু অশোভনও হইয়াছে, এ সকল দোষ কিন্তু অতি সামান্য। মোটের উপর এ গ্রন্থ পাঠে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি—প্রীত হইবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এতদিন কবিতার আলোচনা করিয়া যশঃসঞ্চয়ে ব্রতিনী ছিলেন—এখন তিনি সংসারধর্মের সংস্কারে মন দিয়াছেন; নিরবচ্ছিন্ন কবিতারচনা যি রমণীজীবনের চরম লক্ষ্য নহে, এবং তাহাতে যে রমণীর তৃপ্তি হয় না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন—বুঝিয়া অত্ৰকে তাহা বুঝিবার অবসর দিয়াছেন। আজকাল কবিতাসংক্রমণের দিনে কোন জীবিকবির নিকট হইতে এ শিক্ষার মূল্য অনেক অধিক বলিয়া মনে করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। অলমতি-বিস্তরণ।

হেমচন্দ্র ।

বঙ্গের কবি হেমচন্দ্র ইহধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সকলকেই সে পথে বাইতে হয়, তিনিও সেই পথে গিয়াছেন। শেবাবস্থায় তিনি বেক্লপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর অর্থ নিষ্কৃতি। শোক করিবার কথাই নহে, অথচ এই কলিকাতা-সহরে আমরা ও তাঁহার জন্ত অনেক শোক-

সভার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার অর্থ এই যে, মানুষ মানুষ বড়ই অধীন, সেইজন্ত আমরা তাঁহার জন্ত শোক করিতেছি, নতুবা যিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন, তাঁহার জন্ত শোক করিতে হয় কেন?

আমি আজ তাঁহার গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে বসি নাই; কখন যে করিব, সে

সম্ভাবনাও নাই। কেবল তাঁহাকে মনে করিয়া স্বতই বাহা আমার মনে উদয় হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি।

হেমবাবু যে বঙ্গভাষাকে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমান্ মাতেই স্বীকার করেন। তাঁহার “বৃদ্ধসংহার” ও “দশমহাবিভা”র জ্ঞান কাব্য বঙ্গভাষায় পূর্বে আর লিখিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর এই কয় দিনে এই কলিকাতাসহরে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কেবল একটি কথা কেহ আলোচনা করেন নাই। সেই কথা আমি বলিব মনে করিয়াছি।

হেমবাবুর কবিতায় আমরা তাঁহার মানসিক বিকাশের যে একটি পদ্ধতি দেখিতে পাই, আজ শুধু আমরা তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমেই ধর, তাঁহার “কবিতাবলী”। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার দৃষ্টি নিজের ভিতরেই নিবদ্ধ—কোথায় প্রতিভার পরিচয়, কোথাও বিজ্ঞার পরিচয়। তাঁহার “মদন-পারিজাত” ম্যালেঙ্কাওয়ার পোপের Eloisa to Abelard এর নকল; তাঁহার “কমল-বিলাসী” টেনিসনের Lotos-Eaters এর নকল; তাঁহার “ইন্ড্রের স্তম্ভাপান” ড্রাইডেনের Alexander’s Feast এর অনুকরণ; তাঁহার “হতাশের আক্ষেপ” এবং “কোন একটি পাখীর প্রতি” কেবল ব্যক্তিবিশেষের অন্তরের হাহাকার। ইহাতে এই বুঝিলাম যে, যে সময়ে তিনি “কবিতাবলী” প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতিভা আপনাতেই সন্নিবিষ্ট।

তাঁহার পর দেখিতে পাইবে, তাঁহার প্রতিভা ইহসংসারের ব্যাধায় নিযুক্ত। জগতে যে, শক্তিরই জয়, তাহা ত আমরা প্রতিনিয়ত

প্রত্যক্ষ করিতেছি। “বৃদ্ধসংহারে” সেই চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে।

শক্তির জয়ের, ঐতিহাসিক কালেও পরিচয় পাইয়াছি নেপোলিয়নের জীবনে, কিন্তু শক্তি কি সর্বজয়ী? বৃত্তান্তের এবং নেপোলিয়নে কোথাও ত সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধর্ম আসিয়া জুটিলেই শক্তির ধ্বংস হয়। বৃত্তান্তের এবং নেপোলিয়ন, উভয়েই জগতে শক্তিতে অজয়। অধর্মচারণে উভয়েরই ধ্বংস হইল। শেষে উভয়কেই কাঁদিতে হইয়াছে। একজনকে কাঁদিয়া বলিতে হইল—

“হা শত্ৰু, তুমিও বাম!”

আর জনকেও কাঁদিয়া বলিতে হইয়াছিল—
St. Helena was written in destiny.

চিরদিনই অধর্মে এইরূপ বিলাপ করিতে হয়। সংসারে শক্তির জয় হইবে, ইহা যেমন সত্য; অধাৰ্মিক শক্তির ক্ষয়ও তেমন সত্য। হেমবাবু তাঁহার “বৃদ্ধসংহারে” এই প্রগাঢ় নীতির অবতারণা করিয়াছেন।

তাঁহার পর দেখিতে পাই যে, হেমবাবুর প্রতিভা সংসারকেও ছাড়াইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে—তাঁহার পরিচয় “দশমহাবিভা”। প্রতিভার এইরূপ পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি, আমি আজ তাঁহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত নহি; তাঁহাকে যে হারাষ্ট্রিয়াছি, আজ সেই হৃৎপের কথাই বলিতেছি। যেমন যায়, তেমনটি আর পাওয়া যায় না, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কথা। হেমচন্দ্র তুলিয়া গেলেন; আবার কি আমরা তেমন পাইব? জগদীশ্বর জানেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

অন্নদাবাবু কথাটাকে গভীরভাবে লইয়া বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, ভাবুক হইলেও হজম করাটা চাইই ।

রমেশ নীরবে বসিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিল ।

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, আমার পরামর্শ শুনুন—অন্নদাবাবুর পিল্ খাইয়া একটু সকাল-সকাল শুইতে যান!”

রমেশ কহিল, “অন্নদাবাবুর সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ কথা আছে, সেইজন্ত আমি অপেক্ষা করিয়া আছি।”

অক্ষয় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—
“এই দেখুন, এ কথা পূর্বে বলিলেই হইত । রমেশবাবু সকল কথা পেটে রাখিয়া দেন, শেষকালে সময় যখন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন ব্যস্ত হইয়া উঠেন।”

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ নিজের জুতা-জোড়াতার প্রতি দুই নতচক্ষু বদ্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল—“অন্নদাবাবু, আপনি আমাকে আত্মীয়ের মত আপনার ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিবার অধিকার দিয়াছেন, ইহা আমি যে কত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা আপনাকে মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“বিলক্ষণ! তুমি আমাদের যোগেনের বন্ধু, তোমাকে ঘরের ছেলে বলিয়া মনে করিব না ত কি করিব?”

ভূমিকা ত হইল, তাহার পরে কি বলিতে হইবে, রমেশ কিছুতেই ভাবিয়া পায় না । রমেশের আরক্তবর্ণ মুখ দেখিয়া অন্নদাবাবু ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলেন । তিনি রমেশের পথ স্তম্ভ করিয়া দিবার

জন্ত কহিলেন—“রমেশ, তোমার মত ছেলেকে ঘরের ছেলে করিতে পারা আমারই কি কম সৌভাগ্য!”

ইহার পরেও রমেশের কথা জোগাইল না ।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“দেখ না, তোমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোক অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে । তাহারা বলে, হেমনলিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, এখন তাহার সুস্বিনীকীর্তনসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক । আমি তাহাদিগকে বলি, রমেশকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সে আমাদের উপরে কখনই অত্যাচার ব্যবহার করিতে পারিবে না ! এই সেদিন তারক আমাকে বলিতেছিল, ‘রমেশবাবু তোমাদের সঙ্গে যেরূপ মেশামেশি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া জানা উচিত—লোকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।’ আমি কহিলাম, ‘রমেশ স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলুক বা না বলুক, তাহার দ্বারা হেমনলিনীর যে লেশমাত্র অনিষ্ট হইবে না, সে আমি নিশ্চয়ই জানি।’”

রমেশ । অন্নদাবাবু, আমার সম্বন্ধে আপনি সমস্তই ত জানেন, আপনি যদি আমাকে যোগ্যপাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে—

অন্নদা । সে কথা বলাই বাহুল্য । আমরা ত একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখি—কেবল তোমার সাংসারিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে দিন স্থির করিতে পারি নাই । কিন্তু বাপু, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না । সমাজে এ লইয়া ক্রমেই নানা কথার সৃষ্টি হইতেছে—

সেটা যত শীঘ্র হয়, বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। কি বল?

রমেশ। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে। অবশ্য সর্বপ্রথমে আপনার কন্ঠার মত জানা আবশ্যক।

অন্নদা। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু সে একপ্রকার জানাই আছে। তবু কাল সকালেই সে কথাটা পাকা করিয়া লইব।

রমেশ। আপনার গুহিতে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, আজ তবে আসি।

অন্নদা। একটু দাঁড়াও। আমি বলি কি, আমরা জব্বলপুরে যাইবার আগেই তোমাদের বিবাহটা হইয়া গেলে ভাল হয়।

রমেশ। সে ত আর বেশি দেরি নাই।

অন্নদা। না, এখনো দিনদশেক আছে। অঙ্গামী রবিবারে যদি তোমাদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পরেও যাত্রার আয়োজনের জন্ত ছুতিনদিন সময় পাওয়া যাইবে। বুঝিয়াছ রমেশ, এত তাড়া করিতাম না,—কিন্তু আমার শরীরের জন্তই ভাবনা। অঙ্গকাল পিল্টা খাইয়া কিছু ভাল আছি, কিন্তু বলা ত যায় না। আমি যদি পড়ি, তাহা হইলে বন্দোবস্ত সমস্তই গোল হইয়া যাইবে—কেবল এক অক্ষয় ছাড়া আমাকে সাহায্য করিবার লোক আর কেহ নাই।

রমেশ সম্মত হইল এবং আর-একটা পিল গিলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

১৪

বিবাহপরিণামটা এতদিন অক্ষুট আকারে ছিল। অবশ্য হেমনলিনীকে বিবাহ করিতে তাহার ধর্মসঙ্গত কোন বাধা নাই, এক কথা মনের মধ্যে নিশ্চয় করিয়াই রমেশ এমন

নিশ্চিতভাবে ভালবাসার টানে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। বিবাহের প্রস্তাবটা যখনি স্পষ্ট হইল, তখনি নানা কর্তব্যাকর্তব্যের কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। আর একবার কমলাসম্বন্ধে ভাল করিয়া মনোযোগ করিবার সময় আসিল। কিন্তু সময় অত্যন্ত অল্প।

বিছালয়ের ছুটি নিকটবর্তী। ছুটির সময়ে কমলাকে বিছালয়েই রাখিবার জন্ত রমেশ কত্রীর সহিত পূর্বেই ঠিক করিয়াছিল।

রমেশ প্রত্যুষে উঠিয়া ময়দানের নির্জন রাস্তায় পদচারণা করিতে করিতে স্থির করিল, বিবাহের পর সে কমলাসম্বন্ধে হেমনলিনীকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিস্তারিত করিয়া বলিবে। তাহার পরে কমলাকেও সমস্ত কথা বলিবার অবকাশ হইবে। এইরূপ সকল পক্ষে বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা স্বচ্ছন্দে বন্ধুভাবে হেমনলিনীর সঙ্গেই বাস করিতে পারিবে। দেশে ইহা লইয়া নানা কথা উঠিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া সে হাজারিবাগে গিয়া প্র্যাক্টিস করিবে স্থির করিয়াছে।

ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ী গেল। সিঁড়িতে হঠাৎ হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা হইল। অশ্রুদিন হইলে এরূপ সাক্ষাতে একটু-কিছু অলাপ হইত। আজ হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল,—সেই রক্তিমার মধ্য দিয়া একটা হাসির আভা উদার আলোকের মত দীপ্তি পাইল—হেমনলিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ নীচু করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। হেমনলিনীর এই লজ্জিত আনন্দের নীরব রশ্মি-অভিঘাতে রমেশের সমস্ত হৃদয় পুলকে কাঁপিতে লাগিল।

তাহার সকল হুচিন্তা কুরাশার মত কাটিয়া গেল । পৃথিবীতে কিছুই জগুই যে কোন প্রকার ভয়ভাবনা হইতে পারে, তাহা তাহার মনেই হইল না । যাহাকে কিছুক্ষণ পূর্বে হিমালয় মনে হইয়াছিল, সে তাহার পায়ে কাছ দেথিতে দেথিতে মেঘের মত হাঙ্গা হইয়া গেল—তাহার জীবনপথের সম্মুখে সমস্তই সহজ, সুন্দর, সুমঙ্গল বলিয়া বোধ হইল । সে চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, “হে মহাসুন্দর নিখিল বিশ্ব, আমি আপনাকে নিঃশেষে তোমার কাছে উৎসর্গ করিলাম ।” আর সেই লজ্জিত পুলকিত মুখচ্ছবি বারবার স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল—“পৃথিবীর মাটির উপর দিয়া তোমাকে কেন চলিতে হয়—তোমার চলিবার পথে আমি আমার হৃদয় বিছাইয়া দিতে চাই ! তোমার প্রত্যেক পদক্ষেপ আমার ভালবাসার মধ্যে অম্লভব করিলে তবে আমি কৃতার্থ হইতে পারি !”

রমেশ যে গৎটা হেমনলিনীর কাছ হইতে হার্মোনিয়মে শিখিয়াছিল, বাসায় গিয়া সেইটে খুব করিয়া বাজাইতে লাগিল । কিন্তু একটীমাত্র গং সমস্তদিন বাজানো চলে না । কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিল—মনে হইল, তাহার ভালবাসার সুর যে সুদূর উচ্চে উঠিতেছে, কোনো কবিতা সে পর্য্যন্ত নাগাল পাইতেছে না ।

আর হেমনলিনী অশ্রান্ত আনন্দের সহিত তাহার গৃহকর্ম সমস্ত সারিয়া নিভৃত দ্বিপ্রহরে শয়নঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সেলাইটি লইয়া বসিয়াছে । সুখের উপরে একটি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার শান্তি । একটি সর্বাঙ্গীণ

সার্থকতা তাহাকে জননীর মত স্নিগ্ধবাহুপাশে বেঁধন করিয়া রহিয়াছে—আজ তাহার অন্তরে-বাহিরে কোথাও কিছুমাত্র শূন্যতা নাই, তাহার আনন্দের মধ্যে কোথাও অবকাশ নাই । ইতিপূর্বে, কখন রমেশ আসিবে, কখন চায়ের সময় হইবে, কখন ছাদে যাইবে, ইহা লইয়া হেমনলিনীর চিন্ত সমস্তদিন উৎসুক হইয়া থাকিত, আজ তাহার আর সে চঞ্চলতা নাই । আজ তাহার আর ভিক্ষুক-ভাব নহে—তাহার হৃদয়ের শেষসীমা পর্য্যন্ত ভরিয়া আজ সুখা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—প্রেমের যজ্ঞে প্রিয়জনের হস্তে তাহা সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার জন্ত সে আজ একান্তমনে অর্ঘ্যধারিণী পূজার্থিনীর মত নীরবে অপেক্ষা করিয়া আছে ।

চায়ের সময়ের পূর্বেই কবিতার বই এবং হার্মোনিয়ম ফেলিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল । অতদিন হেমনলিনীর সহিত দেখা হইতে বড় বিলম্ব হইত না । কিন্তু আজ চায়ের ঘরে দেখিল সে ঘর শূন্য, দোতলায় বসিবার ঘরে দেখিল সে ঘরও শূন্য, হেমনলিনী এখনো তাহার শয়নগৃহ ছাড়িয়া নামে নাই ।

অন্নদাবাবু যথাসময়ে আসিয়া টেবিলে অধিকার করিয়া বসিলেন, এবং নানা বিষয়ে, বিশেষত স্বাস্থ্যতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ সুদীর্ঘ আলোচনা করিতে লাগিলেন । রমেশ নিরীহের মত কদাচিৎ তাহার ছুটা-একটা উত্তর দিল এবং ক্ষণে ক্ষণে চকিতভাবে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ।

পদশব্দ হইল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিল অক্ষয় । যথেষ্ট হুত্বতা দেখাইয়া কহিল—

“এই যে রমেশবাবু, আমি আপনার বাসাতেই গিয়াছিলাম ।”

শুনিয়াই রমেশের মুখে উষ্মেগের ছায়া পড়িল ।

অক্ষয় হাসিয়া কহিল—“ভয় কিসের রমেশবাবু? আপনাকে আক্রমণ করিতে যাই নাই । শুভসংবাদে অভিনন্দন প্রকাশ করা বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য—তাহাই পালন করিতে গিয়াছিলাম ।”

এই কথায় অন্নদাবাবুর মনে পড়িল, হেমনলিনী উপস্থিত নাই । হেমনলিনীকে ডাক দিলেন—উত্তর না পাইয়া তিনি নিজে উপরে গিয়া কহিলেন, “হেম, একি, এখনো সেলাই লইয়া বসিয়া আছ? চা তৈরি যে! রমেশ-অক্ষয় আসিয়াছে ।”

হেমনলিনী মুখ ঈষৎ লাল করিয়া কহিল, “বাবা, আমার চা উপরে পাঠাইয়া দাও—আজ আমি সেলাইটা শেষ করিতে চাই ।”

অন্নদা । ঐ তোমার দোষ হেম! যখন যেটা লইয়া পড়, তখন আর-কিছুই থেয়াল কর না । যখন পড়া লইয়া ছিলে, তখন বই কোল হইতে নামিত না—এখন শেলাই লইয়া পড়িয়াছ, এখন আর-সমস্তই বন্ধ! না না, সে হইবে না—চল, নীচে গিয়া চা খাইবে চল !

এই বলিয়া অন্নদাবাবু জোর করিয়াই হেমনলিনীকে নীচে লইয়া আসিলেন । সে আসিয়াই কাহারো দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাড়াতাড়ি চা ঢালিবার ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল !

অন্নদাবাবু অধীর হইয়া কহিলেন, “হেম, ওকি করিতেছ? আমার পেয়ালায় চিনি

দিতেছ কেন? আমি ত কোনোকালেই চিনি দিয়া চা খাই না ।”

অক্ষয় টিপিটিপি হাসিয়া কহিল—“আজ উনি ওদার্য্য ~~অন্নদা~~ করিতে পারিতেছেন না—আজ সকলকেই মিষ্ট বিতরণ করিবেন ।”

হেমনলিনীর প্রতি এই প্রচ্ছন্ন বিক্রপ রমেশের মনে মনে অসহ্য হইল । সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিল—“আর যাই হউক, বিবাহের পরে অক্ষয়ের সহিত কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না ।”

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, আপনার নামটা বদলাইয়া ফেলুন ।”

রমেশ এই রসিকতার চেষ্টায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিল—“কেন বলুন দেখি?”

অক্ষয় খবরের কাগজ খুলিয়া কহিল—“এই দেখুন, আপনার নামের একজন ছাত্র অল্পলোককে নিজের নামে চালাইয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া পাস্ হইয়াছিল—হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে ।”

হেমনলিনী জানে, রমেশ মুখের উপর উত্তর দিতে পারে না—সেইজন্য এতকাল অক্ষয় রমেশকে যত আঘাত করিয়াছে, সে-ই তাহার প্রতিঘাত দিয়া আসিয়াছে । আজও থাকিতে পারিল না । গৃঢ় ক্রোধের লক্ষণ চাপিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—“অক্ষয় বলিয়া ঢের লোক বোধ হয় জেলখানায় আছে ।”

অক্ষয় কহিল, “ঐ দেখুন, বন্ধুভাবে সং-পরামর্শ দিতে গেলে আপনারা রাগ করেন । তবে সমস্ত ইতিহাসটা বলি । আপনি ত জানেন, আমার ছোট বোন শরৎ বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে যায় । সে কাল সন্ধ্যায়

সময় আসিয়া কহিল—“দাদা, তোমাদের রমেশবাবুর জী আমাদের ইঙ্কলে পড়েন ।”

“আমি বলিলাম, ‘দূর পাগলি ! আমাদের রমেশবাবু ছাড়া কি আর দ্বিতীয় রমেশবাবু জগতে নাই !’ শরৎ কহিল, ‘তা যেই হোন, তিনি তাঁর জীর উপরে ভারি অস্ত্রায় করিতেছেন । ছুটিতে প্রায় সব মেয়েই বাড়ী যাইতেছে,—তিনি তাঁর জীকে বোর্ডিঙে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন । সে বেচারী কাদিয়া-কাটিয়া অনর্থপাত করিতেছে ।’ আমি তখন মনে মনে কহিলাম, ‘এ ত ভাল কথা নহে, শরৎ যেমন ভুল করিয়াছিল, এমন ভুল আরো ত কেহ কেহ করিতে পারে !’”

অন্নদাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—“অক্ষয়, তুমি কী পাগলের মত কথা কহিতেছ ! কোন্ রমেশের জী ইঙ্কলে পড়িয়া কাদিতেছে বলিয়া আমাদের রমেশ নাম বদলাইবে নাকি ?”

এমন সময়ে হঠাৎ বিবর্ণমুখে রমেশ ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল । অক্ষয় বলিয়া উঠিল, “ওকি রমেশবাবু, আপনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন নাকি ? দেখুন দেখি, আপনি কি মনে করেন আপনাকে আমি সন্দেহ করিতেছি ?”—বলিয়া রমেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল ।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“একি ক'ণ্ড !”

হেমলিনী কাদিয়া ফেলিল । অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “ওকি হেম, কাদিস্ কেন ?”

সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “বাবা, অক্ষয়বাবুর ভারি অস্ত্রায় ! কেন উনি আমাদের বাড়ীতে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপমান করেন ?”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“অক্ষয় ঠাট্টা করিয়া একটা কি বলিয়াছে, ইহাতে এত অস্থির হইবার কি দরকার ছিল ?”

“এরকম ঠাট্টা অসহ !”—বলিয়া দ্রুতপদে হেমলিনী উপরে চলিয়া গেল ।

এইবার কলিকাতায় আসার পর রমেশ বিশেষ যত্নের সহিত কমলার স্বামীর সন্ধান করিতেছিল । বহুকষ্টে, ধোবাপুকুরটা কোন্ জায়গায়, তাহা বাহির করিয়া কমলার মামা তারিণীচরণকে এক পত্র লিখিয়া-ছিল ।

রমেশ আজ প্রাতঃকালে সেই পত্রের জবাব পাইয়াছে । তারিণীচরণ লিখিতেছেন—‘দুর্ঘটনার পরে তাঁহার জামাতা ভ্রাতৃমান্ নলিনাক্ষের কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই । রংপুরে তিনি ডাক্তারি করিতেন—সেখানে চিঠি লিখিয়া তারিণীচরণ জানিয়াছেন, সেখানেও কেহ আজ পর্যন্ত তাঁহার কোন খবর পায় নাই । তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, তাহা তারিণীচরণের জানা নাই ।’

কমলার স্বামী নলিনাক্ষ যে বাঁচিয়া আছেন, এ আশা আজ রমেশের মন হইতে একেবারে দূর হইল । কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তারিণীচরণকে সংবাদ দিতেন এবং সেখানে তাঁহার জীর সম্বন্ধে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতেন ।

সকালে রমেশের হাতে আরো অনেক-গুলি চিঠি আসিয়া পড়িল । বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার আলাপী পরিচিত অনেকে তাহাকে অভিনন্দনপত্র লিখিয়াছে । কেহ বা আহাের দাবী জানাইয়াছে, কেহ বা, এতদিন সমস্ত ব্যাপারটা সে গোপন রাখি-

রাছে বলিয়া রমেশকে সকৌতুক তিরস্কার করিয়াছে।

কিন্তু রমেশের ভারাক্রান্ত মনে এই চিঠি-শুলা আরো ভার বাড়াইতে লাগিল। যে ফাঁস তাহার গলায় জড়াইয়াছে, অল্পেতেই তাহাতে টান পড়িতেছে এবং বেদনার রমেশ চকিত হইয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে অন্নদাবাবুর বাড়ী হইতে চাকর একখানি চিঠি লইয়া রমেশের হাতে দিল। হাতের অক্ষর দেখিয়া রমেশের বুকের ভিতরটা ছুলিয়া উঠিল।

‘হেমনলিনীর চিঠি। রমেশ মনে করিল, ‘অক্ষয়ের কথা শুনিয়া হেমনলিনীর মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং তাহাই দূর করিবার জন্ত সে রমেশকে পত্র লিখিয়াছে।’

চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কেবল এই ক’টি কথা লেখা আছে—

“অক্ষয়বাবু কাল আপনার উপর ভারি অজ্ঞার করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, আজ সকালেই আপনি আসিবেন, কেন আসিলেন না? অক্ষয়বাবুর কথা কেন আপনি এত করিয়া মনে লইতেছেন? আপনি ত জানেন, আমি তাঁর কথা গ্রাহ্যই করি না। আপনি আজ সকাল-সকাল আসিবেন—আমি আজ সেলাই ফেলিয়া রাখিব।”

এই ক’টি কথার মধ্যে হেমনলিনীর সান্ত্বনাস্বরূপ কোমল হৃদয়ের ব্যথা অসুভব করিয়া রমেশের চোখে জল আসিল। রমেশ কুণ্ডিল, কাল হইতেই হেমনলিনী রমেশের বেদনা শান্ত করিবার জন্ত তাহার সমস্ত অশ্রু-সিক্ত ভালবাসা লইয়া ব্যগ্রহৃদয়ে প্রতীক্ষা

করিয়া আছে। এমনি করিয়া রাত গিয়াছে, এমনি করিয়া সকালটা কাটিয়াছে, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এই চিঠিখানি লিখিয়াছে।

রমেশ কাল হইতে ভাবিতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া এইবার হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু কল্যাকার ব্যাপারের পর বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন ঠিক শুনাইবে, যেন অপরাধ ধরা পড়িয়া জবাবদিহির চেষ্টা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, অক্ষয়ের যে কতকটা জয় হইবে, সে-ও অসহ্য। সকলে যে বলিবে, তাই ত, অক্ষয়কে ত নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না—রমেশের পক্ষে সেটা বড় কঠিন।

রমেশ ভাবিতে লাগিল, “কমলার স্বামী যে আর-কোন রমেশ, নিশ্চয়ই অক্ষয়ের মনে সেই ধারণাই আছে—নহিলে সে এতক্ষণে কেবল ইঙ্গিত করিয়া থামিয়া থাকিত না, পাড়ান্নু গোল করিয়া বেড়াইত। অতএব এই বেলা যাহা-হয়-একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার।”

উপায় কি করা যায়, ভাবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর বাড়ীতে একটি পরিচিত ভৈরবীস্বর হাশ্বোনিয়মে বার্জিতে আরম্ভ করিল। হেমনলিনী জানে যে, এই ভৈরবী রমেশের প্রিয় রাগিনী। এই রাগিনীর পাখা মেলিয়া দিয়া বিরহিণী আপনার হৃদয়টিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া কোথায় কাহার কাছে কি সংবাদ লইতে একলা পাঠাইয়া দিল? কোথায় তাহার নীড়, কোথায় তাহার সাথী, কাহার অভাবে সমস্ত বিষের

জনতার মধ্যে সে একাকী ! হার রমেশ, এমন
সুরে পৃথিবীতে বাহাকে কেহ ডাকিতে পারে,
তাহার কিসের চিন্তা, কিসের বাধা !

রমেশ এই সুর শুনিয়া শুক হইয়া বসিল ।
তাহার মনে হইতে লাগিল, জগৎটি যেন
অত্যন্ত নিভৃত—ইহার মধ্যে কেবল একটি
ভালবাসা আছে ; রাজার রাজ্য নাই,
জীবিকার সংগ্রাম নাই, হুংখীর ছরাশা নাই ।
সুন্দর শরতের দিন, সুধাময় নির্মল নীলা-
কাশ, পরিপূর্ণ জীবন, ভালবাসা স্তম্ভুর !
অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আর-কিছু থাকিবার আর
কোন দরকার নাই ! থাক্ কেবল একটিমাত্র
অবাধ অবকাশ,—তাহা অনন্ত, তাহা অখণ্ড,
—তাহা কেবল ভালবাসিবার । তাহার
কপালে সোনার রৌদ্রালোক, গলায় শেফা-
লীর মালা, কানে দূরাগত ভৈরবীর
তান ।

এমন-সময় আর-একটা ডাকের চিঠি
আসিল । রমেশ খুলিয়া দেখিল, সে চিঠি
দ্বীবিভাগায়ের কর্তার নিকট হইতে আসি-
য়াছে । তিনি লিখিয়াছেন, কমলা অত্যন্ত
কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এ অবস্থায়
ছুটির সময় বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে রাখা তিনি
সঙ্গত বোধ করেন না । আগামী শনিবারে
ইঙ্কল হইয়া ছুটি হইবে, সেই সময়ে তাহাকে
বিদ্যালয় হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা
করা নিতান্ত আবশ্যক ।

আগামী শনিবারে কমলাকে বিদ্যালয়
হইতে লইয়া আসিতে হইবে ! আগামী
রবিবারে রমেশের বিবাহ !

যে ভৈরবী জগতের সমস্ত বিপুল চেষ্টা-
চিন্তা-কর্ম আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই

ভৈরবী এক মুহূর্তে ঢাকা পড়িয়া গেল ।
তাহার সুর আর কানে পৌছিল না ।

“রমেশবাবু, আমাকে মাপ করিতে
হইবে” এই বলিয়া অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ
করিল । কহিল, “এমন একটা সামান্য ঠাট্টায়
আপনি যে এত রাগ করিবেন, তাহা আগে
জানিলে আমি ও কথা তুলিতাম না ! ঠাট্টার
মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেই লোকে চটিয়া
ওঠে, কিন্তু যাহা একেবারে অমূলক, তাহা
লইয়া আপনি সকলের সাক্ষাতে এত রাগা-
রাগি করিলেন কেন ? অন্নদাবাবুত কাল হইতে
আমাকে ভৎসনা করিতেছেন—হেমলিনী
আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছেন । আজ
সকালে তাঁহাদের ওখানে গিয়াছিলাম,
তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন । আমি
এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম বলুন দেখি ?”

রমেশ কহিল—“এ সমস্ত বিচার যথাসময়ে
হইবে । এখন আমাকে মাপ করিবেন—
আমার বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে ।”

অক্ষয় । রত্নচৌকির বায়না দিতে
চলিয়াছেন বৃষ্টি । এদিকে সময় সংক্ষেপ ।
আমি আপনার শুভকর্মে বাধা দিব না,
চলিলাম ।

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ অন্নদাবাবুর
বাগায় গিয়া উপস্থিত হইল । ঘরে ঢুকিতেই
হেমলিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল ।
আজ রমেশ সকাল-সকাল আসিবে, ইহা
হেমলিনী নিশ্চয় ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইয়া
বসিয়া ছিল । তাহার সেলাইয়ের ব্যাপারটি
জাজ করিয়া কুমারী বাথিয়া টেবিলের উপরে
রাখিয়া দিয়াছিল । পাশে হার্মোনিয়ম-যন্ত্রটি
ছিল । আজ খানিকটা সঙ্গীত-আলোচনা

হইতে পারিবে, এইরূপ ভাষার আশা ছিল,
তা ছাড়া অব্যক্ত সঙ্গীত ত আছেই !

রমেশ ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর মুখে
একটি উজ্জল-কোমল আভা পড়িল। কিন্তু
সে আভা মুহূর্তেই ম্লান হইয়া গেল যখন
রমেশ আর-কোন কথা না বলিয়া প্রথমেই
জিজ্ঞাসা করিল—“অন্নদাবাবু কোথায় ?”

হেমনলিনী উত্তর করিল—“বাবা তাঁহার
বসিবার ঘরে আছেন। কেন ? তাঁহাকে
কি এখনি প্রয়োজন আছে ? তিনি ত সেই
চা খাইবার সময় নামিয়া আসিবেন।”

রমেশ। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন
আছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

হেমনলিনী। তবে বান্, তিনি ঘরেই
আছেন।

রমেশ চলিয়া গেল। প্রয়োজন আছে !
প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছুই নাই ! সংসারে
প্রয়োজনেরই কেবল সবুর নয় না ! আর
ভালবাসাকেই ঘরের বাহিরে অবকাশ
প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

শরতের এই অম্লান দিন যেন নিখাস
ফেলিয়া আপন আনন্দভাণ্ডারের সোনার
সিংহদ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল। হেমনলিনী
হার্শোনিয়মের নিকট হইতে চোঁকি সরাইয়া
লইয়া টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে সেলাই
করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছুঁচ ফুটিতে লাগিল
কেবল বাহিরে নহে, ভিতরেও। রমেশের
প্রয়োজনও শীঘ্র শেষ হইল না। প্রয়োজন
রাজার মত আপনার পূরা সময় নয়—আর
ভালবাসা কাঙাল !

ক্রমশ ।

চিঠি ।

না জানি কারে দেখিয়াছি,

দেখেছি কার মুখ !

প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি !

পেয়েছি এই স্মৃতি আছে,

পেয়েছি এই স্মৃতি !

কারেও আমি দেখাবনাক সেটি !

লিখন আমি নাহি জানি,

বুঝি না কি যে আছে বাণী,

যা আছে থাক্ আমারি থাক্ তাহা !

পেয়েছি এই স্মৃতি আজি

পবনে উঠে বেণু বাজি,

পেয়েছি স্মৃতি পরাণ গাহে আহা !

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
 শুনেছি নাকি তিনি
 পড়িয়া দেন লিখন নানামত !
 যাব না আমি তাঁর কাছে,
 তাঁহারে নাহি চিনি,
 থাকুন ল'য়ে পুরাণো পুঁথি যত !
 শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
 বুঝেন কি না বুঝিব কিসে !
 ধন্দ ল'য়ে পড়িব মহাগোলে !
 তাহার চেয়ে এ লিপিবানি
 সাথায় কভু রাখিব আমি
 যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে !

রজনী যবে আঁধারিয়া
 আসিবে চারিধারে
 গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা,
 ধরিব লিপি প্রসারিয়া
 বসিয়া গৃহদ্বারে
 পুলকে র'ব হ'য়ে পলকহারা !
 তখন নদী চলিবে বাহি'
 যা আছে লেখা তাহাই গাহি',
 লিপির গান গাবে বনের পাঁতা !
 আকাশ হ'তে সপ্তর্ষি
 গাহিবে ভেদি' গহন নিশি
 গভীর তানে গোপন এই গাথা !

বুঝি না বুঝি খেদ কিবা,
 র'ব অবোধসম !
 পেয়েছি যাহা কে ল'বে তাহা কাজি' !
 রয়েছে যাহা নিশিদিবা
 রহিবে তাহা মম,
 বৃকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি' !

খুঁজিতে গিয়া বুধা খুঁজি,
 বুঝিতে গিয়া ভুল বুঝি,
 ঘুরিতে গিয়া কাছেই করি দূর !
 না-বোঝা মোর লিপিখানি
 প্রাণের বোঝা দিল টানি,
 সকল গানে লাগিয়ে দিল হার !

লক্ষ্মণ ।

বাল্যকালে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের “প্রাণ ইবাং পরঃ”—অপর প্রাণের ছায়া । ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রামচিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ ।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্বকর্তৃকটা মৌন এবং ছায়ার ছায়া অল্পগামী । লক্ষ্মণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না ; বাধ্য হইয়া হই-এক স্থলে তিনি ইঙ্গিত-মাত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপরিণীত রামপ্রেম মৌন-ভাবেই আমাদের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে ।

ভরত এবং সীতা মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন না ; কিন্তু লক্ষ্মণ স্নেহ-সম্বন্ধে সংযমী—সে স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ তাহা আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই ; এই মৌন স্নেহচিত্র আমাদের নিকট সর্বত্র ব্যক্ত

কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃত্বকর্তৃক অশেষ কথা জানাই-তেছে ।

লক্ষ্মণ আজন্ম রামচন্দ্রের ছায়ার ছায়া অল্পগামী । “ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ । যুগ্মমুপানীতমন্ত্রাতি ন হি তং বিনা ॥” রামের কাছে না গুইলে তাঁহার রাতে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হয় না । “যদা হি হয়মাক্রোদো যুগ্ময়াং বাতি রাঘবঃ । অথৈনং পৃষ্ঠতোহভ্যোতি সধনুঃ পরিপালয়ন ॥” রাম যখন অস্বাস্থ্যবশতঃ যুগ্ময়াং যাত্রা করেন, অমনি ধনুহস্তে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অশ্বচর তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে থাকেন । যেদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষস-বধকালে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সেদিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে । শৈশবদৃষ্টা-বলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আশ্চর্য্যের লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্বকর্তৃক ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সন্তোষপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহলাদসূচক কথা নাই, নীরবে

রামের ছায়ার স্থায় লক্ষণ পশ্চাৎ। কিন্তু রাম স্বল্পভাবী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাদে সুখী হইয়া সর্বপ্রথমেই লক্ষণের কর্ণলগ্ন হইয়া বলিলেন, “জীবিতকালি রাজ্যে স্বদর্শমভিকাময়ে”—আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্তই কামনা করি। ভ্রাতার এইরূপ দুইএকটি কথাই লক্ষণের অপূর্ণ স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনায়নে দেখিতে পাই, রামের এই স্নিগ্ধ আদরে “স্ববর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গণ্ডস্থল নীরব প্রকল্লিতায় রক্তিমাত হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু এই মৌন স্বল্পভাবী যুবক, রামের প্রতি কেহ অশ্রায় করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যেদিন কৈকয়ী অভিষেকব্রতোজ্জল প্রকল্লিত রামচন্দ্রকে মৃত্যু-তুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মৃতি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, তিনি ধ্বিৎ নিলিণ্ডভাবে গুরুতর বনবাসাজ্ঞা মাধ্যম তুলিয়া লইলেন, অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, সেইদিন সেই উৎকট মুহূর্ত্তেও তাঁহার আর-কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাত্তাপে চিরস্বপ্নে ভক্ত স্মৃণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাগ্মীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌনচিত্রটি আঁকিয়াছেন—

“তং বাস্পপরিপূর্ণাঙ্কঃ পৃষ্ঠতোঃস্থগণাম হ ।

লক্ষণঃ পরমকৃষ্ণঃ হসিতোদনস্বৰ্ণবর্নঃ ।”

লক্ষণ—অতিমাত্র জুঁক হইয়া বাস্পপূর্ণচন্দ্রে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এই অশ্রায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র বাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিত-

চিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাধিতগুণ করিয়াছিলেন, জুঁক হইয়া তিনি সমস্ত অধোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই—এই গর্হিত আদেশ-পালন ধর্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অধিমূর্ত্তি যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই বনবাসে যাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্ণ কোমলতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল; তিনি বালকের স্থায় রামের পদযুগ্মে লুপ্তিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন—“ঐশ্বর্য্যকালি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।” অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আমি তোমা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না। রামের পাদপীড়নপূর্ব্বক উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধূটির স্থায় সেই ক্ষাত্তভোজোদীপিত মৃতি ফুলসম স্নকোমল হইয়া সঙ্গে যাইবার অমুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষা স্নেহসূচক দীর্ঘ বক্তৃত্যয় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্ত অমুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহগভীর আশ্রয়ত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, “প্রাণসম প্রিয়,” “বশ্চ,” “সখা” প্রভৃতি স্নেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সঙ্কষ্ট করিয়া বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষণ দুই- একটি দৃঢ়কথার তাঁহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, “আপনি শৈশব হইতে আমার

নিকট প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম-সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন ?”

লক্ষণ সঙ্গে চলিলেন । এই আশ্চর্য্যাগী দেবতার জন্ত কেহ বিলাপ করিল না । যেদিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্ত দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেদিন “উনষোড়শবর্ষে মে রামো রাজীবলোচনঃ ” বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটি রাজীবলোচন যে ছরস্তরাক্ষসবধকালে জাতার অমুবর্তী হইয়া চলিলেন, তজ্জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই । আজ রাম-লক্ষণ-সীতা বনে চলিয়াছেন, অযোধ্যার যত নয়নাশ্রু, তাহা রহিয়া রহিয়া রামসীতার জন্ত বর্ষিত হইতেছে । সীতার পাদপদ্মের অলঙ্কররাগ মুছিয়া যাইবে, তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবে, মহার্ষশরনোচিত রামচন্দ্র বৃক্ষমূলে পাংশুশয্যা শুইয়া মত্ত-মাতঙ্গের শ্রায় ধূলিলুপ্তিতদেহে প্রাতে গাত্রোখান করিবেন, যিনি বন্দিগণের সুশ্রাব্য-গীতিমুখের গগনস্পর্শী প্রাসাদে বাস করিতে অভ্যস্ত, তিনি কেমন করিয়া চীরবাস পরিয়া বনে বনে তরুতল খুঁজিয়া বেড়াইবেন—এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশল্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যাবাসী প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল । প্রজাগণ রথের চক্র ধরিয়া স্তম্ভকে বলিয়াছিল—“সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ স্তম্ভং বাহি শনৈঃ শনৈঃ । মুখং ত্র্যক্ষ্যামো রামস্ত হৃদ্পন্নো ভবিষ্যতি ॥” “সারথি, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চল, আমরা রামের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, আর আমরা উহা

সহজে দেখিতে পাইব না ।” কিন্তু লক্ষণের জন্ত কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলয় হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ মেহার্জ-কণ্ঠে লক্ষণকে বলিয়াছিলেন—

“রামঃ দশরথঃ বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকান্নজাম্ ।

অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাহুতম্ ॥”

‘যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও—রামকে দশরথের শ্রায় দেখিও, সীতাকে আমার শ্রায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও ।’ মাতার চকুর অশ্রুবিন্দু লক্ষণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা তাঁহাকে যেন কর্তব্যপালনের জন্ত আগ্রহসহকারে ঘরাশ্রিত করিয়া দিলেন—“সুমিত্রা গচ্ছ পচ্ছেতি পুনঃপুনরুবাচ তম্ ॥” সুমিত্রা তাঁহাকে পুনঃপুন “যাও যাও” এই কথা বলিতে লাগিলেন ।

মৌন সন্ন্যাসী আশ্রীয স্তম্ভবর্ণের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্ত যে শোকাচ্ছাদ, তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন । তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাঁহার নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ।

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আচ্ছাদ সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন । গিরিসান্ন-দেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজি হইতে কুসুম-চয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুস্তলে পরাইতেন ; গৈরিকরেণু দ্বারা সীতার স্তম্ভের ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন ; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীনীরে

অবগাহন করিতেন, কিংবা গোলাবরী-
তীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মত্তক রক্ষা
করিয়া স্নুখে নিদ্রা যাইতেন ; আর এদিকে
মৌন সন্ন্যাসী খনিজ দ্বারা মৃত্তিকা খনন
করিয়া পর্ণশালা নির্মাণ করিতেন, কখনও
পরশুহস্তে শালশাখা কর্তন করিতেন, কখনও
অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে
পূর্ণ বিপুল বংশপেটিকা হস্তে লইয়া এক
স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও
বা মহিষ ও বৃষের ক্রীড় সংগ্রহ করিয়া
অগ্নি জ্বালিবার বন্দোবস্ত করিতেন । একদিন
দেখিতে পাই, শীতকালের তুষারমলিন
জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বন-
পন্থায় নালশেষ-নলিনী-শোভিত সরসীতে
কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন । অশ্রু
একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্বতের
পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটি
চিল্লিত করিবার জন্ত তিনি পথে পথে উচ্চ
তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন ।
এই সংযমী স্নেহবীর ব্রাহ্মসেবায় তাঁহার
নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন । রামচন্দ্র
পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়া-
ছিলেন—“এই সুলভ তরুস্বাক্ষিপূর্ণ প্রদেশে
পর্ণশালাগচনার জন্ত একটি স্থান খুঁজিয়া
বাহির করিয়া লও ।” লক্ষ্মণ বলিলেন, “আপনি
যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন,
সেবকের উপর নির্বাকচেনের ভার দিবেন না ।”
প্রভুসেবায় এক্ষণ আত্মহারা ভূত্যা,—এমন
আর কোথায় দেখিয়াছেন । রামচন্দ্র স্থান
নির্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির সমতা
সম্পাদন করিয়া খনিজহস্তে মৃত্তিকাখননে
প্রবৃত্ত হইলেন ।

আর-এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে,—গভীর
অরণ্যে চারিদিকে কৃষ্ণসর্প বিচরণ করি-
তেছে, পথহার্য বিপন্ন পথিকতরু রাত্রিবাসের
জন্ত জঙ্গলের নিভৃত্তে বৃক্ষনিম্নে শুইয়া
আছেন, সীতার বদনশ্রী অনশন ও পর্য্য-
টনে একটু হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে । রাম-
চন্দ্রের এই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য
হইল, তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া
যাইবার জন্ত বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে
লাগিলেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই
হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, শোকের অবস্থায়
সাম্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন
করিও ।” লক্ষ্মণ স্বীয়-স্নেহ-সম্বন্ধে বেশী কথা
কহিতে জানিতেন না, রামের এবং বিধ কাত-
রোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

“ন হি তাতঃ ন শত্রুয়ং ন হুমিত্রাঃ পরন্তপ ।

ঐষ্টমিচ্ছেরমম্যাহং স্বর্ণধাপি হুয়া বিনা ॥”

‘আমি পিতা, সূমিত্রা, শত্রুয়, এমন কি স্বর্ণও
তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি
না ।’

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন ; আমরা
দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল
খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্বক কবন্ধ ও
জটায়ুর সংকার করিতেছেন । দিবারাত্র
তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—এই ব্রাহ্মসেবাই
তাঁহার জীবনের পরম আকাজ্জক বিষয়
ছিল । বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি
বলিয়া আসিয়াছিলেন—

“তবাস্তু সহ বেদেহা গিরিসান্নয় রসস্যে ।

অহং সর্বং করিবামি লাব্রতঃ স্বপতন্ত তে ।

ধনুর্দ্বার্য সগুণঃ খনিজপিটকাধরঃ ।”

‘দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসান্ন-
দেশে বিহার করিবেন, আগরিত বা নিদ্রিতই
থাকুন, আপনার সকল কর্ম আমিই

করিয়া দিব। খনিজ, পেটক এবং ধনু হতে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে করিব।’

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোক রাম ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্তত খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অমুজ্জায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন—

‘সীত্রঃ লক্ষ্মণ জানীহি গতা গোদাবরীং নদীম্।

অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যায়িতুং গতা।’

পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া আর্তস্বরে বলিলেন—

‘কং হু সা দেশমাপরা বৈদেহী ক্লেশশাশিনী।’

‘কোন্ দেশে ক্লেশশাশিনী বৈদেহী গিয়া-ছেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না।’—

‘নৈতাং পত্নামি তীর্থেষু ক্লেশতো ন নৃণোতি মে।’

‘গোদাবরীর অবতরণস্থানসমূহের কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।’

লক্ষ্মণস্ত বচঃ শ্রদ্ধা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।

রামঃ সমভিত্তক্ৰাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্।’

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ভ্রিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন।

ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ বেক্রপ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহা অনন্তবনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সাধনা দিবার

চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। লক্ষ্মণের কষ্টলগ্ন হইয়া রাম বারংবার বলিতেছেন—

‘হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে স্বং প্রিয়াং কচিং।’

‘লক্ষ্মণ, তুমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ?’ এই শোকাকুল কণ্ঠের আর্তিতে লক্ষ্মণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত।

দহনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে স্নগ্রী-বের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথপর্যটন করেন, কখনও মুচ্ছিত হইয়া বসিয়া পড়েন; কখনও ‘সীতা সীতা’ বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখনও ‘হা দেবি, একবার এস, তোমার শূন্য পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাও’ এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পা-নীরবর্ত্তি-পদ্মকোষ-নিজ্রাস্ত-পবনস্পর্শে উল্ল-সিত হইয়া বলিয়া উঠেন, ‘নিখাস ইব সীতায়ার্বাতি বায়ুম্নোহরঃ।’ সজলনেত্রে চিরস্রব্ধং চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অব-স্থার স্বধন পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হুম্মান্ স্নগ্রীবকর্কুক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হুম্মান্ সন্ত্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, ‘আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বহুল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তান্তিত মহাবাহ সর্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহ ভূষণহীন কেন?’ এই আদরের কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিরক্লদ হৃৎ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে

সেহারাঁ হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি মেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয়প্রদানের পর তিনি বলিলেন—“দুহুর নির্দেশে আজ আমরা স্ত্রীবেশে শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিত-চিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্ত এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রুত-কীৰ্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রাম-চন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্ত এখানে আসিয়াছেন। সৰ্বলোক ষাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজা-পুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া স্ত্রীবেশে নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত, স্ত্রীবেশে অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।”—বলিতে বলিতে লক্ষণের চির-নিরুপদ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌন হইলেন। রামের হ্রস্বস্বা-দর্শনে লক্ষণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়া-ছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিত্য দুঃখসহায় ভৃত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অপোকাবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, “ভ্রাতা লক্ষণ আমা অপেক্ষা রামের নিরত প্রিয়তর।” রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকর হইয়া পড়িয়া ছিলেন, সেদিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যাঘ্রী বৈরুপ রক্ষা করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আশ্রয়

বলিয়া আছেন;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃকপাত না করিয়া রাম লক্ষণের প্রতি সজল চক্ষু জ্ঞপ্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে-ছিলেন। বানরসৈন্য লক্ষণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃত-কর ভ্রাতাকে অতি স্নেহামলভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন—“তুমি বৈরুপ আমাকে বনে অহুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অহুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমার একবার দেখ; আমি পর্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত, প্রমত্ত বা বিষন্ন হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমার সাধনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?”

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোনকালে বিরক্তি করেন নাই, শ্রায়সজ্ঞত হউক বা না হউক, লক্ষণ সৰ্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসংঘের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শতশত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিলেন, ব্রীড়াময়ী সৰ্ব্বদা কম্পিত হইতেছিল। লক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্যের

প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে রুতসঙ্কল্প হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন—তখন লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃ-স্নেহে তিনি স্বীয়-অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া গিয়া-ছিলেন। ভরতের, এমন কি সীতারও, মুহু অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের স্নগভীর ভালবাসার মধ্যেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহার। ভরত রামচন্দ্রের জন্ত যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্বপদার্থ বলিয়া বোধ হয়; ভরত স্বর্গের দেবতার স্থায়, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে, উহা সর্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময় ভরতের আত্মত্যাগের পার্শ্বে লক্ষ্মণের খনিপ্রহার্য মৃত্তিকাস্থানন প্রভৃতি সেবাস্বত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার স্নগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে

অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ধরাবাসিগণ সেই স্বর্ণ-ব্রষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্নত হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃত্বীতি কতকটা সেইরূপ; কৈকয়ীর ষড়্‌বস্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূর্ব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদের সম্মুখে সেইরূপ চমৎকৃত করিয়া তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রেম আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ, এই বিশাল অপরিমিত স্নেহতরঙ্গ আমাদের সম্মুখিত রাখিয়াছে, অথচ প্রতিক্ষেপে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন—“জল হইতে উদ্ধৃত মীনের স্থায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।” এই অসীম স্নেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। কখন বহুরুচ্ছসাধনে অবসর লক্ষ্মণকে রাম একটি স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষ্মণের নেত্রপ্রান্তে একটি পুলকাক্রান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি রামের কাছে তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই।

✕ লক্ষ্মণের চরিত্রের একদিক্ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আছে। পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষ্ণবীক্ষণ ছিলেন না। তিনি অল্পগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্তু হয় ত রাম ভিন্ন তাঁহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার

আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধিধারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্যটন করা তাঁহার পক্ষে দুঃস্বপ্ন হইত, এইজন্যই তিনি রামগতপ্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। একথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষণই রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।

বনবাসাজ্ঞা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অশ্রাঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাম লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্য্য দৈব-শক্তির দল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরক্ত কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসঙ্গতি পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের জ্ঞায় ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞায় গুণশালিনী মৎস্কুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির জ্ঞায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম, ইহাতে মাহুষের কোন হাত নাই।” লক্ষণ উত্তরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের মোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা বাহ্যায় দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহার আপনার জ্ঞায় অবগত হইয়া পড়েন

না।” মুহূ ব্যক্তিরাই সর্বদা নির্বাতন প্রাপ্ত হন—“মুহূর্হি পরিভূয়তে”। ধর্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে ঘোরতর অশ্রাঘ করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবভূত্যা, ঋতু ও দাস্ত এবং রিপুর্ভাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া— ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম? আমি আজই বাহবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অক্ষুণ্ণ দিয়া উদ্ধাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। বাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?” সাশ্রুনেত্র লক্ষণ এই সকল উক্তির পর “হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্” বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গৃহিত-আদেশ-পালন যে ধর্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোন-ক্রমেই লক্ষণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কা-কাণ্ডে মায়াসীতার মন্তক দর্শনে শোকাবুল রামচন্দ্রকে লক্ষণ বলিয়াছিলেন—“হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, শাস্তি ও ইন্দ্రిয়নিগ্রহ, এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম; কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম পরি-

ত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসের অপহরণ করিয়াছে।” এই প্রথম ব্যক্তিত্বশালী যুবক শুধু বৈশিষ্ট্যেই একান্তরূপে ব্যক্তিত্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা সার্বিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই এবং রামের মত হর্ষলও বোধ হয় রামায়ণে আর কেহ নহে। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে আশ্চর্য পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণরসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা সত্যত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষ্মণ অবস্থার কোন বিপর্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরোধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র “হায়, আজ মাতা কৈকয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া অবসর হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ ঈর্ষের জ্বালায় নিঃসত্যত্যাগ করিয়া বলিলেন—“ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অন্যায়ের জ্বালায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।”

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে একুণ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন।

বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন—তাহা একদিকে যেমন সুগভীর ভালবাসার ব্যঞ্জক, অপর দিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। “আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না”, “আপনার একুণ দৌর্ভাগ্যপ্রদর্শন উচিত নহে”, পুরুষকার অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—“দেবগণের অমৃতলাভের জ্বালা বহু তপস্তা ও ক্রুদ্ধসাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্তার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার জ্বালা ধর্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরূপে কিরূপে সহ্য করিবে?”

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অজ্ঞায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ ষোড়শবৎসকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি চিন্তা

করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহা-
রাজের চরিত্রে পিতৃষের কোন নিদর্শন দেখিতে
পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্তা ও
পিতা, সকলই রামচন্দ্র।”—“অহং তাবদ্রাহ-
মাজ্ঞে পিতৃষং নোপলক্ষয়ে। ভ্রাতা ভর্তা
চ বন্ধুস্ত পিতা চ মম রাঘবঃ।”

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ
ছিল। কৈকয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে
অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল
ধারণা ছিল, কেবল রামের ভৎসনার ভয়ে তিনি
ভরতের প্রতি কঠোরবাক্যপ্রয়োগে নিবৃত্ত
থাকিতেন। কিন্তু যখন অটাবন্ধকেশকলাপ
অনশনকুশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া
ধূলিলুপ্তিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে
চিনিতে পারিয়া সলজ্জ মেহপরিতাপে ত্রিস-
মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাজ্যে
বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাতিকো পক্ষিগণ
কুলায়ে গুপ্তিত হইয়া ছিল, ভরতের ভ্রাতৃ সেই
সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি
রামকে বলিলেন—“এই তীব্রশীত সহ
করিয়া ধর্ম্মাশ্রা ভরত আপনার ভক্তির
তপস্তা পালন করিতেছেন। রাজ্য,
ভোগ, মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া
নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের
রাজ্যিতে মুত্রিকার শয়ন করিতেছেন। পারি-
ত্রাজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেব-
রাজ্যিতে ভরত সরযুতে অবগাহন করিয়া
থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেব-
রাজ্যের তীব্রশীতে কিরূপে সরযুতে স্নান
করেন?” এই লক্ষ্মণই পূর্বে “ভরতস্ত বধে
দোষং নাহং পশ্যামি কখন” বলিয়া ক্রোধ-
প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন বুঝিতে পারি-

লেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের খেচর
সেবার নিরত, অযোধ্যার মহাসমুদ্রের মধ্যে
বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেই-
রূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে
তাঁহার স্বর এইরূপ মেহার্জ ও বিনম্র হইয়া
পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকয়ীকে কখনই
ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন
বলিয়াছিলেন—“দশরথ যঁাহার স্বামী, সাধু
ভরত যঁাহার পুত্র, সেই কৈকয়ী এরূপ নিষ্ঠুর
হইলেন কেন?”

লক্ষ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত
মাত্রায় প্রকাশ পাইত। তিনি রামের
প্রতি অন্তায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির
শ্রায় জলিয়া উঠিতেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
কাহাকেও তিনি এই অপরাধে ক্ষমা করিতে
ইচ্ছুক ছিলেন না।

শরৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি
ফুটিয়া উঠিল, রক্তিমাত কোবিদার বিকশিত
হইল। মালাবান্ পর্ব্বতের উপকণ্ঠে তরঙ্গিণীরা
মন্দগতি হইল, কুসুমশোভী সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষকে
গীতশীল ষট্পদগণ ঘিরিয়া ধরিল, গিরি-
সাহুদেশে বহুজীবের শ্রামাভ ফল দেখা
দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস
বিরহী রামচন্দ্রের নিকট শতবৎসরের শ্রায়
দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি
শীর্ণ হইলে বানরবাহিনীর সীতাকে সন্ধান করা
সহজ হইবে, সুতরাং—“সুগ্রীবস্ত নদীনাঞ্চ
প্রসাদমভিকাঙ্কয়ন”—সুগ্রীব ও নদী-
ফুলের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রামচন্দ্র
শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই
শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির
অনুযায়ী উদ্দেশ্যের কোন চিহ্ন না পাইয়া

রাম স্ত্রীবেশে প্রতি জুগু হইলেন,—গ্রাম্য-
স্থলে রত মূৰ্খ স্ত্রীব উপকার পাইয়া প্রতাপ-
কারে অবহেলা করিতেছে। লক্ষ্মণকে
তিনি স্ত্রীবেশে নিকট পাঠাইয়া দিলেন—
বন্ধুকে স্বীয় কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া
উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত করিবার জন্ত যে সকল
কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধসূচক
কয়েকটি কথা ছিল—“ন স সঙ্কুচিতঃ পশ্চাৎ
যেন বালী হতো গতঃ। সময়ে তিষ্ঠ স্ত্রীব
মা বালিপথমবগাঃ।”—“যে পথে বালী
গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; স্ত্রীব,
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে স্ত্রীপ্রতিষ্ঠ হও,
বালীর পথ অনুসরণ করিও না।” কিন্তু
লক্ষ্মণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা “পুনশ্চ”
ছুড়িয়া লক্ষ্মণকে সাবধান করিয়া দিলেন—
“তাং প্রীতিমমুবর্জ্য পূর্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্।
সামোপহিতয়া বাচা ক্লক্কাণি পরিবজ্জয়ন ॥”
‘প্রীতির অনুসরণ ও পূর্বসম্মত স্মরণ করিয়া
ক্লক্কাণি পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্রবাক্যে স্ত্রীবেশের
সঙ্গে কথা কহিও।’ এই সাবধানতার
কারণ ছিল। কারণ কিছু পূর্বেই লক্ষ্মণ
বলিয়াছিলেন, “আজ সেই মিথ্যাবাদীকে
বিনাশ করিব, বালির পুত্র অঙ্গদ এখন
বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন।”

লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ অভিযোজন রামের কথায়
প্রশমিত হয় নাই। তিনি স্ত্রীবকে জুগু কর্তে
ভৎসনা করিয়া রোষক্ষুরিতাধরে ধুই লইয়া
দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি
তাঁহার কর্ণবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামালা
হেদনপূর্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা
করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী ক্ষত্রিয়কে তেজ-
বিনী সীতা, যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ

করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ্য
করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কোতুলক
হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর
অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে “কোথা রে
লক্ষ্মণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।
সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্মণকে রামের
নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ
রামের আদেশ লভ্বন করিয়া যাইতে অসম্মত
হইলেন এবং মারীচ যে ঐরূপ স্বর-
বিকৃতি করিয়া কোন ছরতিসন্ধিসাধনের
চেষ্টা পাইতেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা
করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদা-
শঙ্কায় জ্ঞানশূন্য, লক্ষ্মণকে সাশ্রনেত্রে ও
সক্রোধে বলিলেন, “তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন
জাতিশত্রু, আমার গোভে রামের অনুবর্তী
হইয়াছ, রামের কোন অন্তত্ব হইলে আমি
অগ্নিতে প্রবেশ করিব।” এ কথা শুনিয়া
লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া
দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার
গাও আক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি
বলিলেন—“দেবি, তুমি আমার নিকট দেবতা-
স্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত
নহে। ক্রীলোকের বুদ্ধি স্বভাবতই ভেদকরী;
তাহারা বিমুক্তধর্মী, ক্রুর ও চপলা। তোমার
কথা তপ্ত লৌহশেলের মত আমার কর্ণে
প্রবেশ করিতেছে, আমি কোনক্রমেই
তাহা সহ করিতে পারিতেছি না। তোমার
আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে
অন্ততলক্ষ্য দেখিতে পাইতেছি—”এই বলিয়া
প্রস্থান করিবার পূর্বে সীতাকে বলিলেন,
“বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতার
তোমাকে রক্ষা করুন।” ক্রোধক্ষুরিতাধরে

এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন ।

লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃষ্ট মহিমা সর্বত্র অনাবিল, —শুভ্র শেফালিকার ছায় সুনির্মল ও সুপবিত্র । সীতাকর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; সে সকল রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, “আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না । নিত্য পদ-বন্দনা কালে তাঁহার নুপুরযুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি । কিক্ষিক্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নুপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিবন শুনিয়া “সৌমিত্রিলজ্জিতো-হভবৎ ।” এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন । যখন মদ-বিহ্বলাক্ষী নমিতাক্ষ্যষ্টি তারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাঁহার বিশালশ্রোণীস্থলিত কাঞ্চীর হেমশূভ্র লক্ষ্মণের সম্মুখে মূহুরন্ধিত হইয়া উঠিল, তখন “অবাস্থখোহভবৎ মনুজ-পুত্রঃ”—লক্ষ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন । এইরূপ দুইএকটি ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যক্ত লক্ষ্মণের নৈতিক সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয় । তখন প্রকৃতই তাঁহাকে দেবতার ছায় পূজার্থ মনে হয় ।

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত পুরুষকারের উজ্জল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই । ইনি সত্য নিষ্ঠীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় সুরধার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সবেও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্তী হইয়া একে-

বারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন । নিতান্ত বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর জীলোকের ছাদ কোমল হইয়া পড়ে নাই । যখন তিনি কবন্ধের বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—“দেখুন আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন । তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন ।” এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই । ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে ।

স্মারতভেজের এই জলন্ত মুর্তি, এই মৌন ভ্রাতৃত্বভক্তির আদর্শ, হিন্দুস্থানে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছেন । “রাম-সীতা” এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় “রাম-লক্ষ্মণ” এই কথা এতদ্দেশে বেগী পরিচিত । সৌভ্রাত্যের কথা মনে হইলে “লক্ষ্মণ” অপেক্ষা প্রশংসার উপমান আমরা কল্পনা করিতে পারি না । ভরত ভ্রাতৃত্বভক্তির পলায়,—স্বকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ । কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃত্বভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান । আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণ-শুভ্র করিতেছি । আজ বহুস্থানে সহধর্ম্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার বক্ষীগণ আমাদের গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে ; যাহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না । হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাহাদিগকে

বিশ্বনিরস্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্রূপে
পড়িয়া দিয়া আমাদেরিগকে প্রকৃত সৌহার্দ
শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্জাব
ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব,
এ কথা কি বিশ্বাস ? আজ আমাদের রাম
বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃষ্ট
উপভোগ করেন ; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটি-
তেছে না, রাম স্বর্ণখালে উপাদের আহ্বার
করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্ত,

বনবাসের দুঃখ, সমস্তই হিণ্ডুগতর পীড়াদায়ক।
লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চির-
সঙ্গী মনে ভাবিতে তুলিয়া যাইতেছি। হে
ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাস্মীকি তোমাকে আঁকিয়া
গিয়াছেন—চিত্রহিসাবে নহে ; হিন্দুর গৃহ-
দেবতারূপ তুমি এপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে।
আবার তুমি হিন্দুর ঘরে কিরিয়া এস, আমা-
দের দক্ষিণবাহ অভিনববলদৃষ্ট হইয়া উঠিবে
—আমরা এ হুদ্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আজিকার ভারতবর্ষ।

২

[ইংরাজের শাসনপদ্ধতি ।]

ভারতপর্য্যটক অ্যালবের্ মেট্যা, করাসী পঙ্ক-
তির সহিত তুলনা করিয়া, ইংরাজের
শাসনপদ্ধতির যেরূপ সমালোচনা করিয়া-
ছেন, তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাই-
তেছে :—

ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনতন্ত্র-সম্বন্ধে কাহারো
বা অনুকূল, কাহারো বা প্রতিকূল
অভিমত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সকল-
কেই স্বীকার করিতে হইবে, কার্য্যত অতীব
দৃঢ় ও সুস্থলভাবে ইহার প্রয়োগ হইয়া
থাকে এবং বাঁহারা ইহার প্রয়োগ করিয়া
থাকেন, তাঁহাদের হস্তে প্রভূত কর্তৃত্বও
দেওয়া হইয়া থাকে।

এই রাজ্যতন্ত্রের তলদেশে “দেশীয়গণ”
ও উপরিভাগে ইংরাজেরা অধিষ্ঠিত। ইংরাজ

রাজপুরুষেরা সবিভব অহুচরবর্গে পরিবৃত্ত ;
দেশীয় ভাষায় এতটা অভিজ্ঞ যে, তাঁহারা
অধীনস্থ কর্মচারীদিগের কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধান
ও নিয়মিত করিতে পারেন। সেই সকল
কর্মচারীদিগকে রীতিমত নিয়মে আবদ্ধ
করিয়া, স্থানীয় স্বার্থ, স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ও স্থানীয় দলাদলির বাহিরে তাঁহাদিগকে
স্থাপন করা হয় ; সর্ব্বশেষে, তাঁহাদের পৃষ্ঠ-
বলরূপ সুসংহত সৈন্তমণ্ডলী অবস্থিত।
এইপ্রকারে, তাঁহারা দেড়শত বৎসর বাবৎ,
বিশ কোটিরও অধিক লোক শাসন করিতে
সমর্থ হইয়াছেন, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর
অরাজকতার পর, ভারতে ব্রিটেনীয় শাস্তি
স্থাপন করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে,
১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহ ছাড়া আর

কোন গুরুতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই ।

ইংরাজের ভারতরাজ্য দেখিয়া যেরূপ একটি অখণ্ডতার ভাব মনে আইসে, ফরাসী-অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডগুলি দেখিয়া—রাজ্য-হীন শুধু পাঁচটি নগর দেখিয়া, সে ভাব মনে আইসে না । ইংরাজদিগের ছায় ফরাসী-দিগের মধ্যেও, কৃষ্ণবর্ণ দেশীয় লোকের বিদ্বেষী, নিষ্ঠুর অবজ্ঞাপূরণ ব্যক্তি কখন-কখন দৃষ্ট হয় । কিন্তু সাধারণত ফরাসীরা ধনাঢ্য “দেশীয়” বণিকদিগের নিকট ছোট-খাটো-বিষয়ে অমুগ্রহের প্রার্থী হইতে ইতস্তত করে না, “দেশীয়” উপপত্নী গ্রহণ করে, দোভাষীর সাহায্য ব্যতীত রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে পারে না । এই সকল কারণে, অজ্ঞাতসারেও অনেকসময় স্থানীয় বিবাদে তাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় । আবার ফরাসীদিগের মধ্যে একদল কর্মচারী এমনও দেখা যায় (সংখ্যায় অল্প)—যাহারা উৎকৃষ্ট ইংরাজ-সিভিলিয়ানের সমকক্ষ, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের লোক । ইহারা আধুনিক ফ্রান্সের মর্মগত বিশেষ-ভাব ও চিন্তা-প্রবাহ ভারতবর্ষে আনয়ন করিতে সচেষ্ট । ইহাদের মধ্যে কেহ-কেহ, কোন সরকারী কাজকর্ম খালি হইলে, উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের প্রতিবাদ সবেও, কোন সুযোগ্য নীচজাতীয় “পারিয়া”কে সেই কর্মে মনোনীত করা প্লাঘার বিষয় মনে করেন ; কেহ বা, ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্ম সংক্রান্ত ইতিহাস অমূল্যলনে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন, যুরোপীয় পাণ্ডি ও স্ত্রীবিবর্গের প্রতি যেরূপ—ইহা-

দিগেরও প্রতি সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন । এইরূপে, উচ্চদের দেশীয়দিগের মধ্যে তাঁহারা লোকপ্রিয় হইয়া উঠেন । কেহ বা, ফরাসী খৃষ্টীয় মঠের মঠধারিণীর অতি-ধর্মোৎসাহের বিরুদ্ধে, হাঁসপাতালের রোগীদিগের পক্ষসমর্থন করেন,—অপোত্তলিক মুসলমানদিগকে যাহাতে “পেগ্যান” নামে অভিহিত না করা হয়, তদ্বিষয়ে মঠধারিণীকে অমুরোধ করেন ।

ফরাসী-অধিকারস্থ এই পঞ্চ নগরে, ফরাসীবিধানামুসারেই, সার্বজনিক শিক্ষা-প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে ; এবং তদ্রূপে বিজ্ঞা-লয়সকলকে, ইংরাজ-ভারতের উন্নততম প্রদেশ বিজ্ঞালয়ের সহিত অক্লেশে তুলনা করা যাইতে পারে ।

ইংলণ্ডের ছায় ফ্রান্সের সরকারী কাজ-কর্ম তত উচ্চপদের নহে ; সেইজন্য ফরাসী রাজধানীর উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে তৎপ্রতি বড়-একটা আকর্ষণ নাই । প্রায় অমুগ্রহবিতরণের হিসাবে কর্মচারিণীরাই হয় ; মন্ত্রিগণ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাক্, কখন-কখন তাঁহারাও অমাবশ্যক পদের সৃষ্টি করিবার দিকে উন্মুখ । এই-হেতু, ফরাসী-ভারতবর্ষে সর্বজাতীয় ও সর্ব-শ্রেণীয় সরকারী কর্মচারী ও ভূত্যের সংখ্যা চৌদশত । সমস্ত ফরাসী-ভারতের লোক-সংখ্যা একটা সামান্য ইংরাজ “ডিস্ট্রিক্টের” সমান হইবে । অতএব, লোকসংখ্যার তুলনায়, কর্মচারীর সংখ্যা বড় বেশী বলিয়া মনে হয় । ফরাসী-ভারতে বিচার-কার্য্যের একটি সর্বাত্মসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে ; আপীল-আদালৎ পণ্ডিচারিতে অধি-

ষ্ঠিত । সমস্ত “দেশীয়” কর্মপ্রার্থীদিগকে স্বদেশে কর্ম দিয়া পরিতুষ্ট করা যায় না ; সুতরাং কতকগুলি দেশীয়কে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া হিন্দ-চীনে পাঠান হইয়া থাকে । সব-সময়ে যে তাহাদের বিচার-কার্য্যে, ফরাসী-ভাষাবিচার-সম্বন্ধে তত্ত্ব অধিবাসীদিগের মনে উচ্চ ধারণা হয়, এরূপ বলা যায় না । যে দিন হইতে ভারতবর্ষের জন্ত এক-জন স্বতন্ত্র “সেনেটার” ও “ডেপুটি” নিদিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন হইতেই কর্মচারীর সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে । ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইতে ভারতের ফরাসী-উপনিবেশ এই-টুকুমাত্র ফল লাভ করিয়াছে ।

হিন্দুদিগকে “স্বেচা” দিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাম্য স্থাপিত হয় নাই । ফরাসীদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ, হিন্দুদিগের চিরাগত সামাজিক বিভাগের কঠোরতা কখন-কখন লাঘব করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছেন ; কিন্তু বর্ণভেদের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত কোনপ্রকার সমবেত চেষ্টা হয় নাই । ধনাঢ্য হিন্দুদিগের হস্তেই “স্বেচা”-সংখ্যা-নির্ণয়কার্য্য অর্পিত হইয়া থাকে ; সে সম্বন্ধে আর কেহ তত্ত্বাবধান করে না ; সুতরাং, সেই প্রভাবশালী দেশীয়েরাই নিজ ইচ্ছামত “স্বেচা”-র ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন । কখন-কখন ফরাসী কর্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু আইন-সম্মত কাজ হইতেছে কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা স্বয়ং কোন এক বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন । এইরূপ নির্বাচক-ব্যতীত নির্বাচনে কখন-কখন বিষম গণ্ডগোল

বাধিয়া যায়, এবং ইহার দরুণ কোন-কোন ফরাসী রাজপুরুষের কতকটা প্রতিপত্তিরও হানি হয় ।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জনসাধারণের মতামত তুলনা না করিলে ফরাসী ও ইংরাজি শাসন-পদ্ধতির একটা সম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া যাইতে পারে না । আমাদের ফরাসী দেশে, কোন কর্মচারী স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করিলে সংবাদপত্রাদিতে ও পার্লামেন্টসভায় নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকে ; এবং দেশীয়দিগের পক্ষ (এমন কি, বিদ্রোহী হইলেও) অবলম্বন করিবার জন্তও ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে একটি বৃহৎ দল আছে । ক্লাইব ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ইংলণ্ডে অনেকবার লোক-মত “দেশীয়”-স্বার্থের অমুকূলে পরিব্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু “সাম্রাজ্যিকতা”র বৃদ্ধিসহকারে, দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে ও অন্তায়পূর্ব্বক কাহাকে ধৃত করা কিংবা দমন করা সম্বন্ধে, গবর্ণমেন্টের নিকট কৈফিয়ৎ চাহে, এরূপ সংবাদপত্রপ্রকাশক ও রাষ্ট্রনৈতিক লোকের সংখ্যা দিন-দিন কমিয়া আসিতেছে । অধিকাংশ লোকে এক্ষণে প্রায় সকল স্থলেই ইংরাজ-কর্মচারীর ও ভারতবাসি-ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে । আমাদের অপেক্ষা ইংরাজদিগের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, উহাদের দ্বারা যে শাসনতন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একটা বিশেষ পদ্ধতি-অনুসারে বখাষণ পরিচালিত হইয়া থাকে । তা ছাড়া, শাসনকার্য্য নির্বাহ করা উহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ; কেন না, ইংরাজেরা মনে করে, স্বাধীনতা-বস্তুটা রপ্তানীর সামগ্রী নহে ; তাহাদের অধিকৃত

দেশসমূহে কি নিয়মে কাজ চলিতেছে, সে বিষয়ে তাহারা সহজে অহুসন্ধান করিতে

চাহে না; তাহারা সর্বত্রই গতানুগতিক এবং গ্রেট-ব্রিটেনের বাহিরে অনিয়ন্ত্রিত প্রভু।*

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বীরকুণ্ডর।

বাস বাঙলায় গোপজাতির বাহুবলসম্বন্ধে যে সুনাম ছিল, ইদানীং তাহা লোপ হইয়া আসিতেছে। গোড় বা গোড়ো গোয়ালারা বঙ্গীয় জমিদারশ্রেণীর লাঠিয়াল সৈন্যদলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল এবং ২৫।৩০ বৎসর পূর্বেও বিত্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রধানত তাহাদের সহকারিতায় ঘটিয়াছে। দণ্ডবিধির কঠোরতা অথবা ম্যালেরিয়ার বিষ, কাহার প্রতাপ বেগী, বলা যায় না; কিন্তু যে কারণেই হউক, বাঙলার এই শূরবীর জাতি অধুনা দলিত-ফণাভুজঙ্গবৎ কেমন নিজ্জীব হইয়া গিয়াছে। এখন আর গোয়াল শূরোচিত বাহুবলের ধার ধারে না, তবে সাধারণত পূর্বের মতই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। কিন্তু গোয়ালিনী-ঠাকুরাণীর চিরদিনের যশটুকু আজিও অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি কক্ষে দৃঢ়ভাঙ অথবা শিরোদেশে দধিছুঁড়ের পসরা লইয়া পূর্ববৎই ফিরি করিয়া বেড়াইতেছেন। কথায় চল এবং হুঞ্জে জল কিন্তু আগেকার চেয়ে মাত্রায় বাড়িয়াছে।

বেহার এবং ছোটনাগপুরে গোপজাতির ইতিহাস পূর্বাগর সমান। তাহাদের অনেক

সেই পুরাকালের মত কোপীন বা নামমাত্র বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ আবৃত করিয়া গোমহিষ চরাইয়া ‘বাথানে’ বিনিদ্ধ রজনী বাপন করিতেছে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ক্ষুদ্রবৃহৎ শৈলমালার সান্নিধ্য, নিবিড় বনজঙ্গলের নিভ্রতে, নির্ভয়ে কঠে শঙ্কায়মান ধাতব অথবা দারুনিষ্ঠিত ঘণ্টা পরিহিত ‘ধুরজানোয়ারের’ ‘রাখোয়ারি’ করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সময়-অসময় নাই। সচরাচর দেখা যায়, গোপসন্তান চারগরত-মহিম পৃষ্ঠে অবলীলাক্রমে উপবেশন বা শয়ন করিয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে। কদাচিৎ তাহার কণ্ঠনিঃসৃত ‘লোরিক’ মলের বীর-গাথা বিচিত্ররূপে পাহাড়জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, সমাজসৃষ্টির প্রভাতে ইহাদের যে অবস্থা ছিল, কাল জয় করিয়া তাহা অব্যাহত আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র গোপজাতির বাস। ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ঘোষী, কিশগোং, মজরোট, চৌঠাহা এবং গোড়িয়া। ইহার ভিতর আচার-ব্যবহারে ঘোষীদের প্রাধান্য, অত্যাশ্রয় শ্রেণীর মত ইহা-

*সত আশপের “মাসিকার ভারতবর্ষ” গ্রন্থের ১৮৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের ১৫শ ছত্রে ভোজনাপার হলে অস-ক্রমে ভজনাপার হইয়াছে।

দের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু চালচলনের খুঁটিনাটি ধরিলে পাঁচ শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এক বিষয়ে ইহাদের মধ্যে চমৎকার ঐক্য বন্ধন আছে।—তাহা শৌর্য্যবীর্য্যের উপাসনা। যে কয়টি বাৎসরিক পর্বে শ্রেণী-নির্নিশেষে তাহাদের ভিতর অতুষ্টিত হয়, সকলই শূরবীরের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। ‘লোরিকে’র গান যতই অদ্ভুত হউক, তাহার প্রতিপদে কেবল শক্তিসামর্থ্যের জয়োচ্চারণ। বীরকুণ্ডর গোয়ালাদের আর একটি দেবতা এবং নির্ভীক সাহসিকতার জন্তই তাহার প্রসিদ্ধি।

তিলকোনান্নী গোপকন্টার গর্ভে মুংরি বাধান গ্রামে বীরকুণ্ডরের জন্ম হয়। যথাসময়ে কুমদার গ্রামের বসান ক্ষীরহর কন্টার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ‘গওনা’ বা দ্বিরাগমন হইল না। ইহাতে ঋণের চিন্তিত হইয়া জামাতাকে চিঠি লিখিলেন। দুইতিনবার পত্র লিখিয়া উত্তর না পাওয়ায় বসান ক্ষীরহর একটা শত্রু দিয়া জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল।

বার বরিষ বিতলো গওনা ও বিরা

কড়ু নহি আইলা কুমদার ঋণরার।

কিন্তু মাতা সহজে পুত্রকে ঋণরালয়ে যাইতে দিবেন না। এখন তাড়াতাড়ি কি, চৈত্রমাস আশ্বক, ‘দুধিয়া গহম’ পাকিয়া উঠুক, তখন মাল্লেশ্বর বাজারে দইধু বেচিয়া গহম কিনিব, তাহা দিয়া ‘পুয়া’ (পিঠা) প্রস্তুত করিয়া দিব, তখন ঋণরার যাস্ বাপ্ আমার!

মাইসে আইলো পুছে মন হামার

উলরল কুমদার ঋণরার

খংপর খং ভেজাওল বসন ক্ষীরহর

মুংরি বাধান, হামরা বড়া বুঝা গ্রান্।

মাই বোলা কি দিন বিতা দুদিন

আওয়ারে চৈৎ মাহিনা,

দুধিয়া গহম উপজেছে এ দেশমে বহৎ,

মাল্লেশ্বর বাজারসে লাইব দুধদহি বেচকে

দুধিয়া গহম,

ওক্রে দেব পুয়া পাকার

ওহো হোতো কুমদের কো সন্দেশ।

কিন্তু বীরকুণ্ডর মাতার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া যাওয়াই স্থির করিল এবং গৃহে বল-প্রকাশ করিয়া পাথের সংগ্রহ করিয়া লইল। গানের কয়টি ছত্রে কাণ্ডজ্ঞানহীন গোপমুবার চরিত্র কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

জবরদস্তি হেলল বীরকুণ্ডর

শিরাঘর ভাঙার,

পরসা কড়ি খা সে কাট লেল

গেঁঠ লাগার।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া বীরকুণ্ডর ঋণর-গৃহে যাত্রা করিতেছে, এমন-সময় দ্বারপথে হাঁচি পড়িল। মা অকুশল আশঙ্কা করিয়া আবার ছেলেকে বারণ করিল এবং প্রতিশ্রুত হইল, তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দ্বিরাগমন করাইবে।

নিকসল বীরকুণ্ডর দরওয়ারাজকে

নকীগ্হিক পড়লক।

মাই কহে লাগলই রে বেটা

মং বাও, কুমদার ঋণরার।

তোরা বাপ্কে ভেজায়েকে .

রোক সোদি করারকে লাগেঁহে।

হিক পড়লক, তুমহারা জান্বে

ওয়ারা নহি হার।

পথে প্রাণের ভয় আছে, মাতার মুখে
শুনিয়া বীরকুণ্ডর বলিল, পৃথিবীতে কে এমন
মানুষ আছে, যে আমার মারিবে!

বীরকুণ্ডর কহলক, ধরিভামে
কে জনম লেল বরিরার মানুষ
সে হমারা মারত্ ।

তখন মাতার কাছে বিদায় হইয়া যাইতে
পথে মহিষেরা তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়া-
ইল—কুমদার স্বপুত্রার যাওয়া হইবে না। কে
আমাদের সেবা ‘বরদাত্ত’ করিবে? বীর-
কুণ্ডর রাখালদের উপর তাহাদের সেবা-
শুশ্রূষার ভার দিয়া ছুইচারি প্রহরের অল্প
রওনা হইয়া গেল!

এতনা কহেকে হঁরাসে চলল বীরকুণ্ডর,
রাস্তাপর গেলত ভঁইস সব হেঁকে
মং যাও তু কুমদার স্বপুত্রার।
কে হামারা সেবা বরদাত্ত করগো।
বীরকুণ্ডর ভঁইসকে হাঁককে
লে আওল বাথান।
আকর, বাগদেং সবকে কহা যে
ছুইচার পহর হামারা ভাইয়া রামকো
রাখে বিলমাকে।
হাম্ কুমদার স্বপুত্রার সে চল আও
ছুচার পহরকে লোটকে।

এখন মধুযক্ নামে ভুইয়া কুমদার
অঞ্চলে শূরবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বারবৎসর
পূর্বে মরিয়া সে ভূত হইয়াছে। তাহার
প্রেতাত্মা বীরকুণ্ডরের সঙ্গ লইল। মানুষের
রূপ ধরিয়া সে পথে বীরকুণ্ডরের সহিত
আলাপপরিচয় করিয়া লইল এবং একটু
‘খইনি’ ভাষা কহিল—“একখিল
খইনি খিলার লেও ত যাও।” বীরকুণ্ডর
তাহার প্রার্থনা ত পূর্ণ করিলই না, তার

উপর কুমদারের সীমানায় পৌছিয়া খুব এক-
চোট কুস্তি খেলিল।

মারে তাল বীরকুণ্ডর সম্মুখে কুমদার উঠে আকাল।
ইহাতে মধুযক্‌রূপী ভূতের বড় রাগ হইল।

মধুযক্‌ আকর কহে মারল গেল মাং
আওর হরল তোর গেমান।

বারবরিষ মধুযক্‌কে মরণা ভেলই
কভি নেহী কই হাঁত রোপাই, সময় খেলইল
মুস্তি তোর জীব আন্ মারল যাইতো।

এই অভিশাপ ও ভয়প্রদর্শন বীরকুণ্ডর
গ্রাহ্য করিল না দেখিয়া মধুযক্‌ বসান
ক্ষীরহরের বাথানে গেল এবং তাহার
সর্বোৎকৃষ্ট মহিষ চুরি করিয়া জঙ্গলে বাধিয়া
রাখিল। ইহাতে স্বপুত্রের মন খারাপ হওয়ায়
সে জামাতাকে ভালরূপ আদর-অভ্যর্থনা
করিল না। বীরকুণ্ডর সকল শুনিয়া জঙ্গলে
চলিয়া গেল এবং মহিষকে উদ্ধার করিয়া
ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে মধুযক্‌র
প্রেতাত্মা সেই বনবাসী এক ব্যাঘ্রকে বলিয়া
দিল যে, তাহার মুখের শীকার কে কাড়িয়া
লইয়া যাইতেছে। তখন ব্যাঘ্র আসিয়া বীর-
কুণ্ডরের পথরোধ করিল এবং উভয়ে তর্ক
আরম্ভ হইল।

তব বীরকুণ্ডর বোলাকি জানকে ডর হার
তো আলগ হো যাও। তব না বোলা বাঘ
কি হাম্‌ বাঘিনকে দুধ পিলে,
আর তোহো আহীরীন্‌কো দুধ পিলে
তব্‌ হামারাসে লড়কে লে যাও।

বুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ব্যাঘ্র বীরকুণ্ডরের
হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। দেখিয়া ভূত
ব্যাঘ্রপত্নীর—নাম তাহার লুলি—নিকট
উপস্থিত হইল এবং কহিল—

সম্বা কি তোর শিরকে সিদুর
হরলে আঁহীরা চলল যাও,
তৌ কি বৈঠল হৈ নিচিৎ
বদলী আইল, মার দে।

বাধিনীও বীরকুণ্ডরের সঙ্গে লড়াইয়ে
হারিয়া স্বামীর সহগামিনী হইল। তখন
বীরকুণ্ডর ঋগুরের হস্তে মহিষ সমর্পণ করিল।
আহাৱাদি করিয়া গৃহে শয়ন করিয়াছে,
এমন-সময়

আত্মাকে স্বরূপ হোকে মধুযক্ বোলে
বীরকুণ্ডরকে বুঝায়,
ঋগুরকে জনমল হোয় সে বীরকুণ্ডর
বাথান যাকে শুভে।

আর কেহ হইলে মনুষ্যরূপী ভূতের এই
গালি গায় মাখিত না, কিন্তু গোপবীর বীর-
কুণ্ডর ইহাতে অধীর হইয়া উঠিল এবং সেই
রাত্রে গৃহ ছাড়িয়া বাথানে গিয়া শয়ন
করিল। ভূত তখন বাঘেদের “বাচ্চা”কে
উত্তেজিত করিয়া বাথানে আনিল। ব্যাঘ্রশিশু
ভয়ে কাছে আসিতেছে না দেখিয়া মধুযক্
বীরকুণ্ডরের নিদ্রাভঙ্গ করিল এবং তাহার
চক্ষে ধূলিমুষ্টি ছড়াইয়া দিল। অতঃপর
“বাঘকে বাচ্চা” অনাগ্রাসে বীরকুণ্ডরের বুকে
উঠিয়া তাহার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করিয়া দিল।
বীরকুণ্ডর মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিল।

তার পর সেও ভূতযোনি প্রাপ্ত হইল।
সেই অবস্থায় জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
বীরকুণ্ডর ঋগুরকে নিজের হত্যাকারী বলিয়া
অভিযোগ করিতে ছাড়িল না। কিন্তু জীর
কাছে সমুদ্র বৃত্তান্ত শুনিয়া অমরোদ্ধ করিল
যে, কাত্যায়নী মাতার নিকট হইতে তাহার
প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যেন মৃতদেহ সমাধিহ না
করা হয়।

এত্না শুন বীরকুণ্ডর কহে তিরিয়াকে
কি হামার মাটাকে আভি মজলিস মং করেকে
হাম দেবী মাই কাত্যানেকা আহান বাই।

কাত্যায়নী মাতার “আস্থানে” গিয়া
ভূতরূপী বীরকুণ্ডর কিছু-কিছু উপদ্রব আরম্ভ
করিল। কাত্যায়নীর দাসী—তিরগু—বেটা
তিরায়নে—সে গৃহমার্জনা করিতে যাইতে-
ছিল, তাহার জলের কলস ভাঙিয়া দিল;
মালিনী ফুল লইয়া আসিয়াছিল, তাহার ফুল
ফেলিয়া দিল। কিন্তু কাত্যায়নী মাতা
তখন পীতাম্বরমণ্ডিত অপরূপ ডুলিতে
শূভমার্গে মোরঙ্গদেশ যাত্রা করিতেছিলেন,
বীরকুণ্ডরের কথা শুনিয়াও তাহাকে দর্শন
দিলেন না।

এ সব শুনকে দেবী মাই কাত্যানে
মোরঙ্গ দেশ করে চড়াহেন।
লালি লালি ডোলিয়া আওর
পীতাম্বর পড়ে ওহার, বিম্ব কাহারকে
ডোলি লাগে আকাশ।

পাখীর রূপ ধরিয়া বীরকুণ্ডরও আকাশে
উঠিল এবং ডুলির লম্বা বাঁশ ধরিয়া ফেলিল।
ইহাতে দেবী কাত্যায়নী বড় বিরক্ত হইলেন।
কোন ইছন মরত। ভুবনমে জনম লেল
যে হামার ডোলি দেলক বিলম্বাকে।

বীরকুণ্ডর কাতর প্রার্থনা করিল—“মা
কাত্যায়নি, তুমি মোরঙ্গদেশ চলিলে, আমার
মৃতদেহ এখনও কুমদার বাথানে পচিতেছে।
মাগো, আমায় যশ দিয়া যাও।” দেবী
প্রতিশ্রুত হইলেন মোরঙ্গদেশে মোগল-
পাঠানদের জয় ও নিজের পুজা প্রচার করিয়া
আসিয়া তাহাকে বর দিবেন। বীরকুণ্ডর
তথাপি ছাড়িল না, দেবীর সঙ্গে সঙ্গে মোরঙ্গ-
দেশ গেল। সেখানে বুদ্ধ করিয়া অনেক

বাছা বাছা মোগলপাঠানকে হারাইয়া দিল । মহামারীর সৃষ্টি করিয়া কাত্যায়নী মাতা মোরঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবেন শুনিয়া সহজেই তাহার পরাজয় স্বীকার করিল । তখন বীরকুণ্ডর দেবীমাইয়ের নিকট প্রার্থনা করিল যে, তাহার দাসী তিরগ্-বেটা তিরায়েনের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দেন । ভূতে এবং মানুষে কি করিয়া সংসারধর্ম চলিতে পারে, এই আপত্তি তুলিয়া কাত্যায়নী প্রথমত বর দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । কেন না,
তব্ বোলে বীরকুণ্ডর, পে মাই
দে হামারা সঙ্গ লাগায়,
হব্ ভূত বানায় লেব ।

তখন বিবাহ করিয়া বীরকুণ্ডর পত্নীকে লাঠির নৌকায় গঙ্গাপার করিতে গেল । ইহাতে তিরগ্-বেটা তিরায়েন জ্বলে ডুবিয়া মরিল । স্মৃতরাং বীরকুণ্ডরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল । কেন না, সে সহধর্মিণীকে ভূত বানাইয়া লইতে পারিয়াছিল ।

এই কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া গোপ-জাতি প্রতিবৎসর কার্তিকী অমাবস্তার পরদিন যে পরীক্ষাষ্ঠান করে, তাহার নাম সোহরাই । সেদিন বেহার এবং ছোটনাগপুরের প্রত্যেক পল্লী পরীক্ষাৎসবে নাতিয়া উঠে ।* প্রভাতে ঢাকঢোলের যে শব্দ গ্রাম-প্রান্ত হইতে উথিত হয়, মধ্যাহ্নের পর তাহা সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে । তখন সকলে একটি গৃহপালিত শূকরকে ভূত মধুযকের প্রতিনিধি করিয়া বাঁধিয়া পূজার স্থানে লইয়া আসে, এবং গোমহিষদের নিকট হইতে তাহাদের বৎসগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া তফাতে

রাখিয়া দেয় । পূজা শেষ হইলে গাভীদের ছাড়িয়া দেওয়া হয় । পরে রজ্জুবদ্ধ বরাহটিকে টানিয়া বৎসদের কাছে এক্রপ ভাবে লইয়া যাওয়া হয়, যাহাতে মাতার দল সহজেই তাহাদের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে । তখন সেই সমবেত গাভীর দল একযোগে শূকরের প্রতি ধাবিত হয় এবং মুহুমূহ তাহাকে শৃঙ্গাবাত করিতে থাকে । শূকর যন্ত্রণায় যত চীৎকার করে, বাত্বোত্তমের ঘটা তত বাড়িয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে গোপসন্তানগণের আনন্দধ্বনিতে চারিদিক্ কম্পিত হইতে থাকে । জন্তুমধ্যে বরাহের প্রাণ বোধ করি সকলের চেয়ে কঠিন, সহজে বাহির হয় না । অতএব এই বীভৎস দৃশ্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলিতে থাকে ।

কয় বৎসর হইল, কোয়েলনদীর তীরে এই নিষ্ঠুর পরীক্ষাৎসব দেখিয়াছিলাম । ক্ষীণ-শ্রোত কল্লোলিনীর উত্তর তীরে মহম্মাকুঞ্জের ঘনচ্ছায়ায় বসিয়া বসিয়া জলক্রীড়ারত পক্ষীদের প্রতি অশ্রমনকভাবে চাহিয়া ছিলাম ।—দূরে পালামোর ক্ষুদ্র সুনীল শৈলমালা, তাহার পশ্চাতে রোহিতাশ্ব-পর্লতশ্রেণীর ঘনকষ্ণ ছায়া-দৃশ্য । সহসা অপর পারে বাত্বাণ্ড বাজিয়া উঠিল, এবং সৈকতভূমিতে অসহায় রজ্জুবদ্ধ শূকরের দিকে রোষপরায়ণ গাভীর দল বেগে ধাবিত হইল । আমার সেখানে অপেক্ষা করার সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না । অপরাহ্নে পথে ঘাইতে যত গ্রাম অতিক্রম করিলাম, সর্বত্র ঢাকঢোলের শব্দ এবং আর্ন্তপশুর চীৎকার কানে বাজিতেছিল ।

অপূৰ্ণ মিলন ।



কাছে যতদিন থাক ততদিন
কতটুকু তোরে পাই ?
তোমার ৰূপেৰ আড়ালে সখিৰে
তোমাৰে হাৱায়ে যাই !
মূৰ্ত্তিৰ মাৰ্কে খুঁজিয়া তোমাৰে
মিলে না তোমাৰ দেখা ;
তোমাৰে বেড়িয়া ৰূপটি তোমাৰ
দাঁড়াইয়া থাকে একা ।
ঘনাইয়া আসে মোহেৰ আবেশ,
ভৰে' আসে হুটি আঁপি ;—
মূঢ়েৰ মত বিশ্বয়ে হত
বিহ্বল হয়ে থাকি ।
বুঝিতে পাৰি না বুঝাতে পাৰি না,
কহিতে পাৰি না কথা ;
চোখে আগে শুধু ছবিখানি তোৰ
হিঁদে আগে শুধু ব্যথা ।
ছবিৰ আড়ালে ৰূপেৰ আড়ালে
তোমাৰে হাৱায়ে যাই ;
কাছে যতদিন থাক ততদিন
তোমাৰ দেখা না পাই ।

দূৰে, কতদূৰে আছ তুমি আজি
হেথায় আমি যে একা,—
তবু তোৰ সাখে দিবসেৰ মাৰ্কে
শতবার কৰি দেখা ।
পিরীতি তোমাৰ মূৰ্ত্তি ধৰিয়া
আৰতি কৰিছে মোৰে ;

রস-অমুরাগ-অশ্রুগন্ধে
 হৃদয় উঠিছে ভ'রে ।
 কাছে থাক যবে মিলে না মিলন
 দূরে গেলে মিলে তবে ;—
 অপরূপ এই মিলনের রীতি
 কে শুনেছে বল কবে ?
 চোখের দেখায় দেখা হয় না যে,
 মরমের মাঝে দেখা ;—
 হিয়ার পরতে তপ্ত শোণিতে
 মরণ-অধিক লেখা ।
 পরানের সাথে পরানের দেখা
 নাম সে বাহার প্রেম—
 মূল্য বাহার পরশমাণিক
 তুল্য নহে সে হেম ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

বক্তিতার খিলিজির বঙ্গবিজয় ।

১

সচরাচর যে সকল গ্রন্থ বাঙলার ইতিহাস বলিয়া বিজ্ঞানলয়ে অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—১২০৩ খৃষ্টাব্দে পাঠান-সেনাপতি বক্তিতার খিলিজি সপ্তদশ অম্বারোহী লইয়া বাঙলার রাজধানী নবদ্বীপনগরে উপনীত হইবামাত্র, নবদ্বীপাধিপতি বৃদ্ধ লাক্ষণ্য সেন রাজ্য ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, অস্ত্র:পুর হইতে উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করেন ।

এই কাহিনী বাঙালীর পুরাতন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু ইহা আধু-

নিক বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে-গক্ষে গলে-উপস্থাসে পাঠকসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে । বঙ্গদেশের পুরাতন জনশ্রুতি হইতে এই কাহিনী গৃহীত হইলে, পুরাতন সাহিত্যেও ইহার আভাস থাকিত । অত্র কোন প্রমাণ না থাকিলেও, এ দেশের পুরাতন জনশ্রুতি বলিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইত ।

কোন সময়ে কি সূত্রে এই কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রথমে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে । বাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিবেন,

তাহারা সকলেই স্বীকার করিবেন,—আধুনিক বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে ইতিহাস অধ্যাপিত হইবার পূর্বে এই কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশলাভ করে নাই। প্রথমে বিদ্যালয়ে, পরে শিক্ষিত-সমাজে এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই কাহিনী ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

যাহারা প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া, বাঙালীর ইতিহাস না জানিয়া, বাঙালীকে ভীক ও কাপুরুষ বলিয়া গ্রহণচনা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহারা এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া স্বমত-সমর্থনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যাহারা তাহাতে মর্মাহত, তাহারা নবদীপাধিপতির নামোল্লেখ করিয়া নানা কটু-কাটব্যপ্রয়োগে মর্মদাহ শাস্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাহারা একরূপ অসম্ভব কথা মানিয়া লইতে অসম্মত, অথচ প্রমাণপ্রয়োগে প্রতিবাদ করিবার জন্ত চেষ্টাশূন্য, তাহারা একজন হিন্দুনরপতির একরূপ ছরপনয় কলঙ্ক কিয়ৎপরিমাণে অপনোদন করিবার আশায় লিখিয়া যান,—বুদ্ধ নরপতির বিশেষ অপরাধ ছিল না; কৃত্য মস্ত্রিদলের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং ব্রাহ্মণগণের উপদেশে একরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যে বক্তৃত্যার খিলিজির বঙ্গবিজয়ব্যাপার নানা-ভাবে কীর্ণিত হইয়া বাঙালীর পরাজয়কলঙ্ক ছরপনয় করিয়া তুলিয়াছে।

যাহারা বঙ্গসাহিত্যের অধিনায়ক, সেই সকল খ্যাতনামা লেখক এইরূপে বাঙলার শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতির কলঙ্কঘোষণা করায়, তাহা এক্ষণে প্রবাদবাক্যের স্থায়

সর্বত্র স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এ কলঙ্ক আদৌ সত্য কি না এবং সত্য হইলে ইহার কতটুকু সত্য, এখন আর সে কথার বিচার করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস যাহার ললাটে ভীক ও কাপুরুষ বলিয়া ছরপনয় কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, সে সভ্যজগতের নিকট লজ্জায় মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস হারা-ইয়া, মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে না পারায়, এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইবার অসুবিধা হইয়াছে। এই কাহিনী যখন বঙ্গসাহিত্যে প্রথমে প্রবেশলাভ করে, তখন ঐতিহাসিক তথ্যসম্বন্ধানের আগ্রহ সমুচিতভাবে বিকশিত হয় নাই। এখনও অনেকের নিকট হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তকের কথা অকাটা প্রমাণ বলিয়া পরি-চিত। কোন পুরাতন পুস্তকে কিছু লিখিত থাকিলেই হইল, তাহার সত্যমিথ্যার আলো-চনা অনাবশ্যক, মিথ্যা হইলে পুস্তকে লিখিত বা মুদ্রিত হইবে কেন,—অনেকে এখনও একরূপ তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। স্মরণ্য এই কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিবার সময়ে ইহার সত্যমিথ্যার বিচার হয় নাই বলিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

বিচারে বিলম্ব ঘটিয়া তথ্যনির্ণয়ের অসু-বিধা হইয়াছে। কিন্তু বিলম্ব ঘটয়াছে বলিয়া তথ্যনির্ণয়ের আশা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন হইবে, তাহা এই :—

- (১) এই কাহিনীর মূল কোথায়?
- (২) বুদ্ধ পলায়নপর নবদীপাধিপতির নাম

কি ? (৩) কোন্ সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ? (৪) তৎকালে নবদ্বীপে রাজধানী ছিল কি না ? (৫) নবদ্বীপ কোন্ সময়ে কি হত্রে মুসলমানের হস্তগত হয় ?

এই সকল প্রশ্ন জটিল হইলেও, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানপরায়ণ পণ্ডিতবর্গের অধ্যবসানে এপর্যন্ত যে সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই কলঙ্ককালনের পক্ষে যথেষ্ট ।*

বক্তিত্যার খিলিজি সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য ইতিহাসে বিশেষ কিছু জ্ঞানিবার উপায় নাই । সুতরাং তাহার নামে কেহ কোন রচনা-কথা প্রচার করিলেও, তাহার প্রতিবাদ করা কঠিন হইয়া পড়ে । বক্তিত্যার খিলিজির বঙ্গবিজয়সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-তথ্য-নির্ণয়ের উপযোগী যে সকল প্রমাণ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বারা যে সকল সিক্কান্ত অনিবার্য বনিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা এই :—

(ক) সপ্তদশ অখারোহীর নবদ্বীপ-অধিকারের কাহিনী জটনৈক বৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের মুখে শ্রবণ করিয়া মিন্‌হাজ উদ্দীন স্বকৃত “তবকাৎ-ই-নাসেরী” নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন । তাহার অণ্ড কোন প্রমাণ নাই । সেই প্রথম, সেই শেষ । পরবর্তী গ্রন্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়া গিয়াছেন ।

(খ) লাক্ষণ্যনামক কোন নরপতির বঙ্গদেশের অধিপতি থাকার প্রমাণ নাই ।

সেনরাজবংশে এই নামের কেহ সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই ।

(গ) ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিত্যারের বঙ্গাগমন বিশ্বাস করা যায় না । কারণ, মুসলমান ইতিহাসলেখকের মতে বক্তিত্যার দ্বাদশ-বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়া ১২০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশেই পরলোকগমন করেন । সুতরাং ১২০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই বক্তিত্যার বঙ্গদেশে উপনীত হন ।

(ঘ) বক্তিত্যার খিলিজির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ হিন্দুরাজ্যভুক্ত একটি বিভাগ বা “বিষয়” ছিল, তথায় কোন রাজা বা রাজধানী ছিল না । লক্ষণাবতী, লঙ্কোর ও বিক্রমপুরে তিনটি রাজধানী ছিল ।

(ঙ) বক্তিত্যার খিলিজি সম্রাট কুতব-উদ্দীনের নিকট যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতেও তাহাকে লক্ষণাবতী অধিকারের ক্ষমতা প্রদান করা হয় । তাহাতে নবদ্বীপের নামোল্লেখ নাই ।

(চ) তৎকালে লক্ষণাবতীর অধীন বরেন্দ্র-ভূমি, লঙ্কোর রাজধানীর অধীন রাঢ়ভূমি ও বিক্রমপুরের অধীন বঙ্গভূমি (পূর্ববঙ্গ) অবস্থিত ছিল । বাগুড়ি অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের কিয়দংশ রাঢ় ও কিয়দংশ বঙ্গের অন্তর্গত ছিল । সুতরাং সেকালের নবদ্বীপ রাঢ়ের অধিকারভুক্ত ছিল । তাহা কোন সময়েই বরেন্দ্র-ভূমির বা লক্ষণাবতীর অন্তর্গত ছিল না ।

* কলঙ্ককালীন বঙ্গসাহিত্যে স্থপরিচিত হইলেও, এই সকল প্রমাণ স্থপরিচিত নহে । তজ্জন্ত এখনও গল্প-উপন্যাসে এবং মাসিকপত্রের প্রবন্ধে অনেক বাঙালী লেখক এই কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিবৃত করিয়া ভবিষ্যৎকালের ইতিহাসলেখকের সমালোচনা-শ্রম বর্জিত করিতেছেন । বিগত চৈত্রসংখ্যার “নবপ্রভা” পত্রে খ্যাতনামা লেখক শ্রীধরানন্দ মহাভারতী মহাশয় “বঙ্গাল সেন” শীর্ষক প্রবন্ধে এই পুরাতন কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে মানিয়া লইয়াছেন ।

(ছ) বক্ত্রিয়ার খিলিজি জীবিত থাকিতে বরেন্দ্রের কিয়দংশমাত্রই মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাঢ় পরাজিত হয় এবং বক্ত্রিয়ারের বঙ্গাগমনের ৬০ বৎসর পরেও মুসলমান ইতিহাসলেখক বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) হিন্দুরাজ্যের অধিকারভুক্ত থাকে, ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বরচিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল সিদ্ধান্ত কোন্ কোন্ প্রমাণ-মূলে কিরূপে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বক্ত্রিয়ার খিলিজির সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীর আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই বলিয়া রাখি,— মুসলমানলিখিত ইতিহাসে বাঙালীর পুরাত্ত্ব নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে ; তাহাতে অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হয় না। সে যুগে যাহারা ইতিহাসরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বিচারবুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করেন নাই ; যাহা শুনিয়াছেন, যাহা জানিয়াছেন, যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই অবলীলাক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসঙ্গক্রমে যিনি বঙ্গভূমির কথা যতটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বাঙলার ইতিহাসের অবলম্বন। বক্ত্রিয়ার খিলিজির সমসময়ে কোন মুসলমান লেখক বাঙলার স্বতন্ত্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই ; করিয়া থাকিলেও সেক্ষেপে গ্রন্থ বর্তমান নাই। অতরাং বক্ত্রিয়ার খিলিজির দ্বিধিজয়দশকে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

১২৬০ খৃষ্টাব্দের সমকালে আবু-উমর-

মিন্‌হাজ উদ্দীন “তবকাৎ-ই-নাসেরী” নামক ইতিহাসের বিংশতিতম অধ্যায়ে বঙ্গভূমির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই মুসলমানলিখিত বাঙলার ইতিহাসের আদিগ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালদহপ্রবাসী গোলাম-হোসেন-সঙ্কলিত “রিয়াজ-উস-সলাতিন” নামক গ্রন্থ ভিন্ন বাঙলার আত্মস্তের ধারাবাহিক আর কোন গ্রন্থ মুসলমানকর্তৃক লিখিত হয় নাই। মিন্‌হাজের গ্রন্থের ইংরাজী ও গোলাম হোসেনের গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন গ্রন্থেই গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতীত প্রমাণবলে সেকালের ইতিহাসের ছায়ামাত্র কেবল প্রতিভাত হইতে পারে।

মুসলমান-শাসন প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আর্য্যাবর্তের পূর্বাঞ্চলে নানা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে পুরাতন মগধ, কান্তকূজ ও গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের সীমা ও অধিকার বহুবার বিপর্য্যস্ত ও পরিবর্তিত হইয়া যায়। কান্তকূজ প্রবল হইয়া মগধের পশ্চিমাঞ্চল অপরূপ করায়, পলায়নপর মগধেশ্বর গোড়ের কিয়দংশ অধিকার করেন, পরে গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যে পাল ও সেন বংশীয় নরপালবর্গের কলহবিবাদ নিরস্ত হইলে, গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। সেনরাজবংশের অধিকারসময়েই বক্ত্রিয়ার খিলিজি গোড়রাজ্য আক্রমণ করেন।

তৎকালে গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ নামক তিনটি প্রধান বিভাগে

বিত্তক ছিল এবং লক্ষণাবতী, লক্ষ্মীর ও ত্রীবিক্রমপুরে এই তিন বিভাগের রাজধানী ছিল। সমগ্র গৌড়ীর সাম্রাজ্য নানা উপ-বিভাগে অর্থাৎ “বিষয়”নামক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিষয় বা উপ-বিভাগ বিষয়পতির দ্বারা শাসিত হইত। গৌড়েশ্বর সাধারণত রাজধানীতে বাস করিতেন। তিনটি রাজধানীর মধ্যে লক্ষণাবতী গঙ্গাভীরে অবস্থিত থাকার এবং পুরাতন গৌড়রাজ্যের রাজধানী বলিয়া সর্বত্র সমাদর লাভ করায়, লক্ষণসেনদেব শেষজীবন তথায় বাস করিয়া নিজ নামানুসারে তাহাকে “লক্ষণাবতী” নাম প্রদান করেন। মুসলমানের আদি ইতিহাসে লক্ষণাবতী “লক্ষোতি” নামে পরিচিত ; তাহাতে গৌড়নামের উল্লেখ নাই।

মিন্‌হাজের গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে এই তিনটি পুরাতন হিন্দুরাজধানীর মধ্যে ত্রীবিক্রমপুর হিন্দুরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল ; অপর দুইটি মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল। মুসলমানলিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তিত্তার খিলিজি লক্ষোতি অধিকার করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি মহম্মদ শেরান কর্তৃক লক্ষ্মীর অধিকৃত হয়। কিন্তু এই দিগ্বিজয় সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। মিন্‌হাজ ও তাঁহার পরবর্তী মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের গ্রন্থে বক্তিত্তার খিলিজি ও তাঁহার রাজ্যবিস্তারের যতদূর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ও প্রধান সেনাপতি কুতবউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে উপ-

বেশন করিবার সময়ে এদেশে কি অভূতপূর্ব পরিবর্তনই না সাধিত হইয়াছিল! তুর্কিস্থানের কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র পরিবারে কুতবের জন্ম হয়। তাঁহাকে শৈশবে দাসবিপণীতে বিক্রীত হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট এইরূপে দাসবিপণী হইতে প্রভুগৃহে ও তথা হইতে ক্রীতদাসরূপে ক্রমে মহম্মদঘোরীর নিকট উপঢৌকনদ্রব্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠাশ্বলি নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া শ্বলতান তাঁহাকে “আইবক্” বলিয়া ডাকিতেন। আইবক্ যে একদিন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তাহা কে জানিত ?

বক্তিত্তার খিলিজির বাল্যজীবনও কুতবউদ্দীনের দ্বারা অজ্ঞাত। তিনি ঘোর-প্রদেশের খিলিজিবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কদাকার বলিয়া কোনস্থলেই তাঁহার প্রতিভার সমাদর হইত না। মহম্মদঘোরী এবং কুতবউদ্দীন উভয়েই কুলশীল অপেক্ষা প্রতিভার সমাদর করিতেন বলিয়া বক্তিত্তার বড় আশা করিয়া প্রথমে ঘোরীর নিকট, পরে কুতবের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খর্ব শূল কদাকার দেহ উভয় স্থলেই তাঁহার সকল আশা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সাহস ছিল, বাহবল ছিল, রণকৌশল ছিল, কিন্তু কদাকার বলিয়া তিনি শ্বলতানের বা দিল্লীখবের সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে দোয়াবপ্রদেশের অভিনব মুসলমানরাজ্যে তিনি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া প্রতিভার পরিচয়দানের অবসর লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইবার সময়ে জায়গীর ও সনন্দ দানের প্রথাই রাজ্য-বিস্তারের প্রধান সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ইউরোপীয়গণ যেমন অসভ্যদেশগুলি আপনাদের রাজ্য মনে করিয়া আপনাদের মধ্যে তাহার অধিকার বণ্টন করিয়া লইতেছেন, সেকালে মুসলমান সুলতানও সেইরূপ করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মদঘোরী কুতবউদ্দীনকে সমগ্র ভারতবর্ষ দান করেন। বলা বাহুল্য, তখন পর্য্যন্ত ভারতের অত্যন্ত ভাগই মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কুতবউদ্দীন আবার নিজ পাত্রমিত্র, সেনাপতি বা সাহসী মুসলমান-বীরকে ভারতের নানা অংশ দান করিতে আরম্ভ করেন। বক্ত্রিয়ার খিলজি একজন সমরকুশল সেনাপতিরূপে পরিচিত হইবামাত্র, সম্রাট তাঁহাকে লাহোরে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে বিহার ও মুঙ্গেরের শাসন-কর্তৃত্বের সনন্দ দান করিলেন। বলা বাহুল্য, বিহার বা মুঙ্গেরে তখনও মুসলমানশাসন প্রবর্তিত হয় নাই।

বক্ত্রিয়ার এইরূপে প্রথমে জায়গীর এবং পরে বিহার ও মুঙ্গেরের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় নিযুক্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া সনন্দ না দিলে, তিনি জায়গীরদার থাকিয়াই জীবনবিসর্জন করিতেন। বক্ত্রিয়ার সনন্দলাভ করিয়া ক্রমে কতদিনে বিহারজয় করেন, মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে তাহার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার একটি মিন্‌হাজকর্তৃক সঙ্কলিত জনশ্রুতি; অপরটি সুমশায়িক লেখকগণের সুবিজ্ঞাত

ঐতিহাসিক তথ্য। মিন্‌হাজের সঙ্কলিত জনশ্রুতি এদেশের জনশ্রুতি নহে; তিনি বক্ত্রিয়ারের বিহারবিজয়ের প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে (১২৪৩ খৃষ্টাব্দে) নিজামুদ্দীন ও সামসুদ্দীন নামক বক্ত্রিয়ারের সেনাদলভুক্ত দুই ভ্রাতার নিকট গল্প শুনিয়াছিলেন,— “বক্ত্রিয়ার দুইশত অশ্বরোহী লইয়া দুর্গদ্বারে উপনীত হইবামাত্র বিহারজয় সুসম্পন্ন হয়।” অত্যাশ্চর্য ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বিহার-জয় এরূপ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয় নাই; দুই বৎসরের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের পর বিহার বক্ত্রিয়ারের করতলগত হইয়াছিল, এবং তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করিয়া মুসলমান-শাসন প্রবর্তিত করিতে আরও এক বৎসর অতীত হইয়াছিল। তিন-বৎসরব্যাপী অসংখ্য সংগ্রামকলহের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই; কিন্তু মুসলমানলিখিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়—বিহাররক্ষার্থ লক্ষ লক্ষ লোক জীবন-বিসর্জন করিয়াছিল। অবশেষে তোরণ, প্রাচীর, দুর্গ, প্রাসাদ, সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইলে, বিহার বিজেতার করতলগত হয়। দুইশত অশ্বরোহীর এত কার্য সম্পন্ন করা আরব্যোপ-ন্যাসের গল্পে শোভা পায়; ইতিহাস তাহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না।

মিন্‌হাজের ইতিহাসের অনুবাদক মেজর রাভার্ট ও অধ্যাপক ব্রুকম্যান উভয়েই সুলতানের সনন্দবলে বক্ত্রিয়ারের রাজ্যবিস্তারের কথায় আত্মসম্মতি করেন নাই। তাঁহারা বলেন,—বক্ত্রিয়ার স্বতন্ত্রভাবেই দেশজয় করিয়াছিলেন; কেবল সুলতানের প্রেরণা

বলিয়া তিনি উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়া মৌখিক অধীনতা স্বীকার করেন। যাহা হউক, বিহারবিজয়ের পর বক্ত্রিয়ার খিলিজির সম্বন্ধে মিনহাজের গ্রন্থে আর একটি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাহা অনেক পরবর্তী মুসলমানলেখকের গ্রন্থে এবং বাঙালীর উপন্যাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুপরিচিত হইয়াছে। গোলাম হোসেন উক্ত কাহিনী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

“মহম্মদ বক্ত্রিয়ার বিহার জয় করিয়া সুলতানের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রধান-অমাত্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বীরকীর্তি ও বক্রমান সৌভাগ্যশ্রী সাম্রাজ্যের সমুদ্রতুল্য প্রধান রাজ-পুরুষগণেরও বিষম ঈর্ষার বিষয় হইয়া পড়িল। তাঁহারা বক্ত্রিয়ারের সর্বনাশসাধনে একমত হইলেন। একদিন রাজসভায় বক্ত্রিয়ারের শোঁধা ও কার্যপটুতার বিস্ময়কর বিবরণ কথিত হইতেছিল, এমন সময়ে বক্ত্রিয়ারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ অমাত্যগণ কোশলে তাঁহার ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত সুলতানের নিকট একবাক্যে কহিলেন, ‘মহম্মদ বক্ত্রিয়ার স্বীয় অসীম শক্তির পরিচয়প্রদানের জন্য মন্তহস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।’ কুতবউদ্দীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— ‘সত্যই কি বক্ত্রিয়ার মনুষ্যের অসাধ্য-সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছেন?’ গোরবলোপভয়ে মূৰ্খতাবশত বক্ত্রিয়ার তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারই বিনাশসাধনের জন্য অমাত্যগণ এই চক্রান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, অতঃপর নির্দিষ্টদিবসে সম্রাট ও সাধা-

রণ জনগণ দরবারে উপস্থিত হইলেন। এক বলবান্ মন্তহস্তীকে সাদা কুঠীতে (কস্বে সফেদ) উপস্থিত করা হইল। বক্ত্রিয়ার সসজ্জ হইয়া গদাহস্তে হস্তীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার গুণ্ডে বিষম প্রহার করিলেন। সে আঘাতে চীৎকার করিয়া হস্তী রণভূমি ত্যাগ করিল। দর্শকগণ উচ্চৈঃ ধ্বনিতে বক্ত্রিয়ারের বিজয়শ্রীর সম্বর্ধনা করিলেন। সুলতান কুতবউদ্দীন লোকাভীত পরাক্রম দর্শন করিয়া বিস্ময় ও আনন্দের সহিত বক্ত্রিয়ারকে বহু মহার্ঘ উপহার ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। সম্রাট রাজ-পুরুষগণও সম্রাটের আদেশে বক্ত্রিয়ারকে বহু অর্থ উপহার দিতে বাধ্য হইলেন। মহম্মদ বক্ত্রিয়ার নিজ হাতে আরও কিছু অর্থ দিয়া ঐ সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি সমাগত জনগণকে বিতরণ করিলেন। বক্ত্রিয়ারের বীরত্ব ও মহত্ব দর্শনে কুতবউদ্দীন বিহার ও লক্ষৌতির অধিকার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে দিল্লী-অভিমুখে গমন করিলেন।”

এই কাহিনীর মূল কোথায়, তাহা এতকাল পরে নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহার মূলে কোন সত্য থাকিলে, তাহা অতিরঞ্জিত আকারে ইতিহাসে স্থানলাভ করায়, তদ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহস হয় না। তথাপি তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে, সুলতান কুতবউদ্দীন বিহার ও লক্ষণাবতী জয়ের ভার প্রদানের জন্য অলৌকিক বীরত্বের অপেক্ষা করিতেছিলেন; বক্ত্রিয়ার খিলিজি সেইরূপ বীর বলিয়া পরিচয় পাইবার পর তাঁহাকে সনন্দ দান করেন। এই অসুমান সত্য

হইলে, তাহা বাঙালীর বাহুবলের ও বঙ্গবিজয়ের মুসলমানের পক্ষে অলৌকিক শৌর্যবীৰ্য্য প্রদর্শনের প্রয়োজন থাকা প্রকাশিত করে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে হুই বৎসরের রণশ্রমে বিহার অধিকৃত হইলেও, হুইজন সৈনিকের অতিরঞ্জিত গল্পগুজবে মিন্‌হাজ হুইশত অশ্বারোহীর দ্বারা বিহারবিজয় সুসম্পন্ন হওয়া লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাসে যে অলৌকিকত্বের স্থানদান করিয়াছেন, বঙ্গবিজয়ের বর্ণনা করিবার সময়েও সেইরূপ সৈনিকের গল্পগুজব অবলম্বন করিয়া সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ-অধিকারের এক অসম্ভব কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কতদিনে কি উপায়ে বঙ্গভূমির কোন্ অংশ অধিকার করিতে বক্ত্রিয়ার খিলিজি কৃতকাৰ্য্য হন, তাহার আলোচনা করিলে সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক বীরত্ব নিতান্ত গল্পগুজব বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

যে কারণেই হউক, বিহারবিজয়ের পরেই যে বক্ত্রিয়ার বাঙলার সনন্দলাভ করেন, সে কথা মুসলমানের ইতিহাসে সৰ্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকৃত। এই সনন্দ লাভ করিবার সময়ে বঙ্গভূমি স্বাধীন; লক্ষণাবতী বা গোড় সে স্বাধীন-রাজ্যের ভারতবিখ্যাত রাজধানী; তজ্জন্ত বক্ত্রিয়ারের সনন্দে নবদ্বীপের পরিবর্তে লক্ষ্যভী অর্থাৎ লক্ষণাবতীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণাবতী অধিকারের জন্তই সনন্দ প্রদত্ত হয়। নবদ্বীপ রাজধানী থাকিলে সনন্দে নবদ্বীপের নামই উল্লিখিত হইত।

লক্ষণাবতী উত্তরবঙ্গের সুবিখ্যাত রাজধানী। তাহার পশ্চিমে মিথিলা এবং কাঙ্গ-কুজান্তর্গত জয়চন্ডের কাশীরাজ্য। জয়চন্ডের রাজ্য ইতিপূর্বে মুসলমানের অধিকারভুক্ত হওয়ার, মিথিলার সীমা পর্যন্ত মুসলমানসেনার আক্রমণপথ পরিকৃত হইয়াছিল। বিহার এবং মুন্ডের মুসলমানের করতলগত হওয়ার, লক্ষণাবতীর নিতান্ত নিকটবর্তী স্থানে সেনাসমাবেশ করিবারও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ-আক্রমণের পক্ষে এরূপ সুযোগ বর্তমান ছিল না। তাহা বাগ্‌ড়ীর অন্তর্গত বলিয়া, উত্তরে লক্ষণাবতী ও পশ্চিমে রাঢ়রাজ্য দ্বারা স্বভাবতই সুরক্ষিত ছিল। প্রথমে উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ অধিকার না করিলে, নবদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং বঙ্গভূমির মধ্যে প্রথমে নবদ্বীপ মুসলমান-কর্তৃক সহসা আক্রান্ত হওয়ার কথা নিতান্তই রচা-কথা। বক্ত্রিয়ার জীবিত থাকিতে রাঢ় অধিকার করিতে না পারায়, তাহার দ্বারা নবদ্বীপ অধিকৃত হওয়ার কাহিনীও নিতান্ত অবিশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয়। নবদ্বীপে রাজধানী থাকা সত্য হইলে, মুসলমানবীর বক্ত্রিয়ার খিলিজি নবদ্বীপেই রাজধানী স্থাপন করিতেন। কিন্তু মুসলমানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—লক্ষণাবতীতেই মুসলমানের প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর বক্ত্রিয়ার খিলিজি যে যে স্থানে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমস্তই উত্তরবঙ্গে; মুসলমানগণ দেশজয় করিয়া পাদমিত্র ও সেনানায়কগণকে জারঙ্গীর দিয়া দেশ শাসন করিতেন; উত্তরবঙ্গেই এইরূপ

অতি পুরাতন মুসলমান জায়গীরের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রদেশ প্রথমে মুসলমানের করতলগত হইলেও, সহসা সমস্ত স্থান অবলীলাক্রমে অধিকৃত হয় নাই ; দ্বাদশ বৎসরের আক্রমণ ও রণকোলাহলেও উত্তর

ও পূর্বাংশ স্বাধীন থাকিয়া বক্ত্রিয়ারের অলৌকিক শৌর্য্যবীৰ্য্য প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মুসলমানের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এখনও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

সার সত্যের আলোচনা ।

জ্ঞেয়স্থানের কেন্দ্র ।

পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে আছি'র সহিত আছ'র ঐক্য এবং তাহার অন্তর্ভূত জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের এবং কর্তার সহিত কর্মের ঐক্য— এই সকল ঐক্যের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে ; এবং বিগত প্রবন্ধে ঐ সকল ঐক্যের গোড়া'র বন্ধনগ্রন্থি কোন্স্থানটিতে, তাহার ঠিকানা নির্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত ঐক্যের প্রতি পাঠকের অমুসন্ধানদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সেই যে এক সর্বতঃপ্রসারিত অখণ্ডনীয় ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্বত্র ওতপ্রোত, তাহার নামই বা কি, আর তাহা পদার্থটাই বা কি ?

উপরি-উক্ত ঐক্যের একটা নাম দিতে হইলে “সার্বাত্মিক ঐক্য” এই নামটি আপাতত চলিতে পারে। সার্বাত্মিক ঐক্য কি ? না, ইংরাজিতে বাহাকে বলে Organic Unity.

উচ্চশ্রেণীর জীবশরীরে, বিশেষত মনুষ্য-শরীরে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নব-দ্বার-পুরের ঘাটিতে ঘাটিতে মস্তিষ্কের সন্তান-সন্ততির পাহারা বসানো রহিয়াছে। তার সাক্ষী বাহুখণ্ড দেখ, দেখিবে—এক প্রহরী বাহর মূলগ্রন্থিতে, এক প্রহরী কনুইস্থানে, এক প্রহরী মণিবন্ধে, পাঁচ-পাঁচ প্রহরী পঁচ-পঁচ অঙ্গুলিমূলে—নির্নিমেষনয়নে জাগিতোছে। এক-এক প্রহরী এক-একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ড। আনথাগ্র বাহুখণ্ডে এ যেমন দেখা গেল—আপাদমস্তক সর্ব-শরীরেই তেমনি। মস্তকের মূলতম মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশতি অঙ্গুলির বিংশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কনিকর পর্য্যন্ত যে একটি নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম দেওয়া হইল সার্বাত্মিক ঐক্য। মস্তকের সহস্রদল গণ্ডে সে ঐক্য যোগাদনে-বিয়াজমান

ঋষি তপোধন । হৃৎপদ্মে সে ঐক্য সিংহাসনে-বিরাজমান ক্ষত্রিয় মহারাজ । নাভিপদ্মে সে ঐক্য আহরণ-বাহরণ (আমদানি-রপ্তানি) প্রভৃতি বাণিজ্যকার্যের তত্ত্বাবধায়ক বৈষ্ণব মহাজন । সে ঐক্য—রাজা, মন্ত্রী, কর্মচারী ; ব্রথী, সারথি, পদাতিক ; যোগী, ভোগী, জ্ঞানী, কৰ্ম্মী ; সমস্তই একাধারে । সে ঐক্যের চক্ষু সকল স্থানেই—হস্ত সকল কাজেই । পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে যদি আঘাত লাগে, তবে সে ঐক্যের তৎক্ষণাৎ তাহা গোচরে আসিবে ; হস্তে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই ; বক্ষে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই । তেমনি আবার, হস্ত হইতে যদি অক্ষররাজি বাহির হয়, তবে ইহা স্থনিশ্চিত যে, তাহা শরীরের সার্বাস্থিক ঐক্য হইতেই বাহির হইতেছে ; পদ হইতে যদি ভ্রমণকার্য বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই ; কণ্ঠ হইতে যদি গীতধ্বনি বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই । এই যে এক সার্বাস্থিক ঐক্য, যাহা শরীরের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের অভাব সমস্তকে দিয়া এবং সমস্তের স্নাতব প্রত্যেককে দিয়া যুগপৎ পূরণ করাইয়া লইতেছে—এ ঐক্য কি কেবল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই আছে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি নাই—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিল তবে কোথা দিয়া ? যাহাকে বলা যাইতেছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তাহা আর-তো কিছু না—কেবল বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একস্থানের একটা শাখা । শাখাতে রদের সঞ্চার হয় কোথা হইতে ? অবশ্য মূল হইতে ।

তুমি হয় তো বলিবে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তক হইতে পদপ্রান্ত বড়-জোর সাত-হাত

দূরে অবস্থিতি করে ; কিন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নভস্তল হইতে রসাতল কোটি-কোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে । সাত-হাত স্থানের অবকাশ-রক্ত-নিকর অর্থাৎ বাঁঝুরি ঐক্যের প্রলেপদ্বারা ভরাট করিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কোটি যোজনের ব্যবধান পূরণ করা সোজা কথা নহে । কোটি যোজনের ছই পারের ছই বস্তকে আঁকড়িয়া পাইতে হইলে—তাহা যিনি করিবেন, তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গমর্ত্যপাতাল ভেদ করিতে পারিবার মতো তীক্ষ্ণ হওয়া চাই ; তাঁহার বাহুদ্বয় স্বর্গমর্ত্যপাতাল পরিবেষ্টন করিতে পারিবার মতো দীর্ঘ হওয়া চাই । ইহার উত্তর এই যে, কিছুই চাই না—কেবল চক্ষু-ছটা উন্মীলন করা চাই । সবিভা দেব কি শতকোটিযোজন দূর হইতে পৃথিবীকে অবলোকন করিতেছেন না ? শতকোটি-যোজন দূরে থাকিয়াও পৃথিবীর হস্তধারণ করিয়া রাশিচক্রে দোড়াদোড়ি করাইতেছেন না ?

পিপীলিকার মস্তক এবং পদতলের মধ্যে যেরূপ অল্প ব্যবধান, তাহাতে পিপীলিকা বলিলেও বলিতে পারে যে, হস্তীর পদাঙ্গুলি হস্তীর ললাটশিখর হইতে কোটিযোজন দূরে অবস্থিতি করে, স্তত্রাং ছয়ের- মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন স্থান পাইতে পারে না । তবে কিনা—পিপীলিকার যুক্তি পিপীলিকাকেই শোভা পায়—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে শোভা পায় না । কেন না, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকটে একথা গোপন থাকিতে পারে না যে, হস্তীর মস্তক এবং পদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও ছয়ের মধ্যে ঐক্যের

বন্ধন যথেষ্ট দৃঢ়, আর, পিপীলিকার মস্তক এবং উদরের মধ্যে অতীব অল্প ব্যবধান সত্বেও ছুরের মধ্যে বন্ধনের আঁট খুবই আলগা ।

যদি এমন হয় যে, একাদ্রবর্তী পরিবারের মধ্য হইতে দশ ভাই দশ দিকে ছটকিয়া পড়িলে ভ্রাতাদিগের কাহারো তাহা বড়-একটা গায়ে লাগে না, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাধুনি বড় আলগা । কিন্তু যদি এমন হয় যে, দশ ভাইয়ের মধ্য হইতে এক ভাই পৃথক্ হইলে তাহার তো মর্ষবেদনা উপস্থিত হয়ই, তা ছাড়া অপর নয় ভাইয়ের প্রত্যেকেরই প্রাণে আঘাত লাগে, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাধুনি অত্যন্ত সূদৃঢ় । অতএব এটা যখন সকলেরই দেখা কথা যে, পিপীলিকার কিংবা বোলতার শরীর মধ্যদেশে বিখণ্ডিত হইলে তাহার পূর্সার্দ্ধ এবং পশ্চার্দ্ধ উভয় খণ্ডই মিনিট-দশেক ধরিয়া জীবিত থাকে ; পশ্চা-ত্তরে, হস্তীর সেরূপ হইলে উভয় খণ্ডেরই যুগপৎ প্রাণবিয়োগ হয় ; তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সার্বস্বিক ঐক্যের বন্ধ-নের আঁট পিপীলিকাদেহে বড়ই আলগা, হস্তিদেহে রীতিমত দৃঢ় । তা ছাড়া, বিজ্ঞান-বিং পণ্ডিতদিগের মতে এটা একটা নির্ঘাত বৈদবাক্য যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য শতকোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে, ইহা সত্য হইলেও সূর্য্যের জীবনই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যের আলোকই পৃথিবীর আলোক, সূর্য্যের বলই পৃথিবীর বল । এইজন্ত বলিতেছি যে, সার্ব-স্বিক ঐক্যের নিকটে স্থানাস্থান নাই, কালা-কাল নাই, পাত্রাপাত্র নাই, দূর-নিকট নাই,

বড়-ছোটো নাই । কিন্তু কি হিসাবে নাই ? সত্তা-হিসাবেই নাই । শক্তি-হিসাবে—স্থানা-স্থানও আছে, কালাকালও আছে, পাত্রাপাত্রও আছে, দূর-নিকটও আছে, বড়-ছোটোও আছে । তার সাক্ষী—সত্তা-হিসাবে (অর্থাৎ শুদ্ধকেবল ‘অস্তি-নাস্তি’ বিবেচনায়) শরীরের সার্বস্বিক ঐক্য মস্তকের উচ্চ শিখরেও যেমন—পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতেও তেমনি—উভয় স্থানেই সমান । কিন্তু শক্তিহিসাবে (অর্থাৎ শক্তির কর্তৃস্থানই বা কোথায় এবং কর্মস্থানই বা কোথায় ; কে চালক, কে চালিত ; এইরূপ চালা-চালক-বিবেচনায়) শরীরের মধ্যে মস্তকই সার্বস্বিক ঐক্যের প্রধান আসন । সর্বশরীর ব্যাপিয়া সার্বস্বিক ঐক্য একই ঐক্য—এ কথা খুবই সত্য ; কিন্তু এ কথাও তেমনিই সত্য যে, সেই একই ঐক্য মস্তকের উচ্চমঞ্চে সারথিরূপে অধ্যাসীন রহিয়াছে এবং পদযুগে অশ্বযুগলরূপে যোজিত রহিয়াছে । ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাকে এক বলিয়া ভাবনা করিবার সময় আমরা ‘মস্তিকমণ্ডলেই মনঃসমাধান করি—পদযুগে মনঃসমাধান করি না ।

মস্তিকমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব-স্বিক ঐক্যের প্রধান আসন, দৃশ্যমান সূর্য্য তেমনি সৌরজগতের সার্বস্বিক ঐক্যের প্রধান আসন ; আদিসূর্য্য তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্বস্বিক ঐক্যের প্রধান আসন । এইজন্ত সৌরজগৎকে এক বলিয়া ভাবনা করিতে হইলে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি প্রা-নত লক্ষ্যসমাধান করা আবশ্যক হয় ;—বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতেরা করেনও তাই । বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতেরা বলেন যে, ক্ষুদ্র

পুরাকালে সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া সূর্য্য একাকী অবস্থিতি করিতেছিলেন; কালক্রমে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ এবং তাহাদের এক ভগ্নী আমাদের এই পৃথিবী মাতা প্রসূত হইলেন। সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি প্রসূত হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যের আর-এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা।

এ তো গেল পুরাণো কালের পুরাণো কথা। তা ছাড়া, বর্তমানে আমাদের চক্ষের সম্মুখে কি হইতেছে— সে কথাটিরও খবর রাখা চাই; কেন না, সেইটাই কাজের কথা। বর্তমানের সৌর-সমাচার বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান তাহার তান্ত্রিকী ভাষায়—এক প্রকার ছেঁদো কথায়—যে-সকল অদ্ভুত রহস্য-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা বিধিমত টীকা এবং ভাষ্যের দ্যোতনা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা অসুকঠিন। তাহার মধ্যে প্রধান একটি রহস্যকথা এই যে, খনিগর্ভস্থিত অঙ্গারের ভিতরে সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে;—অঙ্গারকে যখন প্রজ্জ্বলিত করিয়া কাজে লাগানো যায়, তখন তাহার সেই বহু-পুরাতনকালের সঞ্চিত গুপ্তধন অগ্নি-আকারে প্রকাশে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এইখানেই থামিতেছে না; অধিকন্তু আমরা জানিতে চাই এই যে, সূর্য্য-রশ্মি কি কেবল অঙ্গারের ভিতরেই সংগোপিত রহিয়াছে—আর কোথাও সংগোপিত নাই?

বিজ্ঞান বলেন এই যে, সকল বস্তুই অন্তঃপুরে তড়িতের প্রকৃতিপুরুষান্বিত।

যুগলমূর্ত্তি (Negative এবং Positive Electricity) একত্রে নিলীন রহিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে বহিঃক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় জোড় ভাঙিয়া দৌড়ে ছই দিকে যুগল ফিরাইয়া দাঁড়ায়। তাহার পরে কোনো প্রকার সন্ধীর্ণ ব্যবধানের ছই পারে দাঁড়াইয়া দৌহার সহিত দৌহার যখন চোথোচোখি হয়, তখন হতাশন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং সেই প্রজ্জ্বলিত হতাশনে যুগল-তড়িৎ একীভূত হইয়া যায়। তার সাক্ষী—আকাশের বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের উদ্ভাসনে নর-তড়িৎ এবং নারী-তড়িৎ কেমন আগ্রহের সহিত বিচ্ছেদের বাঁধ ভাঙিয়া-ফেলিয়া একত্র সম্মিলিত হয়, আর, কেমন তেজের সহিত উভয়ের অন্তঃনিগূঢ় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে, সকল বস্তুতেই যুগল তড়িৎ একত্রে নিলীন রহিয়াছে বলাও যা, আর, সকল বস্তুতে অগ্নি নিগূঢ় রহিয়াছে বলাও তা—একই কথা।* এই যে অগ্নি, যাহা সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহা পদার্থটা আর-কিছু না—সূর্য্যেরই প্রভাবাংশ। অগ্নি একপ্রকার পৃথিবীস্থ সূর্য্য। তবেই হইতেছে যে, সুদূর পুরাকালেও যেমন, এখনো তেমনি, সূর্য্যের প্রভাবাগ্নি সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া জ্বলন্ত-স্থল-অনলে-অনিলে সর্বত্র পুষ্পাশুপুষ্পরূপে অমুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আসন শুটানো থাকিলেও আসন, বিছানো থাকিলেও আসন; তেমনি, সৌরজগৎ সূর্য্যে বিলীন থাকিলেও

* শক্তির বহুরূপিতা (Transformation of forces) বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। এক অগ্নি—উত্তাপ, আলোক এবং তড়িৎ, তিনের একাধার। বস্তু-পক্ষে তিনের মধ্যে প্রভেদ নাই।

তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব, সূর্য্য হইতে ছট্‌কিয়া বাহির হইলেও তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব ।

ছট্‌কিয়া বাহির হওয়ার নামই প্রকটিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া বা আবির্ভূত হওয়া ; আর, আবির্ভূতির প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্ছে স্বপ্নের প্রতিযোগ। জল ডাঙার প্রতিযোগে প্রকাশিত হয় ; ডাঙা জলের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয় ; বনকানন-গিরি-নদী-সাগরের বিচিত্র বর্ণসকল পরস্পরের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। বর্ণবৈচিত্র্য আলোকের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয় ; আলোকও তেমনি আবার বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। গোড়া'র প্রতিযোগ হ'চ্ছে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের প্রতিযোগ, অথবা, আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগ, আর, তাহার আত্মবলিক আর-হুইটি অবাস্তরশ্রেণীর প্রতিযোগ হ'চ্ছে—(১) আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগ ; (২) অন্ধকার এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগ ; নিম্নে দেখ :—

(১) প্রতিযোগ

আলোক বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার

(২) প্রতিযোগ

(৩) প্রতিযোগ

প্রতিযোগের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা প্রকাশেরই জন্ত। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকা চাই, তা নহিলে প্রকাশের সমুচিত সার্থকতা হয় না। প্রতিযোগের পথ দিয়া যেমন প্রকাশ ফুটিয়া বাহির হয়, সংযোগের পথ দিয়া তেমনি আনন্দ ফুটিয়া বাহির হয়। শাস্ত্রের মতামুসারে প্রকাশও যেমন—আনন্দও তেমনি, দুইই সত্ত্বগুণের

ধর্ম। সত্ত্বগুণ বলিতে সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ, তিনই একসঙ্গে বুঝায়। সত্ত্বগুণ যে সত্তাবাচক, তাহা তাহার গারে লেখা রহিয়াছে। কবিত্ব এবং কবিতা যেমন একই কথা, সত্ত্ব এবং সত্তাও তেমনি। তা ছাড়া, সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম দুইটি ; একটি হ'চ্ছে প্রকাশ এবং আর-একটি হ'চ্ছে আনন্দ। খাপছাড়া রকমের প্রকাশে আনন্দ হয় না, চৌকোষ রকমের প্রকাশেই আনন্দ হয়। অন্ধকার এবং আলোকের প্রতিযোগ মাত্রাতীত হইলে একদিকে আলোকের প্রকাশ অতিশয় ভীষণভাবে ধারণ করে, আর-এক দিকে অন্ধকারের প্রকাশ অতিশয় ভীষণভাবে ধারণ করে। তাহাতে দর্শকের মন ব্যথিত হয়। প্রতিযোগ দর্শকের চক্ষে-অঙ্গুলি দিয়া দৃশ্য-বস্তুসকলের প্রভেদলক্ষণ দেখাইয়া দ্বার, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলে। সংযোগ সকলের মধ্যে সদ্ভাব, সামঞ্জস্য এবং শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের অভাব সকলকে দিয়া এবং সকলের অভাব প্রত্যেককে দিয়া পূরণ করাইয়া লয়। আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের সুব্যবহাৰমতো সংযোগ হইলে, বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে এবং আলোক হইতে অন্ধকারে ওঠা-নাবার পথ সুগম এবং সুব্যবহ হইয়া যায়, আর, সেই-গতিকে তিনের (কিনা আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের) প্রকাশও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, আর, প্রকাশের মধ্য দিয়া আনন্দও ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পায়। আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে—প্রতিযোগের

উপলব্ধি খুবই সহজ ; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সংযোগের উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ । আলোক এবং অন্ধকার, অথবা অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, দুইকে এক করিয়া দ্যাখা-ও যা, আর, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইকে এক করিয়া দ্যাখা-ও তা—একই কথা । জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কে এক দৃষ্টিতে দ্যাখা প্রথম উদ্ভমেই সাধকের পক্ষে সম্ভাবনীয় নহে ; তাহার পূর্বে জ্ঞেয়-জগৎকে একীভূত করিয়া দেখিতে শেখা চাই । প্রথমে আত্মার জ্ঞেয়স্থানে (অর্থাৎ জ্ঞানচকুর সম্মুখে) সার্বস্বিক একত্বের দর্শন পাওয়া চাই ; তাহা হইলেই বৃক্ষানলে বৃক্ষানল মিশিয়া যেমন দাবানল হইয়া উঠে, তেমনি সম্মুখে বিরাজমান জ্ঞেয়স্থানের একত্ব

এবং পশ্চাতে নুষ্কারিত জ্ঞাতৃস্থানের একত্ব, এই দুই একত্ব একত্রে মিলিয়া আত্মার সার্বস্বিক একত্ব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে । তাই বলিতেছি যে, প্রথম উপক্রমে আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচকুর সম্মুখে দেখিতে হইবে । বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে । বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানে বা সমষ্টিস্থানে বা হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক । শেষের এই কথাগুলি অতীব সংক্ষেপে বলিলাম ; বারান্তরে তাহা সবিস্তরে পর্যালোচনা করা যাইবে ।

শ্রীবিজ্ঞানেশ্বর নাথ ঠাকুর ।

শিশু ।



তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?
কোমল গারে দিল পরারে
রঙিন্ আঙিয়া !
বিহান-বেলা আঙিনা-তলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া !
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া ?

কিসের স্বখে সহাসম্মুখে
নাচিছ বাছনি !

ছয়ারপাশে জননী হাসে
 হেরিয়া নাচনি !
 তাথেই খেই তালির সাথে
 কঁকণ বাজে মায়ের হাতে,
 রাখালবেশে ধরেছ হেসে
 বেণুর পাচনি !
 কিসের স্মৃতি সহাসমুখে
 নাচিছ বাছনি !

ভিখারি ওরে, অমন করে'
 সরম ভুলিয়া
 মাগিস্ কিবা মায়ের গ্রীবা
 আঁকড়ি' ঝুলিয়া !
 ওরেরে লোভি, ভুবনখানি
 গগন হতে উপাড়ি আনি
 ভরিয়া ছুটি ললিত মুঠি
 দিব কি ভুলিয়া ?
 কি চাস্ ওরে অমন করে'
 সরম ভুলিয়া ?

নিখিল শোনে আকুল মনে
 নুপুর-বাজনা ।
 তপন-শশী হেরিছে বসি
 তোমার সাজনা ।
 ঘুমাও যবে মায়ের বৃকে
 আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
 জাগিলে পরে প্রভাত করে
 নয়ন-সাজনা !
 নিখিল শোনে আকুল মনে
 নুপুর-বাজনা ।

ঘুমেয় বুড়ি আসিছে উড়ি
 নয়ন-ঢলানী,

গায়ের-পরে-কোমল-করে-

পরশ-ভুলানী !

মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি

জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,

ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে

ভুবন-ভুলানী !

যুমের বৃদ্ধি আসিছে উড়ি

নয়ন-ভুলানী !

সুযাযুযি ।

গত বৈশাখমাসের বঙ্গদর্শনে ‘রাজকুটুম্ব’-
শীর্ষক প্রবন্ধে নিযুইণ্ডিয়ার প্রকাশিত কোন
রচনার সমালোচনা করা হইয়াছিল। নিযু-
ইণ্ডিয়ার সম্পাদকমহাশয় আমাদের কাছে ভুল
বুঝিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, এক
গালে চড় খাইয়া অল্প গাল ফিরাইয়া দেওয়া
যদি-বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজল-
প্রবাহে আহতগণের আঘাতবেদনার উপশম-
চেষ্টাই আমাদের মতে শ্রেয়।

ইংরাজের ঘৃষিঘাষা খাইয়া নাকিসুরে
নাগিশ করা এদেশে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত
অধিকমাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে
ঢেলা মারিলে পৃথিবীমুখ কাক যেমন চীৎকার
করিয়া মরে, দেশি লোকের মার খাইবার
খবরে আমাদের খবরের কাগজগুলি তেমনি
করিয়া অবিশ্রাম বিলাপপরিচায়ে আকাশ
বিলীর্ণ করিত।

আমরাই সর্বপ্রথমে ‘সাধনা’পত্রিকায়
এই নাকিকামার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি

উত্থাপন করিয়াছি—এবং কথঞ্চিৎ ফললাভ
করিয়াছি, তাহাও দেখা যাইতেছে। আজ
হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোন কারণ
ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

ছবিতে যেমন চৌকা জিনিষের চারিটা
পাশই একসঙ্গে দেখান যায় না, তেমনি
প্রবন্ধেও এক সঙ্গে একটা বিষয়ের একটা,
বড় জোর, দুইটি দিক্ দেখান চলে। রাজ-
কুটুম্ব প্রবন্ধেও আমাদের বক্তব্য বিষয় খুব
ফলাও নহে। নিযুইণ্ডিয়ার সম্পাদকমহা-
শয় যখন ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সম্ভবত আমা-
দের রচনার কোন ত্রুটি থাকিতে পারে।
এবারে ছোট করিয়া এবং স্পষ্ট করিয়া বলি-
বার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়,
এই দুই পক্ষের অবস্থা লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ
তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলাম রাত্রি। আমরা
কোন পক্ষকেই কর্তব্যসম্বন্ধে কোন উপদেশ
দিই নাই।

যে লোক জলে পড়িয়াছে, ডাঙা হইতে তাহাকে টিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ । অপরাধের সে মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত । এরূপ স্থলে কোন্ পক্ষকে কাপুরুষ বলিব ? যে মারে, না যে মার ফিরাইয়া দেয় না ?

ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ—কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে । সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে কারণকে উপেক্ষা করা হইতে পারে । তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাত্তের বল আরো অনেক বেশি । তাহার দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল । আমি যেমন একটি মানুষ, সে-ও যদি তেমনি একটি মানুষমাত্র হইত, তবে আমরা কতকটা সমকক্ষ হইতাম । কিন্তু এহলে আমি একটি বাক্তিমাত্র, আর সে ইংরাজ, সে রাজশক্তি । বিচারকালে, মানুষ বলিয়া আমার বিচার হইবে, আর তাহার বিচার হইবে ইংরাজ বলিয়া ।

আর, আমি যখন ইংরাজকে মারি, তখন বিচারক সেটাকে এই বলিয়া দেখে যে, ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে আমি আঘাত করিলাম—ইংরাজের প্রেঙ্টিজকে আমি ক্লম করিলাম—অতএব সামান্য আঘাতকারী বলিয়া আমার বিচার হয় না ।

আমাদের মধ্যে এই গুরুতর অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায়, তাহার চেয়ে যে মারে, সেই কাপুরুষ বেশি । এই কাপুরুষতার জন্ত ইংরাজ আঘাতকারী বিচারে নিরুতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে দিক্কারলাভ করিত, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম । কিন্তু দেখিতে পাই, উল্টা

তাহারা বেশি করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে । তাহাদের জন্ত চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আহা-উহর অন্ত থাকে না । অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এইরূপ কাপুরুষতার জন্ত কেবল প্রকাশে ভিক্টোরিয়া ক্রস দেওয়া হয় না, এই পর্য্যন্ত !

সম্প্রতি একজন দেশি লোককে খুন করিয়া মার্টিন বলিয়া একজন ইংরাজের দ্বিতীয়বার বিচারে তিনবৎসর জেল হইয়াছে । ইহার পর হইতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজে করূপ আতঙ্কের আর্দ্রনাদ উঠিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত নমুনাটি কৌতুকজনক :—

There are some things that foreign Governments, and even Native States in India, manage better than we do ; one of these is the protection of their own kith and kin, and the maintenance of that prestige so necessary for upholding constituted authority. To the disinterested observer in India, it seems that the white man is becoming very much discounted under the ægis of the British "Raj." Time was when the Britisher, as conqueror and ruler of this land, enjoyed certain rights and privileges, and one of these was his right to be tried by jury. Quite recently we have had the spectacle of the unanimous verdicts of juries, acquitting Europeans, charged with offences triable by these tribunals, set aside, not because there was any outcry against such acquittals, or on the application of the prosecution, but on appeal by the Government against the acquittal. To quote one specific instance, we may refer to the trial of Mr. Rose,

of Dulu Tea Estate, Cachar. The relations between Europeans and natives are becoming acutely antagonistic, and this racial gulf is being widened by the violent writings of the native press. The time has arrived to look into this question a little more closely. The unprovoked assaults on Europeans, especially soldiers, are becoming increasingly frequent. Europeans are insulted, abused and jeered at by the lowest type of natives and if they retaliate, they are set upon by a mob. If the European gets badly mauled, nothing is done, no one cares, but if in the brawl he happens to seriously hurt one of his numerous assailants, in the exercise of his right of self-defence, he is tried for his life and liberty. This we say is one-sided and it behoves the Government to look a little deeper into the causes at work that bring about these frequent conflicts between Europeans and natives.

দেখ, এই একটি সামান্য ঘটনায় ইংলিশ-ম্যান্ কম্পাধিত। অত্যাচার করিবার অশ্রুতি-হত ক্ষমতা যদি কোন উপায়ে একটু থক্ক হয়, তবে কি আতঙ্কের বিষয়! ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, এদেশে ইংরাজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে। করিতে পারে করুক—কিন্তু ইহার পরে ভীকৃতার অপবাদ আমাদিগকে দেওয়া আর চলে না।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অপকৃ-পাত বিচারে “কঙ্কর” ও “কলস”দের যে

প্রেক্ষিজের হানি হয়, এ আশঙ্কা এ দেশের সাধারণ ইংরাজের মনে জাগিয়া আছে—জঙ্ক এবং জুরি নিতান্ত অসাধারণ না হইলে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অপকৃপাতে সুবিচার করিতে যাহারা ভয় করে, তাহারা একদিকে আমাদের পক্ষে ভয়ানক, তেমনি আর একদিকে তাহাদের এই ভীকৃতাই আমাদের কাছে তাহাদের দুর্বলতা প্রতিপন্ন করে। আমাদের কাছে ইহাতে তাহাদের মর্যাদা কমিয়া গেছে। এখন আমরা ইংরাজকে ঘরে-ঘরে এবং মনে-মনে খাট করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি একসময়ে আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি করিয়া দিয়াছিল, এখন আমরা ক্রমশই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্ম্মনীতির যে আদর্শ, তাহা প্রত্যহ আমাদের কাছে উজ্জলতর হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য বর্করতার নগ্নমূর্ত্তি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্রয়লাভের জঙ্ক আমাদের স্বদেশীয় কুলায়ের মধ্যেই একেএকে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি। এইরূপে আমাদের অপমানের মধ্য দিয়াও আত্ম-সম্মানের পথ কিরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার আভাস ছিল।

আর একটি কথা ছিল, বোধ হয় “নিয়ু-ইণ্ডিয়া” সম্পাদক মহাশয় সেইটেতেই আপত্তি করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে একান্তবর্ত্তি-পরিবার-প্রথা এমন যে, বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে সর্বপ্রকারে বিরোধের অপেক্ষা মিলনের জঙ্কই প্রোত করে। আমাদিগকে আত্মত্যাগ এবং ধৈর্য্যই শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা যদি ক্ষমার

দীক্ষিত না হই, তবে এতগুলি লোকের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়। অতএব আমরা যে খণ্ড করিয়া কাহারো নাক-চোখের উপর ঘুষি মারিতে, বা ভূপতিত ব্যক্তির মুখের উপর বা রাগ করিয়া কাহারো তলপেটে উপর্যুপরি লাথি মারিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের সাহসের অভাব নহে—তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শে আমাদেরকে নিরীহ করিয়াছে। ইংরাজ কথঞ্চিৎ পরিহাসের ভঙ্গীতে আমাদেরকে “mild Hindu” বলিয়া থাকে—বস্তুতই আমরা মাইল্ড হিন্দু। ইহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতেছি এবং এখন বর্তমান অবস্থায় কি করা কর্তব্য, তাহাও বিচার্য—কিন্তু মাইল্ড বলিয়া আমাদের লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিবার কথা নহে। ভারতবাসী মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়া যে কাহাকেও আক্রমণ করে না, তাহা নহে—বোয়ারযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় তুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে যে, তাহারা বিনা উত্তেজনাতেও অবিচলিতভাবে মৃত্যুর মুখের সম্মুখে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে—* কিন্তু তাহার ধর্ম, তাহার সমাজ, তাহার হিংস্রপ্রবৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছে—এতদূর করিয়াছে যে, তাহাতে তাহার স্বার্থহানি ও অসুবিধা ঘটে এবং তাহার মানহানি ঘটিতেছে। এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়, তবে ভীকৃতাকে যে ভাষায় করিবে, ইহা-কেও কি সেই ভাষায় করিবে ?

যাহাই হউক, ইংরাজের মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কি কি কারণে সহজ নহে, “রাজকুটুম্ব” প্রবন্ধে তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ফিরাইয়া দেওয়া উচিত কি না, সে কথা তুলি নাই। কর্তব্য হুঃসাধ্য হইলেও কর্তব্য—বরঞ্চ সে কর্তব্যের গৌরব বেশি। এলাহাবাদের কোন দেশীয় ধনী ব্যাঙ্ক স্বহরক্ষা উপলক্ষ্যে তাঁহার কোন ইংরাজ ভাড়াটিয়াকে ফুলগাছের টব লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন—সেই স্পর্দ্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। স্বহরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোন ইংরাজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে, এ আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও যখন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখন ইংরাজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়মসম্বন্ধে আমার স্নগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

স্বভাবের নিয়মের অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে। কিন্তু সে নীতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত বাধা পরাভূত করিয়া নিজেই ছনিবারভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বভাবের নিয়মকেই আশ্রয় করিতে হয় !

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ঘুষাঘুষির উত্তেজনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের ধর্ম-

* স্ত্রাভেন্সল্যাণ্ডের নামক ভ্রমণকারী যখন তিব্বতভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় ভৃত্যই প্রাণভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কেবল চম্পনসিং ও মানসিং বলিয়া তাঁহার যে দুটিমাত্র হিন্দুভৃত্য ছিল, তাহারা কখনো পলায়নের চেষ্টামাত্রও করে নাই—তাহারা আসন্নমৃত্যুর লক্ষ্য এবং অসহ্য উৎপীড়নেও অবিচলিত থাকে—অথচ নূতন দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা, সমাজে যশের প্রত্যাশা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাইয়া অর্থলাভের প্রলোভন, তাহাদের কিছুই ছিল না। তাহাদের প্রভুও বিদেশী এবং অন্ধদিনের—কিন্তু তাহারা হিন্দু, অতীত মারিবার ক্রম তাহারা সর্বদাই উদ্ভূত নয়, অথচ মরিতে ভয় করে না।

নীতিতে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। অশুভপ্রযুক্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্দান করে না। তাহাকে দাস-ত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়। কোন কোন ছর্তুত মদ না খাইলে যেমন কাজ করিতে পারে না, বিদ্বেষ সেইরূপ অন্ধ না হইলে পূরাদমে কাজ করিতে পারে না। গুণাগিরিকে যদি একবার রীতিমত জাগাইয়া তুলি, তবে সে অন্ধ-বিদ্বেষের নেশায় না মতিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে উঠিয়া-পড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চতন মনুষ্যত্বের বুকের রক্ত হইতে সে প্রতিদিন তাহার থোরাব আদায় করিতে থাকিবে। গুণাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মনুষ্যত্বকে শোষণ কহর—বাহাদুরির নেশা জাগিয়া ওঠে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, গুরু উপদেশে কোন ফল হয় না—অভ্যাস তাহা অপেক্ষা দরকারী জিনিষ। মারা উচিত বলিলেই মারা যায় না, মারা অভ্যাস করা চাই। যাহাদের যুঁষি প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহারা শিশুকালে প্রতিবেশীর ছেলেকে মারে, বিজালয়ে সহপাঠকে মারে, কলেজে *gownsmen* হইয়া *townsmen*কে মারে—এমনি করিয়া একেবারে এমন পাকিয়া যায় যে, তাহাদের ধর্মগ্রন্থের উপদেশ অরণ্যে রোননে পরিণত হয়। তাই হর্বাট স্পেন্সার তাঁহার *Facts and Comments* গ্রন্থের ৩০তম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—

But the refusal to recognize the futility of mere instruction as a means to moralization, is most strikingly shown by ignoring the conspicuous

fact that after two thousand years of Christian exhortations, uttered by a hundred thousand priests throughout Europe, pagan ideas and sentiments remain rampant, from emperors down to tramps. Principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood: the obligation being so peremptory that an officer is expelled the army for even daring to question it. And in international affairs the sacred duty of revenge, supreme with the savage, is supreme also with the so-called civilized.

ইহা না হইয়া যায় না। চালের একটি খড় পোড়াইতে গেলেও সমস্ত চালে আগুন লাগে। কাড়াকড়ি-ঘুমাবুধিকে সমাজের সর্বত্র প্রচলিত করিলে, তবেই আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।

টুথ প্রকৃতি বিলাতি কাগজে পুলিশ-আদালতের বিবরণে নিজেই স্বীকে, পুত্র-কন্যাকে, আত্মীয় প্রতিবেশীকে যেরূপ নিশ্চম পাশবভাবে আঘাত করার উদাহরণ দেখিতে পাই, আমাদের হিন্দুসমাজে তাহার সিকির সিকিও দেখা যায় না। শিকারী বিভালের গোফ দেখিলেই চেনা যায়;—কে পীলা ফাটাইবে এবং কাহার পীলা ফাটিবে, এই পুলিশের বিবরণী হইতেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

আমাদের দেশে ছেলেতে-ছেলেতে ঝগড়া যদি মারামারি পর্য্যন্ত ওঠে, তবে বাহাতে আঘাত গুরুতর না হয়, লড়াইকারীর সে চেঁচা বরাবর থাকে—গালে চড়, পিঠে চাপড়ের উর্কে প্রায় ওঠে না। সে আমাদের সমাজের শিক্ষা;

দূর হইতে সূদূরে আশ্রয়তা বিস্তার করাই আমাদের অভ্যাস,—আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়া বাস করি—আমরা যদি ক্ষমা না করি, ধৈর্য্য না ধরি, তবে আমাদের সমাজ ভাঙিয়া যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা বার্থ হয় ।

অতএব আমাদের হুই জাতের হুইরকম আচরণ । যুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমীক্ষের ব্যবহার পরস্পর-বিরোধী । আমাদের সমাজ ক্ষমা, ধৈর্য্য, সন্তোষ ও সর্বভূতে দয়া, এই শাস্ত্রমতের অমুকূলে প্রতিষ্ঠিত । এই সমাজে সূদীর্ঘকাল হইতে আমাদের চরিত্র গঠিত । অতএব মারামারিতে আমাদের গিকে ইংরাজের কাছে হঠিতে হয়—কেবল ভয়ে নহে, অনভ্যাসে ।

যদি হঠিতে না চাও, তবে শিশুকাল হইতে ঘরে-পরে সর্বত্র তাহার আয়োজন করিতে হয় । যাহা আমার, তাহাতে কাহাকেও অংশ বসাইতে দিব না ; যাহা পরের, তাহা ভবদখল করিতে চেষ্টা করিব ; ছন্দল সহপাঠীর উপর অত্যাচার করিব ; ঘৃণি মারিবার সময় কাহারো নাকচোখ বাচাইয়া চলিব না, এবং নিষ্ঠুরতার বিষণ্ণ হওয়াকে পৌরুষের অভাব বলিয়া গণ্য করিব ।

এইরূপে যখন আমাদের আমূল পরিবর্তন হইবে, তখন ইংরাজে-দেশীতে হাতাধাতি সমানভাবে চলিবে । বাঘে-সিংহে খাবা-মারামারি যেমন অত্যন্ত আনন্দজনক দৃশ্য, আমাদেরও দাঁতভাঙাভাঙি সেইরূপ পরম কৌতুকবহু হইতে পারিবে ।

নতুনাকি হইবে ? যে ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে ও পুরুষাঙ্কমে স্বভাববর্ষর নহে, সে যদি কর্তব্যের অহুরোধে চোখকান বুজিয়া

প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভীষণ বর্ষরতাকে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত নথ-দস্ত কোথায় মিলিবে ? আমরা উপদেশের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ আরম্ভ করিব, কিন্তু যে নিষ্ঠুর বিদ্রোহ উদ্ভূত হইয়া উঠিবে, সেই হলাহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদের নাই ।

আমি এ কথা ভয় হইতে বলিতেছি না । দাঁতভাঙা, নাক-খাবড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অন্তঃ বলিয়া গণ্য নাই হইল । কিন্তু যে গরলকে পরিপাক করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম, সেই গরলকে উদ্ভিজ্জ করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না, জানি না ।

কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন ফলাফল বিচার অসম্ভব এবং অজ্ঞায় । ইংরাজ যখন অজ্ঞায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত । ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয় ত ঘুমায় পারিব না এবং হয় ত বিচার-শালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব ; তথাপি অজ্ঞায় দমন করিবার জন্ত প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মানুষের নিকট হয় এবং ধর্ম্মের নিকট পতিত হইব । নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অজ্ঞায়, তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অজ্ঞায় এবং বিধাতার জ্ঞানদণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে । বিদ্রোহ হইতে, বাহাদুরি হইতে,

স্পর্শ হইতে নিজেকে সর্বপ্রথমে বাঁচাইয়া, জ্ঞাননীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া ছুটশাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শারীরিক কষ্ট, ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে 'গুণা' হইয়া উঠি। আমরা দেখিয়াছি, ছুই-দিক্ বাঁচাইয়া চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভালমন্দ ওজন করিয়া অনেকসময় আমাদিগকে একটা দিক্ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ধর্মের

সঙ্গে সেরূপ রক্ষা করিতে গেলেই সেই ছিদ্র-যোগে শনি প্রবেশ করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে, তাহা অত্যন্ত দুর্বল হইলেও তাহাই আমাদিগকে নিয়ন্ত্রণে অহুসঙ্কান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। ধর্মের এই অমৌখ নিয়ম হইতে যুরোপ বা এশিয়া কাহারো নিষ্কৃতি নাই।

অতএব ঘৃণাঘৃণি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তুণেও অস্ত্র আছে, দানবের তুণও শূন্য নহে—অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্রনির্বাচন যদি করিতে পারি, তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে, তখন—কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেমু কদাচন।

সরলা দেবী।



সুভদ্রা সারথি হয়ে কি অক্ষুণ্ণ করে
চালাইলা জয়রথ ! কি দৃপ্ত ভঙ্গীতে
কৃষ্ণা সংহরিলা বেণী তৃপ্ত গর্ভভরে !
কি উদ্দীপ্ত চণ্ডতেজে জনার ইঙ্গিতে
যুদ্ধেছিল ক্ষুদ্র সেনা ! যেদিন রমণী
রচি' দিত ধনুর্গুণ নিজ কেশপাশে,—
পতির পরাত বর্ষ স্বহস্তে আপনি,
সেদিন শমনক্রাস মরিত তরাসে !
তুমি শক্তিরূপা দেবী, তব মাতৃভাষা
এ বঙ্গে অভয়মন্ত্র কল্পক প্রচার !
কটাক্ষেতে কর চূর্ণ দীনতা নিরাশা—
কার্যে কার্যে কর পূর্ণ জীবন-প্রসার !
তোমার তরুণ তেজে নবীন গৌরবে
প্রভাত-অরুণ-রশ্মি জাগুক পূরবে !

ত্ৰিহরেশচন্দ্র চৌধুরী।

বঙ্গদর্শন ।

ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত ।

জুরির বিচার একবার এদেশে হইতে উঠাইয়া দিবার কথা হইয়াছিল—তাহা লইয়া আমাদের কাগজে-পত্রে সভাসমিতিতে খুব একটা কলরব ওঠে ।

সেইসময় আমাদের দেশীয় একজন উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে কোন নিমন্ত্রণে আমি উপস্থিত থাকি । সেখানে কোন কলেজের ইংরাজ প্রিন্সিপালও নিমন্ত্রিত ছিলেন ।

তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া এই জুরির কথাটা তুলিলেন । নিমন্ত্রণকর্ত্তা জুরিবিচার এদেশে টেকে, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করাতে অধ্যাপক কহিলেন, যে দেশের অধঃসভা লোক প্রাণের মাহাত্ম্য (Sanctity of Life) বোঝে না, তাহাদের হাতে জুরিবিচারের অধিকার দেওয়া অস্বাভাবিক ।

ইংরাজের এই কথাটি লইয়া চিন্তা করিবার বিষয় অনেকগুলি ছিল । গুরুতর চিন্তার বিষয় এই যে, আমাদের ছেলেরদের শিক্ষার ভার ইংহার হাতে ! উপনিষদে আছে “প্রজ্ঞয়া দেয়ম্ অপ্রজ্ঞয়া অদেয়ম্”—প্রজ্ঞার সহিত দান করিবে, অপ্রজ্ঞার সহিত দান করিবে না । শিক্ষাদানসম্বন্ধে যদি এ কথার

মূল্য থাকে, তবে শিক্ষাদানসম্বন্ধে এ কথা আরো কত খাটে ! কেবল ইংরাজি কথার ইংরাজি মানে শেখাই পরম লাভ, তাহা মনে—আত্মসম্মানটা একটা মন্ত জিনিষ । কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই, সমস্ত বাধা-নিষেধ-অপমান স্বীকার করিয়াও ছেলেকে ইংরাজের ইস্কুলে দিবার জন্ত আমাদের অভিভাবকেরা লাগামস্থিত হইয়া ফেরেন ; তাহার কারণ, বিত্তজ্ঞ ইংরাজি উচ্চারণকে ইংহারি বিত্তজ্ঞ মনুষ্যবৃত্তের চেয়ে দামী বলিয়া বুঝিয়াছেন । এই অভিভাবকগণ সম্ভবত রায়বাহাদুর হইয়া স্তম্বে মরিতে পারিবেন, কিন্তু অপমানের দীক্ষিত হতভাগ্য ছেলেগুলির জন্ত হুঃখ হয় !

আর একটি কথা এই যে, নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোকটি বাঙালি বলিয়া, যে বিদেশী সামান্য শিষ্টাটুকু ভুলিয়া যায়, বাঙালির প্রতি স্মবিচার করিতে সে কি পারে ? প্রাণের মাহাত্ম্য যেমন একটা আছে, মানের মাহাত্ম্যও তেমনি আছে । হুটো প্রায় এক-সঙ্গেই থাকে । তোমার কাছে যাহার মানের মাহাত্ম্য কম, তাহার প্রাণের মাহাত্ম্যও অল্প,

প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাই-
তেছে।

প্রাণের মাহাত্ম্য ইংরাজ আমাদের চেয়ে
বেশি বোঝে, সে কথা না হয় স্বীকার করি-
য়াই লওয়া গেল। অতএব সেই ইংরাজ
যখন প্রাণ হনন করে, তখন তাহার অপ-
রাধের গুরুত্ব আমাদের মত অর্দ্ধসত্যের
চেয়ে বেশি। অথচ দেখিতে পাই, দেশীয়কে
হত্যা করিয়া কোনো ইংরাজ খুনি, ইংরাজ
জজ ও ইংরাজ জুরির বিচারে ফাঁসি যায় নাই।
প্রাণের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে তাহাদের বোধশক্তি
যে অত্যন্ত হ্রস্ব, ইংরাজ অপরাধী হয় ত তাহার
প্রমাণ পায়, কিন্তু সে প্রমাণ দেশীয় লোকদের
কাছে কিছু অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে।

এইরূপ বিচার আমাদের দৃষ্টি দিক্
হইতে আঘাত করে। প্রাণ যা যাবার, সে ত
যায়ই, ও দিকে মানও নষ্ট হয়। ইহাতে
আমাদের জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ
পায়, তাহা আমাদের সকলেরই গায়ে বাজে!

ইংলণ্ডে মোব্ বলিয়া একটি সংবাদপত্র
আছে। সেটা সেখানকার ভদ্রলোকেরই কাগজ
—তাহাতে লিখিয়াছে, টমি অ্যাটকিন্ (অর্থাৎ
পন্টনের গোরা) দেশি লোককে মারিয়া
ফেলিবে বলিয়া মারে না, কিন্তু মার খাইলেই
দেশি লোকগুলো মরিয়া যায়—এইজন্য টমি-
বেচারার লম্বুও হইলেই দেশি খবরের
কাগজগুলো চীৎকার করিয়া মরে।

টমি অ্যাটকিনের প্রতি দরদ গুব দেখি-
তেছি, কিন্তু স্যাক্‌টিক্ অফ্‌ লাইফ্ কৌণানে!
যে পাশব আঘাতে আমাদের পোলা ফাটে,
এই ভদ্রকাগজের কবছত্রের মধ্যেও কি সেই
আঘাতেরই বেগ নাই? স্বজাতিরূত খুনকে

কোমল স্নেহের সহিত দেখিয়া হতব্যক্তির
আত্মীয়সম্প্রদায়ের বিলাপকে যাহারা বিরক্তির
সহিত দ্বিধা দেয়, তাহারাও কি খুন পোষণ
করিতেছে না?

কিছুকাল হইতে আমরা দেখিতেছি, যুরো-
পীয় সভ্যতার ধর্মনীতির আদর্শ সাধারণত
অভ্যাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—ধর্মবোধশক্তি
এই সভ্যতার অন্তঃকরণের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়
নাই। এইজন্য অভ্যাসের গতির বাহিরে
এই আদর্শ পথ খুঁজিয়া পায় না, অনেকসময়
বিপথে মারা যায়।

যুরোপীয় সমাজে ঘরে-ঘরে কাটাকাটি-
খুনাখুনি হইতে পারে না—এরূপ ব্যবহার
সেখানকার সাধারণ স্বার্থের বিরোধী। বিয়-
প্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাতের দ্বারা খুন করাটা
যুরোপের পক্ষে কয়েক শতাব্দী হইতে ক্রমশ
অনভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু খুন বিনা অস্ত্রাঘাতে—বিনা রক্ত-
পাতে হইতে পারে। ধর্মবোধ যদি অকৃত্রিম
আভ্যন্তরিক হয়, তবে সেরূপ খুনও নিন্দনীয়
এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া
এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া তোলা যাক।

হেনরি শাভেজ্‌ ল্যাণ্ডর্ একজন বিখ্যাত
ভ্রমণকারী। তিব্বতের তীর্থস্থান লাসার
যাইবার জন্য তাঁহার দুর্নিবার ঔৎসুক্য জন্মে।
সকলেই জানেন, তিব্বতীরা যুরোপীয় ভ্রমণ-
কারী ও মিশনারী প্রভৃতিকে সন্দেহ করিয়া
ধাকে। তাহাদের দুর্গম পথঘাট বিদেশীর
কাছে পরিচিত নহে, ইহাই তাহাদের আত্ম-
রক্ষার প্রধান অস্ত্র—সেই অস্ত্রটি যদি তাহারা
জিওগ্রাফিকাল্‌ সোসাইটির হস্তে সমর্পণ

করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না ।

কিন্তু অশ্রে তাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহারো নিষেধ মানিবে না, যুরোপের এই ধর্ম । কোন প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, শুদ্ধ-মাত্র বিপদ্ লঙ্ঘন করিয়া বাহাহুরি করিলে যুরোপে এত বাহবা মিলে যে, অনেকের পক্ষে সে একটা প্রলোভন । যুরোপের বাহাহুরি লোকরা দেশে-বিদেশে বিপদ্ সন্ধান করিয়া ফেরে । যে কোন উপায়ে হোক্, লাসায় যে যুরোপীয় পদার্পণ করিবে, সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না ।

অতএব ভূয়ারগরি ও তিব্বতীর নিষেধকে ফাঁকি দিয়া লাসায় যাইতে হইবে । ল্যাণ্ড-সাহেব কুমায়ুনে আলমোড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন । সঙ্গে এক হিন্দু চাকর আসিয়া জুটিল, তাহার নাম চন্দন সিং ।

কুমায়ুনের প্রান্তে তিব্বতের সীমানায় বৃটিশরাজ্যে শোকা বলিয়া এক পাহাড়ি জাত আছে । তিব্বতীদের ভয়ে ও উপদ্রবে তাহারা কম্পমান । বৃটিশরাজ্য তিব্বতীদের পীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া ল্যাণ্ড-সাহেব বারংবার আক্ষেপ-প্রকাশ করিয়াছেন । সেই শোকাদের মধ্য হইতে সাহেবকে কুলিমজুর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে । বহুকষ্টে ত্রিশজন কুলি জুটিল ।

ইহার পর হইতে যাত্রাকালে সাহেবের এক প্রধান চিন্তা ও চেষ্টা—কিসে কুলিরা না পালায় । তাহাদের পালাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল । ল্যাণ্ড-সাহেব ভ্রমণবৃত্তান্তের পচিশ-পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—“এই বাহকদল

যখন নিঃশব্দ গম্ভীরভাবে বোঝা পিঠে লইয়া করুণাজনক স্বাসকষ্টের সহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উচ্চ হইতে উচ্চ আরোহণ করিতে-ছিল, তখন এই ভয় মনে হইতেছিল, ইহাদের মধ্যে কয়জনই বা কোনকালে ফিরিয়া যাইতে পারিবে !”

আমাদের জিজ্ঞাস্ত এই যে, এ শব্দা যখন তোমার মনে আছে, তখন এই অনিচ্ছুক হতভাগ্যদিগকে যত্নমুখে তড়িনা করিয়া লইয়া যাওয়াকে কি নাম দেওয়া যাইতে পারে ? তুমি পাইবে গোরব এবং তাহার সঙ্গে অর্থলাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে—তুমি তাহার প্রত্যাশায় প্রাণপণ করিতে পার, কিন্তু ইহাদের সম্মুখে কোন্ প্রলোভন আছে ?

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবচ্ছেদ (vivisection) লইয়া যুরোপে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে । সজীব জন্তুদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে যন্ত্রণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবার উচিত্যও আলোচিত হয় । কিন্তু বাহাহুরি করিয়া বাহবা লইবার উদ্দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিচ্ছুক মানুষদের উপরে যে অসহ্য পীড়ন চলে, ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ হয়, সমালোচকেরা করতালি দেন, সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া বায়, হাজার হাজার পাঠক ও পাঠিকা এই সকল বর্ণনা বিস্ময়ের সহিত পাঠ ও আনন্দের সহিত আলোচনা করেন । দুর্গম ভূয়ারপথে নিরীহ শোকা-বাহকদল দিবারাত্র যে অসহ্য কষ্টভোগ করিয়াছে— তাহার পরিণাম কি ? ল্যাণ্ড-সাহেব না হয় লাসায় পৌছিলেন, তাহাতে জগতের

এমন কি উপকার হওয়া সম্ভব, যাহাতে এই সকল ভীত-পীড়িত পলায়নেচ্ছু মানুষদিগকে অহরহ এত কষ্ট দিয়া মৃত্যুর পথে তাড়না করা লেশমাত্র বিহিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু কই, এজ্ঞাত লেখকের সঙ্কোচ নাই, পাঠকের অল্পকম্পা নাই?

তিব্বতীরা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও হত্যা করিতে পারে, শোকারা সেই কারণে তিব্বতীদিগকে কিরূপ ভয় করে, এবং তাহা-দিগকে তিব্বতীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটিশরাজ কিরূপ অক্ষম, তাহা ল্যাণ্ডর্ জ্ঞানিতেন—ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহার মধ্যে যে উৎসাহ-উত্তেজনা ও প্রেলোভন কাজ করিতেছে, শোকারদের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। তৎসঙ্গেও ল্যাণ্ডর্ তাঁহার গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় যে ভাবে তাঁহার বাহকদের ভয়দ্রুতের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তর্জমা করিয়া দিলাম :—

“তাহারা প্রত্যেকে হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। কাচির দুই গাল বাহিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল—দোলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এবং ডাকু ও অগ্র যে একটি তিব্বতী আমার কাজ লইয়াছিল, যাহারা ভয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের বোঝার পশ্চাতে লুকাইয়া বসিয়া ছিল। আমাদের অবস্থা যদিও সঙ্কটাপন্ন ছিল, তবু আমাদের লোকজনদের এই আতুরদশা দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।”—

ইহার পরে এই হুঁচকাগারা পলায়নের চেষ্টা করিলে ল্যাণ্ডর্ তাহাদিগকে এই বলিয়া শাস্ত করেন যে, যে কেহ পলায়নের বা

বিদ্রোহের চেষ্টা করিবে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিব!

কিরূপ তুচ্ছ কারণেই ল্যাণ্ডর্-সাহেবের গুলি করিবার উত্তেজনা জন্মে, অগ্রত তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। তিব্বতী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ল্যাণ্ডর্ যখন প্রথম নিবেদন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি ভাণ করিলেন, যেন ফিরিয়া যাইতেছেন। একটা উপত্য-কায় নামিয়া আসিয়া দূরবীণ কষিয়া দেখিলেন, পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর হইতে প্রায় ত্রিশটা মাথা পাথরের আড়ালে উঁকি মারিতেছে। সাহেব লিখিতেছেন—“আমার বড় বিরক্তিবোধ হইল। যদি ইচ্ছা হয় ত ইহারা প্রকাশ্যভাবেই আমাদের অমুসরণ করে না কেন—দূর হইতে পাহারা দিবার দরকার কি! অতএব আমি আমার আটশ-গজী রাইফেল লইয়া মাটিতে চ্যাপ্টা হইয়া শুইলাম এবং যে মাথাটাকে অগ্রদের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির করিলাম।”

এই “অতএব”—এর বাহার আছে! লুকাচুরিকে ল্যাণ্ডর্-সাহেব কি স্বপাই করেন! তিনি এবং তাঁহার সঙ্গের আর একটা মিশনারি-সাহেব নিজেদের হিন্দু তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, প্রকাশ্যে ভারতবর্ষে ফিরিবার ভাণ করিয়া গোপনে লাসাচ যাইবার উদ্দেশ্য করিতেছেন, কিন্তু পরের লুকাচুরি ইহার এতই অসহ যে, ভূমিতে চ্যাপ্টা হইয়া শুইয়া আত্মগোপনপূর্বক তৎক্ষণাৎ আটশ-গজী রাইফেল বাগাইয়া কহিলেন, “I only wish to teach these cowards a lesson.—আমি এই কাপুরুষদিগকে শিক্ষা

দিতে ইচ্ছা করি।" দূর হইতে লুকাইয়া রাইফেল-চালনার সাহেব যে পৌরুষের পরিচয় দিতেছিলেন, তাহার বিচার করিবার কেহ ছিল না। আমাদের ওরিয়েণ্টালদের অনেক দুর্বলতার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু চালুনি হইয়া ছুঁছুঁকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদের মত আমাদের নাই। আসল কথা, গায়ের জোর থাকিলে বিচারাসনের দখল একচেটে করিয়া লওয়া যায়—তখন অল্পকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসটাই বন্ধ হইয়া যায়, নিজেকে বিচার করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

আসিয়ায়-আফ্রিকায় ভ্রমণকারীরা অনিচ্ছুক ভৃত্য বাহকদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, দেশ-আবিকারের উত্তেজনার ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগকে যে করিয়া বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যান, তাহা কাহারো অগোচর নাই। অথচ Sanctity of Life সম্বন্ধে এই সকল পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বোধশক্তি অত্যন্ত সুতীব্র হইলেও কোথাও কোন আপত্তি শুনিতে পাই না। তাহার কারণ, ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে—স্বার্থপরতার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য যুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিরুদ্ধ হইতে থাকে। এমন কি, সে গণ্ডির মধ্যেও যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল, সেখানে দয়াধর্ম রক্ষণ করার চেষ্টাকে যুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ-পক্ষের সর্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করণ

বিরুদ্ধে কথা কহা "সেটিমেন্টালিটি"। যুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দুষণীয়, কিন্তু পলিটিকে একপক্ষ অপরপক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। মাউন্টেনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে যুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্ধিততারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি বিরূপ আচরণ চলিতেছে, তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত "পোস্ট" সংবাদপত্র হইতে গত ২রা জুলাই তারিখের বিলাতী ডেলিনিউসে সঙ্কলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষকে পুলিশকোর্টে হাজির করা হয়—সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত যে-তাদেরো শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক, লৌহশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সকলপ্রকার উপায়েই তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে ত চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে বৈধব্যা- (bigamy)-অপরাধে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। হাজতে থাকার সময় একজন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করে। কিন্তু কোন বিচার না হইয়াই নির্দোষী বলিয়া এই স্ত্রীলোকটি খালাস পায়। ব্যারিষ্টার ফি-এর দাবি করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্তে এই নিগ্রো স্ত্রীলোক-

টিকে ম্যাক্রি-ক্যাম্পে চোদ্দমাস কাজ করিবার জন্ত পাঠায়। সেখানে তাহাকে নয়মাস চাবিতালা দিয়া বন্ধ করিয়া খাটানো হইয়াছে, জোর করিয়া আর-এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমার বৈধ-স্বামীর সহিত তোমার কোনকালে মিলন হইবে না—পলায়নের আশঙ্কা করিয়া তাহার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রভু ম্যাক্রি তাহাকে নিজের হাতে চাবুক মারিয়াছে এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, খালাস পাইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে মাসে পাঁচডলার করিয়া বেতন পাইত।

ডেলিনিয়ুস বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা হুজুহ হইয়াছে। After all, no great Power is entirely innocent of the charge of treating with barbarous harshness the alien races which are subject to its rule.

আমাদের দেশে ধর্মের যে আদর্শ আছে, তাহা অন্তরের সামগ্রী, তাহা বাহিরে গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে। আমরা যদি Sanctity of Life একবার স্বীকার করি, তবে পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ কোথাও তাহার সীমান্তাপন করি না। ভারতবর্ষ

একসময়ে মাংসাশী ছিল—মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাশী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, জগতে বোধ হয় ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ভারতবর্ষে দেখিতে পাই, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যাহা উপার্জন করে, তাহা দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না—স্বার্থেরও যে একটা শ্রাব্য অধিকার আছে, এ কথাটাকে আমরা সর্বপ্রকার অস্বীকার স্বীকার করিয়া যতদূর সম্ভব থর্ব করিয়াছি। আমাদের দেশে বলে, যুদ্ধেও ধর্মরক্ষা করিতে হইবে—নিরস্ত্র, পলাতক, শরণাগত শত্রুর প্রতি আমাদের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ ব্যবহার ধর্মবিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, যুরোপে তাহা হান্তকর বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার একমাত্র কারণ, ধর্মকে আমরা অন্তরের দ্বার করিতে চাহিয়া-ছিলাম। স্বার্থের প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের ধর্মকে গড়িয়া তোলে নাই, ধর্মের নিয়মই আমাদের স্বার্থকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্ত আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্বল হইয়া থাকি,—সেইজন্তই বহিঃশত্রুর কাছে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরব-লাভ করিয়াছি, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না—একদিন তাহারো দিন আসিবে।

নৌকাডুবি ।

১৫

রমেশ অন্নদাবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অন্নদাবাবু মুখের উপরে খবরের কাগজ চাপা দিয়া কেদারায় পড়িয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া কানিতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া খবরের কাগজটা তুলিয়া ধরিয়াই কহিলেন, “দেখিয়াছ রমেশ, এবারে ওলাউঠায় কত লোক মরিয়াছে?”

অন্নদাবাবু নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য ও শারীরিক দুর্বলতার কথা প্রচার করিতে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু নিদ্রা যে তাঁহাকে অসময়ে অভিবৃত্ত করিতে পারে, ইহা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি যে সহরের মৃত্যুতালিকা লইয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন, রমেশের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিতে বাগ্র হইয়া উঠিলেন। সহরের আবর্জনা দূর করিবার প্রতি ম্যুনিসিপালিটির ঔদাসীন্য যে কিরূপ দৃঢ়বদ্ধমূল, অত্যন্ত গম্ভীর উদ্বেগের সহিত ইহাই তিনি রমেশের সহিত আলোচনা করিতে উৎসাহসহকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

রমেশ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে দুইএকবার সায় দিল। যদিও রমেশের মুখ দেখিয়া মনে হইতে পারিত যে, ওলাউঠার জন্ত কলিকাতা-সহরের সমস্ত উৎকণ্ঠা তাহারি মাধ্যম চাপিয়াছে, কিন্তু আলোচনায় তাহার শৈথিল্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত, মৃত্যুতালিকার

চেয়েও গুরুতর চিন্তার কারণ তাহার ছিল।

অন্নদাবাবু তাহা বুঝিলেন না। তিনি কহিলেন—“সহরের যেক্রপ অবস্থা দেখিতেছি, বিবাহে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা সংক্ষেপ করিতে হইবে।”

দূষিত জলে মাছ বাস করে এবং সেই মাছ কোলের বাটিযোগে ঘরে-ঘরে মহামারী বণ্টন করিয়া দেয়, অতএব রোগভয়ের সময় লঘুপাক পরিমিত নিরামিশ ভোজ্যই যে ব্যবস্থা, অন্নদাবাবু এই সম্বন্ধে আপনায় বক্তব্য বিবৃত করিতেছিলেন। এই সুযোগে অবলম্বন করিয়া রমেশ কহিল, “বিবাহটা আর কিছুদিন পিছাইয়া দিলেই ভাল হয়।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“পাগল হইয়াছ রমেশ? ব্যামোকে কি অত ভয় করিলে চলে? তাহা হইলে কলিকাতা-সহরে লোকের বিবাহ করা একেবারে বন্ধই করিতে হয়। আমাদের যে ম্যুনিসিপালিটি! কমিশনারগুলি যমদূত!”

নিজের এই রসিকতায় অন্নদাবাবু বিশেষ আমোদ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অন্তমনস্ক রমেশের নিকট সমস্তই ব্যর্থ হইল।

রমেশ কহিল, “বিবাহ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখিতে হইবে—আমার বিশেষ কাজ আছে।”

অন্নদাবাবুর মাথা হইতে সহরের মৃত্যুতালিকার বিবরণ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

কর্ণকাল রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—“সে কি কথা রমেশ! নিমন্ত্রণ যে হইয়া গেছে!”

রমেশ কহিল, “এই রবিবারের পরের রবিবারে দিন পিছাইয়া দিয়া আজই পত্র বিলি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।”

অন্নদা। রমেশ, তুমি আমাকে অবাক করিলে! এ কি মকদ্দমা যে, তোমার সুবিধা-স্বত্ব তুমি দিন পিছাইয়া মূলত্ববি করিতে থাকিবে? তোমার প্রয়োজনটা কি, শুনি!

রমেশ। সে অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন, বিলম্ব করিলে চলিবে না!

অন্নদাবাবু বাতাহত কদলীরুক্ষের মত কেদারার উপর হেলানু দিয়া পড়িলেন—কহিলেন—“বিলম্ব করিলে চলিবে না! বেশ কথা, অতি উত্তম কথা! এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর! নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা তোমার বুদ্ধিতে যাহা আসে, তাহাই হোক! লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি বলিব, ‘আমি ও সব কিছুই জানি না,—তাঁহার কি আবশ্যক, সে তিনিই জানেন, আর কবে তাঁহার সুবিধা হইবে, সে তিনিই বলিতে পারেন!’”

রমেশ উত্তর না করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, “হেমনলিনীকে সব কথা বলা হইয়াছে?”

রমেশ। না, তিনি এখনো জানেন না।

অন্নদা। তাঁহার ত জানা আবশ্যক! তোমার ত একবার বিবাহ নয়!

রমেশ। আপনাকে আগে জানাইয়া তাঁহাকে জানাইব স্থির করিয়াছি।

অন্নদাবাবু ডাকিয়া উঠিলেন—“হেম, হেম!”

হেমনলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, “কি বাবা!”

অন্নদা। রমেশ বলিতেছেন, তাঁহার কি একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে, এখন তাঁহার বিবাহ করিবার অবকাশ হইবে না!

হেমনলিনী একবার বিবর্ণমুখে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ অপরাধীর মত নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হেমনলিনীর কাছে এ খবরটা যে এমন করিয়া দেওয়া হইবে, রমেশ তাহা প্রত্যাশা করে নাই। সে যে কি করিয়া আস্তে আস্তে কথাটা পাড়িবে, তাহা নানা রকম করিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিল। ভালবাসার মৃদু দক্ষিণ-হাওয়াকে রমেশ দূত করিবে স্থির করিয়াছিল, হঠাৎ বজ্রমদ্রিত কালবৈশাখী তাহার মুখের কথা ছিনাইয়া লইয়া গেল। অগ্রিম-বার্তা অকস্মাৎ এইরূপ নিতান্ত রুঢ়ভাবে হেমনলিনীকে যে কিরূপ মর্শাস্তিকরূপে আঘাত করিল, রমেশ তাহা নিজের ব্যথিত অন্তঃকরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ অম্লভব করিতে পারিল। কিন্তু যে তাঁর একবার নিকিষ্ট হয়, তাহা আর করে না,—রমেশ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই নির্ভর তাঁর হেমনলিনীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে গিয়া বিধিয়া রহিল!

এখন কথাটা কোনমতে আর নয়ম করিয়া লইবার উপায় নাই। সবই সত্য—বিবাহ এখন স্থগিত রাখিতে হইবে, রমেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কি প্রয়োজন, তাহাও সে বলিতে ইচ্ছা করে না। ইহার উপরে এখন আর নূতন ব্যাখ্যা কি হইতে পারে!

অন্নদাবাবু হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—“তোমাদেরই কাজ, এখন তোমরাই ইহার যা হয় একটা বীমাংসা করিয়া লও !”

হেমনলিনী মুখ নত করিয়া বলিল—“বাবা, আমি ইহার কিছুই জানি না !” এই বলিয়া, ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্য্যাস্তের স্নান আভাটুকু যেমন মিলাইয়া যায়, তেন্নি করিয়া সে চলিয়া গেল ।

অন্নদাবাবু খবরের কাগজ মুখের উপর তুলিয়া পড়িবার ভাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন । রমেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল ।

হঠাৎ রমেশ একসময় চমকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল । বসিবার বড় ঘরে গিয়া দেখিল, হেমনলিনী জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার-ছুটির কলিকাতা ছোয়ারের নদীর মত তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে ক্ষীত জন-প্রবাহে চঞ্চল-মুখর হইয়া উঠিয়াছে ।

রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল । পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল । শরতের অপরাহ্ন-আলোকে বাতায়নবস্তিনী এই শুকমুষ্টিটি রমেশের মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল । ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সব্বত্রচিত কবরীর ভঙ্গী, ঐ গ্রীবার উপরে কোমল-বিরল কেশগুলি, তাহারি নীচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বামদিক হইতে লগ্নিত অঙ্গুরের বন্ধিম প্রান্ত, সমস্তই রেখার-রেখায় তাহার পৌড়িত চিত্রের মধ্যে যেন কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল । ব্যর্থ বেশবিছাসের

আক্ষেপ বহন করিয়া একটি মুহূর্ত্ত সুগন্ধ ঘরমর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল । এই গন্ধটুকু, ঐ ছবিটি রমেশের কত ভবিষ্যৎ শারদীয় অবকাশকে আবিষ্ট করিয়া তুলিবার জন্ত স্থতির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিল !

রমেশ আস্তে আস্তে হেমনলিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল । হেমনলিনী রমেশের চেয়ে রাস্তার লোকদের জন্ত যেন বেশি ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল । রমেশ বাম্প-রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে ।”

রমেশের কণ্ঠধরে উদ্বেল বেদনার আঘাত অমুভব করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমনলিনীর মুখ ফিরিয়া আসিল । রমেশ বলিয়া উঠিল—“তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না !” রমেশ এই প্রথম হেমনলিনীকে ‘তুমি’ বলিল । “এই কথা আমাকে বল যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না ! আমিও অন্তর্ধামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না !”

রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল । তখন হেমনলিনী তাহার শিথলকরণ ছই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল । সেই অনিমেষ দৃষ্টি রমেশের প্রতি নারবে সংশয়লেশহীন অবিশ্বাস নিবেদন করিল—তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর ছই কপোল বাহিয়া করিয়া পড়িতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়নতলে ছইজনের মধ্যে একটি বাক্যবিহীন শান্তি ও সাহসনার স্বর্গধও

স্বজিত হইয়া গেল—জনসমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল, ধরন্ত্রোত সংসারের আঘাত-অভিঘাত কণকালের জন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

কিছুকণ এই অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌনের মধ্যে হৃদয়মন নিমগ্ন রাখিয়া একটি আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল—“কেন আমি এখন সপ্তাহের জন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি জানিতে চাও?”

হেমনলিনী নীরবে মাথা নাড়িল—সে জানিতে চায় না।

রমেশ কহিল, “বিবাহের পরে আমি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিব।”

এই কথাটির হেমনলিনীর কপালের কাছটা একটুখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

আজ আহালাস্তে হেমনলিনী যখন স্নানেশের সহিত মিলনপ্রত্যাশায় উৎসুক-চিত্তে সাজ করিতেছিল, তখন সে অনেক হাসিগল্প, অনেক নিভৃত পরামর্শ, অনেক ছোটখাট সুখের ছবি কল্পনায় স্বজন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এই যে অল্প কয় মুহূর্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা বদল হইয়া গেল—এই যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্তা কিছুই হইল না, কিছুকণের জন্ত হুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল—ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। চতুর্দিক প্রসন্ন হইয়া গেল, সমস্ত সংসার শেখসুক আনন্দেরগন্ধিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—উদার আকাশ মেঘপূর্ণ পিতৃ-ক্রোড়ের মত উভয়কে বেঁঠন করিয়া ধরিল।

হেমনলিনী কহিল, “তুমি একবার বাবার কাছে যাও, তিনি বিরক্ত হইয়া আছেন।”

রমেশ প্রকৃত্তিতে সংসারের ছোট-বড় আঘাত-সংঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্ত চলিয়া গেল।

১৬

অন্নদাবাবু সমস্ত উৎসব-উৎকর্ষাকে ভয় করিতেন—পাছে তাহাতে তাঁহার পরিপাকের বিপাক বৃদ্ধি পায়; আজিকার গোলমালের পর তিনি একটা শারীরিক ছুযোগ আশঙ্কা করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া ছিলেন, এমন-সময় রমেশ পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। উৎসুক হইয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

রমেশ কহিল, “নিমন্ত্রণের ফর্দটা যদি আমার হাতে দেন, তবে দিনপরিবর্তনের চিঠিগুলি আজই রওনা করিয়া দিতে পারি।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “তবে দিনপরিবর্তনই স্থির রহিল?”

রমেশ কহিল, “হাঁ, অস্ত উপায় আর কিছুই দেখি না।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “দেখ বাপু, তবে আমি ইহার মধ্যে নাই। যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিবার, সে তুমিই করিয়ো। আমি লোক হাসাইতে পারিব না। বিবাহ-ব্যাপারটাকে যদি নিজের মজ্জি অহুসারে ছেলেখেলা করিয়া তোল, তবে আমার মত বয়সের লোকের ইহার মধ্যে না থাকাই ভাল। এই লও তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ। ইতিমধ্যে আমি কতকগুলি টাকা খরচ করিয়া কেলিরাছি, তাহার

অনেকটাই নষ্ট হইবে। এমনি করিয়া বার-বার টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারি, এমন সঙ্গতি আমার নাই ?”

নিজেকে ক্রিয়াকর্মের গোলমাল হইতে বাঁচাইবার এই স্বযোগটুকু পাইয়া অন্নদাবাবু ভিতরে-ভিতরে কিছু যে আশ্বস্ত হন নাই, তাহা বলিতে পারি না। পরের প্রতি দোষারোপ করিবার স্বর্থ এবং কর্মের বজ্রাঘাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আরাম, ছুটাই তাঁহার পক্ষে উপাদেয়। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপেরও সম্ভাবনা আছে।

রমেশ সমস্ত ব্যয় ও ব্যবহার ভার নিজের বক্ষে লইতেই প্রস্তুত হইল। সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় অন্নদাবাবু কহিলেন—“রমেশ, বিবাহের পরে তুমি কোথায় প্র্যাক্টিস্ করিবে, কিছু স্থির করিয়াছ ? কলিকাতায় নয় ?”

রমেশ কহিল—“না। পশ্চিমে একটা ভাল জায়গার সন্ধান করিতেছি।”

অন্নদাবাবু। সেই ভাল, পশ্চিমেই ভাল। এটোয়া ত মন্দ জায়গা নয়। সেখানকার জল হজমের পক্ষে অতি উত্তম—আমি সেখানে মাসখানেক ছিলাম—সেই একমাসে আমার আহ্বানের পরিমাণ ডবল বাড়িয়া গিয়াছিল। দেখ বাপু, সংসারে আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে—আমি সর্বদা উহার কাছে-কাছে না থাকিলে সে-ও সুখী হইবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাই আমার ইচ্ছা, তোমাকে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে।

অন্নদাবাবু রমেশের একটা অপরাধের অবকাশ পাইয়া সেই স্বযোগে নিজের বড়

বড় দাবীগুলি উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে রমেশকে তিনি যদি এটোয়া না বলিয়া গায়ে বা চেরাপুঞ্জির কথা বলিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ সে রাজি হইত। সে কহিল, “যে আজ্ঞা, আমি এটোয়াতেই প্র্যাক্টিস্ করিব।”—এই বলিয়া রমেশ নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানের কার্যভার লইয়া প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে অক্ষয় ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, “অন্নদাবাবু, আজকের খবরের কাগজে দেখিয়াছেন ত—কাল সহরে ২৩৫ জন রোগে মরিয়াছে।”

অন্নদাবাবু কহিলেন—“মরুক না, আমার তাহাতে কি ?”

অক্ষয় ভাবিল, “একি হইল—আজ এতবড় মৃত্যুতালিকাতেও অন্নদাবাবুর রুচি নাই ? নিশ্চয় একটা গুরুতর অনর্থপাত কিছু ঘটিয়াছে।”

অক্ষয় মুহূর্ত্তে বলিতে আরম্ভ করিল, “আপনার শরীর—”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “আমার শরীর চুলোয় যাক্ গে—এদিকে রমেশ তাহার বিবাহের দিন একসপ্তাহ পিছাইয়া দিয়াছে।”

অক্ষয়। না না, আপনি বলেন কি ! সে কি কখনো হইতে পারে ? পরও যে বিবাহ।

অন্নদা। হইতে ত না পারাই উচিত ছিল—সাধারণ লোকের ত এমনতর হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাদের যে-রকম কাণ্ড দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

অক্ষয় অত্যন্ত মুখ গভীর করিয়া আড়-ঘর-সহকারে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছু-

ক্ষণ পরে কহিল, “আপনারা যাহাকে একবার সংপাত্র বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ছুটি চক্ষু বুজিয়া থাকেন। মেয়েকে যাহার হাতে চিরদিনের মত সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, ভাল করিয়া তাহার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা উচিত। হোক না কেন সে স্বর্গের দেবতা, তবু সাবধানের বিনাশ নাই।”

অন্নদা। রমেশের মত ছেলেকেও যদি সন্দেহ করিয়া চলিতে হয়, তবে ত সংসারে কাহারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অক্ষয়। আচ্ছা, এই যে, দিন পিছাইয়া দিতেছেন, রমেশবাবু তাহার কারণ কিছু বলিয়াছেন?

অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—“না, কারণ ত কিছুই বলিল না—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বিশেষ দরকার আছে।”

অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া দ্রব্য একটু হাসিল মাত্র। তাহার পরে কহিল, “বোধ হয় আপনার মেয়ের কাছে রমেশবাবু একটা কারণ নিশ্চয় কিছু বলিয়াছেন।”

অন্নদাবাবু। সম্ভব বটে।

অক্ষয়। তাঁহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে ভাল হয় না?

“ঠিক বলিয়াছ” বলিয়া অন্নদাবাবু উঠেঃ-ঘরে হেমনলিনীকে ডাক দিলেন। হেমনলিনী ঘরে ঢুকিয়া অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার বাপের পাশে এমন করিয়া দাঁড়ইল, যাহাতে অক্ষয় তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“বিবাহের দিন বে হঠাৎ পিছাইয়া গেল, রমেশ তাহার কারণ তোমাকে কিছু বলিয়াছেন?”

হেমনলিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—“না।”
অন্নদাবাবু। তুমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই?

হেমনলিনী। না।

অন্নদাবাবু। আশ্চর্য্য ব্যাপার! যেমন রমেশ, তুমিও দেখি তেমনি। তিনি আসিয়া বলিলেন, ‘আমার বিবাহে দূরসং হইতেছে না’—তুমিও বলিলে, ‘বেশ ভাল, আর একদিন হইবে!’ বাস, আর কোন কথাবার্তা নাই!

অক্ষয় হেমনলিনীর পক্ষ লইয়া কহিল, “একজন লোক যখন স্পষ্টই কারণ গোপন করিতেছে, তখন সে কথা লইয়া তাহাকে কি কোন প্রশ্ন করা ভাল দেখায়? যদি বলিবার মত কিছু হইত, তবে ত রমেশবাবু আপনিই বলিতেন!”

হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে কহিল, “এই বিষয় লইয়া আমি বাহিরের লোকের কাছে কোন কথাই শুনিতে চাই না। বাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই, সংশয় নাই—অন্তলোকের যদি অত্যন্ত হস্তিচিন্তা জন্মিয়া থাকে, তবে সেটা আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করি!”

এই বলিয়া হেমনলিনী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অক্ষয় পাণ্ডু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল—“সংসারে বন্ধুর কাজটাতেই সব চেয়ে লাঞ্ছনা বেশি। সেইজন্যই আমি বন্ধুদের গৌরব বেশি অমূল্যব করি। আপনারা আমাকে যুগা করুন আর গালি দিন, রমেশকে সন্দেহ করাই আমি বন্ধুর কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের যেখানে কোনো বিপদের সম্ভা-

বনা দেখি, সেখানে আমি অসংশয়ে থাকিতে পারি না—আমার এই একটা মন্ত হুর্ললতা আছে, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাই হোক, যোগেন্ ত কালই আসিতেছে, সে-ও যদি সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিজের বোনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, তবে এ বিষয়ে আমি আর কোন কথা কহিব না।”

রমেশের ব্যবহারসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে, অন্নদাবাবু এ কথা একেবারে বোঝেন না, তাহা নহে—কিন্তু সন্দেহ না করিলেই নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব এবং নিশ্চিন্ত থাকিলেই সুস্থ থাকিবার আশা করা যায়। যাহা অগোচরে আছে, তাহাকে বলপূর্ণক আলোড়িত করিয়া তাহার মধ্য হইতে হঠাৎ একটা ঝকঝক আবিষ্কারের সম্ভাবনায় তিনি স্বভাবত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করেন না। মুনিসিপ্যালিটির আচরণসম্বন্ধে আশঙ্কা ও আতঙ্কে প্রশ্ন দিতে তিনি উৎসাহ অমুভব করেন, কারণ, কলিকাতা-সহর তাঁহার কথা নহে—কিন্তু উদ্বেগকে তিনি যে-কোন প্রকারে হউক নিজের ঘরের মধ্য হইতে তেঁকাইয়া রাখিতে চান। কারণ সেখানে তাহার আবির্ভাব হইলে বন্ধুবান্ধবদের সহিত তাহার সম্বন্ধে কেবল আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবার জো থাকে না—সে তাঁহার হুর্লল পাকধূলী এবং অনিদ্ৰাপীড়িত ললাটফলককে খাতির করিয়া চলিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় জানেন। এই কারণে অন্নদাবাবু যেখানে নিশ্চিন্তমনে সন্দেহ করিতে পারেন, সেখানে সন্দেহ করিতেই ভালবাসেন এবং যেখানে চিন্তাকর উচিত ও স্বাভাবিক, সেখানেই তিনি নিঃসন্দেহ থাকিতে ইচ্ছা করেন।

অন্ধয়ের উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি কহিলেন, “অন্ধর, তোমার স্বভাবটা বড় সন্দেহ! প্রমাণ না পাইয়া কেন তুমি—”

অন্ধর আপনাকে দমন করিতে জানে, কিন্তু উত্তরোত্তর আঘাতে আজ তাহার ধৈর্য্য ভাঙিয়া গেল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, “দেখুন অন্নদাবাবু, আমার অনেক দোষ আছে! আমি সংপাত্রে প্রতী দীর্ঘা করি, আমি সাধুলোককে সন্দেহ করি। ভদ্রলোকের মেয়েদের ফিলজফি পড়াইবার মত বিদ্যা আমার নাই এবং তাঁহাদের সহিত কাব্য আলোচনা করিবার স্পর্ধাও আমি রাখি না—আমি সাধারণ দশজনের মধ্যেই গণ্য—কিন্তু চিরদিন আমি আপনাদের প্রতি অহরহ, আপনাদের অমুগত। রমেশবাবুর সঙ্গে আর-কোন বিষয়ে আমার তুলনা হইতে পারে না—কিন্তু এইটুকুমাত্র অহঙ্কার আমার আছে, আপনাদের কাছে কোনদিন আমার কিছু লুকাইবার নাই! আপনাদের কাছে আমার সমস্ত দৈন্ত প্রকাশ করিয়া আমি ভিক্ষা চাহিতে পারি, কিন্তু সিঁদ কাটিয়া চুরি করা আমার স্বভাব নহে। এ কথার কি অর্থ, তাহা কালই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।”

১৭

চিঠি বিলি করিয়া দিতে রাত হইয়া পড়িল। রমেশ শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনের ভিতরে গঙ্গাধমুনার মত শাদা-কালো ছই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। ছইটার কল্লোল একসঙ্গে মিশিয়া তাহার বিশ্রামস্বপ্নকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

বারকয়েক পাশ ফিরিয়া সে উঠিয়া পড়িল। জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, শরৎরাত্রির নিস্তরু আকাশ চাঁদের আলোতে বিহ্বল হইয়া গেছে। তাহাদের জনশূন্য গলির এক পাশে বাড়ীগুলির ছায়া, আর-এক পাশে শুভ্র জ্যোৎস্নার রেখা। এক-দিকের গৃহশ্রেণী সহস্র নিদ্রিত গোরতর উল্লস শিশুদের মত ধ্বংস করিতেছে, আর তাহার সম্মুখদিকের বাড়ীগুলি কালো-কাপড়-পরা জাগ্রত প্রহরীর মত অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিশীথরাত্রে সুপ্ত রাজধানীর উপর যখন জ্যোতিষ্কলোক হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া আসে, তখন তাহার মধ্যে মাধুরীমিশ্রিত একটি অপরূপ গাভীরূপ বিরাজ করে। সুখ-দুঃখ লাভ-কৃতির এতবড় বিরূপ উদ্দাম চেষ্টা যখন একেবারে পরাভব মানিয়া শিশুর মত অনন্তের কোড়ে আত্মসমর্পণ করে—তখন সেই অভিজুত বিপুল কন্দলার উপরে একাকী যোগাসনে আসীন সেই অনন্তের অবিচলিত মুখশ্রী সোধশিখরসঙ্কুল আকাশতলে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অরণ্য-সমুদ্রে-গিরিশিখরে দেখা যায় না।

রমেশ শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা নিত্য, যাহা শাস্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী, যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, বিধা নাই, রমেশের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি বিগলিত হইয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। যে শব্দবিহীন সীমা-বিহীন মহালোকের নেপথ্য হইতে চিরকাল ধরিয়া জন্ম এবং মৃত্যু, কণ্ঠ এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, কোন্ অশ্রুত সঙ্গীতের

অপরূপ তালে বিশ্বব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—রমেশ সেই আলো-অন্ধকারের অতীত দেশ হইতে নরনারীর যুগল প্রেমকে এই নক্ষত্রদীপালোকিত নিখিলের মধ্যে আবিস্কৃত হইতে দেখিল। রমেশ কণকালের জন্ত আপন ভালবাসাকে সংসার হইতে সুদূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক বিশ্ববিস্তৃত মহিমার মধ্যে শাস্ত শুদ্ধ সুন্দর সম্পূর্ণমূর্তিতে দেখিতে পাইল। সেই অমান প্রেমের চারিদিক হইতে ক্রুদ্ধ জনসমাজের সমস্ত ভয়, সংশয়, ঈর্ষা, বিরোধ, ভ্রান্তি ঞ্জলিত হইয়া পড়িল, বাধা ও বিচ্ছেদ কুহেলিকার মত বিলীন হইয়া গেল।

রমেশ তখন ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠিল। অন্নদাবাবুর বাড়ীর দিকে চাহিল। সমস্ত নিস্তরু। বাড়ীর দেয়ালের উপরে, কার্ণিশের নীচে, জানলা-দরজার খাঁজের মধ্যে, চুনবাঁলিখসা ভিতের গায়ে জ্যোৎস্না এবং ছায়া-বিচিত্র আকারের রেখা ফেলিয়াছে।

আজ অপরাহ্নে রমেশ ও হেমলিনী যে জানলার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সেই জানলাটি তখন ছায়ার মধ্যে অবগুপ্ত হইয়া ছিল। সেই জানলার দিকে চাহিয়া রমেশ হাঁটু গাড়িয়া জোড় হাত করিয়া বসিয়া সেই জ্যোৎস্না-তিবিক্ত নিস্তরু আকাশের নীচে নিজের ললাট ভূতলে লুপ্তিত করিল। তাহার প্রেম একটি বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারিত হইয়া গেল। একি বিশ্বয়! এই জনপূর্ণ নগরের মধ্যে ঐ সামান্ত গৃহের ভিতরে একটি মানবীর বেশে একি বিশ্বয়! এই রাজধানীতে কত ছাত্র, কত উকীল, কত প্রবাসী ও নিবাসী আছে,

ভাহার মধ্যে রমেশের মত একজন সাধারণ লোক কোথা হইতে একদিন আশ্বিনের পীতাম্বরী রোদ্রে ঐ বাতায়নে একটি বালিকার পাশে নীরবে পাড়াইয়া জীবনকে ও জগৎকে এক অপরিণীত আনন্দময় রহস্যের মাঝখানে ভাসমান দেখিল—একি বিশ্বয়! হৃদয়ের ভিতরে আজ একি বিশ্বয়, হৃদয়ের বাহিরে আজ একি বিশ্বয়! বিশ্বের যে নিগূঢ় অন্তস্তলে প্রাণ ও প্রেম ও সৌন্দর্য্য অনাদিকাল হইতে অহোরাত্র স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিতেছে, সংসারের সমস্ত বন্ধন, জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা অতিক্রম করিয়া আজ কেমন করিয়া রমেশ সেই নির্জন অমৃতনির্ব্বরের তটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল! সেজ্ঞা রমেশ আজ রাত্রে কাহার কাছে জীবন সমর্পণ করিবে, কাহার কাছে আপনাকে নত করিয়া, লুপ্ত করিয়া, লুপ্ত করিয়া নিবেদন করিয়া দিবে!

অনেক রাত্রি পর্যান্ত রমেশ ছাদে বেড়াইল। ধীরে ধীরে কখন একসময়ে খণ্ড চাঁদ সমুদ্রের বাড়ীর আড়ালে নামিয়া গেল। পৃথিবীতলে রাত্রির কালিমা ঘনীভূত হইল—আকাশ তখনো বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুর। অল্প একটুখানি বাতাস জুগিয়া উঠিল—সে বাতাসে শিশিরের পল্লভ জড়িত। ছোটো-একটা গাড়ির চাকার শব্দ শুনা যাইতেছে। গ্রাম হইতে তরকারীবোঝাই গাড়ি সহরের বাজারে যাত্রা করিয়াছে।

রমেশের ক্লান্ত শরীর শীতে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ একটা আশঙ্কা থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল, জীবনের রণ-

ক্ষেত্রে কাল আবার সংগ্রাম করিতে বাহির হইতে হইবে। ঐ আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চোঁটার চাকল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তর শান্ত, বিশ্বপ্রকৃতি ঐ অগণ্য নক্ষত্রলোকের চিরকর্ণের মধ্যে চির-বিশ্রামে বিলীন—তবু মাহুষের আনাগোনা-যোঝাযুঝির অন্ত নাই, সুখে-দুঃখে বাধায়-বিষে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত। অনন্তকালের নিলিপ্ত ঔদাসীণ্যে, অনন্ত আকাশের নির্ঝাঁকু নিস্তরতায় মানবের এই ক্ষুদ্রজীবনের দুই-দিনকার ক্ষোভ ও নিমগ্ন করিয়া দিতে পারিল না। একদিকে অনন্তের ঐ নিত্য শান্তি, আর-এক দিকে সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম—দুই একইকালে একসঙ্গে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, দুশ্চিন্তার মধ্যেও রমেশের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পূর্বে রমেশ বিশ্বলোকের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রেমের যে একটি শাখত সম্পূর্ণ শাস্তমূর্তি দেখিয়াছিল, সেই প্রেমকেই ক্ষণকাল পরে সংসারের সংঘর্ষে, জীবনের জটিলতায়, পদে পদে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেখিতে লাগিল! ইহার মধ্যে কোন্টা সত্য, কোন্টা মায়া! রমেশ মনে মনে কহিল, “যদি বিষ ঘটে, আশার প্রতিমা যদি চূর্ণ হইয়া যায়, জীবন যদি ব্যর্থ হইতে থাকে, তবে জগৎ-চরাচরের মধ্যে প্রেমের এই যে প্রশান্ত বিশ্ব-রূপ দেখিয়াছি,—যাহাকে ভালবাসি, অনন্তের বক্ষের মধ্যে তাহার যে চিরন্তন প্রসন্নমূর্তি দেখিয়াছি, তাহাকে ভুলিব না, ছাড়িব না, তাহাকে সংসারের সমস্ত বিরোধ-বিচ্ছেদ-ব্যর্থতার অন্তরালে মানসমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব”—তাহা হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। হে ভগবন,

আমার সেই আশা, সেই স্বপ্ন, সেই মানুষটিকে তোমার মধ্যে ভুলিয়া রাখিলাম—সেখানে তাহার আর ক্ষয় নাই, বিকার নাই, অন্ত

নাই।”—এই বলিয়া সেই জনশূন্য অন্ধকার ছাদের উপরে আবার সে জোড়হাত করিয়া মস্তক ভূমিতলে অবনুষ্ঠিত করিল।

ক্রমশঃ।

কৌশল্যা।

ভরবাজমুনি দশরথের মহিষীবৃন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে তরত অঙ্গুলী-দ্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, “ভগবন্, ঐ যে দীনা, অনশনরুশা, দেবতার ছায় সৌম্যশাস্ত মূর্তি দেখিতেছেন, উনিই আমার জ্যেষ্ঠা অথবা কৌশল্যা।”

এই যে দীনহীনা ব্রতে:পবাসক্লিষ্টা দেবীর চিত্র দেখিলাম, ইহাই কৌশল্যার চিরস্থান মূর্তি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহিষী হইয়াও স্বামীর আদরে বঞ্চিতা। রামচন্দ্রের বনবাস-সংবাদে ইহার মনে রুদ্ধ কণ্ঠের বেগ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি স্বামীর অনাদরের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—

“ন দৃষ্টপূর্ব্বং কল্যাণং হৃৎ বা পতিপৌরুষে।”

‘জীলোকের শ্রেষ্ঠস্বপ্ন স্বামীর অমুরাগ, আমি তাহা লাভ করিতে পারি নাই।’

‘স্বামী প্রতিকূল, এজন্ত আমি কৈকয়ীর পরিবারবর্গকর্তৃক নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া আসিতেছি।’—

“অতো হৃৎখতরং কিম্, সমদানং ভবিনতি।”

‘সপত্নীর একরূপ লাঞ্ছনা হইতে জীলোকের আর বেশী কি কষ্ট হইতে পারে!’

‘যে আমার সেবা করে, কৈকয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত হয়। আমি কৈকয়ীর কিকরীবর্গের সমান অথবা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি।’

একমাত্র রামের ছায় পুত্র লাভ করিয়া তিনি জীবনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই পুত্র সহজে তিনি লাভ করেন নাই,—পুত্র-কামনা করিয়া বহু তপস্তা ও নানাপ্রকার শারীরিক কষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। আমরা রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, পুত্র-কামনার তিনি একদা স্বয়ং যজ্ঞের অশ্বের পরিচর্যা করিয়া সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ব্রতনিরতা ক্ষৌমবাসা সাক্ষী চিরনয়নমধুরপ্রকৃতিসম্পন্না। ভয়ীবৎ স্নিগ্ধ ব্যবহার দ্বারা তিনি কৈকয়ীর নিষ্ঠুরতার শোধ দিয়াছিলেন; তরত কৈকয়ীকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, “কৌশল্যা চিরদিনই তোমাকে ভয়ীর ছায় মেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহার প্রতি এরূপ বজ্রাঘাত কেন করিলে?” ‘ক্ষমাশীলা’ কৌশল্যা কৈকয়ীর শত অত্যাচার ও সর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার স্বামীর চিত্তে একাধিপত্য-

স্থাপন সবেও তাঁহাকে ভগ্নীর মত ভাল-
বাসিতেন । জ্যেষ্ঠা মহিষীর এই ক্রমা ও উদার
স্নিগ্ধতার তুলনা কোথায় ? দশরথ অনেক
সময়েই কৈকয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন,
তাহাও আমরা ভরতের কথাতেই জানিতে
পারি ।—“রাজা ভবতি তুগ্ৰিষ্ঠমিহান্বায়া
নিবেশনে ।” সুতরাং কৌশল্যাকে আমরা
যখনই দেখিতে পাই, তখনই তাঁহাকে ব্রত
ও পূজার্কনাদিতে রত দেখি, স্বামিকর্তৃক
নিগৃহীতা কেবল এক স্থানেই শান্তি পাইতে
পারেন । জগতে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান
নাই, কিন্তু যিনি অনাথের আশ্রয়, যাহার
স্নেহকোমল বাহু ব্যথিতকে আদরে ক্রোড়ে
লইয়া শান্তিদান করে, সেই পরমদেবতাকে
কৌশল্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই
সংসারের দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহার চরিত্র
কঠোর কিংবা কটু হইয়া যায় নাই, উহা যেন
আরও অমৃতরসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল ।
রামায়ণে দেবসেবানিরতা কৌশল্যাকে দেখিয়া
মনে হয়, যেন তিনি সর্বদা সংসারের তাড়না
ভুলিবার জন্ত ভগবানের আশ্রয়তিকা করিয়া
কান্ধাতিপাত করিতেন ।

এই দুঃখিনীর একমাত্র সুখ রামের
মত পুত্রলাভ । যেদিন রামচন্দ্র তাঁহাকে
স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সেদিন
তিনি দেবতাদিগের প্রীতিতে একান্তরূপ
আহ্লাসস্থাপন করিলেন । ভাবিলেন, তাঁহার
পূজা-অর্চনা সমস্তই এতদিনে সার্থক হইল ।
তিনি, রামচন্দ্রের শত শত গুণের মধ্যে যে
মহাগুণে তিনি পিতৃস্নেহ লাভ করিতে
পারিয়াছিলেন, সেই গুণ স্বরণেই একান্ত
প্রীত ও বিম্মিত হইয়াছিলেন—

“কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোহসি পুত্রক ।

বেন দ্বয়া দশরথো গুণৈরারামিতঃ পিতা ॥”

‘তুমি অতি শুভকক্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছ,
তাই তুমি স্বগুণে দশরথ রাজার প্রীতিলাভ
করিতে পারিয়াছ ।’ দশরথ রাজার স্নেহ-
লাভ যে কি হৃদয় ভাগ্যের ফল, সাধবী
তাহা আজীবন তপস্তা করিয়া জানিয়া-
ছিলেন । শুভাভিষেকস্মরণে রাণী গলদশ
বস্ত্রাঞ্চলাগ্রে মার্জনা করিয়া রামচন্দ্রকে
আশীর্বাদ করিলেন ।

রামের অভিষেক-উৎসব ; এতদিনে
দুঃখিনী মাতা আজ আনন্দের আব্বানে
আমগ্নিত হইয়াছেন । কিন্তু তিনি মহার্ঘ
বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া হর্ষকর্কশ্রুতিধরে
এই প্রসঙ্গে প্রগল্ভা রমণীর স্থায় আচরণ
করিলেন না । মহুরা-দাসী শশাঙ্কসন্ধ্যা-
প্রাসাদ-দীর্ঘে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিল—
“রামমাতা ধনং কিম্ব জনেভ্যঃ সম্প্রদচ্ছতি ।”
কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও যাচকদিগকে ধন-
দান করিতেছিলেন । রাম দেখিলেন, তিনি
পবিত্র পটবস্ত্র পরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে-
ছেন ও একমনে বিষ্ণুপূজায় রত রহিয়া-
ছেন । ধর্ম্মিষ্ঠা কৌশল্যা দেবসেবা করিয়া
সফলকামা হইয়াছেন, সেই দেবসেবায় তিনি
আরও আগ্রহসহকারে নিযুক্ত হইলেন ।

এই স্থানে রামচন্দ্র মাতাকে নিষ্ঠুর বনবাস-
সংবাদ শুনাইলেন ; সে সংবাদ পুত্রস্বল
জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল ।

“সো নিকৃন্তেব শালত যষ্টঃ পরশুনো বনে ।

পপাত সহসা দেবী দেবতেন দিবচ্চ্যুতা ॥”

অরণ্যে কুঠারাঘাতে কর্তৃত শালযষ্টির
স্থায়,—স্বর্গচ্যুত দেবতার স্থায় দেবী কৌশল্যা

সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন;—পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দশরথের মত প্রাণত্যাগ করিলেন না।

দশরথ স্বকৃত পাপের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকে বনে পাঠাইয়া তাঁহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপরাধে এই কার্য্য করার অল্প তাঁহার তদপেক্ষা গভীরতর মনস্তাপ ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চিরস্বখাত্যস্ত কুমারকে জটা ও চীরবাস পরিহিত দেখিয়া সেই কষ্টই তাঁহার অসহনীয় হইল কিংবা যিনি কোন অপরাধে অপরাধী নহেন, তাঁহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্দাসনদণ্ড দেওয়ার লজ্জা তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা মুকঠিন। আজ্ঞাতপন্থিনী কৌশল্যার পুত্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্তু দশরথের মত অমূল্য হইবার তাঁহার কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ দশরথ চিরস্বখাত্যস্ত, গার্হস্থ্যজীবনে স্নেহের অভিলাষ তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বৃদ্ধ-বয়সে তাহা সহ্য করিবার শক্তি হইল না। কৌশল্যা চিরদুঃখিনী, চিরস্নেহবঞ্চিতা, দেবতায় বিশ্বাসপরায়ণা। এই দুঃখ পূর্ব-বর্ত্তী দুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, তিনি স্নেহজনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, তাহা সহিতে সহিতে ধর্ম্মশীলার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল; তিনি এই মহাত্ম্যের সময় যে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষুঃকৃত করিয়া তুলে।

বনগমনসম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি পিতৃগত্যাধিকার বনে যাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু মাতার নিকট কি

তোমার কোন ঋণ নাই! আমি অল্পজ্ঞা করিতেছি, তুমি এখানে থাকিয়া এই বৃদ্ধ-কালে আমার পরিচর্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্ম্মে পতিত হইবে না। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ধর্ম্ম-সঙ্গত হইবে না।” শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, “আমি পূর্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং আমার উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ-আদেশে ঋষি কণ্ঠ গোহত্যা করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সাগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে হুরুহ ব্রত অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতৃ-আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না। তিনি কাম কিংবা মোহ বশত যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমার বিচার্য্য নহে, —তাঁহার প্রতিশ্রুতিপালন আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য।” কৌশল্যা বলিলেন, “দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহাদের বংশের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে বাঁচিব? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোমার মুখ দেখিয়া তৃণ খাইয়া জীবন-ধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়।” রাম বলিলেন, “পিতা তোমারও প্রত্যক্ষদেবতা, তাঁহার পরিচর্য্যাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তুমি সংবতাহারী হইয়া ধন্যাত্ম্যে এই চতুর্দশবৎসর অতিবাহিত কর, এই-সময়-অন্তে শীঘ্র আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দনা করিব।” লক্ষ্মণ ঘোর বাধিতও উৎপাদিত করিয়া রামচন্দ্রকে এই ‘অজ্ঞায়-আদেশ-প্রতিপালন হইতে প্রতিনিবৃত্ত

করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন; সজল নেত্র-প্রান্তের অশ্রু অকলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্যা সকলই শুনিতেছিলেন—তাহার পার্শ্বে ধর্ম্মাবতার সৌম্যমূর্তি মাতৃহঃখে বিষম রামচন্দ্র ধর্ম্মের জন্ত, পবিত্র প্রতিকৃতিপালনের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিবার অটল সঙ্কল্প দেহবশী-ভূত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এবং ত্রুণ লক্ষণের হস্তধারণপূর্বক তাহার উদ্ভে-জনাশ্রমনার্থ অহুনয় করিয়া বলিতে-ছিলেন;—দেবীকৃপণী কৌশল্যা দেবকৃপণী পুত্রের অপূর্ণ ধর্ম্মভাব দেখিয়া অপূর্ণভাবে সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন;—ধর্ম্মের কথা কৌশ-ল্যার হৃদয়ে বার্ষ হইবার নহে। সহসা পুত্রশোকাক্রান্তা মহিষী দীরগন্তীর মূর্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রামের বনগমন অহুমোদন করিয়া অশ্রুগলদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—

“গচ্ছ পুত্র ধমেকাগ্রো ভবন্তেহস্ত সন্ম বিতো ।

পুনশ্চ নিবৃত্তে তু ভবিত্যসি পতঃসমা ।

পিতৃগনুগাত্য প্রাপ্তে স্বপিতৃ পরণঃ স্বপত্ন ।

গচ্ছদানীঃ মহাবাহো ক্ষেমেন পুনরাগতঃ ।

নন্দয়িস্যি মাং পুত্র সান্নাঃ স্তব্ধেন চাক্ষুণা ॥”

“পুত্র, তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সমস্ত হঃখ অপনোদিত হইবে। তুমি এই চতুর্দশবৎসর ব্রতপালনপূর্বক পিতৃ-ধ্বংস হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা ঘাইব। বৎস, এখন প্রস্থান কর, নির্লিপ্তে পুনরাগত হইয়া হৃদয়হারী নিম্নল সাহসনা-বাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও।” সেই করুণ শোকধ্বনি, ধর্ম্মপূর্ণ সঙ্কল্প ও ক্রোধের নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশল্যা দেবীর

এই চিত্র সহসা মহাশব্দগোরবে আপূরিত হইয়া উঠিল। কৌশল্যা দেবী যে দেবতাদিগকে রামের অভিষেকের জন্ত পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জন্ত প্রার্থনা করিয় পুনরায় পূজা করিতে লাগিলেন। কৃতাজলি হইয়া রামের বনবাসে শুভকামনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—“হে ধর্ম্ম, তোমাকে আমার বাজক আশ্রয় করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিও। হে দেবগণ, চৈত্য ও আয়তন সমূহে রাম তোমা-দিগকে নিত্য পূজা করিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও। হে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত দেবপ্রভাব অস্ত্রসকল, তোমরা রামকে রক্ষা করিও। পিতৃমাতৃসেবা দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনান্ত্রিত রামকে রক্ষা করে।” অশ্রুপূর্ণচক্রে ধর্ম্মশীলা কৌশল্যা একটি একটি করিয়া সমস্ত দেবতার নিকট রামচন্দ্রের মঙ্গলকামনা করিলেন। পুত্রের মৃত্যুকে শুভাশিষ্যপ্রদায়ী হস্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন—“আমার মূনিবেশধারী ফলমূলোপজীবী কুমার যেন রাক্ষস ও দানব-দিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়; দংশ, মশক, বৃশ্চিক, কীট ও সরীসৃপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে; সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাকায হস্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষেরা এবং নরখাদক রাক্ষস-গণ যেন ধর্ম্মাশ্রিত পিতৃসত্যপালনরত তল্পণী বালকের দ্রোহাচরণ না করে। হে পুত্র, তোমার পথ সুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,—তুমি বনে গমম কর, আমি অহুমতি দিতেছি।”—বলিতে বলিতে ধর্ম্মশীলা রাণী গৌরবদৃশ হইয়া পূজার উপকরণ লইয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তাহার ধর্ম্মবিদ্যাস এতটুকুও

শিখিল হইল না। যে পবিত্র যজ্ঞাঘি অভিষেকের শুভকামনায় প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বনপ্রস্থানকালে মঙ্গলভিক্ষা করিয়া পুনরায় ঘৃতাভি দিতে লাগিলেন এবং বন্ধাজ্জলি হইয়া পুনরায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, “বৃদ্ধনাশকালে ভগবান্ ইচ্ছকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমৃত-লাভোদ্দেশে কঠোর তপঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে সেই মঙ্গল আশ্রয় করুন; স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষ্ণুকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন।” সহসা ধর্মপ্রাণা কৌশল্যা ধর্মের অপূর্ণ ও গভীর শান্তি লাভ করিলেন। তিনি স্থির ও স্নেহগদগদ কণ্ঠে রামচন্দ্রকে বলিলেন, “পুত্র, তুমি স্নেহে বনগমন কর, রোগশূন্য শরীরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিও। এই চতুর্দশবৎসর নিবিড় কৃষ্ণারজনীর ন্যায় কাটিয়া যাইবে, অযোধ্যায় রাজপথে তুমি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদ্ভিত হইবে, আমি তোমাকে লাভ করিয়া স্তব্ধ হইব। পিতাকে ঋণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্বসিক্তি লাভ করিয়া তুমি পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম।”

তৎপরে বখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গ্রহণের জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কৈকয়ীকে নিন্দা করিয়া ও দশরথের অন্যায় প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাত করিয়া

ঘোর বাণিতত্তা উপস্থিত করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে লাগিলেন,— রাজকুমারদ্বয় ও সীতার হস্তে কৈকয়ী চীরবাস প্রদান করিলেন; সেই অভিষেকত্রতোজ্জ্বল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া জটাবকলধারী হইয়া দাঁড়াইলেন, এই মর্ম্মবিদারক দৃশ্য বৃদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, স্তম্ভ এবং কুলপুরোহিত বসিষ্ঠের চক্ষে অসহ্য হইল—তাঁহারা কৈকয়ীর তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর তর্ক ও বাণিতত্তা পূর্ণ গৃহের এক প্রান্তে অশ্রুমুখী কৌশল্যা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার দিকে চাহিয়া রাম রাজাকে বলিলেন—

“ইয়ং ধার্মিক কৌশল্যা মম মাতা। যশস্বিনী।

বৃদ্ধা চাক্ষুঃশীলা চ নচ ভ্যাং দেব গর্হতে ॥

ময়া বিহীনাঃ বরদ প্রপন্নাঃ পোকসাগরম্।

অদৃষ্টপূর্ববদনঃ ভূয়ঃ সংযতমহসি ॥”

‘আমার উদারস্বভাবা যশস্বিনী বৃদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। আমার বিষয়ে ইনি শোকসাগরে পতিত হইবেন, ইনি এরূপ হুংখ আর পান নাই, আপনি ইহাকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন।’

এই দেবী দশরথের অনাদৃত্য ছিলেন; কিন্তু দশরথ কি ইহার প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল্যা তাঁহার বিরূপ আদরগীরা, দশরথ তাহা জানিতেন। কৈকয়ীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—

‘আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এরূপ অপ্রিয় কার্যা করিয়া আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব?’

“যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ সখীব চ ।

ভাৰ্গ্যাবস্তগিনীবচ মাতৃবচোপতিষ্ঠেত ॥

সততঃ প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ।

ন ময়া সংকৃতা দেবী সংকারার্বা কৃতে তব ॥”

“কৌশল্যা দাসীর ছায়, সখীর ছায়, স্ত্রীর ছায়, ভগিনীর ছায় এবং মাতার ছায় আমার অমুগুতি করিয়া থাকেন। তিনি আমার নিয়ত হিতৈষিনী এবং প্রিয়ভাষিনী ও প্রিয় পুত্রের জননী। তিনি সর্বতোভাবে সমাদরের যোগ্য, আমি তোমার জন্ত তাঁহাকে আদর করিতে পারি নাই।” কৈকয়ী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

“সহ কৌশল্যা নিত্যঃ রত্নমিচ্ছসি দুৰ্ব্বতে ।”

কিন্তু অযোধ্যা ছাড়িয়া রামচন্দ্র যখন চলিয়া গেলেন, যখন মৌনভাবে কৌশল্যা দশরথের সঙ্গে সঙ্গে রামের রথের অমুবর্ত্তিনী হইয়া বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশল্যার প্রতি তাঁহার আদর ও স্নেহ অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ পথে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া বলিলেন, “আনাকে মহারানী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অশ্রুত শান্তি পাইব না।” অন্ধরাতে শোকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়া কৌশল্যাঁকে তিনি বলিলেন,—“দেবি, রামের রথের ধূলির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আমি দৃষ্টিহারী হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ কর।”

নিভৃত প্রেক্ষাৰ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশল্যা তাঁহাকে কটুক্ৰি করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, সপত্নীর

বশীভূত স্বামীর এই ব্যবহার লোক-সমক্ষে তিনি মৌনভাবে সহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন না। কাদিতে কাদিতে দশরথকে বলিলেন— “পৃথিবীর সর্বত্র তুমি যশস্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্ত বলিয়া কীর্তিত। কি বলিয়া তুমি পুত্রহর ও সীতাকে ত্যাগ করিলে?—স্বকুমারী চিরসুখোচিতা জানকী কিরূপে সীতাতপ সহিবেন! স্থপকারগণের প্রস্তুত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য যিনি আহার করিতে অভ্যস্ত, তিনি বনের কষায় ফল খাইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! রামচন্দ্রের স্নেহশাস্ত্র পদ্মবর্ণ ও পদ্মগন্ধিনীসমযুক্ত ব্রুঞ্চ আমি জীবনে আর কি দেখিতে পাইব?” এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যা অধীর হইয়া স্বামীর প্রতি কচুবাঁকা প্রয়োগ করিলেন—“জলজন্তুরা বৈরূপ স্বীয় সন্তানকে ত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাজ্যনাশ ও পৌর-জনের সর্বনাশ করিলে। মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম।

গতিরেকা পতিনীয়া দ্বিতীয়া গতিরাস্ত্রজঃ ।

তৃতীয়া জাতয়ো রাজন্ চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥”

কৌশল্যার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া দশরথ মুহূর্ত্তকাল ছঃখিতভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তাঁহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিল। জ্ঞানলাভান্তে তিনি সাক্ষশ্চেষ্ট্রে, তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্বে কৌশল্যাঁকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌন হইলেন। তিনি স্বীয় পূৰ্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া শোকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং অশ্রু-

পূর্ণচন্দ্রে অধোমুখে কৃতাজ্জলি হইয়া কম্পিত-
দেহে কৌশল্যার প্রসাদভিক্ষা করিয়া বলি-
লেন, “দেবি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও,
তুমি শ্বেহশীলা ও শত্রুগণের প্রতিও ক্ষমা
প্রদর্শন করিয়া থাক। স্বামী গুণবান্ বা
নিগুণ হউন, জীলোকের নিত্য গুরু।
আমি দুঃখমাগরে পতিত হইয়াছি এবং
তোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার
প্রতি অপ্রিয়কথা প্রয়োগে বিরত হও।”
রাজা বক্সাজলি, তাঁহার অশ্রু ও করুণ
দৈন্ত দর্শনে কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,
তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা বিগলিত
হইতে লাগিল। তিনি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ
কমলকর ধারণ করিয়া স্বীয় মস্তকে
রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন
— “দেব, আমি তোমার পদতলে আশ্রিতা,—
প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
তুমি আমার নিকট কৃতাজ্জলি হইলে সেই
পাপে আমার ইহকাল-পরকাল দুইই যাইবে,
আমি তোমার ক্ষমার বোণা হইব না। চিরা-
রাধ্য স্বামী বাহাকে এইরূপে প্রদর করিতে
চান, সে কুলজ্ঞীর মর্যাদা লঙ্ঘন করি-
য়াছে,—সে আর কুলজ্ঞী বলিয়া পরিচয়
দিতে পারে না। ধর্ম কি, আমি তাহা
জানি,—তুমি সত্যের অবতাররূপ, তাহাও
বুঝিতেছি। পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া আমি
তোমার প্রতি দুর্দ্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি—
তোমার প্রতি প্রসন্ন হও। শোকে ধৈর্য্য
নষ্ট হয়, শোকে ধর্মজ্ঞান অন্তর্দান করে,
শোকে সর্বনাশ হয়, শোকের মত
রিপু নাই। পঞ্চ রাজি অতীত হইল রাম
অযোধ্যা হইতে গিয়াছে, এই পঞ্চ রাজি

আমার নিকট পঞ্চ বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ
হইয়াছে।” এই সময়ে সূর্য্যদেব মন্দরগ্নি হইয়া
নভঃপ্রান্তে বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে
রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল—দশরথ
কৌশল্যার কথায় আশ্রিত হইয়া নিদ্রিত
হইলেন।

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ণ
স্বামিভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দৃশ্যটি সংক্ষেপে
সঙ্কলিত হইল, আমরা মূলকাব্যের এই অংশ
অশ্রবেগে পড়িতে পারি নাই।

পররাজে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন
কৌশল্যা পুত্রশোকে আকুল হইয়া নিদ্রায়
আক্রান্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পারেন
নাই। পরদিন প্রত্যুষে সেই দুঃখময় রাজ-
প্রাসাদের চিরপ্রথাযুসারে বন্ধিগণ গান
আরম্ভ করিল, বীণার মধুর নিকণে প্রবৃদ্ধ
হইয়া শাখাবিহারী ও পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগকুল
কাকলি করিয়া উঠিল, প্রসুপ্তা কৌশল্যার
মুখে বিবর্ণতা ও শোক অঙ্কিত হইয়াছিল—

“নিশ্রুজা চ বিবর্ণা চ সরা শোকেন সন্নতা।

ন ব্যরাজত কৌশল্যা তারেব তিমিরাবৃত।”

গত ভীষণ রজনীর দুইটিনার চিত্র
উদঘাটন করিয়া যখন উষাদেবী দর্শন দিলেন,
তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়া মহিষীগণ আকু-
লিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাস্পপূর্ণচন্দ্রে
কৌশল্যা স্বামীর মস্তক ধারণ করিয়া কৈকয়ীর
দিকে চাহিয়া বলিলেন—

“সকামা তব কৈকেয়ী ভূঙ্গ রাজ্যমকটকম্।”

“রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজা ছাড়িয়া
গেলেন, এখন আমি আর কি লইয়া থাকিব?

—ইহং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্।”

“এই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি

অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিব।’ ইহার পরে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ষষ্ঠ-নার কোন সংবাদ জানিতেন না; কৈকয়ীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে শোকার্তকণ্ঠে ভৎসনা করিয়া বিলাপ করিতে-ছিলেন, অপর প্রেক্ষা হইতে কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্মিত্রার দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভরত কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “তোমার মাতা! রাজ্যাকামনায় আমার পুত্রকে চীর ও বকল পরাইয়া বনে পাঠাইয়া দিয়াছেন, রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনবাস্তশালিনী অযোধ্যাপুরী অধিকার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।” ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আর্য্যে, আপনি কেন না জানিয়া আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,—রামের আমি চির-অহরাগী, আমাকে সন্দেহ করিবেন না।” এই বলিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন। রামের প্রতি যদি তাঁহার বিবেচবুদ্ধি থাকে, তবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত নরকে তাঁহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরিশ্রান্ত ভরত শোকোচ্ছ্বাসে মৌনী হইয়া রহিলেন। কৌশল্যা বলিলেন—“বৎস, তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে ধর্ম্মবেদন। প্রদান করিতেছ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্ম্মব্রত হয় নাই, আমার দুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।” এই বলিয়া কৌশল্যা ব্রাতৃবৎসল

ভরতকে সন্নেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরত অযোধ্যার সমস্ত পৌরজনে পরিবৃত হইয়া রামকে আনিতে গেলেন; শোককর্ণিতা কৌশল্যা সঙ্গে গিয়াছিলেন। শৃঙ্গবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত ভুলুপ্তিত হইয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিলেন,—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে পারিতেছিলেন না,—কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া দীন ও আশ্রয় স্বরে ও স্নিগ্ধসম্ভাষণে তাঁহাকে বলি-লেন—

“পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্ছিরীঃ প্রতিবোধতে।

স্বঃ পৃষ্ট। পুত্র জীবামি রামে সন্নাহুকে গতে।”

‘পুত্র, তোমার শরীরে ত কোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই। রাম ভ্রাতার সহিত বন-বাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি দেখিয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি।’

প্ৰকৃতপক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন গর্ভজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন—কৈকয়ী তাঁহার বিমাতার স্তায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিত্রকূট-পর্বতে রামের সঙ্গে মিলন সঞ্চটিত হইল! কৌশল্যা সীতার স্বথের উজ্জ্বল স্ত্রী আতপল্লিষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুপূর্ণাক্ষী সীতা স্বশ্রমতাকে প্রণাম করিয়া নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কৌশল্যা বলিলেন—“যিনি মিথিলাধিপতির কন্যা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং রামচন্দ্রের স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত দুঃখ পাইতেছেন?

বৎসে, আতপসন্তপ্ত পদ্মের শ্রায়, ধূলিধ্বস্ত
কাঞ্চনের শ্রায় তোমার মুখের ছটা বিবর্ণ
হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়া
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ।”

রাম ইন্দুদীফল দিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান
করিয়াছিলেন,—ভূতলে দক্ষিণাশ্র দর্ভের
উপর প্রদত্ত সেই ইন্দুদীফলের পিণ্ড
দেখিয়া কৌশল্যা বিলাপ করিয়া বলিলেন
—“রাম এই ইন্দুদীফলে পিতৃপিণ্ড দান
করিয়াছেন, এ দৃশ্য আমার সহ্য হয় না—”

“চতুরাশ্রাঃ মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভূবি ।

কথমিহুদিপিণ্যাকং স ভুঙক্তে বহুধাবিণিঃ ॥

অতো হৃৎযতরং লোকে ন কিঞ্চিং প্রতিভাতি মে ।

যত্র রামঃ পিতুর্দণ্যাদিহুদীক্ষোদবৃদ্ধিমান্ ॥”

“ইন্দ্রতুলাপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ সসাগরা
পৃথিবী ভোগ করিয়া এই ইন্দুদীফল কিরূপে
ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্রে ইন্দুদীফলের
পিণ্ড পিতাকে প্রদান করিলেন, ইহা হইতে
আমার অধিকতর হৃৎযত আর কিছুই নাই ।”
সামান্য বিবয় লইয়া এই সকল বিলাপপূর্ণ
উক্তির একদিকে পুত্রের বনবাসে জননীর
দারুণ হৃৎযত, অপরদিকে স্বামিবিয়োগে
সাম্বীর স্নগভীর মর্ম্মবেদনা কুটিয়া উঠি-
য়াছে ।

এই কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ-
জননীর চিত্র—আদর্শ গ্রীচিচিত্র । প্রতি পল্লী-

গৃহের হিন্দুবালাক এখনও এই স্নেহ ও আশ্র-
ত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্ত হইতেছেন ।
এখনও শত শত স্নেহময়ী কৌশল্যা হিন্দু-
স্থানের প্রতি তরুণলবছারায় স্বীয় কোমল
বাহুবন্ধনে আশ্রিত শিশুগণকে পালন
করিতেছেন ও তাহাদের শুভকামনায় কঠোর
ব্রত-উপবাস ও দেবারাধনা করিয়া নিরন্তর
স্নেহার্থ আশ্রবিসর্জনে করিতেছেন । এখনও
বঙ্গদেশের কবি “কে আসে ধীরে ধীরে
আকুল নয়ননীরে” প্রভৃতি স্মৃষ্টি বন্দনা-
গীতে সেই স্নেহপ্রতিমার অর্চনা করিতেছেন ।
কিন্তু কৌশল্যার মত কয়জন জননী এখন
ধর্ম্মব্রতে আশ্রবিসর্জনকারী বঙ্গলধারী
পুত্রকে বলিতে পারেন—

“ন শক্যতে বারষিতুং গচ্ছনানীং রবৃত্তম ।

শীঘ্রক বিনিবর্ত্তস্য বর্ষস্য চ সত্যঃ ক্রমে ॥

যং পালয়সি ধর্ম্মঃ ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ ।

স বৈ রায়বশাদ্ভীল ধর্ম্মস্বামিরিচ্ছতু ॥”

‘বৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ
করিয়া রাখিতে পারিলাম না, এক্ষণে তুমি
প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও
এবং সংপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিও । তুমি প্রীতির
সহিত—নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত
হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন ।”
আমাদের চিরপূজ্যর্হা শচীমাতাও বুক বাধিয়া
এমন কথা বলিতে পারেন নাই ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

আমাদের নিবাস ।

‘আপনার নিবাস ?’—প্রশ্নটি সকলেরই পরিচিত । কিন্তু সকল স্থলে উত্তর একপ্রকার হয় না । উত্তর দিবার সময় প্রশ্নকর্তার দেশবিদেশের জ্ঞান অমুমান করিয়া লইতে হয় । তিনি দূরদেশবাসী হইলে তাঁহাকে গ্রামের নাম বলা মিছে ; জেলার নাম করিলেও প্রশ্নকর্তা নিবাস ঠিক বুঝিতে পারেন না । হুগলি কিংবা বক্রমান জেলায় বাস হইলেও বলিতে হয়, নিবাস কলিকাতা, কিংবা বঙ্গদেশ ।

আমেরিকা, যুরোপ প্রভৃতি দেশের লোক আমাদের নিবাস জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্গদেশ বলিলেও চলে না । হয় ত বলিতে হইবে, নিবাস ভারতখণ্ডে ।

কিন্তু মনে করুন, বৃহস্পতিগ্রহের কোন অধিবাসীকে আমাদের নিবাস বলিতে হইবে । তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের নাম করা মিছে । হয় ত বলিতে হইবে, নিবাস পৃথিবীতে । বৃহস্পতিবাসী নিশ্চয়ই সূর্য্যকে জানেন । স্ততরাং বলিতে হইবে, আমাদের নিবাস সেই পৃথিবীতে, যে পৃথিবী সূর্য্য হইতে নয়-কোটি ত্রিশলক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া তাহার সমস্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে । বৃহস্পতিবাসী দেশবিদেশে অভিজ্ঞ হইলে আর একটু বলিতে পারা যায় । বলিতে পারা যায়, সূর্য ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যবর্তী আকাশে পৃথিবী ।

কিন্তু লুকক-(Sirius)-তারার অধিবাসীকে এই উত্তর দিলে চলিবে না । হয় ত তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন, সূর্য্যটা কোথায় ? আকাশে ? ব্রহ্মাণ্ডে ? ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সূর্য্য কোথায় ? আপনার ব্রহ্মাণ্ডই বা কোথায় ?

উপরে যে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের আভাস দেওয়া গেল, তাহা একটি কঠিন সমস্তার ভূমিকামাত্র । প্রশ্নটি বহু পুরাতন, কিন্তু যুরোপে গত দুইশত বৎসর চাপা ছিল । কয়েকমাস হইল, স্বনামখ্যাত প্রাণিবেত্তা ডাঃ রাসেল্‌ বালেস্ট্রাহকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন । ইনি যে-সে লোক নহেন ; যেদার্বিন্‌ সভাসমাজের চিন্তাপথ আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন, সেই দার্বিনের প্রায় তুল্য আসনে ইনি উপবেশন করিতে পারেন ।

প্রাচীনেরা—শুধু এদেশে নহে, অস্ত্রান্ত্র দেশেও—ভাবিতেন, এই ভূমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত । ভূমণ্ডলের জীবসমূহের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ ; স্ততরাং মানবের নিমিত্ত ভূমণ্ডল, সূর্য্য, তারা, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে । আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি পরিমাণ করিতেও নিরস্ত হন নাই । তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডকে সান্ত ভাবিয়া উহার অপর পারে লোকালোক-পৰ্ব্বত বসাইয়াছিলেন । তাঁহারা মনে করিতেন, সূর্য্যের রশ্মিতেই গ্রহতারা প্রভৃতি

ঈশ্বিন্দীপু হইয়াছে, এবং যতদূর রবিকরে সমুদ্ভাসিত, ততদূর ব্রহ্মাণ্ড । ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি আছে শুনিয়া ভাস্করাচার্য্য অবাচ্ হইয়াছিলেন । কিন্তু যাহাদিগের নিকট ব্রহ্মাণ্ড করামলকবৎ অমল বোধ হইত, তাঁহাদিগের কথা খণ্ডন করিতে ভাস্করের সাধ্য ছিল না । ফলত তিনি কথাটা মানিয়াও মানেন নাই, এবং নূতন ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া কথাটার একটা সম্ভব অর্থ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন । আমাদের কোন কোন পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি বলিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-বর্ণনস্থলে উহাকে সসীম ভাবিয়াছিলেন । ডাঃ বালেস্ এই প্রাচীন বিশ্বাস আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনঃস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

তিনি বলেন, এবং আধুনিক জ্যোতিষ হইতে প্রমাণও দিয়াছেন যে, তারাময় ব্রহ্মাণ্ড সসীম, সূর্য্য ছায়াপথের ঠিক তলে (plane) এবং প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত । সূর্য্য সমগ্র দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত বলিয়া সম্ভবত সমগ্র জড়ময় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত । তদনন্তর তিনি জীবসঞ্চারের অস্বকূল অবস্থা-সকল অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে, একমাত্র পৃথিবীই জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে । শত শত নহে, সহস্র সহস্র নহে, কোটি কোটি বৎসর কোন গ্রহের পৃষ্ঠদেশ সমন্যাত্মক উষ্ণ না থাকিলে জীবের বাসোপযোগী হইতে পারে না । জীবের আবির্ভাবপক্ষে এই পৃথিবীতে অনেক গুলি অস্বকূল অবস্থা বিস্ত-

মান ছিল । সূর্য্য হইতে পৃথিবীর এমন অন্তর যে, পৃথিবীর উষ্ণতার সমভাব সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে । পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া আবশ্যকমত ঘন আবহ রহিয়াছে ; পৃথিবীতে গভীর বিস্তীর্ণ সমুদ্র রহিয়াছে ; মরুভূমি ও আগ্নেয়গিরি সমূহ রহিয়াছে । সূর্য্য তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়াই পৃথিবীর অবস্থা একরূপ হইতে পারিয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তে এমন কোন তারারূপ সূর্য্য নাই, যাহার গ্রহসকলে জীবসঞ্চারের অস্বকূল অবস্থা থাকিতে পারে ।

বলা বাহুল্য, ডাঃ বালেসের জ্যোতিষিক আধার শিথিল হইলে তাঁহার জীবসঞ্চার-বিষয়ক অস্বকূল নিরর্থক হইবে । ইহাও বলা বাহুল্য, এমন একটা কথা বিনা আলোচনায় বিব্রতসমাজে স্থান পাইতে পারে না । কয়েকজন জ্যোতিষী ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া-ছেন । তন্মধ্যে ইংলণ্ডের মণ্ডল-সাহেব এবং ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ স্কুমারিয়ার্-সাহেব যে সকল দৃষ্টি দ্বারা বালেসের অস্বকূল খণ্ডন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সারাংশ সঙ্কলিত হইল ।* ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতিষের মত কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে ।

অবশ্য কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে । হাসিয়া সকল তর্কের মীমাংসা করা যাইতে পারে । বিচারে, প্রমাণপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া স্ব স্ব সংস্কারের দশবর্তী হইলে কোন বিষয়েরই বিচার আবশ্যক হয় না । ব্রহ্মাণ্ড সান্ত না অনন্ত, এ প্রসঙ্গ আধুনিক

কোন কোন জ্যোতিষীর মনে স্থান পাই-
রাছে ।*

প্রথমেই দেখা যায়, ব্রহ্মাণ্ড সসীম না
হইলে তাহার মধ্যস্থল নির্দেশ করিতে পারা
যায় না । বস্তুত ব্রহ্মাণ্ড সসীম, না অসীম ?
বালেসের তর্ক এই যে, ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইলে
তারা অসংখ্য হইত । কিন্তু দূরবীক্ষণের
ক্ষমতারূপে সঙ্কে সঙ্কে তারাসংখ্যা বৃদ্ধি
পাইতে দেখা যায় না । অল্প ক্ষমতায় তারা-
সংখ্যা যে অল্পপাতে বৃদ্ধি পায়, অধিক ক্ষম-
তায় সে অল্পপাতে পায় না, নূন অল্পপাতে
পায় । তারা অ-সংখ্য হইলে একরূপ হইত
না । অতএব মনে হয় যে, সমধিক-ক্ষমতা-
শালী দূরবীক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তারা
দৃষ্টিগোচর হইতে পারে । তবে, ব্রহ্মাণ্ড
অনন্ত কই ?

কিন্তু এ যুক্তি নির্দোষ নহে । দূরবীক্ষণ
যত বৃহৎ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার কাচ
তত বৃহৎ ও স্থূল হয় । কাচদ্বারা আলোক
শোষিত হয়; এবং কাচ যত স্থূল হয়, আলোকও
তত অধিক শোষিত হয় । সুতরাং দূর-
বীক্ষণের ক্ষমতারূপে অল্পপাতে তারার সংখ্যা-
বৃদ্ধি হইতে পারে না । কিন্তু তারাগণনার
নিমিত্ত দূরবীক্ষণই একমাত্র উপায় নহে ।
ফটোগ্রাফীর কাচ আকাশের দিকে উন্মুক্ত
রাখিলে কাচে তারাসকল অঙ্কিত হয় । পনর-
মিনিট উন্মুক্ত রাখিলে যত তারার চিত্র পাওয়া
যায়, ত্রিশমিনিট রাখিলে তদপেক্ষা অধিক
পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিগুণ পাওয়া যায় না ।

* ব্রহ্মাণ্ডশব্দ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা বাইতেছে ।
আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিক অর্থ । কল্পনায় কি আসে,
প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই বিবেচ্য ।

অবশ্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারাসমূহকে কোন
কথা নাই ; ক্ষীণ তারা লইয়াই কথা । কিন্তু
ফটোগ্রাফীর কাচে আলোকদানের (expo-
sure) কালবৃদ্ধির অল্পপাতে যে অতিশয় স্বল্প
তারার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এমন নিয়ম নাই ।
অতএব কি দূরবীক্ষণ, কি ফটোগ্রাফীর কাচ,
কোন উপায়ে নভোমণ্ডলের সমুদয় তারা
দৃষ্ট হইতে পারে না ।

বালেসের দ্বিতীয় তর্ক এই যে, এক এক
তারা বিশালদেহ প্রদীপ্ত সূর্য্য ; এই সকল
সূর্য্য অ-সংখ্য হইলে তাহাদিগের নিকট
হইতে অসীম উজ্জ্বল আলোক আসিত, এবং
গগনমণ্ডল মধ্যাহ্নের জ্বায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত
থাকিত ।

কিন্তু একরূপ প্রথর আলোক না পাইবার
অনেক কারণ থাকিতে পারে । (১) দূরব-
ক্ষের বর্ণাঙ্কসারে আলোকের প্রাণার্থ্য ভ্রাস
পায় বটে, কিন্তু আলোকবহু পদার্থের স্বচ্ছ-
তার কিঞ্চিৎ নূনতায় উক্ত নিয়মে ভ্রাস পায়
না । কে জানে, কিরূপ পদার্থে দিব্যস্থান
পরিবাপ্ত আছে ? (২) তারা গণিবার সমস্ত
কেবল উজ্জ্বল তারাসকল গণি কেন ?
প্রদীপ্ত তারা ব্যতীত নিম্নতর অদৃশ্য বহু তারা
থাকিতে পারে । একরূপ তারা যে আছে, তাহাতে
সন্দেহ নাই । সময়ে সময়ে নূতন তারা
প্রকাশিত হয় । একরূপ তারা কত আছে,
কে জানে ? সংখ্যায় দৃশ্য ও অদৃশ্য তারা
সমান হইতে পারে, এবং এই সকল অদৃশ্য
তারা দ্বারা আলোক প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে ।

এতদ্বারা আমাদের দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড বৃদ্ধি হইবে । ইহাই
কি না আসে,—সে তর্ক তুলিবার প্রয়োগ নাই । কি

(৩) নীহারিকা (Nebula) দ্বারা দিব্যালোক পূর্ণ। ফটোগ্রাফী এ বিষয়ের সাক্ষী। কিন্তু সমুদয় নীহারিকা প্রকাশমান না হইতে পারে। বরং প্রথম অবস্থায় নীহারিকার অদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা। এই সকল নীহারিকাও আলোক শোষণ করিতে পারে। (৪) দিবা রজঃ যাহার জন্ত পরিষের * (Zodiacal Light) উৎপত্তি, এবং উজ্জ্বল, যাহা বৎসরে ভূতলেই কোটি কোটি পতিত হয়,—ইহারাও তারাসমূহের আলোক শোষণ করিতেছে।

বালেসের আর এক তর্ক এই যে, ব্রহ্মা ও অনন্ত হইলে সকল দিকেই সমানসংখ্যক তারা দেখিতে পাওয়া যাইত। তর্কটি নূতন নহে; অনেক জ্যোতিষী তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের রূপ অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন। এ নিমিত্ত কথ্যটা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বলা যাইতেছে। বস্তুত আমাদের সকল দিকে একইসংখ্যক তারা দেখা যায় না। স্বর্গজা বা ছায়াপথের দিকেই তারা অধিক, ছায়াপথের তির্ঘ্যাক দিকে অল্প। ছায়াপথের যত নিকটের আকাশে দৃষ্টিপাত করা যায়, তত অধিক ও সর্ববিধ উজ্জ্বল তারা নয়নগোচর হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রায় ছয়সহস্র তারাপুঞ্জ ও নীহারিকা দেখা গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ তারাপুঞ্জ ছায়াপথের তলে (plane), এবং অধিকাংশ বাষ্পনয় নীহারিকা উক্ত তলে হইতে দূরে, এমন কি, ছায়াপথের মেরুর নিকটে দেখা গিয়াছে। অতএব তারাময়

ব্রহ্মাণ্ডের একটা গঠন আছে। তারা ও তারাপুঞ্জ আকাশের সর্বত্র সমান ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। ছায়াপথেরও একটা বিশেষ গঠন আছে। রাত্রিকালে নির্মল আকাশে ছায়াপথ নিরীক্ষণ করিলে উহাতে সমঘন তারা-সন্নিবেশ দৃষ্টিগোচর হয় না; মনে হয়, ছায়াপথ সৌরজগতের জায় কোন নিয়তাকার চক্র নহে। আমরা দেখি, উহা হংস (Cygnus) এবং বৃশ্চিক নক্ষত্রে ছই অসম শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; দেখি, উহা স্থানে স্থানে যেন বিদীর্ণ হইয়াছে। কোন ঋজুনদী দূর হইতে দেখিলে যেমন উহার ছই তীর পরস্পর নিকটস্থ বোধ হয়, ছায়াপথের তারা-কল আমরা বহু-বহু দূর হইতে দেখি বলিয়া তাহারা পরস্পর নিকটস্থ বোধ হয়, এবং ছায়াপথ চক্রাকার দেখায়।

এ সকল কথাই সত্য। তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের একটা রূপ আছে; তারাসমূহ সকল দিকে সমান সংখ্যায় দেখিতে পাই না। কিন্তু তা বলিয়া তাহারা যে সমান দূরে আছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। বস্তুত ছায়াপথের তারাসমূহের পরস্পর অন্তর সমান নহে। সেখানে বহু-বহু দূরে দূরে পৃষ্ঠাতে পৃষ্ঠাতে অনেক তারা আছে; উপরের দৃষ্টান্তের নদীর জায় দূরদৃষ্টি (perspective) হেতু তৎসমুদয় নিকটে নিকটে অবস্থিত মনে হয়।

স্বর্ঘ্য ছায়াপথের মধ্যস্থলে এবং তাহার তলে কি না, তাহা পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ। ছায়াপথ ঠিক চক্রাকার নহে; অতরাং

* সংস্কৃত 'পরিব' শব্দ দ্বারা Zodiacal Light চাই। নানা কারণ এই শব্দটি ভাল বোঝ হইয়াছে।

বুঝাইত কি না, সে তর্কে প্রয়োজন নাই। একটা শব্দ

উহার মধ্যস্থল কিংবা তল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। স্থূলত বলা যাইতে পারে, ছায়াপথের অধিকাংশ তিনশত আলোক-বর্ষ* পথ দূরে রহিয়াছে। দক্ষিণ আকাশের জঙ্ঘু- (বা কিয়র—Centaurus)-নক্ষত্রের ক-তারা চারি আলোকবর্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে আছে। সুতরাং আমরা ছায়াপথের মধ্যস্থলের নিকটে না থাকিয়া বরং জঙ্ঘুনক্ষত্রের নিকটে আছি।

তা ছাড়া, সূর্য্যও তাঁ স্থির নহে। উহা যে বেগে চলিতেছে, সেই বেগে চলিলে উহা পৃথিবীসহস্র বৎসরে জঙ্ঘুনক্ষত্রের ক-তারায় উপস্থিত হইতে পারে। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের তুলনায় এই কাল ক্ষণমাত্র বলিতে হইবে। যদি অতীতকালেও সূর্য্য এই বেগে চলিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য পঞ্চাশলক্ষ বৎসর পূর্বে ছায়াপথে ছিল, এবং ভবিষ্যতে ঐ বেগে চলিলে উহা ছায়াপথের অপর সীমায় গিয়া পড়িবে। ভূবিজ্ঞা ও জীববিজ্ঞা বিৎ পণ্ডিতগণের অনুমানে পাণ্ডুবৃষ্টির পক্ষে একশত লক্ষ বৎসর গণনার যোগ্য নহে। তবে, সূর্য্যকে ছায়াপথের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলা যাইতে পারে না। এইরূপ, অপর কোন তারাকেও বলিতে পারা যায় না।

* অপর তারা অপেক্ষা সূর্য্য-তারা গুরুও নহে। জঙ্ঘুনক্ষত্রে যুগ্মতারা আছে; তাহাদের জড়মান সূর্য্যের জড়মানের প্রায় দ্বিগুণ। লুকেসের জড়মান চারিটি সূর্য্যের তুল্য।

সূর্য্য তাদৃশ উজ্জ্বলও নহে। ১ম প্রভার তারাসকল যত দূরে আছে, তত দূরে

থাকিলে সূর্য্য ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ প্রভা তারার তুল্য ক্ষীণ দেখাইত। ৬ষ্ঠ প্রভার তারা আমাদের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অগস্ত্য-তারা (Canopus) হইতে সূর্য্য দেখাই যাইত না। অথচ অগস্ত্য ১ম প্রভার তারা। অভিজিৎ (Vega) সত্তরটি সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল, এবং অগস্ত্য দশসহস্র সূর্য্য অপেক্ষাও দীপ্তিশালী। এই সকল কারণে ক্লুমারিয়ের সাহেব বলেন যে, ডাঃ. বালেস লুকেস কিংবা ব্রহ্মহৃদয় (Capella) কিংবা জোষ্ঠা (Antares) নক্ষত্র লইয়া তাঁহার কল্পনা বিস্তার করিলে বরং তাহা একদিন শোভা পাইত, আমাদের পৃথিবীর ত্রায় ক্ষুদ্র পল্লীর পক্ষে কথটা আদৌ সাজে না। কোন সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে, আমাদের সূর্য্যও নহে; সুতরাং বালেসের কল্পনায় মোহিত হইবার কারণ নাই। সৌরজগতে রাজা সূর্য্য। কিন্তু তারাময় ব্রহ্মাণ্ডে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নাই; সকলেই রাজা, সকলেই প্রজা।

তারাসকল আকাশে স্থির নহে। তাহাদের স্ব স্ব গতি (proper motion) আছে। অনেকের স্বগতি পরিমিত হইয়াছে। লড্ কেল্ভিন্ তারাসকলের স্বগতি লইয়া গণনা দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমাদের তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্যের সংখ্যা একশত কোটির অধিক হইবে না। ইহাদের মাধ্যাকর্ষণশক্তি গড়ে আমাদের সূর্য্যের তুল্য হইলে, ইহাদের বেগ সেকেন্ডে বার মাইল হইতে ষাট-মাইল পর্য্যন্ত হইবে। কিন্তু এই

* আলোক যে পথ এক বর্ষে অতিক্রম করে। এক বর্ষে আলোক পৃথিবীকে সাতআটবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

সেকেন্ডে আলোক পৃথিবীকে সাতআটবার প্রদক্ষিণ

বেগ অধিক দৃষ্ট হইলে তারাসংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। অধিকন্তু তারাসংখ্যা শত-কোটি অঙ্গীকার করিলেও এমন বুঝায় না যে, কেবল এই শত-কোটিই আছে, এবং ইহাদের পরে দ্বিতীয় শত-কোটি, তৃতীয় শত-কোটি, চতুর্থ শত-কোটি, কিংবা আরও অধিক নাই। আকাশের বিস্তার যতই হউক, ছায়াপথ তাহার বিন্দুমাত্র। আমাদের দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে অল্প তারা আছে বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক হ্যাকোন্স এরূপ তারার সংবাদ শুনাইয়াছেন। তেমনই কয়েকটি গোলাকার তারাপুঞ্জও আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নহে বলিয়া বোধ হইয়াছে।

বালেসের জ্যোতিষিক আধার ভ্রমপূর্ণ। অতএব তাঁহার জীবসঞ্চারবিষয়ক অনুমান দৃঢ় নহে। ফ্ল্যামারিয়ের জ্যোতিষী বলেন, পৃথিবী প্রকৃতি হইতে কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে নাই; কোন যে বিশেষ কালে উপস্থিত হইয়াছে, এমনও নহে। সৌর-জগতের সকল গ্রহের অবস্থা এক নহে। চন্দ্র ভূতকালের গোরবের সাক্ষী; বৃহস্পতি ভবিষ্যৎকালের অপেক্ষা করিতেছে। আধুনিক জ্যোতিষ প্রাচীন জ্যোতিষের সঙ্গীর্ণতা

ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টি বহু-বহু দূরে লইয়া গিয়াছে। অথচ তাহা বাস্তবের ছায়ামাত্র। আমরা অনন্তে ডুবিয়া আছি; জীবন্যুষ্টি অনাদি ও সার্বজনিক; আমাদের পৃথিবী সংখ্যাভীত দিব্য দীপপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র দীপ। আকাশ (space) অনন্ত; উহার উচ্চতা নাই, গভীরতা নাই; বাম নাই, দক্ষিণ নাই। সেই-রূপ কালেরও আদি নাই, অন্ত নাই। অতএব আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পার্থিব জ্ঞান লইয়া প্রকৃতির শক্তির সীমানির্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধূটতা। আকাশে শিশুর দোলা আছে, বৃদ্ধের সমাধিস্থান আছে। গতকল্য চন্দ্র, আজ পৃথিবী, আগামী কল্য বৃহস্পতি, কালচক্রে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। রক্তবর্ণ তারাসকল অচিরে সমাধিস্থ হইবে; লুপ্ত ও অভিজিতের ছায়া তারাসকল ভবিষ্যতে জাগ্রত হইবে; প্রক্সা (Procyon), ব্রহ্মহৃদয় (Capella) ও স্বাতীর (Arcturus) ছায়া তারাসকল বর্তমানে যৌবন ভোগ করিতেছে। রোজিনী (Aldebaran) প্রায় গতাস্থ হইতে বসিয়াছে, সূর্য্য এখনও যৌবনে রহিয়াছে। আবার কোন কোন মৃত তারা ক্ষণকালের নিমিত্ত পুনর্জীবিতও হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সাহিত্য-সমালোচনা ।

ঘরে বসিয়া আনন্দে বৎসর জাসি এবং হৃৎখে যখন কাঁদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরো একটু বেশি করিয়া হাসা

দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা হৃৎখে দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন

মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অমুখ্যায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্ত্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে, তাহা নয়, পুত্রশোকের গোরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে হুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্ত যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোকপ্রমাণের জন্ত তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অজ্ঞান হইবে। শোকপ্রমাণ শোকপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূলা যে কেবল আমার কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মনোমাত্তিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাবসঙ্গেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আশ্বাসনিত ও আপিস-বাতায়নে প্রবৃত্ত থাকিবে, শোকাভূত মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই জগতের প্রাচুর্য্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গোরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে, যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড়চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত

করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উত্তম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়ভাবেরই এই দুইটা দিক্ই আছে, একটা নিজের জন্ত, একটা পরের জন্ত। আমার হৃদয়ভাবে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্বনা, একটা গোরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন, ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না।

কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হৃদে দেখি, আর দশজনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়! সেটা আমারই দুর্বলতা।

আমার হৃদয়বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অমুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অমুভব করিতেছি, তাহা যে আমার দুর্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার গার্গল্যমি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল, তাহা দশজনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা হুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশজনের কাছে সুখ বা হুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুঃস্থ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়,

যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অল্পভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখান আবশ্যক। সেটুকু বড়, সত্যের অল্পরোধেই করিতে হয়। নহিলে জিনিষটা যে পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যাক্ষপূর্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতার সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক, তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।

কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃতিকসত্যে এবং সাহিত্যসত্যে এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাদে, প্রাকৃতিক মা তেমন করিয়া কাদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যে মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত প্রাকৃতিক রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা শ্রুতারে-ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা

উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করেনা। দ্বিতীয়ত প্রাকৃতিক মা আপনীর শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারেনা, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিজ্ঞানই প্রকৃতির যথার্থ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্ৰত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এস্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ-ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিনয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃতিক অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে “অধিকতর সত্য” এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানুষের ভাবসম্বন্ধে প্রাকৃতিক সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের চেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঝড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে—তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাত্মনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া আশ্রয়ের দ্বারা অনেকটা ভর্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাশ্রয়ীও তাহার সমস্তটা লইয়া

আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্বতি নিপুণ সাহিত্যরচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটবড় সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্বতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই ত্বপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া, যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অন্নই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্ধামীও নই। তাঁহার অনেকখানিই যে আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অন্নই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, বোকানদার বলিয়া জানি—মানুষ বলিয়া

জানি না। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব, সেইটেকেই সর্বাপেক্ষা বড় করিয়া জানি—তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড় যাহা আছে, তাহা আমাদের কাছে কোন আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদের কাছে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানায়—অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়কে বড় করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আনুগাৎ জমাই করিয়া দাঁড় করায়! প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

জন্মের কার্য্যপ্রণালী প্রায় একইরকম। কেবল জন্মের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাৎ ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্ত—সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সকলের আনন্দের জন্ত। নিজের জন্ত একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে—সকলের জন্ত আগাগোড়া স্তম্ভ করিয়া তুলিতে হয়। এবং তাহাকে এমন জায়গায় এমন আলোকে এমন করিয়া ধরিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে—সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সংগ্রহ করে। মনের জিনিষকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে স্বজনশক্তির আবশ্যক হয়।

এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে বাহ্য প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অম্লকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনা, আমাদের স্মৃতি, শুদ্ধ বর্তমান কাল নহে, চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। স্মৃতি সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাপসামঞ্জস্য করিতে হয়! ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্ত গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সঙ্গীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্ব-মানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চির-কালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যিকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই 'প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিষ নির্বাচন করিয়া নিজের জন্ত গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি কথাটা বেশ আপ্সা হইয়া আসিয়াছে। আর একটু পরিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে ছুঁইটা অংশের প্রতি অম্লভব করিতে পারি।

একটা অংশ আমার নিজস্ব, আর একটা অংশ আমার মানবস্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজস্ব ও মানবস্ব সেইপ্রকার। যদি ছয়ের মধ্যে হৃৎকেন্দ্র দেয়াল তোলা থাকে, তবে আত্মা অক্ষুণ্ণের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যিকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজস্ব ও মানবস্বের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের শাশির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যিকারের সেই মানবস্বই স্বজনকর্তা। লেখকের নিজস্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পুঙ্খই বলিয়াছি, মনোরাঞ্জ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো—কিন্তু ভালোকে ভালো প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুকিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল, না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল ?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতবস্তুর স্বক্কে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা ভালো, তাহাই সত্য ভালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ স্বক্কে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভালো যে ভালোই এবং কত ভালো, তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে স্বক্কে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন হয়।

বিশেষ কঠিন এই জ্ঞান, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান কালের জ্ঞান নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জ্ঞান লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে ?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক, তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাঙ্কি-সংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্তনসত্ত্বেও যে সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়—ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মত উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্যন্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষমীমাংসা অতিদীর্ঘকাল-সাপেক্ষ—ততক্ষণ মোটামুটি বিচার একরকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে,—সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি সমালোচনার প্রতিভাও আছে। একএকজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সন্ধীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা জীব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ

করিয়া নিত্যহের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাত-সারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য ।

আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে । তাহাদের পুণিগত বিদ্ভা । তাহারা সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই । তাহারা অনেক সময়েই গাড়িছুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে । কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং

তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মন্তকাস্রাণ করেন । তাহারা কখন-কখন তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধুলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন । এই সমস্ত ধূলা-মাটি-সন্দেশ দেবী বাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দরওয়ান-গুলি তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া ? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মাহুষ চেনে না । তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই । সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার বাহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন ।

আবাহন ।

(১)

জাগিয়া উঠেছে এ প্রাণের মাঝে
শতক হুঃখের কাহিনী
ওনিতে সে কথা আসিবে কি নামি'
জননি হ্যালোকবাসিনি ?
অশ্রুসলিল ফুটিছে নয়নে
করিছে অঝোরে গোপনে
নিত্য এ মোর অশ্রুর মেলা
নিরখিবে কেগো নয়নে ?

(২)

কতই বেদনা উঠিছে নিত্য
রুদ্ধ হৃদয় ভেদিয়া

উদাস মুক্ত বায়ুর মাঝারে
 ঘুরিছে নিত্য ভ্রমিয়া।
 শীর্ণ পাণ্ডু— আপ্সুত আঁখি
 ধুলিতে রেখেছে আবরি’
 কে আর তাহাতে সিক্তিবে বারি
 সদয় হৃদয়ে আহরি’।

(৩)

অস্তিম কালে ভুলিয়া যাতনা
 আমারি দুঃখ ভেবেছ
 সজল নয়নে আশিসপুষ্প
 এ শিরে বরষি’ দিয়েছ।
 অপার-করণা— সাগররূপিণি!
 সাগর শুকাল কেমনে?
 তনয়ের তব পূজার অর্থ্য
 কেমনে দলিলে চরণে?

(৪)

যতই তোমার করুণার আঁখি
 নেহারি মানসনয়নে
 ততই কঠিন থল ছলভরা
 নিরখি নিখিল ভুবনে।
 তব স্মৃতি হ’তে যত দূরে আসি’
 কালের কঠিন তাড়নে
 তত দ্রুতর নেহারি জননি!
 ঘন সংসারগহনে।

(৫)

হবে না কি শেষ হবে না কি শেষ
 দুঃখ তামসী যামিনী
 শত-বৃশ্চিক— দংশনে নিতি
 জলিয়া মরিব জননি?
 স্বয়ংবাসিনি এ ধরা ত্যজেছ
 কাটিয়াছ মায়া-শিকলি,

তনয়ের তরে রাখিয়া গিয়াছ
বিষাদ-দৈন্ত কেবলি !

(৬)

যেখানে জাগে না তোমার হাত
সে গৃহ কেমনে গণিব ?
যেখানে রাজে না তোমার অভয়
ভবন কি তারে বলিব ?
সে যদি গো গেহ শান্ত-মধুর
অরণ্য পারে কহে গো ?
তোমারে হারিয়ে শ্মশানে রহিতে
হৃদয়ে কি সাধ রহে গো ?

(৭)

তরণ জীবনে সব সাধ মোর
মিটিয়াছে সব কামনা
গরলে দিগ্ধ মরণ আসিয়া
সহসা হরেছে চেতনা ।
জীবনপাত্র উঠেছে ভরিয়া
সুনীল তীর গরলে
ঘোর জ্বলাময় দীর্ঘ জীবন
বহিতে হইবে বিরলে ।

(৮)

এস নেমে এস শান্তিকুপিণি
জননি ! জ্বালার জগতে
বিতর শান্তি করুণার বারি
তাপভঃসহ মরতে ।
শান্ত প্রসর অঞ্চলে তব
আবৃত কর তনয়ে
দ্রঃসহ শোক দূর কর দ্বরা
উরি' এ মরতে অভয়ে !

(৯)

ভগ্নহৃদয় ভিক্ষু তনয়
পড়িয়া অকূল পাথারে

চিরবিশ্রাম লভেছ যথায়
তুলে লহ তথা তাহারে ।
অমিয় শিশির কোমল পরশে
মুছাও হৃদয়বেদনা
হর হঃসহ পাপতাপরাশি
হর হঃসহ যাতনা ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

মেঘচ্ছবি ।

আমাদের প্রান্তরে মেঘবৃষ্টির ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে ।

এই প্রান্তরই বটে শৃঙ্খলমুক্ত বর্ষাপ্রকৃতির সুযোগ্য ক্রীড়াস্থান । মুক্ত আকাশ এবং মুক্ত প্রান্তর যুগ্মযুগ্মী হইয়া চাহিয়া থাকে ; তরুলেশশূন্য চক্রবালে, যেখানে মৃত্তিকা অসীম আকাশসমুদ্রের প্রান্তে স্তম্ভিত হইয়া দেন থামিয়া দাঁড়াইয়াছে, দৃশ্যপটের সেই দূরান্ত সীমায়, - শূন্যতার অবাধ-বিস্তারে এক অগাধ এবং কঠোর ঔদাসীন্ধ্য ব্যঞ্জিত দেখিতে পাই;—আর একদিকে, যেখানে ধরণী-আকাশের সঙ্গমরেণায় এই সুদূর হইতে লক্ষ্যগোচর একসারি চিত্রবৎ স্পন্দহীন তালগাছ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ওই অগাধ শূন্যতাকে প্রতিহত করিতেছে, ওখানকার দৃশ্যটি কি সন্ধ্যায় ! ঐ দূরলক্ষ্য ক্ষীণ তালগাছ-ক'টি দেখিয়া আমার মনে কেমন-একটু অসহায়তার ভাবের সঙ্গে একটি করুণা আবিস্কৃত হয় । বিশ্ব-

গ্রাসী শূন্যতার মধ্যে ওই ঋজুক্ষীণ জীবনরেখা-কয়েকটি বাস্তবিকই বড় সন্ধ্যায় ।

কিন্তু চারিদিকেই, ঔদাসীন্ধ্য এবং কারুণ্যে সকলি ভরিয়া আজ ব্যাকুলতার নিবিড় সঞ্চার । ঐ যে তালীশ্রেণীর পশ্চাতে ঘন-নিবন্ধ মেঘস্তর বিলম্বিত হইয়া তালীবনশ্রীতে রুম্বকোমল সজলস্পর্শে গভীরতর কারুণ্য অর্পণ করিয়াছে । এবং পশ্চিম দিগন্তেও ঐ নির্লিপ্ত শূন্যতার অন্তর আজ বৃহৎ বাষ্পোচ্ছ্বাসতরঙ্গে গদগদ এবং ব্যাকুল ।

আমাদের ধরাতলের বাষ্পোচ্ছ্বাসে বৃষ্টি-আজ গগনের জ্যোতির্লোক অবরুদ্ধ ; দীর্ঘায়িত গুরুগুরু মেঘধ্বনিতে বৃষ্টি আজ পৃথিবীর মর্ম্মবেদনা আকাশপ্রাঙ্গণে শব্দায়মান । শূন্যতার উদাসীন ললাটে চিন্তাকালিমা, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্লোক নিরুদ্ধ, আকাশপ্রাঙ্গণে সিদ্ধ-নির্ঘোষ, ধরণীর বনে-প্রান্তরে নিবিড়তর মলিনিমা—আজ ধরণী-গগনের সহায়ত্বের

দিন, আজ অপেক্ষার দিন, আজ অশ্রুজলে মিলনের দিন, আজিকার দিনান্তের পরিবাস্ত অন্ধকারে ধরাভলে অভিসারের একরজনী আবির্ভূত হইবে।

কোথা হইতে কোথা চলিলাম? কিন্তু আজিকার দিনে সহজেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। দিন আজ রাত্রির মত প্রায়, সমস্ত সুখ আজ দুঃখের মত প্রায়। নীপসুন্দর-মিতা সুন্দরি—তোমার হাত আজ সিঁচু-তলের রত্নের মত অন্ধকার। স্মরণ-অ-বিলসিতা, তোমার উজ্জল চকুতারকা আজ ঘনঘোর আকাশের মত বাষ্পময় অন্ধকারে আবিষ্ট। কোথায় রাত্রি? কোথায় রাত্রি-মুখে সন্ধ্যা? আজ কিরূপে তাহাকে চিনিয়া লইব? তাহার নীলাকাশভরা কোমলতা নীলাভা হইতে নীলাভায় বিগলিত হইয়া আজ কখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে!—ঘনবিস্তৃত মেঘের রন্ধ্রে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইব কি? কিন্তু না,—আজিকার সন্ধ্যা অপূর্ণতর। একি অভিনব সন্ধ্যা। বিকচ-জ্বাপুষ্প-রাগরক্ত এই সায়াহ্নকাল। ক্ষণকালের জন্ত একটি রক্তমেঘ হইতে কোমলতর রক্তাভা নির্গত হইয়া এমনি তীব্র উজ্জলতা ধারণ করিল যে, মনে হইতেছে, যেন বিশ্বকর্মার অগ্নিকুণ্ডে দেবসেনাপতির বহ্নিদগ্ধ কঠিন লৌহবর্শ নির্মাণ হইতেছে। রক্তাভার নিম্নদেশে পৃথিবীও একটি বনচ্ছবি মিলাইয়া দিল, বৃষ্টিধোত মেঘচ্ছায়াচকিত নিবাত-নিষ্কম্প বনচ্ছবি এমনি প্রগাঢ় সবুজ যে, ঐ ছবিটিকেও যেন কাঠিকের

একটি কঠিন তাম্র-ঢালের উপরে উৎকীর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। মেঘে এবং বনে মিলিয়া একখানি রক্ত-পীত-নীল-হরিত-তরঙ্গান্বিত প্রগাঢ়বর্ণ তাম্রপত্র খচিত বৃহৎ ছবি।

এই চিত্রখানির, এই প্রতিমাখানির বেদিকা—এই অপার মুক্তপ্রান্তর,—এই ছায়া-মলিন সিক্ত-সুগন্ধি ভূগন্ধেত্র। ধীরে ধীরে সিক্ত মাঠের প্রতি অণুটিতে সন্ধ্যারাগ প্রবেশ করিয়াছে। কোথাও কালো ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেতের স্থানে স্থানে বর্ষার জল-রাশি সঞ্চিত হইয়া আছে—ঐখানেই আকাশের বর্ণে ভূবেদিকা অতিশয় সুরঞ্জিত। ঐ যে বাধের বর্ষাকীত তীরতরুশ্রেণীতে জলরাশি দেখিতে দেখিতে সমস্ত অবরবে সিন্দূর হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা জলকান্তি জ্বরস-কষায়িতবৎ ঈষৎ বেগুনী। ধরণী-গগনের সহায়ত্বের মধ্য, পরস্পরের সিন্দূরী অঙ্ক-রঞ্জনের মধ্য বসিয়া মনে হইতেছে, যেন আমার চারিদিকে নানাবর্ণদস্তর একটি বিরাট দাড়িমফল ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চারিদিকেই এই স্বচ্ছতা, সরসতা এবং বর্ণ-বিলাস। আজ আমার স্তম্ভিত চোখিত হৃদয়। তাহা না হইলে চিত্রপটে এই মেঘচ্ছবি বিধিত হইয়া, শত উপমায় জীবন্ত হইয়া—এক অলকাপুরী নির্মাণ করিয়া ফেলিত। তাহা হইল না,—সন্ধ্যার ছায়ার আমার অদৃষ্ট বীণা পদতলে ফেলিয়া দিয়া নিস্তক হইয়া বসিয়া আছি। সিন্দূরলেখা ক্রমে দ্রাবিষ্য বিলীন হইয়া যাইতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

অতিপ্রাকৃত ।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিব কি না, একালের একটা প্রধান সমস্যা। সেকালের লোক নির্দিষ্টবাদে বিশ্বাস করিত। একালেরও এত লোকে বিশ্বাস করে যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও অবিশ্বাসটাই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অস্বাভাবিক হইলেও একালের বৈজ্ঞানিকেরা অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাস করেন। আর যাহারা আপনাদের অবৈজ্ঞানিকতা-স্বীকারে কুণ্ঠিত, তাহারাও একালের বিজ্ঞানের খাতিরে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন। কিন্তু যখন শোনা যায়, বৃহৎকলন বড় বড় বৈজ্ঞানিক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, তখন বড়ই ষট্কা পাড়ায়। পিয়-সফিষ্টদের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলেই তাহারা উন্নাসের সহিত ওয়ালাশ, ক্রুকস ও লজের নাম করিয়া ফেলেন। তখন তাহাদের দশন-প্রভায় আঁধার ঘর আলো হইয়া পড়ে। আমাদের মত অপণ্ডিত লোক, যাহারা উক্ত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যমহিমায় মুগ্ধ আছেন, তাহারা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন।

অগত্যা তখন বলা যায়, বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজশাসন নাই। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিতে আমরা বাধ্য নহি। তিনি যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, তখন তাহার কথা

তনিব। নাম দেখিয়া ভয় বৈজ্ঞানিকের রীতি নহে।

যলা বাছিয়া, এইরূপ উত্তর দেওয়া যায় বটে, কিন্তু মনের ভিতর গোল থাকিয়া যায়। কথাটা যদি নিতান্তই অমূলক হইবে, তবে ওয়ালাশ-সাহেব মানেন কেন? আর কেহ নহে,—যে-সে নহে,—ওয়ালাশ কেন মানেন?

বড় কঠিন সমস্যা। হিউম নাকি বলিয়া গিয়াছেন অতিপ্রাকৃত,—যাহার ইংরাজি নাম মিরাকুল,—তাহা ঘটতে পারে না। টিণ্ডাল নাকি বলিয়াছেন, জগতে মিরাকুলের স্থান নাই। এখন কোন্ পথে যাই?

থিয়সফিষ্ট বজ্জগকে খুসী করিতে পারিব না জানি, তথাপি একবার বিচারসমুদ্রে অব-গাহন করা যাক।

ইংরাজি মিরাকুল শব্দের অর্থ কি 'ঠিক জানি না'; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ জানি। প্রাকৃত অর্থে যাহা প্রকৃতির অঙ্গ, যাহা প্রকৃতিতে ঘটে; অতিপ্রাকৃত অর্থে, প্রকৃতিকে যাহা অতিক্রম করে, যাহা প্রকৃতির বাহির।

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই প্রকৃতির অঙ্গীভূত—তা সে যতই অদ্ভুত হউক না কেন। অদ্ভুত হইলেও তাহা যখন ঘটিতেছে, তখন তাহা প্রাকৃত, তাহা অতিপ্রাকৃত নহে।

বাইবেলে গম আছে, জোওয়ার আদেশে সূর্য আকাশে স্থির হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট

স্বভূতর পর অনেককে দেখা দিয়াছিলেন।
ঐ ঐ গল্প হয় সত্য, নয় মিথ্যা। হয় উহা
ঘটিয়াছিল, নয় ঘটে নাই। যদি ঘটিয়া
থাকে—তবে উহা প্রাকৃত—অতিপ্রাকৃত
নহে—অত্যদ্ভুত হইলেও অতিপ্রাকৃত নহে।
যদি না ঘটিয়া থাকে ত কথাই নাই।

যাহা ঘটে, তাহাই যখন প্রাকৃত, তখন
অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য প্রণাপবাক্য।
উহা বক্যাপ্তের জায় নিরর্থক শব্দ। কাজেই
অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করায় প্রয়োজন নাই।

এইরূপে ভাষাগত বা ব্যাকরণগত তর্ক
তুলিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করা চলে। কিন্তু
তাহাতে আসল কথাই মীমাংসা হয় না।
আসল কথা এই, জ্ঞানোন্নতির আদেশে স্বর্ঘ্যের
গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? ঐ ব্যাপার
ঘটিয়াছিল কি না? যীশুখৃষ্টের প্রেতমূর্ত্তি
লোকে দেখিয়াছিল কি না? ভূত মানিব
কি না?

কেহ কেহ বলিবেন, না, মানিব না!
ঐ সকল ব্যাপার অসম্ভব; উহা প্রকৃতির
নিয়মবিরুদ্ধ। যাহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ,
তাহা ঘটিতে পারে না। টিওল হয় ত ঐরূপ
বলিতেন।

ভাল; কিন্তু উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ,
তাহা জানিলে কিরূপে? প্রকৃতির নিয়ম কি?

হয় ত বলিবে, ঐ ব্যাপার অতি অদ্ভুত,
অতি নূতন; বাইবেলের গল্পে ছাড়া এরূপ
ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, শোনে নাই।
উহা অতি অদ্ভুত, অতি অসাধারণ, অতি
নূতন—কাজেই উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।

এরূপ বলিতে পার না। এই কয়েক-
ষৎসহস্রমধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র কত অদ্ভুত নূতন

কাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছে। বায়ুমধ্যে
আর্গন, ক্রিপটন প্রভৃতি কত-কি অদ্ভুত
নূতন পদার্থ বাহির হইল; কত-কি-রকম
অদ্ভুত আলো বাহির হইল, তাহা কাঠ-
পাথর মানে না, তাহার ভিতর দিয়া অনা-
য়াসে চলিয়া যায়;—এই সকল অত্যদ্ভুত,
অতি নূতন, স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারে বিশ্বাস
কর, আর বাইবেলের গল্পে বিশ্বাস করিবে না?
ইহার উত্তর নাই। নূতন বলিয়া,
অদ্ভুত বলিয়া, অদৃষ্টপূর্ণ বলিয়া, অবিশ্বাস
করিবার জো নাই। অজ্ঞাতপূর্ণ হইলেই বা
অদ্ভুত হইলেই প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ হয় না।

তার চেয়েও স্বল্প তর্ক আছে। প্রকৃতির
নিয়ম কি? প্রকৃতিতে যা ঘটে, তাহা লইয়াই
ত প্রকৃতির নিয়ম। যাহা ঘটে, তাহা নিয়ম-
বিরুদ্ধ হইতেই পারে না। আমি বলিতেছি
স্বর্ঘ্যের গতিরোধ যখন ঘটিয়াছিল, তখন
উহা নিয়মসঙ্গত। তুমি যদি বল, উহা
নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা হইলে যাহা বিচারের
বিষয়, যাহা বিরোধস্থল, যাহাকে অসম্ভব
প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগেই
অসম্ভব ধরিয়া লইতেছ। এ কিরূপ যুক্তি?
জ্ঞানশাস্ত্রে এরূপ যুক্তি টিকে না। তুমি হয় ত
বলিবে, চিরকাল ধরিয়া মানুষে যখন স্বর্ঘ্যকে
গতিশীল দেখিয়া আসিতেছে, তখন স্বর্ঘ্যের
অবিরাম গমনই নিয়ম; এত সহস্র বৎসর-
মধ্যে কেবল একবারমাত্র গতির রোধ নিয়ম-
বিরুদ্ধ।

বিখ্যাত ব্যাবেজ-সাহেব ইহার উত্তর
দিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ আঁক-কথা
বস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। নির্দিষ্ট নিয়মবলে
সেই বস্ত্র আঁক কবিয়া উত্তর বাহির করিয়া

দিতে পারে। একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, দুই, তিন, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পর পর সংখ্যা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। তুমি এগার হাজার সাত শ তেইশের অপেক্ষার বসিয়া আছ, এমন সময়ে অকস্মাৎ বাহির হইল তেত্রিশ হাজার পাঁচ। তার পর আবার নিয়মমত যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যন্ত্রের মিরাকুল বটে, তবে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যন্ত্র একরূপ কৌশলে নির্মিত যে, ঐ সময়ে এই সংখ্যা বাহির না হইয়া ঐ সংখ্যাই বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির নির্মাতা অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারেন। যে জানে না, সে যন্ত্র বিকল হইয়াছে, মনে করিতে পারে।

এইরূপ জগদ্ব্যবসায়কেও বলা যাইতে পারে। সূর্য্য দিনের পর দিন যথানিয়মে উঠিতেছেন ও আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন অকস্মাৎ যদি থামিয়া যান, তাহা হইলে জগদ্ব্যবসায় বিকল হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। যিনি যন্ত্রের নির্মাতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্য চলিতে চলিতে সহসা একএকবার থামিবেন, যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরূপই আছে।

বস্তুত ব্যাবেজ-সাহেবের আপত্তির উত্তর নাই। মহুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, ঐটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যাতিচার নাই বা হইতে পারে না, একরূপ নির্দেশ অন্তায়, অসঙ্গত, অসমীচীন, অবৈজ্ঞানিক। একরূপ হুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমানকে সাজে না।

মাধ্যাকর্ষণ, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা প্রভৃতি কয়েকটি ঘোরতর প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন পূর্বে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বড়ই বাবদুকতা প্রদর্শন করিতেন। আজিকালি অনেকে সাবধান হইয়া কথা কহেন। যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার সীমা ছাড়াইয়া কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। যে কালটুকু ও যে দেশটুকু ব্যাপিয়া আমরা ঐ সকল নিয়মের অস্তিত্ব দেখি, উহারা ততটুকুর মধ্যেই ঠিক। তাহার বেশী আমরা বলিতে পারিব না। ঐ সকল নিয়মের ব্যাতিচার অকল্পনীয় নহে, অসম্ভবও নহে। হয় ত কিছুদিন পরে শুনিতে পাইব, অমুক নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে জড়ের নূতন সৃষ্টি ঘটিতেছে, শক্তির ধ্বংস ঘটিতেছে; তাহাতে বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু যদি ঘটে, তাহার অপলাপ করিতে পারিব না। প্রকৃতিতে যাহা ঘটিবে, তাহাকেই প্রাকৃত ও প্রাকৃতিক-নিয়ম-সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চলিবে না। শক্তিকে অনশ্বর জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম ও কত বক্তৃতা করিয়াছি; 'এখন উহাকে স্থলবিশেষে নশ্বর দেখিলে হুঃখিত হইব, কিন্তু হুঃখই সার হইবে। যাহা যেখানে নশ্বর, তাহা আমার খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে না।

তাই যদি ব্যাবেজের কলের মত সূর্য্য লাথ-বৎসর অন্তর একবার করিয়া কাহারও আদেশমত থামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। অসম্ভব বলিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে উড়াইতে পারিব না।

কোন নূতন ধরণের সামুদ্রিক জীব যদি মাঝে মাঝে জাহাজের নিকট ভাসিয়া উঠে, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হয় কি? তবে মাঝে মাঝে যদি কোন নূতন ধরণের জীব তাহার ইথরীয় ছায়াময় শরীর লইয়া আসিয়া দেখা দেয় বা ভয় দেখায় বা নাকি-স্নরে কথা কয়, তাহাতেই বা প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায়?

কখনই না। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে, অতএব অসম্ভব, - এটা কোন কাজের কথাই নহে। প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহাই যখন পূরা সাহসে বলিতে পারি না, তখন ঐ উক্তি হঠাৎকিমাাত্র। প্রকৃতির এক দেশের সহিত আমার পরিচয়, লেনাদেনা, কারবার রহিয়াছে; কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা অকস্মাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিবার কাহারও অধিকার নাই। তবে কি আজ হইতে ভূত মানিব? বাইবেলের যত অদ্ভুত গল্পে বিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তর হক্সলি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। জগতে একবারে অসম্ভব কিছুই নাই, স্বর্ঘ্যের গতিরোধ হইতে ভূতের উৎপাত পর্যন্ত কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। তেমনি গুলিখোরের সভায় যত গল্পের সৃষ্টি হয়, তাহারও কোনটাও হয় ত অসম্ভব নহে। তথাপি এই ক্ষেত্রে আমরা ঐ সকল গল্পে বিশ্বাস করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। ঘটনা সম্ভব হইলেই সত্য হয় না। সত্যতার প্রমাণ আবশ্যক হয়। বাইবেলের গল্পের যদি যথোচিত প্রমাণ থাকে, তাহার যথার্থ্যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রমাণ কিন্তু যথোচিত হওয়া আবশ্যক; ঐ যথোচিত কথাটাতেই যত গোল। সর্বসাধারণে যে প্রমাণে সন্তুষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও মতভেদ ঘটে। কতটুকু প্রমাণ হইলে সত্যতার বিশ্বাস করা বাইবে, এ বিষয়ে শ্রায়শাস্ত্র নীরব। ইঞ্জিরকে বিশ্বাস করিবার জো নাই; চোখে ভুল দেখে, কান ভুল শোনে, বুদ্ধি বিকৃত হয়।

সর্বাপেক্ষা মনুষ্যচরিত্র দুর্বোধ্য। কাহার মনে কি আছে, বলা অসাধ্য। নিজের উপরেই যখন সর্বদা বিশ্বাস চলে না। সাক্ষীর কথা—তিনি যত-বড় সাক্ষীই হউন, সাক্ষীর কথায় নির্ভর করিয়া অনেক সময়ে ঠকিতে হয়।

মোটের উপর কথা এই, কতটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যক্তিভেদে আদর্শভেদ রহিয়াছে। সকলের আদর্শ সমান নহে; সমান হইবারও উপায় নাই। কাজেই যে কথায় ভূমি অবলীলাক্রমে বিশ্বাস কর, আমি তাহাতে আদৌ আগ্রহ করি না। পরস্পর গালিগালাজ করিয়া শাস্তিভঙ্গ করি। ফল কিছু হয় না।

বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে ওপক্ষের একটা অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ আমরা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু তোমরা ধীরভাবে প্রমাণ গ্রহণ করিতেই অসম্মত; তোমরা গোড়াতেই আমাদেরকে মিথ্যাবাদী, প্রতারণক বা অন্ধ-প্রতারণিত বলিয়া এবং জানিয়া রাখিয়াছ। আমাদের প্রমাণ না দেখিয়াই, না জানিয়াই, তোমরা স্নায় বাহাল রাখিতেছ, এটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক প্রথা।

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাক্ষ্য এই যে, আমরা বারবার প্রমাণ শুনিয়া ও সাক্ষ্য শুনিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আর ও মিছা অভিনয় ভাল লাগে না । জীবন চিরস্থায়ী নহে, আমাদের অনেক কাজ আছে ; আর পুনঃপুন সময় নষ্ট করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত নহি ।

সাক্ষ্যই নিতান্ত কেলিবার নহে । এত-বার বৈজ্ঞানিকদিগকে ঠকিতে হইয়াছে যে, তাঁহারা পুনরায় ঠকিতে কুণ্ঠিত হইলে তাঁহা-দিগকে দোষ দেওয়া উচিত হয় না । তবে তাঁহারা প্রতিপক্ষকে একবারে না চটাইয়া এইরূপ জবাব দিলেই বোধ করি সঙ্গত হয় । বন্ধু, মনুষ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, জীবনও অচির-স্থায়ী ; একজনেই যে জগতের যত সত্য বাহির করিবে, এরূপ আশা করা যায় না । আমার কাজ আমি করিতেছি ; তোমার কাজ তুমি কর । আমরা উভয়েই প্রকৃতির সাম্রাজ্যে সত্যাস্থসন্ধান নিযুক্ত আছি । যে যাহা আপন চেষ্টায় পারে, সে তাহা করুক । তুমি যে সকল অজ্ঞাতপূৰ্ব্ব অদৃষ্টের অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য হইতে পারে । তোমাকে আমি মিথ্যা-বাদী বলিতেছি না ; তবে বলি, তোমার সং-গৃহীত প্রমাণ জনসমাজে উপস্থিত কর, আরও নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাক, যদি তোমার আবিষ্কৃত সংবাদ সত্য হয়, একদিন না এক-দিন তাহা গৃহীত হইবেই । সত্যমেব জয়তে—সত্যের জয় হইবেই । তবে ভিক্ষা এই, নিতান্ত অধীর হইও না—সত্যের জয় হয় বটে, কিন্তু যত শীঘ্র হওয়া উচিত, তাহা হয় না—কি করিবে, সংসারের বন্দোবস্তটাই এইরূপ । আর ভিক্ষা—আমি আমার কাজে নিতান্ত ব্যাপ্ত

থাকার নিতান্ত অবকাশের অভাবে যদি তোমার আবিষ্কৃত নূতন তথ্য মনোযোগ দিবার অবকাশ না পাই, আমাকে গালি দিও না ।

আসল কথাটা এই, জগতে সময়ে সময়ে এমন একএকটা ঘটনা ঘটে, তাহা আমাদের পরিচিত জগৎ-প্রণালীর সঙ্গে সমঞ্জস হয় না ; উহার সহিত ঠিক খাপ খায় না । যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ খাপছাড়া ঘটনার সাক্ষাৎলাভ সদাসন্দর্ভাই ঘটিয়া থাকে । বৈজ্ঞানিকেরা দিনদিন যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন, তাহার অধি-কাংশই বোধ করি খাপছাড়া । রস্তুগনের ও অস্ত্রাশ্র পণ্ডিতের আবিষ্কৃত নূতন রশ্মিগুলি এইরূপ খাপছাড়া ; আমাদের চিরপরিচিত আলোকরশ্মির সহিত উহাদের মিল নাই ; উহারা কি, আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না । সেইরূপ আর্গন ক্রিপটনাদি বায়ুগুলিও কতকটা খাপছাড়া ; আমাদের চিরপরিচিত জড়পদার্থসম্ভার মধ্যে উহারা কোথায় স্থান পাইবে, তজ্জন্ত রাসায়নিক পণ্ডিতেরা আকুল হইয়া আছেন । এইরূপ খাপ-ছাড়া ব্যাপার নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতে-ছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকের এতটা বাহাহুরি ; অথচ যাহা দেখিতে পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিতে পান ; ইহাতেই উঁহার এত দর্প । অথচ সেই বৈজ্ঞানিকেরাই অবৈজ্ঞা-নিকদের আবিষ্কৃত একটা নূতন তথ্যের সংবাদ পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহসা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের হেতু হয় । আপাতত ইহা একটা সমস্যা ঠেকে । কিন্তু একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা

বুঝা যায়। খাপছাড়া নূতন তথ্য লইয়া বৈজ্ঞানিকের কারবার বটে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি খাপছাড়াকে খাপে পুরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমঞ্জসকে সমঞ্জস করিতে না পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নূতন সত্যকে পুরাণ পূর্ব-পরিচিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া, সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া, তাহার কোঠায় না ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। চেষ্টার বলে ও বুদ্ধিবলে তিনি কালে সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, তখন তাহা আর অসমঞ্জস খাপছাড়া থাকে না। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাসই তাহাই, বাহা এককালে খাপছাড়া ঠেকিত, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে। বাহা ধুমকেতুর মত অকস্মাৎ প্রত্যক্ষগোচর হইয়া বিভীষিকা দেখাইত, তাহা সৌর-জগতের পরিচিত প্রণালীবদ্ধ জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। এইরূপে অসম্বন্ধ অসমঞ্জস জগতে সামঞ্জস্য ও সম্বন্ধের পুনঃপুন আবিষ্কারে সমর্থ হইয়া বৈজ্ঞানিকের সেই সামঞ্জস্যের প্রতি একটা মজ্জাগত প্রীতি জন্মিয়া যায়। তখন যদি সহসা কেহ একটা নূতন সংবাদ আনিয়া দেয়, যে সংবাদ তাঁহার পরিচিত জগৎপ্রণালীর সঙ্গে মিলে না বা তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চাহে, তখন তাঁহার মনে একটা ব্যাকুলতা আসে। তিনি ও তাঁহার পূর্ববর্তীগণ উৎকট পরিশ্রমে যে সৌধখানি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় তাহা ভাঙিয়া যাইবে, সেই ভয়ে কতকটা ব্যাকুল হন। সেই সৌধের কোন প্রকোষ্ঠমধ্যে এই নূতন জিনিষটাকে স্থান দিতে না পারায় তাঁহার সামঞ্জস্য-বুদ্ধিতে, তাঁহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। এই নূতন জিনিষটাকে কতকটা সংশয়ের,

কতকটা ভয়ের চোখে দেখেন, এবং যদি কোন-রূপে উহার অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে যেন হাঁফ ছাড়িবার অবসর পান। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে মার্জনা করা যাইতে পারে।

বস্তুত এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জ্ঞাতিগত ভেদ আছে, তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মানুষ বস্তুতই এক-শ্রেণীর লোক। জগদ্ব্যস্ত যদি একেবারে এলোমেলো, শৃঙ্খলারহিত, একটা গুণ্ডগোল-মাত্র হইত, তাহা হইলে সাধারণ মানুষেরও জীবনযাত্রা স্কন্ধ হইত না। জগদ্ব্যস্তে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ভাত খাইলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়; হঠাৎ যদি এই নিয়মটা বদলাইয়া যায়, এবং যত খাবে, তত ক্ষুধা বাড়িবে, এইরূপই যদি বন্দোবস্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মহামোর বৃদ্ধি হৃৎকিনিবারণের উপায়-নির্ধারণে একবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতি-প্রাকৃতের প্রতি বা মিরাকলের প্রতি যাহার যত ভক্তি থাকে, জগদ্ব্যস্তে যদি কোনরূপ শৃঙ্খলা না থাকিত, তাহা হইলে কাহাকেও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে হইত না। কাজেই কতকটা সামঞ্জস্য ও কতকটা শৃঙ্খলা মহামাত্যের পক্ষেই প্রীতিকর না হইলে চলে না। সামঞ্জস্যের প্রতি, শৃঙ্খলার প্রতি মহামাত্যেরই কতকটা আনন্দরিক অমুরাগ রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ পশুর উপরে; রহিয়াছে বলিয়াই সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষের উপরে। মহামাত্যেই ন্যূনাধিক মাত্রায় বৈজ্ঞানিক। ..

ন্যূনাধিক মাত্রায় কেন? না, সামঞ্জস্য প্রীতি সকলের পক্ষে সমান নহে,

সকলের জগৎ ঠিক সমানমাত্রায় সমজস নহে। ব্যবহারিক হিসাব ছাড়িয়া একটু পরমার্থের হিসাবে দেখিলে বুঝিতে হয়, আমরা আপন আপন জগৎ আপনার আপনার মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষ জগৎকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। বস্তুতই বলা চলে না। এই প্রত্যয়গুলি মানসিক পদার্থ; প্রত্যেক ব্যক্তি উহাদিগকে নানাভাবে সাজাইয়া আপন আপন জগৎ নির্মাণ করিয়া লয়। সকলের প্রত্যয় ঠিক সমান নহে, সেইজন্য সকলের জগৎ ঠিক এক নহে; প্রায় এক; কিন্তু ঠিক এক নহে।

দর্শনশাস্ত্র হইতে জাগরণ, স্বপ্ন ও স্মৃতি এই তিনটা শব্দ গ্রহণ করিলে বুঝিবার কতকটা সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনার তিন অবস্থা,—জাগরণের, স্বপ্নের ও স্মৃতির অবস্থা। জাগরণের অবস্থায় জগৎ সৃষ্টিশীল, সৃষ্টিশীল, সমজস; স্বপ্নাবস্থায় জগৎ সৃষ্টিশীল, অসমজস, এলোমেলো—তবে যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা থাকে, ততক্ষণ উহা সৃষ্টিশীল বলিয়াই বোধ হয়। আর স্মৃতির অবস্থায় জগৎ প্রায় নাস্তিহীন লীন হইয়া যায়। অবস্থা এই তিনটা, কিন্তু চেতনা যুগপৎ এই তিন অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। চেতনা পূর্ণ জাগ্রত, বা পূর্ণ স্বপ্নাবস্থ, বা পূর্ণ স্মৃতি কখনও থাকে, তাহা বোধ হয় না। জাগরণে, স্বপ্নে ও স্মৃতিতে মিলাইয়া-মিশাইয়া চেতনার প্রকাশ। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার কিয়দংশ স্বপ্ন দেখে ও কিয়দংশ স্বপ্নহীন ঘুমে থাকে। আজকাল subliminal self বা subliminal consciousness নামে

একটা কথা শুনা যায়। প্রেতভাষিকেরা ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার করেন, এবং উহার দ্বারা নানাবিধ মানসিক বিকারাবস্থার ব্যাখ্যা করেন। ঐ শব্দের অর্থ এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। মানুষের চেতনার একটা প্রকোষ্ঠমাত্র পূর্ণ-চেতন বা পূর্ণ-জাগ্রত; যাহা সেই প্রকোষ্ঠের অন্তর্কর্ষিত, তাহাই আমাদের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রত্যয়গুলি যাতায়াত করিতেছে; যতক্ষণ উহা সেই দ্বারের বাহিরে থাকে, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ হয় না, ততক্ষণ উহা subliminal, ততক্ষণ উহা জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেই subliminal অবস্থাকে আমরা সুপ্ত অবস্থা, এবং যাহা প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়াছে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, যাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, মায়ার্স-সাহেব যাহাকে supraliminal বলেন, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে পারি। সুপ্ত অবস্থায় যে সকল প্রত্যয় জাগ্রত চেতনার প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারে, কখন কণেকের মত দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার তখনই পলাইয়া যায়, তাহাদিগকে স্বপ্নাবস্থ মনে করিতে পারি। মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় বা মস্তমুগ্ধ অবস্থায় (ইংরাজিতে যাহাকে হিপনটিক্ অবস্থা বলে, তাহাতে), বা ওষধিমুগ্ধ অবস্থায় (অর্থাৎ নেশার অবস্থায়) এই আকস্মিক, আগন্তুক, অপরিচিত বা অল্পপরিচিত প্রত্যয়গুলি আসিয়া উঁকি মারে। তখন উহাদিগকে আমরা বেধি; কিন্তু জাগ্রদবস্থার পরিচিত পূর্ণপ্রকাশ প্রত্যয়গুলির সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। প্রেতভাষিকের ভাষায় আমাদের পূর্ণ জাগ্রদবস্থাতেও এই sublimi-

nal—প্রকোষ্ঠের বহিঃ—চেতনা কাজ করে ও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আমরা তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হই বা স্তম্ভিত হই ও তাহাদের সহিত পুরা সাহসে কারবার চালাইতে, তাহাদিগকে জীবনের কাজে লাগাইতে সাহস করি না। তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা ঠিক বুঝি না; কাজেই আশঙ্কা ও আতঙ্কের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করি বা প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্বৃত্ত হই।

ব্যাখ্যার ভাষাটা যাহাই হউক, কথাটা কিন্তু ঠিক। আমাদের চেতনায় সর্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও স্রষ্টৃপ্তি মিলিয়া অবস্থান করিতেছে। তিনের তারতম্যানুসারে চেতনার অবস্থানভেদ ঘটে। আমরা যাহাকে পূর্ণ-জাগরণ বলি, তাহা পূর্ণ-জাগরণ নহে—তাহাতে স্বপ্নের অভাব নাই; এবং তখন চৈতন্তের কিয়দংশ যে নিদ্রিত নহে, তাহাও বলা যায় না। যাহা জাগরণে দেখি, তাহা স্রষ্টৃশ্রল, যথাবিস্তৃত; যাহা স্বপ্নে দেখি, তাহা স্রষ্টৃশ্রল-হীন, বিপর্যস্ত; তাহা জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট পরিচিত প্রণালীর সহিত অসম্বন্ধ। কিন্তু যাহা এইরূপ অসম্বন্ধ ও অসংযত, তাহাকে সংযমের স্রষ্টৃশ্রল আবদ্ধ করাই চেতনার কাজ। অন্তত তাহাতেই চেতনার অভিব্যক্তি। ইহা প্রেততাত্ত্বিকেরাও অস্বীকার করিবেন না। করিলে তাঁহারা দেহযুক্ত প্রেতপুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠ কারবারের জন্ত এত উৎসুক হইতেন না। তাহাদের সহিত কথাবার্তা, চিঠিচালাচালির জন্ত এত ব্যগ্র হইতেন না। তাহাদের ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্ত এত ব্যাকুল হইতেন না। এইরূপ স্বপ্নকে জাগরণে লইয়া আসিবার

জন্তই চেতনা ব্যাকুল। স্বপ্নের জাগরণে পরিণতিতেই চেতনার ক্ষুধা ও সার্থকতা।

এখন উঠে, কেন এমন হয়? জাগরণের অবস্থাতেই প্রত্যয়গুলি কেন সংযত, স্রষ্টৃশ্রল, ও স্বপ্নাবস্থাতেই বা কেন অসংযত? ব্যাবহারিক হিসাবে ইহার উত্তর এই যে, জগৎপ্রণালীর অন্তত খানিকটা সংযত, নিয়মবদ্ধ, সমস্তস না হইলে মানুষ ধরাধামে টিকিত না। নিম্ন-পর্যায়ের জীবে মানুষের মত জগৎকে অনিয়ত দেখে না, তাহা ঠিক। মানুষ দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চপর্যায়ের জীব; মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত স্রষ্টৃশ্রল, যত অনিয়ত দেখে, সে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মানুষের ইতিহাস তাহার সাক্ষী; বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। স্বপ্ন জীবনসংগ্রামে অসফল নহে; তাহার সাক্ষী পাগল। সে কেবল স্বপ্ন দেখে—তাহার জগতে স্রষ্টৃশ্রল নাই—সে জীবনসময়ে অশক্ত। সেইজন্য বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক মানুষ আপনার জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্ত আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মিত, সংযত, স্রষ্টৃশ্রল বদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; আপনার গঠিত জগতে, আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জাগ্রত; নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জীবনসংগ্রামে সমর্থ।

অনিয়মের প্রতি, বিশৃঙ্খলার প্রতি বৈজ্ঞানিকের বিবৃষ্টির মূল এইখানে। অতি প্রাকৃত লইয়া কোলাহলের মূলও এইখানে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

১৯

পরদিন সকালের গাড়িতে যোগেন্দ্র পশ্চিম চট্টতে ফিরিয়া আসিল। আজ শনিবার, কাল রবিবারে হেমনলিনীর বিবাহের কথা। কিন্তু যোগেন্দ্র তাহাদের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া উৎসবের স্বাগতক কিছুই পাইল না। যোগেন্দ্র মনে করিয়া আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহাদের বাসার বারান্দার উপর দেবদারু-পাতার মালা ঝোলানো শুরু হইয়াছে—কাছে আসিয়া দেখিল, শ্রীহীন মালিন্যে পাশের বাড়ীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর কোন প্রভেদ নাই।

ভয় হইল, পাছে কাহারো অসুখ-বিসুখ করিয়া থাকে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চায়ের টেবিলে তাহার জন্ত আহাতিদি প্রস্তুত রহিয়াছে এবং ‘অন্নদাবাবু’ অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

যোগেন্দ্র ধরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, “হেম কেমন আছে?”

অন্নদাবাবু। ভাল।

যোগেন্দ্র। বিবাহের কি হইল?

অন্নদাবাবু। কাল রবিবারের পরের রবিবারে হইবে।

যোগেন্দ্র। কেন?

অন্নদাবাবু। কেন, তাহা তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর। রমেশ আমাদের কেবল এইটুকু জানাইয়াছে যে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে,—এ রবিবারে বিবাহ বন্ধ রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র তাহার অক্ষম বাপের উপরে মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল—“বাবা, আমি না থাকিলে তোনাদের নানান গল্দ্ঘটে। রমেশের আবার প্রয়োজন কিসের? সে স্বাধীন। তাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই বলিলেই হয়। যদি তাহার বৈষয়িক বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সে কথা খুলিয়া বলিবার কোন বাধা দেখি না! রমেশকে তুমি এত সহজে ছাড়িয়া দিবে কেন?”

অন্নদাবাবু। আচ্ছা বেশ ত, সে ত এখনো পালায় নাই—তুমিই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দেখ না!

যোগেন্দ্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক-পেয়ালা

গরম চা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল ।

অন্নদাবাবু কহিলেন—“আহা, যোগেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের ! তোমার যে খাওয়া হইল না ।”

সে কথা যোগেন্দ্রের কানে পৌঁছিল না । সে রমেশের বাসায় ঢুকিয়া সশব্দ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল । “রমেশ ! রমেশ !” রমেশের কোন সাড়া নাই । ঘরে-ঘরে খুঁজিয়া দেখিল, রমেশ শুইবার ঘরে নাই, বসিবার ঘরে নাই, ছাদে নাই, একতলায় নাই । অনেক ডাকাডাকির পর বেহারাটাকে সন্ধান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“বাবু কোথায় ?”

বেহারা কহিল—“বাবু ত ভোরে বাহির হইয়া গেছেন ।”

যোগেন্দ্র । কখন আসিবে ?

বেহারা জানাইল—বাবু তাঁহার কতক-কতক কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়া গেছেন । বলিয়া গেছেন, ফিরিয়া আসিতে তাঁহার চারপাঁচদিন দেরি হইতে পারে । কোথায় গেছেন, তাহা বেহারা জানে না ।

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল । অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হইল ?”

যোগেন্দ্র কিছু হইয়া কহিল—“হইবে আর কি, যাহার সঙ্গে আজ-বাদে-কাল মৈত্রেয় বিবাহ দিবে, তাহার কি কাজ পড়িয়াছে, সে কখন কোথায় থাকে, তাহার খোজ-খবর তোমরা কিছুই রাখ না ! অথচ তোমার বাড়ীর পাশেই তাহার বাসা !”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “কেন, কাল রাত্রেও ত রমেশ ঐ বাসাতেই ছিল !”

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, “তোমরা জান না সে কোথায় যাইবে, তাহার বেহারা জানে না সে কোথায় গেছে, এ কি-রকম লুকাচুরি ব্যাপার চলিতেছে ? আমার কাছে এত কিছুই ভাল ঠেকিতেছে না ! বাবা, তুমি এমন নিশ্চিন্ত আছ কি করিয়া ?”

অন্নদাবাবু এই ভৎসনায় হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইবার চেষ্টা করিলেন । গম্ভীর মুখ করিয়া কহিলেন, “তাই ত, এ সব কি ?”

কাণ্ডজ্ঞানহীন রমেশ অনায়াসে কাল রাত্রে অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে পারিত । কিন্তু সে কথা তাহার মনে উদয়ও হয় নাই । ঐ যে সে “বিশেষ প্রয়োজন আছে” বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যেই তাহার সকল কথা বলা হইয়া গেছে, এইরূপ রমেশের ধারণা । ঐ এক কথাতেই আপাতত সকল রকমের ছুটি পাইয়াছে জানিয়া, সে তাহার উপস্থিত কর্তব্যসাধনে বিভ্রত হইয়া বেড়াইতেছে ।

যোগেন্দ্র । হেমনলিনী কোথায় ?

অন্নদাবাবু । সে আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া উপরেই গেছে ।

যোগেন্দ্র কহিল—“রমেশের এই সমস্ত অদ্রুত আচরণে বেচারা বোধ হয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আছে—সেইজন্য সে আমার সঙ্গে দেখা হইবার ভয়ে পালাইয়া রহিয়াছে !”

সঙ্কুচিত ও ব্যথিত হেমনলিনীকে আশ্বাস দিবার জন্য যোগেন্দ্র উপরে গেল । হেমনলিনী তাহাদের বড় ঘরে চৌকির উপরে চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিল । যোগেন্দ্রের পদশব্দ

শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার ভাণ করিল। যোগেন্দ্র ঘরে আসিতেই বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল—“এই যে, দাদা কখন এলে? তোমাকে ত তেমন বিশেষ ভাল দেখাইতেছে না।”

যোগেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া-পড়িয়া কহিল, “ভাল দেখাইবার ত কথা নহ্ন। আমি সব কথা শুনিয়াছি হেম! কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি কোন চিন্তা করিয়ো না। আমি ছিগ্নম না বলিয়াই এই-রকম গোলমাল ঘটিতে পারিয়াছে। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব। আচ্ছা হেম, রমেশ তোমাকে কোন কারণ বলে নাই?”

হেমনলিনী মুঞ্চিলে পড়িল। রমেশসম্বন্ধে এই সকল সন্দিগ্ধ আলোচনা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ তাহাকে বিনাহাদিন পিছাইবার কোন কারণ বলে নাই, একথা যোগেন্দ্রকে বলিতে তাহার ইচ্ছা নাই, অথচ মিথ্যা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। হেমনলিনী কহিল, “তিনি আমাকে কারণ বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, আমি শোনা দরকার মনে করি নাই।”

যোগেন্দ্র মনে করিল, ‘ইহা গুরুতর অভিমানের কথা এবং এরূপ অভিমান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।’ কহিল, “আচ্ছা, তুমি কিছুই ভয় করিয়ো না, ‘কারণ’ আমি আজই বাহির করিয়া আনিব।”

হেমনলিনী কোলের বইধানার পাতা অনাবশ্যক উন্টাইতে উন্টাইতে কহিল—“দাদা, আমি ভয় কিছুই করি না। ‘কারণ’ বাহির করিবার জন্য তুমি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কর, এমন আমার ইচ্ছা নহ্ন।”

যোগেন্দ্র ভাবিল, ‘ইহাও অভিমানের কথা!’ কহিল, “আচ্ছা, সে তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না।”—বলিয়া তখন চলিয়া যাইতে উদ্বৃত্ত হইল।

হেমনলিনী তখন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—“না দাদা, একথা লইয়া তুমি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে যাইতে পারিবে না। তোমরা তাঁহাকে যাহাই মনে কর না কেন, আমি তাঁহাকে কিছুনা সন্দেহ করি না।”

তখন যোগেন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, এত অভিমানের মত শুনাইতেছে না! তখন স্নেহমিশ্রিত করুণায় তাহার মনে মনে হাসি পাইল। ভাবিল, ‘ইহাদের সংসারের জ্ঞান কিছুই নাই। এদিকে পড়াশুনা এত করিয়াছে, পৃথিবীর গৌজখবরও অনেক রাখে; কিন্তু কোন্থানে সন্দেহ করিতে হইবে, সে অভিজ্ঞতাটুকুও ইহার হয় নাই।’ এই নিঃসংশয় নির্ভরের সহিত রমেশের ছদ্মব্যবহারের তুলনা করিয়া যোগেন্দ্র মনে মনে রমেশের উপর আরো চটিয়া উঠিল। ‘কারণ’ বাহির করিবার প্রতিজ্ঞা তাহার মনে আরো দৃঢ় হইল। যোগেন্দ্র দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেমনলিনী কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল—“দাদা, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, তাঁহার কাছে এসব কথা একেবারে উত্থাপনমাত্র করিবে না।”

যোগেন্দ্র কহিল—“সে দেখা যাইবে।”

হেমনলিনী। না দাদা, দেখা যাইবে না! আমার কাছে কথা দিয়া যাও! আমি তোমাদের নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের কোন চিন্তার বিষয় নাই! একটিবার আমার এই একটি কথা রাখ!

হেমনলিনীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া যোগেন্দ্র ভাবিল, ‘তবে নিশ্চয় রমেশ হেমের কাছে সকল কথা বলিয়াছে ! কিন্তু হেমকে যাহা-তাহা বলিয়া ভুলানো ত শক্ত নয় ।’ কহিল—“দেখ হেম, অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না । কত্ৰাপক্ষের অভিভাবকদের যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে ত । তোমার সঙ্গে তার যদি কিছু বোঝাপড়া হইয়া থাকে, সে তোমরাই জান, কিন্তু সেই হইলেই ত যথেষ্ট হইল না—আমাদের সঙ্গেও তাহার বোঝাপড়া করিবার আছে । সত্য কথা বলিতে কি হেম, এখন তোমার চেয়ে আমাদের সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ার সম্পর্ক বেশি—বিবাহ হইয়া গেলে তখন আমাদের বেশি কথা বলিবার থাকিবে না ।”

এই বলিয়া যোগেন্দ্র তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল । ভালবাসা যে আড়াল, যে আবরণ ধোঁজে, সে আর রহিল না । হেমনলিনী ও রমেশের যে সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া ছইজনকে কেবল দুইজনেরই করিয়া দিবে, আজ তাহারই উপরে দশজনদের সন্দেহের কঠিন স্পর্শ আসিয়া বারংবার আঘাত করিতেছে । চারিদিকের এই সকল আলো-লনের অভিঘাতে হেমনলিনী এমন ব্যথিত হইয়া আছে যে, আত্মীয়বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎমাত্রও তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে । যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে হেমনলিনী চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ।

যোগেন্দ্র বাহিরে বাইতেই অক্ষয় আসিয়া কহিল—“এই যে, যোগেন্দ্র আসিয়াছে ! সব কথা শুনিয়াছ ত ? এখন তোমার কি মনে হইতেছে ?”

যোগেন্দ্র । মনে ত অনেকরকম হইতেছে, সে সমস্ত অনুমান লইয়া মিথ্যা বাদ্যবাদ করিয়া কি হইবে ? এখন কি চায়ের টেবিলে বসিয়া মনস্তত্ত্বের হুন্স আলোচনার সময় ?

অক্ষয় । তুমি ত জানই হুন্স আলোচনাটা আমার স্বভাব নয়, তা মনস্তত্ত্বই বল, দর্শনই বল, আর কাবাই বল । আমি কাজের কথাই বুঝি ভাল—তোমার সঙ্গে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি ।

অধীরস্বভাব যোগেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, কাজের কথা হবে । এখন বলিতে পার, রমেশ কোথায় গেছে ?”

অক্ষয় কহিল, “পারি ।”

যোগেন্দ্র প্রশ্ন করিল, “কোথায় ?”

অক্ষয় কহিল, “এমন সে আমি তোমাকে বলিব না—স্বাক্ষর তিনটার সময় একেবারে তোমাকে রমেশের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব ।”

যোগেন্দ্র কহিল—“কাণ্ডখানা কি বল দেখি ? তোমরা সবাই যে মৃগ্মিন্য হইয়া উঠিলে ? আমি এই ক’দিনমাত্র বেড়াইতে গেছি, সেই সুবোণে পুণিবাটা এমন ভয়ানক রহস্যময় হইয়া উঠিল ? না না অক্ষয়, এমন ঢাকাঢাকি করিলে চলিবে না ।”

অক্ষয় । শুনিয়া খুসি হইলাম । ঢাকাঢাকি করি নাই বলিয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অচল হইয়া উঠিয়াছে—তোমার বোন ত আমার মুখ দেখা বন্ধ করিয়াছেন, তোমার বাবা আমাকে সন্ধিপ্ররুতি বলিয়া গালি দেন, আর রমেশ-বাবুও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন না । এখন কেবল তুমিই বাকি আছ । তোমাকে

আমি ভয় করি—তুমি স্বপ্ন আলোচনার লোক নও, মোটা কাজটাই তোমার সহজে আসে—আমি কাহিল মানুষ, তোমার যা আমার সহ্য হইবে না !

যোগেশ্বর । দেখ অক্ষয়, তোমার ঐ সকল পাণ্যচালো চাল আমার ভাল লাগে না । বেশ বুঝিতেছি, একটা কি খবর তোমার বলিবার আছে, সেটাকে আড়াল করিয়া অমন দর-বুন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন ? সরল-ভাবে বলিয়া ফেল, চুকিয়া যাক !

অক্ষয় । আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে গোড়া হইতেই বলি—তুমি অনেক কথাই জান না ।

২০

রমেশ দক্ষিণাডায় যে বাসায় ছিল, সে বাসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাট, তাহা আর-কাহাকেও ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে রমেশ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই । সে এই কয়েকমাস সংসারের বাহিরে উধাও হইয়া গিয়াছিল, লাভক্ষতিকে বিচারের মধ্যেই আনে নাই ।

আজ সে প্রত্যাষে সেই বাসায় গিয়া ঘর-ছয়ার সাফ করাইয়া লইয়াছে, তক্তপোষের উপর বিছানা পাতাইয়াছে এবং আহাতিদিরও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে । আজ ইক্ষুলের ছুটির পর কমলাকে আনিতে হইবে ।

সে এখনো ঘেরি আছে । ইতিমধ্যে রমেশ তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল । এটোয়া সে কখনো দেখে নাই—কিন্তু পশ্চিমের দৃষ্ট কল্পনা করা কঠিন নহে । সহরের প্রান্তে তাহার বাড়ী—তরুশ্রেণীদ্বারা ছায়াখচিত

বড় রাস্তা তাহার বাগানের ধার দিয়া চলিয়া গেছে—রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মাঝে মাঝে কূপ, মাঝে মাঝে পশুপক্ষী ভাড়াইবার জন্ত মাচা বাঁধা । ক্ষেত্রসেচনের জন্ত গোক দিয়া জল তোলা হইতেছে, সমস্ত মধ্যাহ্নে তাহার করণ শব্দ শোনা যায়—রাস্তা দিয়া প্রচুর ধূলা উড়াইয়া মাঝে মাঝে একা-গাড়ি ছুটিয়াছে, তাহার ঝন্ঝন্ শব্দে রৌদ্রদগ্ধ আকাশ জাগিয়া উঠিতেছে । এই সুদূর প্রবাসের প্রথর তাপ, উদাস মধ্যাহ্ন ও শূন্য নির্জনতার মধ্যে সে তাহার রুদ্ধদ্বার বাংলা-ঘরে সমস্তদিন হেমনলিনীকে একা কল্পনা করিতে গেলে ক্লেশ অনুভব করিত । তাহার পাশে চিরসখীরূপে কমলাকে দেখিয়া সে আরাম বোধ করিল । কমলার ইতিহাস শুনিবে ও কমলার সুন্দর কিশোর মুখখানি দেখিলে কোমলহৃদয়া হেমনলিনীর সহজেই স্নেহ আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে রমেশের কোন সন্দেহ ছিল না । এই মেয়েটিকে মানুষ করা, ইহাকে লেখাপড়া শিখানো, হেমনলিনীর দিনব্যাপনের একটি প্রধান উপায় হইবে । তাহার পরে রমেশের ঘর যখন শিশুসন্তানের হাসিকান্নায় সরস হইয়া উঠিবে, তখন তাহা-দিগকে মানুষ করিয়া, তাহাদের ভালবাসা পাইয়া, তাহাদের মুখে মাসীসম্ভাষণ শুনিয়া কমলার হৃদয়ের শূন্যতামোচন হইবে, তাহার বুক জুড়াইয়া যাইবে ।

রমেশ ঠিক করিয়াছে, এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না । বিবাহের পর হেমনলিনী তাহাকে বৃকের উপর টানিয়া-লইয়া স্নযোগ বুঝিয়া সাকরণ স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে,

—যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব, কমলার জীবনের এই জটিল রহস্যজাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পরে সেই দূর বিদেশে, তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে, কোন-প্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।

তখন দ্বিপ্রহরে গলি নিস্তব্ধ ;—যাহারা আপিসে যাইবার, তাহারা আপিসে গেছে, যাহারা না যাইবার, তাহারা দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। অনতিতপ্ত আশ্বিনের মধ্যাহ্নটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে—আগামী ছুটির উল্লাস এখন যেন আকাশকে আনন্দের আভাস দিয়া মাখাইয়া রাখিয়াছে। রমেশ তাহার নির্জন বাসায় নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে স্বপ্নের ছবি উত্তরোত্তর কলাও করিয়া আঁকিতে লাগিল।

এমন সময়ে খুব একটা ভারি গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সে গাড়ি রমেশের বাসায় ঘরের কাছে আসিয়া থামিল। রমেশ বুঝিল, ইন্সুলের গাড়ি কমলাকে পৌছাইয়া দিতে আসিতেছে। তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমলাকে কিরূপ দেখিবে, তাহার সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্তা হইবে, কমলাই বা রমেশকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, হঠাৎ এই চিন্তা তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

নীচে তাহার হৃদয় চাকর ছিল—প্রথমে তাহারা ধরাধরি করিয়া কমলার তোরঙ্গ লইয়া আসিয়া বারান্দায় রাখিল—তাহার পশ্চাতে কমলা ঘরের ঘরের সমুখ পর্যন্ত আসিয়া থম্কিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে প্রবেশ করিল না।

রমেশ কহিল—“কমলা, ঘরে এস।”

কমলা একটা সঙ্কোচের আক্রমণ কাটাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছুটির সময়ে রমেশ তাহাকে বিভ্রালয়ে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কান্নাকাটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই ঘটনায় এবং কয়েক-মাসের বিচ্ছেদে রমেশের সঙ্গে তাহার যেন একটু মনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। তাই কমলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া একটুখানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা দরজার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

রমেশ কমলাকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল। যেন তাহাকে আর-একবার নূতন করিয়া দেখিল। এই কয়েকমাসে তাহার আশ্রয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অনতিপল্লবিতা লতার মত সে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাড়াগেয়ে মেয়েটির অপরিমৃষ্ট সন্ধ্যা জ্বলন্ত স্বাস্থ্যের যে একটি পারপুষ্টতা ছিল, সে কোথায় গেল? তাহার গোলগাল মুখটি করিয়া লম্বা হইয়া একটি বিশেষ লাল ভরিয়াছে, তাহার গাল দুটি পুষ্টির শ্রামাত চিকণতা ত্যাগ করিয়া কোমল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহার দুই কালো চোখে কেবল বাহিরের বিষয়গতের খেলা প্রতি-বিস্তৃত নহে, সেখানে তাহার অন্তঃকরণের ছায়া পড়িয়াছে। পূর্বে রমেশ যখন তাহাকে আজকালকার কলিকাতার ছাঁদে সাজাইয়াছিল, তখন বালিকা এবং তাহার সজ্জা যেন আলাদা হইয়া ছিল—আকাশের সঙ্গে জ্যোৎস্না যেমন মিশিয়া যায়, কমলার নূতন বেশনের কাপড় তাহার গায়ের

সঙ্গে তেমন একাক্ষ হইয়া যাইতে পারে নাই—আজ সে তাহার সাজসজ্জাকে অনায়াসে বহন করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া সহজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া কমলা যেন নিজেকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এখন তাহার গতিবিধি-ভাবভঙ্গীতে কোনপ্রকার জড়তা নাই। আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে ঋজুদেহে ঈষৎ বন্ধিম-মুখে থোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপরে শরৎ-মধ্যাহ্নের আলো আসিয়া পড়িল, তাহার মাথায় কাপড় নাই, অগ্রভাগে লাল-ফিতার গ্রন্থিবাধা বেণীটি পিঠের উপরে পড়িয়াছে, ফিকে হৃদয়ে রঙের মেরিনোর শাড়ী তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে অঁটিয়া বেষ্টন করিয়াছে—তখন রমেশ কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কমলার সৌন্দর্য্য এই কয়মাসে রমেশের মনে আবছায়ার মত হইয়া আসিয়াছিল, আজ সেই সৌন্দর্য্য নবতর বিকাশ লাভ করিয়া হঠাৎ তাহাকে চমক লাগাইয়া দিল। সে যেন ইহার জন্ত প্রস্তুত ছিল না।

রমেশ কহিল, “কমলা, বোস।”

কমলা একটা চোঁকিতে বসিল। রমেশ কহিল, “ইস্কুলে তোমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে?”

কমলা অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল—“বেশ।”

রমেশ ভাবিতে লাগিল, ‘এইবার কি বলা যাইবে।’ হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—কহিল, “বোধ হয় অনেকক্ষণ খাও নাই। তোমার খাবার তৈরি আছে। এইখানেই আনিতে বলি?”

কমলা কহিল, “খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।”

রমেশ কহিল—“একটু কিছু খাইবে না? মিষ্ট না খাও ত ফল আছে—আতা, আপেল, বেদানা—”

কমলা কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল। কমলার এই স্বদূর নির্লিপ্তভাব রমেশের ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ আগেই রমেশ ভাবিতেছিল, ‘স্বামিত্রম করিয়া কমলার ভালবাসা যদি তাহার প্রতি দৃঢ়বন্ধ-মূল হইয়া থাকে, তবে কি মুকিল হইবে! তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহাকে কাছে রাখা চলিবে? কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে উদাসীন অনাস্বীয়তা—সেও কি ভাল? কমলাকে যখন চিরদিন রমেশের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ থাকা ত চাই।’

আসল কথা, যাহার মুখখানি এমন সুন্দর, যাহার বড়-বড় ছুটি চোখের মধ্যে এমন সরলতা, যাহার ভাবখানি দেখিলে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভালবাসিবার শক্তি তাহার অপরিণত হৃদয়কোরকের মধ্যে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে, একেবারে পথের পথিকের মত তাহার হৃদয়-সীমানার সম্পূর্ণ বাহিরে পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক নহে। এই সুন্দরী মেয়েটি জীবনের সুখসাম্রাজ্যের জন্ত দ্বিধা আত্মীয়তার সহিত রমেশের প্রতি নির্ভর করিবে, এই প্রত্যাশাটুকু রমেশ ছাড়িতে পারিল না। কমলার মধ্যে এখন রমেশের প্রেমের চরম সার্থকতা নাই—সে রমেশের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যাহার

প্রয়োজন নাই, তাহারো মূল্য আছে—হীরা-মুক্তার আবশ্যকতা অল্প, কিন্তু তাহার মূল্য অল্প নহে, তাহা হাতে পাইয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে না। রমেশকে এই মুহূর্তে যদি তাহার অদৃষ্ট আসিয়া বলে, “বাপু, কমলাকে লইয়া তুমি বড়ই মুকিলে পড়িয়াছ, এক কাজ করা যাক্, ইহাকে তোমার সংসার হইতে একেবারে সূদূরে সরাইয়া দিয়া তোমাকে জটিল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করি!” তবে রমেশ বোধ হয় এই উত্তর করে—“জটিলতাটা কাটিয়া যাওয়া নিতান্তই দরকার, কিন্তু কোন উপায়ে কমলা যদি থাকিয়া যায় ত থাক্ না! ও বেচারী মুক্তার মুখ হইতে ভাসিয়া আমার কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে—আমি উহাকে প্রাণ দিয়াছি, এ সংসারে আমার কাছে ও কি আশ্রয় পাইবে না?”

রমেশ জানিত, কমলার অদৃষ্টে নারী-জীবনের প্রধান স্মৃতি নাই—কিন্তু শিক্ষার দ্বারা, স্নেহের দ্বারা ইহার হৃদয়মনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার ভার আজ কাহার উপরে পড়িয়াছে? ঘটনাগুলি এমনি করিয়া ঘটয়াছে যে, সেই কর্তব্য একমাত্র রমেশেরই। নিজের সুখের জন্ত, সুবিধার জন্ত এই কর্তব্য রমেশ ফেলিয়া দিতে পারে না।

রমেশ আর-একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কমলা তখন ঈষৎ মুখ নত করিয়া তাহার ইংরাজীশিক্ষার বহি হইতে ছবি দেখিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মত নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে আগাইয়া তোলে। শরতের আলোক হঠাৎ যেন প্রাণ পাইল, আশ্বিনের

দিন যেন আকার ধারণ করিল—একটি তরুণ স্নকুমার লাভণ্যে চারিদিকের আকাশ যেন ঢলঢল করিতে লাগিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে—তেমনি এই মেয়েটি আকাশকে, বাতাসকে, আলোককে আপনার চারিদিকে যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিল—যে সুরগুলি বিচ্ছিন্ন, তাহাতে যেন একটি বিশেষ রাগিণী সঙ্গার করিল—যে কথাগুলি বিক্ষিপ্ত, তাহাকে যেন বিশেষ অর্থে ও ছন্দে সুপরিণত করিয়া তুলিল। অথচ সে নিজে ইহার কিছুই না জানিয়া চূপ করিয়া বসিয়া তাহার পড়িবার বইয়ের ছবি দেখিতেছিল।

রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “হেম-নলিনীকে লইয়া রমেশ যে সংসার পাতিয়া বসিবে, কমলার এই কিশোর-কোমল কান্তি তাহার উপরে একটি বৈচিত্র্যপাত করিবে। এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, এই স্নেহের পুতলী, রমেশ ও হেমনলিনীর ভালবাসার মাঝখানে আরো একটি বিশেষ রসসঙ্গার করিয়া দিবে—ইহার মাধুর্য্য তাহাদের প্রেমের মাধুরীর মধ্যে আরো একটি রঙীন রশ্মি বিকীর্ণ করিবে। তাহাদের প্রেমের উপরে চন্দ্র যেমন বিশেষভাবে আলো দিবে, বসন্তের ফুল যেমন বিশেষভাবে গন্ধ মিয়াইবে, এই মেয়েটিও তেমনি ইহার বিকচোন্মুখ নবীন জীবনের নব নব বিকাশবৈচিত্র্য তাহাদের প্রেমের সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে।

এইরূপে রমেশ একবার কমলার নিজের দিক্ হইতে, একবার আপনারদেহের সর্বপ্রাসী ভালবাসার দিক্ হইতে কমলাকে অবিস্ফেস্তভাবে নিজেকে আত্মীয় করিয়া দেখিল।

তাহার হৃদয় বিস্ফারিত হইল, তাহার মন হইতে সমস্ত সঙ্কট যেন কাটিয়া গেল ।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া একটা খালায় কতকগুলি আপেল, নাসপাতি, বেদানা লইয়া উপস্থিত করিল । কহিল, “কমলা, তুমি ত খাবে না দেখিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমি ত আর সবুর করিতে পারি না ।”

শুনিয়া কমলা একটুখানি হাসিল । এই অকস্মাৎ হাসির আলোকে উভয়ের ভিতরকার কুয়াশা যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল ।

রমেশ ছুরি লইয়া আপেল কাটিতে লাগিল । কিন্তু কোনপ্রকার হাতের কাজে রমেশের কিছুমাত্র দক্ষতা নাই । তাহার একদিকে ক্ষুধার আগ্রহ, অত্ৰদিকে এলো-মেলো কাটিবার ভঙ্গী দেখিয়া বালিকার ভারি হাসি পাইল—সে খিল্খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

রমেশ এই হাসোচ্ছ্বাসে খুসি হইয়া কহিল, “আমি বুঝি ভাল কাটিতে পারি না, তাই হাসিতেছ ! আচ্ছা, তুমি কাটিয়া দাও দেখি, তোমার কিরূপ বিত্তা !”

“কমলা কহিল, “বটি হইলে আমি কাটিয়া দিতে পারি, ছুরিতে পারি না ।”

রমেশ কহিল, “তুমি মনে করিতেছ, বটি এখানে নাই ?”—চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বটি আছে ?” সে কহিল, “আছে—রাত্রের আহারের জন্ত সমস্ত আনা হইয়াছে ।”

রমেশ কহিল, “ভাল করিয়া ধুইয়া একটা বটি লইয়া আর ।”

চাকর বটি লইয়া আসিল ।

কমলা জুতা খুলিয়া বটি পাতিয়া নীচে বসিল এবং হাসিমুখে নিপুণহস্তে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফলের খোসা ছাড়াইয়া চাকলা-চাকলা করিয়া কাটিতে লাগিল । রমেশ তাহার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া ফলের খণ্ড-গুলি খালায় ধরিয়া লইল ।

রমেশ কহিল, “তোমাকেও খাইতে হইবে ।”

কমলা কহিল—“না ।”

রমেশ কহিল—“তবে আমিও খাইব না ।”

কমলা রমেশের মুখের উপরে হুই চোখ ভুলিয়া কহিল—“আচ্ছা, তুমি আগে খাও, তার পরে আমি খাইব ।”

রমেশ কহিল—“দেখিযো, শেষকালে ফাঁকি দিযো না !”

কমলা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—“না, সত্যি বলিতেছি, ফাঁকি দিব না !”

বালিকার এই সত্যপ্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইয়া রমেশ থালা হইতে একটুকুরা ফল লইয়া মুখে পুরিয়া দিল ।

হঠাৎ তাহার চিবানো বন্ধ হইয়া গেল । হঠাৎ দেখিল, তাহার সম্মুখেই দ্বারের বাহিরে যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত ।

অক্ষয় কহিল, “রমেশবাবু, মাপ করিবেন—আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানে বুঝি একলাই আছেন । যোগেন্, খবর না দিয়া হঠাৎ এমন করিয়া আসিয়া পড়াটা ভাল হয় নাই । চল, আমরা নীচে বসি গিয়া ।”

বটি ফেলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল । ঘর হইতে পালাইবার পথেই হুজনে

দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেন্দ্র একটুখানি সরিয়া দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু কমলার মুখের উপর কমলা সজ্জিত হইয়া পাশের ঘরে চলিয়া হইতে চোখ ফিরাইল না—তাহাকে তীব্র-গেল।

ক্রমশঃ ।

দৃষ্টিতত্ত্ব ।

কৃত্রিম চক্ষু ।

আধুনিক শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে দৃষ্টি-জ্ঞান-উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন,—চক্ষুর পশ্চাদ্বর্তী রুম্বপর্দায় (Retina) বাহিরের আলোক পড়িয়া উত্তেজনা উপস্থিত করিলে, সেই উত্তেজনা ও মস্তিষ্কের যোগে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চারণ হয়। কিন্তু সেই উত্তেজনাটা যে কি, এবং অতি ক্ষুদ্র অতীন্দ্রিয় ঈথরতরঙ্গই বা অক্ষিপর্দায় আঘাত দিবামাত্র যে কিপ্রকারে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে মতবৈধ আছে।

একদল বৈজ্ঞানিকের মতে, অক্ষিপর্দায় লিপ্ত পদার্থবিশেষের রাসায়নিক পরিবর্তন দৃষ্টিজ্ঞানের মূলকারণ। বাহিরের আলোক অক্ষিছিদ্রের (Pupil) মধ্য দিয়া পর্দালিপ্ত পদার্থে পড়িয়া সেই রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। ইহারা আরো বলেন,— এই পরিবর্তন ঠিক সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তনের অনুরূপ নয়, আলোকদ্বারা পর্দালিপ্ত পদার্থ অবস্থাবিশেষে কখন ধ্বংস

এবং কখনও বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় এবং বৃদ্ধি (Katabolic and Anabolic changes) দ্বারা দৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের আলোকদ্বারা আমরা সৃষ্টপদার্থে যে নানাবর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই, ইহাদের মতে উক্ত দুইপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্তনের (Metabolic changes) মিশ্রণই তাহার মূল কারণ।

প্রাকৃতিক কার্যসকল বাহির হইতে দেখিলে খুব জটিল ও অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু একবার রহস্তাবরণ উন্মোচিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সুব্যবস্থা ও সরল-নিয়ম ধরা পড়িয়া যায়। দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপাদনের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় নানা জটিলতা থাকায়, সেটা কতকটা অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এইজন্য আজকাল অনেকেই সেটিকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। আলোকপাতমাত্র অক্ষিপর্দালিপ্ত পদার্থের ক্ষয় ও নিমেষমধ্যে সেই ক্ষয়ের

পূরণ এবং তার পর আবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন, এ সকলই আমাদেরও নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় । এপ্রকার ত্বরিত রাসায়নিক কার্যের উদাহরণও জড়-বিজ্ঞানে চূর্ণত বটে । যা হউক, দৃষ্টিজ্ঞানোৎপত্তির রাসায়নিক ব্যাখ্যার এই সকল গলদ দেখিয়া, একদল আধুনিক পণ্ডিত তাহার আর-এক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন । ইহাদের মতে দৃষ্টিজ্ঞানের মূল কারণ বিজ্যৎ । আলোকপাতমাত্র রূপদার্থলিপ্ত অক্ষিপর্দায় তড়িৎ উৎপন্ন হয়, এবং তার পর সেই তড়িৎ-তরঙ্গ অক্ষিমায়া (Optic nerve) দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হইলে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয় । অক্ষিমায়ুর কাণ্য কতকটা টেলিগ্রাফের তারের কার্যের অনুরূপ এবং প্রাণিমস্তিকটা যেন টেলিগ্রাফের সঙ্কেতগ্রহণবস্ত্র,—অতি মৃদু তরঙ্গও ইহাতে আসিয়া প্রবল সাড়ার উৎপাদক হয় ।

উল্লিখিত নূতন মতবাদ প্রচারের পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । কি কারণে আলোকপাতে তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং চক্ষুপ্রবিষ্ট আলোকের প্রকারভেদেই বা কোন্ প্রক্রিয়ার বর্ণবৈচিত্র্যের বিকাশ হয়, এই সকল তথ্যের সহজ মীমাংসা এই মতবাদে পাওয়া যায় নাই । ভারতের সুসন্তান বিজ্ঞানার্থী জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বহু গবেষণাদ্বারা সম্প্রতি দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক মতবাদের পোষক অনেকগুলি প্রত্যক্ষবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । অধ্যাপক বসুমহাশয়ের এই সকল আবিষ্কারদ্বারা শিশু মতবাদটির ভিত্তি সূদৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । এবং অপর বৈজ্ঞানিকগণ দৃষ্টিব্যাপারের যে সকল জটিল ঘটনার কোন কারণই এপর্যন্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই, বসুমহাশয়ের গবেষণায় তাহাদেরও উৎপত্তিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসুমহাশয়ের দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় আবিষ্কারের কিঞ্চিৎ আভাস দিব ।

হোমগ্রেন (Holmgren), কুনে (Kuhne), ডিওয়ার (Dewar) এবং ষ্টেনার (Steiner) প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক অনেক পণ্ডিত দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়াছিলেন । আলোকপাতজনিত বিজ্যৎপ্রবাহে যে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি করে, ভেকের চক্ষে আলোকপাত করিয়া ইহারাই তাহা প্রথমে দেখিতে পান । অধ্যাপক বসুমহাশয়ও পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা প্রাণিচক্ষে আলোকপাত করিয়া বিজ্যৎলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ইহাৎ আলোকপাতরোধ ও আলোকের প্রাণব্যাপরিবর্তন করিলে, প্রবাহের কিপ্রকার পরিবর্তন হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন । এই পরীক্ষাকালে বসুমহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যদি প্রকৃতই আলোকদ্বারা প্রাণিচক্ষে বিজ্যতের উৎপত্তি সম্ভবপর, তবে স্কোশলে চক্ষুর অনুরূপ একটা যন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাহাতে আলোকপাত করিলে নিশ্চয়ই বিজ্যতের উৎপত্তি হইবে । এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া একটি নাতিমূল রোপ্যদণ্ডের একপ্রান্ত পিটাইয়া বসুমহাশয় সেটাকে অক্ষিকোষের আকার প্রদান করিয়াছিলেন । এবং তার সেই অক্ষিপটে ব্রোমিনের (Bromine) অলপদ্রব্য কৃত্রিম অক্ষিপর্দা রচনা করিয়া

তাহাতে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছিলেন, — প্রাণিচক্ষে আলোকপাত হইলে, যেমন অক্ষিপর্দা ও অক্ষিমায়ুর মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচলন করে, কৃত্রিম চক্ষুতেও অক্ষিপুট ও সেই রোপ্যদণ্ডের মুক্তপ্রান্ত-সংলগ্ন তারের মধ্য দিয়াও তদ্রূপ তড়িৎপ্রবাহ দেখা যায় ।

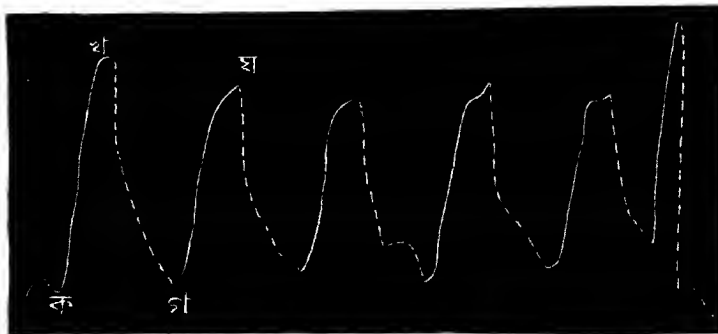
পূর্ববর্ণিত সহজ ও অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রটি অধ্যাপক বসুমহাশয়ের দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় আবিষ্কারের প্রধান অবলম্বন । প্রাণিচক্ষু ও উক্ত কৃত্রিম চক্ষুর উপর আলোকের কার্য যখন অবিকল এক, সে স্থলে প্রথমে কেবল কৃত্রিম চক্ষুর উপরে আলোকের নানা খুঁটিনাটি কার্য পরীক্ষা করিলে, দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় অনেক সমস্তার মীমাংসা হইবে বলিয়া ইহার মনে হইয়াছিল । এই প্রথায় পরীক্ষা করিয়া এবং পরীক্ষালব্ধ ফল প্রাণিচক্ষুর উপর আলোকের নানা কার্যের সহিত তুলনা করিয়া, অধ্যাপকমহাশয় অত্যন্ত ফললাভ করিয়াছেন । এত অনায়াসে এবং এপ্রকার

সহজ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিতত্ত্বের নানা জটিল রহস্যের উদ্ভেদ দেখিয়া আজ সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে ।

প্রাণি চক্ষুপতিত আলোক ও পূর্ববর্ণিত কৃত্রিম চক্ষু পতিত আলোক দ্বারা যে সকল বৈজ্ঞাতিক লক্ষণের বিকাশ হয়, অধ্যাপক বসুমহাশয় তাহাদের ঐক্য কিপ্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক । প্রাণিচক্ষে একই প্রকারের আলোকরশ্মি পুনঃপুন নিয়মিতভাবে আঘাত করিলে, প্রতি আঘাতেই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় । আচার্য্য বসুমহাশয় এইপ্রকার নিয়মিত আলোকতাড়ন-জাত প্রাণিচক্ষুর সাড়ালিপি অঙ্কিত করিয়া, এবং ঠিক সেই অবস্থায় কৃত্রিম চক্ষুর বৈজ্ঞাতিক প্রবাহপরিবর্তন পরীক্ষা করিয়া, অবিকল একই সাড়ালিপি পাইয়াছেন ।

নিম্নস্থ চিত্রগুলি দেখিলে পাঠক বক্তব্যটা সহজে বুঝিতে পারিবেন । ১ম চিত্রটি প্রাণিচক্ষুর উপর পতিত আলোকোৎ-

১ম চিত্র ।
জীবচক্ষুর সাড়ালিপি ।



পন্ন সাড়ার ছবি । ছয়বার নিয়মিতভাবে প্রকারে বিদ্যুৎতরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় আলোকপাত হওয়াতে, প্রতিবারে কি- হইয়াছিল, তাহা চিত্রের ছয়টি তরঙ্গরেখা-

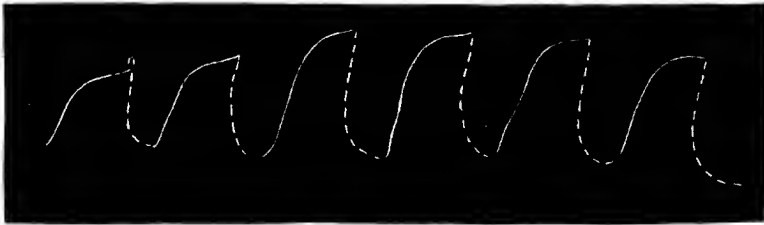
দ্বারা পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই শ্রেণীর চিত্রে কথ, গঘ ইত্যাদি স্থল রেখাগুলির দৈর্ঘ্য ও ভূমির সহিত তাহাদের অবনতি তুলনা করিলে, প্রত্যেক আলোকপাতে, কত সময়ে, কি পরিমাণ, তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রে কথ-রেখা গঘ অপেক্ষা দীর্ঘতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, প্রথম আলোকপাতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় আলোকপাতে তদপেক্ষা অল্প তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে। গঘ-রেখা যদি কথ অপেক্ষাও লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কগ-ভূমিরেখার সহিত বৃহত্তর

কোণ উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে পাঠক বুঝিবেন, দ্বিতীয় আলোকপাতজাত প্রবাহ, প্রথম প্রবাহটি অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ণতা-প্রাপ্তির পর, প্রবাহ কিপ্রকারে ক্রমে লম্ব পাইয়া চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করে, নিম্নগামী স্বল্প রেখাগুলিদ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে। যে রেখা যত হেলিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহার উৎপাদক তড়িৎপ্রবাহ তত অধিক সময়ে লম্ব পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

২য় চিত্রটি সেই রৌপ্যানির্গিত কৃত্রিম-চক্ষে পাতিত আলোক হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের

২য় চিত্র ।

কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালিপি ।



সাড়ালিপি। পাঠক উভয় চিত্রের অঙ্কিত ঐক্য দেখুন।

আলোকপাতের কাল ও তড়ুৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের মধ্যে একটা অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রাণিচক্ষুতে একই আলোক যথাক্রমে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সেকেন্ড ধরিয়া পাতিত কর, এই সকল আলোকতড়নায় সমান সাড়া দেখিতে পাইবে না। কাল-বৃদ্ধির সূহিত সাড়া প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটি সীমায় উপস্থিত হইবে যে, তখন সময় বাড়াইলেও সাড়া অপরিবর্তনীয় থাকিয়া

যাইবে। ইহার পরও কালবৃদ্ধি করিতে থাকিলে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পূর্বোপেক্ষা যুৎ সাড়া দিতে থাকিবে। কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালিপিতে কাল ও সাড়ার পূর্বোক্ত সম্বন্ধ অবিকল ধরা পড়িয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ চিত্র দুইটি প্রাণী ও কৃত্রিমচক্ষুর পূর্ববর্ণিত সাড়ার ছবি। চিত্রের নিম্নস্থ সংখ্যাগুলি দ্বারা আলোকপাতের কাল এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপরকার তরঙ্গরেখাদ্বারা তত্তৎকালের সাড়া-পরিমাণ সূচিত হইতেছে। কালসহকারে সাড়ার পরিবর্তন যে প্রাণী ও কৃত্রিম

চক্ষুতে অবিকল এক, তাহা পাঠক চিত্রদ্বয়ে আলোকপাতকাল আটসেকেন্ড হইতে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশসেকেন্ড পর্য্যন্ত

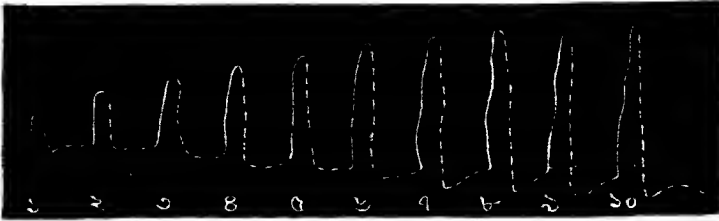
৩য় চিত্র ।

প্রাণিচক্ষুর সাড়া ।



৪র্থ চিত্র ।

কৃত্রিম চক্ষুর সাড়া ।



স্থায়ী করিলেও, উভয়ের সাড়া যে আর বৃদ্ধি পায় না, পাঠক তাহাও চিত্রদ্বয় তুলনা করিলে বুঝিবেন।

সুদীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন আলোকপাতদ্বারা প্রাণিচক্ষুর সাড়া। চরমসীমায় উপনীত হইলে পর যদি আলোকপাত হঠাৎ রহিত করা যায়, তাহা হইলে আর-একপ্রকার বৈজাতিক লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে। অধ্যাপক বসু-মহাশয় ইহাকে after oscillation বা পরা-ন্বোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৪র্থ চিত্রের শেষ অংশে দীর্ঘকাল আলোকপাত-জনিত যে তরঙ্গরেখাগুলি আছে, পাঠক তাহার মূলদেশ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন,—ইহার কতকগুলিতে নিয়মগামী

স্বল্পরেখা চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থাজ্ঞাপক সেই ভূমিরেখাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমে আবার ভূমিরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই পুনরান্বোলনের সূচক। অধ্যাপক বসু-মহাশয় বলেন,—বচক্ষণ আলোকে উন্মুক্ত থাকায় চক্ষুর অণুসকল যখন বিকৃত হইয়া পড়ে, সেই সময় হঠাৎ আলোকপাত রোধ করিলে প্রত্যেক অণুরই প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য একটা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার আধিক্যেই তাহার স্বাভাবিক অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া সাড়ালিপিতে তাহার লক্ষণ অঙ্কিত করে। প্রকৃত এবং কৃত্রিম চক্ষুতে বসু-মহাশয় অবিকল পূর্বোক্ত পুনরান্বোলন আবিষ্কার করিয়াছেন। আগবিক-বিকৃতি-

জাত এই অনিয়মিত সাড়ার ফলে, প্রাণীর যে দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে ।

প্রাণী মরণোন্মুখ বা মৃত হইলে তাহাদের চক্ষুর অণুসকল বিকৃত হইয়া পড়ে, কাজেই গলিতচক্ষে আলোকপাত করিলে যে বৈহ্যাতিক লক্ষণ বিকাশ পায়, তাহা স্নহচক্ষুর সাড়ার সহিত মিলে না । অধ্যাপক বসু-মহাশয় স্নকোশলে কৃত্রিমচক্ষুর আণবিক বিকার উপস্থিত করাইয়া, ঠিক গলিতচক্ষুর সাড়ালিপির অনুরূপ রেখাচিত্র পাইয়াছেন ।

প্রাণিচক্ষে আলোকপাত করিয়া হঠাৎ সেই আলোক রোধ করিলে, কখন-কখন সেই পূর্বের আলোকজাত বৈহ্যাতিক প্রবাহ যথানিয়মে হ্রাস না হইয়া ক্ষণিককালের জন্ত প্রবলতর হইয়া পড়ে । কুনে (Kuhne) এই ব্যাপারের সহিত পরিচিত ছিলেন ।

প্রথম চিত্রের ৪র্থ এবং ৫ম সাড়ালিপিতে ইহা দেখা যায় । অধ্যাপক বসু মহাশয় তদবস্থ কৃত্রিমচক্ষে বৈহ্যাতিক সাড়ার উক্ত উচ্ছ্বলতাও আবিষ্কার করিয়াছেন । ২য় চিত্রের প্রথম সাড়ালিপিতে ইহা প্রদর্শিত হইতেছে । এতদ্ব্যতীত শৈত্যতাপাদিভেদে এবং আলোকের প্রাথমিক অনুরসারে চক্ষে যে পরিবর্তন হয়, কৃত্রিমচক্ষে অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে ।

স্মরণ্য দেখা যাইতেছে, প্রাণিচক্ষু ও কৃত্রিমচক্ষুর উপর আলোকের কার্য অবিকল এক, এবং অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এই একতার ভঙ্গ দেখা যায় না । উভয় চক্ষুর এই ঐক্য অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক বসু-মহাশয় কিপ্রকারে নানা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপত্তিতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন, পরপ্রবন্ধে আমরা তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিব ।

শ্রীজগদানন্দ রায় ।

সাহিত্যের সামগ্রী ।

একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্তই লেখা সাহিত্য নহে । অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখী যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত—পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন ।

পাখীর গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না । না থাকে ত নাই রহিল,

তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ ।

তা বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই । মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্ত, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিবার কোন বাধা দেখি না ।

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই ছোটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে । যে কাঠ জলে নাই,

তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মত নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কথায় বলে ‘মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ’—ভাঙারে কি জমা আছে, তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোন ক্ষতি নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে-হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেই-রকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্ত নহে, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে—এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রকৃতিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্ত, টিকিয়া থাকিবার জন্ত, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই-রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশ ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং

কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহুমনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই, কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোস্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বা দিক্ হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক্ হইতে বায়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অল্প সারে! কি? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিস্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে! আমার বাড়ীবর, আমার আস্বাবপত্র, আমার শরীরমন, আমার স্বপ্নঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

মধ্য এসিয়ায় গোবি-মরুভূমির বালুকা-স্তূপের মধ্য হইতে যখন বিলুপ্ত মানব-সমাজের বিস্তৃত প্রাচীনকালের জীর্ণ পুঁথি বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই অজানা ভাষার অপরিচিত অক্ষরগুলির মধ্যে কি-একটি বেদনা প্রকাশ পায়! কোন্ কালের কোন্ সজীব চিন্তের চেষ্টা আজ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্ত আঁকুপাঁকু করিতেছে। যে লিখিয়াছিল, সে নাই, যে লোকালয়ে লেখা হইয়াছিল, তাহাও নাই—

কিছু মাহুঘের মনের ভাবটুকু মাহুঘের মনের
সুখঃখের মধ্যে লালিত হইবার জন্ত যুগ
হইতে যুগান্তরে আসিয়া আপনার পরিচয়
দিতে পারিতেছে না—হুই বাহু বাড়াইয়া
মুখের দিকে চাহিতেছে ।

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক
আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের প্রতি-
গোচর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে
তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন ।
ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনোকালে মরিবে
না, সরিবে না—অনন্তকালের পথের ধারে
অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিক-
দের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি
করিতে থাকিবে । পাহাড়কে তিনি কথা
কহিবার ভার দিয়াছিলেন ।

পাহাড় কালকালের কোন বিচার না
করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে ।
কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র,
কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের
দিন ! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-
কয়টি বিম্বিত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায়
আজও উচ্চারণ করিতেছে ! কতদিন
অরণ্যে রোদন করিয়াছে,—অশোকের সেই
মহাবাগীও কত-শত-বৎসর মানবহৃদয়কে
বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান
করিয়াছে । পথ দিয়া রাজপুত গেল,
পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি
বিছাতের মত ক্ষিপ্ৰবেগে দিগ্দিগন্তে প্রল-
য়ের কষাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার
ইশারায় সাড়া দিল না । সমুদ্রপারের যে
কুদ্রবীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও
করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে

যখন তাঁহার অমুশাসন উৎকীর্ণ করিতে-
ছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী “দ্রমিদ্”-
গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন
প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু-
সহস্র বৎসর পবে সেই দ্বীপ হইতে একটি
বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মুক ইন্দি-
পাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া
লইলেন । রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা
এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে
সার্থকতলাভ করিল । সেই ইচ্ছা আর কিছুই
নহে, তিনি যত বড় সম্রাটই হউন, তিনি কি
চান্ কিনা চান্, তাঁহার কাছে কোন্টা ভাল
কোন্টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানা-
ইতে হইবে । তাঁহার মনের ভাব এত যুগ
ধরিয়া সকল মাহুঘের মনের আশ্রয় চাহিয়া
পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে । রাজচক্রবর্তীর
সেই একাগ্র আকাজ্ঞার দিকে পথের লোক
কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া
চলিয়া যাইতেছে ।

তাই বলিয়া অশোকের অমুশাসনগুলিকে
আমি যে সাহিত্য বলিতেছি, তাহা নহে ।
উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের
একটা প্রধান আকাজ্ঞা কি ? আমরা যে
মৃষ্টি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা
লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি,
দেশে-বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই
যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই
নয়, মাহুঘের হৃদয় মাহুঘের হৃদয়ের মধ্যে
অমরতা প্রার্থনা করিতেছে ।

বাহা চিরকালীন মাহুঘের হৃদয়ে অমর
হইতে চেষ্টা করে, সাধারণত তাহা আমাদের
ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানা-

প্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে । আমরা সাংসংসরিক প্রয়োজনের জন্তই ধান-যব-গম প্রভৃতি ওষধির বীজ রপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি, তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয় ।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা । সেইজন্ত দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান্ সাহিত্যের অভাব হইতেছে—কেবল নাটক-নভেল-কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁস হয় না । কারণ, সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি ।

কারণ, যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায় । মানুষের জ্ঞানসম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে । কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্ধাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে । যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে, সেই সত্য পুরাতন বেশে বিশ্বস্ত-মাত্র উদ্বেক করে না । আজ যে সকল তত্ত্ব মুঢ়ের নিকটে পরিচিত, কোনকালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় ।

কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না । জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না ; আগুন গরম, সূর্য্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়—দ্বিতীয়বার কেহ যদি

তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মত জানাইতে আসে, তবে ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয় । কিন্তু ভাবের কথা বারবার অমৃতভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না । সূর্য্য যে পূর্ব্বদিকে ওঠে, এক কথা আর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ, তাহা জীবনটির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে অমান আছে । এমন কি, অমৃতভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে, ততই তাহার গভীরতাবৃদ্ধি হয়—ততই তাহা আমাদের সহজে আবিষ্ট করিতে পারে ।

অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিষ মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীন-ভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয় । এইজন্ত সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয় ।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিষ, তাহা এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে । মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেকসময় তাহার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধি হয় । তাহার বিষয়টি লইয়া নানা লোকে নানা ভাষায় নানা রকম করিয়া প্রচার করিতে পারে—এইরূপেই তাহার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইয়া থাকে ।

কিন্তু ভাবের বিষয়সম্বন্ধে এক কথা থাকে না । তাহা যে মুষ্টিকে আশ্রয় করে, তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না ।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়,

আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। উষা যে আরক্তবর্ণ, তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার যে কয়টি উপায় আছে, তাহা জানা শক্ত নহে—কিন্তু উষা আমার যে কেমন লাগিতেছে, তাহা অত্ৰকে ঠিকমত অল্পভব করাইতে গেলে কোনো বাঁধা উপায়ের দোহাই দেওয়া চলে না। যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মত তাহা নির্দিষ্ট নহে। তাহার জন্ত নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা, ভাবের দেহের মত। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অমুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মাল্লবের কাছে আদর পায়—ইহার শক্তি অমুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

প্রাণের জিনিষ দেহের উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। জলের মত তাহাকে এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালা যায় না। দেহ এবং প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে গোরবান্বিত করিয়া একান্ত হইয়া বিরাজ করে।

যেখানে রচনার সঙ্গে তাহার বিষয়ের এইরূপ একাত্মতা আছে, সেইখানেই সাহিত্য সজীবমুষ্টিতে প্রকাশ পায়। কুমারসম্ভবের মধ্যে যে বিষয়টুকু আছে, তাহা জানা হইলেই যে কুমারসম্ভব পড়ার ফল পাওয়া যায়, তাহা নহে। উহার ছন্দোবদ্ধ, উহার আগাগোড়াই পড়িতে হইবে। কুমারসম্ভব ছাড়া আর

কোনখানেই কুমারসম্ভবপাঠের উদ্দেশ্য সফল করিবার কোন উপায় নাই। উজ্জয়িনীতে বসিয়া কত শতাব্দী পূর্বে কালিদাস যে কয়টি কথা লিখিয়াছেন, তাহার একটি অক্ষর বাদ দিলে চলিবে না। তাঁহারই ভাব তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই রচনার ভঙ্গীতে আমাদেরকে সমগ্র আকারে গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার প্রাণহানি হইবে। ইহাই যথার্থ বাঁচিয়া থাকা।

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মাল্লবের। তাহা একজন যদি বাহির না করে ত কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্ত রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়—কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।

দীর্ঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বোঝায়। কিন্তু কীর্তি কোন্টা? জল মাল্লবের সৃষ্টি নহে—তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের জন্ত সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্তিমান্ মাল্লবের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহা বিশেষ মুষ্টিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই লেখকের কীর্তি।

অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের

করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার-জিনিষটা জলে-স্থলে-বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে—গাছপালা তাহাকে নিগূঢ়-শক্তিবলে বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘকাল বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহায এবং উত্তাপের কাজে লাগে, তাহা নহে—তাহা হইতে সৌন্দর্য্য, ছায়া, স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

সাহিত্যের মূল জিনিষটা সেইরূপ অভ্যস্ত সাধারণ। লেখক তাহাকে প্রথমত নিজের করিয়া লন। সেই উপায়ে তাহা মূর্হিগ্রহণ করে, সৌন্দর্য্যলাভ করে, সহজে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়া বিশেষ আকারে স্থায়ী প্রাপ্ত হয়।

সৃষ্টির মূল উপাদান অসংখ্য নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া অসীম বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সাহিত্যেরও মূল উপাদান সীমাবদ্ধ। একই ভাব সহস্র চিত্র হইতে সহস্রভাবে প্রতিকূলিত হইয়া মানুষের আনন্দলোককে নব নব বৈচিত্র্য দান করিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণের জিনিষকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

তা যদি হয়, তবে জ্ঞানের জিনিষ সাহিত্য হইতে আপনি বাদ পড়িয়া যায়। কারণ, ইংরাজিতে যাহাকে টুণ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়—তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ববর্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্ব্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, শুভ্র-নিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অস্ত্রের কাছে অস্ত্ররূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র রুদয়ের নূতন নূতন রঙের ছায়া পড়িবার জো নাই।

যে সকল জিনিষ অস্ত্রের রুদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী রুদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের রুদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অস্ত্র রুদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকার-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাচিতে পারে—তাহা মানুষের একান্ত আপন্য—তাহা আবিস্কার নহে, অন্বেষণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর করা চলে না—তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। সেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হয়।

এমার্সন ।

জীবনের এক অতি ঘোর দুর্দিনে, শোক ও নিরাশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এমার্সনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে কাহিনী কহিতে গেলে, কিয়ৎপরিমাণে আশ্ব-কথা কহিতে হয়; অবস্থাধীনে পাঠক এ অপরাধ মার্জনা করিবেন।

যৌবনের প্রারম্ভে, আর-দশজনের ছায় আমারও জ্ঞানের সমক্ষে জটিল বিশ্ব-সমগ্রতা উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে, লৌকিক ছায় অম্লসরণ করিয়া, বিশ্বমূলে আমি যুগপৎ দুইটি তব প্রতিষ্ঠিত করি—এক জড়ত্ব, অপর চেতনত্ব। জড় ও চৈতন্য, পরমাণু ও ঈশ্বর, উভয়ই অনাদি, উভয়ই অনন্ত, জড়-চেতনার সমাবেশে বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

‘নাসতো সজ্জায়তে’—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ ধারণা বহুদিন হইতেই বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। প্রচলিত খৃষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে এইজন্ত বহুদিনই একেবারে অসিদ্ধ বলিয়া বর্জন করিয়া-ছিলাম। স্বদেশের সৃষ্টিতত্ত্বাদিসম্বন্ধে তখন কোনও জ্ঞানই ছিল না। সুতরাং আশ্চ-চেষ্টা দ্বারাই সৃষ্টিসমগ্রতাবোধের উপায় উদ্ভা-বনে প্রবৃত্ত হই। এই প্রয়াস হইতেই আমার দ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা।

স্থূলদৃষ্টিতে তখন জগতে দুই পরস্পর-বিরোধী অথচ পরস্পরাপেক্ষী বস্তু দেখিয়া-

ছিলাম—এক জড়, অপর চৈতন্য। দুই প্রত্য-ক্ষের বিষয়, প্রত্যক্ষকে অগ্রাহ্য করি কিরূপে? জড়কে যতদিন জড় বলিয়াই জানিবে, ততদিন চৈতন্য হইতে তাহার উৎপত্তি কল্পনাও করিতে পারিবে না। আমিও কল্পনা করিতে পারি নাই। সুতরাং জড় হইতে জড়, চৈতন্য হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়িল।

বিশেষত, কেন বলিতে পারি না, অদ্বৈত-বাদের প্রতি একটা বিকট বিদ্বেষ বহুদিন হইতেই প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এবং অদ্বৈতবাদের বিভীষিকা হইতে আশ্ব-রক্ষা করিবার জন্তই, যৌবনের প্রারম্ভে জিজ্ঞাসার উদয় হইবামাত্র, ঘোর দ্বৈতবাদের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

কিন্তু আমাদের কল্পনারচিত সিদ্ধান্ত কখনই শুদ্ধ তর্কযুক্তির সাহায্যে বেশিদিন স্থির থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষ সত্যই একমাত্র স্থির ও সনাতন সত্য। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার উপরে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠালাভ করে, অভিজ্ঞতার প্রকৃত মর্ম্ম অবিসংবাদিত-রূপে যে সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করিতে পারে, তাহাই অটুট, অচ্যুত থাকে। তাহার বিকাশ হয়, কিন্তু বিনাশ সম্ভবে না।

জীবনের অভিজ্ঞতারূপের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কিতে আমার দ্বৈতসিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল।

যৌবনে আশ্বশক্তির উপরে অটল বিশ্বাস

থাকে। যৌবনে বিকাশোন্মুখ শক্তি ও বৃত্তিসকল মানবকে অপরিমিত শক্তিমদে প্রমত্ত করিয়া রাখে। মানবের অসাধ্য যে কিছু আছে, তখন ইহা কল্পনাতেও প্রায় স্থান-প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সংসারের ভীষণ শক্তিসংঘর্ষের মধ্যে একবার পড়িয়া গেলে, সহজেই সেই কল্পিত আশ্ববিবাস চূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের অকিঞ্চনতা ও অক্ষমতার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আন্তিক-নাস্তিকের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। নাস্তিক্যবাদী ব্রাডলর মুখে পর্য্যাপ্ত এ কথা শুনিয়াছি—
‘Oh, what little, man can do!’ ইহাই মানবের সর্বজনীন অভিজ্ঞতা।

জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের শক্তিমদ যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, ততই মানবের শক্তিসাধোর অতীত এক বিশ্বব্যাপিনী বিধাতৃশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত এই শক্তিকে অন্ধ প্রাক্তন—Blind Fate বলিয়া ভাবিতাম। ক্রমে এই কল্পনা হইতেই এক অনন্তকল্যাণকারিণী বিশ্বশক্তির সত্তায় বিশ্বাসের বিকাশ হইতে লাগিল। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে, আশা ও নৈরাশ্রের সংঘর্ষে এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বসিদ্ধ জড়চতনবাদের ভূমি শিথিল হইল বটে, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত হইল না।

এই একত্বাত্মভূতি যে সময়ে অগ্রে অগ্রে প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে এমার্সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়।

এই অভিজ্ঞতা জন্মিবার পূর্বে এমার্সনকে জানিতাম বটে, কিন্তু ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই।

অদৃষ্টের সন্ধান তখন জৈষৎ পাইয়াছি বটে, কিন্তু দৃষ্টের উপরেও পূর্ণ আশ্বাসই রহিয়াছে। আর থাকিবারই কথা। তখনও স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সুখ ও সন্তোষের পসরা লইয়া জীবনতরঙ্গী মুহমল কালতরঙ্গে আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সহসা একদিন প্রলয়ঝঙ্কার সমুদায় বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট হইয়া গেল। মৃত্যুর স্ফিডেস্ত অন্ধকার চক্ষের নিমেষে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিল। সেই অন্ধকারে, নিরাশার নির্মম নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমার অনিত্যের বিভীষিকা জাগিয়া উঠিয়া, মৃত্যুর ছবিকেও যেন ব্রিয়মাণ করিয়া তুলিল।

সেই দুর্দিনে, সেই মৃত্যুচ্ছায়ায়, সেই বিভীষিকার মধ্যে, এমার্সনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

এদেশের নব্য শিক্ষিতসমাজের আর-দশজনের ছায়া আমিও বহুদিনই এমার্সনের নাম জ্ঞানিতাম; বহুদিন তাঁহার গ্রন্থাবলীও কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম; কিন্তু আশ্বাদন করিতে পারি নাই। ফলত এতাবৎকাল এমার্সনের সঙ্গে আমার মানস-সাক্ষাৎকার হয় নাই। আর গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ পরিচয় ব্যতিরেকে, শুদ্ধ বাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে কোন গ্রন্থেরই নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

জগতের শিক্ষাশুক্রদিগের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ-পরিচয়ব্যাপারটা নিতান্তই দুর্ভাগ্য, কেবল দেবপ্রসাদেই সম্ভব হয়। কারণ সমানে

সমানেই কেবল প্রকৃত চেনাশোনা হইয়া থাকে, আর দেবতার রূপা ভিন্ন প্রাকৃতজনের পক্ষে অলৌকিক প্রতিভার সঙ্গে কোনও বিষয়ে সমতা লাভ করা সম্ভব হয় না। মানবের সৰ্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার ভূমিতে, দৈবক্রমে গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎকার হইলেই কেবল, সেই অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়া, অকৃতী শিষ্য, মহাজন গুরুর তত্ত্বোপদেশের মৰ্গগ্রহণে সমর্থ হয়। এমার্সনের সঙ্গে ও এই ভূমিতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

মৃতাচ্ছাদ্যায় বসিয়া একদিন সহসা বত-কালোপেক্ষিত এমার্সনের গ্রন্থাবলী খুলিলাম। ‘ক্ষতিপূরণ’ শীর্ষক প্রবন্ধের উপরেই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল। তাহার শেষভাগে দেখিলাম লেখা আছে—

Such also is the natural history of calamity. The changes that break up at short intervals the prosperity of men are advertisements of a nature whose law is growth—ইত্যাদি।

অর্থাৎ ঋষট্টনার প্রাকৃত ইতিহাসও এইরূপই। যে সকল অবস্থাবিপর্ধ্যায় মধ্যো লোকের স্বখসৌভাগ্য ভাঙিয়া দেয়, তাহা দ্বারা মানবপ্রকৃতিনিহিত অনন্ত উন্নতির বিধানই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধ যে এই প্রথম পড়িলাম, তাহা নহে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া এমার্সন্ এ সকল কথা লিখিয়াছিলেন, আমার তখনও সে অভিজ্ঞতা হয় নাই। বক্যা কি কখন মাতৃদ্বৈত সত্যভাবে জানিতে

পারে বা পুত্রশোকের মৰ্ম্মযাতনা কোনক্রমে অনুভব করিতে সমর্থ হয় ?

এমার্সন্ এখানে শোকার্ন্তের অন্তর্জীবন-চরিত বিবৃত করিতেছেন; শোকাহত ব্যক্তিই কেবল ইহার গভীর মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে, অপরে তাহা কল্পনা করিতে পারে, ধারণা করিবে কিরূপে ? আর শোকার্ন্ত-মাত্রেই যে বুঝিবে, এমনও নহে। স্বধি-বাক্যের মৰ্ম্মগ্রহণ করা সৰ্ব্বথাই দেবানুগ্রহ-সাপেক্ষ।

এই ক্ষতিপূরণ প্রবন্ধে এমার্সন্ শেষভাগে শোকার্ন্তের কথা কহিয়াছেন। কিন্তু এমন করিয়া শোকার্ন্তকে কেহ সাঙ্ঘনা দিতে পারে, পূর্বে জানিতাম না।

সংসারে শোকার্ন্তের অভাব নাই; সহৃদয় লোকেও সততই শোকার্ন্তকে সাঙ্ঘনা-দান করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার ফল কি হয়, তাহাও অনেকেই জানি। এই সকল সাঙ্ঘনাবাক্যের নির্মীক বেদনা শোকার্ন্তমাত্রেই স্বল্লাধিক ভোগ করিয়া থাকেন।

অসারে সার-বুদ্ধি, অনিত্যে নিত্য-ধারণা হইতেই শোকের উৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু যে আত্মহারা হইয়া অসারকেই বুকে ধরিয়া কাঁদিতেছে, তাহার নিকটে অসারের অসারত্বের অলীক বর্ণনায় শোকের সাঙ্ঘনা হয় না, কেবল প্রীতিরই অবমাননা হইয়া থাকে। অথচ অজ্ঞ অরসিক লোকে সৰ্ব্বদাই শোকা-তুরকে সাঙ্ঘনা দিতে যাইয়া এইরূপ অর্কচীন-ভাবে তাহার প্রীতির অবমাননা করে। অনিত্যের অনিত্যতা দেখিয়া যে সেই অনিত্যেরই জন্ত কাঁদিতেছে, তাহাকে আবার

সেই মর্শ্বঘাতী অনিত্যতা বুঝাইতে যাওয়া অথবা বেদনাদায়ক বিড়ম্বনামাত্র !

অথচ সংসারের লোকে নিয়তই ইহা করিতেছে। ধর্মব্যবসায়িগণ এ বিষয়ে সর্বা-পেক্ষা সমধিক পটু। শোকের সম্মুখীন হইলেই ইহারা অনিত্যতার অসার উপদেশ প্রদানে অগ্রসর হন।

এমার্সন্‌ও শোকাক্তকেই সাহসনা দিতে-ছেন ; অথচ তাঁহার উপদেশে অনিত্যতার অসার বর্ণনা নাই ; শ্মশানবৈরাগ্যের উদ্দীপনা নাই ; স্বাস্থ্য-দৌন্দর্য্য-সম্পদ-সুখ-সন্তোষের প্রতি বিরক্তি নাই ; জীবন-যৌবনের প্রতি নির্মমতা নাই ; শোকাক্ত যাহার জন্ত অবিরাম হাহাকার করে, যাহার পুণ্যস্মৃতি রুদয়ে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়া অশ্রুজলে প্রতিদিন তাহার তর্পণ করে, তৎপ্রতি উপেক্ষা-ঔদাসীন্দ্ৰ্যের লেশমাত্র নাই ; অথচ কি অপূর্ণ অমিয়দ্বারাসেচনের দ্বারা। মৃত্যুর উপরেই অমৃতের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস রহিয়াছে !

প্রেমের সম্বন্ধ কেবলই দানে নহে, গ্রহণেও। আদান ও প্রদানের মধ্যে প্রেম কোনটাতে সমধিক পরিতৃপ্ত হয়, বলা সহজ নহে। সেবা করিয়া যেমন সুখ, সেবা পাই-য়াও তেমনি। এমার্সন্‌ আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে মৃত্যুকেও এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের আদান প্রদানের সম্বন্ধজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যু কি কেবলই ক্ষতির কারণ, লাভ কি তাহাতে কিছু নাই? মৃত্যু হরণ করে অসারকে, কিন্তু দিয়া যায় সারবস্তু ; হরণ করে অনিত্যকে, দিয়া যায় অনন্ত অমৃত।

The death of a dear friend,

wife, brother, lover, which seemed nothing but privation, somewhat later assumes the aspect of a guide or a genius.....and the man or woman who would have remained a sunny garden flower with no room for its roots, and too much sunshine for its head, by the falling of the walls, and the neglect of the gardener is made the banian of the forest, yielding shade and fruit to wide neighbourhoods of men.

বিশ্ববিধানের এই অপ্রতিহত কল্যাণে বিশ্বাস কেবল একছায়াভূতি হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই একছায়াভূতিতেই পাশ্চাত্য প্রতিভাসমাজে এমার্সনের গৌরব ও বিশেষত্ব। এমন করিয়া আর কেহ সে দেশে অনিত্যের মধ্যে নিত্য, অসারের মধ্যে সার, ও মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে দর্শন করিতে পারে নাই। এই একছায়াভূতিই তাঁহার শিক্ষার ও প্রতিভার, জীবনের ও উপদেশের মূলসূত্র। এই সূত্র যে ধরিতে পারিল, তাহারই নিকটে এমার্সনের সমুদয় রহস্য সহজে প্রকাশিত হইয়া পড়িল ; যে পারিল না, চিরদিনই সে তাঁহার প্রতিভার বহিরঙ্গনে পড়িয়া রহিল, অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পাইল না।

এই একছায়াভূতি জগতে অতি বিরল। এইজন্তই এমার্সনের গ্রন্থাবলী পড়ে অনেকে, কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্মগ্রহণ করিতে পারে অতি অল্প লোকে। মার্কিন কবি হুইট্‌ইয়ার বলিয়াছেন যে, সহস্র বৎসর পরে লোকে আমেরিক গ্রন্থকর্তাদিগের মধ্যে কেবল এমার্সনের

গ্রন্থাবলীই সাদরে পাঠ করিবে । কিন্তু হইট-ইয়ার্ এমার্সনের প্রতিভার গৌরব যেরূপ বৃদ্ধিগাছেন, তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাহার শতাংশের একাংশও বৃদ্ধিতে পারে নাই । পারিলে তাহার কখনই হৃৎকেন্দ্রে এমার্সনের উপরে স্থানদান করিত না । যেমন মার্কিনে, সেই-রূপ ইংলণ্ডে । এমার্সন্ ইউনিটেরিয়ান ছিলেন । ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান দলেই তাঁহার প্রতিপত্তি সর্বাধিক, তাহাও স্বগণপক্ষপাতিতামূলক । ইংলণ্ডে এখনও এমার্সনের প্রতিভার গৌরব ও তাঁহার শিক্ষার মূল্য বৃদ্ধিতে সমর্থ হয় নাই ।

ইহাতে বিশ্বের কথা কিছুই নাই । 'ভবানীকুটীভঙ্গ ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ'—ভবানীর কুটীভঙ্গ ভবই কেবল বৃদ্ধিতে পারেন, ভূধর বৃদ্ধিবেন কিরূপে ? এমার্সনের সঙ্গে বাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা, ভাব-আদর্শ কোন-বিষয়েই সমতা নাই, তাঁহার তাঁহার মর্ম্ম বোঝেন না, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

পাশ্চাত্যজগতে প্রথম হইতেই এমার্সন্ একরূপ হ্রস্বোদ্য ছিলেন । মিড্‌ভিল্-তত্ত্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক বারবার-সাহেবের মুখে এ বিষয়ে একটি বড়ই কুতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনিয়াছিলাম ।

বারবার যখন যুবক, হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তখন ব্রহ্ম Brahina নামে এমার্সনের একটি কবিতা প্রকাশিত হয় । সে কবিতাটি এই :—

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near ;
Shadow and sunlight are the same ;
The vanished gods to me appear ;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill, who leave me out ;
When me they fly I am the wings ;
I am the doubter and the doubt,
I am the hymn the Brahmin sings.

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven ;
But thou, meek lover of the good,
Find me, and turn thy back on heaven !

সে সময়ে এই কবিতাটি লোকের নিকটে এমনই হ্রস্বোদ্য হইয়াছিল যে, মার্কিনের শিক্ষিত যুবকেরা বাহা-কিছু অবোধ্য ও অর্থশূন্য, তাহাকেই পরম্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তার পরিহাসচ্ছলে "ব্রহ্ম" বলিয়া ব্যাখ্যা করিত । আজিও শুধু এই বিশেষ কবিতাটি নহে, কিন্তু এমার্সনের অনেক রচনাই ইংরাজ ও মার্কিন সমাজে এই "ব্রহ্ম"পর্যায়ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে ।

স্মৃতিনিবন্ধ সম্বন্ধ এবং ছায়াতপ ও হস্তা-হতের মৌলিক একত্বের অল্পভূতি পাশ্চাত্যসমাজে এখনও নিরতিশয় ক্ষীণ রহিয়াছে । অথচ ইহাই এমার্সনের বিশেষত্ব, এই গভীর অধ্যাত্ম একত্বভূতিতেই তাঁহার ঋষিত্ব । এই একত্বভূতি বাঁহার অন্তরে স্বল্লাধিক জাগ্রত হয় নাই, সে কদাপি এমার্সনের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না ।

এমার্সন্ ঋষি ছিলেন । 'ঋষয়ো মন্ত্রজ্ঞপীঠাঃ'—মন্ত্রের সাক্ষাৎকার বাঁহার লাভ করেন,

তঁাহারাই ঋষি। মস্ত্রে তৎস্বের অভিব্যক্তি ; মন্ত্রদর্শী আর তত্ত্বদর্শী একই কথা। এমার্সন্ স্বষ্টির নিগূঢ়তত্ত্ব আপনার অসাধারণ অধ্যাত্ম অমুভূতির প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

স্বষ্টির তত্ত্ব জড় নহে, অজড় আত্মা ; এই আত্মবস্তু হইতেই, যথা প্রদীপ্ত পাবক হইতে অসংখ্য ফুলিপ্সের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আত্ম-বস্তুতেই তাহার স্থিতি,—আত্মতত্ত্বের এই মহান্দুরণেই বিশ্বের গতি ও পরিণতি। এমার্সন্ এই মহান্দুরণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। এই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল বলিয়াই তঁাহাকে অবোধে ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

আর আত্মচৈতন্য এইরূপে ঐহ্যার স্মুরিত হইয়া থাকে, তঁাহার নিকটে জগতের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইজন্ত ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক নহেন, কিন্তু বিজ্ঞানের পরম তত্ত্বসকল কখন-কখন তঁাহাদের জ্ঞানে আপনি ফুটিয়া উঠে। তঁাহারা দার্শনিক নহেন, কিন্তু লৌকিক দর্শন যে সকল মহাসত্ত্বের অন্বেষণে যাইয়া ঋজুকুটিল বহু পন্থা বৃথা পরিভ্রমণ করে, অনেক সময়ে তঁাহারা সে সকল মহাসত্ত্ব সহজে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। এই অলৌকিক অধ্যাত্ম দৃষ্টিতেই ঋষিগণের ঋষিত্ব। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারাই এমার্সন্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বস্তু ও ঘটনার মধ্যে এক অখণ্ড একত্ব অমুভব করিয়াছিলেন।

যে একত্বামুভূতিতে এমার্সনের বিশেষত্ব ও ঋষিত্ব, যুরোপে তাহা কিয়ৎপরিমাণে নুতন হইলেও, ভারতে নূতন নহে। এই

একত্বামুভূতি ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার বিশেষত্ব ; ইহাতেই আমাদের জাতীয় চিন্তা ও চরিত্রের মৌলিকত্ব। বেদে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ইহার অমুর, উপনিষদে ইহার বিকাশ, পুরাণে ইহার পরিণতি। অতএব পাশ্চাত্যজগতে এমার্সনের শিক্ষা দুর্লভ হইলেও, হিন্দুর নিকটে সেরূপ দুর্লভিগম্য হইতে পারে না।

কিন্তু হর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু বহুদিন আপনার শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সাক্ষাৎ যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে ; সুতরাং যে একত্বামুভূতিতে তাহার জাতীয় সাধনার বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব, তাহা বর্তমান-হিন্দুমাণ্ডলী-মধ্যে স্বল্পাধিক জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্ত হিন্দুও ইংরাজ এবং মাকিনের জ্ঞান এমার্সনের মতগ্রহণে সহজে সমর্থ হয় না। কেবল দৈবামুগ্রহে ঐহ্যারা কোন-প্রকারে সেই সর্বজনীন একত্বের সন্ধানে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তঁাহাদের নিকটেই এমার্সনের প্রতিভা প্রকৃতরূপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

আমিও এই সন্ধানের পথেই এমার্সনের সাক্ষাৎকার লাভ করি। যতদিন যোর জড়বাদী ও দৈতবাদী ছিলাম, এমার্সন্ পড়িতাম বটে, কিন্তু কিছুই বুদ্ধিতাম না। ক্রমে যখন সংসারচক্রের তাড়নায়, শোক ও নিরাশার নিম্নম নিম্পেষণে, আত্মশক্তির উপরে অবিশ্বাস হইয়া এক অখণ্ড অদ্বৈত বিশ্বশক্তির উপরে চক্ষু পড়িতে লাগিল ; জড়-চেতনে, জীবন-মরণে এক অনন্ত বিধাতৃ-শক্তির লীলাচ্ছবি মানসপটে, উষার উত্তির আলোকে জগচ্চিত্রের জ্ঞান, ফুটিয়া উঠিতে

লাগিল ; তখনই প্রকৃতপক্ষে আমার নিকটে এমার্সনের মৰ্ম্মও প্রকাশিত হইতে লাগিল । সংসারমোহে ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে, ধাঁহার ঈষৎ সন্কেত পাইয়া, অন্ধকারে ধাঁহার অমুসন্ধান করিতেছিলাম, এমার্সন্ তাঁহাকেই স্বহস্তে ধরিয়া আমার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন ।

ভারতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞায় এমার্সন্ আমার প্রথম গুরু । এমার্সন্ই গীতোপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের অমূল্য শিক্ষার আমাকে দীক্ষিত করেন । এমার্সন্কে জানিবার পূর্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর-দশজনের জ্ঞান আমার চিত্ত ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনার বাহ্য চাক্চিক্যে সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া ছিল । যুরোপের চরিত্র ও আদর্শকেই মানবজাতির আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম । সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনা, আচার ও আদর্শ, ভাব ও স্বভাব, সকলের প্রতিই একটা অশ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল । অজ্ঞতাজনিত অশ্রদ্ধা যেরূপ উদাম হয়, এ অশ্রদ্ধাও তাহাই ছিল ।

যৌবনের প্রথমে অনাথ দরিদ্রশিশুর জ্ঞান বিদেশে-বিভূমে, পারি ও লণ্ডনের রাজপথে, মায়ামুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম । এমার্সন্ এই প্রবাসী শিশুকে হাতে ধরিয়া, তাহার স্বদেশে আনিয়া, স্বজনগণের মধ্যে রাখিয়া গেলেন । এমার্সনের ঋণ জন্মে শোধ দিতে পারিব না ।

এমার্সন্ এই সকল গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব কোথায় শিক্ষা করিলেন, এ প্রশ্নের সহজত্তর দান করা সহজ নহে ।

এমার্সনের পিতা ধর্ম্মযাজক ছিলেন ।

ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মযাজকগণের পুত্রকাগারে সে সময়ে যে সকল গ্রন্থাদি থাকা সম্ভব ছিল, এমার্সনের পিতৃগৃহেও তাহাই ছিল । কিন্তু খৃষ্টীয় ত্রিহবাদের খণ্ডনে গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি আবশ্যক হয় না । এই সকল গ্রন্থও কেবল আমার তর্কযুক্তিতেই পূর্ণ থাকিত । এমার্সন্ স্বয়ং ধর্ম্মযাজনার জন্ত শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই সকল বাধ্যতাবৃত্তার গ্রন্থাদি তাঁহাকে স্বল্পবিস্তর পাঠ করিতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ সকলের দ্বারা তাঁহার মানসিক জীবন গঠিত হয় নাই । বাল্যকালে শেক্সপীয়ার, মিল্টন্, ড্রাইডেন্, ইয়ং, কলিন্স, বাইরন্, স্কট ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই, ইহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম গুরু ছিলেন । এই মহাকাবিদিগের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে এমার্সনের অধ্যাত্মজীবন বহুলপরিমাণে গঠিত হইয়াছিল । পরিণত বয়সে ইনি জার্মান তত্ত্ববিজ্ঞা ও ভারতীয় শাস্ত্রাদিও কিছু পাঠ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে ।

কিন্তু এই সকলের দ্বারা এমার্সনের বুদ্ধি, রঞ্জিনী বৃত্তি ও আত্মদর্পণ সুমার্জিত হইয়াছিল মাত্র, অন্তর্জীবনের মূল উপদান-সকল তিনি প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎভাবে গভীর অধ্যাত্মবোধের দ্বারা, একদিকে আত্মবস্তু ও অপরদিকে প্রকৃতিদেবীর স্বহস্ত হইতে গ্রহণ করিতেন ।

এমার্সনের জন্মস্থান কনকর্ড (Concord) । কনকর্ডে নদীগিরি ও বনস্থলীর অতি আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় ।

এমার্সনের বাড়ীর সম্মুখেই, রাজপথের পরপারে, কনকর্ড-দর্শনবিদ্যালয়ের পশ্চাতে (Concord School of Philosophy) বহুবৃক্ষরাজিশোভিত পর্বতশ্রেণী। তাঁহার বাটীর অব্যবহিত পশ্চাতে বিস্তীর্ণ গিরি-উপত্যকা, তাহারই প্রান্তদেশে অপর এক পর্বতমালার পাদদেশ ধৌত করিয়া মুহুম্মদ-গতিতে এক কলকলনাদিনী গিরিনদী স্রুত-প্রান্তরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে।

বসন্তে এই বিচিত্র বনস্থলী বর্ণনাভীত শোভাধারণ করিয়া থাকে। সমুখস্থ গিরিপার্শ্ব তখন উচ্ছ্বসিতজীবন তরলতাদির বিচিত্র বর্ণে ও গন্ধে অপার্থিব গোরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পশ্চাতে প্রান্তরভূমি শ্রামলময়ণ তৃণপুঞ্জের অকোমল স্রবমায় ভরিয়া যায়। আতটপ্লাবিনী কল্লোলিনী যৌবনের পসরা লইয়া বহিয়া যাঁহিতে থাকে। আর তাহারই তীরদেশে, সে সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যেন, পর্বতমালা নির্ঝাঁক-নিশ্চল হইয়া অধোমুখে সে নিরুপম রূপরাশি পান করিয়া কৃতার্থ হয়। কবিপ্রতিভা-পরিপোষণের জন্তই যেন বিধাতা কনকর্ডকে এমন করিয়া রচনা করিয়াছেন।

প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাভূমিতে এমার্সনের অধ্যাত্মজীবন আজন্ম অতিবাহিত হইয়াছিল। এমার্সন্ আশৈশবই নীরবে, নির্জনে, এই পর্বত, উপত্যকা, প্রান্তর ও কল্লোলিনীর সহচর হইয়া, তাহাদেরই মধ্যে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনার অধীর্ষত গ্রহাদিতে মানব-জাতির যে সকল প্রাচীন গৌরবকাহিনী অধ্যয়ন করিতেন, এই সকল গিরিনদাদির

মধ্যে কল্পনাচক্ষে তাহারই যেন পুনরভিনয় দর্শন করিতেন। এমার্সনের পুত্রের মুখে শুনিয়াছি যে, এই বনস্থলী এমার্সনের চক্ষে এক মায়াপুরীর জায় দৃষ্ট হইত। It was an enchanted forest or a cloud of witness.

There in a moment they have seen
The buried past arise :
The fields of Thessaly grew green
Old gods forsook the skies.

আমরণ এমার্সন্ প্রকৃতির প্রিয়শিষ্য ছিলেন। স্বদেশীয় যুবকগণকে তিনি সর্বদাই নীরবে, নির্জনে, দিনের মধ্যে অন্তত কিছুকাল, প্রকৃতির সহবাস করিতে উপদেশ দিতেন। বনে-জঙ্গলে একাকী বাইয়া কি করিব—কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিতেন—কান পাতিয়া শুনিও—Listen। প্রকৃতির অমূল্যলনসম্বন্ধে শিক্ষার্থীদিগকে তিনি দুটি উপদেশ দিতেন, এক—একাকী ভ্রমণ করিও—roam alone, অপর—একটা রোজনামচা রাখিও—keep a journal.

এমার্সন্ বলিয়াছেন যে—

In the woods a man casts off
his years as the snake his slough,
and at what period soever of life, is
always a child.

অর্থাৎ বনে-জঙ্গলে, সর্প যেরূপ আপনার খোলস ত্যাগ করে, মানুষ সেইরূপ আপনার বার্ককোর খোঁসা ত্যাগ করিয়া শিশু হইয়া যায়।

আবার—এই বনে-জঙ্গলেই চিরযৌবন বিরাজ করে।

In the woods is perpetual youth.
Within these plantations of God,

a decorum and sanctity reign, a perennial festival is dressed, and the guest sees not how he should tire of them in a thousand years.

আবার এইখানেই আমরা বিবেক ও বিশ্বাস পুনঃপ্রাপ্ত হই।

In the woods we return to reason and faith. There I feel that nothing can befall me in life,—no disgrace, no calamity (leaving me my eyes) which nature cannot repair. Standing upon bare ground,—my head bathed by the blithe air, and uplifted into infinite space,—all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball; I

am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God.

এখানেও আবার সেই গভীর একত্বাত্ম-ভূতি! প্রকৃতি সেই একেরই বিগ্রহ। মানবও তাঁহারই বিগ্রহ। এইজন্তই বিচিত্রতার মধ্যেও প্রকৃতি এক। এইজন্তই রুচি, স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা ও সাধনার অশেষ বৈষম্যের মধ্যেও মানবাত্মা এক। মানবজীবন ও মানবীয় ইতিহাসের ঘটনাবৈচিত্র্যও সেই একেরই প্রকাশ। এই একের সন্ধান ইন্দ্রিতেও যিনি পাইয়াছেন, এমার্সনের মর্ম্ম-গ্রহণে কেবল তিনিই সমর্থ।

শ্রী:—

আজিকার ভারতবর্ষ ।

৩

জাতীয় আন্দোলন

ফরাসী পর্য্যটক যেতঁা কংগ্রেস-প্রভৃতির সঙ্কে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিয়ে দেওয়া যাইতেছে :—

দেশীয় প্রতিবাদকারীদিগের আপত্তি ও প্রার্থনার কথাগুলি “ভাষাশাস্ত্র কংগ্রেসে”র কার্য্যবিবরণী ও কার্য্যপ্রক্রম হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। যাহারা ইংরাজের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যপদ্ধতি অবগত আছেন, তাহারাই এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। তাহারাই ইংরাজি আদর্শে একটি রাষ্ট্রনৈতিক

দল সংগঠনের চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেস-নামক বার্ষিক সভাটি এই আন্দোলনেরই বাহ্য বিকাশ। গোড়ায়, প্রাদেশিক সভা-সমিতিতে, স্থানীয় বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন হয়; যে সকল হুঃখুঃদর্শার কথা সরকারকে জানানো আবশ্যক, তাহার তালিকা প্রস্তুত হয়; সংস্কারের প্রস্তাবসকল আলোচিত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতি বৎসর ডিসেম্বরের শেষে, ভারতবর্ষের কোন-না-কোন বৃহৎ নগরে এই কংগ্রেস-

সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশই হিন্দু; তাহাদের পাশাপাশি অনেকগুলি মুসলমান ও অশান্ত ক্ষুদ্র সমাজমণ্ডলীরও প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ছই একজন পার্শি এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী ও কর্মকর্তা। যাহারা যুরোপের সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা এই প্রতিবাদকার্যের পরিচালক। এই সকল বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যেরূপ পরিপাটি যুক্তিবিহ্বাস করেন, তাহা যুরোপের সর্বোত্তম-শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অরূপ। সিপাহীবিদ্রোহের শ্রায় ইহা কোন বিদ্রোহব্যাপার নহে, ইংরাজকে তাড়াইয়া দেশীয় পূর্বাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই আন্দোলনটি দেশীয় উকিল-মোক্তার-ডাক্তারদিগের নিরূপদ্রব আন্দোলন। যুরোপের প্রচলিত ক্লাউটনৈতিক মূলস্বত্রের দোহাই দিয়া, যাহাতে যুরোপীয় রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে তাঁহারাও একটু স্থান করিয়া লইতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা।

১৮৯৮ অব্দের কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য এইরূপ বলিয়াছিলেন :—“এই কথাটি আপনারা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন যে, আমরা সকলেই ইংরাজ-রাজতন্ত্র-ধরনের পক্ষপাতী। ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থান করা দূরে থাক, আমরা মনে করি, ইংরাজ-রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইলে, আমাদের মহাজর্জগ্যা ও অনর্থ উপস্থিত হইবে। ফলত ইংরাজের প্রসাদেই আমরা ‘জাতীয় ভাবের’ ভাবুক হইতে সমর্থ হইয়াছি; এতদিনের পর এই সর্ব-

প্রথমে আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্রেক হইয়াছে। ইংরাজের প্রসাদেই আমরা জাতিভেদ ও ধর্মভেদ ভুলিতে সক্ষম হইয়াছি; ইংরাজের নিকট হইতেই আমরা একটি সাধারণ ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছি; কেন না, এই কংগ্রেসে আমাদের সমস্ত আলোচনা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়া থাকে। আমরা কিসের জন্ত এত অমুযোগ-অভিযোগ করি? —ইংরাজস্বলভ অধিকার, ইংরাজস্বলভ পদন্যাদা লাভ করিবার জন্তই কি নহে? ‘আমরা ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা’ এই কথা বলিবার অধিকার ও সার্থকতা লাভ করাই কি আমাদের প্রার্থনাদির মূল উদ্দেশ্য নহে?”

এই আন্দোলনের নেতৃগণ এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার সার-মর্মটি এইরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—“আমরা রাজতন্ত্র প্রজা; অস্ত্র উপনিবেশসমূহকে যে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিক আমরা কিছুই প্রার্থনা করি না; কিন্তু আমরা চাহি, যে-সকল মূলস্বত্রের উপর ইংরাজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল মূলস্বত্র আমাদের সম্বন্ধেও কার্য্যত প্রয়োগ করা হয়।”

শ্রাশানাল-কংগ্রেসের প্রার্থনা-তালিকা পাঠ করিলে, একজন যুরোপীয়ের মনে, প্রথমে অমূল্য ধারণাই হইয়া থাকে; কেন না, উহা যুরোপীয় ধরনের দাবীদাওয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উহা একটু বেশিমানাত্রা যুরোপীয়—উহা ভারতবর্ষের পক্ষে ঠিক খাটে না।

এই প্রতিবাদকারীদিগের দলপুষ্টি

করিতে হইলে, ভারতবর্ষে একটা সাধারণ লোকমত থাকা আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, অতি অল্প লোকেই সংবাদপত্রাদি পাঠ করে ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রভাবে ও যুরোপীয়দিগের সহিত বিষয়কর্ষের সংস্রবে, যদি যুরোপীয়মূলভ চিন্তা ও মনোভাব ভারতবর্ষে সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে এই জাতীয় আন্দোলনের অস্তিত্বই থাকিত না। এই সকল সম্পত্তিবিহীন ও পদমর্যাদাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদারীদের অতি প্রাচুর্য না থাকিলে, এই আন্দোলনের কোন বলই থাকিত না। ইহাদের আন্দোলন ও দাবীদাওয়ার সহিত আমাদের মধ্যবিত্ত কৃতবিত্তমণ্ডলীর আন্দোলন ও দাবীদাওয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সকল অসম্ভব ব্যক্তিগণ নূতন কাব্য-পদ্ধতি প্রবর্তিত করিতে চাহে ও নিকাচন-মূলক মন্ত্রিসভার সংগঠন প্রার্থনা করে। * * * ইহার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসাধন হইবারই কথা। বনেদী রাজা-মহারাজা ও যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি সম্মানের উপাধি ইংরাজ-সরকার হইতে লাভ করিয়াছে, কিংবা লাভ করিবার আশা করে, এই আন্দোলনের সহিত তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই। পক্ষান্তরে, শ্রমজীবী-কৃষিজীবী প্রভৃতি নিরক্ষর ইতরলোকেরা স্বীয় দুঃখহর্দশার কারণ কিছুই বুঝিতে পারে না, স্মরণ্য তৎপ্রতিকারের উপায়ও সরকারকে জ্ঞানাইতে পারে না; তাই, এই আন্দোলনে তাহারা যোগ দেয় নাই। আবার, আমাদের কৃতবিত্ত মধ্যমশ্রেণীর

লোকেরা এ সকল বিষয়ে যেরূপ ইতর-লোকের সাহায্য প্রার্থনা করে, এখানকার সেই শ্রেণীর লোকেরা সে-সব কিছু করে না।

নিরক্ষর দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে যুরোপে যেরূপ জাতীয়তাবের ক্ষুধা দেখা যায়, “জাতীয় কংগ্রেস” এই নাম-গ্রহণ-সঙ্গেও, দেশসাধারণ জাতীয়তাব ভারতবর্ষে কুত্রাপি দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতি যত-না বিদ্বেষ, তাহা অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব আরও অধিক। তত্রস্থ বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা আপনাদিগকে পরস্পরের সম্বন্ধে যেন বিদেশী বলিয়া অনুভব করে। এ বড় আশ্চর্যের বিষয়, কংগ্রেসের এই ক্ষুদ্র কৃতবিত্তমণ্ডলীর মধ্যেও এই চিরাগত জাতিভেদের স্থিতি বিলুপ্ত হয় নাই; তবে, কতকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে। এখনও তাহাদের মধ্যে জাতীয় একতার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে-সকল ভাব ও জ্ঞানের কথা প্রাচ্যদেশে কস্মিন্ কালেও জানা ছিল না, তাহাই প্রতিবাদকারীর দল মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ও বক্তৃতা-যোগে দেশময় প্রচার করিতে সক্ষম করিয়াছেন। এই বিরাট চেষ্টার কথা ভাবিতে গেলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়। আবার ইংলণ্ডের জনসাধারণ অল্পকূল না থাকায় “বদেশীয়” দলের পক্ষে কার্যসিদ্ধি আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে আমূল সংস্কারের একটি ক্ষুদ্র দল আছে, তাহারাই এই শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের দাবীদাওয়া সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু ইংরাজজাতীয় অধিকাংশ লোকই ইহার

বিরোধী। দুই-তিনটি উদারনৈতিক ও ছোটো-খাটো ঋষ্টসম্প্রদায়ে জনকয়েক ধর্ম-প্রচারক ছাড়া, ভারতবর্ষেরও সমস্ত ইংরাজ একবাক্যে অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বেরই পক্ষসমর্থন করেন। “স্বদেশী” আন্দোলনের পক্ষপাতী যতগুলি দল আছে, আমি তাহাদের সকল দলের মধ্যেই গিয়াছি; তাহাদের মধ্যে কেবল আমি দুইটি ইংরাজকে দেখিতে পাইলাম। সেই দুইটি ইংরাজকে উহাদের “জাত-ভাই”রা অঙ্গুলীনির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দেয়। একজন ইংরাজমহিলা আমাকে বলিয়াছিলেন—“এই সকল দুষ্ট লোকেরা ভূসম্পত্তির অংশভাগী হইবে, ইহাই তাহাদের একমাত্র অভিসন্ধি।” ইংরাজমহলে সর্বত্রই বাঙালী “বাবু”দিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। প্রতিবাদকারী শিক্ষিত দেশীয়-দিগের মধ্যে উহাদিগেরই সংখ্যা সমধিক।

ভারতবর্ষীয়-ইংরাজের সংবাদপত্রসকল এইরূপ ভাগ করে, যেন তাহারা জ্ঞানশাল কংগ্রেসের কোন সংবাদই রাখে না; তাহারা শুধু এই কথা বলে, ভারতবর্ষসম্বন্ধে “জ্ঞানশাল” অর্থাৎ “স্বজাতীয়” এই শব্দ প্রয়োগ করিবার কোন অর্থ নাই।

ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ মনে করেন, কংগ্রেস কখনই সমস্ত ভারতবর্ষের মুখপাত্র হইতে পারে না। তা ছাড়া, তাঁহারা বলেন, কোম্পানীর শাসন রহিত হইবার পর হইতে, বরাবর ভারতবর্ষে সংস্কারকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে এবং এখনো তাঁহারা সংস্কারের জন্ত উন্মুখ রহিয়াছেন; তবে কিনা, যে-কোন সংস্কারই হউক না কেন, তাহার প্রথম

আরম্ভ স্বয়ং তাঁহাদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

ইংলণ্ডে ও ইংরাজ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত উপ-নিবেশসমূহে কতকগুলি মূলতন্ত্র যে অক্লেশ কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেপক্ষে তাঁহাদের কোন বিরোধ নাই; তবে তাঁহারা বলেন, তাহার জন্ত ভারতবর্ষ এখনো পরিপক্ব হয় নাই। Sir Alfred Lyall ইংরাজ-সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া এইরূপ বলিয়া-ছেন:—“তাঁহারা যেন উদারনীতির বাড়ী-বাড়ি করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতবর্ষকে না দেন। তাহা হইলে প্রজাস্বায়ত্ত শাসনতন্ত্র ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হইবে।

প্রতিবাদকারীদিগেরই সাক্ষ্য অনুসারে, ইংরাজ-সরকারের প্রভাব ও কর্তৃত্বের বলেই, ভারতের একতা সাধিত হইয়াছে। অধিকন্তু, ইংরাজ রাজপুরুষেরা এই কথা বলেন, যে মুহূর্ত্তে ইংরাজের কর্তৃত্ব রহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এই একতাও অন্তর্হিত হইবে। এইজন্তই “সমকালীন-পরীক্ষা” স্থাপনসম্বন্ধে ইংরাজ-সরকার বিধিমত-প্রকারে বাধা দিতেছেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছেন যে, নির্বাচনের নিয়মে মন্ত্রিসভায় কতকগুলি দেশীয় সদস্য গ্রহণ করিবেন; কিন্তু অরাজকতার ছুতা করিয়া তাঁহারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। সংস্কার-কাজ্জলী ভারতবাসীদিগের শিক্ষাপটুতা ও কার্য্যোত্তম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন মত-বিরোধ নাই; তবে তাঁহারা বলেন, ইংরাজ-দিগের এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে,

যাহা ভারতবর্ষের উন্নতিপক্ষে নিতান্তই আবশ্যক । Sir Alfred Lyall বলেন—
 “আমরা ভারতবর্ষে আসিয়াছি রাষ্ট্রীয় স্বনীতি
 শিখাইবার জন্ত, শিখিবার জন্ত নহে ।” ভার-
 তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সমস্ত
 ইংরাজ রাজপুরুষেরা, সমস্ত খ্যাতনামা
 ইংরাজ, এই কথাই পোষকতা করেন ।
 আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, একটি
 ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক আমাদের
 নিকট যে কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার
 উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । যেখানেই
 আমরা একটু উক্কাইয়া দিয়া ইংরাজের মনের
 কথা বাহির করিয়াছি, সেইখানেই সেই সব
 উক্তির মধ্যে পরস্পর নৈকট্য লক্ষিত হই-
 য়াছে । “অবশ্য, ভারতবাসীরা একথা বলিতে
 পারে যে, তাহারা আমাদের কাছে তাড়াইতে ইচ্ছা
 করে না, কেন না, আমরা তাহাদের পক্ষে
 নিতান্তই আবশ্যক । আমাদের থাকাতে যে
 সুবিধা, সে সুবিধাটুকু ভারতবাসীরা খোয়াইতে
 চাহে না, তাহারা আমাদের দ্বারা শুধু ‘পুপিদ্-
 ম্যানে’র কাজ করাইয়া লইতে চাহে ।
 তাহারা রাষ্ট্রসংস্কায় তৎকথার শিক্ষাও
 হইতে চাহে, এবং ভারতরাজ্যের লেখনী ও
 বাকু-বস্ত্র নিজায়ত্ত করিতে চাহে । আমাদের
 সমস্ত অধিকার যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দি,
 তবেই তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় । এই-
 রূপ হইলে, ব্রাহ্মণ-যুবকেরা বস্ত্রের মতো
 আসিয়া আমাদের কর্ণপ্রাথিগণের স্থান অধি-
 কার করিবে ।

কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, আমরা যদি
 আমাদের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করি, তবেই
 ভারতের সাধারণ স্বার্থ রক্ষিত হইবে । কেন না,

আমাদের স্বজাতীয়েরাই এদেশকে একতা,
 শান্তি, ভ্রাতৃত্বাচার ও স্বনীতি প্রদান করিতে
 সক্ষম । আর, আমরা যদি এই দেশের প্রভু
 হইয়া থাকি, তবেই সম্যক্রূপে এই কর্তব্যটি
 পালন করিতে আমরা সমর্থ হইব ।”

—“তবে কি তোমার বিশ্বাস, ভারতে
 যুরোপীয় তত্ত্বাবধান আবশ্যক ?”

—“না, যুরোপীয় নহে—ইংরাজের
 তত্ত্বাবধান আবশ্যক, স্বনীতিমূলক তত্ত্বাবধান
 আবশ্যক ।”

প্রায়ই উক্তরূপ প্রত্যুত্তর ইংরাজদিগের
 মুখে শুনা যায় । কেন না, ইংরাজেরা যুরো-
 পীয় দৃষ্টিতে কিছুই দেখিতে ভালবাসে না ;
 অত্যাচার পাশ্চাত্যজাতির সহিত উহারা এক-
 দলভূক্ত হইতেও চাহে না । তাহাদের দ্বারা
 ভারতে যে সভ্যতাবিস্তার হইতেছে, তাহা-
 দের মতে, উহা ‘ইঙ্গ-শ্রাক্সন্’-সভ্যতা ।”

এক্ষণে আমরা ইংরাজ শাসনপদ্ধতির
 নিগূঢ়ত্ব অবগত হইলাম ; কিসে ইংরাজ
 কর্মচারীদিগের স্বার্থসাধন ও ব্রিটেনীয় ধন-
 ভাণ্ডারের পরিপূর্তি হয়, তাহাই এই শাসন-
 পদ্ধতির পক্ষপাতিগণের একমাত্র চিন্তা ।
 তাহারা বলেন, পার্লেমেন্ট-পদ্ধতি অপেক্ষা
 “জ্ঞানালোক-সমন্বিত অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব”ই
 ভারতের উন্নতিসাধনপক্ষে শ্রেষ্ঠতর
 উপায় ।

ফলত, ইংরাজ-সরকার আধুনিক যুরো-
 পের শাসনসংক্রান্ত মূলতত্ত্বগুলি মানিয়া
 চলেন এবং আসিয়াবাসিন্দ্রলভ পুরাতন পদ্ধতি
 অনুসারে প্রজ্ঞালোষণনীতি অনুসরণ করাও
 উচিত বোধ করেন না । প্রতিবাদকারী-
 দিগের সহিত তাহাদের মূলে কোন মত-

ভেদ আছে, একরূপ বোধ হয় না ; যাহা-কিছু মতভেদ, সে কেবল পদ্ধতি লইয়া ও পাত্রাপাত্র লইয়া । এক্ষণে ইংরাজশাসন ভারতবর্ষে

পূর্ণবলে প্রতিষ্ঠিত ; কেন না, ভারতবর্ষ জাতি-ভেদে বিভক্ত এবং ইংলণ্ডের লোক-মতও বর্তমান শাসনপদ্ধতির সম্পূর্ণ অমুকূল ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

সার সত্যের আলোচনা ।

ভিতর-মহলে প্রবেশের উদ্যোগ ।

পূর্বে প্রবন্ধের শেষভাগে সংক্ষেপে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, “আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্রের সম্মুখে দেখিতে হইবে । বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে ; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক ।” এই কথাটির আশপাশের পরিধিমহলে ঘোরাকেরা হইয়াছে অনেক—এক্ষণে উহার ভিতর-মহলের কপাট উন্মোচন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই চেষ্টা দেখা যাক ।

পোর্টুলা-পুটলি বাঁধিয়া যাত্রীগণ প্রয়াগ-পথে চলিয়াছেন—অতি উত্তম । কিন্তু ঠাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য হ’লে গম্য-স্থানে যাওয়া । গম্যস্থান কোন্ স্থান ? গম্যস্থান হ’লে আনন্দ ;—নিম্নল আনন্দ, সজাগ আনন্দ, প্রশান্ত আনন্দ, পরমানন্দ । যাওয়া হইতেছে কোন্ পথ দিয়া ? তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ দিয়া । তত্ত্বজ্ঞান-পথের পাথের-সম্বল কি ? পাথের-সম্বল হ’লে মূলতত্ত্ব । মূলতত্ত্ব কাকে বলে ? মূলতত্ত্ব হ’লে সেই তত্ত্ব, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের অমুশীলনের

সময় গোড়াতেই (অর্থাৎ পহিলা নম্বরেই) স্বীকার্য্য । দৃষ্টান্ত দেখাও । জ্ঞাতজ্ঞান-জ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব ; কেন না, আত্মজ্ঞান বলিবামাত্রই বুঝায় যে, সে-জ্ঞানের জ্ঞাতাও আপনি—জ্ঞেয়ও আপনি । তবেই হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের অমুশীলনকালে জ্ঞাতজ্ঞান-জ্ঞেয়ের ঐক্য গোড়াতেই স্বীকার্য্য ; এইজন্ত বলিতেছি যে, জ্ঞাতজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব । আত্মজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব—কিস্ত আর-আর জ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব ? যাহা আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, তাহা সকল জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব । প্রমাণ কি ? প্রণিধান করা হোক :—

জ্ঞানের কার্য্যই হ’লে সত্যকে প্রকাশ করা । সত্য কি ? না, যাহা “আছে” বলিয়া ধ্রুব প্রতীয়মান, তাহাই সত্য । কিন্তু “আছে” দেখা-কথা । দেখা-কথা’র মূলে হওয়া-কথা থাকা চাই ; আছে’র মূলে আছি থাকা চাই ; জগতের মূলে আত্মা থাকা চাই । অতএব এটা যখন স্থনিশ্চিত যে, জ্ঞাতজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মার মূলতত্ত্ব, তখন সেইসঙ্গে এটাও স্থনিশ্চিত যে, আত্মার ঐ যে মূলতত্ত্ব জ্ঞাতজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য,

উহা সর্বজগতেরই মূলতত্ত্ব ; কেন না, সর্ব-
জগতেরই মূলে আত্মা জাগিতেছে। একটু
ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে,
আত্মাই সত্য এবং সত্যই আত্মা। ফলেও
দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তুসকলের উপরে-
উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে সত্যে পৌঁছানো
যায় না—বস্তুসকলের আত্মাতে ডুব দিলেই
সত্যের উপলব্ধি পাওয়া যায়।

এ কথা খুব ঠিক যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানক্ষেত্রের
ঐক্য সর্বজগতেরই মূলতত্ত্ব, কিন্তু ঐ মূল-
তত্ত্বটি মস্তিষ্কের ভাঙারে চাবি দিয়া রাখি-
বার জন্ম হয় নাই—কাজে খাটাইবার জন্মই
হইয়াছে। কোন্ স্থানে খাটাইতে হইবে ?
ঐ মূলতত্ত্বটির প্রয়োগ-ক্ষেত্র দুইটি—

একটি হ'চ্ছে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, আরেকটি
হ'চ্ছে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড। কোন্ কাজে খাটাইতে
হইবে ? উহাকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ
করিয়া ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সার্বস্বাদিক ঐক্য
অবধারণ করিতে হইবে ; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে
প্রয়োগ করিয়া বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সার্বস্বাদিক
ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে। এই স্থানটিতে
টিপ্পনীচ্ছলে একটি কথা বলিয়া রাখা নিতান্তই
আবশ্যক মনে করিতেছি ; কথাটি এই :—
বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড বলা হইতেছে
শুদ্ধকেন্দ্র ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনার
অনুরোধে ; প্রকৃত কথা এই যে, বৃহৎ-
ব্রহ্মাণ্ডের নামই সর্বব্রহ্মাণ্ড, এবং সর্বজগতের
নামই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড। সর্বজগতের বাহিরে
তো আর দ্বিতীয় জগৎ থাকিতে পারে না—
বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড থাকিবে
কেমন করিয়া ? ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের
বাহিরে নাই—কিন্তু আছে তাহাতে আর

ভুল নাই ; কেন না, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড আমরা
আপনারাই। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুদ্র-
ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত।

এই যে কথাগুলি বলা হইল, ইহার অন্ধি-
সন্ধি প্রদেশগুলো ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ
করিয়া দেখা যাক্।

বলিলাম যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের
বাহিরে নাই—ভিতরে আছে ; এ যাহা
বলিলাম, এটা এক হিসাবের কথা।
আর-এক হিসাবের কথা এই যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডও
ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে আছে। পুরাণে
গল্পচ্ছলে কথিত হইয়াছে যে, বালক-কৃষ্ণকে
মাটি খাইতে দেখিয়া যশোদা-মাতা তাঁহাকে
যখন হাঁ করিতে বলিলেন, তখন বালক
গেম্বি হাঁ করিল, যশোদা-মাতা কি দেখি-
লেন ? তিনি দেখিয়া অবাক—যে, সমস্ত
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ক্ষুদ্র বালকটির উদরের
অভ্যন্তরে। একথার তাৎপর্য্য আর-কিছু
না—সার্বস্বাদিক ঐক্য। পূর্বে বলিয়াছি
যে, মনুষ্যশরীরে একই সার্বস্বাদিক ঐক্য
মস্তকে যোগাসনে উপবিষ্ট, হৃদয়ে সিংহাসনে
উপবিষ্ট, নাভিকেন্দ্রে কণ্ঠাসনে উপবিষ্ট।
ইহাতে প্রকারান্তরে বুঝাইতেছে এই যে,
শরীরের প্রত্যেক মর্মান্থানে সমস্ত শরীর
অন্তর্ভূত। তার সাক্ষী—যখন মাথা কাজ
করে, তখন মাথার মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর
কাজ করে ; যখন হৃদয় কাজ করে, তখন
হৃদয়ের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে ;
যখন হস্তপদ কাজ করে, তখন হস্তপদের মধ্য
দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে। তবেই
হইল যে, শরীরের প্রত্যেক মর্মান্থানের অভ্য-
ন্তরে সমস্ত শরীর জাগিতেছে। এই যে

একটি লোকপ্রসিদ্ধ কথা যে, পরমাত্মা ঘটে-ঘটে বিরাজমান, এ কথার অর্থও তাই। সার্বাত্মিক ঐক্যস্থরে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের মর্শ্বে-মর্শ্বে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড জাগিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মার অভ্যন্তরে বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা জাগিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাই যদি হইল, পরমাত্মা যদি ঘটে-ঘটে বিরাজমান—তবে সাধনভজনের প্রয়োজন কি? পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্তই তো সাধন-ভজন; তিনি যদি সাধকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন—তবে তো তিনি সাধকের মুঠার মধ্যেই আছেন; আবার কেন তবে সাধন-ভজন? তুমি যে রত্ন চাহিতেছ, তাহা তোমার আঁচলে বাধা রহিয়াছে—তবে কেন তাহার জন্ত এতশত সাধাসাধনা? এ কথার একটা মীমাংসা করার নিতান্তই প্রয়োজন। ইহার মীমাংসা এইরূপ:—

তুমি যে বলিতেছ, পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্ত সাধাসাধনার প্রয়োজন কি? “লাভ করা” বলিতেছ কাহাকে? লাভ করা অর্থাৎ পাওয়া। চাওয়া বাস্তবেরকে “পাওয়া” কথাটার কোনো অর্থ হইতে পারে কি না? মনে কর যে, ফিন্কি-ফিন্কি বৃষ্টি পড়িতেছে—আর সেই সময়ে একজন হৃষীকর্তৃ পথিক এক-গণ্ডু বজলের জন্ত হাত বাড়াইল; কিন্তু তাহার অঙ্গলিপুটে এক-ফোঁটা জল পড়িল, আর, তাহার পরেই বৃষ্টি ধরিয়া গেল। পথিক বলিল—“জল পাইলাম না”; তাহার কিয়ৎ পরে মুহলদারের বৃষ্টি আরম্ভ হইল; পথিক হাত পাতিবানাত্ৰই এক-গণ্ডু জল পাইল। তখন পথিক বলিল—

“জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম।” পূর্বে তাহারই হস্তে এক-ফোঁটা জল নিপতিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাহারই হস্তে এক-গণ্ডু জল নিপতিত হইল। অথচ সেবারে পথিক বলিয়াছিল—“জল পাইলাম না”, এবারে বলিল—“জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম”। দুই বারের দুইরকম কথার তাৎপর্য কি? সেবারে পথিক বাহা চাহে নাই, তাহাই তাহার হস্তে পড়িয়াছিল; এবারে পথিক বাহা চাহে, তাহাই তাহার হস্তে পড়িল;—এই তাহার তাৎপর্য। পাওয়ার সতিত চাওয়ার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চাওয়া তিনরূপ;—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া এবং বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া হ’লে ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া হ’লে অমুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া হ’লে অবধারণ। মনে কর, ত্রিপাস্তুর মাঠের মাঝখানে পথিকের প্রাণ জলের জন্ত ব্যাকুল হইল; মন জলের অমুসন্धानে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখে একটা নদীর মত দৃশ্য দেখিল, কিন্তু তাহা মরীচিকাও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। মন বলিতেছে, উহা মরীচিকা কি জল, তাহা আমি জানিও না, জানিতে চাহিও না; জলেই আমার প্রয়োজন—মরীচিকার আমার প্রয়োজন নাই, অতএব উহা জলই। শেক্সপিয়ার এক স্থানে বলিয়াছেন “এটা তোমার মনের ইচ্ছামুখারী চিন্তা—তোমার Wish is father to thy thought, ইচ্ছাই তোমার চিন্তার জননিতা।” মন বাসনাকেই সমীপে বরণ করিয়া সত্যাসত্যের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। বুদ্ধি কিন্তু মনের মন-ভুলানিয়া কথায় সম্ভাষণ মানিতে পারে না। বুদ্ধি বলে, “বাহা দেখা যাইতেছে, তাহা

সত্যসত্যই জল কি মরীচিকা, তাহা সর্বত্রই
বিসেচা ।* এখন বক্তব্য এই যে, বাকু-
লতার ধাপ হইতে অনুসন্ধানের ধাপ এবং
অনুসন্ধানের ধাপ হইতে অবধারণার ধাপে
উদ্বিগ্ন যখন ইষ্টবস্তুকে হস্তে নাগাল পাওয়া
যায়, তখন তাহারই নাম প্রকৃত পাওয়া ।
আপাতত ভক্তদিগের প্রাণের চাওয়া স্বভা-
বত কোন দিকে টেনুখ হয়, তাহা পরীক্ষা
করিয়া দেখা যাক্, তাহার পরে তাহার তত্ত্ব-
সন্ধান প্রবৃত্তি তওয়া ঘাইবে ।

দিগ্ভিন্রূপণ ।

এটা একটা দেখা কথা যে, ভক্তগণের
প্রাণের চাওয়া যখন তাঁহাদের ইষ্টদেবতার
প্রতি উন্মুখ হয়, তখন তাঁহাদের চক্ষের
চাওয়া স্বভাবতই আকাশের প্রতি নির্বিষ্ট
হয় । ভক্তেরা পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপী
জানিয়াও তাঁহাকে ডাকিবার সময়, বা স্মরণ
করিবার সময়, বা ভজনা করিবার সময় কর-

জোড়ে উপরে দৃষ্টিপাত না করিয়া ক্ষান্ত
থাকিতে পারেন না । তা ছাড়া, স্থষ্টির এক
আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে,
বৃক্ষের মূল ভূতলে প্রোথিত ; সন্ন্যাসপ জন্তু-
দিগের শরীর ভূপৃষ্ঠ অবলম্বিত ; গো-মেঘা-
দির শরীর পৃথিবী হইতে অর্কোন্নত ; মনুষ্যের
শরীর পূর্ণসম্মত । মনুষ্য বৃক্ষের ঠিক উল্টা-
পিট এবং অস্ত্রাজ জন্তুরা ভয়ের মধ্যবর্তী ।
তার সাক্ষী—বৃক্ষের মস্তক নিম্নমুখ, হস্তপদ
বা ডালপালা উর্দ্ধমুখ, মনুষ্যের মস্তক উর্দ্ধ-
মুখ, হস্তপদ নিম্নমুখ । মনুষ্যের মস্তক যেমন
স্বভাবতই উর্দ্ধমুখ, ভক্তগণের প্রাণের চাও-
য়াও তেমনি স্বভাবতই উর্দ্ধমুখ । উপনিষৎ-
শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে, “তদ্বিক্ষোঃ পরমং
পদং সনা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্ ।”
সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্বদা দেখেন হরীগণ
—গগনমণ্ডলে যেন চক্ষু আতত । অর্থাৎ
গগনমণ্ডল যেন চক্ষু স্থান ।*

* এখানে ভাব্যাসব্দকে দুইটি কথা বক্তব্য । প্রথম কথা এই যে, আকাশশব্দের প্রকৃত অর্থ গগন নহে ;
আকাশশব্দের প্রকৃত অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে বলে space । তেমনি দো-শব্দের অর্থ space বা আকাশ নহে ;
দো-শব্দের অর্থ sky বা heaven । এইজন্য “দিবি”-শব্দের অর্থ আমি “আকাশে” না করিয়া, করিলাম “গগন-
মণ্ডলে” । ভূত্বের বিষয় এই যে, স্বর্গীয় পাতনামা রাজসুন্দরাল মিত্র পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ করিতে
গিয়া স্বরচিত পুস্তকের স্থানে স্থানে আকাশ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন sky । ঘটাকাশ কি ঘটাবচ্ছিন্ন sky ? ঘটাকাশ-
শব্দের অর্থ ঘটাবচ্ছিন্ন space, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই । শাস্ত্রীয় বচনসকলের ঐরূপ বিপরীত অর্থ ঘট-
টলে শাস্ত্রের আশে যে কিরূপ মন্বাদিত্বক আঘাত করা হয়, তাহা বলিবার কথা নহে । অতএব, শাস্ত্রের অনুবাদ
করিবার পূর্বে কোন শব্দের কোনটি মুখ্য অর্থ—কোনটি গৌণ অর্থ—কোনটি আদিম অর্থ—কোনটি আধুনিক
অর্থ—কোনটি বাঙালি অর্থ—কোনটি সংস্কৃত অর্থ—এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়া এবং অনু-
সন্ধান করিয়া দেখা অনুবাদের নিত্যমুখ্য কর্তব্য । সংস্কৃতশব্দের বাঙালি অর্থ এবং সংস্কৃত অর্থের মধ্যে অনেক স্থলে
প্রভেদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । উপস্থাপনশব্দের বাঙালি অর্থ উপকথা, সংস্কৃত অর্থ hypothesis । যদি
বল “কোথা হইতে পাইলে ?” তবে ভ্রমণ কর ;—স্থাপন-শব্দের অর্থ স্থাপন করা । স্থাপন ধন কি ? না, যাহা
আপাতত কোনো ব্যক্তির হস্তে স্থাপন করা যায় ; সে ধন কাহার প্রকৃত প্রাপ্য, তাহা পরে বিচার্য্য । উপস্থাপন কি ?
না, যে কথা উপস্থাপিত করা যায় অর্থাৎ আপাতত আনিয়া দাঁড় করানো হয় ;—তাহার সত্যাসত্য পরে বিচার্য্য ।
hypo = উপ, thesis = স্থাপন বা স্থাপন । hypothesis = উপস্থাপন বা উপস্থাপন । পুণ্ডিত বিদ্যার প্রধান
একটি পোষ এই যে, “যাহা পুণ্ডিতে পাওয়া যায় না, তাহা মিথ্যা জল্পনা, স্বতন্ত্র উপকথারই সামিন” এইরূপ একটি
ধারণা । বঙ্গীয় সাধুভাবার সূ-মণ্ডিত পুণ্ডিত বিদ্যার বিদ্যাবাগীশ ছিলেন । তাঁহার বৈজ্ঞানিক hypo-
thesis-এর মূল্য কিছুই বুঝেন না । স্বতন্ত্র hypothesis বা উপস্থাপন তাহাদের নিকটে মিথ্যা জল্পনা ছাড়া—
উপকথা ছাড়া—মার কিছুই হইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না । কিন্তু সংস্কৃতগ্রন্থে “যদেতৎ তদা উপস্থাপনম্” ইহার

ঈশ্বর সর্বব্যাপী—অথচ আমরা তাঁহাকে
প্রাণ ভরে' ডাকিবার সময় স্বভাবতই উপরে
দৃষ্টিপাত করি, ইহার কারণ কি? ইহার

কারণ দুই—এক ছত্রে বলিয়া বুঝাইবার কথা
নহে; অতএব এবারে এইখানেই বিশ্রাম করা
বিধেয়।

ত্রিবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বক্ত্রিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়।

১

২

অতি পুরাকাল হইতে পৌণ্ড বর্ধনরাজ্যের
সুধৈবর্ধন্যের কথা ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল।
পদ্মাবতীর তীরবর্তী উত্তরবঙ্গের উর্ধ্বরক্ষেত্র
ধনধান্তে পরিপূর্ণ বলিয়া পার্শ্বতা অসভ্য-
জাতির উপদ্রবের অভাব ছিল না। তাহার
সময়ে সময়ে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল হইতে সহস্রা
আপত্তিত হইয়া দেশলুণ্ঠন করিয়া পলায়ন
করিত। এই উপদ্রব নিবারণের জন্ত উত্তর-
বঙ্গের অধিপতিকে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত
 থাকিতে হইত। উত্তরবঙ্গের পূর্বাংশে সে-
কালের কামরূপরাজ্য করতোয়া-নদীর পূর্ব-

তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের সহিত
পৌণ্ড বর্ধনরাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহের অভাব
ছিল না। এই সকল বিপ্লবে নিয়ত বিপর্য্যস্ত
হইয়া উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল শান্তিস্থখে বঞ্চিত
 থাকিয়া গোড়ীয়া হিন্দুসাম্রাজ্যের অধিকার-
ভুক্ত হয়। তৎকালে বিহার, মিথিলা, রাঢ়,
বাগড়ী, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এক শাসনক্ষমতার
অধীন হইয়া আর্য্যাবর্তের পূর্ব প্রান্তের
বিখ্যাত সাম্রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।
এই সাম্রাজ্যের শাসনকৌশল ও বাহুবলের
কথা এখনও কোন কোন পুরাতন খোদিত-
লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল

অর্থ “এই বাহা তুমি উপস্থাপন করিলে বা উপস্থাপন করিলে বা আনিয়া ঠাঁড় করাইলে” এ ছাড়া আর কিছুই
হইতে পারে না। hypothesis তো আর গাছে কলে না;—বাহা আনিয়া ঠাঁড় করানো হয় এবং বাহার সত্য-
সত্য পরে বিচার্য্য—তাহারই নাম hypothesis। আমার জ্ঞানে আমি কোনো সংস্কৃতগ্রন্থে উপস্থাপনশব্দ উপকথা
অর্থ ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। আমাদের সকলের আরব্য উপস্থাপনের নাম কথাসরিৎসাগর; তা বই, তাহার
নাম উপস্থাপনসরিৎসাগর নহে। সংস্কৃতভাষায় উপস্থাপন বটে উপকথারই সমোদর। কিন্তু উপস্থাপন-কথাটা (হেতু,
নিগমন, সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির জ্ঞান) জ্ঞানশাস্ত্রের নিজাধিকারের গণ্ডির ভিতরকার কথা, তাহার অর্থ উপকথা
হইতেই পারে না। উপন্যাস তো ন্যায়শাস্ত্রীয় কথা; অনেকানেক লৌকিক ব্যবহায়া সংস্কৃতকথার অর্থ বাংলা
ভাষায় উচ্চাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যুগ্ম-শব্দের অর্থ কৃপা, নিযুগ্ম-শব্দের অর্থ নির্দয়। নিযুগ্ম-শব্দের অর্থ অনেকে
বোঝেন এই যে, বাহার মেদা নাই। যুগ্ম-শব্দের গৌণ অর্থ নিম্নিত—তাহা তো হইতে পারে। ইংরাজিতেও
বলা হইয়া থাকে pitiable case, miserable wretch ইত্যাদি। I pity you একথার ঠিক অর্থ এই যে,
আমি তোমাকে যুগ্ম করি। কিন্তু I hate you একথার অর্থ সন্ত্র। যুগ্ম এবং ঘেরের মধ্যে বিশাল প্রভেদ।
বাঁহারা তিন শব্দে এক শ করিয়াছেন, দুই ব'কে এক ব করিয়াছেন, দুই ন'কে এক ন করিয়াছেন, তাঁহারা যে,
উপন্যাস এবং উপকথার মিশাইয়া, যুগ্ম এবং ঘেরে মিশাইয়া, আকাশে এবং গগনে মিশাইয়া খিচুড়ি পাকাইবেন,
তাঁহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

কবিতানিবন্ধ স্তম্ভপাঠ্য বর্ণনায় নানা অতি-শ্লোকিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও, তাহার মূলে কিছু-না-কিছু সত্যসংশয় থাকা অসম্ভব হইতে পারে না । কিন্তু গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের এই প্রবল প্রতাপ দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান থাকা বিশ্বাস করা যায় না । পাল-নরপালগণের সহিত সেন-ভূপালগণের সাম্রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধকলহের স্রষ্টাপাত হয়, তাহাতে গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য অবার বিপ্লবের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল । অবশেষে পাল-নরপালগণের গোড়ীয় সাম্রাজ্য সেনবংশোদ্ভব ভূপতিবর্গের করতলগত হয় । তাহারাই গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত । কিন্তু কোন্ সেনভূপতির শাসনসময়ে বক্তিত্যার খিলিজি বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন, তাহা অত্ৰাপি নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হয় নাই । সাধারণত লাক্ষ্যসেনের শাসনসময়ে এই বিপ্লব সংঘটিত হইবার কথা ইতিহাসে বাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা সহজ নহে । কারণ লাক্ষ্যসেন নামক কোন সেনবংশীয় নরপালের এ দেশের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

সেনরাজবংশের ইতিহাস ক্রমে জনশ্রুতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে । তাহারাই কি স্রষ্ট্র কোন্ সময়ে গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যে অধিকারচ্যুত হন, তাহার সকল কথাই এখন উপকথার স্রায় নিতান্ত বিশ্বাস্যবহ হইয়া উঠিয়াছে । ঘটক ও কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে এই রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

যায়, তদ্বারা ঐতিহাসিক অল্পসন্ধিসা পরি-তৃপ্ত হয় না । এ পর্য্যন্ত যে সকল পুরাতন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বর্তমান নাই । ঐ সকল প্রাচীনলিপি অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়,—কর্ণাটকদ্রিয়বংশে চন্দ্রবংশীয় বীরসেননামক কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন ; তাহারই বংশধরগণ কালক্রমে গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । এই বীরসেন কোন্ সময়ে প্রাচ্যভূত হন, তিনি কখনও এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন কি না, এ সকল বিষয়ে প্রাচীন লিপিতে কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না । তথাপি কেহ কেহ অল্পমানবলে বীরসেনকে আদিশূর বলিয়া কল্পনা করিতে ক্রটি করেন নাই । সমস্ত পুরাতন-লিপিতে বীরসেন সেনবংশের সুবিখ্যাত আদিপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত ; কিন্তু তিনি কোন্ পুরাকালে বর্তমান ছিলেন, তাহার পরিচয় কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

লাক্ষ্যসেনদেব যে সকল তাম্রশাসন খোদিত করাইয়াছিলেন, তাহাতে বীরসেনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না । তিনি চন্দ্রবংশের সুবিখ্যাত নৃপতিকূলে সেনরাজবংশের ক্ষেত্র-স্বরূপ হেমন্তসেনের জন্মগ্রহণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । যথা :—

সেবাবনব্রূপকোটকিরীটরোটি-

রঘুসংপদনখদ্ব্যতিবল্লরীভিঃ ।

তেজোবিষম্বরমুখো বিষতামভুবন

ভূমিভূজঃ ক্ষুণ্টমখোবধিনাথবংশে ॥

আকোমারবিকসরৈর্দিশি দিশি প্রতদ্বিভর্দৈর্দিশঃ-

প্রাণেয়ৈ রিপুর্নাজবন্তনলিনয়ানীঃ সম্মীলয়ন ।

হেমন্তঃ ক্ষুণ্ণমেব সেনজননক্ষেত্রৌষপুণ্যাবলী-
শালিরায্যবিপাকপীবরণস্তেষামহৃৎশংখঃ ॥”

এই হেমন্তসেনের পুত্রের নাম বিজয়-
সেন । তিনি “বিজয়ী” বিশেষণে বর্ণিত হইয়া-
ছেন । বিজয়সেনদেব রাজসাহীর অন্ত-
র্গত বরেন্দ্রভূমে প্রত্নাশ্মেধরনামক-শিব-মন্দির
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে যে ফলকলিপি
সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কৃত হইয়া
এসিয়াটিক্-সোসাইটি-কর্তৃক সুরক্ষিত হই-
য়াছে । উক্ত ফলকলিখিত কবিতাবলী
অবিখ্যাত উমাপতির রচিত বলিয়া ফলকে
খোদিত আছে । তদনুসারে বিজয়সেনদেবের
বরেন্দ্রভূমে অধিকার স্থাপন করা জানিতে
পারা যায় । বিজয়সেনের পুত্র স্বনামখ্যাত
বল্লালসেন যে “দানসাগর”নামক গ্রন্থ রচনা
করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পিতা বিজয়সেনের
বরেন্দ্রভূমে প্রাচুর্য হইবার কথা লিখিত
আছে । এই সকল কারণে লক্ষণসেনের
তাম্রশাসনে বিজয়সেনকে “বিজয়ী” বলিবার
বিশেষ কারণ থাকা অসম্ভব করিতে হয় ।
এই সকল পুরাতন লিপি সমালোচনা করিয়া
স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়,—সেনরাজবংশের
বিজয়সেনদেবই বরেন্দ্রবিজয়ী প্রথম নর-
পতি । তাঁহার পুত্র বল্লাল ও পৌত্র লক্ষণ-
সেন গোড়রাজ্য সম্পূর্ণরূপে করতলগত করিয়া
গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
বিজয়সেনও গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন,
কিন্তু তখনও সমগ্র গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য
পালবংশের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া
বোধ হয় না ।

সেনরাজবংশের বিবিধ পুরাতন-লিপি
আলোচনা করিয়া যে ঐতিহাসিক তথ্য লাভ

করা যায়, তাহাতে বিজয়, বল্লাল ও লক্ষণ-
সেনের সময়ে সেনসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পরি-
চয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । লক্ষণসেনের সময়ে
কাশীরাজ্য পর্য্যন্তও যে তাঁহার প্রবল প্রতাপ
জয়যুক্ত হইয়াছিল, লক্ষণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ-
সেনের তাম্রশাসনে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত
হওয়া যায় । বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে
“স গর্গযবনাশ্বরপ্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ” বলিয়া
বর্ণনা পাঠ করিয়া স্বীকার করিতে হয়,—
লক্ষণের পুত্র বিশ্বরূপের সঙ্গে ঘোড়ীবাণী-
দিগের যুদ্ধকলহ উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ
জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং যবনগণ তাঁহাকে
প্রলয়কালরুদ্ররূপে দর্শন করিতেন । মুসল-
মানের ইতিহাসে স্পষ্টত ইহার উল্লেখ না
থাকিলেও, প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকৃত
হইয়াছে । কারণ মুসলমানলেখক মিন্‌হাজ-
উদ্দীন বক্ত্রিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ষষ্টি-
বৎসর পরে এদেশে পদার্পণ করিয়া তখনও
পূর্ববঙ্গ সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত আছে,
দেখিয়া গিয়াছেন । বাহবলে বক্ত্রিয়ার খিলি-
জির আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিলে,
ইহা কদাচ সম্ভব হইত না ।

লক্ষণসেনের পর তদীয় পুত্রগণের শাসন-
সময়েই যে বক্ত্রিয়ার খিলিজি এদেশে অধি-
কার-বিস্তারের আয়োজন করেন, পুরাতন-
লিপি অনুসরণ করিলে তাহাই বিশ্বাস করিতে
হয় । কোন্ সময়ে বক্ত্রিয়ার প্রথমে এই
কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে
বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক ।

মুসলমানলিখিত ইতিহাসে খৃষ্টীয় ১২০৫
সালের সমকালে বক্ত্রিয়ার খিলিজির নিহত
হইবার কথা দেখিতে পাওয়া যায় ; তৎপূর্বে

তাহার ষাটশবৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করিবার কথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বর্ণনা সত্য হইলে, বক্তিরার খিলিজির ১১২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পদার্পণ করা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মুসলমান-ইতিহাস সমালোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ মহাত্মা বিভারিজ ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ ১১২৮ খৃষ্টাব্দের সমন্বয়ে বক্তিরার খিলিজির বঙ্গাগমনের কাল নির্দেশ করিয়াছেন।

সুতরাং নিকট হইতে লক্ষণাবতী অধিকার করিবার ক্ষমতাপন্ন পাইবার ষাটশবৎসর পরে বক্তিরার খিলিজির মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া অসম্ভব করিতে পারিলে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। তাহা হইলে ১১২৩ খৃষ্টাব্দে সনন্দলাভ, ১১২৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাগমন ও ১২০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন স্থির করিতে হয়। ইহাতে বঙ্গাগমনের উদ্দেশ্যে ৫১৬ বৎসর, লক্ষণাবতী-অধিকার ও শাসন-সংস্থাপনে ৫১৬ বৎসর অতিবাহিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার সহিত অষ্টাদশ অধারোহীর বঙ্গবিজয়কাহিনীর সামঞ্জস্য নাই।

এই ষাটশ বৎসরের ইতিহাসই প্রকৃত-পক্ষে বিশেষভাবে অসম্ভব করা আবশ্যক। মিথিলাপ্রদেশ একদা গোড়ীয়া হিন্দুসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; তথায় অতীত লক্ষণসেনের সংবৎ প্রচলিত আছে। ১১১২ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত সংবৎ প্রচলিত হওয়া অনেক সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা সত্য হইলে, ৮০ লক্ষণ-সংবৎের সমন্বয়ে বক্তিরারের বঙ্গদেশে পদার্পণ করা স্বীকার করিতে হয়। মিন্-হাজের গ্রন্থেও এই কথাই লিখিত আছে। মিন্-হাজ বলেন, এই সময়ে লক্ষণসেন জীবিত

ছিলেন। তাহা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, লক্ষণসেনদেবের পরিণত-বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বল্লাল ও লক্ষণসেনের বিরচিত যে সকল কবিতা অতীত বিদূষ হইয়া নাই, তাহাতে এই প্রমাণ দেদীপ্যমান। সুতরাং লক্ষণসেনের পরিণতবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮০ বৎসর রাজ্যভোগ করা সত্য হইলে, তাহার পরমায়ু অত্যধিক হইয়া পড়ে।

বল্লালসেন ‘দানসাগর’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার পুত্র ও পৌত্রগণও কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। লক্ষণসেনদেবের মহাসামন্তাধিপতি বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে নবদ্বীপে রাজকাৰ্য্যে লিপ্ত থাকিয়া “সহজ-কর্ণামৃত” নামে যে কাব্যসংগ্রহ সংকলিত করেন, তাহাতে লক্ষণ ও তৎপুত্র মাধবসেনের কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ও নবদ্বীপ যে মুসলমানের করতলগত হয় নাই, “সহজ-কর্ণামৃত”ই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। লক্ষণসেনের পুত্রদিগের মধ্যে মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপের নাম সুপরিচিত। মাধবের নাম সহজ-কর্ণামৃতে, কেশবের নাম ঘটক-দিগের গ্রন্থে ও বিশ্বরূপের নাম তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তিন পুত্র পিতৃ-রাজ্যের তিন বিভাগে রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়। ঘটকদিগের গ্রন্থে কেশবের পৌড়ে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা স্পষ্টই লিখিত আছে। মাধব রাঢ় ও বিশ্বরূপ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেশবের যবনাক্রমণ-ভয়ে ব্রাহ্মণগণ সমগ্র দেশে পলায়ন করা

ঐক্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধব বোধ হয় বক্তৃত্বের পরলোকগমনের পর পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে কথা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ব-রূপ যবনাক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণের আলোচনা করিলে, বুদ্ধ লক্ষণসেনকে পলায়নকলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে সাহস হয় না। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তৃত্বের খিলিজির বঙ্গবিজয়েও আত্মস্থাপন করা কঠিন হইয়া উঠে। রাঢ় ও বরেন্দ্র জয় করিবার পূর্বে প্রথমেই নবদ্বীপ জয় করিবার কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বাঙলার ইতিহাসের এই অংশ এখনও কমসাহস্র। যে সকল তাত্ত্বশাসন, প্রস্তরদিপি ও প্রাচীনপুস্তকে এই সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তেগুলি জন-সমাজে সুপরিচিত না থাকায়, বিদ্যালয়ের

পাঠ্যপুস্তকে নানা কথা লিখিত হইয়া থাকে।

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের ইতিহাস সকলনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল বিষয় অধ্যয়ন ও আলোচনা করা আবশ্যিক, তাহা শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। যতদূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে লক্ষণসেনদেবের শাসনকাল সেনরাজবংশের ইতিহাসের গোত্রবোজ্জল মুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই যুগে ধর্ম্মাধিকার হলায়ুধ, বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম ঐতিহ্য বিবৃদ্ধমণ্ডলীর পাণ্ডিত্যে বরেন্দ্রদেশ ভারতবিখ্যাত হইয়াছিল; এই যুগে লক্ষণসেনের বাহুবলে কাশী, কলিঙ্গ ও কামরূপ গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। বক্তৃত্বের খিলিজি এই বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাংশমাত্র অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—তজ্জন্ত লক্ষণাবতীতেই মুসলমানদিগের প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

আশ্রয় ।

শুনি দূরে শুনি কাছে তব গানে ছেয়ে আছে
শুভ্র জল স্থল
সারাবিশ্ব অভিনব রূপের প্রভাস তব
করে ঢলঢল ।
তোমার মধুর হাসি এ হৃদয়ে ঢালে আসি
অরুণ কিরণ
তব সুখগন্ধ ব'য়ে বিহ্বল পরাণ ল'য়ে
অনিছে পবন ।

লিখ ভালে প্রীতি-লেখা হান গো বিজলী-রেখা
মোহতম নাশি' ।

তব দিব্য কর হানি' কঠিন বেটনী টানি'
রাখ মোরে রাখ
বিশ্ব হ'তে বহদুরে আমার আনন্দপুরে
থাক একা থাক ।

এ জীবন-নিশি-শেষে মধুবেশে মূহ হেসে
দিয়ে পাশে স্থান
তুমি নিয়ে ভালবাসা হৃদয়ের প্রেম আশা
ঘেটুকু সম্মান ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

চাক্চন্দা ।

খাস বাড়লায় সেকালের গুরুনহাশয়ের দিন-
কাল গিয়াছে, কিন্তু বেহার-অঞ্চলে এখনও
তিনি শিশুমহলের সন্মাত্র । বঙ্গীয় পাঠ-
শালার পোড়োরা চিরদিন গুরুকে যমের মত
দেখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কঠোর শাসনা-
ধীনে বালমূলত চাপল্য এবং আমোদপ্রিয়তা
প্রশ্রয় পাইত না । সে হিসাবে বেহারী
গুরুজীকে অনেকপরিমাণে উনার বলিতে
হইবে । “চাক্চন্দা”পর্ক তাহার একটি
বিশিষ্ট প্রমাণ ।

নষ্টচন্দ্রের দিন—বেহারে ফসলী ভাতের
৪ঠা তারিখ—চাক্চন্দা-পরব । সুধাকর কি
অপরাধে সেদিন “নষ্ট” আখ্যা লাভ করেন,

অহুস্কানে ঠিক জানিতে পারি নাই ; কিন্তু
ইহা স্থির যে, বাড়লা, বেহার, উড়িষ্যা
হিন্দু-মুসলমানে সেদিন তাঁহার দর্শন ছরপ-
নেয়-কলঙ্ক-জনক মনে করে । সকলেই
জানেন, ছষ্টছেলে এবং ছষ্টতর যুবকদের
আলায় সে রাতে বঙ্গে গৃহস্থবাড়ীতে লাউ,
কুমড়া, শসা গাছের রক্ষা নাই । বেহারে
সে সব কিছু শুনিতে পাই নু । তবে ছেলে-
বুড়ায় একজোট হইয়া সে রাতে তাহার
প্রতিবেশিগৃহে লোষ্ট্রনিষ্ক্ষেপ করে এবং
ইহা একটি সনাতন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ।

কবি বিজ্ঞাপতি সখীমুখে রাধিকাকে
বলিয়াছিলেন—

“চান্দক আহ্নয়ে ভেদ কলঙ্ক ।

ও যে কলঙ্কী তুহ নিফলঙ্ক ॥”

তথাপি কোন শশিমুখী স্ত্রীকবির কথায়
বলিতে হয়—

“তোর সঙ্গে কইব না কথা

তুই পরনিম্ভকী ।

ও তুই অমন সাধের চাঁদকে

বলিল চাঁদা কলঙ্কী ॥”

“চাক্চন্দা”-পরবের কথা হইতেছিল ।

বেহারে ছেলেদের সেদিন ভারি আমোদ
এবং লালাজী গুরুদেব তাহাতে যোগদান
করিয়া বেশ হুপয়সা উপার্জন করেন ।

গণপতির পৃথক্ ভাবে পূজা-অর্চনা বঙ্গ-
দেশে প্রচলিত নাই । বেহারে এই চাক্চন্দা-
পর্যাপলক্ষে “গুরুপিণ্ডায়” তিনি পূজা পাইয়া
থাকেন । পূজার সকল উদ্দেশ্য-আয়োজন
ছেলেদেরই করিতে হয় । তাহারা প্রত্যেকে
স্ব স্ব গৃহ হইতে পুষ্প, ধূপ, পান, সুপারি,
মিষ্টান্ন এবং খেলিবার জন্ত হস্তপরিমিত
বিচিত্রবর্ণের ছই ছই কাঠের ডাণ্ডা আনিয়া
পূজার থালি ভরিয়া দেয় । অপরাহ্নে পূজা-
শেষে শিশুরা আপন আপন ডাণ্ডা ফিরাইয়া
লয় এবং উহা যুগপৎ বাজাইতে বাজাইতে
সমস্বরে গণেশজীর জয়গীতি উচ্চারণ
করে । সেইভাবে তাহারা গুরুমহাশয়ের
সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হয় । তিনি তাহাদের
প্রত্যেকের গৃহে পদার্পণ করিয়া উৎকৃষ্ট
পিতামাতার নিকট পুরস্কার লাভ করেন ।
উনিয়াছি, নগদ মুদ্রা ছাড়া এই উপলক্ষে
তৈজস-বস্ত্রাদিও প্রচুরপরিমাণে গুরুজীর
গৃহজাত হইয়া থাকে ।

চাক্চন্দার ছেলেরা যে শ্লোক গান করে,
তাহার ছইটি নমুনা দিতেছি ।

(১)

ভাদো চউঠ গণেশকি আই ।
বীচ আন্ধনা বীচ কুঁয়া খনাই ।
কুঁয়াপর ছ চন্দ্র লাগাই ॥
যো যো কুঁয়া রাহার লিঙ্কে ।
সব চটানকো পূজা দিজীয়ে ॥
ডিল্লী ঘোড়ি তুম্ চড়াম ।
সাত পঁচাত্তর গহনা লাম ।
এক পঁচাত্তর ঠিক ঠিকাম ॥
হাঁতি উপর লাদে বোর ।
হাত লিয়া সোণেকি তীর ॥
গঙ্গাজীসে ঝাড়ু লিয়া ।
যে ঝাড়ু কাহু নিয়া কো দিয়া ॥
সে কাহু নিয়া ফুটাহা দিয়া ।
সো ফুটাহা ঘাঁসগাঢ়া কো দিয়া ॥
ঘাঁসগাঢ়া বেচারা ঘাঁস দিয়া ।
সো ঘাঁসনে গোকে দিয়া ॥
গো বেচারী ছুখা দিয়া ।
সে ছখনে মোউর কো দিয়া ॥
মোউর বেচারী পাঁখ দিয়া ।
সো পাঁখনে রাজাকো দিয়া ।
রাজা বেচারী ঘোড়া দিয়া ॥
সে ঘোড়ানে আরপার ।
তিসুপর চড়ে মিয়া ছলার ॥
মিয়া ছলারকে লম্বি ছুরী ।
খরখর কাঁপে যমুনাপুরী ॥
যমুনাপুরীকে আয়ামীর ।
মার গেরা সোণেকা তীর ।
ওসি কোমরসে নও সে তীর ॥
এক তীর সেই মাজ্ লিয়া ।
বড়াসাহেবকা নাম লিয়া ॥
মারতা হঁজী মারতা হঁ ।
ডিল্লী ছোড় ফুকারতা হঁ ॥
তেরে ডিল্লিয়া লোটপোট ।
মার মোগালিয়া পহিলি চোট ॥
পহিলি চোট কি আগান মাগান ॥

বীচ লহর বীচ পানি শিজীরে ।
 গঙ্গাজীকে ধারা লিজীরে ।
 পানকা পান বাটা লিজীরে ॥
 হাজিপুরকা ঘোড়া লিজীরে ।
 ঘোড়েকা আসবাব লিজীরে ॥

(২)

শ্রীগণেশজী চড়ে উৎরঙ্গ ।
 নওসে মোতি বলকে রঙ্গ ॥
 এক মোতি হর তালা তালা ।
 ঝাঁহা পঢ়াওৎ পণ্ডিত্ লালা ॥
 পণ্ডিত্ লালা দিয়া আশীষ ।
 জীও গুহ্ ছাতর লাখ বরিষ ॥
 লাখ লাখ সো তাক্ মাস্কায়া ।
 ডিল্লী সো গজমোৎ মাস্কায়া ॥
 পহিনো ওড়ো করো সিঙ্গার ।
 দুবমন-ছাতি পরে আঙ্গার ॥
 দুবমনকে দু ছাতি জরি ।
 বীচ মাস্ বীচ মোতি ভারি ॥
 লালা লালা হৈ সোণেকি মালা ॥
 হৈ সোণেকি ডাণ্ডি ।
 লোহার চার খাটি ॥
 লোহার চার চোখা ।
 ডিল্লীসে কুরোখা ॥
 দরিয়াসে লাগাই ॥
 দরিয়ান নদী নালো ।
 যোবনকে হাঁত মালা ।
 ভবুৎ চার পেয়ালা ॥
 ভবুৎকে হাঁত ছাঙ্গে ।
 ছচার মোতি লাগ্গে ॥

ছোট কি কে হাঁত কালি ॥
 বড় কি কে হাঁত রেজা ।
 ভগবান দাস নে ভেজা ॥
 ভগবান দাস হালুয়াই ।
 তেরে মিঠে মিঠাই ॥
 দোকান চড়ে যাই ।
 লাড্ডু চুন চুন খাই ॥
 গুরু শঙ্কাদাস তামোলি ।
 পীঠ্ হোরি চোলি ॥
 চোলি উপর ছিটকা ।
 শ্রীগণেশজী স্বটকা ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, চাক্চন্দার দিন সন্ধ্যার
 পর গৃহস্থবাড়ী ঢিল ছুড়িয়া মারা ছেলেদের
 একটা আমোদ । শিশুদের পক্ষে পাঁচ-
 পাঁচটি মাত্র ঢিল ফেলিবার ব্যবস্থা এবং
 তাহা মারাত্মক হইবার কথা নহে । কিন্তু
 যুবক ও প্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত তাহাতে যোগ
 দিয়া আনন্দটাকে বীভৎস করিয়া তোলে ।

সহরে প্রশস্ত রাজপথে বাগ্গভাণ্ডের
 তালে তালে বিচিত্রবর্ণের কাঠদণ্ড বাজাইয়া
 দলে দলে অসজ্জিত অকুমার শিশুরা যখন
 গুরুজীদের পশ্চাতে পশ্চাতে গণেশজীর
 গান গাহিয়া চলে, সে বড় সুন্দর দৃশ্য ।
 কল্কনদীর তীরে ক্ষুদ্র শৈলের উপর
 দাঁড়াইয়া সেদিন স্বর্ধ্যাস্তের পূর্বে আমরা
 এই মানবকসেনার পরিক্রম দেখিয়া মুগ্ধ
 হইয়াছিলাম ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

২১

যোগেন্দ্র কহিল, “রমেশ, এই মেয়েটি কে ?”

রমেশ কহিল—“আমার একটি আত্মীয়।”

যোগেন্দ্র কহিল—“কি রকমের আত্মীয় ?
বোধ হয় গুরুজন কেহ হইবেন না, মেহের
সম্পর্কও বোধ হইল না। তোমার সকল
আত্মীয়ের কথাই ত তোমার কাছ হইতে
শুনিরাছি,—এ আত্মীয়ের ত কোন বিবরণ
শুনি নাই।”

অক্ষয় কহিল—“যোগেন, এ তোমার
অভ্রায়,—মানুষের কি এমন কোন কথা
থাকিতে পারে না, যাহা বন্ধুর কাছেও
গোপনীয় ?”

যোগেন্দ্র। কি রমেশ, অত্যন্ত গোপনীয়
নাকি ?

রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে
কহিল, “হঁ। গোপনীয়। এই মেয়েটির সম্বন্ধে
আমি তোমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা
করিতে ইচ্ছা করি না।”

যোগেন্দ্র। কিন্তু হৃর্ভাগ্যক্রমে, আমি
তোমার সঙ্গে আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছা

করি। হেমের সহিত যদি তোমার শিবাহের
প্রস্তাব না হইত, তবে কার সঙ্গে তোমার
কতটা-দূর আত্মীয়তা গড়াইয়াছে, তাহা
লইয়া এত তোলাপাড়া করিবার কোন
প্রয়োজন হইত না—যাহা গোপনীয়, তাহা
গোপনেই থাকিত।

রমেশ কহিল, “এইটুকু-পর্যন্ত আমি
তোমাদিগকে বলিতে পারি, পৃথিবীতে
কাহারো সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই,
যাহাতে হেমলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে
বন্ধ হইতে আমার কোন বাধা থাকিতে পারে।”

যোগেন্দ্র। তোমার হয় ত কিছুতেই বাধা
না থাকিতে পারে—কিন্তু হেমলিনীর
আত্মীয়দের থাকিতে পারে। একটা কথা
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যার সঙ্গে
তোমার যেরূপ আত্মীয়তা থাক্ না কেন, তাহা
গোপনে রাখিবার কি কারণ আছে ?

রমেশ। সেই কারণটি যদি বলি, তবে
গোপনে রাখা আর চলে না। তুমি আমাকে
ছেলেবেলা হইতে জান—কোন কারণ
জিজ্ঞাসা না করিয়া শুদ্ধ আমার কথার উপরে
তোমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

• যোগেন্দ্র। এই মেয়ের নাম কমলা কি না ?

রমেশ। হাঁ।

যোগেন্দ্র। ইহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছ কি না ?

রমেশ। হাঁ দিয়াছি।

যোগেন্দ্র। তবু তোমার উপরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে ? তুমি আমাদিগকে জানাইতে চাও, এই মেয়েটি তোমার স্ত্রী নহে; অল্প সকলকে জানাইয়াছ, এই তোমার স্ত্রী—ইহা ঠিক সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত নহে।

অক্ষয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানবোধের নীতিবোধে এ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে না—কিন্তু ভাই যোগেন, সংসারে দুই পক্ষের কাছে দুইরকম কথা বলা হয় ত অবহাবিশেষে আবশ্যক হইতে পারে। অন্তত তাহার মধ্যে একটা সত্য হওয়াই সম্ভব। হয় ত রমেশবাবু তোমাদিগকে যেটা বলিতেছেন, সেইটেই সত্য।

রমেশ। আমি তোমাদিগকে কোন কথাই বলিতেছি না। আমি কেবল এই কথা বলিতেছি, হেমলিনিনীর সহিত বিবাহ আমার কর্তব্যবিরুদ্ধ নহে। কমলাসম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিবার গুরুতর বাধা আছে—তোমরা আমাকে সন্দেহ করিলেও সে অস্ত্রায় আমি কিছুতে করিতে পারিব না। আমার নিজের সুখ-দুঃখ মান-অপমানের বিষয় হইলে আমি তোমাদের কাছে গোপন করিতাম না—কিন্তু অস্ত্রের প্রতি অস্ত্রায় করিতে পারি না।

যোগেন্দ্র। হেমলিনিনীকে সকল কথা বলিয়াছ ?

রমেশ। না। বিবাহের পরে তাঁহাকে বলিব, এইরূপ কথা আছে—যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এখনো তাঁহাকে বলিতে পারি।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, কমলাকে এ সম্বন্ধে দুই-একটা প্রশ্ন করিতে পারি ?

রমেশ। না, কোনমতেই না! আমাকে যদি অপরাধী বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করিতে পার—কিন্তু তোমাদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর করিবার জন্ত নির্দোষী কমলাকে দাঁড় করাইতে পারিব না।

যোগেন্দ্র। কাহাকেও প্রশ্নোত্তর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। বাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি। প্রশ্ন যথেষ্ট হইয়াছে। এখন তোমাকে আমি স্পষ্টই বলিতেছি, ইহার পরে আমাদের বাড়ীতে যদি প্রবেশের চেষ্টা কর, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।

রমেশ পাণ্ডুবর্ণমুখে তরু হইয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল—“আর-একটি কথা আছে,—হেমকে তুমি চিঠি লিখিতে পারিবে না—তাহার সঙ্গে একান্তে বা গোপনে তোমার স্নেহ সম্পর্কও থাকিবে না। যদি চিঠি লেখ, তবে যে কথা তুমি গোপন রাখিতে চাহিতেছ, সেই কথা আমি সমস্ত প্রশ্নের সহিত সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিব। এখন যদি কেহ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমার সঙ্গে হেমের বিবাহ কেন ভাঙিয়া গেল, আমি বলিব, এ বিবাহে আমার সম্মতি নাই বলিয়া ভাঙিয়া দিয়াছি—ভিতরকার কথাটা বলিব না। কিন্তু তুমি যদি সারথান সা হও,

তবে সমস্ত কথা বাহির হইয়া বাইবে। তুমি এমন পাষাণের মত ব্যবহার করিয়াছ, তবু যে আমি আপনাকে দমন করিয়া রাখিয়াছি, সে তোমার উপরে দয়া করিয়া নহে—ইহার মধ্যে আমার বোন হেমের সংশ্রব আছে বলিয়াই তুমি এত সহজে নিরুত্তি পাইলে। এখন তোমার কাছে আমার এই শেষ বক্তব্য যে, কোনোকালে হেমের সঙ্গে তোমার যে কোন পরিচয় ছিল, তোমার কথার-বার্তার বা ব্যবহারে তাহার যেন কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তোমাকে সত্য করাইয়া লইতে পারিলাম না, কারণ, এত মিথ্যার পরে সত্য তোমার মুখে মানাইবে না। তবে এখনো যদি লজ্জা থাকে,—অপমানের ভয় থাকে, তবে আমার এই কথাটা ভ্রমেও অবহেলা করিয়ে না।”

অক্ষয়। আহা যোগেন্দ্র, আর কেন ? রমেশবাবু নিরন্তর হইয়া আছেন, তবু তোমার মনে একটু দয়া হইতেছে না ? এইবার চল ! রমেশবাবু, কিছু মনে করিবেন না, আমরা এখন আসি !

যোগেন্দ্র-অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ কাঠের মূর্তির মত কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। হতবুদ্ধি-ভাবটা কাটিয়া গেলে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে করিতে সমস্ত অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়। কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল কমলা আছে, তাহাকে বাসার একলা কেলিয়া-রাখিয়া যাওয়া যায় না।

রমেশ পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, কমলা বাস্তার দিকের জান্নার একটা খড়্‌খড়ি

খুলিয়া চূপ করিয়া বসিয়া আছে। রমেশের পদশব্দ শুনিয়া সে খড়্‌খড়ি বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেশ মেজের উপরে বসিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “উহারা দুজনে কে ? আজ সকালে আমাদের ইকুলে গিয়াছিল।”

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, “ইকুলে গিয়াছিল ?”

কমলা কহিল, “হাঁ। উহারা তোমাকে কি বলিতেছিল ?”

রমেশ কহিল, “আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তুমি আমার কে হও ?”

কমলা যদিও খণ্ডরবাড়ীর অহুশাসনের অভাবে এখনো লজ্জা করিতে শেখে নাই, তবু আশৈশব-সংস্কারবশে রমেশের এই কথায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, “আমি উহাদিগকে উত্তর করিয়াছি, তুমি আমার কেউ হও না।”

কমলা ভাবিল, রমেশ তাহাকে অন্যান্য লজ্জা দিয়া উৎপীড়ন করিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া তর্জনের দিকে কহিল, “যাও !”

রমেশ ভাবিতে লাগিল, “কমলার কাছে সকল কথা কেমন করিয়া খুলিয়া বলিব ?”

কমলা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, “ঐ যা, তোমার ফল কাকে লইয়া বাইতেছে।”—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া কাক তাড়াইয়া ফলের থালা লইয়া আসিল।

রমেশের সম্মুখে থালা রাখিয়া কহিল, “তুমি খাইবে না ?”

রমেশের আর আহ্বারের উৎসাহ ছিল না—কিন্তু কমলার এই যত্নটুকু তাহার হৃদয়

স্পর্শ করিল। সে কহিল, “কমলা, তুমি খাবে না ?”

কমলা কহিল, “তুমি আগে খাও।”

এইটুকু ব্যাপার, বেশি-কিছু নয়, কিন্তু রমেশের বর্তমান অবস্থায় এই হৃদয়ের কোমল আভাসটুকু তাহার বন্ধের ভিতরকার অশ্রু-উৎসে গিয়া যেন ঘা দিল। রমেশ কোন কথা না বলিয়া জোর করিয়া কল খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পালা সাক্ষ হইলে রমেশ কহিল, “কমলা, আজ রাত্রে আমরা দেশে যাইব।”

কমলা চোখ নীচু, মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিল, “সেখানে আমার ভাল লাগে না।”

রমেশ। ইঙ্গুলে থাকিতে তোমার ভাল লাগে ?

কমলা। না, আমাকে ইঙ্গুলে পাঠাইয়ো না। আমার লজ্জা করে। মেয়েরা আমাকে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।

রমেশ। তুমি কি বল ?

কমলা। আমি কিছুই বলিতে পারি না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কেন আমারকে ছুটির সময়ে ইঙ্গুলে রাখিতে চাহিয়াছ—আমি—

কমলা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

রমেশ। তুমি কেন বলিলে না, তিনি আমার কেহই হন না !

কমলা রাগ করিয়া রমেশের মুখের দিকে কুটল-কটাক্ষে চাহিল—কহিল, “বাও।”

আবার রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “কি করা বাইবে ?” এদিকে রমেশের বন্ধের

ভিতরে বরাবর একটা চাপা বেদনা কীটের মত যেন গহ্বর-খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে কি বলিল, হেমনলিনী কি মনে করিতেছে, প্রকৃত অবস্থা কেমন করিয়া হেমনলিনীকে বুঝাইবে, হেমনলিনীর সহিত চিরকালের জ্ঞান যদি তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তবে জীবন বহন করিবে কি করিয়া—এই সকল আলাময় প্রশ্ন ভিতরে-ভিতরে জমা হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ভাল করিয়া তাহা আলোচনা করিবার অবসর রমেশ পাইতেছিল না। রমেশ এটুকু বুঝিয়া-ছিল যে, কমলার সহিত রমেশের সম্বন্ধ কলিকাতায় তাহার বন্ধু ও শত্রু মণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। রমেশ যে কমলার স্বামী, এই গোলমালে সেই জন-শ্রুতি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। এ সময়ে রমেশের পক্ষে কমলাকে লইয়া আর এক-দিনও কলিকাতায় থাকা সম্ভব হইবে না।

অশ্রুমনস্ক রমেশের এই চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ কমলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—“তুমি কি ভাবিতেছ ? তুমি যদি দেশে থাকিতে চাও, আমি সেইখানেই থাকিব।”

বালিকার মুখে এই আশ্বাসসংঘের কথা শুনিয়া রমেশের বুকে আবার ঘা লাগিল—আবার সে ভাবিল, “কি করা বাইবে ?” পুনর্বার সে অশ্রুমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিরুত্তরে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা মুখ গভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা, আমি ছুটির সময়ে ইঙ্গুলে থাকিতে

চাহি নাই বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ?—সত্য করিয়া বল।”

রমেশ কহিল—“সত্য করিয়াই বলিতেছি, তোমার উপরে রাগ করি নাই, আমি নিজের উপরেই রাগ করিয়াছি।”

রমেশ ভাবনার জাল হইতে নিজেকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কমলার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা কমলা, ইঙ্কলে এতদিন কি শিখিলে বল দেখি?”

কমলা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিজের শিক্ষার হিসাব দিতে লাগিল। সম্প্রতি পৃথিবীর গোলাকৃতির কথা তাহার অগোচর নাই জানাইয়া যখন সে রমেশকে চমৎকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, রমেশ গভীরমুখে ভূমণ্ডলের গোলত্বে সন্দেহপ্রকাশ করিল। কহিল, “এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে?”

কমলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—“বাঃ, আমাদের বইয়ে লেখা আছে—আমরা পড়িয়াছি।”

রমেশ আশ্চর্য্য জানাইয়া কহিল—“বল, কি বইয়ে লেখা আছে? কতবড় বই?”

এই প্রশ্নে কমলা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, “বেশি বড় বই নয়—কিন্তু ছাপার বই। তাহাতে ছবিও দেওয়া আছে।”

এত-বড় প্রমাণের পর রমেশকে হার মানিতে হইল। তার পরে কমলা শিক্ষার বিবরণ শেষ করিয়া বিভ্রালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা, সেখানকার দৈনিক কার্য্যধারা লইয়া বকিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ অন্তমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে মাড়া দিয়া গেল। কখনো বা কথার শেষ

সূত্র ধরিয়া এক-আধটা প্রশ্নও করিল। হঠাৎ একসময়ে কমলা বলিয়া উঠিল, “তুমি আমার কথা কিছুই শুনিতেন না।” বলিয়া সে রাগ করিয়া তখনি উঠিয়া পড়িল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না না কমলা, রাগ করিয়ে না—আমি আজ ভাল নাই।”

ভাল নাই শুনিয়া তখনি কমলা কিরিয়া-আসিয়া কহিল—“তোমার অসুখ করিয়াছে? কি হইয়াছে?”

রমেশ কহিল—“ঠিক অসুখ নয়—ও কিছুই নয়—আমার মাঝে মাঝে অমন হইয়া থাকে—আবার এখন চলিয়া যাইবে।”

কমলা রমেশকে শিক্ষার সহিত আমোদ দিবার জন্ত কহিল, “আমার ভূগোল-প্রবেশে পৃথিবীর যে ছবি আছে, দেখিবে?”

রমেশ আগ্রহপ্রকাশ করিয়া দেখিতে চাহিল। কমলা তাড়াতাড়ি তাহার বই আনিয়া রমেশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। কহিল—“এই যে দুটো গোল দেখিতেছ, ইহা আসলে একটা। গোল জিনিষের দুটো পিঠ কি কখনো একসঙ্গে দেখা যায়?”

রমেশ কিঞ্চিৎ ভাবিবার ভাণ করিয়া কহিল—“চ্যাপ্টা জিনিষেরও দেখা যায় না।”

কমলা কহিল, “সেইজন্ত এই ছবিতে পৃথিবীর দুই পিঠ আলাদা করিয়া আঁকিয়াছে।”

এমনি করিয়া সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

২২

অন্নদাবাবু একান্তমনে আশা করিতেছিলেন, যোগেন্দ্র ভাল থবর লইয়া আসিবে, সমস্ত গোলমাল অতি সহজে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যোগেন্দ্র ও অক্ষয় যখন ঘরে

আসিয়া প্রবেশ করিল, অন্নদাবাবু ভীতভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন ।

যোগেন্দ্র কহিল, “বাবা, তুমি যে রমেশকে এতদূর-পৰ্য্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতে দিবে, তাহাকে জানিত ? এমন জানিলে আমি তোমাদের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতাম না ।”

অন্নদাবাবু । রমেশের সঙ্গে হেমললিনীর বিবাহ তোমার অভিপ্রেত, এ কথা তুমি ত আমাকে অনেকবার বলিয়াছ । বাধা দিবার ইচ্ছা যদি তোমার ছিল, তবে আমাকে—

যোগেন্দ্র । অবশ্য একেবারে বাধা দিবার কথা আমার মনে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া—

অন্নদাবাবু । ঐ দেখ, ৩য় মধ্যে “তাই বলিয়া” কোথায় থাকিতে পারে ! হয় অগ্রসর হইতে দিবে, নয় বাধা দিবে, এর মাঝখানে আর কি আছে ?

যোগেন্দ্র । তাই বলিয়া একেবারে এতটা-দূর অগ্রসর—

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, “কতকগুলি মিনিট আছে, যা আপনার কোঁকেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, তাহাকে আর প্রেরণ দিতে হয় না—বাড়িতে বাড়িতে আপনিই বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায় । কিন্তু যা হইয়া গেছে, তা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ কি ? এখন যা করা কর্তব্য, তাই আলোচনা কর ।”

অন্নদাবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“রমেশের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে ?”

যোগেন্দ্র । খুব দেখা হইয়াছে—এত দেখা আশা করি নাই । এমন কি, তার জীবন সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গেল ।

অন্নদাবাবু নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন । কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“কার জীবন সঙ্গে পরিচয় হইল ?”

যোগেন্দ্র । রমেশের জীবন ।

অন্নদাবাবু । তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । কোন্ রমেশের জীবন ?

যোগেন্দ্র । আমাদের রমেশের । পাঁচ-ছয়-মাস আগে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন সে বিবাহ করিতেই গিয়াছিল ।

অন্নদাবাবু । কিন্তু তার পিতার মৃত্যু হইল বলিয়া বিবাহ ঘটিতে পারে নাই ।

যোগেন্দ্র । মৃত্যুর পূর্বেই বিবাহ হইয়া গেছে ।

অন্নদাবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া মাথার হাত বুলাইতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, “তবে ত আমাদের হেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না ।”

যোগেন্দ্র । আমরা ত তাই বলিতেছি—
অন্নদাবাবু । তোমরা ত তাই বলিলে,

এদিকে যে বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়া গেছে—এ রবিবারে হইল না বলিয়া তাহার পরের রবিবারে দিন স্থির করিয়া চিঠি বিলি হইয়া গেছে—“আবার সেটা বন্ধ করিয়া ফের চিঠি লিখিতে হইবে ?

যোগেন্দ্র কহিল—“একেবারে বন্ধ করার দরকার কি—কিছু পরিবর্তন করিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া হইতে পারে ।”

অন্নদাবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন—
“৩য় মধ্যে পরিবর্তন কোন্‌খানটার করিবে ?”

যোগেন্দ্র । যেখানে পরিবর্তন করা সম্ভব, সেইখানেই করিতে হইবে । রমেশের বদলে

আর-কোন পাজ স্থির করিয়া আস্তে রবিবারেই যেমন করিয়া হৌক্ কর্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। নহিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।

বলিয়া যোগেন্দ্র একবার অক্ষরের মুখের দিকে চাহিল। অক্ষর বিনয়ে মুখ নত করিল।

অন্নদাবাবু। পাজ এত শীঘ্র পাওয়া যাইবে ?

যোগেন্দ্র। সে তুমি নিশ্চিত থাক।

অন্নদাবাবু। কিন্তু হেমকে ত রাজি করাইতে হইবে।

যোগেন্দ্র। রমেশের সমস্ত ব্যাপার শুনিলে সে নিশ্চয় রাজি হইবে।

অন্নদাবাবু। তবে যা তুমি ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর। কিন্তু রমেশের বেশ সজ্ঞতিও ছিল, আবার উপার্জনের মত বিজ্ঞাবুদ্ধিও ছিল। এই পণ্ড আমার সঙ্গে কথা ঠিক হইয়া গেল, সে এটোয়ার গিয়া প্র্যাক্টিস্ করিবে, এর মধ্যে দেখ দেখি কি কাণ্ড !

যোগেন্দ্র। সেজন্য কেন চিন্তা করিতেছ বাবা, এটোয়াতে রমেশ এখনো প্র্যাক্টিস্ করিতে পারিবে। একবার হেমকে ডাকিয়া আনি, আর ত বেশি সময় নাই।

কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষর ঘরের এক কোণে বইয়ের আলমারির আড়ালে বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, “হেম, বোস, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

হেমনলিনী শুক হইয়া চৌকিতে বসিল। সে জানিত, তাহার একটা পরীক্ষা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র ভূমিকাঙ্কলে দিজালা করিল, “রমেশের ব্যবহারে সন্দেহের কারণ তুমি কিছুই দেখিতে পাও না ?”

হেমনলিনী কোন কথা না বলিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্র। সে যে বিবাহের দিন এক-সপ্তাহ পিছাইয়া দিল, তাহার এমন কী কারণ থাকিতে পারে, মাহা আমাদের কারো কাছে বলা চলে না।

হেমনলিনী চোখ নীচু করিয়া কহিল, “কারণ অবশ্যই কিছু আছে।”

যোগেন্দ্র। সে ত ঠিক কথা। কারণ ত আছেই—কিন্তু সে কি সন্দেহজনক না ?

হেমনলিনী আবার নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—“না।”

তাহাদের সকলের চেয়ে রমেশের উপরেই এমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে যোগেন্দ্র রাগ করিল। সাবধানে ভূমিকা করিয়া কথা-পাড়া আর চলিল না।

যোগেন্দ্র কঠিনভাবে বলিতে লাগিল—“তোমার ত মনে আছে, রমেশ মাস-ছয়েক আগে তাহার বাপের সঙ্গে দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে অনেকদিন তাহার কোন চিঠিপত্র না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। ইহাও তুমি জান যে, যে রমেশ ছইবেলা আমাদের এখানে আসিত, যে বরাবর আমাদের পাশের বাড়ীতে বাসা লইয়া ছিল, সে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একবারো দেখাও করিল না, অস্ত

বাসার গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল—ইহা সঙ্গেও তোমরা সকলে পূর্বের মত বিশ্বাসেই তাহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিলে ? আমি থাকিলে এমন কি কখনো ঘটিতে পারিত ?”

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র। রমেশের এইরূপ ব্যবহারের কোন অর্থ তোমরা খুঁজিয়া পাইয়াছ ? এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও কি তোমাদের মনে উদয় হয় নাই ? রমেশের পরে এত গভীর বিশ্বাস ?

হেমনলিনী নিরন্তর রহিল।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা বেশ কথা—তোমরা সরলস্বভাব, কাহাকেও সন্দেহ কর না—আশা করি, আমার উপরেও তোমার কতকটা বিশ্বাস আছে। আমি নিজে ইস্কুলে গিয়া খবর লইয়াছি, রমেশ তাহার স্ত্রী কমলাকে সেখানে বোর্ডার রাখিয়া পড়াইতেছিল। ছুটির সময়েও তাহাকে সেখানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই-তিন-দিন হইল, ইস্কুলের কর্তার নিকট হইতে রমেশ চিঠি পাইয়াছে যে, ছুটির সময়ে কমলাকে ইস্কুলে রাখা হইবে না। আজ তাহাদের ছুটি ফুরাইয়াছে—কমলাকে ইস্কুলের গাড়ি দর্জিপাড়ায় তাহাদের সাবক বাসার পৌছাইয়া দিয়াছে। সেই বাসায় আমি নিজে গিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, কমলা বাঁটিতে আপেলের খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া দিতেছে, রমেশ তাহার সমুখে মাটিতে বসিয়া এক-এক টুকরা লইয়া মুখে পুরিতেছে। রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ব্যাপারখানা কি ?’ রমেশ বলিল, ‘সে এখন এবং আমাদের

কাছে কিছুই বলিবে না।’ যদি রমেশ একটা কথাও বলিত যে, কমলা তাহার স্ত্রী নয়, তা হলেও না হয় সেই কথাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া কোনমতে সন্দেহকে শাস্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সে হাঁ, না, কিছুই বলিতে চায় না। এখন, ইহার পরেও কি রমেশের উপর বিশ্বাস রাখিতে চাও ?”

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় যোগেন্দ্র হেম-নলিনীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার মুখে অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেছে, এবং তাহার বতটা জোর আছে, দুই হাতে চৌকির হাতা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্তকাল পরেই সম্মুখের দিকে ফুঁকিয়া-পড়িয়া মুছিত হইয়া চৌকি হইতে সে নীচে পড়িয়া গেল।

অন্নদাবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভুলুষ্ঠিতা হেমনলিনীর মাথা দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া-লইয়া কহিলেন—“মা, কি হইল মা ! ওদের কথা তুমি কিছুই বিশ্বাস করিয়া না—সব মিথ্যা !”

যোগেন্দ্র তাহার পিতাকে সরাইয়া তাড়া-তাড়ি হেমনলিনীকে একটা সোফার উপর তুলিল,—নিকটেই কুঁজার জল ছিল, সেই জল লইয়া তাহার মুখে-চোখে বাস্রংবার ছিটাইয়া দিল—এবং অক্ষয় একখানা হাতপাখা লইয়া তাহাকে বেগে বাতাস করিতে লাগিল।

হেমনলিনী অনতিকাল পরে চোখ খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল—অন্নদাবাবুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “বাবা, বাবা, অক্ষয়বাবুকে এখান হইতে সরিয়া বাইতে বল।”

অক্ষয় পাখা রাখিয়া ঘরের বাহিরে দর-জার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাবাবু সোফার উপরে হেমনলিনীর পাশে বসিয়া তাহার মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন—এবং গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল একবার বলিলেন, “মা।”

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর ছই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তাহার বুক ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল—পিতার জাহ্নুর উপর বুক চাপিয়া-ধরিয়া তাহার অন্যত্ন স্নেহদনের বেগ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল। অন্নদাবাবু অশ্রুজ্বলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। রমেশকে আমি খুব জানি—সে কখনই অবিশ্বাসী নয়—যোগেন নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে।”

যোগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, কহিল, “বাবা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ো না!—এখনকার মত কষ্ট বাঁচাইতে গিয়া উহাকে দিগন্ত কষ্টে ফেলা হইবে। বাবা, হেমকে এখন কিছুক্ষণ ভাবিবার সময় দাও।”

হেমনলিনী তখন পিতার জাহ্নু ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল—এবং যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—“আমার যাহা ভাবিবার, সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোন-মতেই বিশ্বাস করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিযো।”

এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিলেন—কহিলেন, “পড়িয়া যাইবে।”

হেমনলিনী অন্নদাবাবুর হাত ধরিয়া তাহার শোবার ঘরে গেল। বিছানার ওইয়া

কহিল, “বাবা, আমাকে একটুখানি একলা রাখিয়া যাও, আমি ঘুমাইব।”

অন্নদাবাবু কহিলেন, “হরির মাকে ডাকিয়া দিব?—বাতাস করিবে?”

হেমনলিনী কহিল, “বাতাসের দরকার নাই বাবা।”

অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। এই কজাটিকে ছয়মাসের শিশু-অবস্থায় রাখিয়া ইহার মা মারা যায়, সেই হেমের মার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সেবা, সেই ধৈর্য্য, সেই চিরপ্রসন্নতা মনে পড়িল। সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মত যে মেয়েটি এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিষ্ট-অশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে বসিয়া-বসিয়া তিনি মনে মনে তাহাকে সন্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“মা, তোমার সকল বিষয় দূর হউক, চিরদিন তুমি সুখে থাক—তোমাকে সুখী দেখিয়া, সুস্থ দেখিয়া, যাহাকে ভালবাস তাহার ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর মত প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমি যেন তোমার মার কাছে যাইতে পারি!” এই বলিয়া জামার প্রান্তে আর্দ্রচক্ষু মুছিলেন।

মেয়েদের বুদ্ধির প্রতি যোগেন্দ্রের পূর্ন হইতেই যথেষ্ট অবজ্ঞা ছিল, আজ তাহা আরো দৃঢ় হইল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিশ্বাস করেন না—ইহাদিগকে লইয়া কি করা যাইবে? ছইরে ছইরে যে চার হইবেই, তাহাতে মাহু-ঘের সুখই হোক আর দুঃখই হোক, তাহা ইহার স্বলবিশেষে অনান্যসেই অস্বীকার করিতে পারে! বুদ্ধি যদি কালোকে কালোই বলে, আর ইহাদের ভালবাসা তাহাকে বলে

শাদা, তবে যুক্তি-বেচারার উপরে ইহারা ভারি খাপা হইয়া উঠিবে! ইহাদিগকে লইয়া যে কি করিয়া সংসার চলে, তাহা যোগেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

যোগেন্দ্র ডাকিল—“অক্ষয়!”

অক্ষয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্র কহিল—“সব ত শুনিয়াছ, এখন ইহার উপায় কি?”

অক্ষয় কহিল—“আমাকে এ সব কথাই মধ্যে কেন মিছামিছি টান ভাই! আমি এত দিন কোন কথাই বলি নাই—তুমি আসিয়াই আমাকে এই মুষ্কিলে ফেলিয়াছ।”

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, সে সব নালিশের কথা পরে হইবে। এখন হেমনলিনীর কাছে রমেশকে নিজের মুখে সকল কথা কবুল না করাইলে উপায় দেখি না।

অক্ষয়। পাগল হইয়াছ? মানুষ নিজের মুখে—

যোগেন্দ্র। কিছা যদি একটা চিঠি লেখে, তাহা হইলে আরো ভাল হয়। তোমাকে এই ভার লইতেই হইবে। কিন্তু আর দেরি করিলে চলিবে না।

অক্ষয় কহিল—“দেখি, কতদূর কি করিতে পারি!”

ক্রমশঃ।

সাহিত্যের তাৎপর্য্য।

বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভাললাগা-মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিষম্ব, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া-তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

যেমন অঠরে জারকরস অনেকের পর্য্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভাল করিয়া আপনার শরী-

রের জিনিষ করিয়া লইতে পারে না—তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারকরস বাহারা পর্য্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।

একজন সাধারণ ভ্রমণকারীর সঙ্গে কবি ওয়ার্ড সুওয়ার্থের এই প্রভেদ। সাধারণ ভ্রমণকারী যখন শৈলবোষ্ট্রিত সরোবর দেখে, তখন যে তার ভাল লাগে না, তাহা নয়—সে যে নিতান্ত কেবল পাহাড়টা কত উঁচু, সরোবরটা কত গভীর, সেই খবরটুকু লইবার চেষ্টা করে, তাহা নহে—সে হৃদয়ের আবেগের দ্বারা এই বাহিরের দৃষ্টটিকে আপনার করিয়া

লইতে চায়। কিন্তু তাহার কল্পনা এবং হৃদয়াবেগ কবির তুলনার সামান্য। কবি আপন হৃদয়ের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা বহিঃ-প্রকৃতিকে ওতপ্রোত করিয়া লইয়াছেন—ছোট বনফুল হইতে বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার—এবং সেই স্ত্রে মানবের।

যে কবির হৃদয়বৃত্তি জগতের যত বিচিত্র ও অধিক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া লইতে পারে, তাহার কবিত্বের গৌরব তত বাড়ে। কারণ, তিনি বিশ্বকে অধিকপরিমাণে এবং বিচিত্র-ভাবে মানুষের আপনার করিয়া গড়িয়া দেন।

এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে, জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহার হৃদয়ের উৎস্রব্য—তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্শগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।

এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন, যাহাদের বিশ্বয়, প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ—প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাহাদের নিমগ্ন; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

বাহিরের বিশ্ব ইহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রংয়ে, নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

তাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি স্বপ্নম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের

চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাঙ্গপেক্ষ উপাদেয়।

অতএব দেখা বাইতেছে, বাহিরের জগতের সঙ্গে -মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্টা শাদা, কোন্টা কালো, কোন্টা বড়, কোন্টা ছোট, মানবের জগৎ সেই খবরটুকু-মাত্র দেয় না। কোন্টা প্রিয়, কোন্টা অপ্রিয়, কোন্টা সুন্দর, কোন্টা অসুন্দর, কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা স্তরে বলে।

এই যে মানুষের জগৎ, ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয়—নব নব হৃদয়ের তিতরদিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চির-দিশই স্রষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ জিনিষ নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্ত ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ। তাই মানুষ কেবলি লিখিতেছে, খুঁদিতেছে, গাহিতেছে, আঁকিতেছে—তাহার বিশ্রাম নাই। তাহার প্রকাশ-চেষ্টা নানারূপে স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে। ইহা প্রয়োজন বুঝিয়া কাজ করে না—ইহা বিশ্বের অনাবশ্যক স্রষ্টি করে—ইহা কেবল আকার ধরিতে চায়, বাহির হইতে চায়।

অতএব সাহিত্যকারের প্রথম কাজ কল্পনাশক্তির দ্বারা, হৃদয়বৃত্তির দ্বারা বাহিরের

জগৎকে আপনার মনের করিয়া তোলা। তাঁর পরে রচনাশক্তির দ্বারা সেই মনের জিনিষকে বাহিরের, আপনার জিনিষকে সকলের করিয়া দেওয়া।

অতএব সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিষ দেখিতে হয়। ১ম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি—২য়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা ?

সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানেই সোনার সোহাগা।

কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় বতই বিশ্ব-ব্যাপী হয়, ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানব-বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।

কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে :নষ্ট হয় না। ইহা ভাবার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। ধৈর্য্যগুণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে, মানুষ তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কি ?

তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্ভিক্ত হয়।

হৃদয়ের ভাব উদ্ভেক করিতে সাক্ষরসম্রাজ্য অনেক লাগে।

পুরুষমানুষের আপিসের কাপড় শাদা-সিধা—তাহা বতই বাহ্যল্যবর্জিত হয়, ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাসরম, ভাবভঙ্গী, সমস্ত-সভ্যসমাজেই প্রচলিত।

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়—এইজন্য তাহাদিগকে নিত্য সাজানুজি, শাদাসিধা, ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথার্থ হওয়া আবশ্যক—কিন্তু মেয়েদের সুলভ হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভাল—কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলঙ্কারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের-ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মত নিরলঙ্কার হইলে তাহার চলে না।

অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্কচনীয়াতাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন স্ত্রী এবং ব্রী, সাহিত্যের অনির্কচনীয়াতাটিও সেইরূপ। তাহা অম্লকরণের অতীত। তাহা অলঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।

ভাবার মধ্যে এই ভাবাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাবার মধ্যে

দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সঙ্গীত ।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয় । সাহিত্যে এই ছবি-আঁকার সীমা নাই । উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায় । “দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়” এই এক কথার বলরামদাস কি না বলিয়াছেন ? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে ? দৃষ্টি পাখীর মত উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শাস্তিলাভ করিয়াছে ।

এ ছাড়া ছন্দে, শব্দে, বাক্যবিন্যাসে, সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় ত গ্রহণ করিতেই হয় । যাহা কোনমতে বলিবার জো নাই, এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে । অর্থ-বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথটা যৎসামান্য, এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে । কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চার করিয়া দেয় ।

অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ । চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে । চিত্র দেখ এবং সঙ্গীত শ্রোণ ।

কিন্তু কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিষ, তাহা নহে । মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি, যাহা জড়-সৃষ্টির দ্বারা আমাদের ইঞ্জিয়ারের দ্বারা আয়ত্ত-গম্য নহে । তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়াই না । তাহা মানুষের পক্ষে পরম গুরুত্বজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালায়

পশুর মত বাধিয়া রাখার মধ্যে পুড়িয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই ।

এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানব-চরিত্র—সাহিত্য ইহাকেও অন্তরলোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় । অত্যন্ত দুঃস্থ কাজ । কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে, স্নস-দ্রুত নহে—তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর—তাহার সদরে-অন্দরে অব্যবহৃত গতি-বিধি সহজ নয় । তা ছাড়া, তার লীলা এত স্বন্দ, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ । ব্যাস-বাস্তবিক-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন ।

এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানব-চরিত্র ।

কিন্তু মানবচরিত্র, এটুকুও যেন বাহ্যিক বলা হইল । বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব-চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য ।

ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানব-চরিত্রের মধ্যে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে । মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে । এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র । কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষ্যমাত্র ।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতীকনি। এই জগৎ-সৃষ্টির আনন্দগীতের স্বাক্ষর আমাদের হৃদয়-বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানসসঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিখাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা সচরিতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্ত নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

বক্তার খিলিজির বঙ্গবিজয়।

শেষাংশ।

মহানন্দার পূর্ব, করতোয়ার পশ্চিম, হিমাচলপদতলগত আরণ্যপ্রদেশের দক্ষিণ এবং পদ্মাবতীর উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তগত ত্রীপোণ্ডুবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী স্থান “বরেন্দ্র” নামে পরিচিত ছিল। অত্ৰাপি ইহার অনেক স্থান “বরেন্দ্র” নামেই পরিচিত। ইহার পশ্চিমে মিথিলা এবং পূর্বে কামরূপের রাজ্য। উত্তর ও পূর্বাঞ্চল হইতে বিবিধ পার্বত্য দহাদল নিয়ত বরেন্দ্রভূমির উর্বরক্ষেত্রে আপতিত হইত। তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্ত করতোয়া-তটে নানাস্থানে প্রান্তদুর্গ বর্তমান ছিল। অত্ৰাপি বর্ধনকোট ও মহাহান নামক পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ করতোয়াতটে দেখিতে পাওয়া যায়।

মগধের পূর্ব, সমতট বা বাগড়ীর পশ্চিম, মিথিলার দক্ষিণ ও ওড়্রদেশের উত্তর,—এই

চতুঃসীমান্তগত স্থান “রাঢ়” নামে পরিচিত ছিল; অত্ৰাপি সেই নাম প্রচলিত আছে। রাঢ় দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আক্রান্ত হইত বলিয়া, তাহার নানাস্থানে গিরি দুর্গ ও বনদুর্গ বর্তমান ছিল।

ব্রহ্মদেশের পূর্ব, সমতটের পশ্চিম, কামরূপের দক্ষিণ ও বঙ্গোপসাগরের উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তগত স্থান “বঙ্গ” নামে পরিচিত ছিল। পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকায়, বঙ্গবিভাগে ও রণপোতাঙ্গি রক্ষিত হইত।

রাঢ়ের পূর্ব, বঙ্গের পশ্চিম, বরেন্দ্রের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তগত স্থান “সমতট” অথবা “বাগড়ী” নামে পরিচিত ছিল। এই সমতট-প্রদেশ স্বভাবতঃ অক্ষয়িত বলিয়া, এই বিভাগে কোন

হুগাঁদি বর্তমান ছিল না। এই প্রদেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যে বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রদেশেই প্রাদেশিক রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। সমতটপ্রদেশে কখনও কোন রাজধানী থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উত্তরকালে কেবল কিছুদিনের জন্য সুন্দরবনান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে সমতটের অন্তর্গত নবদ্বীপে রাজধানী থাকিবার কোন ইতিহাস বা প্রমাণ বা জনশ্রুতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিন্‌হাজ নিজেও তথ্য কোন রাজধানীর অস্তিত্ব দেখিয়া যান নাই। কেবল বক্তৃত্তারের পার্শ্বের মুসলমানসেনার নিকট গল্প শুনিবার সময় তাহারই মুখে নবদ্বীপে রাজধানী থাকার কথা শুনিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বিচারে বা তথ্যাসূক্ষ্মানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিচারবুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন নাই। যেখানে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সেনরাজবংশের রাজ্যবিস্তারের পূর্বে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও সমতট পালরাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহাদের শাসনসময়ে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের নানা রাজধানীর নাম ও পরিচয় পুরাতন তাম্রশাসনে খোদিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় পাল-নরপালগণ তাঁহাদের ইতিহাসবিখ্যাত পাটলিপুত্রের পুরাতন রাজধানীতে বসিয়াই গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। পরে মুদগ-গিরি-(মুকের)-নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত

হইয়াছিল। তাহার পর গৌড়ান্তর্গত পৌণ্ড্র-বর্ধন ও পৌণ্ড্র বর্ধনের নানা উপবিভাগে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। কিন্তু পাল-নরপালবর্গের শাসনসময়েও সমতটের অন্তর্গত কোন স্থানে কোন রাজধানী সংস্থাপিত হওয়ার প্রমাণ নাই। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেখা যায়, সমতটনিবাসী শিল্পী ঐ তাম্রশাসনে রাজাজ্ঞা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। সেনরাজবংশের অধিকার বিস্তৃত হইয়া সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য তাঁহাদের করতলগত হইবার পর রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গেই রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারাও শ্রীবিক্রমপুরের পুরাতন রাজধানীকেই প্রধান রাজধানী মনে করিতেন।

বক্তৃত্তার খিলিজির এদেশে উপনীত হইবার সমসময়ে, সমতটপ্রদেশে কোন রাজধানী থাকিলে, তাহা জয় করিবার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইত। বক্তৃত্তারের বঙ্গবিজয়সময়ে যতদূর জানিতে পারা সম্ভব, তাহাতে লক্ষ্মার, লক্ষ্মণাবতী ও শ্রীবিক্রমপুর অক্রমণের চেষ্টাই জ্ঞাত হওয়া যায়। বক্তৃত্তার জীবিত থাকিতে, লক্ষ্মণাবতী ভিন্ন আর কোন গৌড়ীয় হিন্দুরাজধানী তাঁহার করতলগত হয় নাই। তিনি আর যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। বক্তৃত্তার খিলিজির বঙ্গবিজয় বলিতে বিবুল্লিব, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহার বঙ্গবিজয়সময়ে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। যে সকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) প্রথম প্রমাণ,—বিজয়সেনের

প্রত্নতত্ত্বের নামক-শিবমন্দিরের প্রস্তরলিপির
লিপি। ইহা উমাপতি নামক কবির রচিত
বলিয়া লিখিত আছে। জয়দেব উমাপতির
সমসাময়িক। জয়দেব লিখিয়া গিয়াছেন—
“উমাপতি বাক্যকে বড় পল্লবিত করিয়া
থাকেন।” উমাপতির এই রচনাতেও পল্ল-
বিত বাক্যাবলীর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।
কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যে কিছুমাত্র ঐতি-
হাসিক সত্য নাই, এরূপ অসম্ভব
নিতান্ত অসঙ্গত। উমাপতি বিজয়সেনকে
বিজয়ী বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।
অজ্ঞাত প্রমাণেও ইহা দৃষ্টীকৃত হইয়াছে।
বিজয়সেন বীর না হইলে, পালবংশের অধি-
কৃত বরেন্দ্রপ্রদেশে রাজধানী ও রাজ্য সংস্থাপ-
নে কৃতকাৰ্য্য হইতেন না। সুতরাং অজ্ঞ
প্রমাণ না থাকিলেও, তাহাকে বিজয়ী বীর
বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বিজয়সেন
“গৌড়েশ্বর” উপাধি গ্রহণ করিলেও, তিনি
যে সমগ্র গৌড়রাজ্য করতলগত করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়
না। সত্য হইলে, তিনি রাজধানীর অন্তর্গত
গোদাগাড়ীর নিকট বরেন্দ্রনামক স্থানে
রাজধানীসংস্থাপন ও শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা না
করিয়া, ইতিহাসবিখ্যাত পোণ্ড বর্ধনের
পুরাতন রাজধানীতেই সিংহাসনে উপবেশন
করিতেন। কিন্তু প্রস্তরলিপিতে বিজয়সেন
গৌড়, কলিঙ্গ ও কামরূপ জেতা বলিয়া
বর্ণিত। যথা :—

“সং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
কব্যানাথামননরুচিনিপুটদোষঃ ।
গৌড়েশ্বরবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপঃ কলিঙ্গমপি যন্তয়স্যা জিগাম ।”

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ,—বঙ্গালবিরচিত
“দানসাগর” নামক গ্রন্থের পরিচয়লোকাবলী।
তাহাতে বিজয়সেনদেবের বরেন্দ্রে প্রাপ্তভূত
হইবার কথা লিখিত আছে। বিজয়সেন যে
সমগ্র গৌড়রাজ্য করতলগত করিতে পারেন
নাই, “দানসাগরের” লোকই তাহার বিশিষ্ট
প্রমাণ। যথা :—

“হেমন্তঃ পরিপরিপক্কসরঃ সর্বত্র নৈসর্গিকৈ-
রুদ্গতঃ স্বর্ণশৈলদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোহজনি ।”
“তদন্তু বিজয়সেনঃ প্রাহুয়াসীৎ বরেন্দ্রে
দিশি বিদিশি ভজন্তে বস্ত বীরধ্বজস্বয়ং ।”

ইহাতে বিজয়সেন বীর ও বিজয়ী বলি-
য়াই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বরেন্দ্রে
প্রাপ্তভূত হইয়াছিলেন,—সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দু-
সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই।

(৩) তৃতীয় প্রমাণ,—লক্ষণসেনদেবের
বিবিধ তান্ত্রশাসন। ইহাতে বিজয়সেনের
রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, জানিতে
পারা যায়। এ পর্য্যন্ত লক্ষণসেনদেবের বত-
গুলি তান্ত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে
তদীয় রাজ্যস্বের সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত তাহার
ত্রিবিক্রমপুরের রাজধানীতে থাকার পরিচয়
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল তান্ত্রশাসনে বিজয়সেন
“বিজয়ী” এবং বঙ্গালসেন “সংগ্রামাবতার”
বলিয়া কীর্তিত। বঙ্গালই যে সেনরাজবংশের
নরপতিবর্গের মধ্যে গৌড়ে রাজধানীসংস্থাপ-
নের পথপ্রদর্শক, গৌড়ের স্বসংসাবেবের
মধ্যে বঙ্গালবাড়ী নামক স্থান অজ্ঞাপি তাহার
সাক্ষ্যদান করিতেছে। লক্ষণসেনদেবের
যে তান্ত্রশাসন মাধাইনগরে প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে, তাহাতে তিনি “গৌড়েশ্বর” বলিয়া

আপনার পরিচয়প্রদান এবং কাশীরাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের উল্লেখ করিয়াছেন ।

(৪) চতুর্থ প্রমাণ, — লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন । ইহাতে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন গোড়েশ্বর বলিয়া কীর্তিত হইলেও, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাধির উল্লেখ আছে । তাহা কবিকল্পনামাত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না । তাহা অবশ্যই কোন-না-কোন ঐতিহাসিক তথ্য সুব্যক্ত করিত । উপাধিগুলি এইরূপে কীর্তিত, যথা :

- (১) অরিরাজবংশধর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়সেনদেব ।
- (২) অরিরাজনিঃশঙ্কধর গোড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব ।
- (৩) অরিরাজমদনধর গোড়েশ্বর শ্রীমদলক্ষ্মণসেনদেব ।

এই তিন বিখ্যাত নরপতির মধ্যে লক্ষ্মণসেনদেবের পরিচয়স্বরূপ আরও একটি উপাধির উল্লেখ আছে । লক্ষ্মণসেন “অম্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজজয়ধিপতি” বলিয়া পরিকীর্তিত । লক্ষ্মণসেনদেবের শ্রীক্ষেত্রে, কাশীধামে ও প্রমাণেও “সমরজয়ন্তমমালা” স্থাপন করিবার কথা এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে । এই কয়েকটি প্রমাণে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শাসনসময়ে সেনরাজ্যের শৌর্য-ব্রাহ্মণ ও বিজয়কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, এবং লক্ষ্মণসেনদেবই যে বাহুবলের জন্ত সন্ধ্যাপেক্ষা প্রশংসিত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহা বিশ্বরূপসেনের রাজ্যাব্যয়ের চতুর্দশবর্ষীয় লিপি ; তখন লক্ষ্মণসেন স্বর্গারূঢ় ও যবনগণ বিশ্বরূপের নিকট পরাভূত ; বিশ্বরূপ তাঁহাদের পক্ষে “প্রলয়কালরূঢ়” নামে পরিচিত । লক্ষ্মণসেন নিতান্ত কাপুরুষের জায় রাজ্য, রাজধানী ও রাজধন বিসর্জন

করিয়া, প্রাণ লইয়া অন্তঃপুর হইতে পলায়নের জন্ত ব্যাকুল ছিলেন কি না, তাহার বিচার করা অনাবশ্যক । মুসলমান ইতিহাসলেখক রায়-লছ্মণিয়া-নামক নরপতির ক্ষেত্রেই পলায়নকলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন । এই রায় লছ্মণিয়া কে ছিলেন ? পুরাতত্ত্ববিৎ জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ্‌ প্রথমে এই অনুসন্ধানকার্যে হস্তক্ষেপ করেন । তিনি সেনরাজবংশের নরপতিবর্গের এক নামাবলী স্থির করিয়া যান । তাহা এইরূপ :—

খৃষ্টাব্দ ।	নরপতির নাম ।
১০৬৩	বিজয়সেন ।
১০৬৬	বল্লালসেন ।
১১১৬	লক্ষ্মণসেন ।
১১২৩	মাধবসেন ।
১১৩৩	কেশবসেন ।
১১৫১	সদাসেন ।
১১৫৪	নারায়ণ ।
১২০০	লছ্মণিয়া ।

এই তালিকা অনুসারে লছ্মণিয়া লক্ষ্মণসেনের বহুপরবর্তী নরপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন । ইহার পর আর আলেক্‌জান্ডার কনিংহাম্‌ কতকগুলি তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি ও আইন আকবর অবলম্বনে আর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন । তাহা এইরূপ :—

খৃষ্টাব্দ ।	নরপতির নাম ।
১০২৫	বিজয়সেন ।
১০৫০	বল্লালসেন ।
১০৭৬	লক্ষ্মণসেন ।
১১০৬	মাধবসেন ।
১১০৮	কেশবসেন ।

খৃষ্টাব্দ ।

নরপতির নাম ।

নামও মনঃপূত বা ব্যাকরণসম্মত হইল না ;

১১১৮

লছ্মণিয়া ।

তখন লছ্মণিয়া “লক্ষণসেন” বলিয়াই অস্মিত

১১২৮

বক্তিরারের বঙ্গবিজয় ।

হইলেন । এই অস্মিত বিগত অর্ধশতাব্দীর

এই তালিকা অমুসারেও লছ্মণিয়া লক্ষণসেনের বহুপরবর্তী নরপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন । মিন্‌হাজ বখেন, লছ্মণিয়ার রাজ্যাদের ৮০ অব্দে বক্তিরার বঙ্গদেশে উপনীত হন । মিথিলাপ্রদেশে “লক্ষণাক্ষ” নামে এক অল্প প্রচলিত আছে ।

খৃষ্টীয় ১১১৯ সাল তাহার আরম্ভকাল । এই প্রমাণ অবলম্বনে বক্তিরারের বঙ্গদেশে আগমন ৮০ লক্ষণাক্ষে অস্মিত হইলে, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—লছ্মণিয়াই লক্ষণসেন । ৮০ বৎসর রাজ্যভোগ করা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না । লক্ষণসেন পরিণতবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করায়, তাহার ১১২৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে । তদীয় রাজ্যাদের ৮০ সালে বক্তিরারের বঙ্গদেশে উপনীত হওয়া সত্য হইলেও, তৎকালে লক্ষণসেনের জীবিত থাকা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ।

কিন্তু এই অস্মিতই ক্রমে ক্রমে বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে । এখন লক্ষণসেনের পুত্র পর্যাস্ত সেনরাজবংশের নরপতিবর্গের নামাবলী বিবিধ তাত্রশাসনে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং লক্ষণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের যবনসমরে বিজয়ী প্রলয়কালরুদ্র বলিয়া পরিচিত থাকাও প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে লছ্মণিয়া যে প্রকৃত নাম নহে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবামাত্র, কেহ কেহ ঐ নাম সংশোধনের চেষ্টা করিয়া উহাকে লাক্ষণ্য-আখ্যা প্রদান করেন । লাক্ষণ্য-

তুলিয়াছে :—

“—এই সেই নবদীপ,

যেখানে বীর আখ্যকুলের প্রদীপ

বজ্রেশ লক্ষণসেন, প্রবৃত্ত আহারে,

শুনি সপ্তদশ সেনা উপনীত হারে,

অতাত্ত-প্রতাপমতিত্ব-সহিত,

পশ্চাদ্ধার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,—

একেবারে না চাহিয়া দক্ষিণে ও বামে,

একেবারে উপনীত বারাগনীধামে ।”

কবিকুল নিরঙ্কুশ !—বঙ্গদেশের স্বরগীর বীরচরিত্র বিকৃত করিবার সময়ও নিরঙ্কুশ ! এতই নিরঙ্কুশ যে,—প্রাণভয়ে ভীত পলায়ন-পরায়ণ লক্ষণসেন মুসলমানসেনার আক্রমণে দূরে পলায়ন না করিয়া, মুসলমানের নবাধিকৃত বারাগনীধামে গমন করায়, কাব্যে কতখানি অসঙ্গত হইয়া উঠিল, তাহার প্রতিও রুদ্ধেপ নাই !

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রও লক্ষণসেনকেই পলায়নের কলকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু নবীনচন্দ্র ইহা লইয়া পরিহাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন নাই ; মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র সে মর্ম্মবেদনার বধ্যসাধ্য উপশম-সাধনার্থ পশুপতিরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া

করিয়া, যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিতেন, তথায় পশুপতি উপবিষ্ট বলিয়া আক্ষেপপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখানে পশুপতির নাম গৃহীত না হইলেই ভাল হইত। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠের নামই পশুপতি। তিনি বিবিধশাস্ত্রবিশারদ সাধুবাক্তি ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি বড় নিদ্রারূপে বঙ্গসাহিত্যে পদবিদলিত হইয়াছে।

বরেন্দ্রভূমি সেনরাজবংশের আদিরাজ্য ছিল না। বিজয়, বল্লাল ও লক্ষণ ক্রমে ক্রমে তাহা পাল-নরপালগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বক্তির্যারের আগমন-সময়ে এই প্রদেশে সেনরাজবংশের সূদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকায়, লক্ষণের পুত্রগণ আদি-রাজ্যরক্ষার্থ বরেন্দ্র পরিত্যাগ করায়, বক্তির্যার তাহা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। বঙ্গরক্ষাই লক্ষণের পুত্রগণের লক্ষ্য ছিল, তাহাতে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে কৃতকাৰ্য্য হইবার কথা মুসলমানের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণ অবস্থায় বক্তির্যার খিলিজির বঙ্গবিজয়ে সেনরাজবংশীয় কোন নরপতিরই কলঙ্ক ঘোষিত হইতে পারে না। ঘটকদিগের গ্রন্থে যে পুরাতন জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে, তদনুসারে লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেনের গোড়রাজ্য পরিত্যাগ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেশবসেন গোড়রাজ্য পরিত্যাগ করিলেও, রাঢ় ও বঙ্গ পরিত্যক্ত হয় নাই। বক্তির্যার খিলিজি পরিত্যক্ত গোড়-বিভাগই অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অপরিত্যক্ত রাঢ় ও বঙ্গবিভাগ অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইতে হইয়াছিল। রাঢ় বক্তির্যার

খিলিজির জীবিত থাকা পর্য্যন্ত অধিকৃত হয় নাই; বঙ্গ বক্তির্যার খিলিজির মৃত্যুর পর অরুণতাকী পর্য্যন্তও অধিকৃত হয় নাই;— তাহার প্রমাণ মুসলমানের ইতিহাসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গকবি পলায়নকলঙ্কের সরস কবিতায় বঙ্গসাহিত্যে পূর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষণায়ুজ বিশ্বরূপসেনের স্বদেশরক্ষার কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য লেখনী-চালনা করেন নাই।

লক্ষণসেন দুর্বলহস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেন নাই। তাঁহার শাসনসময়ে গোড়ীয় হিন্দুমাত্রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। অত্মাপি মিথিলাপ্রদেশে “লক্ষণ-সংবৎসর” প্রচলিত থাকিয়া লক্ষণসেনের রাজ্যবিস্তারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিশ্বরূপসেনের তাম্র-শাসনে লিখিত আছে :—

“বেলায়াং দক্ষিণাক্ষে মুসলধরদাপাশিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিবেশরক্ত ক্ষুরদসিবরণাঙ্গেবগন্ধোদ্রিতাজি ।
ঔরোংসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমথারন্তনির্বাণপূতে
গোনাট্টেগজযুগৈঃ সহ সমরজয়ন্তমাল্য জ্ঞায়াং ॥”

এই বর্ণনার সহিত লক্ষণসেনদেবের “অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি”-নামক সূদীর্ঘ উপাধির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবিস্তৃত গোড়ীয় হিন্দুমাত্রাজ্য যে প্রণালীতে শাসিত হইত, তাম্রশাসনে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লক্ষণশাসনসময়ে গোড়ীয় হিন্দুমাত্রাজ্য যে স্বরক্ষিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল হইতে মিথিলার পথে কেহ আক্রমণ করিলে, তাহার গতিরোধের কোন উপায় ছিল না।

বনভ্রমণে ও গিরিভ্রমণে রাতের পশ্চিমাঞ্চল অরক্ষিত ছিল ; করতোয়ার প্রবল প্রবাহ এবং করতোয়াতটাবস্থিত প্রান্তভূগর্ভ উত্তরবঙ্গের পূর্বাঞ্চল অরক্ষিত করিয়াছিল । কিন্তু উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল কাশী পর্য্যন্ত অবিভূত সমতলক্ষেত্র ;—তাহা কোনরূপে দুর্গাদি দ্বারা অরক্ষিত ছিল না । কাশীরাজ্য যখন হস্তে পতিত হইবার পর, কাহারও পক্ষে সহজে মিথিলা ও উত্তরবঙ্গ রক্ষা করিবার সম্ভাবনা ছিল না ;—তজ্জুহই তাহা কেশব-সেন-কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব । গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতির প্রাণভয়ে অস্তঃপুর হইতে পলায়ন করা সত্য হইলে, বক্তিম্বার খিলিজি সমগ্র গোড়ীয় হিন্দু-সাম্রাজ্যেই অধিকারবিস্তার করিতে পারিতেন ; তাঁহাকে উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না । মিন্‌হাজ পুরাতন সৈনিকের মুখে যে গল্পগুজব শ্রবণ করিয়া-ছিলেন, তাহা যে গল্পমাত্র,—ঐতিহাসিক সত্য নহে, এই ঘটনাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ।

বক্তিম্বার খিলিজির উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া লক্ষণাবতীতে রাজধানীস্থাপন করার কথা মুসলমানের ইতিহাসে লিখিত থাকিলেও কোন সময়ে এই কার্য সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে । বক্তিম্বার খিলিজি বিহার অধিকার করিবার পরই উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন । কিন্তু তিনি তথায় বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না । ৫৯৯ হিজরীতে (১২০১ খৃষ্টাব্দে) সুলতান যখন কাশ্মীরের দুর্গ জয় করিয়া কাশ্মীর অধিকার করেন, তখন

বক্তিম্বার খিলিজি বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত সম্রাটের গোচর করিয়া উপাটকনপ্রদানার্থ তাঁহার নিকট উপনীত হন । মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তিম্বার এই সময়ে বিহার হইতেই সম্রাটের নিকট গমন করিয়াছিলেন ; এবং সুলতানের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়া বহুসংখ্যক অপরিস্কৃত হিন্দুদেবমন্দির ধ্বংস ও অটিল করিয়া পরমশুভ্র মোহাম্মদীয় ধর্মের উপাসনাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন । সূত্রাং ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিম্বারের বঙ্গবিজয় এবং তাঁহার ষাটশব্দ বঙ্গদেশশাসনের কথা কেবল কথার কথা ।* ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ আক্রান্ত ও ১২০১ খৃষ্টাব্দের পর তথায় মুসলমানশাসনের স্বরূপাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় । গোড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের যে অংশ এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মুসলমানের করতলগত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অধিকার করিতে বক্তিম্বার খিলিজির তিন-চারি-বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল । ইহার পর তিনি ছইবৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন । সে ছই বৎসরের ইতিহাস কেবল সৈন্তসংগ্রহ, যুদ্ধকলহ, মহানন্দার তীর হইতে করতোয়ার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধাভ্যাস, করতোয়া উত্তীর্ণ হইবার পর প্রত্যাগমন ও পথিমধ্যে মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ বিবরণে পরিপূর্ণ । সূত্রাং বক্তিম্বার খিলিজির প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সসৈন্তে নানাহান পরিভ্রমণ করা ভিন্ন যথার্থীতি শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া ও ষাটশ-

* এই সকল কারণে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিম্বার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের কথা লিখিত হইয়া থাকিবে ।

বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করা বিখ্যাস করা যায় না। যাহারা পলায়নপর কাপুরুষ বলিয়া কাব্যে, উপন্যাসে ও ইতিহাসে লিখিত, তাহাদের দেশে বক্তিত্যার খিলিজির বীরবাহু দ্বাদশবৎসরেও মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, তাহার কারণপরম্পরার বিস্তৃত বিবরণ বিলুপ্ত হইলেও, তাহা অসম্ভব করিয়া লইতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে না। ইতিহাসে যত কথা লিখিত আছে, তাহা সত্য হইলে, এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত না। বক্তিত্যার খিলিজি যে ৩৫বৎসর অয়ঃ উত্তরবঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত কাহিনী “রিয়াজ-উদ্-মালাতিন” হইতে উদ্ধৃত হইল।

“অতঃপর* বক্তিত্যার থেতা† ও তাঁর বৎসরাক্রমণের জন্ত ১০১২হাজার অপরোহী দৈত্য লইয়া বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব পার্বত্যপথে গমন করিলেন। পশ্চিমঘো কোচ-প্রদেশের আলিমেচ-নামক জনৈক শ্রেষ্ঠব্যক্তি বক্তিত্যারের হস্তে পবিত্র এসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

* “When several years had elapsed he (Bakhtiyar) received information about the territories of Turkistan and Tibet to the east of Lakhlanti and he began to entertain a desire of taking (them). For this purpose he prepared an army of about ten thousand horse.” Tabakht-i-Nasiri. *Trans.*

† ট্যুর্ট-সাহেব এখানে এক বৎসর (In the course of a year) বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।—Stewart's Bengal. p. 28.

‡ তুর্কিস্থানের নাম।

§ গোলাম হোসেন এখানে স্থানের নাম লইয়া গোল করিয়াছেন। অথবা তাহার অপরাধ কি? হস্তলিখিত ‘নাসিরী’পুস্তক একজ্ঞ দায়ী। পরবর্তী লেখকে এগুলি নানারূপে পাইয়াছে। কথিত নগরটি ‘বর্দনকোট’ ও নদীর নাম ‘বায়মতী’—নাসিরীগ্রন্থের অনেক খণ্ড মিলাইয়া এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বগুড়াজেলার উত্তরাংশে গোবিন্দগঞ্জের নিকট করতোয়া-নদী-তীরে প্রাচীন বর্দনকোটের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। ‘বায়মতী’ই করতোয়া এবং দশদিন ধরিয়া করতোয়া ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর পার্শ্ব দিয়া বক্তিত্যারের সৈন্তেরা যাত্রা করে,—পণ্ডিতবর বুক্‌ম্যান এইরূপ অসম্ভবান করেন।

§ ইলিয়ট-সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদে খিলান-সংখ্যা ২০টি এবং ট্যুর্টের গ্রন্থে ২২টি, অথচ উভয়েই এক নাসিরীগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন। সম্ভবত মূলগ্রন্থের বিংশত্যধিক (Twenty odd) কথা নানা জনে নানা ভাবে লইয়াছেন।

ইনি বক্তিত্যারের সৈন্তগণের পার্বত্যপ্রদেশের পথপ্রদর্শক ও অগ্রগামী হইলেন।

“আলিমেচ বক্তিত্যারের সৈন্তগণকে অস্ত্র একটি প্রদেশে লইয়া যান। ঐ প্রদেশে আবদান ও বরমনগতি নামক নগর বর্তমান ছিল। পূর্বতন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই নগর রাজা গরসাসেপের কীর্তি। গঙ্গা-নদীর ত্রিগুণ গভীরতা ও বিস্তার বিশিষ্ট নমকদী-নামী এক নদী ‡ ঐ নগরের সম্মুখে প্রবাহিত হইত। উহা পার হইবার কোন উপায় ছিল না। একজ্ঞ বক্তিত্যার ঐ স্থান ভাগ করিয়া দশদিন পরে অস্ত্র একস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ছিল; উহা ২০টি প্রস্তর-নির্মিত খিলানের উপর দণ্ডায়মান। §

“ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, গরসাসেপ যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন ঐ সেতু নির্মাণ করিয়া তিনি কামরূপে আসিয়াছিলেন। মোহম্মদ বক্তিত্যার সেতু-পথে নদী পার হইয়া অগসর হইলেন। দুই-

জন অঝোরোহী কতিপয় দৈনিক সহ পূলের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত রহিল। কামরূপের রাজা অগ্রসর হইতে বাধা দিয়া কহিলেন,* 'বদি অধুনা তীক্ষ্ণ-অভিযানে ক্রান্ত হইয়া অগামী বর্ষে উপযুক্ত সৈন্ত ও দূত সহ বখ্তিয়ার আগমন করেন, তবে তিনি এসলাম-সৈন্তের অগ্রগামী হইয়া (তাহাদের সহায়তা-সাধনার্থ) পরিশ্রম করিবেন।' কিন্তু বখ্তিয়ার কামরূপের রাজার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ষোড়শ-দিবস পরে তীক্ষ্ণ-দেশে উপনীত হইলেন। তথায় গরাসাপ শাহের এক সূদূত চুর্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বহু এসলাম-সৈন্ত নিহত হইল, তথাপি বখ্তিয়ার চুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না।

“শত্রুপক্ষীয় যে সকল লোক বন্দী হইয়া ছিল, তাহাদের নিকট বখ্তিয়ার অবগত হইলেন যে, উক্ত চুর্গের পঞ্চকোশ দূরে এক বৃহৎ নগর আছে।† পঞ্চাশৎসহস্র ধর্ম্মধারী তুর্কী অঝোরোহী ঐ নগরে অবস্থান করে। প্রতাই ঐ নগরের অধিবাসীগণে ১৫শত অশ্ব বিক্রীত হয়। এই স্থান হইতেই লাক্কোতী-দেশে অশ্ব পৌরিত হইয়া থাকে।‡ বন্দিগণ কহিল, ‘এই সামান্যসৈন্তবলে উক্ত নগর অধিকার করা অসম্ভব।’ বখ্তিয়ার নগরের চরাক্রম্যতা চিন্তা করিয়া নিরাশ-ভাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যা-

বর্তনের সময় তাঁহাকে বিবম ছরবছার পড়িতে হইয়াছিল। দেশের অধিবাসিগণ ষাণ্ডদ্রব্য ও গৃহপালিত পশু সহ স্ব স্ব আবাস-গৃহসকল দগ্ধ করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া পর্বতশৃঙ্খার লুক্কায়িত হইয়াছিল। প্রত্যাগমনের পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত বখ্তিয়ারের সৈন্ত কুত্রাপি মনুষ্য বা পশুর আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে পারিল না। পঞ্চদশ দিন কেবল পশুমাংসে জীবনরক্ষা করিয়া বখ্তিয়ার সৈন্তে সেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। সে দুইজন অঝোরোহীকে বখ্তিয়ার সেতুর রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, পরস্পর বিবাদ করিয়া তাহারা প্রস্থান করিলে, তদ্বংশের অধিবাসিগণ সেতু ভগ্ন করিয়া কেলিয়াছিল। আশায়িত হইয়া বখ্তিয়ার সেতুর নিকট আসিগাছিলেন, সেতু ভগ্ন দেখিয়া সকলেরই হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। বখ্তিয়ার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনেক অল্পসম্মানে সংবাদ পাওয়া গেল যে, নিকটবর্তী একস্থানে একটি বৃহৎ দেবালয় আছে। ঐ দেবালয়ে রোপা ও স্বর্ণ নিখিত অতি বৃহৎ বৃহৎ নিজীব মূর্তিসকল দণ্ডায়মান ছিল। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ দেবালয়ে সহস্র-সংখ্যক পরিমিত একটি দেবমূর্তি ছিল। বখ্তিয়ার স্বীয় সৈন্তসহ ঐ দেবালয়ে অবস্থান করিয়া নদী উত্তরণের জন্য তরি নির্মাণ করিতে লাগিলেন।

* বখ্তিয়ারের গন্তব্যপথ কামরূপরাজ্যের পার্শ্বদেশ ও কথিত সেতু দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী স্থানে ছিল, ইহাট বুকম্যান-সাহেবের বিশ্বাস। বর্তমানেও মেহজাতির বাসস্থান হইতে অন্তান্ত পার্শ্বভ্যক্তির বাসস্থানের সীমান্তরেখা দার্জিলিং-এর ৬কোশ দক্ষিণ পাক্কাবাড়ী-নামক স্থান।

† নাসিরী-পুস্তকে এই নগরের নাম—‘করবটান’ বা ‘করবাটান’। ইহার স্থান অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

‡ এগুলি ‘টাঙ্গট’ বোড়া (Tang) বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। নাসিরী-পুস্তককার বলিয়াছেন, তীক্ষ্ণ হইতে কামরূপ আসিতে ৩৫টি পার্শ্বভ্যক্ত আছে। এই সমস্ত পথ দিয়া এ দেশে অশ্ব আনীত হইত।

“কামরূপাধিপতির আদেশে ঐ দেশের সৈন্য ও প্রজাবর্গ দেবালয়-অবরোধার্থ তাহার চতুর্দিকে বাশের খুঁটিসমূহ প্রোথিত করিয়া প্রাচীরের স্থায় প্রস্তুত করিল। দেবালয়ে অবস্থান করিলে মৃত্যু নিশ্চিত দেখিয়া বখ্তিয়ার সসৈন্যে প্রাচীরের দিকে যুদ্ধার্থ ধাবিত এবং এক দিকে ভগ্ন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন। শত্রুসৈন্য নদীকূল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

“মোসলমানসৈন্য সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নদীতীরে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের কতক সৈন্য তরবারির আঘাতে নিহত, কতক বা নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই সময় হঠাৎ বখ্তিয়ারের একজন অধা-

রোহী নদীতে অবতরণ করিল। একটি বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে যতদূর যায়, জলমধ্যে সে ততদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিল। তদর্শনে সমস্ত সৈন্য জলে অবতরণ করিল। নদীর গর্ভ কেবল বালুকাময় ছিল, বহুলোকের পদাঘাতে উহার বালুকারাশি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া জলের গভীরতা বৃদ্ধিত হওয়ায় বহু সৈন্য জলমগ্ন হইল। কেবল বখ্তিয়ার ও একসহস্র অধারোহী (মতান্তরে ৩০০ শত) পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। হতাবশিষ্ট সন্ধিগণ সহ বখ্তিয়ার ভগ্নদেহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গুরুতর অবসাদে তাঁহার অর ও কাশরোগ হইল। তিনি দেবকোটে উপনীত হইয়াই পঞ্চদশপ্রাপ্ত হইলেন।”

সমাপ্ত ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

সার সত্যের আলোচনা ।

• আলোচ্য বিষয় ।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে, কৃত্তরভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিবার সময় লোকে করজোড়ে উদ্বেগুটিপাত করে, অথচ সর্বসাধারণের ইহা ক্রব বিশ্বাস যে, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বাঙ্গবাসী ; ইহার ভাবনানা কি ? আমাদের দেশের শাস্ত্রে তো আছেই—“তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি স্বয়ম্ দিবীৰ চক্ষুরাততম্”—সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্বদা

দেখেন হরিগণ ছালোকে ঘেন চক্ষু আতত” ; তা ছাড়া, অত্রান্ত দেশেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি যত্র-তত্র শুনিতে পাওয়া যায়—যেমন এই একটি কথা—“Heart within and God o’erhead”। ইহার কারণ কি ? কারণ হ’চ্ছে এই :—

মনে কর, তোমার আত্মার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; কোথায় আমি তোমার আত্মার সাক্ষাৎ পাইব ? তুমি হয় তো বলিবে যে, “খাঁচার

মধ্যে যেমন পাখী থাকে—আমার শরীরের মধ্যে তেমনি আত্মা আছেন।” কিন্তু সে কথা হইতে পারে না—এইজন্ত—যেহেতু ভিতর-বাহির দূর-নিকট প্রভৃতি কোনোপ্রকার আকাশঘটিত সঙ্কর নিরাকার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আত্মাকে নাগালই পায় না—স্পর্শ করিবে কেমন করিয়া? আকাশঘটিত কোনোপ্রকার সঙ্কর আত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারুক, তথাপি তোমার সহিত আমি যখন বাক্যালাপ করিতেছি তখন কাজের গতিকে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তোমার আত্মা আমার ডাহিনেও নহে—বামেও নহে—উপরেও নহে—নীচেও নহে—পরস্তু সম্মুখে বর্তমান; কেন না, তোমার সহিত বাক্যালাপের সময় তোমার আত্মা তোমার মুখ-চকুর অভ্যন্তর হইতে উঁকি দিতেছে, এই ভাবে আমি তোমার আত্মাকে উপলব্ধি করি। এক-তো আত্মা অনাকাশে অবস্থিতি করেন, আর, সেইজন্ত ভিতর-বাহির-দূর-নিকট প্রভৃতি আকাশঘটিত সঙ্কর আত্মাতে সংলগ্নই হয় না; তাহাতে আবার, যদি-বা পাঁচজনের মতে মত দিয়া মোটামুটি মানিয়া লওয়া যায় যে, আত্মা শরীরের ভিতরে আছেন, তাহা হইলে আর-এক দিকে গোল বাধে এই যে, আত্মা তো মনুষ্যের সর্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; আমরা তবে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলেরই প্রতি লক্ষ্য করি কেন? পদাঙ্গুলির প্রতি লক্ষ্য করি না কেন?

উপরে যাহা ইঙ্গিত করা হইল, তাহাতে সহজ-বুদ্ধিতে সহজেই এইরূপ প্রতীতমান

হইতে পারে যে, যে-কারণে লোকে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপ্ৰেরণ করে, সেই কারণে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় উক্ত আকাশে দৃষ্টিপ্ৰেরণ করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সে কারণ কি?

ত্রক্ষাণ্ডের ব্যবস্থা।

সে কারণ যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে চারিটি বিষয় আবশ্যপূর্বক বুঝিয়া দেখা আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র ত্রক্ষাণ্ডের ব্যবস্থা।

(২) বৃহৎ ত্রক্ষাণ্ডের ব্যবস্থা।

(৩) দুয়ের দৌসাদৃশ্য।

(৪) সমস্তের সার্বাঙ্গিক ঐক্য।

আপাতত মনে হইতে পারে যে, মনুষ্য-শরীরে রক্তবাহিনী নাড়ির নদী-নালা, বায়ু-বাহিনী নাড়ির ডালপালা, তৈজসতত্ত্বের মাকড়সার জাল, অস্থি'র ইষ্টক-গাথুনি, মাংসপেশীর কব্জা-বন্ধন, মেদের প্রলেপ এবং মাংসের ছাউনি, এই সকল নানাবিধ উপকরণের একটা পরিপাটি-রকমের ব্যবস্থা আছে; সেই ব্যবস্থার পশ্চাৎ ধরিয়া প্রাণ-মন-বুদ্ধি অনাহতভাবে একে একে শরীরের মধ্যে আসিয়া জোটে; পক্ষান্তরে, বহির্ভাগে সকলই এলোমেলো কাণ্ড;—সেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির বাসের উপযোগী না আছে বসিবার আসন, না আছে শোবার বিছানা, না আছে ব্যবহার্য-দ্রব্যাদির আয়োজন;—সেখানে কেহ কাহাকেও চেনে না—কেহ কাহারো ধোঁজ লয় না—কেবল একএকটা বিশাল বিশাল কাণ্ড (সমুদ্র—পর্বত—মন্ডলুপি—অরণ্য—ইত্যাকার বৃহৎ বৃহৎ

অনাড় অচেতন ভূত-নিচয়) শত-শত-যোজন জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে যেন কুন্তকর্ণের প্রপিতামহ !

বলিতেছ কি ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা নাট—না তোমার চক্ষু নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি ব্যবস্থা না থাকিবে, তবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা আসিবে কোথা হইতে ? (১) পৃথিবীর স্তরসজ্জা ; (২) বায়ুমণ্ডলের স্তরসজ্জা ; (৩) অন্তরীক্ষের পর্বত এবং পাতালস্পন্দী সমুদ্রের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বোঝাপড়া ;—তুমার মুকুটের ন্যায়রূপী কাচা-নান বায়ু-বোঝাট করিয়া পর্বতসমীপে পাঠাইবেন সমুদ্র, আর, নানা দেশের নানা-জাতীয় মুক্তিকান্তরণ নদনদী-বোঝাট করিয়া সমুদ্রসমীপে পাঠাইবেন পর্বত, উভয়ত এইরূপ আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত ; (৪) বিস্পষ্ট আলোক লইয়া সূর্য্য উঠিবেন দিবা-ভাগে, নিদ্রারসাদি স্নমধুর আলোক লইয়া চন্দ্রমা উঠিবেন রাত্রিকালে, এইরূপ রকম-ওয়ারি আলোকের উদয়াস্তের পালা-বিভাগ ;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের এ ক'ক কম ব্যবস্থা ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ইত্যাকার অনি-র্কণীয় মহা-মহা ব্যবস্থার কোনো একটা'র একচুল এদিক্-ওদিক্ হটুক দেখি—তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার বিপর্য্য-দশা উপস্থিত হইবে। অতএব ব্যবস্থা-পারিপাট্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি ; অণুবীক্ষণের চক্ষেও যেমন তাহা প্রকাশমান, দূরবীক্ষণের চক্ষেও তেমনি তাহা প্রকাশমান। এখন কথা হ'চ্ছে—এই যে, কে জাগে, কে পিছে ? কে বড়, কে ছোটো ? কে দাতা, কে গ্রহীতা ?

কে কাহার খাইয়া মাহুব ? এ কথা'র উত্তর স্পষ্টই পড়িয়া আছে ;—খাদ্যক্ষেত্রের মুক্তিকা-ই মনুষ্যের শরীর গঠিত, সমুদ্রের নৌনুতা জলেই মনুষ্যের রক্ত রসায়িত, সূর্য্যের আলোকেই মনুষ্যের চক্ষু আলো-কিত ; মনুষ্যের নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকাশের বায়ুমণ্ডলেরই জোয়ার-ভাঁটা। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পদার্থটা কি ? না, সেদিনকার আমি বা তুমি বা তিনি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি ? না, যেখানে যত আমি বা তুমি বা তিনি আছেন বা ছিলেন বা থাকিবেন, সমস্ত লইয়া বৃহৎ এক ব্যাপার। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তাহা তো বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেই ; তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই, তাহাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে ; দশবৎসর পরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই অজাত-বালকও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে (বালকরূপে না থাকুক—আর-কোনরূপে আছে) ; আর, একশত-বৎসর পূর্বে যে মহাত্ম্যারা বঙ্গদেশ উজ্জল করিয়াছিলেন, সেই সর্গীয় মহাত্ম্যারাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেন ; কি বেশে এবং কি ভাবে আছেন, সে কথা স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান, প্রাণ, মন প্রভৃতি যেখানে যত-কিছু ব্যাপার আছে, সমস্তেরই আকর-ভূমি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। অতএব এটা স্থির যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বড়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ছোটো ; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দাতা, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গ্রহীতা ; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড চিরযৌবনসম্পন্ন কত-কালের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ তাহা বলা যায় না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-গুলি সেদিনকার অভিনব বালক, তাহার মধ্যে অনেকে অকালবৃদ্ধ।

ছই পক্ষের নাম তুমি বাহাই দেও না কেন—সমষ্টি-বাষ্টি নামই দেও, বড়-ছোটো

নামই দেও, আর দাতা-গ্রহীতা নামই দেও—
নাম যাহা দিতে হয় দেও, কেবল এইটি
মনে রাখিও যে, ছুই পক্ষ একহস্তে গাঁথা।
সে হস্ত হ'লে নাস্তিক্যিক ঐক্য। কাজেই
ছুরের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যস্বাবী। সম্বন্ধ যখন
অবশ্যস্বাবী—তখন সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্যও
অবশ্যস্বাবী। সে কার্য্য কি? না, অভাবের
পূরণ। অভাব কাহার? সে ছোটো। যে
গ্রহীতা, যে ব্যক্তি, তাহার : ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের।
অভাবের পূরণকর্ত্তা কে? না, যিনি বড়।
যিনি দাতা, যিনি সমষ্টি, তিনি ;—বৃহৎ
ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড,
দোহার মধ্যে ব্যাপার যাহা চলিতেছে, তাহা
সংক্ষেপে এই :—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড চা'ন।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ছান।

(৩) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পা'ন।

চাওয়ার সহিত পাওয়ার সংযোগের নামই
আনন্দ। চাওয়ার পূরণচেষ্টার নামই
কর্গচেষ্টা এবং চাওয়ার পূরণের নামই ভোগ।
একাকী কেবল আমি নহি বা তুমি নহি,
পরন্তু জগৎওক্ক সমস্ত লোকই চাহিতেছে,
চেষ্টা করিতেছে, পাইতেছে; কাজেই,
চাওয়ার সহিত চাওয়ার সুর-মিলানো চাই,
চেষ্টার সহিত চেষ্টার সুর-মিলানো চাই,
পাওয়ার সহিত পাওয়ার সুর-মিলানো চাই;
লোকমধ্যে একটা ব্যবস্থা চাই। চাহি-
বারও একটা ব্যবস্থা আছে, চেষ্টা করিবারও
একটা ব্যবস্থা আছে, পাইবারও একটা
ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাকে উন্নত্বন করিয়া
চাইলে চাওয়াও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উন্ন-
ত্বন করিয়া চেষ্টা করিলে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়,

ব্যবস্থাকে উন্নত্বন করিয়া পাইলে পাওয়াও
নিষ্ফল হয়। দৈত্যদানবেরা যখন দেবজা-
দিগের যজ্ঞের ভাগ হরণ করিয়া “পাইয়াছি”
বলিয়া আত্মসাৎ নৃত্য করে, তখন তাহাদের
জানা উচিত যে,—

“অধর্মেইথে তে ভাবং ততো ভ্রামসি পশুতি।

ততঃ সপত্নান জয়তি সমলম্ভ বিনমতি।”

“অধর্মের দ্বারা লোকে তো বুকি পায়, তাহার
পরে কল্যাণ ছাপে, তাহার পরে শত্রু-
দিগকে জয় করে, সমূলে কিন্তু বিনাশ
পায়।” ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্য-
ঙ্গের মধ্যেও যেমন—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গের মধ্যেও তেমনি ইহা পূর্বে দেখা
হইয়াছে। তা ছাড়া, ছুই ব্রহ্মাণ্ডের পর-
স্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগেরও
একটা ব্যবস্থা আছে: সে ব্যবস্থার একটা
নামসামান্য নমুনা এই :—

কৃষা হ'লে চাওয়া; ক্ষেত্রকর্ষণ হ'লে কন্ম-
চেষ্টা; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজাত অঙ্গ দ্বারা
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদরপূরণ হ'লে ভোগ।
ক্ষমবোধ করিতে হইবে, কর্গচেষ্টা করিতে
হইবে, অন্নভোজন করিতে হইবে, এই
হ'লে ব্যবস্থা। তুমি হয় তো বলিবে যে,
“এ যে ব্যবস্থা তুমি দেখাইতেছ—এটা বড়-
একটা নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা; উহার নাম
করিতে লজ্জাবোধ হয়! সমুদ্রা দেবভূলা
জীব—সে কিনা পেটের জালায় লাঙল
ধরিবে! ধিক্!” মুখে বলিতেছ—“নীচের
শ্রেণীর ব্যবস্থা”—কিন্তু যেই নীচশ্রেণীর
ব্যবস্থা উন্নত্বন করিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থায়
ওঠা দেখি—তখন তুমি বীরপুরুষ!
তোমার উদরে একদিন অন্ন না পড়িলে

তোমার সাধের মস্তিষ্ক চতুর্দিক্ ভৌঁভাঁ দেবিতে থাকিবে! কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, হরেরই ব্যবস্থা এমনি কড়াকড় যে, মস্তক যে মাথা উঁচু করিয়া উদরকে বলিবেন—“তুমি কোনো কাজের নহ, তোমাকে চাহি না”; অথবা উদর যে পিস্তবমন করিয়া মস্তককে বলিবেন—“তুমি কোনো কাজের নহ, তোমাকে চাহি না”; স্বর্ঘ্য যে চোখ রাঙাইয়া পৃথিবীকে বলিবেন—“দূর হও, তোমাকে চাহি না”; অথবা পৃথিবী যে মুখ নাকাইয়া স্বর্ঘ্যকে বলিবেন—“তুমি যাও, তোমাকে চাহি না”; তাহার জো নাই। সকলেরই সকলকে চাহিতে হইবে—তবে কিনা ব্যবস্থা অল্পসারে। উদর যদি চায় যে, “মস্তক আমার কাজ করুন, আমি মস্তকের কাজ করিন”, তবে দেরূপ চাওয়া ব্যবস্থাবিহীন, সুতরাং নিতান্তই নিষ্ফল।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ব্যবস্থা প্রধানত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরই ব্যবস্থা—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা সেই মূল ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। কথাটার ভাব এই :—

সমস্ত-শরীরের যেমন মস্তিষ্ক আছে বাহরও তেমনি মস্তিষ্ক আছে; বাহর মস্তিষ্ক বাহনুলে অবস্থিতি করে। কিন্তু “মস্তিষ্ক” বলিতে প্রধানত মাথার মস্তিষ্কই বুঝায় বাহর মস্তিষ্ক বুঝায় না। অঙ্গুলি যদি বলে যে, “মাথার মস্তিষ্কের খবরে আমার কি কাজ—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ?” আমার কাছে বাহর মস্তিষ্কই মস্তিষ্ক। তবে অঙ্গুলির মুখে সে কথা শোভা পাইলেও মস্তকের মস্তিষ্ক সে কথার কখনই

সার দিতে পারে না; মস্তকের মস্তিষ্ক হাসিয়া বলে যে, “আমি যদি শক্তিসংহার করি—তবে বাহর মস্তিষ্ক সেই দণ্ডে আড়ষ্ট হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িবে, তাহা সে জানে না।” ফল কথা এই যে, সমস্তির কাছে ব্যষ্টির প্রভু খাটে না। বাহনুলের প্রভু অঙ্গুলির কাছেই খাটে—মস্তকের কাছে খাটে না। বাহর মস্তিষ্ক এবং মস্তকের মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের মধ্যেও তেমনি ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ। কাজেই বলিতে হয় যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষই মুখ্য হিরণ্ময় কোষ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ তাহার একটা চূড়ক অঙ্গুলিপি বা প্রতিলিপি। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রদল আসন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রাংগ আসন। অতএব সর্বব্যাপী এবং সর্বাস্ত-যামী পরমেশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় লোকের চক্ষের চাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া হইই যে স্বভাবতই উক্কে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের দিকে—প্রত্যা-বর্তন করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে।

পূর্বে বলিয়াছি যে, স্বর্ঘ্যের এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা। স্বর্ঘ্য এক সময়ে পৃথিবী ছাড়াইয়া আরো অনেকদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। “কে বলিল?” বলিয়াছেন কম কেহ ন’ন—জ্যোতির্বিদ্যা! বিজ্ঞান কথার ভাবে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, আদিমকালে মহৎ এক তৈজসপদার্থ—অতীব

স্বল্প তৈজসপদার্থ—নিখিল আকাশে পরি-
 ব্যাপ্ত ছিল : সেই স্বল্প তৈজসপদার্থ
 হইতে পৃথিবাদি লোকমণ্ডল প্রসূত হইল ।
 পৃথিবী স্বর্ষ্য হইতে নীচে নাবিয়া আসিয়াছে
 অনেকদূর পর্য্যন্ত ;—স্বর্ষ্য পৃথিবীর প্রাণকে
 উপরের দিকে অর্থাৎ আপনার দিকে টানি-
 তেছে । তা'র সাক্ষী—বৃক্ষের মূল বা মস্তক
 বন্ধি-চ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তথাপি
 বৃক্ষেরা উর্কে হাত-পা ছুঁড়িয়া আকাশের
 অভিমুখে ডালপালা বিকীর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত
 থাকিতে পারে না । বৃক্ষেরা ভূগর্ভ হইতে
 মূল বা মাথা বাহির করিতে পারে না—
 সর্পেরা কিন্তু তাহা পারে । তবে কিনা
 সর্পেরা পৃথিবীর সঙ্গে লপ্টা-লপ্টি-ভাবে চলা-
 ক্ষেরা করে । পখাদি জন্তুরা কেহ বা সর-
 সর হুই স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ
 হইয়া দাঁড়ায়—যেমন সারসপক্ষী ; কেহ বা
 মোটামোটা চারি স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী
 হইতে অলগ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন হস্তী । জীব-
 গণের মধ্যে মনুষ্যই কেবল একাকী পূর্ণ-
 মাত্রায় পৃথিবী হইতে মাথা উঁচু করিয়া
 দাঁড়ায় । মনুষ্যের মস্তক বেগন পৃথিবী হইতে
 উর্কে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনুষ্যের অপার্থিব
 বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করে, মনুষ্যের
 চাওয়াও তেমনি পৃথিবী হইতে উর্কে উন্মুখ
 হইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয়-
 প্রদান করে ।

মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রাণের চাওয়া
 স্বভাবতই দুই দিকে দোড়ে—মনুষ্যের দিকে
 এবং পরমেশ্বরের দিকে । মনুষ্যের চক্ষের
 চাওয়াও তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া সম্মুখে মনু-
 ষ্যের চক্ষুর প্রতি এবং উর্কমুখে ঈশ্বরের চক্ষুর

প্রতি আকৃষ্ট হয় । আর, ঐ দুই দিকের দৃষ্টি-
 চালনা-কার্য্য বাহাতে অনির্বাণ হইতে পারে,
 তাহার মতো একটা দীপ-বাবস্থাও মনুষ্য-
 শরীরে আছে । অশ্বগবাদির দুই চক্ষু তাহা-
 দের ললাটের দুই পার্শ্বে আড়াআড়ি ভাবে
 বসানো রহিয়াছে—ইহা সকলেরই দেখা
 কথা । কেবল মনুষ্যের এবং মনুষ্যাকৃতি জীবের
 দুই চক্ষু ললাটের সম্মুখে একপংক্তিতে
 বসানো রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ।
 জ্ঞানিতভাইদিগের পরস্পরকে পরস্পরের
 চক্ষের চাওয়ার মধ্য দিয়া মনের চাওয়া
 জানানো চাই—তাই মনুষ্য এবং মনুষ্যাকৃতি
 জীবদিগের দুই চক্ষু সম্মুখদৃষ্টির উপযোগী
 করিয়া ললাটের মধ্যস্থলে একপংক্তিতে
 বসাইয়া রাখা হইয়াছে । তাহার মধ্যে
 বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞানিতভাই-
 দিগের সহিত সম্মুখদৃষ্টি চালাচালি করিতে
 বানরদিগকেও দেখা যায় ; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে
 উর্কে দৃষ্টি প্রত্যাবর্তন করিতে আর-কোনো
 জীবকেই দেখা যায় না । সওয়ার মনুষ্য ।
 কাজেই বলিতে হয় যে, ভ্রমধাস্থিত তৃতীয়চক্ষুর
 উর্কদৃষ্টি মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব ।
 তবে কিনা, মনুষ্য সবে-কেবল হামাগুড়ি
 ছাড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে শিখি-
 রাচ্ছে—এখনো মনুষ্যের তৃতীয়চক্ষু ভাল
 করিয়া কোটে নাই । ফলেও দেখিতে
 পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের চাওয়ার বতটা
 তান মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি, তার সিকির সিকি
 টানও ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি এখনো লোক-
 সমাজে জন্মে নাই । মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি
 চাহিয়া মনুষ্য কি না করে ? মনুষ্যের
 চক্ষুর প্রতি চাহিয়া যোদ্ধা হেলার প্রাণ

জ্ঞান, নাবিক তেলার সমুদ্র পার হয়, কবির কঠোর ফোয়ারা খুলিয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের হৃদয়দৃষ্টি পাষণতেদী হইয়া উঠে। কোনো দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের চতুর্দিক হইতে যদি মনুষ্যমণ্ডলীর চক্ষু স্রুত্রে সরাইয়া রাখা যায়, তবে তাঁহার মহাপ্রতাপান্বিত গোঁড়াবীৰ্য্য-প্রভাবপরাক্রম সমস্তই একমুহুর্তে মাটি হইয়া যায়! দেশশুদ্ধ লোকের আশ্রয়ের চাওয়া এবং চক্ষের চাওয়া, দুইই মনুষ্যের চক্ষুর দিকেই দিবানিশি টঙ্কিত; তা বই। বর্তমান-কালের রক্তবিস্তৃপ্তসমাজে কয়জনের আশ্রয় এবং চক্ষের চাওয়া ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি দিনের মধ্যে একবারও প্রত্যাবর্তন করে? কিন্তু যাহাই হউক না কেন মনুষ্য সত্য-সত্যই কিছু আর পশু নহে—মনুষ্য মনুষ্য।

এটা যখন স্থির যে, তৃতীয়চক্ষুর উদ্বুদ্ধি মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে এই যে, সমুদ্বুদ্ধিই মনুষ্যের সস্বয় নহে। কিন্তু তথাপি সমুদ্বুদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধি, দুয়ের মধ্যে এমনি একটা ক্রমাধিকার-সম্বন্ধ আছে—যাহা কোনো অংশেই উপেক্ষণীয় নহে; সে সম্বন্ধ এইরূপ:—

মনে কর, একটা অরণ্যের মধ্যে শাখায় শাখায় বর্ষাবর্ষি হইয়া এক স্থানে অগ্নি উদ্ভিত হইল। প্রথমে সে অগ্নি বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া সম্মুখে বিস্তৃত হইতে লাগিল,

এবং পরিশেষে সমস্ত অরণ্যটা কবলিত করিয়া আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যে দাবানলের নীচের বিস্তার যত বেগা, তাহার উপরের শিখাগ্র ততই উচ্চে উত্থান করে। আর—একটি দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির শিখাগ্র বিন্দু-পরিমাণ; অথচ সেই স্থানটিতে অগ্নির সমস্ত উত্তাপ যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে—এমনি তাহার প্রবলা দাহিকা শক্তি। তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির নীচের বিস্তার, শিখার উদ্বগমিতা এবং শিখাগ্রের প্রাধিকার, তিনের পরিমাণ পরস্পরের সদৃশ। এই উপমার সাহায্যে মোটামুটি এইরূপ একটা ভাবের উপলব্ধি সহজেই হইতে পারে যে, সমুদ্বুদ্ধির বিস্তার, উদ্বুদ্ধির একতানতা, এবং লক্ষ্য কেন্দ্রের প্রভাবমাহাত্ম্য, তিনের মধ্যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এবারকার প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি লৌকিকভাবে বলিয়া চোকা হইল। বাহা বলা হইল—কথাগুলি মোটামুটি-ধরণের বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলি হৃদয় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তত্ত্ব চাপা দেওয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত তত্ত্বগুলি খোলসা করিয়া ভাঙিয়া না বলিলে পাঠকবর্গের মনের ধন্দ কিছুতেই মিটিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণই বুঝিতেছি। কাজেই সেই হৃদয়তত্ত্বগুলি অবশ্যপ্রকাশ্য—কিন্তু শব্দশব্দে ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আচার্য্য বসু'র আবিষ্কার ।

দৃষ্টিবিভ্রম ।

অধ্যাপক বসুমহাশয় স্নকোশলে কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করিয়া, প্রাণিচক্ষুর সহিত তাহার সাড়ায় ঐক্য কিপ্রকারে আবিষ্কার করিয়া ছেন, তাহা আমরা পূর্বপ্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সেই কৃত্রিম চক্ষুরই কার্য্য পরীক্ষা করিয়া, তিনি কিপ্রকারে নানা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপত্তিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই রৌপ্যময় কোষাকার কৃত্রিম-চক্ষুর মধ্যে এবং তাহার বাহিরের সেই অক্ষিদ্বায়ুসদৃশ রৌপ্যদণ্ডে তার সংলগ্ন করিয়া ইহার বৈজ্ঞাতিক-সাড়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এখন পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম চক্ষুর উপরে যদি আলোকপাত না হয় এবং উভয়েরই আণবিক অবস্থা যদি সমান থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রবাহের অণুমাত্র চিত্র দেখা যাইবে না।* কিন্তু, ভিতর-বাহিরের একপ্রকার সাম্যভাব প্রায়ই দেখা যায় না, এজন্ত অতি সতর্কতার সহিত আলোকপাত বা অপর বাহ্য উত্তেজনা রোধ করিলেও, অনেকসময় তার দিয়া ক্ষীণ বিচ্ছৎপ্রবাহ চলিয়া থাকে। প্রাণি-চক্ষুর অবস্থাও তাই, - অক্ষিপর্দা ও চক্ষু-দ্বায়ুর ঠিক আণবিক সাম্যভাব প্রায় ঘটে

না, কাজেই একটা ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ নিরন্তরই চক্ষুদ্বায়ু বাহিরা মস্তিকে পৌছিতে থাকে। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ থাকিলেই তজ্জাত একটা দৃষ্টিজ্ঞান অবশ্যস্বাভাবী। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিলে ঘোর অন্ধকার দেখি না, - চক্ষু বন্ধ রাখা সঙ্গেও একপ্রকার ক্ষীণ আলোক ("the intrinsic light of the retina") যেন আমাদের চতুর্দিক ঘেরিয়া থাকে। অধ্যাপক বসুমহাশয় বলেন, এই আভ্যন্তরীণ আলোক চক্ষুর নানা অংশের আণবিক-বৈষম্য-জাত ক্ষীণ বৈজ্ঞাতিক তরঙ্গের কার্য্য।

কৃত্রিম চক্ষুতে অতি স্বল্পকালস্থায়ী কোন আলোকপাত করিলে, তদুৎপন্ন বিচ্ছাদের বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না। আলোকপাত রহিত করার পর প্রবাহটা ক্রমে পূর্ণতালাভ করে। তা ছাড়া, যদি পাতিত ক্ষণিক আলোকটা খুব উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞাতিক সাড়া সেপ্রকার স্বল্পকালস্থায়ী হয় না ; তদুৎপন্ন বৈজ্ঞাতিক প্রবাহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রবহমান থাকিয়া শেষে লগ্নপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অধ্যাপক বসুমহাশয় প্রাণিচক্ষুর উপর ক্ষণিক আলোকের অবিকল একইপ্রকার কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

* পদার্থের নানা অংশের আণবিক বৈষম্য যে বিচ্ছৎ-উৎপত্তির কারণ, অধ্যাপক বসুমহাশয় তাহা নানা পরীক্ষাধারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিব।—লেখক।

একটি ন্যূনতম নলের এক প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন করিয়া, তাহার বাহির-ভাগটা নীপশিখারদ্বারা কজ্জলবৃত্ত কর এবং তার পর কোন সূক্ষ্মগ্রা পদার্থদ্বারা তাহার উপর বসেছে অক্ষর লিখ, লেখনীদ্বারা কজ্জল স্থানচ্যুত হওয়ার কাচে বসেছে অক্ষর অঙ্কিত হইয়া পড়িবে। এখন যদি নলের মুক্ত অংশে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া, তাহার কজ্জললিখ প্রান্তটাকে অতি অল্পক্ষণের জন্য কোন উজ্জ্বল আলোকের দিকে উদ্ভূত রাখা যায়, তাহা হইলে কাচের বসেছে অংশ দিয়া সেই ক্ষণিক আলোক দশকের চক্ষে আসিয়া পড়িবে। আলোকপাতনারই চক্ষু মুদ্রিত করিলে দর্শক প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু আরও কিছুকাল চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে, উল্লিখিত কাচাঙ্কিত অক্ষরগুলিকে তিনি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে দেখিবেন। কিন্তু চক্ষুর এই অন্তর্দৃষ্টি অধিককাল থাকে না, অক্ষরগুলি অল্পক্ষণের জন্য উজ্জ্বল থাকিয়া ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, কৃত্রিম চক্ষুতে পাতিত ক্ষণিক আলোকের জ্বাল, পূর্বোক্ত আলোক অতি অল্পকালব্যয়ী হওয়ার, তজ্জাত বৈজ্ঞানিক প্রবাহের পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে দার্শন্যময়ের আবশ্যক হয়। কাজেই মূল আলোক নির্দীপিত বা স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বিজ্ঞানপ্রবাহদ্বারা দৃষ্টি-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকপাতে

কৃত্রিমচক্ষে যে দীর্ঘকালব্যাপি-প্রবাহ-উৎপত্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, অধ্যাপক বহুমহাশয় প্রাণিচক্ষে অভ্যুজ্জ্বল আলোক-পাত করিয়া ঠিক তদনুরূপ কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মাগ্নিসিরম-ধাতুচূর্ণ দ্বারা রুদ্ধ কাঠিকলকের উপর কয়েকটি অক্ষর রচনা করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ কর। ধাতুচূর্ণ অভ্যুজ্জ্বল শিখার অল্পকালের জন্য জ্বলিতে থাকিবে। কিন্তু দর্শক যৌয়া ও উজ্জ্বলতার আধিক্যে, অক্ষরগুলিকে তখন পড়িতে পারিবেন না। কিন্তু অগ্নি নির্দীপিত হইবামাত্র যদি দর্শক চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে অল্পক্ষণ পরে তিনি সেই অক্ষরগুলিকেই উজ্জ্বল অবস্থায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইবেন।*

সূদীর্ঘ আলোকতাড়নায় চক্ষুর বিভিন্ন-রাংশের আগবিক বিকার দ্বারা, এবং আগবিক-রোধের পর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির অতিরিক্ত চেষ্টায়, যে অনিয়মিত বৈজ্ঞানিক সাড়া বা পরানোলনের (after-oscillation) কথা পূর্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে, উদ্বারা প্রাণিচক্ষে কিপ্রকার দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়, এখন দেখা যাউক। এই স্থলে আলোক-রোধমাত্র, স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় অণুগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবাহ শীঘ্র রোধ করিয়া, তাহাদের নির্দিষ্টস্থান অতিক্রম করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে। কাজেই যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিপরীতদিকে স্বতই তাহাদের আর-একটা আন্দোলন আসিয়া

* কয়েকমান পূর্বে আমরা এই পদ্ধতিক্রমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সূর্যগ্রহণ দেখিয়াছিলাম। গ্রহণকালে সূর্য-গোলকের অতি কিরৎকাল দৃষ্টিপাত করি। বলা বাহুল্য, ইহার অভ্যুজ্জ্বলতার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু ইহার পরই চক্ষু মুদ্রিত করার-পদ্ধতি সূর্যগোলক কিরৎকালের জন্য স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।—লেখক।

পড়ে এবং স্তম্ভলিখিত গোলকের আন্দোলনের
স্তার অণুসকল বহুক্ষণ গমনাগমন করিয়া
শেষে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক
বহুমহাশয় পদার্থের অণুসকলের এইপ্রকার
আন্দোলনজাত তড়িৎপ্রবাহকে “পর্যায়োলন”
সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পাঠক একটি
উজ্জ্বল আলোকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত
করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে, উক্ত আন্দোলনের
কার্য্য বেশ বুদ্ধিতে পারিবেন। চক্ষু
বন্ধ করিবামাত্র ঘোর অন্ধকার সম্মুখে দেখা
দিবে। পূর্ক-আলোকপাত-জ্ঞাত আণবিক
বিচলন দ্বারা যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া-
ছিল, চক্ষুর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল
চেষ্টায় এখনকার আণবিক বিচলন ঠিক
তাহার বিপরীত দিকে হয় বলিয়া, সেই
প্রবাহ ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই চক্ষুর
বৈদ্যুতিক সাম্যাবস্থায় ঘোর অন্ধকার
ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু
পাঠক যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল চক্ষু মুদ্রিত
করিয়া অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই
পূর্কদৃষ্ট উজ্জ্বল আলোকের ছবি চক্ষু
বুদ্ধিয়াও দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য,
স্বভাবপ্রাপ্তির অতিরিক্ত চেষ্টায় নির্দিষ্টস্থান
অতিক্রম করার পর, পুনরায় স্বাভাবিক
স্থানে আসিবার চেষ্টায় অণুগুলির যে নূতন
বিচলন হয়, উক্ত অস্পষ্ট ছবি তাহারই
কার্য্য।

কোন উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টিপাত করিয়া
চক্ষু মুদ্রিত রাখিলে, সেই পদার্থের যে
আলোকময় ছবি ক্রমে আবির্ভূত ও তিরো-
ভূত হয়, তাহা আমরা অনেক সময়েই
দেখিতে পাই। পূর্ক-বৈজ্ঞানিকগণও এই

দৃষ্টিবিভ্রম দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা
ইহার একটা কারণও স্থির করিয়াছিলেন।
ইহারা বলিতেন,—উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টি
আবদ্ধ রাখায়, আলোক অন্তর্ভুক্ত হইলেও
সেই উদ্ভেজনার কতকটা চক্ষে থাকিয়া
যায়; কিন্তু চক্ষু আলোকদর্শনে ক্রান্ত হইয়া
পড়ায় সে সময়ে আমরা ঐ উদ্ভেজনার
কোন কার্য্যই দেখিতে পাই না।
ক্রান্তির উৎপত্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের দুইটি
প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। একদল পণ্ডিত
বলেন, শ্রমদ্বারা শরীরে একপ্রকার অবসাদ-
জনক পদার্থের (Fatigue substance)
উৎপত্তি হয়, বিশ্রামসহকারে শোণিতপ্রবাহ-
দ্বারা সেই পদার্থ স্থানান্তরিত হইলে, জীব
আবার শ্রমক্ষম হইয়া পড়ে। আর একদল
পণ্ডিত বলেন,—শ্রম শরীরের ক্ষয়সাধন
করে, এবং ক্ষয়ই প্রান্তির কারণ। প্রাণীকে
বিশ্রাম করিতে দাও, স্বাভাবিক শারীর-
কার্য্যে সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া যাইবে, এবং
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নূতন শ্রমভারবহনের
উপযোগী দেখিবে। দৃষ্টিবিভ্রমটির উল্লিখিত
ব্যাখ্যা নির্ভুল হইলে,—বিশ্রামসহকারে
চক্ষুর প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর অন্ধকারের মোচন
হওয়াই সম্ভব; কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যাপার
বিশ্রামলাভের পরও আমরা পূর্কদৃষ্ট পদার্থের
আলোক ও অন্ধকার ময় ছবির পুনঃপুন
বিকাশ দেখিতে পাই। এই বিসদৃশ ঘটনার
কারণ উক্ত দৃষ্টিবিভ্রমের প্রচলিত ব্যাখ্যানে
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধ্যাপক বহু-
মহাশয় প্রচলিত সিদ্ধান্তের এইপ্রকার আরও
অনেক ভ্রম দেখাইয়া, তাঁহার আবিষ্কৃত
তথ্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।

কগলের অতি বৃহৎ আবিষ্কারগুলির
মূল্যবোধ করিলে, অনেকস্থলেই একএকটা
ভুল অবাস্তব ঘটনাকে মহদাবিষ্কারের কারণ
হইতে দেখা যায়। চক্ৰস্বকীর পূর্বোক্ত
পরীক্ষার সময়ে, বস্তুমহাশয় ঐপ্রকার এক
ক্ষুদ্র ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গস্বকীর একটা মহ-
দাবিষ্কার সাধন করিয়াছেন। চক্ৰস্বকীর দৃষ্টিশক্তি
এই আবিষ্কারের বিষয়। উভয় চক্ৰস্বকীর দৃষ্টি-
শক্তি অপরিবর্তনীয় বলিয়া, এ পর্য্যন্ত
বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন।
বস্তুমহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন,
প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। বামচক্ৰস্বকীর
দৃষ্টিশক্তি যখন প্রবল থাকে, দক্ষিণচক্ৰস্বকীর
ক্ষীণশক্তি হইয়া বিশ্রাম করে, এবং পরমুহর্তে
দক্ষিণচক্ৰস্বকীর যখন বিগতভ্রম হইয়া দাঁড়ায়,
তখন দর্শনের ভার তাহার উপর দিয়া বাম-
চক্ৰস্বকীর বিশ্রামের অবকাশ লয়। চক্ৰস্বকীর
দৃষ্টিশক্তির এই পরিবর্তন অতি ঘনঘন হইয়া
থাকে, কিন্তু স্থূলত উভয়ের সমবেতশক্তি
অপরিবর্তনীয় থাকিতে দেখা যায়।

অধ্যাপক বস্তুমহাশয়ের আবিষ্কৃত
ব্যাপারটি সহজে পরীক্ষা করিবার একটি
স্থল উপায় আছে। ১ম-চিত্রাঙ্কিত রেখার
জায় বিপরীতদিকে হেলানো দুইটি স্থূল সরল-
রেখা কাগজে অঙ্কিত করিয়া, সেটিকে ষ্টেরি-
স্কোপ (stereoscope)-যন্ত্রে সংযুক্ত কর।
এই যন্ত্রে কোটোগ্রাফের ছবি যেমন



১ম চিত্র।



২য় চিত্র।

উপযুক্তপরি বিভক্ত হইয়া পড়ে, এখানেও এই
হেলানো রেখার পরস্পরের উপরে পড়িবে
এবং ২য়-চিত্রের ক্রসের অনুরূপ একটা ছবি
দর্শক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এখন যদি
যন্ত্রটিকে আকাশের উজ্জল আলোকের দিকে
ধরিয়া দর্শক কিয়ৎকালের জন্য ছবিটিকে
দেখিতে থাকেন, তবে সেই ক্রসটিকে (cross)
সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন না;—উহার একটি
রেখাকে কিয়ৎকালের জন্য খুব উজ্জল ও
অপরটিকে লুপ্তপ্রায় দেখিবেন এবং পরক্ষণেই
ম্নানটিকে ক্ষুদ্রতর ও উজ্জলটিকে ক্ষীণজ্যোতি
হইতে প্রত্যক্ষ করিবেন।

দুইটি বিভিন্ন লেখার প্রতি যুগপৎ দুই
চক্ৰস্বকীর রাখিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলে,
পূর্বোক্ত আবিষ্কারটির পরিচয় সহজে গ্রহণ
করা যাইতে পারে। একই সময়ে দুই চক্ৰস্বকীর
দুইটা পৃথক লেখার উপর আবদ্ধ থাকায়,
পাঠক কোনটিই পড়িতে পারিবেন না। কিন্তু
ইহার পরই যদি চক্ৰস্বকীর মুদ্রিত করা যায়, তাহা
হইলে পর্যায়ক্রমে সেই লেখারই এক এক-
টিকে চক্ৰস্বকীর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে ফুটিয়া মিলাইতে
দেখা যাইবে। এইজন্যই অধ্যাপক বস্তু-
মহাশয় তাঁহার আবিষ্কারস্বকীর গ্রন্থের
একস্থানে বলিয়াছেন,—“যন্ত্রটিকে আমরা
যাহা পড়িতে না পারি, চক্ৰস্বকীর মুদ্রিত করিলে
তাহাই সহজপাঠ্য হইয়া পড়ে।”

যে সকল পদার্থ আমরা বেজ্ঞান ও

সজ্ঞানে দেখি, কেবল তাহারই ছবির বে পুনরাবির্ভাব হয়, তাহা নহে। অজ্ঞাতসারে ও অন্তমনে দৃষ্ট পদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাবও বহুমানসের আবিষ্কার করিয়াছেন। দৃষ্টি-তত্ত্বের গবেষণাকালীন ইনি একদিন একটি জানালায় প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার ছবির পুনরাবির্ভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। ছবি বধারীতি কয়েকবার আবির্ভূত হইয়াছিল; কিন্তু পুনঃপুন পরীক্ষার অক্ষিপদ্য অবসর হইয়া পড়ার শেষে বহুক্ষণ মুদ্রিত-ক্ষেত্রে থাকিয়াও আর জানালায় ছবি দেখিতে পান নাই, এবং তৎপরিবর্তে চকুর এক প্রান্ত হইতে একটি ক্ষুদ্র গবাক্কের স্পষ্ট ছবি আবির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক বহু সেই গবাক্কটির প্রতি পূর্বে বেচ্ছার দৃষ্টিপাত করেন নাই এবং ইতঃপূর্বে সেটির অস্তিত্ব পর্যন্ত জানিতেন না। বলা বাহুল্য, বহুমানসের সেই পূর্বের জানালাটি দেখিতে গিয়া, নিশ্চয়ই গবাক্কটিকেও অজ্ঞাতসারে দেখিয়া-কেলিয়াছিলেন এবং তাহাতেই শেষে সেই অজ্ঞানদৃষ্ট পদার্থ ছবিদ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল। অল্প মাহুয়ের বিভী-বিকাদর্শনের সত্তোরজনক ব্যাখ্যা শারীর-বিজ্ঞান পাওয়া যায় না। পূর্ববর্ণিত ব্যাপারের সহিত বিভীবিকাদর্শনের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া বহুমানসের অনুমান করিতেছেন।

কোন উচ্ছল পদার্থে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চকু মুদ্রিত করিলে, দৃষ্ট বস্তুর ছবির যে আবির্ভাব-তিরোভাব হয়, তাহা বিশেষ

করিয়া পরীক্ষা করিলে, দর্শক প্রত্যেক পুনরাবির্ভাবের সহিত ছবিটিকে ক্রমেই স্নানভর হইতে দেখিবেন এবং অবশেষে সেটি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, তখন ছবি দেখা যাইতেছে, কি পূর্বদৃষ্ট পদার্থের স্মৃতি মনে জাগিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে ঠিক করা যাইবে না। অধ্যাপক বহুমানস এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—ইঞ্জি-য়ের এই পরামোলনজাত সাড়ার সহিত সম্ভবত স্মৃতির সাড়ার কোন পার্থক্য নাই। দৃষ্টপদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাব ও বিলোপের জ্ঞান, স্মৃতিরও তদনুরূপ আবির্ভাব ও লোপ দেখা গিয়া থাকে, স্মৃতির উভয়েই একই শ্রেণীর প্রাকৃতিক ঘটনা।

অধ্যাপক বহুমানস কেবল আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার প্রত্যেক আবিষ্কারের সহিত যে শত শত ব্যাপার জড়িত রহিয়াছে, তাহাদেরও আভাস দিয়াছেন। সেই সকল আভাসের প্রত্যেকটির আলোচনা ও অনুসন্ধান একএকজন বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যতী হইলেও, অল্পমিত ব্যাপারগুলির সীমাংসা হয় কি না, সন্দেহ। শত অবাস্তর কার্য ও বাধাবিষয়ের মধ্যে ধ্যানমগ্ন সূত্রের মত তিনি আজও গবেষণানিরত রহিয়াছেন। একক অধ্যাপক বহুমানসের নিকট হইতে জড়-বিজ্ঞান যাহা পাইয়াছে, তাহা অমূল্য এবং আমাদের সেই নবীন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে তবিস্যতে বিজ্ঞান যে আরো অনেক অমূল্যর সংগ্রহ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ঐজগদানন্দ রায়।

রামচরিত ।*

রামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষণ, সীতা প্রভৃতি অপরাপর সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও লক্ষণ ভ্রাতৃত্বে, সীতা সতীত্বে এবং দশরথ ও কৌশল্যা পিতৃমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নানা দিগ্দ্বেশ হইতে আগত হইয়া নদীগুলি এক সমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলে, রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেইপ্রকার নানাদিক্ হইতে রামমুখী হইয়াছে—রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই তাঁহাদের সত্তা ও বিকাশ—একজ্ঞ রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর চরিত্র ন্যূনাধিক সরল। কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত;—তিনি রামায়ণে পুত্ররূপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন,—ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে, স্বামি ও প্রভুরূপে—সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য; বহুদিক্ হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে—এবং বহু বিভাগ হইতে তাঁহার চরিত্র দর্শনীয়। আবার তাঁহার চরিত্রের কতকগুলি আপাত-বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে বৃষ্টিতে হইবে; কতকগুলি জটিল রহস্যের নীমাংসা না করিলে তিনি ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র—কৌশল্যাকে তিনি বলিয়াছিলেন,—“কাম মোহ বা

অন্ত যে-কোন ভাবের বশবর্তী হইয়াই পিতা এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিব—তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।” সেই রামচন্দ্রই গঙ্গার অপরতীরবর্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমূলে বসিয়া সাক্ষ্যদেয় লক্ষণকে বলিয়াছিলেন—“এমন কি কোথাও দেখিয়াছ লক্ষণ, প্রেমদার বাক্যের বশবর্তী হইয়া কোন পিতা আমার ভ্রাতৃহান্যবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহারাজ অবশ্যই কষ্ট পাইতেছেন—কিন্তু যাহারা ধর্মত্যাগ করিয়া কামসেবা করে—রাজা দশরথের ভ্রাতৃ কষ্ট তাহাদের অবশ্যস্বাবী।” যিনি সীতাকে “শুভ্রায়াং জগতীমধ্যে” বলিয়া বিবাহ করিতেন এবং বাহাকে হারাইয়া তিনি শোকাকুণ্ডল উন্মত্তবৎ পুণ্ডরীককে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং “আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূভ্রোহরমুটকস্তব” বলিয়া কাদিয়া আকুল হইয়াছিলেন—লক্ষ্যতে প্রবেশ করিয়া ‘অশোকবন হইতে সীতাকে স্পর্শ করিয়া বায়ুপ্রবাহ তাঁহার অঙ্গ হইতেছে’ বলিয়া পুলকাক্ষনেতে ধানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সেই রাম বিপুল সৈন্তসম্বল সাক্ষাতে—“লক্ষণ, ভরত, বিভীষণ বা সুগ্রীব, ইহাদের বাহাকে ইচ্ছা, তুমি ভজন্য করিতে

* লেখক রামায়ণের চরিত্রসম্বন্ধীয় যে পুস্তক দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন, তন্মধ্যে এবং অন্তর্গত রামচন্দ্রের বিবরণ বিস্তারিতভাবে এতদ্রূপে হইয়াছে—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাহার অঙ্গীভূত বিশেষণমাত্র।

পায়—দশদিক্ পড়িয়া আছে—তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর—আমার তোমাকে কোন প্রয়োজন নাই—”গলদ্রুনেত্রা, শোকশীর্ণা, অনপরাধিনী সীতাকে এইরূপ নিৰ্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। যিনি বনবাসদণ্ডের কথা শুনিয়া কৈকয়ীর নিকট স্পর্ধাসহকারে বলিয়াছিলেন—“বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্ত্বলাং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্”—‘আমাকে ঋষিগণের মত বিমলধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবেন’, তিনিই কৌশল্যার সমীপবর্তী হইয়া “নিষমস্রিব কুঞ্জরঃ” পরিপ্রাপ্ত হস্তীর ভ্রায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং সীতার অঞ্চলপার্শ্ববর্তী হইয়া মুখে অপূর্ণ মলিনিমা প্রকাশ করিয়া কেলিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে যিনি তাঁহাকে কঠোর-বাক্যে বলিয়াছিলেন—“তুমি রাজ্যলোভে এইরূপ কথা বলিয়া থাকিলে, আমি ভরতকে কহিয়া রাজ্য তোমাকে দিব” এবং যিনি ভরত তাঁহার “প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর” বারংবার এই কথা কহিতেন—তিনিই সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির অপরের প্রশংসা সহ করিতে পারেন না।” ভরতের ভ্রাতৃত্বকির অপূর্ণ পরিচয় পাইয়া তিনি সীতাবিরহের সময়েও ভরতের দীন শোকাভূত মূর্তি বিস্মৃত হন নাই—পুষ্পভারা-লঙ্কতা পম্পাতীরতরুরাজির পাশ্বে ভরতের কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন, —বিভীষণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইজন্ত অগ্রীব তাঁহাকে অবিবাহিত বলিয়া নিন্দা করাতে, রামচন্দ্র বলিয়া-

ছিলেন—“বহু, ভরতের ভ্রাতা তাই এই পৃথিবীতে তুমি কয়জন পাইবে?” তিনিই আবার বনবাসান্তে ভরতজ্যেষ্ঠের আশ্রমে বাইয়া হর্ষমান্কে নলিগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—“আমার আগমনসংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।” এইরূপ বহুবিধ আপাতবৈষম্য তাঁহার চরিত্রকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

• রামায়ণপাঠককে আমরা একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য দুই পৃথক্ সামগ্রী—ঐক্য রীতি অনুসারে নাটকবর্ণিত কাল তিন দিবসের উর্দ্ধ হওয়ার বিধান নাই। এই দিবসত্রয়ের ঘটনাবর্ণনায় চরিত্রবিশেষকে একভাবাপন্ন করা একান্ত আবশ্যক, *কোন কথাটি কাহার মুখ হইতে বাহির হইবে, লেখককে সতর্কতার সহিত তাহা লক্ষ্য করিয়া নাটকরচনা করিতে হয়—চরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে সেই গুণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে হয়। কিন্তু যে কাব্যের ঘটনা জীবন-ব্যাপী, সে কাব্যের চরিত্রগুলি নাটকের রীতি অনুসারে বিচার্য্য নহে। এই দীর্ঘকালে নানারূপ অবস্থাজ্ঞে পতিত হইয়া চরিত্র-গুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা বিচিত্র হইয়া থাকে—তাহা সমন্বয়গোপী হয় কি না—তাহাই সমধিকপরিমাণে বিচার্য্য। শ্রেষ্ঠতম সাধুরও সারাজীবনের অন্তর্বর্তী হইএকটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে ধরিলে তাহা ভাষ্য শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। অবস্থার

ক্রমাগত উৎসীড়ন সহ করিয়া লোকে সাধারণত সাহসিকগুণসম্পন্ন হইলেও ছুইএক স্থলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক । ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন—তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে দৌরল্যজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার আলোকপাতে স্তম্ভভাবে বিচার করিলে তাহা অনেক সময়েই অল্পরূপে প্রতিপন্ন হইবে । তাঁহার “দৌরল্যজ্ঞাপক” উক্তিগুলি বাদ দিলে হয়ত তিনি আমাদের সহানুভূতির অত্যাধিক্যে মাইয়া পড়িতেন, আমরা তাঁহাকে ধরিতে-ছুঁইতে পারিতাম না । রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির স্থায়—উহা কচিং নমিত হইয়া ভূস্পর্শ

করিলেও সেই অবনয়ন তাহার নভঃস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না—পার্শ্বিক জাতিদের পরিচয় দিয়া আমাদের কাছে আশস্ত করে মাত্র । রামচন্দ্র সাধারণত উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্বশ্রীসমমিত রাখিয়াছেন—তাঁহার কোন চিন্তা বা কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভিত নহে, এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষ্ঠভ্রাতার ভাৰ্য্যাপহারী দম্ভ্য বলিয়া সত্যসত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্তই দণ্ড দিতেও গিয়াছিলেন ! সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু—তাহাকে বধ করিতে তিনি অধি-সমক্ষে প্রতিক্ষিত ছিলেন—এই প্রতিক্ষিত-পালনও তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।* মহাকাব্যের কোন গৃহদেহে

* আমরা রামারণের সমস্ত প্রসঙ্গই লক্ষ্যকাণ্ড পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়াছি । উত্তরকাণ্ডে রামকে আমরা রাজরূপে দর্শন করি । প্রজা লইয়াই রাজা,—সেই প্রজার মনোরঞ্জনের জন্ত তিনি স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন । এতদূরে দেখিতে হইবে, প্রজাদের এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণ করিবার তাঁহার কোন উপায় ছিল কি না ?—প্রজার ভুল বুঝিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার বাহা বুঝিয়াছিল, তাহা তাদৃশ অবস্থায় স্বাভাবিক,—সীতা এতদিন শত্রুগৃহে ছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহার সীতার চরিত্রে সন্দেহপরাগণ হইয়াছিল—এই সন্দেহের জন্ত তাঁহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না—এবং তাঁহাদের এই সন্দেহ নিরাকরণের যেণ্য কোন উপায়ই রামের করায়ত্ত ছিল না—অথচ তিনি যে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, সেই সিংহাসনের মধ্যাদা ও পবিত্রতা লোক-দ্বন্দ্বের প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্ত—সীতাকে বর্জন ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না । প্রজার কল্যাণ—তাঁহাদের মতের সম্মানরক্ষা তিনি স্বীয় রাজত্বজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়াছিলেন,—এইজন্ত তিনি আদর্শ রাজা বলিয়া পরিগণিত । শুধু সমুদ্রবক্ষে দিক্ হইতে দেখিলে, তিনি যাহা নিজে সত্য বলিয়া জানেন, তাহা লম্বন করিয়া অপরের অসম্মত মতের অমূলক কাণ্ড করিয়া অবলা রমণীকে কেন আজমুহুঃখিনী করিলেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য । ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তিনি প্রজারঞ্জন উদ্দেশ্যে নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বনিতার জীবন চিরদুঃখ-পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন,—এইপ্রকার উদ্দেশ্য ও কর্তব্যের আদর্শদৃষ্টে মতবৈধ হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে বীরবিশ্বাসানুসারে উচ্চ কর্তব্যের লক্ষ্যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্দেহ নাই । সীতাবর্জনের পরে তিনি অশ্রমেযত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সদায় হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়,—তিনি স্বর্ণসীতা নির্মাণ করিয়া এই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ও প্রজাপণকে বুঝাইলেন,—তাঁহার বাঁহাকে অবিদ্যাস করিয়াছে,—তিনি তাঁহাদের মতের অনুকূলে কার্য্য করিয়া তাঁহার এবং নিজের দাম্পত্যজীবন দুঃসহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐটি স্বর্ণের স্থায় সমুচ্ছল সীতার চরিত্রের মাহাত্ম্য তিনি তিলমাত্রও বিস্মৃত হন নাই । তাঁহার পূর্বপুরুষগণ একএকজন বহু বিবাহ করিয়াছেন, তিনি সে সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা ঘুরে থাকুক, “ন রাম পরদারান্ স চক্ষুর্ভাষপি পশতি” প্রভৃতি বাক্যে দৃষ্ট হয়, তাঁহার দাম্পত্যবিন্দিতা ও সাধী স্ত্রীর প্রতি অগাধ ভালবাসা তাঁহার চরিত্রকে চিরালঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে । বদীও উত্তর-কাণ্ডসম্বন্ধে আমার বহির্বিষয় নানারূপ কথাই আছে, এবং যদিও এপর্য্যন্ত তাঁহার আলোচনা মজুত রাখিয়াছিলাম, তথাপি সীতাবর্জনসম্বন্ধে কিছু না বলিলে রামচরিত্রের আলোচনা বাঁহারা অসম্পূর্ণ মনে করিবেন, তাঁহাদের জন্ত এই কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলাম ।

অবহার দারুণ পীড়নে নিশ্চেষ্ট হইয়া তিনি ছুই একটি অধীরবাক্য প্ররোণ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হটগোল করা এবং হিআলরের কোন শিলা কি পাদপে একটু কতচিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া পর্ত্তরাজের মহস্বকে তুচ্ছ করা, ছুইই একবিধ। সাহিত্যিক ধূর্ত্তগণ রামচরিত্রের তজ্জপ সমালোচনার ভার লইবেন। বাস্তবিক-অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত—এ চিত্রে স্ফটিক বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়—এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূর্ত্তবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।

সঙ্গীতের জ্ঞান মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে—গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া-ফিরিয়াও স্বীয় মূল-রাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানব-চরিত্রেরও সেইরূপ একটা অপরিচারক স্বতন্ত্র আছে—সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বলা যায়, জীবনের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,—সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি তাক্সীলোর সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেকত্রতোজ্জল শুদ্ধপটবস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—“এবমন্ত গমি-
 যামি বনঃ বন্তমহং ভিতঃ। জটাতীরধরো রাজঃ
 প্রতিজ্ঞামহুপালয়ন” —“তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক জটাবতল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব”—সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র। এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। প্রকাগপ অলভারিচ্ছর আকুল চক্রে তাঁহাকে

খিরিয়া ধরিয়াছে, তিনি ভাহাদিগকে সাধনা দিয়া বলিতেছেন—

“যা প্রীতিবহমানক মধ্যাধ্যানিবাসিনাম্।

মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষণ ভরতঃ সা বিবীরভাম্।”

‘অধ্যোধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহমান ও প্রীতি, তাহা ভরতের প্রতি বিশেষ-ভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত হইব।’ এই উদার উক্তিই রামচরিত্রের পরিচায়ক। লক্ষণের কোধ ও বাগ্‌বিত্ততা পরাকৃত করিয়া প্রবিবং সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন—

“সৌমিত্রে যোহভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্মতঃ।

অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোহন্ত সম্ভারসম্মতঃ।”

‘সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্ত যে সম্মত ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্ত হউক।’ এই বৈরাগ্য-পূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত ক্ষুদ্রবর পরাজিত করিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে। যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ভ্রষ্টকুল ও হতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা পাইতেছিল না, সেদিন রামচন্দ্র কমালীল গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—“রাক্ষস, তুমি আমার বহু-সৈন্ত নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে বাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।” সেই মহাহবের মহতী প্রাক্কণভূমিতে ধার্মিক-প্রবরের এই কণ্ঠবর স্বর্গীর কন্মা উচ্চারণ করিয়াছিল;—উহাই তাঁহার চিরাত্মক কণ্ঠধ্বনি,—রাম ভিন্ন জগতে এ কথা শব্দকে আর কে বলিতে পারিত? কৈকরীকে লক্ষণ প্রসন্নক্রমে নিদ্রা করিলে রামচন্দ্র

পঞ্চবতীতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“অবা কৈকরীর নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও না”—এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই বাতাবিক ; সীতাকেও তিনি এইভাবে বলিয়াছিলেন—“দেহপ্রণয়সম্বোধে সমা হি মম মাতরঃ”—আমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে,—সকল মাতাই আমার পক্ষে তুল্য ।” যেদিন শরাত লক্ষণ যুক্তকর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এদিকে হর্ষরবণ তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল,—ব্যাক্তী যেরূপ স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্র সেইভাবে লক্ষণকে রক্ষা করিতেছিলেন ; রাবণের শরজাল তাঁহার গৃহদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রামচন্দ্র সজলচক্ষে লক্ষণকে বকে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন—“তুমি যেরূপ বনে আমাকে অহুগমন করিয়াছ, আমিও আজ সেইরূপ যত্নে তোমাকে অহুগমন করিব,

তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না ।”—এইরূপ শত শত চিত্ত রামায়ণকাণ্ডে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তি-সেই চিত্ত স্বর্গের আদর্শ পৃথিবীতে আঁকিয়া ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও উক্তি ‘আমাদিগকে এই আশ্চর্য্য চরিত্রের সমুদ্রত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মুগ্ধ ও বিশ্বাসাভিভূত করিতেছে । রামায়ণকাব্যপাঠান্তে রামচন্দ্রের এই উচ্ছল ও সাধু মূর্ত্তি মানসপটে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়, অপর কোন কথা মনে উদয় হয় না; আর একান্ত সাবিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোন্মাদ যদি দৌর্জল্যজ্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সাস্থনা যে, প্রণয়িগণের নিকট রামের এই প্রেমোন্মাদের স্রায় মনোহর কিছু নাই—এখানে বৈরাগ্যের শ্রী নাই, কিন্তু অপূর্ণ্যাপ্ত কাব্যশ্রী সে অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে, আর নিজ্জন গিরিপ্রদেশের শোভাযিত দৃশ্যাবলীতে বিরহাশ্রুর সংযোগ করিয়া সেই সমস্ত বিচিত্র বাহুসম্পদ চিরস্বন্দর করিয়া রাখিয়াছে । *

:

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

সিদ্ধিদাতা গণেশ ।

“হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়ন-জলে ।” সে কথা বৃষ্টিতে পারি । মাতার চক্ষে পুত্রবতী কন্তা বড় মহিমময়ী মূর্ত্তি । কিন্তু একাকী গণেশঠাকুর এই নরলোকের চক্ষে দেখিতে কেমন, তাহা ঠিক বলিয়া ওঠা দায় । একে কুলভঙ্গ, তাহে ধর্ম্মীকৃতি, তাহার উপর আবার লম্বোদর । ওই ধড়ের

উপর একটা মাছুষের মাথা থাকিলে যে দুশ্রুটি কিরূপ হইত, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু গজেন্দ্রবদনের সহিত ধর্ম্মকুলভঙ্গ ও লম্বোদর, বেশ মানানসই হইয়াছে ।

সমগ্র দেবতাবর্গের মধ্যে গণেশ ভিন্ন আর কাহারও স্বন্ধে একটা জন্তুবিশেষের মূণ্ড স্থাপিত হয় নাই । অথচ পঞ্চদেবতার

পূজার ইহার পূজা সর্বপ্রথম, এবং ইনি দর্শনিকদিগেরা বলিয়া স্বীকৃত। কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে ইহার উদ্ভব হইল, যথাসাধ্য তাহার অনুসন্ধান করিব।

পুরাণে ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সংক্ষেপত তাহা বলিয়া লইতেছি। নন্দী-ভূক্তি প্রভৃতি মহাদেবের অনেকগুলি অমুরের ছিল; এই অমুরেরা “গণ” নামে আখ্যাত হইত। মহাদেব অনেকসময়ে এই “গণ” সমভিব্যাহারে নানা স্থানে চলিয়া যাইতেন, এবং পার্বতীকে একাকিনী অরুণিতভাবে অবস্থান করিতে হইত। এইজন্য একদিন মহাদেবের অমুরপুত্র-কালে পার্বতী একতাল কাদা লইয়া একটি পুতুল গড়িয়া, তাহার দেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন; এবং দ্বারদেশে প্রহরিস্বরূপে রক্ষা করিয়া এই নবমুঠ পুরুষকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার অনুমতি ভিন্ন গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। সজীব পুতুলিকা,—কর্তব্যপালন করিতেছেন, এমন সময়ে নন্দী-ভূক্তি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব কত অমুনয়-বিনয় করিলেন, নন্দী কত ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই এই পুতুলিকা দ্বার ছাড়িয়া দিল না। তখন কাজে-কাজেই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পার্বতীর এ সকল কথার খোঁজখবর নাই; এদিকে কিন্তু স্বর্গ-ময় সোরগোল পড়িয়া গেল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি যে যেখানে ছিলেন, সসৈন্তে মহাদেবের সহায়তায় উপস্থিত হইলেন। পুতুলিকার কাছে প্রায় সকলেই হটিয়া বাইতেছিলেন, এমন-সময় ছলে ও কৌশলে

মহাদেব উহার নিরস্ত্র করিলেন। এইবার পার্বতীর খবর হইল। তাঁহুরা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন যে, তাঁহার আদরের পুত্রটির সেই বথের জন্য তিনি একটি ওলটপালট করিয়া দিবেন। মহাদেব সভয়ে ভূতাদিগকে আদেশ করিলেন যে, “প্রথমে বাহার মুণ্ড পাও, লইয়া আইস,— পার্বতীপুত্রের জীবনবিধান করিতে হইবে।” আদেশের ফলে একটা হাতীর মুণ্ড আসিল; এবং সেইটি লইয়াই মহাদেব মৃতপুত্রের জীবনবিধান করিলেন। তাহার পর ওই বীর পুত্রকে গণদিগের অধিপতি বা নায়ক করিয়া দিয়া উঁহাকে গণেশ করা হইল।

বৈদিক সাহিত্যে যখন একালের অনেক দেবতারই অস্তিত্ব অমৃত হইয়া না, তখন সেস্থলে গণেশকে না পাইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণাদির সৃষ্টির পূর্বে যে কুত্রাপি গণেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহাই সমস্তার কথা। মহাভারতের অমুরমণিকায় গণেশের লিপিকাখ্যের ভার গ্রহণ করিবার কথা আছে। ওইটি যে সম্পূর্ণ প্রাক্লিপ্ত, তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপত্তি করিবেন না। সূত্র মহাভারতের মধ্যে মহাদেব, পার্বতী, স্বল্প প্রভৃতি সকল দেবতারই নাম এবং ইতিহাস আছে; কিন্তু কোথাও গণেশের কথা ভ্রমেও উল্লিখিত নাই। যখন কেবল অমুরমণিকায় একবার-মাত্র তাঁহার নাম উল্লিখিত, তখন ঐ দেবতা মহাভারতরচনার সময়ে কদাচ পরিচিত ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। ঐ উপক্রমলিকা যে পরবর্তী সময়ের রচনা, সে কথা প্রবন্ধান্তরে বিধিবাছি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একটি শিবস্তোত্র আছে। এই শিবস্তোত্রে স্বয়ং মহাদেবকেই গণেশ বলা হইয়াছে। মহাদেবের অমৃতেরা 'গণ' নামে আখ্যাত; কাজেই মহাদেবকে সেই গণের অধিপতি বলা যাইতে পারে। রামায়ণের এই সর্গটি স্বদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরাও প্রসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সেটা অল্প বিশিষ্ট কারণে। মহাদেবের নামে গণের অধিপতি, গণেশ এবং গণপতি শব্দ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। বাহা হউক, গণেশনামক স্বতন্ত্র দেবতাটির কথা যে রামায়ণে নাই, ইহাই যথেষ্ট।

পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থ একালে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে সত্য, তথাপি ঐ গ্রন্থের আদিত্তে যেখানে সমগ্র সিদ্ধিদাতা দেবতাদিগের নাম করিয়া প্রণামাদি করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে গণেশ নাই। যিনি সকল দেবতার অগ্রে পূজিত, তাহার যদি পঞ্চম শতাব্দীতে জন্ম হইয়া থাকিত, তবে কদাচ এরূপ অমূল্য সম্ভবপর হইত না। বৎস, তদ্রি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন কবির গ্রন্থে গণেশের নাম নাই। ঐ যুগের কোন প্রস্তরলিপিতেও উহার নাম পাওয়া যায় না।

তরতপ্রণীত নৃত্যশাস্ত্র এখন নাট্যশাস্ত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ যখন নৃত্যশাস্ত্র হইতে নাট্যশাস্ত্রে পরিণত হয়, তখন এ দেশে অনেক নাটকের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থ পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হইলেও মূল অংশটার যে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই

নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গভূমির কলাগণ এবং ভক্ত-সঙ্কল্পে বত দেবতার নাম পাওয়া যায়, তাহাতে তৎসময়পূজিত কোন দেবতার অমূল্য নাই। দেবতাদিগের এই স্মরণীয় তালিকাতেও গণেশের নাম নাই। গণেশের অনন্তিভ ভিন্ন ইহার অল্প কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

বাণভট্ট এবং ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর কবি। বাণভট্ট উত্তরপ্রদেশের এবং ভবভূতি দক্ষিণপ্রদেশের। এই সময়ে যে ত্রীপর্বতসম্বন্ধিত প্রদেশে এবং জাতিদিগের মধ্যে কাপালিক এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা উভয় কবির গ্রন্থেই দেখিতে পাই। বাণভট্টের কাদম্বরীতে একটি স্থলে গণপতির কথা পাওয়া যায়। সাহিত্যে হস্তিমুণ্ডধারী গণপতির সাহিত্য এই প্রথম সাক্ষাৎ। এখানেও দেখিতে পাই যে, যেখানে বিজ্ঞান, গন্ধৰ্ব্ব প্রভৃতির চিত্রে চিত্রিত দেশের কথা বলা হইতেছে, সেই স্থলে 'গণ'-দিগের গাত্রমার্জ্জনচিত্রের কথা বলিয়া, তৎসঙ্গেই তাহাদের অধিপতির অবগাহনের চিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। লিখিত হইয়াছে—

“অবকীর্ণভঙ্গ্যহিত-মগ্নোখিত-গণবল্লোললনম্ অব-
গাহাবর্তীর্ণ-গণপতি-গণহুলগলিত-মদপ্রবণ-সিদ্ধম্।”

এস্থলে অল্প কোন দেবতার কথা নাই; এবং কুত্রাপি দেবতার চিত্র এরূপ ভাবেও ব্যক্ত হয় নাই। এখানে গণপতি গণদিগের সহচর এবং অস্ত্রাস্ত্র গন্ধৰ্ব্বকিন্নরদিগের একদলে। গণপতি যদি তখন পূজিত দেবতাবর্গের মধ্যে একজন হইতেন, তাহা হইলে কাদম্বরীর যে যে স্থানে দেবতাদিগের কথা উঠিয়াছে,

কেই সেই স্থানে ইহাকে পাওয়া যাইত। যেখানে গৃহপ্রতিষ্ঠিত সকল দেবতাদিগেরই নাম এবং আয়তনের উল্লেখ আছে, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অম্বিকা, কাঞ্চিক প্রভৃতি তো আছেনই, তদ্ব্যতীত বৌদ্ধদিগের শৌক্কা-নন, অবলোকিতেশ্বর এবং অর্হতও উল্লিখিত হইয়াছেন। সেখানে গণপতির নাম নাই; কিন্তু আছে যেখানে অত্যাশ্র 'গণ' এবং গন্ধর্বদিগের আবাসের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, প্রথমতঃ গণদিগের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ গণের কর্তব্য হইয়াছিল; এবং পরে তাঁহার পূজার প্রচলন হইলে, কোন-একারে তাঁহাকে পার্শ্বতীর হাতে কাদার তালে উদ্ভূত করাইয়া, মহাদেবের পুত্রস্থানীয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

ভবভূতির মালতীমাধবে সর্বপ্রথমে গণেশের পূজাপদবীলাভ দেখিতে পাই। দক্ষিণপ্রদেশে যে প্রথমতঃ গণেশের পূজা ও পুরাণের উৎপত্তি, তাহা দেখাইতেছি। ভবভূতিতে যাহা দক্ষিণপ্রদেশে সুপ্রচলিত বলিয়া দেখিতে পাই, উত্তরপ্রদেশের বাণভট্টে কাহার কেবল অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়। ইহাতে মনে হয় যে, গণেশের জন্ম সপ্তম শতাব্দীর অধিক পূর্ববর্তী নহে।

রাষ্ট্রকূট এবং চালুক্য রাজাদিগের বিজয়ের পূর্বে যে দক্ষিণদেশে আধ্যানিবাস স্থাপিত হয় নাই, তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কুতূহলী পাঠকগণ এ বিষয়ে সংক্ষেপতঃ শ্রীযুত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের দক্ষিণাপথের ইতিহাস পড়িতে পারেন।

দক্ষিণপ্রদেশে বিশেষভাবে আধ্যানিবাস সংস্থাপিত হইবার পরে যে অমরকন্টক, চিত্রোৎপলা প্রভৃতি এবং মহীশূরপ্রদেশের তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে পুরাণে তুঙ্গভদ্রাদি পবিত্র তীর্থ, নিশ্চয়ই ভাহা দক্ষিণপ্রদেশে রচিত; এবং কাজেই উহা কদাচ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে না। মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং স্বল্পপুরাণ, নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ের পরবর্তী। ভবভূতির সময়ে গণপতি কোন আশ্র পুরাণে স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অল্পসময় পরেই বাঁহার জন্ম পুরাণ রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই দক্ষিণপ্রদেশে তাঁহার পূজা একটু পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল।

দক্ষিণের চণ্ডী ও দক্ষিণের তীর্থমহি-মায় পূরিত মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং চালুক্যদিগের কুলদেবতা স্বন্দের পুরাণ যে অশ্র পুরাণের সহিত প্রতিযোগিতায় দক্ষিণপ্রদেশে লিখিত, তাহার আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ঐ পুরাণগুলি পাঠ করিলেই দক্ষিণপ্রদেশের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে। পুরাণের কালনির্ণয়ের সময়ে বিশেষ কথা পরে লিখিব। পাঠকেরা হয় ত জানেন যে, এখনও দক্ষিণপ্রদেশে গণপতির প্রভাব এবং পূজা যত প্রচলিত, অত্যাশ্র কোণ দেশে তাহা পরিলক্ষিত হয় না।

মহাদেবের বা রুদ্রের 'গণ' পূর্বকালের মরুৎগুলির বংশধর। এই গণদিগের মধ্যে কাহারও বাঁড়ের সুও, কাহারও বা অশ্র জন্তর সুও এবং কাহারও বা সুও নাই।

এরূপ স্থলে, জন্মদিগের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ-জন্মের মাথা বসাইয়া যে গণদিগের অধিপতির সৃষ্টি হইবে, তাহা স্বাভাবিক । গণপতি হইয়া আবার যখন গণেশ পূজা পাইতে লাগিলেন, তখন যে উহার নামে পুরাণ রচিত হইয়া, উহাকে দেববংশজ করা হইবে, তাহাও স্বাভাবিক । যখন যে দেবতার নামে প্রথম পুরাণ হয়, তিনিই তখন সকলের উপরে আসন পাইবার মত গুণ লাভ করেন । গণেশ, কার্তিকের কনিষ্ঠ হইয়াও, একটা

কাঁকির জোরে আগে বিবাহ করিলেন, এ কথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে । এখন কিন্তু কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত ।

গণেশের বয়স প্রায় ১৩শত বৎসর । ইনি দেববর্গের মধ্যে শিশু হইলেও, এখন একটু বয়স্ক ; তাই এখন ইনি অতি নির্দোষী এবং সিদ্ধিনাতা মাত্র । কিন্তু ইনি প্রথম বয়সে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাত্ত্বিক-ধর্ম্মের আলোচনার সময়ে তাহা না বলিলে চলিবে না ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

আমাদের ভাবী অবতারণা ।

জগতের প্রয়োজন হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হন—ইহাই আমাদের প্রাচীন ধারণা ।

পাপের আধিক্য হইলে দুইটি ফলের একটি অবশ্যসম্ভাবী । পাপ পূর্ণ হইলে জীব এক হয় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, না হয় উদ্ধারের পন্থার আশিয়া পড়িবে ।

দোষের মাত্রা চড়িয়া উঠিলে অনেক ব্যক্তি, অনেক সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়—আবার কোন কোন ব্যক্তি বা জাতির জীবনের গতি বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে । এই হিসাবে “যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত” শ্লোকের অর্থ একটু নূতনভাবে বুঝিতে হইবে । যেখানেই অত্যাচারের আবর্ত প্রবল, সেইখানেই যে ভগবৎ-রূপার আলোকবর্তিকা প্রকাশ পাইয়া ধ্বংসমুখ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, তাহা নহে । অত্যাচারের মুখে কত ক্রান্তি একেবারে

বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । যুরোপীয় সভ্যজাতি-গণের অত্যাচারে নিরীহ রেড্ ইণ্ডিয়ান্ বিনষ্ট হইয়া গেল, সেখানে ত অত্যাচারীর হস্তের খড়্গ ও বন্দুক কাড়িয়া লইবার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন না,—সুতরাং আমরা যদি কখনও ছুঃখে-কষ্টে পড়িয়া একান্ত আতঙ্কিত আশঙ্কিত হই যে, ছুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, এইবার ভগবান্ নিশ্চয়ই ভাগ্য-চক্রের পরিবর্তন করিবেন, তাহা আমাদের অন্ধবিশ্বাস বই আর কিছু নহে ।

ব্যক্তিগত জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ হইয়া—সামাজিক জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্র সেই সত্যকে আরও বেশী ফলাইয়া তোলে । কোন কোন জীবন রোগ, শোক বা পরপীড়ন প্রভৃতি দুর্ঘটনার উৎস হইয়া যায়, আবার এরূপও চাই এক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, ঘোর বিপদে

পড়িয়া সহসা মানুষের আভ্যন্তরীণ মহাশক্তি জাগিয়া উঠে ও তাহাকে দেবশ্রীমণ্ডিত করিয়া অঙ্গতে প্রচার করে,—সেই স্থলে ভগবানের অঙ্ককম্পা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

যে জাতি পাপের মোহে অন্ধ হইয়া যায়, আর জাগ্রত হয় না,—পাপ তাহাকে ধ্বংস করে ; সে জাতি কখনই আশা করিতে পারে না যে, তাহাদের কষ্ট ভগবদ্দয়ার উদ্রেক করিবে । শাস্ত্রে লিখিত আছে, এদেশে কবির অবতার হইবে, তিনি স্লেচ্ছাধিকার দূর করিয়া সাধুর পরিভ্রাণ করিবেন । মুর্শিদাবাদকাহিনীর লেখক নিখিলবাবু একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যদি স্লেচ্ছ-বিনাশকল্পে ভগবানের আসা সম্ভবপর হয়, তাহাতে আমাদের আশ্বাসিত হইবার কোন কারণ নাই—সে স্লেচ্ছ আমরা । বাস্তবিকই সংপঞ্চরট, আচারবর্জিত, কর্তব্যো পরাশ্রুথ, ভীক ও বিলাসী কাপুরুষ আমাদের অপেক্ষা স্লেচ্ছ আর বর্তমান জগতে কে আছে ? শাস্ত্রের শ্লোক হিন্দুজাতির প্রতি পক্ষপাতী নহে—উহার অর্থ সনাতন ও ব্যাপক, সমস্ত জীবজগৎকে লক্ষ্য করে । তাহাই যদি হয়, তবে অশ্মারূঢ় কঙ্কিমূর্তি আমাদের আশ্বাসপ্রদ নহে, উহার কল্পনায় আমাদের আত্মাপুরুষের আতঙ্কিত হইয়া উঠিবার কথা ।

কিন্তু যে জাতি অজ্ঞান সহিয়া, বিবিধ দুর্কর্মের স্রোতে কণিক আত্মহারা হইয়া পুনরায় জাগ্রত হয়—অনুতাপাগ্নি আলিয়া পূর্নকৃত সমস্ত দুর্কর্মের জঞ্জাল ভস্মীভূত করিয়া নবশক্তিবাহের পুনরারাদনা রত হয়,—তাহাদের মধ্যে ঐশশক্তিবিকাশের সম্ভাবনা দাঁড়ায় । সমস্তজাতির তপশ্চরণে

যে জ্যোতির উদগম হয়—অবতারের লগাটে তাহাই বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে । সে জাতি যত কুদ্র, যত তুচ্ছ হউক না কেন, ভগবানের রূপভাজন হইতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না । শাস্ত্রে দেখিতে পাই, তিনি কুর্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যে জাতির যেরূপ অভাব, তাহাই মোচন করিবার উপযোগী সুব্যবস্থা করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ইতস্তত হয় না, এতদর্থে মনুষ্য ও কুর্মমূর্তি তাঁহার নিকট তুল্যরূপে গ্রাহ্য ।

কিন্তু অবতার যে আকারেই উপস্থিত হউন না কেন, তিনি সমাজের একজন হইয়াও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকেন । কুর্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপ গ্রহণে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু স্বর্গের আলোক তাঁহার নখর বা শৃঙ্গ হইতে ফলিয়া উঠে ও তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হয় না । প্রাচীন সংস্কার যখন সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়, প্রাচীন পাপ যখন ধর্মবেদি আশ্রয় করিয়া অণুবা শাস্ত্রবচনে পুষ্ট হইয়া সমাজের মূর্ধায় অভিষিক্ত হয়—যখন সমাজদেহের যেখানে বিষ, সেখানে বেদনাবোধ লুপ্ত হয়—তখন সেই পুরুষবর একহস্তে চৈতন্তের আলোকবর্তিকা, অপর হস্তে প্রাণসঞ্জীবন মহৌষধ লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহার বাহুরূপ সমাজের উপযোগী হয়, কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরের বিগ্রহ মানবসমাজের চিরন্তন স্বর্গকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যায় । এই হিসাবে নর-সিংহ ও কুর্ম রূপের সঙ্গে বুদ্ধাবতারের কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না । একজন অবিবাসীর মুণ্ড নথরে ছেদন করিয়া-

ছিলেন, অপর জগতের সারথন বেদকে রক্ষা করিয়াছেন; আর বুদ্ধদেব এই নির্ভর রাজ্যে স্বর্গীয় করুণার বেদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহারা সময়োপযোগী ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে অব-
তীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য—কিন্তু প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক ছিল। পৃথিবীর সঙ্গে যখন স্বর্গের সম্পর্ক লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, তখন ইহারা সেই সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন যদি গারো কিংবা কুকিজাতির মধ্যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, তবে বোধ হয় তাঁহাকে নরসিংহের মত মূর্তিতে উপস্থিত হইতে হইবে, পরম-
সৌম্য বুদ্ধের মহিমা সেই সকল সমাজের উপযোগী নহে; কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধ ও নরসিংহের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছুই নাই—চিরন্তন বিশ্ববিধানের পবিত্রতা-
রক্ষাই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ। প্রথম কয়টি অবতারের কথা যদি রূপকথা বলিয়া গণ্য হয়, ভগবানের অপার করুণায় বিধাসই সেই রূপকথার সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশ এখন একজন মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; আমরা বিপৎসাগরে পতিত; যে মহিমা হিন্দুস্থানের ললাটে উজ্জ্বল এবং প্রকৃত রাজচিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া ছিল, তাহা মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা পরপ্রেক্ষী, অনশনতপ্ত ও নানা অপমানে লাঞ্চিত। আমাদের এই মন্দ ভ্রমসাক্ষর রাজ্যি কোন্ তেজস্বী মহা-
জনের মহিমায় কাটিয়া যাইবে? শত শত বৎসর যে হিন্দুস্থান স্বীয় নিরুত্তর ও সংঘের

পুণ্য যজ্ঞায়ি সম্মুখে রাখিয়া তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিল—যে ব্রতসিদ্ধির ফলস্বরূপ শত শত মহাজন আবির্ভূত হইয়া এই দেশ হইতে ধর্ম, দর্শন ও কবিত্বের সাধু-শুভ্র জ্যোতি চিরকালের জন্ত জগতের অন্ধকার দূর করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছেন—সেই ব্রত কি এতদিনে সাক্ষ হইয়াছে? এই যে উপবাস, সংযম, দেবারাধনা, নির্জন-চিন্তা—যাহা হিন্দুস্থানের শুভ্রতম-কিরীটস্বরূপ, তাহা দূর করিয়া কোন্ অন্ধ সভ্যতা আমাদের মধ্যে অতৃপ্ত বিলাস ও বুদ্ধির অগ্নি জালিয়া দিল? হায়! আমাদের বৃদ্ধি ধ্বংস হইবার দিন সম্মুখীন!—এইজন্ত স্বর্গের আলো ছাড়িয়া আমরা আলেয়ার আশ্রয়ে অগম পন্থার আবিষ্কার করিতে চাহিতেছি! আমাদের যোগসাধনা করিবার প্রাচীন কৌপীনখানি ফেলিয়া রাখিয়াছি ও মুরোপীয় বিলাসের রঙিন শ্রাক্‌ডায় শোভাষিত হইতে চাহিতেছি। কিন্তু যদি মহাপরীক্ষার দিনে হিন্দুস্থানকে গর্ব করিয়া স্বীয় নিজস্ব প্রমাণ করিতে হয়—জগতের সম্মানশালার তাহার আশ্ব-
পরিচয় দিতে হয়, তবে সেই ছিন্ন-গলিত কৌপীনখানিরই অল্পসন্ধান করিতে হইবে; সেই বেদান্তধর্ম হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে জগৎকে নিঃশ্রুতম, শুভ্রতম আলো দেখাইয়া আমন্ত্রণ করিতেছে—আমাদের পরিত্যক্ত কৌপীনখানি সেই বেদান্তকারগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন,—আমরা বহুভাগ্যে উত্তরাধিকার-
স্বত্ব তাহা পাইয়াছি, আমাদের উহাই জাতীয় পতাকা। যিনি মানবজাতির চুঃখ-
বিমোচনের জন্ত রাজপুত্র হইয়াও ককিরের বেশে বনে বনে কি-এক স্বর্গীয় ঔষধ খুঁজিয়া

বেড়াইয়াছিলেন, সেই ভিষকরাজ এই পৃথিবীতে, যে জ্যোতিষ্ময় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন—তাহার বৈরাগ্যের শুভ্রদীপ্তি শত শত যমুয়াসনের তীব্র জ্যোতি ম্লান করিয়া দিতেছে। বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে নহে—কপিলাবস্তুর বনরাজির চিরহরিৎ পল্লবনিচয় আমাদের কাছে যে বৈরাগ্যের স্বপ্ন দেখাইতেছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে আমাদের প্রকৃত মহিমা বিদূরিত হইবে। এই বৈরাগ্যজনিত মহাপ্রেম একদিন বজ্রার ছায় নবদীপ হইতে বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। আমাদের যাহা-কিছু গৌরব, যাহা-কিছু মহিমা—তাহা নিরুত্তর, তাহা বৈরাগ্যের। হিন্দু পাত্র, এই পূর্বপুরুষপ্রদর্শিত পন্থা ত্যাগ করিলে তোমাদের অস্তিত্বরক্ষার সম্ভাবনা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বালা, যৌবন ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়; বালক বুদ্ধের মত হইয়া পড়িলে তাহার অকাল জ্যেষ্ঠতাত্বের জ্ঞান সে নিম্নিত হয়, বুদ্ধও যৌবনের আভরণ-প্রকাশে উৎসাহী হইলে তাহার গুপ্তের কলপ ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য হাতের উল্লেক করে।

হিন্দুজাতি এখন বয়োবৃদ্ধ। যাহারা এখন নবযৌবনের ক্ষুণ্ণিতে ঢই হাতে বিজয়-ডকা বাজাইয়া পৃথিবী চমকিত করিয়া তুলিতেছেন, রাজ্যলুপ্ত ও ধনগৃহী হইয়া সর্বজনীন হিতের মন্তকে বজ্রাঘাত করিতেছেন,—পশু-হননের জ্ঞান নহে, স্বজাতির সংহারকামনায় ভয়-ঙ্কর শত শত মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, যাহারা মহাব্যাজ্ঞতির প্রতি স্বর্গীয়সম্ব্যাজ্ঞাপক মহাপ্রহর বাইবেলের নীতি মুখে স্বীকার করিয়াও সেই পুস্তকের চক্রে চক্রে শেল বিদ্ধ

করিয়া যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তে নাচিয়া-উঠিয়া কয়েকখানি বংশযষ্টি সংগ্রহ করিয়া জগতে বরণীয় হইব, ইহা নিতান্তই উপহাসের কথা—এই বংশদণ্ডের বীরত্ব ও প্রতাপাদিত্যের প্রেতাশ্বার আমন্ত্রণ—আমাদের ললাটে গৌরবচিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিবে না। ইহার অপেক্ষা উপহাসের কথা কি হইতে পারে যে, যেকালে ম্যাক্সিম-গন্ প্রভৃতি মৃত্যুর ভয়াবহ যন্ত্রসকল উদ্ভাবিত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিজ্ঞার লোল-রসনা বিনাশশক্তি তাণ্ডবনৃত্যের সূচনা দেখাইয়া জগৎকে আতঙ্কিত করিতেছে, সেইকালে আমরা জগতের একপ্রান্তে বসিয়া কয়েকটি বংশযষ্টিতে সর্ষপতৈল সংযোগ করিতেছি ও প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য প্রভৃতি পল্লিবীরগণের মৃতস্বপ্নের পুনরুদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হইয়া রঙ্গালয়ের ক্ষণিক উত্তেজনার আশ্ব-প্রসাদে চরিতার্থ হইতেছি। গীতার “স্বর্গে নিধনং শ্রেয়ঃ” সকলেই জানেন। আমরা এখন ঐরূপ বীরত্বে অল্প প্রাণিত হইবার অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি—উহা আমাদের ধর্ম নহে। বুদ্ধব্যক্তির গুপ্ত কলপ দেওয়ার ছায় এই ধার-করা বীরত্ব উপহাসের সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। আমরা দেশীয় ব্যারামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার হিসাবে এই বংশযষ্টির অল্প-লীলন স্বাস্থ্যের হিতকর বলিয়া গণ্য করি, কিন্তু কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইহা আমাদের রাজোন্নতির নির্ভরদণ্ড হইবে—এ কল্পনা নিতান্ত অসাড়। আশা করি, ঐরূপ উদ্ভ্রান্ত কল্পনা কাহারও মাথার আইসে নাই।

বয়োবৃদ্ধের যে সম্মান, তাহা আমাদের মধ্যে ছিল, বর্তমান কালের হিড়িকে আমরা

তাহা হারাইতে বসিয়াছি। গ্রীস ও রোম তাহাদের প্রাচীন বীর্য ফিরিয়া পায় নাই। বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধের প্রাণ্য মর্যাদা দেখাইয়া সমগ্রইয় যুরোপ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে মাত্র। উহাদের অপেক্ষা উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর মর্যাদা ভারতের প্রাণ্য। যে তপস্বী আমাদের পূর্বপুরুষগণের ছিল—সেই তপস্বী অক্ষর ও অপ্রতিহত রাখিলে তাহাদের প্রদত্ত অমূল্য শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের অধিকার জন্মাবে। আমাদের মত সেই তপস্বী কোন জাতি করে নাই এবং যেদিন প্রজ্বলিত গৃহকলহে যুরোপের ঐশ্বর্যসম্পন্ন বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ আহুতি পড়িবে, সেদিন পরিতপ্ত জগৎ ব্যাকুলভাবে শান্তি ও শ্রীতি শিক্ষার জন্য চতুর্দিকে তাকাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষ মহাশিক্ষক—মহাভিষেক রূপে তাহার ব্যথিত স্থানে নিবৃত্তি ও পরাধীনতার হস্ত ব্লাইয়া দিবেন এবং অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই মহারাজরাজেশ্বরকে চিনাইয়া দিবেন—যাঁহার শাস্তিময়, অমৃতময় নিকেতনের আভাস পাইলে মানুষের ভয় ও অশান্তি চিরতরে ঘুচিয়া যায়। আমাদের কল্পনা এই দৃষ্ট আঁকিয়া ছুট হইতেছে। যে অস্ত্রশস্ত্রের বন্দনা চারিদিক হইতে শ্রুত হইতেছে—ইহা প্রলয়ের সূচনা করিতেছে। ইহা যুরোপের নানা শিল্পদৈর্ঘ্যে উদ্ভাসিত বিলাসকলা শোভিত রাজধানীগুলিকে মহাশ্মশানে পরিণত করিবার আশঙ্কা দেখাইতেছে,—যুরোপের আকাশচুম্বী মহামেষ্টগুলির শীর্ষে গুপ্তরাজ বসিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এইরূপ মনে হয়। এই অস্ত্রশস্ত্র—মৃত্যুর এই ভয়াবহ যন্ত্রগুলি যে অগ্নিআলা উদ্দীপন করিবে,

তাহাতে হয় ত যুরোপে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। যাহাদের এত তেজ ও পরস্পরের সহিত এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহারা এই বিষময় আলা বেশিদিন ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন না; মহামঞ্জে যেদিন লৌহ-যন্ত্রগুলি অগ্নি উদ্দীপন করিবে, সেদিন স্পর্ধা, বিক্রম ও অহঙ্কারের হয় ত শেষ আহুতি পড়িবে, সেইদিন যুরোপের গতি হয় ত ভিন্নদিকে প্রবাহিত হইবে। এই ছুটব্রণ উদ্দীপিত হইয়া বাউক। এই যে অর্ধপৃথিবী গ্রাস করিতে উত্তত হইয়া ক্রমভঙ্গ্যক রোষকবাগ্নিতনেত্র পৃথিবীর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও শাস্তিময় ক্ষুদ্র জাপান-রাজ্যখানিকে এক প্রাণান্তক থাবার চূর্ণ করিয়া ফেলিবার স্পর্ধা করিতেছে, এই তল্পকরাজের উত্তত পাদমুষ্টিই যুরোপের সমুদ্রলক্ষ্মীকে চিরবিনাশের পথে লইয়া যাইবার পূর্বাভাস দিতেছে কি না, কে বলিবে? কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও বৈষম্যের পরে শান্তির দিন আছে। এমন দিন আসিতে পারে, যখন শান্তির জন্ত জগতে হাঁহাকার উঠিবে। হে ভারতবাসি, তুমি ধীরহস্তে সন্ধ্যার ধবজ্যোতি,—নিবৃত্তির আলো আলাইয়া রাখ। এই হট্টগোলপূর্ণ বিধেহট্ট কলরবের দিবাবসানে মানবজাতি হয় ত পুনশ্চ এই দীপের অল্পসন্ধান করিবে, ইহার নির্মূল ভাতিতে তাহার চক্ষে নবজ্যোতি ফিরিয়া আসিবে; হিন্দু এই দীপ নিবাইও না। তোমার চরিত্র সংবত হউক, সামাজিক শত শত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, নির্মলদেহে নির্ভীক অন্তঃকরণে তপস্বী কর;—সত্যনিষ্ঠা, বিষয়ে বৈরাগ্য, অবস্থার প্রতি উপেক্ষা শিথিয়া শরীর ও মনকে হুঃখকষ্টে অভ্যস্ত কর।

একদিন নারীজাতির দ্বারা যে উপবাস, সেবা ও পরার্থ আত্মসমর্পণের চর্চা করাইয়া লইয়াছে, পুনরায় নিজেরা সেই সকল বৃত্তির অঙ্গীকারে প্রবৃত্ত হও। সত্যের সহিত সহমরণে প্রস্তুত হও, নিবৃত্তির পবিত্র রক্তাগ্নিতে অগলক বিলাসিতার সামগ্রীগুলি পোড়াইয়া ফেল। এই তপস্তা পূর্ণ হইলে নিবৃত্তির মহাক্ষেত্রে মহানিবৃত্তিপরায়ণ আবির্ভূত হইতে পারেন। তাঁহার শুভ-সুখদুঃখ হাতছাড়া চক্রকরলেখার ভ্রাম্য উত্তপ্ত ধরাবক্ষকে শাস্তিময় করিয়া তুলিবে,—সমস্ত বিদ্রোহ তাঁহার সাম্য-শান্তি-পরিষোধক মেঘহ্রুত্তি-মাদী কণ্ঠধরে দমিত হইয়া যাইবে,—তখন শুক্লগৃহ বা দেবগৃহের যে সম্মান, তাহাই প্রদান করিয়া জগদ্বাসী হিন্দুস্থানকে রক্ষা করিবে। আমরা তপশ্চরণ না করিলে তিনি আসিবেন না,—বিদেশীয়গণের উদ্ধৃত্ততা ও বিলাসিতায় যোগদান করিলে আমাদের ধ্বংস অবধারিত; কারণ ধোবন বাহা সহিতেছে বা করিতেছে—বার্দ্ধক্যে তাহা সহিবে না। তাহা হইলে কক্ষি আমাদের মত স্নেহের উচ্ছেদের জন্তই আবির্ভূত হইবেন। নরসিংহাবতার আমাদের সমাজে হইয়া গিয়াছে, সেই অরুণপুত্র অন্ধ-নরাকৃতি দেবতা আর আমাদের সমাজের উপযোগী নহে। যে স্থান দুষ্ট, অহঙ্কার ও অধিধাসের জাঁড়াক্ষেত্রে, সেই স্থানে নরসিংহ-মূর্তির আবির্ভাব হইতে পারে,—অথবা যুরোপে নেপোলিয়ানমূর্তিতে তাহা হইয়াও গিয়াছে। আমরা বুদ্ধচৈতন্যের পরম রূপা পাইয়াছি; আমাদের এখানে যিনি আসিবেন, তিনি সম্পূর্ণ দেবতাব লইয়া আসিবেন—অন্ত কোন

মূর্তি আমাদের উপাস্ত হইবে না। তিনি শুভ প্রীতিপুষ্পের মালা পরিয়া আসিবেন, তিনি বিবিধকারকাব্যখচিত উজ্জলরাগ-রঞ্জিত বিচিত্র অধরে সংযুত হইয়া তুলাইবেন না, তিনি আমাদের কোপীনবাসেরই মহিমা ঘোষিত করিয়া বিলাসী জগৎকে পুণ্যদীপ্ত দৈন্তের অলঙ্কার পরাইয়া দিবেন; তিনি শত্রু-দমনের জন্ত অসিচন্দ্র বা বন্দুক লইয়া আসিবেন না,—জ্ঞানের তৃতীয়চক্র লইয়া আসিবেন,—জগতের মোহবন্ধন তাঁহার ইজিতে টুটিয়া যাইবে। এইরূপ মহাপ্রসিক্তের আবির্ভাব সম্বন্ধ করিয়া জাতীয়ত্বত অবলম্বনপূর্বক আমাদের প্রতীক্ষা করা উচিত। আমরা কুশিকা ও উজ্জ্বলতার তাপে স্নান হইয়া পাড়িলেও আমাদের শোণিতে যে সাত্ত্বিকতা সঞ্চিত আছে, জগতের কোন জাতির তাহা নাই, তাহারই বিকাশ করিবার সময় হইয়াছে। রাক্ষসের বদনব্যাদান দেখিয়া, আগাদের দন্তরুচিবিকাশের চেষ্টা হাত্তকর ও অসার। “জীবন-মৃত্যু পারের ভূত্যা”—মৃত্যুকে ভয় না করিয়া, জীবনের আকাজকা ছাড়িয়া, জগতের হিততত্ত্ব পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভাবী অবতারণকে আবাহন করিয়া আনিতে হইবে। যখন ভীষণ বিবেচনায় নিপীড়িত মানবজাতি ‘পরিজাহি’ বলিয়া চীৎকার করিবে, তুমার শুভ্র অবিচলিত মূর্তিতে তখন বেতচন্দন-দ্র্যতি-দীপ্ত হইয়া, তুমি ব্রাহ্মণ, আর একবার জগতে শান্তির শুভ আদেশ প্রচার করিয়া যাইও। যে তারতবর্ষ শান্তির লক্ষ্যে এক ক্রুদ্ধ, এক তপশ্চরণ করিল, সেই তারতবর্ষ হইতে যদি জগতে শান্তি প্রচারিত না হয়, তবে তাহা আর কোন স্থান হইতে হইবে ?

ত্রীকেশচন্দ্র সেন।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

২৩

রাত্রি নরটার সময় রমেশ কমলাকে লইয়া শেয়ালদহ-ষ্টেশনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় একটু ঘুরপথ দিয়া গেল। গাড়োয়ানকে অনাবশ্যক গোটাকতক গলি ঘুরাইয়া লইল। কলুটোলায় একটা বাড়ীর কাছে আসিয়া আগ্রহসহকারে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। পরিচিত বাড়ীর ত কোন পরিবর্তন হয় নাই! রমেশ এমন কত রাজে এই গলিতে পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে— শুকরাড্রে বাড়ীর একটি চেহারা দিনেরবেলার চেয়ে আরো যেন ফুটয়া উঠিত—গলি যখন জনশূন্য এবং নিঃশব্দ, তখন এই বাড়ীর বৃকের ভিতরকার একটি মহামূল্য রহস্য অন্ধকারের মধ্যে যেন বাহির হইয়া আসিত, —রাজে বাড়ীর হৃদয়স্বরূপ যেন ইটকাঠের মধ্য হইতে মুক্ত হইয়া ভিত্তিচ্ছায়ায় শুক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। বহুতর গভীর রাজের সেই নিবিড় তাবাবেগ তাহার চিত্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে এই বাড়ীর দীপালোক ও অন্ধকার, রুদ্ধধার ও মুক্ত বাতাস, বারান্দার শূন্যতা ও শাদা দেয়ালের

গুহ্যচ্ছটা রমেশের ব্যগ্রদৃষ্টির উপর দিয়া চলিয়া গেল। যদি আজ না হইয়া গতকল্য হইত, তবে অনাগ্রাসে রমেশ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিত, “রোথো, রোথো!” এই ঘরের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া সবেগে ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত এবং কথা ও দৃষ্টির দ্বারা সকলের কাছ হইতে বিদায় লইয়া আসিতে পারিত। প্রবেশদ্বার আজও খোলা রহিয়াছে, কিন্তু প্রবেশ করিবার পথ নাই। এই দরজা দিয়া রমেশ এই বাড়ীতে আর কখনো প্রবেশ করিতে পারিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। গাড়ি চলিয়া গেল— রমেশের হৃদয়ের একান্ত আগ্রহ এই দরজার কাছে গাড়ির গতিকে লেশমাত্র বাধা দিল না—গাড়ি অপক্ষপাত দ্রুততার সহিত গলির সব বাড়ীকেই অতিক্রম করিয়া বড়রাস্তায় গিয়া পৌছিল।

রমেশ এমন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যে, নিদ্রাবিষ্ট কমলা চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি হইয়াছে?”

রমেশ উত্তর করিল—“কিছুই না।” আর—

কিছুই বলিল না—গাড়ির অন্ধকারে চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া, কমলা আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্ত কমলার অস্তিত্বকে রমেশের যেন অসহ্য বোধ হইল। প্রাণপণ শক্তিতে ইহার বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল। একটীমাত্র এই বালিকা তাহার ভবিষ্যৎকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যে দিকেই তাকায়, কোথাও সে কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। রাজে গাড়ি যখন দুই পাখের হস্তাশ্রয়ীর মাঝখান দিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, কমলা যেন একটা বস্তুর মত তাহার পরিচিত লোকালয় হইতে রমেশকে একটা কালো স্রোতের উপর দিয়া ছুনিবার বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে—কোথায় ঠেকিবে, কোথায় থামিবে, কিছুই জানা নাই এবং রমেশের সমস্ত আশ্রয়স্থান এই স্রোতের সংঘাতে ভাঙিয়া-চুরিয়া কি দশা পাইবে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন। সাঁতার দিবার সময় পারে কাপড় জড়াইয়া ডুবিলার মত হইলে মজ্জমান ব্যক্তি বন্ধনমোচনের জন্ত যেমন করিয়া পা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশের সমস্ত মনটা ভিতরে-ভিতরে তেমনি হাঁসফাঁস করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এখনি গাড়ি ফিরাইয়া সেই গলির মধ্যে সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং সকলের সাম্নে কমলাকে রাখিয়া আজ রাজেই সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলে। কিন্তু কথা পরিষ্কার হইবার পক্ষে অনেক বিলম্ব হইয়া গেছে। দেশে তাহাদের পরিবারের মধ্যে রমেশ

কমলাকে লইয়া স্বামিজীর মত অনেক দিন যাপন করিয়াছে—কমলার ইতিহাস হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিবার আর কোন উপায় নাই; এখন সত্য কথা বলিতে গেলে কমলাকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে হয়। যদি তাহার স্বামী থাকে, তবে সে অবলম্বন হইতে কমলা ভ্রষ্ট হইয়াছে; আর সমাজে বৈধব্যের যে নিভৃত আশ্রয়, তাহা হইতেও কমলা বিচ্যুত। এমন অবস্থায় তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া আর কেহ পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু রমেশ পারে না।

গাড়ি যথাসময়ে স্টেশনে পৌছিল। একটী সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ি পূর্ব হইতেই রিজার্ভ করা ছিল—রমেশ ও কমলা তাহাতে উঠিল। একদিকের বেঞ্চিতে কমলার জন্ত বিছানা পাতিয়া গাড়ির বাতির নীচে পদ্ম টানিয়া অন্ধকার করিয়া দিয়া রমেশ কমলাকে কহিল, “অনেকক্ষণ তোমার শোবার সময় হইয়া গেছে, এইখানে তুমি ঘুমাও।”

কমলা কহিল, “গাড়ি ছাড়িলে আমি ঘুমাইব, ততক্ষণ আমি এই জানালার ধারে বসিয়া একটু দেখিব?”

রমেশ রাতি হইল। কমলা মাথায় কাপড় টানিয়া প্ল্যাটফর্মের দিকের আসন-প্রান্তে বসিয়া লোকজনের আনাগোনা দেখিতে লাগিল। রমেশ মাঝের আসনে বসিয়া অশ্রমনস্বভাবে চাহিয়া রহিল। গাড়ি যখন সব ছাড়িয়াছে, এমন-সময় রমেশ চমকিয়া উঠিল—হঠাৎ মনে হইল, তাহার একজন চেনালোক গাড়ির অভিমুখে ছুটিয়াছে।

পরক্ষণেই কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেশ জানলা হইতে মুখ

বাড়াইয়া দেখিল—রেলোয়ে কর্মচারীর বাধা কাটাওয়া একজন লোক কোনক্রমে চলন্ত গাড়িতে উঠিয়াছে এবং টানাটানিতে তাহার চাদর কর্মচারীর হাতেই রহিয়া গেছে। চাদর লইবার জন্ত সে ব্যক্তি যখন ছান্ধা হইতে বুঁকিয়া-পড়িয়া হাত বাড়াইল, তখন রমেশ স্পষ্ট চিনিতে পারিল, সে আর-কেহ নয়, অক্ষয়।

এই চাদর-কাড়াকাড়ির দৃশ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমলার হাসি থামিতে চাহিল না।

রমেশ কহিল—“সাদে দশটা বাজিয়া গেছে—গাড়ি ছাড়িয়াছে, এইবার তুমি ঘুমাও।”

বালিকা বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিল, মাঝে মাঝে খিল্খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে রমেশের বিশেষ কৌতুকবোধ হইল না।

রমেশ জানিত, কোন পল্লিগ্রামের সহিত অক্ষয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না—সে পুরুষাত্মক কলিকাতাবাসী। আজ রাত্রে এমন উদ্ধাশে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে? রমেশ নিশ্চয় বুঝিল, অক্ষয় তাহারই অমূল্যরূপে চলিয়াছে।

অক্ষয় যদি তাহাদের গ্রামে গিয়া অমূল্যসন্ধান আরম্ভ করে এবং সেখানে রমেশের ধপধপক্ষমগুণীর মধ্যে এই কথা লইয়া একটা বাঁটাঘাটি হইতে থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা কিরূপ জঘন্য হইয়া উঠিবে, তাহাই কল্পনা করিয়া রমেশের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের পাড়ায় কে কি বলিবে, কিরূপে ঘোঁট চলিবে, তাহা রমেশ যেন প্রত্যক্ষ-

বৎ দেখিতে লাগিল। কলিকাতার মত সহরে সকল অবস্থাতেই অন্তরাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়—কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর গভীরতা কম বলিয়াই মল্ল আঘাতেই তাহার আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠে। সেই কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, রমেশের মন ততই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

বারাকপুরে যখন গাড়ি থামিল, রমেশ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় নামিল না। নৈহাটিতে অনেক লোক উঠানামা করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে অক্ষয়কে দেখা গেল না। একবার বৃথা আশায় বগুলা-ষ্টেশনেও রমেশ বাগ্র হইয়া মুখ বাড়াইল—অবরোধীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই। তাহার পরের আর কোনো ষ্টেশনে অক্ষয়ের নামিবার কোন সম্ভাবনা সে কল্পনা করিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে:শান্ত হইয়া রমেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

পঁরদিন প্রাতে গোয়ালন্দে গাড়ি পৌঁছিলে রমেশ দেখিল, অক্ষয় মাথায়-মুখে চাদর জড়াইয়া একটা হাতবাগ্ লইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে ষ্টীমারে রমেশের উঠিবার কথা, সে ষ্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব আছে। কিন্তু অল্প ঘাটে আর একটা ষ্টীমার গমনোন্মুখ অবস্থায় ঘনঘন বাঁশী বাজাইতেছে। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “এ ষ্টীমার কোথায় যাইবে?” উত্তর পাইল, “পশ্চিমে।”

“কতদূর পর্যন্ত যাইবে?”

“জল না কমিলে কাণী পর্যন্ত যায়।”

ওনিয়া রমেশ তৎক্ষণাৎ সেই ষ্টীমারে

উঠিয়া কমলাকে একটা কামরাধ বসাইয়া আসিল—এবং তাড়াতাড়ি কিছু দুধ, চাল-ডাল এবং একছড়া কলা কিনিয়া লইল।

এদিকে অক্ষয় অল্প দীমারে সকল আরোহীর আগে উঠিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেখান হইতে অন্যান্য বাজীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। যাত্রীগণের বিশেষ তাড়া ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার দেরি আছে—তাহারা এই অবকাশে মুখ-হাত ধুইয়া, নান করিয়া, কেহ কেহ বা তাঁরে রান্ধাবাড়া করিয়া খাইয়া লইতে লাগিল। অক্ষয়ের কাছে গোয়ালন্দ পরিচিত নহে। সে মনে করিল, নিকটে কোথাও হোটেল বা কিছু আছে, সেইখানে রমেশ কমলাকে খাওয়াইয়া লইতেছে।

অবশেষে দীমারে বাণী দিতে লাগিল। তখনো রমেশের দেখা নাই। কম্পমান তক্তার উপর দিয়া বাজীর দল জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘনঘন বাণীর ফুৎকারে লোকের তাড়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আগত ও আগন্তুকদের মধ্যে রমেশের কোন চিহ্ন নাই। ঘনঘন আরোহীর সংখ্যা শেষ হইয়া আসিল—তক্তার টানিয়া লইল এবং সারেং নোঙর তুলিবার হুকুম করিল, তখন অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, “আমি নামিয়া বাইব”—কিন্তু খালাসিয়া তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ডাঙা দূরে ছিল না, অক্ষয় দীমার হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

তীরে উঠিয়া রমেশদের কোন খবর পাওয়া গেল না। অলক্ষণ হইল, গোয়ালন্দ হইতে সকালবেলাকার প্যাসেঞ্জার-ট্রেন কলি-

কাতা-অভিমুখে চলিয়া গেছে। অক্ষয় মনে মনে ভাবিল, কাল রাত্রে গাড়িতে উঠিবার সময়কার টানাটানিতে নিশ্চয় সে রমেশের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং রমেশ তাহার কোন বিরুদ্ধ অভিসন্ধি অনুমান করিয়া দেশে না গিয়া আবার সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেছে। কলিকাতায় যদি কোন লোক লুকাইবার চেষ্টা করে, তবে ত তাহাকে বাহির করাই কঠিন হইবে!

• ২৪

অক্ষয় সমস্তদিন গোয়ালন্দে ছট্‌ফট করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার ডাকগাড়িতে উঠিয়া পড়িল। পরদিন ভোরে কলিকাতায় পৌছিয়া প্রথমেই সে রমেশের দর্জিপাড়ার বাসায় আসিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ—খবর লইয়া জানিল, সেখানে কেহই আসে নাই।

কলুটোলায় আসিয়া দেখিল, রমেশের বাসা শূন্য। অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া যোগেন্দ্রকে কহিল “পালাইয়াছে—ধরিতে পারিলাম না।”

যোগেন্দ্র কহিল—“সে কি কথা?”

অক্ষয় তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল।

অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া রমেশ কমলাকে স্কন্ধ লইয়া পালাইয়াছে, এই খবরে রমেশের বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হইল।

যোগেন্দ্র কহিল—“কিন্তু অক্ষয়, এ সমস্ত যুক্তি কোন কাজেই লাগিবে না। শুধু হেম-নলিনী কেন, বাবা-স্বন্ধ ঐ এক বুলি ধরিয়াছেন—তিনি বলেন, রমেশের নিজের মুখে শেষ কথা না শুনিয়া তিনি রমেশকে অস্বিখাস

করিতে পারিবে না। এমন কি, রমেশ আজ্ঞা আদিয়া যদি বলে, ‘আমি এখন কিছুই বলিব না’, তবু নিশ্চয় বাবা তাহার সঙ্গে হেমের বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাদের লইয়া আমি এমনি মুক্ছিলে পড়িয়াছি। বাবা হেমনলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না—হেম যদি আজ আশ্রয় করিয়া বসে, ‘রমেশের অস্ত্র স্ত্রী থাকুক, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব, তবে বাবা বোধ হয় তাহাতেই রাজি হন। যেমন করিয়া হোক এবং যত শীঘ্রই হোক, রমেশকে দিয়া কবুল করাইতেই হইবে। তোমাকে হতাশ হইলে চলিবে না। আমিই এ কাজে লাগিতে পারিতাম, কিন্তু কোনপ্রকার কন্দী আমার মাথায় আসে না—আমি হয় ত রমেশের সঙ্গে একটা মারামারি বাধাইয়া দিব। এখনো বুকি তোমার মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া হয় নাই।’

অক্ষয় মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে অন্নদাবাবু হেমনলিনীর হাত ধরিয়া চা খাইবার ঘরে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয়কে দেখিয়া মাত্র হেমনলিনী ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির ছুইয়া গেল।

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া কহিল—“হেমের এ তারি অস্ত্রায়! বাবা, তুমি উহার এই সকল অভদ্রতায় প্রশ্রয় দিও না। উহাকে জোর করিয়া এখানে আনা উচিত। হেম! হেম!”

হেমনলিনী তখন উপরে চলিয়া গেছে। অক্ষয় কহিল, “যোগেন্দ্র, তুমি আমার কেসু আরো খারাপ করিয়া দিবে দেখিতেছি! উহার কাছে আমার সূক্ষ্মে কোন কথাটি

কহিলো না। সময়ে ইহার প্রতিকার হইবে—জবরদস্তি করিতে গেলে সব মাটি হইয়া যাইবে।”

এই বলিয়া অক্ষয় চা খাইয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়ের ধৈর্য্যের অভাব ছিল না। যখন সমস্ত লক্ষণ তাহার প্রতিকূলে, তখনো সে লাগিয়া থাকিতে জানে। তাহার ভাবেরও কোন বিকার হয় না। অভিমান করিয়া সে মুখ গম্ভীর করে না বা দূরে চলিয়া যায় না। অনাদর-স্ববমাননার সে অবিচলিত থাকে। লোকটা টাঁকসই। তাহার প্রতি যাহার ব্যবহার যেমনি হোক, সে টাঁকিয়া থাকে।

অক্ষয় চলিয়া গেলে আবার অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। আজ তাহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ—তাহার চোখের নীচে কালি পড়িয়া গেছে। ঘরে ঢুকিয়া সে চোখ নীচু করিল, যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে জানিত, যোগেন্দ্র তাহার ও রমেশের উপর রাগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিচার করিতেছে। এইজন্য যোগেন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি-চোখোচোখি হওয়া তাহার পক্ষে দুঃকর হইয়া উঠিয়াছে।

ভালবাসায় যদিও হেমনলিনীর বিশ্বাসকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল, তবু যুক্তিকে একেবারেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যোগেন্দ্রের সম্মুখে হেমনলিনী কাল আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে শয়নঘরের মধ্যে একলা সেই বল সম্পূর্ণ থাকে না। বস্তুতই প্রথম হইতে রমেশের ব্যবহারের কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

সন্দেহের কারণগুলিকে হেমনলিনী যত প্রাণপণ বলে তাহার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে দেয় না—তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ততই সবলে আঘাত করিতে থাকে। সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে ছুই হাতে চাপিয়া-ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিক্রমে তেমনি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁক-
ড়িয়া রাখিল। কিন্তু হায়, জোর কি সকল-
সময় সমান থাকে !

হেমনলিনীর পাশের ঘরেই রাত্রে অন্নদা-
বাবু শুইয়াছিলেন। হেম যে বিছানায় এপাশ-
ওপাশ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে
পারিতেছিলেন। একএকবার তাহার ঘরে
গিয়া তাহাকে বলিতেছিলেন, “মা, তোমার
ঘুম হইতেছে না?” হেমনলিনী উত্তর
দিতেছিল, “বাবা, তুমি কেন জাগিয়া আছ ?
আমার ঘুম আসিতেছে—আমি এখনি
ঘুমাইয়া পড়িব।”

পরের দিন ভোরে উঠিয়া হেমনলিনী
ছাদের উপর বেড়াইতেছিল। রমেশের
বাসার একটি দরজা, একটি জান্নাও খোলা
নাই। হেমনলিনীর মনে হইতে লাগিল,
তাহার জীবন হইতেও রমেশ যেন এমনি-
ভাবেই রুদ্ধ হইয়া গেছে। পরস্পরের সঙ্-
কের কোন পথই যেন কোথাও খোলা নাই।
তবে এখন হইতে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া
তাহার অন্তরের মধ্যে আকাশের আলোক
আসিবে, দক্ষিণের বাতাস প্রবেশ করিবে ?
রমেশ—রমেশ !—কোথায় রমেশ ! যে এতই
কাঁছে ছিল, সে কোথায় গেল ! যে অনায়াসে

এই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঐ ছাদের উপরে
আসিয়া দাঁড়াইতে পারে—বাহার আগমনে
আনন্দিত হৃদয়ের মত ঐ বাড়ীর সমস্ত
জান্না-কবাট উন্মুক্ত হইয়া গৃহের মধ্যে শুভ-
প্রভাতকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে পারে—
সে সমস্ত বাধা ছুইহাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া
কেন এখনি আসিতেছে না ! তাহার জন্ত
সমস্ত প্রস্তুত—তাহার জন্ত সবাই অপেক্ষা
করিতেছে—তাহারই জন্ত হেমনলিনী ভিক্-
কের উর্দ্ধ প্রসারিত ব্যাকুলবাহর মত আপ-
নার সমস্ত হৃদয়কে আজ এই অরুণরাগরক্ত
অনন্ত আকাশের মাঝখানে উত্তোলিত করিয়া
ধরিয়াছে।—এস, এস, এস ! সমস্ত কুয়াসা
কাটাইয়া, সমস্ত মেঘ ঠেলিয়া, সমস্ত অন্ধকার
পার হইয়া শিশিরাশ্রুধৌত প্রভাতের
আলোকটির মত এস—এখনি একমুহূর্তে
হেমনলিনীর সমস্ত উৎসুক জীবনকে, উন্মুখ
জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেল !

সূর্য্য ক্রমে পূর্ব্বদিকের সৌধশিখরমালার
উপরে উঠিয়া পড়িল। হেমনলিনীর কাছে
আজিকার এই নূতন-অভ্যাদিত দিনটি এমনি
শুক-শুভ, এমনি আশাহীন-আনন্দহীন তৈকিল
যে, সে সেই ছাদের এক কোণে দসিয়া-
পড়িয়া ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।
আজ সমস্তদিন কেহই আসিবে না, চায়ের
সময় কাহাকেও আশা করিবার নাই, পাশের
বাড়ীতে কেহ একজন আছে, এই কল্পনা
করিবার সুখটুকু পর্য্যন্ত ঘুচিয়া গেছে !

“হেম ! হেম !”

হেমনলিনী ভাড়াভাড়ি উঠিয়া চোখ
মুছিয়া-ফেলিয়া সাড়া দিল—“কি বাবা !”

অন্নদাবাবু ছাদে উঠিয়া-আসিয়া হেমনলি-

নীর পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন—“আমার আঙ্গ উঠিতে দেয়ি হইয়া গেছে ।”

অন্নদাবাবু উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই—ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিলেন। আলো চোখে লাগিতেই উঠিয়া-পড়িয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া হেমনলিনীর খবর লইতে গেলেন। দেখিলেন, ঘরে কেহ নাই। সকালে তাহাকে একলা বেড়াইতে দেখিয়া তাহার বৃকের মধ্যে আঘাত লাগিল। কহিলেন—“চল মা, চা খাইবে চল ।”

চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া চা খাইবার ইচ্ছা হেমনলিনীর ছিল না। কিন্তু সে জানিত, কোনরূপ নিয়মের অন্তর্গত তাহার বাপকে পীড়া দেয়। তা ছাড়া, প্রত্যহ সে নিজের হাতে তাহার বাপের পেয়ালার চা ঢালিয়া দেয়, এই সেবাটুকু হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিল না।

নাচে গিয়া ঘরে পৌছিবার পূর্বে যখন সে বাহির হঠতে শুনিল, যোগেন্দ্র কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে—তখন তাহার বৃক কাঁপিয়া উঠিল হঠাৎ মনে হইল, বৃক রমেশ আসিয়াছে। এত সকালে আর কে আসিবে ?

কম্পিতপদে ঘরে ঢুকিয়া যেই দেখিল অক্ষয়, অমনি সে আর কিছুতেই আশ্ব-সংবরণ করিতে পারিল না—তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দ্বিতীয়বার অন্নদাবাবু যখন তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন, তখন সে তাহার পিতার চোকির পাশে বঁসিয়া পাড়াইয়া নত-মুখে তাহার চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র হেমনলিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। হেম যে রমেশের জন্ত এমন করিয়া শোক অনুভব করিবে, ইহা তাহার অসম্ভব বোধ হইতেছিল। তাহার পরে যখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাহার এই শোকের সঙ্গী হইয়াছেন এবং সেও যেন সংসারের আর সকলের নিকট হইতে অন্নদাবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার অধৈর্য্য আরো বাড়িয়া উঠিল। “আমরা যেন সবাই অশ্রায়কারী আমরা যে স্নেহের খাতিরেই কর্তব্যপালনে চেষ্টা করিতেছি, আমরাই যে যথার্থভাবে উহার মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত—তাহার জন্ত লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা দূরে থাক, মনে মনে আমাদের দোষী করিতেছে। বাবার ত কোন বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান নাই! এখন সাঙ্গনা দিবার সময় নহে—এখন আঘাত দিবারই সময়। তাহা না করিয়া তিনি ক্রমাগতই অপ্রিয়-সত্যকে উহার নিকট হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিতেছেন।”

যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, “জান বাবা, কি হইয়াছে।”

অন্নদাবাবু জন্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “না—কি হইয়াছে ?”

যোগেন্দ্র। রমেশ কাল তাহার স্ত্রীকে লইয়া গোয়ালন্দ-মেলে দেশে যাইতেছিল—অক্ষয়কে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া দৈর্ঘ্য না গিয়া আবার সে কলিকাতায় পালাইয়া আসিয়াছে।

হেমনলিনীর হাত কাঁপিয়া উঠিল—চা ঢালিতে চা পড়িয়া গেল। সে চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল—
“পালাইবার কি দরকার ছিল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। অন্ধের কাছে ত পূর্বেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। ‘একে ত তাহার পূর্বের ব্যবহার যথেষ্ট হেয়—তাহার পরে এই ভীকৃত্য, এই চোরের মত ক্রমাগত পালাইয়া-বেড়ানো আমার কাছে অত্যন্ত অযত্ন মনে হয়। জানি না, হেম কি মনে করে—কিন্তু এইরূপ পলায়নেই তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে।”

হেমনলিনী কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কহিল, “দাদা, আমি প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখি না। তিনি ভাল কি মন্দ, তাহা ঈশ্বর জানেন—এখন তাহা আমার সন্ধান করিবার সময় নয়। তোমরা তাহার বিচার করিতে চাও কর—আমি তাহার বিচারক নই—তিনি যদি দোষ করিয়া থাকেন, তবে হুঃখভোগ করিতে পারি, কিন্তু দণ্ড দিতে পারি না—তবে আমার কাছে কেন বারবার তোমাদের গুপ্ত-চরের প্রমাণ আনিয়া উপস্থিত করিতেছ?”

যোগেন্দ্র। তোমার সঙ্গে যাহার বিবাহের সন্ধ হইতেছে, সে কি আমাদের নিঃসম্পর্ক?

হেমনলিনী। বিবাহের কথা কে বলিতেছে? তোমরা ভাড়িয়া দিতে চাও, ভাড়িয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙাইবার জন্ত নিখ্যা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের কোন ক্ষতি না করিয়া আমি যদি মনে মনে কোথাও স্নেহ পাই,—নির্ভর পাই—তোমাদের তাহাতে কি?

বলিতে বলিতে হেমনলিনী অরব্ধ হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—“চল হেম, আমরা উপরে যাই!”

২৫

ঈমার ছাড়িয়া দিল। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কেহই ছিল না। রমেশ একটি কামরা বাড়িয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া দিল। সকালবেলায় দুধ খাইয়া সেই কামরার দরজা খুলিয়া কমলা নদী ও নদীতীর দেখিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “জান কমলা, আমরা কোথায় বাইতেছি?”

কমলা কহিল, “দেশে বাইতেছি।”

রমেশ। দেশ ত তোমার ভাল লাগে না—আমরা দেশে বাইব না।

কমলা। আমার জন্তে তুমি দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছ?

রমেশ। হাঁ, তোমারই জন্তে।

কমলা মুখ ভার করিয়া কহিল—“কেন তা করিলে? আমি একদিন কথায়-কথায় কি বলিয়াছিলাম, সেটা বুঝি এমম করিয়া মনে লইতে আছে? তুমি কিন্তু ভারি অশ্রদ্ধেই রাগ কর!”

রমেশ হাসিয়া কহিল—“আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। দেশে বাইবার ইচ্ছা আমারও নাই।”

কমলা তখন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তবে আমরা কোথায় বাইতেছি?”

রমেশ। পশ্চিমে।

“পশ্চিমে” শুনিয়া কমলার চক্ষু বিম্বা-

নিত হইয়া উঠিল। পশ্চিমে বন লোক চির-দিন ধরের মতো কাটাইয়াছে, এক “পশ্চিম” বলিতে তাহার কাছে কতখানি বোঝায়। পশ্চিমে তীর্থ, পশ্চিমে স্বাস্থ্য, পশ্চিমে নব নব দেশ, নব নব দৃশ্য, কত রাজা ও সম্রাটের পুরাতন কীর্তি, কত কারুখচিত দেবালয়, কত প্রাচীন কাহিনী, কত বীরত্বের ইতিহাস।

কমলা পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—
“পশ্চিমে আমরা কোথায় বাইতেছি?”

রমেশ কহিল, “কিছুই ঠিক নাই। মূজের, পাটনা, দানাপুর, বস্তার, গাজিপুর, কাশি, বেধানে হউক, এক জায়গার গিয়া উঠা যাইবে।”

এই সকল কতক-জানা এবং না-জানা সহরের নাম শুনিয়া কমলার কল্পনাবৃত্তি আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে হাত-তালি দিয়া কহিল, “ভারি মজা হইবে।”

রমেশ কহিল—“মজা ত পরে হইবে, কিন্তু এ কয়দিন খাওয়াদাওয়ার কি করা যাইবে? তুমি খালাসিদের হাতের রান্না খাইতে পারিবে?”

কমলা স্থগার মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—
“নাগো! সে আমি পারিব না।”

রমেশ। তাহা হইলে কি উপায় করিবে?

কমলা। কেন, আমি নিজে রান্না করিব।

রমেশ। তুমি রান্নািতে পার?

কমলা হাসিয়া-উঠিয়া কহিল—“তুমি আমাকে কি যে ভাব, আমি না। রান্নািতে পারি না ত কি? আমি কি কচিথুক? আমার বাড়ীতে আমি ত বরাবর রান্না করিয়া আসিয়াছি।”

রমেশ তৎক্ষণাৎ অহুতাশ প্রকাশ করিয়া কহিল, “তাই শু, তোমাকে এই প্রস্তুত করা ঠিক সম্ভব হয় নাই। তাহা হইলে এখন হইতে রান্নািয়ার জোগাড় করা যাক—কি বল?”

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল এবং সন্ধান করিয়া এক লোহার উত্থন সংগ্রহ করিল। শুধু তাই নয়, কাশি পৌছাইয়া দিবার পথ ও বেতনের প্রলোভনে উমেশ বলিয়া এক কারুস্থবালককে জলভোলা, বাসনমাঝা প্রভৃতি কাজের জন্ত নিযুক্ত করিল।

রমেশ কহিল—“কমলা, আজ কি রান্না হইবে?”

কমলা কহিল—“তোমার ত ভারি জোগাড় আছে! এক ডাল আর চাল—আজ খিচুড়ি হইবে।”

রমেশ খালাসিদের নিকট হইতে কমলার নির্দেশমত মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

রমেশের অনভিজ্ঞতার কমলা হাসিয়া উঠিল, কহিল—“শুধু মসলা লইয়া কি করিব? শিল-নোড়া নহিলে বাটব কি করিয়া? তুমি ত বেশ।”

বালিকার এই অবজ্ঞা বহন করিয়া রমেশ শিল-নোড়ার সন্ধানে ছুটিল। শিল-নোড়া না পাইয়া খালাসিদের কাছ হইতে এক লোহার হামানদিত্তা ধার করিয়া আনিয়া—

হামানদিত্তার মসলা-কোটা কমলার অভ্যাগ ছিল না। অগত্যা তাহাই লইয়া বসিতে হইল। রমেশ কহিল, “মসলা না হয় আর কাহাকেও দিয়া লিখাইয়া আনিতেছি।”

কমলার তাহা মনঃপুষ্ট হইল না।

নিজেই উৎসাহসহকারে কাজ আরম্ভ করিল। এই অনভ্যস্ত প্রণালীর অসুবিধাতে তাহার কোতুকবোধ হইল। মসলা লাফাইয়া-উঠিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে, আর সে হাসি রাখিতে পারে না। তাহার এই হাসি দেখিয়া রমেশেরও হাসি পায়।

এইরূপে মসলাকোটার অধ্যায় শেষ করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া একটা দরমা-বেয়া জায়গায় কমলা রান্না চড়াইয়া দিল। কলিকাতা হইতে একটা হাঁড়িতে করিয়া সন্দেশ আনা হইয়াছিল, সেই হাঁড়িতেই কাজ চালাইয়া লইতে হইল।

রান্না চড়াইয়া-দিয়া কমলা রমেশকে কহিল, “তুমি যাও, শীঘ্র স্নান করিয়া লও—আমার রান্না হইতে বেশি দেরি হইবে না।”

রান্নাও হইল, রমেশও স্নান করিয়া আসিল। এখন প্রসন্ন উঠিল, খাল ত নাই, কিসে খাওয়া যায়?

রমেশ অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, “খালাসি-দের কাছ হইতে সানুকি ধার করিয়া আনা যাইতে পারে।”

কমলা কহিল—“ছি!”

রমেশ মুহূর্ত্তে জানাইল, একরূপ অনাচার পূর্বেও তাহার দ্বারা অসুস্থিত হইয়াছে।

কমলা কহিল—“পূর্বে যা হইয়াছে, তা হইয়াছে, এখন হইতে হইবে না—আমি ও দেখিতে পারিব না।”

এই বলিয়া সে সেই সন্দেশের মুখে যে সরি ছিল, তাহাই ভাল করিয়া ধুইয়া-আনিয়া উপস্থিত করিল। কহিল—“আজকের মত তুমি ইহাতেই খাও, পরে দেখা যাইবে।”

জল দিয়া ধুইয়া আহারস্থান প্রস্তুত

হইলে রমেশ শুদ্ধভাবে খাইতে বসিয়া গেল। দুই-এক গ্রাস মুখে তুলিয়া কহিল—“বাঃ, চমৎকার হইয়াছে!”

কমলা লজ্জিত হইয়া কহিল—“যাও, ঠাট্টা করিতে হইবে না।”

রমেশ কহিল—“ঠাট্টা নয়, তাহা এখন দেখিতে পাইবে।” বলিয়া পাতে রান্না দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ করিয়া আবার চাহিল। কমলা এবারে অনেক বেশি করিয়া দিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল—“ও কি করিতেছ? তোমার নিজের জন্ত কিছু আছে ত?”

“ঢের আছে—সেজ্ঞে তোমার ভাবিতে হইবে না।”

রমেশের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারে কমলা তারি খুসি হইল। রমেশ কহিল—“তুমি কিসে খাইবে?”

কমলা কহিল—“কেন, ঐ সরিতেই হইবে!”

রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, “না, সে হইতেই পারে না।”

কমলা আশ্চর্য হইয়া কহিল—“কেন, হইবে না কেন?”

রমেশ কহিল—“না না, সে কি হয়!”

কমলা কহিল—“খুব হইবে—আমি সরি ঠিক করিয়া লইতেছি। উমেশ, তুমি কিসে খাইবি?”

উমেশ কহিল, “মাঠাকরুণ, নীচে ময়রা খাবার বেচিতেছে, তাহার কাছ হইতে শালপাতা চাহিয়া আনিতেছি।”

রমেশ কহিল, “তুমি যদি ঐ সরিতেই খাইবে ত আমাকে দাও, আমি ভাল করিয়া ধুইয়া আনিতেছি।”

কমলা কেবল সংক্ষেপে কহিল, “পাগল হইয়াছ !”—ক্ষণকাল পরে সে বলিয়া উঠিল, “কিন্তু পান তৈরি করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে পান আনা হইয়া দাও নাই।”

রমেশ কহিল, “নীচে পানওয়ালা পান বেচিতেছে।”

এমনি করিয়া অতি সহজেই ঘরকন্না সুরু হইল। রমেশ মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, ‘দাম্পত্যের ভাবকে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়? গৃহিণীর পদ অধিকার করিয়া লইবার জন্য কমলা বাহিরের কোন সহায়তা বা শিক্ষার প্রত্যাশা রাখে না। সে যতদিন তাহার মামার বাড়ীতে ছিল, রাখিয়াছে-বাড়িয়াছে, ছেলে মানুষ করিয়াছে, ঘরের কাজ

চালাইয়াছে।’ তাহার নৈপুণ্য, তৎপরতা ও কর্মের আনন্দ দেখিয়া রমেশের ভারি সুন্দর লাগিল—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সে ভাবিতে লাগিল, ‘ভবিষ্যতে ইহাকে লইয়া কি ভাবে চলা যাইবে? ইহাকে কেমন করিয়া কাছে রাখিব, অথচ দূরে রাখিয়া দিব? তাহাদের দুইজনের মাঝখানে গভীর রেখাটা কোন্-খানে টানা উচিত? তাহাদের উভয়ের মধ্যে যদি হেমনলিনী থাকিত, তাহা হইলে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিত! কিন্তু সে আশা যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে একলা কমলাকে লইয়া সমস্ত সমস্তার মীমাংসা যে কি করিয়া হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।’ রমেশ স্থির করিল, আসল কথাটা কমলাকে খুলিয়া বলাই উচিত, ইহার পরে আর চাপিয়া-রাখা চলে না।

ক্রমশঃ ।

মন্দিরের কথা ।

উড়িয়ায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা দশতান্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মুক বলিয়া, জ্বরে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক-রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র;

হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের হৃদয় এখানে কি কথা গাথা-
য়াছে? ভক্তি কি রহস্য প্রকাশ করিয়াছে?
মানুষ অনন্তের মধ্য হইতে আপন অন্তঃকরণে
এমন কি বাণী পাইয়াছিল, বাহার প্রকাশের
প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ
প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে?

এই যে শতাব্দিক দেবালয়—বাহার

অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, বাহার খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুপ্তিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাত যুগের ভাষাভারে আক্রান্ত। যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নবজীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্রবৎসর পরে নিশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা কোনো একটি প্রাচীন নবযুগের মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ়-নিহিত নিস্তক চিন্তাশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপুলতা, তাহার অপূর্ব প্রত্যেক প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ড-খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে-পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—সুতরাং মন যে কি বুঝিল, কি শুনিল, কি পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সমর্থ পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে-ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্বক্ষেত্র ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাও বলিতে পারি না। মানুষের ছোটবড় ভালমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে নিবিড়-ভাবে বেষ্টিত করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্গনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইম্রাজসমাজের প্রতিদিনের ছবি কালিতেছে :—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগ্‌কাট্ট ইঁকাইতেছে, কেহ হুইষ্ট খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেঁধে রাখিয়া পক্ষা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বুঝি-বা বপ্ত দেখিতেছি—কারণ, গির্জা সংসারকে সর্বতোভাবে মুছিয়া-ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে

—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্যসম্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিশ্বয়ের আঘাত লাগে । স্বভাবত হয় ত লাগিত না, কিন্তু আশ্চর্য ইংরাজী-শিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি । ‘সর্বদাই সন্তুর্ণণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে ; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র স্রুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে ।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয় । গতি-শীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অশ্রুটতার মধ্যে দেবমূর্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে ।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না । মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় বাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল ।

সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন । তিনি জন্মমৃত্যু, সুখঃখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান । এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির । এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া

রচিত হইয়া উঠিতেছে । ইহা কোনকালে নুতন নহে, কোনকালে পুরাতন হয় না । ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরি-বর্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন ।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়া-ছিলেন । তিনি জাতি মানেন নাই, যাগ-যজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন । তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন । দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন ।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উজ্জমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন । মানুষ যে দীন দৈবাবধীন হীনপদাথ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন ।

এমন-সময় হিন্দুর চিন্তা জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে ; কারণ, মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, বাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালাইয়া করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি ।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন । বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল । মানবের

মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমূর্ত্তের স্তূপস্থলের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দুধর্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজে-কর্ম্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোট-বড় ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

“বৃক্ষ ইব স্তম্বো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ”—

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের স্তম্ব হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তম্ব হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আগাদের চোখের উপর দিয়া কেবলি আবর্ত্তিত হইতেছে, স্তূপস্থল উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকে-ছায়ায় সংসারভর্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র-সমস্ত চঞ্চল,—ইহারই অন্তরে নিরলঙ্কার নিভৃত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন, —এই পরিবর্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গমর্ত্তা, বন্ধন

ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য—ইহাই প্রভুর ভাষায় ধ্বনিত।

উপনিষদ এইরূপ কথায় একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

“হা হুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানঃ বৃক্ষং পরিববজাতে ।
তয়ো'রজঃ পিঙ্গলং স্বাধত্যনয়ন্নজ্যোতিচাকর্শীতি ॥”

হুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক-বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাহ পিঙ্গল আহা করিতেছে, অপরটি অন-শনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমান্বার এরূপ সায়ুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনান্বাসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে! জীবের সাহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্ত তাহাকে উপমার দ্বারা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।—অরণ্যচারী কবি বনের ছুটি সুন্দর ডানাওয়াল পাখীর মত করিয়া সমীমকে ও অসীমকে গায়ে-গায়ে নিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তাই কোনো একাঙ উপমার ঘট্টা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোট পাখী যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্যপারচ্ছ্যের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্যের যে নিশ্চিত সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটিই পাখী, ডানা-ডানা সংযুক্ত

হইয়া আছে—ইহার সখা, ইহার। একবৃক্ষেই পরিষ্কৃত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে—তাহা দেবালয় হইতে মানবহৃদয়ে মুছিয়া ফেলে নাই—তাহা দুই পাখীকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আরো যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবির মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে আমিভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আশ্রিতের মধ্যে “শাস্ত্রং শিবমদৈত্যং” স্তব্ধভাবে নিয়ত আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লিখিত হয় নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ

লইয়া, তাহার তুচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনাদের মাঝখানে অন্তরতরুরূপে, স্তব্ধরূপে, সাক্ষিরূপে ভগবানকে প্রকাশ করিতেছে,—নির্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দবালায় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্রে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটবড় সমস্ত মানবকে আপন প্রস্তরপটে এক করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরে দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে আছে—তিনি কে। এই ভূমি-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্রমানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অগ্র জাতি, এক কালের সহিত অগ্র কাল, এক ইতিহাসের সহিত অগ্র ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে!

শ্রমণ ।

“ধর্মঃ শরণং গচ্ছামি ।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ।

সংসং শরণং গচ্ছামি ।”

এক সময়ে এই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রে ভারতবর্ষে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে তাহারই নাম—বৌদ্ধ-

যুগ। তাহার কথা কালে সমগ্র সভ্যজগতের সুধীমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে বৌদ্ধমত নিতান্ত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব করিবার পর হইতে, এই পুরাতন মত অভিনব বিক্রমে নানা দিশেদিশে প্রচারিত

হইবার স্বরূপাত হয়। তৎপূর্বে ষাঁহার।
বিবিধ তপঃক্লেশ সহ করিয়া “বুদ্ধ”লাভে
কৃতার্থমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার। স্বমত-
প্রচারে ব্যগ্র ছিলেন না।* তাঁহার। কোন্
পুরাকালের সাধক, তাহা নির্ণয় করিবার
উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের কথা বৌদ্ধ-
সাহিত্যেও একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই।†

শাক্যসিংহের আবির্ভাবকাল নানা
প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার সম-
কালবর্তী বিবিধ বিখ্যাত রাজত্ববর্গেরও
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া শিষ্টাচারে। তখনও ভুবন-
বিখ্যাত মগধসাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপ ভারত-
বর্ষের বিবিধ বিভাগে ব্যাপ্ত হয় নাই;—
নানা প্রদেশ, নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল।
শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিলে, তাঁহার মত্রে
দীক্ষিত হইয়া যে সকল বৌদ্ধসন্ন্যাসী স্বদেশে-
বিদেশে বৌদ্ধধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়া
ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তারের সহায়তা
করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সাধারণত “শ্রমণ”
নামে সুপরিচিত। :

শ্রমণগণ নিরত পরহিতকামী, আত্মত্যাগী,
সংপথাবলম্বী সন্ন্যাসী বলিয়া এসিয়াখণ্ডের
সকল দেশেই সাধুপুরুষোচিত চরিত্রগৌরবে
লোকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।
তাঁহার। হিংসাঘেযবিনিমুক্ত স্বধর্ম্মাহরত
ভক্তের কাতরকণ্ঠে জগতের জ্ঞানাক্র নর-
নারীকে নবধর্ম্মের সুসমাচার প্রদান করিবার
জন্ত তিকাপাত্রহস্তে প্রাসাদ ও কুটীরদ্বারে

উপনীত হইবামাত্র, লোকসমাজ মন্ত্রমুগ্ধের
জায় তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া চরিত্র-
সংশোধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের
কলাপে কত অসভ্য মানবসমাজ জ্ঞান ও ধর্ম্মে
সমুন্নত হইয়াছিল; কত মরু-গিরি-মহারণ্য
জনকোলাহলময় বিচিত্র গ্রামনগরে অলঙ্কৃত
হইয়া সভ্যতাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল;
কত অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র দ্বীপ, কত অপরিচিত
বৃহৎ বিদেশ “ধর্ম্মসংঘ ও বুদ্ধ” মত্রে নবজীবন
লাভ করিয়া অবনত শিষ্যের জায় ভক্তি-
বিস্ময়ে ভারতাহরত হইয়া উঠিয়াছিল,—
তাহার কথা এখন নিতান্ত স্বপ্নকাহিনী
বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তথাপি
শ্রাম-সিংহল, ব্রহ্ম-তাতার, চীন-জাপান, তোট-
তিকতের বৌদ্ধমতরক্ষিত বিবিধ গ্রন্থে এখনও
তাঁহার ক্ষীণচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।
শ্রমণগণের ধর্ম্মপ্রচার দিগ্বিজয় বলিয়া কবি-
কুলের অমরকাব্যে কীর্তিত না হইলেও,
পৃথিবী এরূপ প্রেমের দিগ্বিজয় অন্নই কীর্তন
করিতে পারে! এমন নিঃস্বার্থ পরহিত-
কামনা, এমন অকৃত্রিম বিশ্বপ্রেমোন্মত্ত
মানবসেবা, এমন সরল-সুন্দর আত্মত্যাগের
মহিমা সভ্যসমাজের কাব্যে, ইতিহাসে বা
উপন্যাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।†

শ্রমণশব্দ উত্তরকালে বিশ্ববিখ্যাত হইলেও,
তাহা ভগবান্ শাক্যসিংহের আবিষ্কৃত
কোন নূতন শব্দ বলিয়া বোধ হয় না।‡
“শ্রমু তপসি খেদে চ”—এই চিরপুরাতন

* শাক্যসিংহের পূর্বে ষাঁহার। বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তন্মধ্যে বিপত্তী, শিখী, বিষকু, ককুৎসল, কনকমুরি ও কাশ-
পের নাম বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত।

† ললিতবিস্তরঃ।

‡ সন্ন্যাসিধর্ম্মই অশ্রমপদবাচ্য ছিলেন, ললিতবিস্তরে তাঁহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

ধাতু হইতে শ্রমণশব্দের উৎপত্তি।* ইহা কত পুরাতন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই যে এই শব্দ ভারতীয় পুরাতন সাহিত্যে সুপরিচিত ছিল, তাহার নানা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধগণ উপাসনা, উপাসক, ভিক্ষু প্রভৃতি পুরাতন শব্দের ছায় শ্রমণশব্দও প্রচলিত সাহিত্যে ইহাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ শ্রমণ-উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায় সুপরিচিত হইবার পর, এই পুরাতন শব্দ সাধারণত বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিজ্ঞাপক সঙ্গীণ অথৈ ব্যবহৃত হওয়ায়, পুরাতন অথ কালে অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমণশব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাসের সমাক্ষ আলোচনা না করিয়া, কোন কোন ইউরোপীয় অধ্যাপক ইহাকে বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিজ্ঞাপক অভিনব সংজ্ঞামাত্র মনে করিয়া থাকেন। পুরাতন সংস্কৃত-সাহিত্যের কোনও গ্রন্থে “শ্রমণ”শব্দের সন্ধান পাইবামাত্র এই শ্রেণীর অধ্যাপকগণ তাহাকে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ বলিয়া অবলোলাক্রমে অভিমত ব্যক্ত করেন! তাহাদের বিশেষ অপরাধ নাই। আমাদের দেশের উত্তরকালের অনেক টাকাকারও “শ্রমণ”শব্দে প্রথমে বৌদ্ধসন্ন্যাসীকেই সূচিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখনও পুরাতন অথ একেবারে বিলুপ্ত না হওয়ায়, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। রামানুজকৃত রামায়ণের প্রসিদ্ধ টীকায় ইহার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

“ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবস্ত্রং ভুঞ্জতে।

তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে ॥” ২।১৪।১২॥

অযোধ্যাকাণ্ডের এই সরল শ্লোকের “শ্রমণ”শব্দের ব্যাখ্যায় রামানুজ, প্রথমে “শ্রমণা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনঃ” লিখিয়া, পরে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—“যদ্বা শ্রমণপদং সন্ন্যাস্যপলক্ষণম্।” এক্ষণ ব্যাখ্যা দর্শন করিয়া কেহ কেহ এই শ্লোক অবলম্বনে রামায়ণকে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বগা বাহুল্য, এই শ্লোকের “শ্রমণ”শব্দ বৌদ্ধসন্ন্যাসিবাচক বলিয়া গৃহীত হইলে, শ্লোকাথ নিতান্ত অসঙ্গত হয়। শ্রমণগণের পক্ষে বেদিকধম্মানুরক্ত দশরথ রাজার অশ্ব-মেধযজ্ঞে আহূত বা অনাহূত অতিথিরূপে ভোজনব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব। জাবলি যে বজ্রের প্রধান অঙ্গ, তাহাতে প্রতিদিন প্রকাশ্যরূপে শ্রমণগণের কদাচ ভোজনাত্ম সমাগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রামায়ণের নানা শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামানুজ আধুনিক যুগের সংস্কার নইয়া প্রাচীন সাহিত্যের টীকারচনা করিতে গিয়া নানা প্রকার অসঙ্গতির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণোক্ত “শ্রমণ”শব্দ যে বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিজ্ঞাপক নূতন শব্দ নহে, রামায়ণেই তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

“যদ্বা শ্রমণপদং সন্ন্যাস্যপলক্ষণম্।”

ইহাতেই বুঝা যায়, সন্ন্যাসিমাত্রের পক্ষেই “শ্রমণ”শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারা রামানুজের সময়েও অপরিজ্ঞাত ছিল না। সন্ন্যাসীর ছায়

* ঐহট্টবরাচর্য্যকৃত “ভাষাবৃত্তপরিচয়ঃ”।

সন্ন্যাসিনীও নিভাস্ত পুরাকাল হইতে ভারত-বর্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতে । সন্ন্যাসিগণ শ্রমণ এবং সন্ন্যাসিনীগণ শ্রমণী বা শ্রমণী নামে কথিত হইতেন ।* আরণ্যকাণ্ডের চতুঃ-সপ্ততিতম সর্গে এইরূপ একটি শ্রমণীর বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—তাহার নাম শবরী ।

রামলক্ষ্মণ সীতাশোকে সন্তপ্তহৃদয়ে নানাস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধের নিকট উপনীত হইয়া সীতা-উদ্ধারের সন্ধান প্রাপ্ত হন । কবন্ধ সন্ধান প্রদানকালে রামলক্ষ্মণকে পম্পাতীরে গমন করিতে উপদেশদান করেন । তত্পক্ষে কবন্ধ বলিয়াছিলেন—“পম্পাতীরে মতঙ্গমুনির শিষ্যগণের আশ্রম বর্তমান আছে ; শিষ্যগণ স্বর্গারোহণ করায়, তাঁহাদের আশ্রমপরিচারণী শবরী নামী এক শ্রমণী এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন ।” যথা—

“তেষাং গতানামন্যাপি দৃষ্টতে পরিচারণী ।

শ্রমণী শবরী নাম কাঞ্চনস্থ চিরজীবিনী ॥”৩৭৭২৬১

এই শ্লোকের “শ্রমণী”শব্দের ব্যাখ্যায় রাশামুজ অল্প কোনরূপে ইতস্তত না করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—“শ্রমণী তাপসী ।” রাম-লক্ষ্মণ সেই বুদ্ধা তাপসীর আশ্রমে উপনীত হইয়া আতিথ্যদ্বীকার করিলে, তাপসী আশ্রমোচিত বিবিধ সংস্কারে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে হস্তাশ্রমে আত্মাহুতি প্রদান করেন ।

“ইত্যেবমুক্তা জটিলী চীরকৃষ্ণাজিনাধরা ।

অহুজাতা তু রামেণ হস্তাস্তানং হতাসন ॥

* “শ্রমণ”শব্দের ত্রীলিঙ্গে “শ্রমণা”শব্দ হুপরিচিত ; “শ্রমণী”শব্দ সেরূপ হুপরিচিত নহে । রামায়ণের আদি-কাণ্ডের ৭৭ সংখ্যক শ্লোকে “শ্রমণী”শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে । তাহার টীকায় রাশামুজ লিখিয়াছেন—“শ্রমণী-মিত্যজ কণ্ঠরি পুট্ ; তপসা শ্রাম্যতীত্যর্থঃ” ; হস্তরাম শ্রমণাশব্দের-স্তায় শ্রমণীশব্দ ও সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সম্মত ।

† বৌদ্ধশ্রমণী কাশ্যপাধারা মুণ্ডিতকেশা সন্ন্যাসিনী ; জটিলী চীরকৃষ্ণাজিনাধরা তপস্বিনী বলিয়া বর্ণিত হইতে পারেন না ।

অলংপাবকসঙ্কশা স্বর্গমেব জগাম হ ।

দিব্যাত্তরণসংযুক্তা দিব্যমালায়ুধলেনা ॥”৩৭৭৪৩২-৩৩

এই বর্ণনা অনুসারে “জটিলী চীরকৃষ্ণা-জিনাধরা” শবরীর যথাবিধি আত্মাহুতিপ্রদানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীর এরূপ বেশভূষা বা আচরণ কদাচ দৃষ্ট হইতে পারে না ।† শবরীর পূজনীয় গুরুকুল যেখানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং যে “প্রত্যাকৃষ্টলী”নামী বেদিতে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন, শবরী তৎসমস্ত রামলক্ষ্মণকে দেখাইয়া গুরুকুলের বৈদিক-ধর্ম্মাঙ্গুলনের পরিচয় দিয়াছিলেন ।

উত্তরকালে জ্রীলোকের পক্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্ত ক্রমে বিলুপ্ত হইলে, বৈদিকযুগের একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি ছিল হইয়া যায় । বেদার্থজ্ঞানবতী না হইলে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না ; শবরী জ্রীলোক হইয়া কিরূপে সে জ্ঞানের অধিকারিণী হইতে পারেন, —উত্তরকালের টীকাকারগণের নিকট তাহা একটি কূট প্রশ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল । শবরী “বিজ্ঞানে অবহিঙ্কতা” বলিয়া কথিতা ছিলেন ।—

“রামবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাম্ নিত্যমবহিঙ্কতাম্ ।”

ইহার ব্যাখ্যায় তীর্থনামধেয় প্রাচীন টীকাকার লিখিয়া গিয়াছেন,—“বিজ্ঞানে আগতানাগতজ্ঞানে অবহিঙ্কতাং তাদৃশ-জ্ঞানবতীম্ ।” এই ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, শবরী তত্তজ্ঞানবতী ছিলেন । কতক-নামধেয় টীকাকার, জ্রীলোকের পক্ষে

তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার থাকা বিনা প্রমাণে ব্যাখ্যা না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন ;— “বিজ্ঞানে ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং মৈত্র্যাজ্ঞেয়াদিবৎ অবহিক্তাং তত্রাপ্যধিকারিণীমিতার্থঃ।” মৈত্রী, আজ্ঞেয়ী প্রভৃতি ভারতরমণীগণ যেমন পুরাকালে রমণী হইয়াও ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, শবরীও তদ্রূপ গুরুকুলকর্তৃক সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তীর্থ ও কতক নাম-ধেয় টীকাকারগণের এই মূলভ্রুগত ব্যাখ্যা উত্তরকালে গৃহীত হয় নাই। ইহা “জ্ঞী-শুদ্ধিজ্ঞানং জ্ঞানী ন স্রষ্টাগোচরা” এষ্ট শাসনবাক্যের নিত্যস্ত বিরোধী বলিয়া, উত্তর-কালের টীকাকার রামানুজ রামায়ণের এই শ্লোকার্থের ব্যাখ্যায় এক নূতন অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন! সে অর্থ এই—“বিশিষ্টং জ্ঞানং যেষাং তেষাং সম্বন্ধো যজ্ঞাত্মসম্বোধনে হে বিজ্ঞানে। ইতি সম্বোধ্য, তাং নিত্যমবহিক্তাং ভোক্তনাদি-ব্যাপারাদিতি শেষঃ, তদন্তমাহারাদিক-মঙ্গীকৃত্য।” বলা বাহুল্য, রামানুজের এই ব্যাখ্যা নিত্যস্ত কষ্টকল্পিত। বোধ হয়, তাঁহার সময়ে জনসমাজ প্রাণীলোকের ব্রহ্ম-বিজ্ঞায় অধিকার থাকা স্বীকার করিতেন না বলিয়া, রামানুজ রামায়ণের সরল বাক্যার্থের এরূপ কুটিল কষ্টকল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

শাক্যসিংহ ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে, কপিলবস্তুর* ক্ষত্রিয়রমণীগণ নবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৃহে বাস করিয়া

গৃহীর ধর্ম প্রতিপালন করা অপেক্ষা শাক্য-সিংহের জায় সন্ন্যাসগ্রহণের জন্ত ব্যাকুলা হইলে, শাক্যসিংহ তাঁহাদিগের প্রাথমিক কণপাত করিতে অসম্মত হন। পরে তিনি আনন্দের বিবিধ অহুনয়বাক্যে নিত্যস্ত বাধ্য হইয়া রমণীগণকে সন্ন্যাসাধিকার প্রদান করেন। তৎকালে শাক্যসিংহ রমণীগণের পক্ষে যে সকল কঠোর ব্রত ও নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,— তিনি সন্ন্যাসধর্মের উচ্চ আদর্শ অবিকৃত রাখিবার উদ্দেশ্যেই মহিলামণ্ডলীর সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন।*

বৌদ্ধভিক্ষুীগণ সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার লাভ করিয়া, শ্রমণী বা শ্রমণা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় না। তাঁহারা ভিক্ষুীগণামেই সাহিত্যে সুপরিচিত। যাহা হউক, শাক্যসিংহের ধর্ম প্রচারের পূর্ব হইতেই যে “শ্রমণ” শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। শাক্য-বির্ভাবের পূর্বকালবিরচিত পাণিনিহৃত্রেও “শ্রমণা” শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

“কুমারঃ শ্রমণাদিভিঃ ॥” ২।১।৭০॥

“কুমারশব্দঃ শ্রমণাদিভিঃ সহ সমস্ততে, তৎ-পুরুষশ্চ সমাসো ভবতি।” শ্রমণা, প্রব্র-জিতা, কুলটা, গভীণী, তাপসী, দাসী, বন্ধকী প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতবাক্যগণে “শ্রমণাদি” শব্দ বলিয়া পরিচিত। এই সকল শব্দের সহিত “কুমার” শব্দ মিলিত হইয়া “তৎপুরুষ” সমাস নিষ্পন্ন হইবার কথা পাণিনিহৃত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। এই হ্রদ্যানুসারে “কুমারী শ্রমণা”

সমাসে “কুমারশ্রমণা” রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্ত্রী একটি পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। ইহাতে একদা ভারতবর্ষে চির-কুমারী সন্ন্যাসিনী বর্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দেশে উত্তরকালে পুরুষমাত্রেই উদ্ধাহশূন্যে আবদ্ধ হইয়া নানা হুঃখক্লেশ বহন করা অবশ্যপ্রতিপাল্য ধর্ম্মাশ্রম-শাসন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল জ্ঞীলোকের পক্ষেই বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি, বার্ক্ক্যে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে বসতি করিবার ব্যবস্থা করিয়া, কাহাকেও কদাপি স্বাভাব্য-অবলম্বনের প্রশ্রয় দান করে নাই, সে দেশে যে কক্ষসময়ে চিরকুমারী সন্ন্যাসিনীগণ স্বতন্ত্রভাবে আশ্রয় ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস বিলুপ্ত হইলেও, এ বিষয়ের নানা প্রমাণ অত্য়পি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল প্রমাণ নিতান্ত প্রচ্ছন্নভাবে অপার শাস্ত্রসমুদ্রের অভলগর্ভে ইতস্তত লুক্কায়িত থাকায়, ভারতরমণীর অবস্থাপর্যালোচনায় ইউরোপীয় মহিলামণ্ডলী তাঁহাদিগকে কারানিবাসিনী হতভাগিনী বলিয়া কত-না সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন! এ কালের কথা বলিতেছি না;—সেকালের সাহিত্যে, সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রে, সেকালের লোকব্যবহারে, ভারত-রমণী স্বকীয় চরিত্রগৌরবে দেবীপদবাচ্যা হইয়া, ভারতবর্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তারের প্রভূত সহায়তাদান করিয়াছিলেন।

সংসারাশ্রম সর্ক্সাশ্রমের সার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, অবস্থাভেদে সংসারাশ্রম গ্রহণ না করিয়া, জীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধযুগ প্রবর্তিত হইবার বহুপূর্ক্স হইতে এই অধিকার পরিচালিত হইত। রমণীমাত্রেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেন না। সাধারণত পুরুষের ত্রায় রমণীগণও উদ্ধাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া লোকযাত্রা নির্বাহ করিতেন; কিন্তু স্থলবিশেষে পুরুষের ত্রায় রমণীগণও চির-ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিষ্ঠার অমুশীলন করিতেন। এই শ্রেণীর তাপসীগণ গুরুগৃহে বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার অধ্যাপনাকার্য্যেও নিযুক্ত হইতেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। “নির্ণয়সিদ্ধি” নামক স্মার্ত্তগ্রন্থে পুরাকালে এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকার পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে। পাণিনিহৃত্রেও * অধ্যাপিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নাট্যগাহিত্যের নানাস্থানে জ্ঞীলোকের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রসঙ্গ অত্য়পি দেদীপ্যমান † সন্ন্যাসধর্ম্মের মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইলেও, ভারতরমণী সে কঠিন ব্রতপালনের ক্ষমতা আত্মোৎসর্গ করিয়া পুরাকালে নানা কীর্তি স্থাপন করিয়া থিয়াছেন। আজ তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের কীর্তিকলাপ বিশ্বতিনিমগ্ন বলিয়া ভারত-রমণীগণ সমবেদনার পাত্রী! তথাপি ভগবতী ভারতরমণী নিয়ত দেবীপদবাচ্যা পূজনীয়া তপস্বিনী।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধভিক্ষুর ত্রায় বৌদ্ধ

ভিক্রুণীগণও নানা দিগ্দেশে ধর্মপ্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম ও কীর্তিকাহিনী অত্য়াপি বৌদ্ধসাহিত্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রমণগণ যে কঠোর ধর্মপালনের জন্ত চিরবিখ্যাত, তাহা অত্য়াপি সভ্যসমাজের বিশ্বয়োৎপাদন করিয়া থাকে। ধর্মার্থে একরূপ আত্মতাগ, একরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা, একরূপ অপরাজিত অধ্যবসায়, জগতের ইতিহাসে অল্পই পাওয়া যায়। সময়ের উত্তেজনা, বিধর্মীর অত্যাচারে, নিত্যন্ত নিরুপায় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে জীবনবিসর্জন অলৌকিক-শৌর্ধ্যবিজ্ঞাপক অমাহুষিক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চিরজীবন সংসারসুখ বিসর্জন করিয়া তপঃ-ক্লেশ সহ্য করাই যথার্থ অলৌকিক ব্যাপার। মৃত ও বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, ভারতবর্ষের নরনারী বহুবার এই চরিত্রবলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিতাভস্মে এ দেশ আজিও পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।*

বৌদ্ধ শ্রমণগণ এ বিষয়ে আরও অক্ষয়-কীর্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশের শাস্তোজ্জ্বল সুখসৌভাগ্য বিসর্জন করিয়া, কেহ চিরতুহারাবৃত অশ্বকীর হিমারণো, কেহ তপ্তরবিতাপদগ্ন প্রচণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলে, কেহ গতস্থাপদসঙ্কুল অপরিজ্ঞাত অরণ্যপথে, কেহ বা তদপেক্ষা অধিক অপরিজ্ঞাত তরঙ্গতাড়িত

সাগরবক্ষে নানা দিগ্দেশে গমন করিয়া,—ধর্ম-প্রচারে মানবসমাজকে সমুন্নত করিবার জন্ত বিদেশের প্রান্তরে, শ্মশানে, গিরিসঙ্কটে বা নদীসৈকতে জীর্ণকাল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! ভারতবর্ষের বাহিরে যাহারা এইরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আত্ম অন্নসংখ্যক শ্রমণের নাম অত্য়াপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম বৌদ্ধশ্রমণ “পঞ্চ ভদ্রবর্গীয়” নামক পাঁচ ব্যক্তি। তাঁহাদের কথা সকল দেশের বৌদ্ধশাস্ত্রেই সুপরিচিত। তাঁহাদের নাম,—জ্ঞানকৌণ্ডিন, অশ্বজিৎ, বাস্প, মহানাম ও ভদ্রিক। ইহারা কিরূপে শাক্যসিংহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা নানা গ্রন্থে নানা-রূপে কীর্তিত আছে। “ললিতবিস্তরে” দেখিতে পাওয়া যায়, এই “পঞ্চ ভদ্রবর্গীয়” কৌণ্ডিনাদি বৌদ্ধশ্রমণগণ পূর্বে রুদ্রক রাম-পুত্রের শিষ্য ছিলেন; পরে শাক্যসিংহের অনুসরণ করেন।

“এবং বিম্বা পঞ্চক ভদ্রবর্গীয়া রুদ্রকরামপুত্রসকাশাৎ অপক্রম্য বোধিসত্ত্ব অববন্ধ।” (অববন্ধঃ)

ললিতবিস্তরঃ, সপ্তদশাধ্যায়ঃ। †

ইহারা শাক্যসিংহের নিকট কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া, তাঁহাকে প্রথমে কৃচ্ছসাধনে ও পরে আহাৰায়েষণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে পলায়নপূর্বক বারাণসীধামে

* রোমান ক্যাথলিক শ্রমণী ও শ্রমণাসিনীগণ বৌদ্ধ শ্রমণ-শ্রমণার আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইহা অনুমান করিয়া থাকেন।

† মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্রবৎসল শুদ্ধোদন শাক্যসিংহের তপস্তাকালে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্ত এই সকল লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখানে “ললিতবিস্তরের” মত গৃহীত হইল। শুদ্ধোদনকর্তৃক প্রেরিত হইলে ইহারা শাক্যসিংহকে পরিত্যাগ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

“মৃগদাব” নামক ঋষিপুত্রে বাস করিতে আরম্ভ করেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিয়া মৃগদাবে উপনীত হইলে, এই পঞ্চ-শিষ্যই প্রথমে তাঁহার নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ইহারা প্রমণপদবীতে আরোহণ করিয়া কোন্ কোন্ স্থানে প্রচারকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে ইহারা প্রথম শ্রমণ বলিয়া চিরসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদের পর বহুলোকে প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া শাক্যসিংহের জীবিতকালেই ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও ভারতবর্ষেই শ্রমণ-গণের একমাত্র প্রধান প্রচারক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গাকারে ও কাশ্মীরে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পর ইহাতে, তাহা ভারত-বর্ষের বাহিরে প্রধাবিত হইবার সূত্রপাত হয়। তাহার পর ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সদাচার, শিল্প ও সাহিত্য ভূমধ্যসাগরতীর হইতে প্রশান্তমহাসাগর পর্য্যন্ত জলে-হলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অনেক স্থান এক্ষণে সে শিক্ষা ও সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, অত্মাপি ভূমণ্ডলের অধিকাংশ নর-নারী ভারতবর্ষকে গুরুস্থান বলিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিয়া থাকে। ইহারা নিম্নত আত্মবিসর্জন করিয়া স্বদেশের নাম এইরূপে ভূমণ্ডলে জয়যুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের কবি যেদিন সে পুণ্য-গাথা গান করিবেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখক যেদিন সে অপূর্ণ আত্মত্যাগকাহিনী কীর্ত্তন করিবেন, সেদিন ভারতবর্ষের

সাহিত্য নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পাঠক-সমাজকে আত্মমর্য্যাদার অমৃতগোরবে গোরবাসিত করিবে!

শাক্যসিংহ কৌণ্ডিন্দ্ৰাদি পঞ্চ ভদ্রবর্গীয় শিষ্যাগণকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার পর বারণসীধামে আরও ৫৫জন তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে যশঃ, পূর্ণ, বিমল, গবাম্পতি এবং সুবাহুর নাম বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত। এই পঞ্চ যুবক যৌবনোচিত অলৌক আনন্দপ্রমোদে কালাতিপাত করিতেন;—অর্থের অভাব ছিল না; প্রবল প্রভাপের অবধি ছিল না; তরুণজীবনে ভোগসুখ বিসর্জন করিয়া ভিক্ষাপাত্র-গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহাদের সম্মাস-গ্রহণের ও চরিত্রসংশোধনের দৃষ্টান্তে বারণসীদর সংকুলজাত সম্ভ্রান্ত যুবকগণের মধ্যে আরও পঞ্চাশং শিষ্য মন্ত্রগ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ এই ষষ্টিসংখ্যক মন্ত্রশিষ্যাগণকে ত্রিশ দলে বিভক্ত করিয়া ছই ছই জনকে এক এক দিকে ধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবিষাভিমুখে প্রস্থিত হন।

তৎকালে উরুবিষ-কাশ্রপ, নদী-কাশ্রপ ও গয়া-কাশ্রপ নামে তিন ভ্রাতা নৈরজ্ঞনা-নদীতীরে বহুসংখ্যক শিষ্য সহ সম্মাসধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহারা শাক্যসিংহের নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই উরুবিষ-কাশ্রপ বৌদ্ধসাহিত্যে মহাকাশ্রপ নামে পরিচিত। শাক্যসিংহ মহাপরিনির্বাণ লাভ করিলে, মহাকাশ্রপই বৌদ্ধশ্রমণগণের নেতৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্রবল ও বয়োবাহিক্যে তিনিই মহাস্থবিরপদের একমাত্র যোগ্যব্যক্তি বলিয়া পরিচিত

ছিলেন। কাশ্মীরের চেষ্টার মগধান্তর্গত সপ্ত-পর্ণগুহাসমীপে পাঁচশত বৌদ্ধশ্রমণ সম্মিলিত হইয়া “ত্রিপিটক” সংকলন করিবার পর, সূত্র, বিনয় ও অভিধর্মের তত্ত্ব দেশবিদেশে প্রচারের সূত্রপাত হয়। মহাকাশ্মীরের পর আনন্দ, আনন্দের পর শাণবাসিক, শাণবাসিকের পর উপগুপ্ত মহাহবিরের পদবী লাভ করেন। আনন্দ নির্বাণলাভের সময়ে মধ্যাস্তিকনামক শিষ্যকে, মন্ত্রদান করিয়া-ছিলেন। এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধশ্রমণই কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। শাণবাসিকের গান্ধারে ধর্মপ্রচার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের অবস্থা কিরূপ ছিল, তথায় কিরূপে নবধর্ম প্রচারিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুসভ্য-সম্পন্ন গ্রামনগর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-ছিল, বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ নানা অলৌকিক অতিরঞ্জিত উপা-খ্যানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীর তৎকালে আর্শাক্ষিত নাগজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। তাহারা প্রথমে ধর্ম-প্রচারকের উপর নানা অত্যাচার করিয়া, অবশেষে তাঁহার সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও প্রেমের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহাকে স্থানদান করেন।* এই স্থানে গ্রামনগর নিৰ্ম্মাণ করিয়া শ্রমণগণ পঞ্চমাদননামক পর্বত হইতে কুকুমবৃক্ষ আনয়ন করিয়াছিলেন;— তাহার কৃষিকার্য্যেই নবধর্মাহুরক্ত উপনিবেশ-নিবাসিগণ ধনধাত্তে সমৃদ্ধি লাভ করেন।

বৌদ্ধশ্রমণগণ ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্মপ্রচার করিবার সময়ে সেই সকল অল্পমত দরিদ্র-দেশের ধর্ম ও নীতি সমুন্নত করিয়াই নিরন্তর হইতে পারেন নাই; তথাকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতি সাধন করিবার জন্তও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে হিমালয়ের এক প্রদেশ হইতে অত্র প্রদেশে শাক্যসিংহের নবধর্ম প্রচারিত হইয়া, তাহা ক্রমশ হিমা-লয় অতিক্রম করিয়া তাতার, তিব্বৎ ও চীন-সাম্রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

তাতারের অন্তর্গত “কুন্তন”নামক রাজ্য হইতেই বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এশিয়াখণ্ডের পশ্চি-মাংশে প্রচারিত হয়। এই কুন্তননগর এক্ষণে “খোটান” নামে পরিচিত। শাক্য-সিংহের এই দেশে উপনীত হইবার কথা তিব্ব-তায় বৌদ্ধসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। “তাঁহার মহাপরিনির্বাণলাভের ২৩৪ বৎসর পরে ধর্মশাশোকনামক নরপতি মগধের সিংহা-সনে আরোহণ করেন।† তাঁহার রাজ্যাকের ত্রিশতম বর্ষে তদীয় মহিষীর এক পুত্রসন্তান জন্মিত হইলে, ঐ নবজাত শিশু পরিত্যক্ত হয়। চীনদেশের অধিপতি তাহাকে প্রতি-পালন করেন। ঐ পুত্রের নাম “কুন্তন”। তিনি উত্তরকালে কুন্তনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।‡ চীন ও ভারতবর্ষ হইতে বহু-লোকে এই দেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করায়, অতি অল্পদিনের মধ্যে এই রাজ্য ভারতবর্ষ, চীন ও মধ্য এশিয়ার সম্মি-লনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তথায় ভার-তীয় শিক্ষা, ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য, ভারতীয়

* এই কাহিনী নানা লতাপত্রের অলঙ্কৃত হইয়া সমস্ত বৌদ্ধসাহিত্যে নানাতাবে কীর্ণিত হইয়াছে।

† ইহা তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যের কথা।

‡ Rockhill's Life of Buddha.

লিপিকৌশল ও ভারতীয় সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়া, ভারতবর্ষের বাহিরে এক “মহা-ভারতরাজ্য” গঠিত হইবার সূত্রপাত করে। বৌদ্ধশ্রমণগণের অশ্রান্ত অধ্যবসায়ে এই জ্ঞানসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কালে তাহা মুসলমানধর্মের প্রবল প্রতাপে চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও, মরুনাহিত বৌদ্ধবিহারাদি অতীত কালিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছে।*

এই প্রদেশে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রবিষ্ট হইয়া সভ্যতাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল, হিয়ঙ্গথসঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—কাস্মীর হইতে বৈরোচন-নামক ভ্রমণ আসিয়া এই সংস্কারকার্য সাধন করেন। হিয়ঙ্গথসঙ্গ এই দেশে উপনীত হইয়া, ইহার যে স্তম্ভসমূহ ও সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণগণের আশ্চর্য্যভাগ ও প্রচার-কৌশলই তাহার মূল কারণ।† কুস্তন ও চীন-রাজ্য হইতে ক্রমে তিব্বতের তুষারাবৃত উচ্চ উপত্যকায় শাক্যসিংহের নবধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তিব্বতে ভাষা ছিল, লিপিকৌশল ছিল না; নরনারী ছিল, সমুদ্রত শিল্প-সাহিত্য ছিল না; রাজ্য ছিল, নিয়ত কলহকোলাহল ভিন্ন শান্তিস্থ ছিল না। ভ্রমণগণের

অক্লান্ত অধ্যবসায়ে কিরূপে ধীরে ধীরে তিব্বতের সর্বপ্রকার সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিরতিশয় কৌতূহলের বিষয়।

ভ্রমণগণের মধ্যে কালে নানা কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের পূর্ব-গৌরব বিনষ্ট করায়, বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে উপধম্মে পরিণত হইয়া এসিয়াখণ্ডের অধিকাংশ স্থান হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে! ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস ও রোমের পূর্ব-কাহিনী যেমন বিশ্বয়োৎপাদন করিলেও, তাহাদের অধঃপতনের মূলে চরিত্রহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠকচিহ্নিত অবসাদ-গ্রস্ত করে, বৌদ্ধভ্রমণের ইতিহাসও সেইরূপ চিত্তক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। ষাংহারা সর্বত্র বিসর্জন করিয়া কেবল চরিত্রবলের অজ্ঞেয়শক্তিতে জলে-স্থলে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের বেশ, তাহাদের ধর্ম, তাহাদের পবিত্র উপাধিধারণ করিয়া উত্তর-কালের ভ্রমণগণ চরিত্রহীনতার বৌদ্ধজ্ঞান-সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন! পৃথিবীর ইতিহাসে নানা দেশ নানা সময়ে বাহুবলে বলি-য়ান্ হইয়া কিয়ৎকাল ভূমণ্ডলের কিয়দংশে প্রবল প্রতাপে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল; অত্যাধি তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু কেবল চরিত্রবলে অঙ্গপৃথিবীব্যাপি-জ্ঞান-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে ভারতবর্ষের বৌদ্ধভ্রমণই

* এক্ষণে খোড়ানের নিকটস্থ “টাক্সা-মকান” নামক মন্দিরে পুরাতন মন্দিরাদি আবিস্কৃত হইয়াছে।

† Their external behaviour is full of urbanity; their customs are properly regulated. Their written characters and their mode of forming their sentences resemble the Indian model; the forms of the letters differ somewhat.—Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II. p. 309.

জগতে একাকী অসহ্য হইরাছিলেন। সে সাম্রাজ্য স্বয়ংকাহিনীতে পরিণত হইরাছে; কিন্তু তাহার কল্যাণে প্রাচ্যসভ্যতা কিরূপে ধীরে ধীরে প্রতীচ্য মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন অজ্ঞাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

মধ্যএসিয়ার বৌদ্ধ জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, তাহা ধীরে ধীরে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত ও পূর্বে চীনসাম্রাজ্যের পূর্বোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। খৃষ্টাব্দিভাবের পূর্বেই পশ্চিমাংশে শ্রমণগণের প্রচারচেষ্টা সকল হয়; পূর্বাংশে চীনসাম্রাজ্যের পুরাতন প্রথা ও ধর্মবিশ্বাস প্রবল থাকায় সহসা নবধর্মের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা ছিল না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে চীনসাম্রাজ্যেও শ্রমণগণের প্রচারচেষ্টা সফল হইতে আরম্ভ করে। যে সাম্রাজ্য নিতান্ত বিলাসলোলুপ আলস্য-পরায়ণ পুরাতন মানবসমাজের আবাসভূমি বলিয়া চিরপরিচিত, সেই সাম্রাজ্য সহসা নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। চীনদেশের ধর্মপিপাসু নবদীক্ষিত শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত তথ্য লাভ করিবার জন্ত এবং ভারতবর্ষের বিবিধ-পুণ্যতীর্থ-দর্শনে আত্মা পবিত্র করিবার আশায় মরুগিরি উত্তীর্ণ হইয়া দলে দলে ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। নালন্দার বৌদ্ধবিদ্যালয়ে চীনদেশের ছাত্রবর্গের জন্ত শ্রীশ্রীশ্রী নামধের মগধেশ্বর মন্দির ও আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল ছাত্র বা শ্রমণগণের নাম ও পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীনদেশের যে সকল তীর্থ-

যাত্রীর নাম সুবিখ্যাত, তন্মধ্যে কাহিরান ও হিরান্থসজের নাম সভ্যসমাজে সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। কাহিরান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এবং হিরান্থসজ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কাহিরান সমুদ্রপথে ও হিরান্থসজ মধ্য-এসিয়ার স্থলপথে প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে উভয়েই স্থলপথে অগ্রসর হইরাছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবিধ বিলুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার-কার্য্যে প্রকৃত সহায়তাসাধন করিতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দী হইতে সপ্তমশতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্য-এসিয়ার বিবিধ সমুন্নত জনপদের শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্মভাবের যে সকল বিবরণ এই সকল ভ্রমণকাহিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষের অকৃত্রিম গৌরবের বিবরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনসাম্রাজ্যে যে সকল বৌদ্ধভ্রমণ প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হইরাছিলেন, তাঁহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহিরান ও হিরান্থসজের সময়ে বৌদ্ধগ্রন্থাবলি সাহায্য করিবার জন্ত যে সকল শ্রমণ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম-মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চীন, তাতার ও নেপালের সমবেত চেষ্টার তির্য্যক্বে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তির্য্যক্বে মানবসমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। প্রকৃতি সে দেশকে পৃথিবীর নরনারীর সাধু-সঙ্গে চিরবঞ্চিত করিয়া ছুঁবার্য্যুত গিরি-

প্রাচীনে চিরক্ক রাধিয়া কতকাল নীরবে
অভিবাহিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা
বার না। পর্বতের উপর পর্বত, তুবারের
উপর তুবার! তাহার মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত
ক্ষুদ্রগ্রামের ক্ষুদ্রকূটরে পশুচর্শে গাভীচ্ছাদন
করিয়া শরীররক্ষার্থ নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত তিব্বত-
নিবাসী নরনারীর পক্ষে মানসিক-সমুন্নতি-
সাধনের অবসর উপস্থিত হয় নাই। কোন-
রূপে কথোপকথন পরিচালনা করিয়াই ভাষা
পরিভূষ্ট হইত; কখন কোন গ্রাম্যগীত
রচিত হইয়া মুখে মুখে কূটীর হইতে কূটীরা-
ন্তরে পরিলম্বণ করিত;—সাহিত্য ছিল না;
তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্ত কোনরূপ
অক্ষর বা লিপিকৌশলও আবিষ্কৃত হয় নাই।
সমগ্র উপত্যকা নানা ক্ষুদ্রপল্লীতে বিভক্ত
হইয়া নিরন্তর সংগ্রামকোলাহলে শান্তিভঙ্গ
করিত;—তাহার মধ্যে যথাসম্ভব স্তম্ভস্থ
লইয়া তিব্বতনিবাসী জীবনযাত্রা নির্বাহ
করিয়া কোনরূপে মানবলীলা সংবরণ
করিত। বৌদ্ধভ্রমণ সেই তুবারাবৃত স্রঞ্জাত-
রাজ্যে নগ্নপদে ভিক্ষাপাত্রহস্তে উপনীত
হইবার পর সে দেশের কি মহাপরিবর্তন
সাধিত হইয়াছে!

তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যে কৌশলাধিপতি
শলেনজিতের পুত্রই তিব্বতীয় প্রথম নরপতি
বলিয়া উল্লিখিত। কোন পুস্তকে তাহার
খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ, কোন পুস্তকে বা পঞ্চম
শতাব্দীতে প্রোক্ত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত
হওয়া যায়। তাঁহার বংশ “বর্গীয়-সপ্ত-নর-
পতি”বংশ বলিয়া কীৰ্ত্তিত। তাহার পর
“পার্শ্ব-অষ্ট-নরপতি”বংশের অভ্যুদয় হয়।
এই বংশের পর যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ

করে, তৎসংক্রান্ত তৃতীয় নরপতির শাসনসময়ে,
খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, তিব্বতে বৌদ্ধভ্রমণ
প্রবেশলাভ করেন। প্রথম প্রচারচেষ্টা
বিফল হইয়া যায়। এই চেষ্টা নেপাল হইতে
আরক্ক হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
যায়। চতুর্থ নরপতির শাসনসময়ে চীন
হইতে তিব্বতে চিকিৎসা ও গুণিতবিদ্যা
প্রচলিত হয়। ইহার পুত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতা-
ব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর
তিব্বতের নবজীবনলাভের সূত্রপাত হয়।
এই সময়ে অক্ষরশিক্ষার্থ ভারতবর্ষে সপ্তদশ
তিব্বতীয় শিক্ষার্থী উপনীত হইয়া জনৈক
ব্রাহ্মণ লিপিকর ও সিংহবোধ্য-নামধের পণ্ডি-
তের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই
শিক্ষার্থিগণের দলপতির নাম সডোটা। তিনি
কাম্বীরপ্রচলিত নাগরাক্ষরও শিক্ষা করিয়া
কয়েকখণ্ড বৌদ্ধগ্রন্থের অমূল্য লইয়া
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। লিপিকৌশল
প্রচলিত হইলে, তিব্বতীয়গণ বহুযুগের জড়-
অভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রবল উৎসাহে বৌদ্ধ-
গ্রন্থের অমূল্যকাব্যে নিযুক্ত হইয়া, অল্প-
দিনের মধ্যেই বিপুল সাহিত্যের প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠা-
করেন। একালের জাপানের জ্ঞান সেকালের
তিব্বৎ অতি অল্পকালের মধ্যেই সমু-
ন্নতিলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল।

যে সকল বৌদ্ধভ্রমণের অধ্যবসারে
তিব্বতের সমুন্নতি সাধিত হয়, তাহার এক-
কালের লোক হইলে, তাহাদের নাম ও কীর্ত্তি-
কলাপ সভ্যজগতে চিরস্মরণীয় হইত। তিব্ব-
তের রাজা নেপাল ও চীনদেশের রাজকন্ডার
পাণিগ্রহণ করায়, তিব্বতের উন্নতিলাভের
পথ আরও সহজ হইয়াছিল। এই সমা

পণ্ডিতের পরিবর্তে সুচিকণ পট্টবস্ত্র তিব্বত-বাসীর পরিচ্ছদশোভা বর্দ্ধিত করিয়া বাণিজ্য-বিস্তারে ধনবৃদ্ধির পন্থা প্রদর্শন করে। ভারত-বর্ষ হইতে কুমার-নামধেয় শ্রমণ, নেপাল হইতে মঞ্জুশ্রী, কাশ্মীর হইতে তবুত ও গণুত এবং চীনদেশ হইতে মহাদেব আসিয়া এই সময়ে তিব্বতের শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহদান করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অধিকতর সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ধোটাঁন হইতে শ্রমণগণ আসিয়া তিব্বতে ধর্মপ্রচার করেন, ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধগুহ ও বুদ্ধশাস্তি নামধেয় অধ্যাপকদ্বয় তিব্বতে আমন্ত্রিত হইয়া গ্রন্থানুবাদে নিযুক্ত হন এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে নানা গ্রন্থ তিব্বতে আনীত হইয়া অনুবাদিত হইতে আরম্ভ করে। এই শতাব্দীতে শাস্ত্ররক্ষিত, পদ্মসম্বৎ, আনন্দ ও কমলশীল প্রভৃতি ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণগণের তিব্বতে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিবার বিবরণ তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাশ্মীর হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পূর্বেই ব্রহ্মদেশ হইতে পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। শাক্য-সিংহের জীবিতকালেই ব্রহ্ম ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের কথা কিরণপরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষের লোকে বাণিজ্যার্থে যে সকল দীপে ভ্রমণ করিত, সেখানেও ক্রমে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

যাহারা বহুকাল সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে সমুদ্রযাত্রাকে জাতিনাশের

কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যে একদা সমুদ্রপথে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দীপমণ্ডলে বাণিজ্যোপলক্ষে গমনাগমন করিয়া সেই সকল অনার্য্য জনপদে সভ্যতা-বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এখন ভারতবর্ষের লোকে বিশ্বত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা কোন্ পুরাকালে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু খৃষ্টাব্দিভাবের অন্তত পাঁচশত বৎসর পূর্বেও যে ভারতবর্ষের লোকে বাণিজ্যার্থে সমুদ্রপথে বহুদূর পর্য্যটন করিতেন, বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধশ্রমণ-গণের প্রথম নেতা কাশ্যপ, দ্বিতীয় নেতা আনন্দ, তৃতীয় নেতা শাণবাসিক,—তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাণবাসিক একজন ধনপতি বণিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে দীর্ঘকাল সমুদ্রপথে পর্য্যটন করিবার সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ মহাপরি-নির্বাণ লাভ করেন। শাণবাসিক স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গুরুদেবের দেহত্যাগের বৃত্তান্ত অবগত হন এবং সংসারাত্মম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রয় গ্রহণ করেন। সার্ক-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে যাহারা সমুদ্রপথে নানা দিগদেশে গমনাগমন করিতেন, তাহাদের মধ্যে কেবল শাণবাসিকের নাম এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

শ্রমণগণ মধ্য-এসিয়ার নানাস্থানে যে সকল বৌদ্ধধর্মীয়রক্ত জনসমাজকে বিবিধ বিদ্যায় অলঙ্কৃত করিয়া সভ্যতামার্গে সমুন্নত করিয়া-

ছিলেন, তাহাদের বংশধরগণই কালে মুসল-মানধর্ম গ্রহণ করিয়া এশিয়া হইতে আফ্রিকা এবং আফ্রিকা হইতে ইউরোপে রাজ্যবিস্তার করিবার সময়ে নব্য ইউরোপের জ্ঞানবিস্তারের সহায়তাসাধন করে ।* সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও, ইউরোপীয় সমুদ্রভির প্রথম সোপানে পরোক্ষভাবে ভারতীয় প্রমণ-

গণের জীবনগত প্রচারপ্রম যে কিরূপ পরিমাণে বর্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস আলোচিত হইলে, কালে এই সকল তথ্য সমগ্র সভ্যসমাজে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইবে ; জন্মানু অধ্যাপকগণের তথ্যসম্বন্ধানুকোণে তাহার পূর্বসূচনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে !

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ।

থিয়েটার ।



নাটক এ দেশে নূতন নহে, কিন্তু নাট্যালয় নূতন । পুরাকালে রাজাদের প্রাসাদে নাটক অভিনীত হইত, ইদানী ধনীর ঘরে যাত্রা হইত । ইংরাজদিগের দেখাদেখি যখন এ দেশে থিয়েটারের সৃষ্টি হইল, তখন কাজে-কাজেই নাট্যাগৃহ নির্মিত হইল । সেকালের নাটক কিংবা যাত্রা সকল আসরে অভিনয় করা যাইত, কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ, পট প্রভৃতি আসিল, অভিনয়কৌশলের সহিত পটাদি পরিবর্তন মিলিত হইল । থিয়েটারও প্রথমে সপের হয় ; প্রথম-প্রথম তাহাতে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিতেন । ক্রমে থিয়েটার ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইল । তাহাতে নিন্দার কিছু দেখি না, কারণ পেশাদার না হইলে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হয় না । দর্শকের পক্ষে পরস্যা দিয়া দেখিলে ভালমন্দ বিচার করিবার অধিকার বাড়ে । মধুসূদন দত্তের নাটক লইয়া আমা-

দের দেশে থিয়েটারের আরম্ভ । তাহার পর বকিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, যুগলিনী, বিষবৃক্ষ নাটকাকারে ভাঙিয়া এবং দীনবন্ধুর নাটক লইয়া থিয়েটার জাঁকিয়া উঠিল। জাঁকিয়া উঠিবারই কথা, কারণ ওরূপ উৎকৃষ্ট নাটকা-বলীর সর্বত্রই সমাদর হয় । ক্রমে ছোট ছোট গীতিনাট্য রচিত হইল, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মার্জিত ও উচ্চ অঙ্গের নাটক-গুলি প্রচারিত ও অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল । যাত্রাকে একপ্রকার বিদ্যার করিয়া দিয়া থিয়েটার তাহার আসনে জমকাইয়া বসিল ।

বঙ্গদেশের নাট্যালয়ের ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা আমার নাই, এবং সে ইতিহাস এত আধুনিক যে, তাহার অল্প পুঁথিপালি হাংড়াইবার প্রয়োজন হয় না । কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে থিয়েটারের ক্রমোন্নতি না হইয়া কেবল অবনতি হইতেছে কেন ?

* এ বিষয়ে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত প্রকাশিত হইবে ।

হওয়া যায়, তাহা “ভারতীয় জাতিসাহিত্য” শীর্ষক গ্রন্থে

এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, কেন না, থিয়েটারের সঙ্গে সমগ্র জাতির সম্বন্ধ আছে। থিয়েটার শুধু রঙ্গালয় নয়, শিক্ষালয়। আগে যাত্রার দলে মিশিয়া অনেক ছেলে বিগড়াইয়া বাইত; এখন থিয়েটারের জন্ত কত ছেলের সর্বনাশ হইতেছে, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? নাট্যালয়ের শিক্ষা বিভাগালের শিক্ষার বিরোধী হইল কেন? অল্পকথায় তাহা বলিতেছি।

যাত্রার ও থিয়েটারে একটা গুরুতর মৌলিক প্রভেদ। যাত্রা সত্বেই হোক বা পেশাদারি হোক, যাত্রার জীলোক নাই, কোনকালে ছিল না। বালকেরা জীলোক সাজিত। নির্দোষ সমাজের অবস্থার অহু-যায়ী হইয়াছিল। জীলোক লইলে যাত্রা থেমটায় গড়াইবে জানিয়া যাত্রার দলপতিরা জীলোককে দলে লইতেন না। কিন্তু যখন থিয়েটার পেশা হইল, তখন আর জীলোক নহিলে চলে না। যদি বিলাতের মত সমস্তই যথাযথ করিতে হয়, তাহা হইলে জীলোকের পার্ট পুরুষ অথবা পুরুষশিশু কেমন করিয়া অভিনয় করিবে? আপত্তি করা যাইতে পারিত যে, এ দেশে জীলোকে ঘরের বাহির হইতে জানে না; আগে তাহাদিগকে লেখাপড়া শেখাও, 'পথে-ঘাটে-সমাজে বাহির কর, তাহার পর না হয় রঙ্গমঞ্চে তুলিও। সে আপত্তি শোনে কে? থিয়েটারযাত্রী-দিগের মনে কোন বিধা হইল না। সুতরাং যে শ্রেণীর জীলোক নষ্ট সাজিতে পারে, তাহারাই আসিল। বাহারা রাজপথের পণ্যবীথিকার দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারাই

রঙ্গমঞ্চের দীপমালায় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পদমধ্যাদা বাড়িল বৈ কমিল না, কিন্তু সেই এক বিষয় অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল।

হইল কি? থিয়েটারে পূর্বে লোকে অভিনয় শুনিতে বাইত, নাট্যকলা দেখিতে বাইত। নৃত্যগীতের সাধ হইলে স্থানান্তরে বাইত। অভিনেতাদিগের গুণাগুণ সর্বত্র বিচারিত হইত, অভিনেত্রীদিগের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া বাইত না। পরি-বর্তন অতি দ্রুত ঘটিতে লাগিল। নাটকে গীতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নটাদিগের নৃত্যকলা দেখিয়া দর্শকেরা মুগ্ধ হইতে লাগিল। দীনবন্ধুর নাটক পুরাতন হইয়া উঠিল। বঙ্কিমের উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে, নাট্যকাব্যে অভিনয় তত ভাল লাগে না। যে নাটক বা নাট্যগীতিতে কেবল রঙ্গরহস্য, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, ও নৃত্যগীতের অক্ষর উৎস, তাহাই দেখিবার জন্ত দলে দলে লোক ভাঙে। বিলাতের থিয়েটারের উপমা আর কাহারও মনে রহিল না। সেখানে থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে, এই ত্রিবিধ মূর্তিতে যে আনন্দ উৎপাদন করে, এখানে একমাত্র থিয়েটারে সেই আনন্দের ত্রিধারা প্রবাহিত হইল—অবশেষে একবেণী হইয়া ব্যালেক্সপী মেঘনামূর্তি ধারণ করিল। হায় দীনবন্ধু-মধুসূদন! মধুকৈটভ আসিয়া আবার তোমাদের সিংহাসন অধিকার করিল। কোথায় গেল বঙ্কিমের ভাষা, দীনবন্ধুর রসিকতা! গানে, কথায়, ভঙ্গীতে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। একটা বর্ণসঙ্কর, অতি কুৎসিত, অশুভ্র, অশ্রাব্য ভাষা থিয়েটারের ভাষা

হইল। তাহাতে বাংলার আত্মশ্রদ্ধা ও হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষার পিণ্ডদান একত্রে সম্পন্ন হইল। সেই অকৃত জারজ ভাষায় ছুরি ছুরি গীত রচিত হইল। যে হিন্দীভাষা এখন পর্য্যন্ত গায়কের অঘলঘন, বাহার ললিত-কোমল শ্রুতিমধুর পদাবলীর তুলনা নাই, সেই ভাষাকে কীচকরূপে বধ করিয়া তাহা হইতে উৎকট শ্রুতিপুরুষ গীতধ্বনি নিঃসারিত হইতেছে! বালকেরা এই ভাষায় কথোপকথন বা গীত শ্রবণ করিলে মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারযাত্রীর দলপরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বেকার সে রসগ্রাহী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আর থিয়েটারে দেখিতে পাওয়া যায় না। অশিক্ষিত ও শিক্ষার্থীতে এখন নাট্যালয় পরিপূর্ণ। যে সকল বালকদিগের নাচমোজরা দেখিবার কখন সুযোগ হইত না, তাহারা অবলীলাক্রমে ইচ্ছামত থিয়েটারে বিকটহাবভাবযুক্ত নৃত্যাদি দর্শন করিয়া থাকে! যদি কাহারও মনে এমন ছরাশা হইয়া থাকে যে, এই দেশের থিয়েটারে মিসেস্ সিডল্ অথবা এলেন টেরীর মত অভিনেত্রীর আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে, তবে তিনি সহজেই চক্ষুর্দূর বিবাদভঞ্জন করিতে পারেন।

আমাদের নাট্যালয়ের ক্ষুদ্রজীবনের আর একটি যুগের উল্লেখ না করিলে প্রকৃত কথাই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ইতিপূর্বে যে বর্তমান যৌর কলিযুগের কথা বলিলাম, উক্ত যুগ উহার পূর্বগামী। সেই যুগকে লড়া, ত্রেতা, কিংবা দ্বাপর নামে অভিহিত করা কর্তব্য, তাহাও বিচার্য। আপাতত

তাহার নাম ধর্ম্মযুগ দেওয়া বাইতে পারে। সেই সকল নাটকের রচয়িতা স্বয়ং একজন বিখ্যাত অভিনেতা। সীতার বনবাস, বৃন্দাবন, চৈতন্তলীলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটক। যখন এই সকল নাটক প্রথমে অভিনয় হইতে আরম্ভ হইল, তখন শ্রোতা ও দর্শকদিগের মধ্যে অভিনয় উৎসাহ দেখা দিল। লোকে মনে করিল, নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই বিষম গলদ। সীতার বনবাসে লবকুশের পার্ট কোথায় বালকে অথবা তরুণ যুবকে অভিনয় করিবে, না স্ত্রীলোকে অভিনয় করিতে লাগিল! চৈতন্ত স্ত্রীলোকে সাজিল! আশ্চর্যের কথা এই যে, দর্শকদিগের মনে অথবা সমাজে কাহারও মনে কোন বিদ্वा বা মানি হইল না। প্রথমত যে অভিনয়-বিপর্য্যয় নিবারণ করিবার জন্ত থিয়েটারে অভিনেত্রীর সমাগম হইল, সেই বিপর্য্যয় আরও দোবাবহ হইয়া উঠিল। যদি বালক স্ত্রীলোক সাজিলে রসভঙ্গ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজিলে কি দোবাবহ হয় না? মুণ্ডিতগুপ্ত শ্রীমান্ নদেরচাঁদ যখন দূতী সাজিয়া হাত নাড়িয়া গান করিত, তখন লোকের আপাদমস্তক জলিয়া উঠিত; আর অলঙ্কারাগরজিত শ্রীমতী জগদবা যখন কুশ, চৈতন্ত কিংবা শ্রীকৃষ্ণের বেশে আসরে নামিত, তখন কি দর্শকের চক্ষে কিছুমাত্র বিসদৃশ চৈকিত না? চৈতন্তের তুল্য মহাপুরুষের লীলা থিয়েটারে অভিনয়যোগ্য কি না, তাহাতেই গুরুতর সন্দেহ। মহাদেবের চরিত্র অভিনয় হইবার প্রস্তাব হওয়াতে কুলনারায়ণ কীর্ত্তন যৌরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা

কি কাহারও স্মরণ নাই ? শুধু এখানে কেন, ব্রাহ্মণে যখন ঐক্যপ কথা হয়, তখন ক্রমের সুলভান আপত্তি করিয়া অভিনয় রহিত করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টের চরিত্র থিয়েটারে অভিনয় করিলে কি ষ্ট্রীলেনেরা চূপ করিয়া থাকেন ? তাহার পর চৈতন্তের চরিত্র পুরুষে অভিনয় না করিয়া যখন স্ত্রীলোকে অভিনয় করিতে লাগিল, তখন এই ধর্মগত প্রাণ হিন্দু-জাতির হৃদয়ে কি কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না ? এইজন্ত নাট্যজগতের ধর্মযুগ অধিক-দিন টিকিল না। লোকের মন অভিনয়ে আকৃষ্ট হয় নাই, অভিনেত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বুদ্ধদেব কিংবা চৈতন্ত-লীলার অভিনয় হইলে এখন আর থিয়েটারের দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি হয় না।

থিয়েটারে আজকালকার অভ্যাসারম্ভ নাটকসকল অভিনীত হয় কেন, স্ত্রীলোককে পুরুষের পাঠ অভিনয় করিতে দেওয়া হয় কেন, দ্বিজ্ঞান করিলে উত্তর এই যে, লোকে যেমন চায়, তেমন পায়। আগে লোকে ঐতিহাসিক কি ধর্মসম্বন্ধীয় নাটক চাহিত, তাহাই পাইত। এখন লোকে রসবহুল নাটক চায়, সুতরাং তাহাই জোগাইতে হয়। পুরুষ স্ত্রীলোক সাজিলে ভাল দেখায় না, কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ সাজিলে, চৈতন্ত কিংবা শ্রীকৃষ্ণ সাজিলে দেখিতে বেশ মোলায়েম হয়, লোকে দেখিয়া খুসী হয়। রাত্রে থিয়েটার দেখিয়া যদি লোকের বিরক্তি হয়, তাহা হইলে দিনেও তাহাদিগকে দেখাইতে পারা যায়। চরম নীমার থিয়েটার যে কোথায় পৌঁছিবে, তাহা কল্পনা করিতে আশঙ্কা হয়। দেখিয়া-শুনিয়া এখন মনে হয়, আমাদের দেশী

যাত্রা ছিল ভাল ; বিদেশী থিয়েটার যহা অনর্থ ঘটাইতেছে।

থিয়েটারের অবনতি যে লোকের কুচি-বিকারের সঙ্গে সঙ্গে সাধিত হইয়াছে, এ কথা আর স্বীকার করি না। শ্রীযুক্ত কীরোদ-প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত “প্রতাপাদিত্য” নাটকের অভিনয় দেখিলে আর সে ভ্রম থাকে না। ইহাতে ভাবার প্রতি অত্যাচার নাই, হিন্দীর মন্তকচর্চণের ঘটনা নাই। নৃত্য-গীতের আড়ম্বর বড় নাই। থিয়েটারে যেমন নাটক অভিনয় হওয়া উচিত, যেমন পূর্বে হইত, সেইরকম। অথচ লোকে লোকারণ্য। প্রতি রাত্রে শত শত লোক স্থান না পাইয়া ফিরিয়া যায়। স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজে না—কেবল একটি ছোট বালিকা বালক সাজে। স্ত্রীলোকে প্রতাপাদিত্য সাজিলে কেমন মানাইত ? এ কথা যদি কেহ রাগ করেন, তাহা হইলে বলিব যে, স্ত্রীলোক যদি চৈতন্ত সাজিতে পারে, তাহা হইলে প্রতাপাদিত্য সাজিলে ক্ষতি কি ? যাহাই হউক, প্রতাপাদিত্যের অভিনয়ে কোনরূপ রীতি-বৈপরীত্যের প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি থিয়েটারে এত লোকসমাগম, একরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও সহায়ত্বিত অনেকদিন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যাহারা বহুকাল থিয়েটার দেখেন নাই, যাহারা ক্ষুধা হইয়া সে পথ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারাই প্রতাপাদিত্য দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। পেট্রুস্টিস্ প্রতাপাদিত্যের প্রধান আকর্ষণী শক্তি ; সে মোহিনী কতদিন থাকিবে বলিতে পারি না। কিন্তু সে মোহিনী উৎকৃষ্ট, না বিদ্রমবিলাসযুক্ত সঙ্গীতলাভের মোহিনী উৎকৃষ্ট ? অনেকে

সেই নৃত্যগীত ও সেই উৎকর্ষ ভাবভঙ্গীতে প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিয়া কি কিছু আনন্দ অনুভব করে নাই? ফল কথা এই যে, থিয়েটারের অবনতির কারণ দর্শকেরা নহে—নাটকরচয়িতাগণ ও থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ। যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা থিয়েটারে অভিনয় করে, তাহাদিগকে মহাচরিত্র মহাপুরুষগণের অভিনয় করিতে দেখিলে, হয় অত্যন্ত বিরক্তি জন্মায়, না হয় মনের দ্বার দুর্বল হইয়া পড়ে, মনের ও কল্পনার আদর্শস্রষ্টাশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে।

এই সকল দৃষ্ট ও অনবরত নৃত্যগীতের উচ্ছ্বাস যে বিভ্রালয়ের বালকদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনিষ্টকর, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ অবগত আছেন। পূর্বে যে সকল নাটক অভিনীত হইত, অথবা প্রতাপাদিত্য যে শ্রেণীর নাটক তাহাতে বাষসায়ের লাভ এবং দেশেরও কিছু মঙ্গল হয়। যাহারা অল্প অল্প কুৎসিত নাটক প্রণয়ন বা অভিনয় করেন, তাহারা সমাজের নিকট অত্যন্ত অপরাধী। তাহাদিগকে শাসন করা সমাজের কর্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বুলাই।*



(১)

কোথা হ'তে পেলি তুই এই রূপরশি,
ভাবিয়া না পাই!
সত্য-শিব-সুন্দরের গুহ্র গুহ্রহাসি,
তুই কি বুলাই?

(২)

ভুহ করে প্রাণ যার,—দুঃখী যেই জন,
বড়ই উদাসী,
সে-ও হেসে ফেলে, হেরে ও চাঁদবদন
অগ্নি রূপরশি!

(৩)

বেগাড়া সংসারী যেই, হিংসানল জ্বলে
জ্বলে' হয় সারা,
তারো প্রাণে শাস্তি আসে, তোর কাছে এলে,
লো রূপ-কোরারা!

* বুলাই দশমাসের একটি কটি মেয়ে।

(৪)

জ্যোতির জ্যোতির কোলে তুই ছিলি বুঝি
 স্বধায় বিভোর ?
 সে আনন্দে হ'স্ নাই !—চক্ষু ছাটি বুজি
 বুলাই-চকোর !

(৫)

জোছনা-বরণে ছোপা, ও অঙ্গ—পরশে,
 তাই কি, বুলাই,
 প্রাণ জুড়াইয়া যায় ? নিবিড় হরষে
 চিদানন্দ পাই !

(৬)

কর্ণনাশা-পাপনদী গঙ্গারে পাইল,—
 মুক্ত—অভিশাপে !
 কল্যাণি রে, ও শুভাঙ্গ হরে নিল, হরে নিল,
 মোর পাপতাপে !

(৭)

একি ! একি ! ফুলে ফুলে ফুলন্ত ভুবন !
 সচন্দ্র সলিলে
 শত চন্দ্র !—কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলকূজন !
 কি শোভা নিখিলে !

(৮)

একি এ জ্যোতির বজ্রা ! বিশ্ববিমোহন
 একি হেরি রূপ !
 হাসিছেন হরি !—চুষি সে রাঙা চরণ
 গুঞ্জরে মধুপ !

(৯)

চরণসরোজগন্ধে আনন্দে অধীর
 আমিও আকুল !
 সৌন্দর্যানির্ঝরে হেরি, চক্ষে বহে নীর
 বুলাই, বুলবুল !

শ্রীদেবেশ্বরনাথ সেন ।

কীরের পুতুল। *



শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের রূপায় বাঙালীর ছেলেরা একটা পড়িবার মত সাহিত্য পাইয়াছে; বঙ্গসাহিত্যের মহারথি-গণ শিশুগুলির জন্ত তেমন নাম করিবার যোগ্য কোন পুস্তক রচনা করেন নাই। কিছু পূর্বে ‘শিশুপাঠ্য’ শুনিলেই অনেকে অবজ্ঞার সহিত বই ফেলিয়া দিতেন;—শিশু-পাঠ্য বইগুলি প্রাচীন ব্যক্তির অবজ্ঞার সামগ্রী ছিল। এদিকে আবার “সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ”ও সেই সকল নীতিপূর্ণ সন্দর্ভের সঙ্গে বেদ্রাঘাতের একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক করিয়া সেই সকল পুস্তক, এমন কি পুস্তকমাত্রই, ভয়ের চক্ষে দেখিত। এই সকল পুস্তকের নীতিকথা এবং শুদ্ধ উপদেশও চড়কিল এবং কানমলার মতই ছেলেদের নিকট পীড়াদায়ক হইত। অনেক স্থলে সরস্বতীর সঙ্গে বালকের চিরশত্রুতার সৃষ্টি-পক্ষে এই নীতিপুস্তকগুলি আশাতীতরূপে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিল।

যোগীন্দ্রবাবু শিশুমণ্ডলীর হাতে ছবি ও গল্পপূর্ণ পুস্তক প্রদান করিয়া তাহাদের নিকট দেবী ভারতীকে অনেকপরিমাণে মনোজ্ঞ করিয়াছেন;—তাহারা এখন নির্ভয়ে তাহার পদে ফুলের অঞ্জলি দিতে পারিবে, এমন মনে হয়। আমাদের ছোট রাজ্যে এখন চিনির রথ, চীনে পুতুল ও হাসি-খুসীর বই—ইহাদের মধ্যে একটা ঘোর প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা পড়িয়া গিয়াছে। “কি নিবি” বলিলে অনেক জন্মপেটরোগী পেটুক ছেলেও চিনির রথ হইতে সত্যক দৃষ্টি ফিরাইয়া ‘হাসি ও খেলা’ লইতে ছোট্ট এবং বঙ্গের গৃহে গৃহে হারাধনের সাতপুত্রের কোনটির কি-ভাবে অকালমৃত্যু হইয়াছে—তাহা লইয়া প্রায়ই কোমলকণ্ঠের বাদপ্রতিবাদ শোনা যায়। একপে স্থলে অনেক সময়েই দেখা যায়, কোন মুখর বালক কবিতাটির সমস্ত নির্ভুল আবৃত্তি করিয়া তর্কের স্রমীমাংসা করিয়া দিতেছে।

কিন্তু তথাপি মনে হয়, যোগীন্দ্রবাবুর উপাখ্যানগুলি অনেকটা ইতিহাসের ছন্দে রচিত; কথাগুলি একটুও ঐকিয়া-বৈকিয়া পড়ে নাই, বর্ণিত বিষয়ের সকল অংশেরই অর্থ করা যায়,—বর্ণিত চরিত্র মেঘই হউক, আর গর্জিত কি মনুষ্যই হউক—তাহাদের প্রত্যেকটি কোণ বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—উহাতে কথাগুলির আন্তঃবন্ধন কোন স্থানেই টুটিয়া পড়ে নাই; উপজ্ঞাসে যেমন কল্পিত বস্তুকে সত্যবৎ দেখাইতে চাহে—এই বহিগুলি কতকটা সেই ছন্দে রচিত। যোগীন্দ্রবাবু ইংরেজী আদর্শেরই বিশেষভাবে অনুকরণ করিয়াছেন। যেখানে প্রাচীন ছড়াগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—সেখানে তাঁহার মৌলিকতা কিছু নাই, কিন্তু যেখানে কোন গল্প বা আখ্যান তিনি রচনা করিয়াছেন—সেখানে

উহা প্রকৃত জীবনের কথাই আলোতে একটু বেশী পরিষ্কার দেখাইতেছে—আর-একটু সন্ধ্যার আবছায়া ঘনীভূত হইলে যেন বালক-বুদ্ধির জন্ত প্রকৃষ্টতর নীড় প্রস্তুত হইতে পারিত। বহিঃশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বেশ উপযোগী, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ও তাহাদের কনিষ্ঠদের জ্ঞান এই সকল পুস্তকের অপেক্ষাও অধিকতর উপযোগী একখানি পুস্তকের পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যাহার সকল কথার অর্থ হয় ও সামঞ্জস্য আছে, এমন-সকল উপাখ্যান শিশুদিগের প্রতিভার ঠিক অমুকূল কি না, সন্দেহ। তাহার। যে রাজ্যের লোক, সেখানে সভ্য ঘটনার তীব্র জ্যোতিতে সকল জিনিষ বিকাশ পাইয়া উঠিলে চক্ষুর কোতুল ফুটাইয়া যায়, একটু নিবিড়তা দেখিলে অদৃশ্য-দর্শনের উৎকণ্ঠা তাহাদের মনকে সজাগ করিয়া তোলে। এই কল্পনাপ্রবণতা নষ্ট করিয়া তাহাদের কোমল প্রকৃতিকে সাংসারিক চিত্রের খুটিনাটিতে অভ্যস্ত করিলে, তাহাদের কবিত্বের মূল শুকাইয়া যাইবে। প্রবীণ-বয়সে কল্পনাশক্তি সংযত হইয়া অন্তর্দৃষ্টির সহায় হয়। এই কল্পনার শিকড়টি শিশু-প্রকৃতি হইতে বদী তুলিয়া ফেল, তবে বড় হইলে শিশুর অতিরিক্তমাত্রার সংসারী ও কতক পরিমাণে অন্তঃকরণশূন্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা।

এইজন্ত সেই কল্পনাময়ী প্রকৃতির অমুকূলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত—তাহাতে উহার বাস্তবিক আনন্দ পায়, অথচ এমন কোন ধারণা বন্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে অসত্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া

শেষে বিকাশ পাইতে পারে;—ছেলেভুলান ছড়ার মধ্যে যে কবিত্বমিশ্র নিরর্থ কল্পনার মুক্ত পরিবেষণ দৃষ্ট হয়—তাহাতে শিশু-প্রকৃতি পুষ্ট হয়, অথচ শিশু বাড়িয়া উঠিলে বুদ্ধি সতেজ হওনামাত্র সে কল্পনাগুলি কুয়াশার মত কাটিয়া যায়, তাহাতে হৃদয়ে কোন স্থায়ী দাগ পড়ে না—কিন্তু প্রকৃতিটি ভাব-প্রবণ ও স্নিকুমার হইয়া থাকে।

“কীরের পুতুল” শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচনা করিয়াছেন। ইহার আখ্যানাংশ এমন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, কোন শিশুই ইহা পড়িতে বা শুনিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবে না;—ছেলেদের পিতাদের পক্ষেও সেই কথা। কিন্তু ইহার এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে পুস্তকখানিকে আমরা সর্বতোভাবে শিশুপ্রকৃতির অমুকূল ও দেশের স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করি। উহার অনেক স্থান আছে—মাথা খুঁড়িয়াও যাহার কোন অর্থ হইবে না, অথচ গল্পের মধ্যে এমন ভাবে তাহার ছুড়িয়া আছে যে, শিশুগুলি উহা পড়িলে কল্পনার দেশের অনেক অসীম ও আশ্চর্য্য চিত্র তাহাদের মনের ভিতর আনাগোনা করিতে থাকিবে। শিশুগণ শব্দায় শুইয়া মাতামহী বা পিতামহীর ঘেঁসকল ছড়া শোনে—সেই নিরর্থ, অসংলগ্ন, আজগুবি কথায় তাহার। কেমন-একটা নিম্নল আনন্দ পাইয়া উৎসাহ বোধ করে—উহা তাহার। যেমন বোধে, আমরা ভেমন বুঝি না—কারণ উহাতে বুঝিবার কিছু নাই, অথচ শিশুর সমস্ত অন্তর্নিহিত কোতুল, কল্পনা ও চেষ্টার উদ্বেক করিয়া দিতে উহার।

অনান্যরূপে সার্থক। সেই সকল ছড়া পড়িয়া আমাদের মনে হয়—যেন কোন একটা কথা ভালরূপে বলিবার সময় তাহার সমস্ত বাধনগুলি ছিড়িয়া গিয়াছে—কথাগুলি পড়িয়া আছে, তাহা স্কৃত হইয়া সার্থক হয় নাই; শিশুগুলির কল্পনা ঠিক সেই লুপ্ত বাধনগুলির উদ্ধার করিতে পারে; যাহা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বা অসংলগ্ন, তাহাদের নিকট তাহাতে একটা সমগ্র-সুন্দর আশ্চর্য্য ও কৌতুহলোদ্দীপক চিত্র উন্মোচন করিয়া দেয়। একটা অসীম রাজ্য, যাহার প্রতি-প্রান্তটি ইন্ডিয়ের ধারণাযোগ্যভাবে কঠোর হইয়া উঠে নাই—যাহার সীমা মানচিত্রের কোন নির্দিষ্ট রেখায় পর্য্যবসিত নহে—যাহার বর্ণ কোন চিরদৃষ্ট দীপ্তিতে ভাতিয়া উঠে না—সুন্দর অথচ নির্দিষ্ট নহে, পতিভীল অথচ স্থানের গণ্ডিতে নিয়মিত নহে—স্পষ্ট অথচ সন্ধ্যালোকের কোমল ছায়ার ও কুহেলিপাতে একটু নিবিড়, এইরূপ এক অচিস্তিতপূর্ব্ব জগতের চিত্রা শিশুর মনে উদ্ভূত করিতে সেই ছড়াগুলি বিশেষরূপে উপযোগী। এইভাবে কল্পনা গাঢ় হইয়া প্রবীণবয়সে বিশ্বনিয়ন্তার অসীমত্বের আভাস দিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়।

সমস্ত প্রাচ্য ছড়াগুলির প্রতিভা আরক্ত করিয়া অবনীন্দ্রবাবু তাঁহার “কীরের পুতুল” রচনা করিয়াছেন। উহা এদেশের বালকগণের বেক্স উপযোগী হইয়াছে, অল্প কোন ছবি বা গল্পের বই তজ্জপ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহার রচনার ভঙ্গীতে দিদিমার স্মৃতি ধরা দিয়াছে—তাহা এত মধুর যে, পড়িবার সঙ্গে শৈশবের স্মৃতি উজ্জীবিত

না হইয়া যায় না—তেমনই বাহ্যল্যপূর্ণ কথার অন্ধিসন্ধি—একটা কথা বিনাইয়া নানারূপে বলিবার ভঙ্গী—উহা দিদিমার মেহমধুর ধরণটি এমন কৌশলে, এমন সহজভাবে অহু-করণ করিয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন নগ্ন শিশুটির কোমল কপোলে লোলিত-চন্দ্র জীর্ণহস্ত রাখিয়া মেহের সুরে তিনি বলিয়া যাইতেছেন এবং ঔৎসুক্যে শিশুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—দিদিমা একটু ধামিলেই প্রমাদ। এই পুস্তকের প্রত্যেক অংশই উক্তগুণগ্রামবিশিষ্ট, না বাছিয়া ছোট স্থল নমুনাস্বরূপ নিয়ে দিলাম।

(১) ছোটরাণী সাতমহল বাড়ীর সাততলার উপর সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে, সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পুচ্ছেন, কাজললতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পুচ্ছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন।

(২) তখন মানিনী ছোটরাণী আট-হাজার মাণিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা সখের শাড়ী ধুলোয় ফেলে বলেন—“ছাই গহনা, ছাই এ শাড়ী—কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ কোন দেশের ধুলোবালিতে এ মল গড়ালে? ছিছি, এ কাঁকর বাসি মুক্তোর বাসি হার, এ কোন রাজকন্তার পরা শাড়ী? দেখলে যে স্বগা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিরে বাও মহারাজ, এ পরা শাড়ী,—পরা গহনার আমার কাজ নাই।”

এই সমস্ত কথার উপর আমাদের শৈশবে-শ্রুত স্বপ্নরাজ্যের আলোটুকু পড়িয়া চিত্রগুলিকে নানা বিচিত্র বর্ণে ফলাইয়া তুলিতেছে। এক সময় এই সকল কথার কত আশ্চর্য্য ও মন্দর ছবিই মনে জাগিয়া উঠিত, কোন কথার বা ভয়বিহ্বল হইয়া গল্পকারিণীর বক্ষে জড়মড়ভাবে লুকাইয়া পড়িতে হইত, কোন কথার বা গল্পোক্ত নায়কের আশ্চর্য্যভাবে উদ্ধারের সংবাদে আমাদের দেহে প্রাণ আসিত। কীরের পুতুলের প্রধান নায়ক বানরটি বরকে লইয়া বিবাহবাসরে উপস্থিত হইতে দেরি করিতেছে—বানর বৃক্ষ বরকে আনিতে পারিল না, এই আশঙ্কায় রাজা চটয়া গিয়াছেন; তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিবেন, ক্ষুদ্র পাঠকের বুক সেই ভয়ে ভাঙিয়া পড়িবার মধ্যে। তখন উৎফুল্ল হইয়া ধোকাবাবুরা গুলিতে পাইলেন, “এমন-সময় - গুরুগুরু ঢোল বাজিয়ে, পো-পো বাশী বাজিয়ে, টুক্‌টুক্‌ ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝক্‌মক্‌ আলো জালিয়ে বানর বর নিয়ে এল।” এ সব ধোকাবাবুদেরই ভাষা, কিংবা যে ভাষা গুলিতে তাহারা বড় মস্তা পান—ইহা ঠিক সেই ভাষা, ইহার সম্বন্ধে আর-কিছু বলা নিম্নয়োজন। আখ্যানটি শিশুদিগের গুলিবার বোগ্য সুখ, দুঃখ, হিংসা ও ক্রমা পূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া কোড়ুহলের দীপশিখা এক ভাবে জাগ্রত রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে; যে স্থানে যজ্ঞীকরণ বানরের চোখে হাত বুলাইয়া তাহাকে দিব্যচক্ষু দিলেন—যজ্ঞীতলার সে আশ্চর্য্য দৃশ্য দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সজ্জয়ের বর্ণিত কৃষ্ণক্ষেত্রের চিত্র হইতে বালক-গণের নিকট ঢের বেশী উজ্জ্বল। যতগুলি

গ্রাম্যছড়া, সবগুলি সেই স্থলে অবনীবাতির লেখনীকে উপাদান জোগাইয়াছে। বানুর যজ্ঞীতলার ছেলেমেয়েদের যে কাণ্ড দেখিতে পাইল, তাহা অতীব আশ্চর্য্য, অথচ পুড়া শেষ করিয়া পাঠক বলিতে পারিবেন না কি দেখিলেন। কোন্‌ ছবির মাথায় কোন্‌ ছবি আসিয়া পড়িয়াছে, কোন্‌ ক্ষেত্রের ধান কাহার গোলায় গিয়াছে ঠিক নাই,—সত্যাসত্যের তর্ক, বিশ্লেষণের চেষ্টা সে স্থানে একান্ত পরাভব পাইবে, অথচ এমন মনোজ্ঞ চিত্র বালকগণের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। যাহারা সবটুকু না বুঝিয়া, সবটুকু না দেখিয়া ঢের বেশী বোঝে বা শোনে—এ তাহাদেরই রাজ্যের কথা, এখানে তাহাদের কোমল নিখাসে হাওয়ার উপর ফুলের সৃষ্টি করে,—বুক্তিতর্কেরদর্পকে সম-উচ্চারিত কোমলকণ্ঠের “খবরদার” শব্দ বাহিরে দাড় করাইয়া রাখে; এখানে ‘তেপান্তর’ নামক পৃথিবীর সীমানার বাহিরে একখানি অসীম মাঠ আছে, সেখানে “বনগাঁবানী মাসি-পিসি থৈয়ের মোতা গড়েন।” যাহা-কিছু অসম্ভব, এ রাজ্যে তাহার সকলই সম্ভব;—অসীম সম্ভাবনা ও বিশ্বাসের বিশ্বজোড়া বিশ্রামক্ষেত্রে এখানে সমস্ত দ্রব্য পুষ্ট হইতেছে—কোন যুক্তিতর্কের প্রথর তেজে ভাবগুলি ওকাইয়া আধমবা হইয়া যায় নাই। তাই—“সেখানে নিম্নেবে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক—ঝুঝুঝু বালির মাঝে চিক্‌চিকে জলা, তারি ধারে একপাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পোণ কড়ি গুণ্ডতে গুণ্ডতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পারে মাছের কাটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে, জেলেদের

ছেলে ভাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে ।” কোন কথা নাই—অথচ একরাশ কথা, কোন বিষয়ের সংলগ্ন বর্ণনা নাই—অথচ একএকটি কথাই একএকটি চিত্র । ঠিক নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গল্প শুনিতে হইলে বুদ্ধিকে বাধিয়া একদিকে চালাইতে হয়, আমাদের ছড়ার পাঠকগণের মনোযোগের উপর ততটা পীড়ন হইলে তাহারা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে—তাই তাহাদের জন্ত মাতৃহৃদয় বসিয়া-বসিয়া এই সকল ছড়া প্রস্তুত করিয়াছিল । উহাতে কতকটা সত্যের আলো দেখাইয়া আবার তাহা কল্পনার কুহকে নিবাইয়া ফেলা হয়, শিশুবুদ্ধি আবার সেই আলোটুকুর জন্ত হামা দিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়—এইভাবে কৌতুহল জাগাইয়া ঐ সকল ছড়ার ভিতর পৃথিবীটা তাহাদের নিকট নানা বিচিত্র বর্ণে ফলিত হইয়া উঠে ; কোন মহাপণ্ডিত সহস্র প্রতিভাবলে এই ছড়াগুলি নিষ্কাশন করিতে পারিতেন না—ইহা মাতৃস্নেহের অপূর্ণ সৃষ্টি এবং শিশুপ্রকৃতিপোষণের একান্ত উপযোগী । এত যে অবাস্তব কথা, অসংলগ্ন প্রলাপ, তথাপি লক্ষ্য করিলে একটি জিনিষ ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়—তাহা খোকাবাবুর জন্ত মাতার ভালবাসা, কথাগুলির সর্বত্র সেই স্নেহাতুর

হৃদয়ের করুণার ছায়া পড়িয়াছে । “চাঁদ-মুখে রোদ পড়েছে”—“খোকাবাবু কি শু হইয়া ঘরে এলেন, মা তপ্ত হৃৎ জুড়াইয়া খেতে দিলেন” প্রভৃতি কথার নানা দিক হইতে একই চিত্র প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে—স্নেহের পুত্তলী যেন ঘুম ভেঙে উঠে ঢুল-ঢুলে চোখে আমাদের কোলে কাঁপিয়ে পড়িবেন, এইরূপ একটি চিত্রের ভাব সর্বত্র মনে হয় । বানর মণ্ডিতলায় যে অপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহা পল্লীর পল্লবচ্ছায়ার স্নেহ-সারে স্থিত শিশুগণকে শান্ত করিবার জন্ত আবহমান কাল হইতে অবলম্বিত উপায়—স্নেহপূর্ণ হৃদয় সর্বদেশে এই উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং দুধের বাটার সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও বালকপ্রকৃতি পোষণ করিবার জন্ত ঘরে ঘরে আবশ্যক হয় । ক্ষীরের পুতুলের গল্পে সেই সকল মনোহর ছড়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে । অবনীবাবু তাহা এমন কৌশলে গল্পে জুড়িয়া দিয়াছেন যে, বহিঃস্থানিতে যেন শিশুদেহের একটা কোমল স্পর্শ ও মৃদু গন্ধ ব্যাপিয়া আছে । “ক্ষীরের পুতুল” সুওরাণী ও হুওরাণীর কথাসংক্রান্ত একখানি গল্পের বহিঃস্থানিতে অবনীবাবুর হাতের কয়েকখানি রঞ্জিত চিত্র আছে ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

সার সত্যের আলোচনা ।

বিগত প্রবন্ধে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধস্থলের পথ ধরিয়া চলিয়া—হুয়েরই উচ্চশিখরে সার্বাত্মিক ঐক্যের কেন্দ্রস্থান রহিয়াছে, আর, সেই কেন্দ্রস্থান বা হিরণ্ময় কোষ পৃথিবীর মধ্যে কেবল মহেশ্বরেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই তত্ত্বটির দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়া থামিয়া দাঁড়ানো হইরাহিল; অতঃপর শাস্ত্র এবং যুক্তির মসল ধরিয়া ঐ সাক্ষাৎ-লব্ধ তত্ত্বটির ভিতর-মহলের অক্ষিসন্ধিগুলো পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

পঞ্চকোষ ।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেমন যে সর্বাঙ্গস্থল্য মিল, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড হইতেই যাত্রারম্ভ করা বিধেয়; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আমাদের হাতের কাছে। শাস্ত্রে লেখে (বিজ্ঞান-পুস্তকেও না লেখে, তাহা নহে, তবে কিনা প্রকারান্তরে) যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চকোষের সমষ্টি। পঞ্চকোষ হ'লে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পাঁচটি কুটুরীর-ভিতর-কুটুরী। পঞ্চকোষের ল্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া মাঝের তিনটি কোষ হ'লে প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়। এই তিনটি কোষের পুটুলি-বন্ধির নাম সূক্ষ্ম-শরীর। অবশিষ্ট রহিল অন্নময় কোষ এবং

আনন্দময় কোষ। এই দুইটি কোষ সূক্ষ্মশরীরের দুই মুড়ার অন্তঃপাতী। অন্নময় কোষের আর-এক নাম স্থূলশরীর; আনন্দময় কোষের আর-এক নাম কারণ-শরীর। নিম্নে দৃষ্টি-পাত কর :—

- | | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| (১) অন্নময় কোষ | ... | (১) স্থূলশরীর |
| (২) প্রাণময় কোষ | } | (২) সূক্ষ্মশরীর |
| (৩) মনোময় কোষ | | |
| (৪) বিজ্ঞানময় কোষ | | |
| (৫) আনন্দময় কোষ | ... | (৩) কারণ-শরীর |
- স্থূলশরীরের শিকড়জাল।

যিনিই বাহা বলুন, আর, যিনিই বাহা লিখুন—স্নায়ুশব্দের অর্থ Nerve নহে; স্নায়ু-শব্দে বুঝায় আর-কিছু না—একপ্রকার অস্থি-বন্ধনী রজ্জু (সুশ্রুত দেখ)। Sinew শব্দেও তাহাই বুঝায়। কলিকাতা যখন Calcutta হইতে পারিয়াছে, হৃৎ Heart হইতে পারিয়াছে, নাসা Nose হইতে পারিয়াছে, সংস্কৃতের স্নেহ যখন প্রাকৃতের সিনেহ হইতে পারিয়াছে, তখন স্নায়ু যে Sinew হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই—বরং তাহা না হওয়াই আশ্চর্য্য। এই গেল একটা কথা; আর-একটা কথা এই যে, নাড়ীশব্দের অর্থ শুধুই যে নাড়িভূঁড়ি, তাহা নহে; নাড়ী-শব্দের অর্থ—নল। নাড়ী এবং নালীর মধ্যে “ডলরোরভেদঃ”। দেশের মধ্যে যেমন নদী, নালা, খাল, পুষ্করিণী, ডোবা,

কুল প্রভৃতি জগৎর নানাবিধ, দেখে
মধ্যে তেমনি নাড়ী নানাবিধ। নিরে
বেধ :-

Blood vessel রক্তবহা { ধমনী Artery
নাড়ী { শিরা Vein

Lymphatic vessel মেদোবহা নাড়ী

Lungs (ফুসফুস) নাদবহা নাড়ী

Intestine মলবহা নাড়ী

ইত্যাদি।

তা খেন হইল—পরন্ত Nerve-এরও তো
একটা প্রতিশব্দ চাই; তাহার উপায় কি
করিলে? Sinew'র বাঙলা নাম বলিতেছ
স্নায়ু; Nerve-এর বাঙলা নাম তবে কি?
ডাক্তারি-বিজ্ঞা অতি অল্পই যাহা আমার
জানা আছে, তাহা না জানারই মধ্যে; তবে
কিনা “কর্ণধা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ”—জিজ্ঞাসিত
প্রশ্নের একটা সমুচিত মীমাংসা আণ্ড
প্রয়োজনীয়—তাহা না করিলে নয়; কাজেই
তাহা আমাকর্তৃক যতদূর সম্ভাবনীয়, তাহার
চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা আমার পক্ষে উচিত হয়
না; অতএব চেষ্টাচুষ্টি করিয়া দেখা
বা'ক্ :-

আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি আণব
(Molecular) গতিক্রিয়াসকলের পরস্পরের
মধ্যে প্রভেদ কিপ্রকার, তাহা যদি
জিজ্ঞাসা কর, তবে বিজ্ঞান তাহার উত্তর
জা'ন এই যে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা'র
পরস্পরের প্রভেদ যেমন বায়বীয় কল্পনের
প্রকারভেদ মাত্র, তেমনি আলোক, উত্তাপ,
তড়িৎ প্রভৃতি আণব (Molecular) গতি-
ক্রিয়াসকলের পরস্পরের প্রভেদ ঐধরীর
কল্পনক্রিয়ার প্রকারভেদ বই আর-কিছুই

নহে। তবেই হইতেছে যে, আলোক, উত্তাপ,
তড়িৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আণব (Molecular)
গতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন তালের নৃত্যলীলা।
নৃত্য করে যে, সে কে? নৃত্য করে ঐধর!
সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা'র সাধারণ নাম
নাদ, তাহা কাহারো অবদিত নাই; আলোক-
উত্তাপাদি'র তেমন-তরো কোনো-একটা
সাধারণ নাম কি নাই? অবশ্যই আছে।
আমি বলিতেছি তেজ। বিলাতি বীণাযন্ত্রের
এক সপ্তকের মধ্যে যেমন সাত সুরের সাত
দাঁত পংক্তি-সাজানো রহিয়াছে—প্রজলিত
অগ্নির তেজের মধ্যে তেমনি আলোক,
উত্তাপ, তড়িৎ (এবং আর যদি কিছু থাকে,
তাহাও) সারি-সারি পংক্তি-সাজানো রহি-
য়াছে—এটা খুব আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য!
বিজ্ঞান তাহা চক্ষে দেখিয়াছে। ময়ূর-
পক্ষীর পাখা-বিস্তারের জায় তেজ যখন
ছটা বিস্তার করে, তখন তাহার মধ্যে
আলোকাদি আণবী গতিক্রিয়াদের কে কোথায়
লুকাইয়া আছে, তাহা বিজ্ঞানের মর্শ্বভেদী
অনুসন্ধানচক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তবেই
হইতেছে যে, তেজ বলিলে আলোক, উত্তাপ
এবং আর-আর যতপ্রকার আণবী গতি-
ক্রিয়া আছে, সবই একসঙ্গে বুঝাইয়া যায়।
তেজ হ'লে একপ্রকার-নৃত্য; নর্তক হ'ছেন
ঐধর। তেজোরূপিণী শক্তিক্ষুণ্ডির মধ্যে
বস্তু যাহা, তাহা ঐধর। “তেজের আধার-
বস্তু” এই অর্থে ঐধরকে আমি বলিতেছি
তৈজস পদার্থ। Nerve-এর খোলসের
ভিতরে একটা-কি লুকাইয়া আছে, তাহা
বুঝিতেই পারা যাইতেছে; কিন্তু কে যে সে
লুকাইয়া আছে—তাহা যে বস্তু কি, তাহার

সটীক* সমাচার বিজ্ঞানের লেখনী দিয়া এখনো বাহির হয় নাই; তাহা না হো'ক—কিন্তু এটা স্থির যে, Nerve একপ্রকার সূক্ষ্ম নাড়ী বা নালী; আর সেই সূক্ষ্ম নালী-পথের মধ্য দিয়া আলোকাদি আগব (Molecular) কম্পনক্রিয়াসকল যাতায়াত করে। খুব সম্ভব যে, Nerve-এর সূক্ষ্মনালীর অন্তরালে ঈথর বা ঈথর অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর আর-কোনো তৈজস পদার্থ ঘাটি মারিয়া লুকাইয়া আছে; আর সেই তৈজস প্রহরীই অভ্যাগত আলোকাদিকে শরীর-মন্দিরের তেতালা-মহলে সঞ্চে করিয়া লইয়া গিয়া চেতনার সহিত আধাসাক্ষাৎ করাইয়া ছায়। এই সকল বিবেচনার বশবর্তী হইয়া আপাতত এখনকার মতো Nerve-এর আমি নাম দিলাম তৈজস-নাড়ী।

দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞানে (Physiologyতে) দুই শ্রেণীর তৈজস-নাড়ীর উল্লেখ আছে। এক শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী হ'চ্ছে অগ্রমস্তিকভবা মেরুপথগা + (cerebro-spinal) তৈজস-নাড়ী, আর-এক শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী হ'চ্ছে মর্শ্ভবা ‡ (sympathetic) তৈজস-নাড়ী। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে “অগ্রমস্তিকভবা মেরুপথগা” জায়গা জুড়িয়া বসিলে, ছোটো-খাটো কথাগুলির নড়ন-চড়নের ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাই তাহার অর্থের গুরুভার “বরিষ্ঠা” এই ক্ষুদ্র বিশেষণটির স্বকের উপর দিয়া জোশো করিয়া ঢালাইয়া দেওয়া প্রেয়

বোধ করিতেছি। “বরিষ্ঠা” অর্থাৎ প্রধান-পদবীহা। এই যে দুই শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী—বরিষ্ঠা এবং মর্শ্ভবা, উভয়েই দুই দুই অবাস্তর শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) Afferent কেন্দ্রমুখী, (২) Efferent বহির্মুখী। কেন্দ্রমুখী তৈজস-নাড়ীর কার্য হ'চ্ছে বার্তা-বহন, বহির্মুখী তৈজস-নাড়ীর কার্য হ'চ্ছে আজ্ঞাবহন। বুদ্ধির সমীপে বার্তাবহন করে বরিষ্ঠা cerebro-spinal কেন্দ্রমুখী, প্রাণের সমীপে বার্তাবহন করে মর্শ্ভবা sympathetic কেন্দ্রমুখী। তেমনি আবার, ইচ্ছার বা মনের আজ্ঞাবহন করে বরিষ্ঠা বহির্মুখী; প্রাণের আজ্ঞাবহন করে মর্শ্ভবা বহির্মুখী। বরিষ্ঠা কেন্দ্রমুখীরা বুদ্ধির সমীপে বার্তাবহন করিয়া বুদ্ধিকে চেতিত করে অর্থাৎ চেয়ায়, তাই বরিষ্ঠা কেন্দ্রমুখীর নাম দিতেছি চেতোবহা তৈজস-নাড়ী (Sensory)। বরিষ্ঠা বহির্মুখীরা ইচ্ছার বা মনের আজ্ঞাবহন করিয়া ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে কার্য্যায়ত্ত্ব করে, তাই বরিষ্ঠা বহির্মুখীর নাম দিতেছি কর্ম্মবহা তৈজস-নাড়ী (ইচ্ছাধীন Motor)। ইচ্ছাধীন (Voluntary) কর্ম্মকেই আমি এখানে কর্ম্ম বলিতেছি, এটা যেন মনে থাকে। পক্ষান্তরে, মর্শ্ভবা sympathetic কেন্দ্রমুখীরা প্রাণের সমীপে বার্তা-বহন করিবার মধ্যে করে শুধু দ্বারে আঘাত; কিন্তু সে আঘাতে প্রাণের ঘুম ভাঙে না, যেহেতু প্রাণ মনোবুদ্ধির ছায় চেতনাস্বিকা অন্তঃকরণবৃত্তি নহে। এইজন্য মর্শ্ভবা বুঝা ভার। সটীক-পথে বুঝার—টীকাসহকৃত অর্থাৎ

* অনেক লেখেন সটিক। সটিক-পথের অর্থ স্বর্গের পরিহার।

† অর্থাৎ মেরুপথগাতি।

‡ স্বর্গীয় শরীরের বিশেষ বিবিধ মর্শ্ভবান হইতে প্রসূত।

sympathetic কেন্দ্রমুখী তৈজস-নাড়ীকে আমি চেতাবহা না বলিয়া বলিতে চাই ঘাতবহা। ঘাত-শব্দের অর্থ এখানে প্রাণে আঘাত; তবে কিনা অব্যক্ত রকমের আঘাত—বেদনার সহিত তাহার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই। আহার্যাজবোর সংস্পর্শমাত্রে জিহবার তাহা অর্থাৎ প্রাণতন্ত্রীতে এক-প্রকার সূক্ষ্মরকমের আঘাত পড়ে, আর তাহারই প্রতিঘাতে বা তাড়সে জিহ্বাতে রসের উদ্রেক হয়। আঘাত সংক্রামণ করে মর্ষভবা কেন্দ্রমুখী, প্রতিঘাত বহন করে মর্ষভবা বহিমুখী। প্রাণ-মহলের এই যে আঘাত-প্রতিঘাত, তাহার বিশেষ এই যে, সে আঘাত বেদনাত্মক নহে, অথচ যেন বেদনাত্মক; সে প্রতিঘাত ইচ্ছাধীন নহে, অথচ যেন ইচ্ছাধীন। পূর্বেকার এক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে—যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের তলে-তলে একান্তভাবে রহিয়াছে, আর, সেইগতিকে পরস্পরের গায়ে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়। প্রাণেতে বুদ্ধির ছায়া পড়াতে ফল হয় এই যে, মর্ষভবা কেন্দ্রমুখীর পথ দিয়া প্রাণেতে আঘাত বাহ্য পৌছে—তাহা চেতনাত্মক না হইলেও চেতনা'র তান বা নাট্যাভিনয় করিতে ছাড়ে না। “তেননি আবার, প্রাণেতে মনের ছায়া পড়াতে তাহার ফল হয় এই যে, মর্ষভবা বহিমুখীর পথ দিয়া প্রতিঘাত যাহা বাহির হয়, তাহা ইচ্ছাধীন না হইলেও ইচ্ছার তান করিতে ছাড়ে না। প্রাণতন্ত্রীতে আঘাত পড়িলে বহিমুখীর পথ দিয়া প্রতিঘাত বাহ্য বাহির হয়, তাহাকে কর্তব্য বলিতে পারা যায় না এইজন্য—

যেহেতু তাহা কর্তার ইচ্ছাধীন নহে। তাই মর্ষভবা (sympathetic) বহিমুখী তৈজস-নাড়ীকে আমি কর্তব্যবহা না বলিয়া বলিতে চাই প্রতিঘাতবহা। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, মর্ষভবা (sympathetic) তৈজস-নাড়ী-মহলের ঘাতপ্রতিঘাতবহা নাড়ী-যুগল মানিকজোড়ের জ্ঞায় একরূপ একাধারে ঘাসাবেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে যে, কেন্দ্রমুখীর পথ দিয়া আঘাত সংক্রমিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বহিমুখীর পথ দিয়া তাহার প্রতিঘাত বাহির হয়—প্রতিঘাত বাহির হইতে একমুহূর্তও বিলম্ব হয় না। ফলে, প্রাণমহলের ঘাতপ্রতিঘাত একই ক্রিয়াচক্রের দুই অর্ধাঙ্গ। নিশ্বাসের আকর্ষণ এবং প্রশ্বাসের বিসর্জন, এ দুই ক্রিয়াকে আমরা যেমন একসঙ্গে জড়াইয়া মোটের উপর বলি শ্বাসক্রিয়া, তেমনি মর্ষভবা তৈজস-নাড়ী-মহলের কেন্দ্রমুখীদের ঘাতবাহিতা এবং বহিমুখীদের প্রতিঘাতবাহিতা, এ দুই ব্যাপারকে একসঙ্গে জড়াইয়া মোটের উপর বলা বাহিতে পারে মর্ষবাহিতা। বলিবও আমি তাই। “মর্ষভবা তৈজস-নাড়ী ঘাতপ্রতিঘাতবহা”, এই অর্থে মর্ষভবা তৈজস-নাড়ীকে বলিব মর্ষবহা নাড়ী। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলা হইল, তাহাতে তৈজস-নাড়ীর নিরলিখিত শ্রেণীবিভাগের সৌন্দর্য্যত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ভরসা করি পাঠক-বর্গের বিশেষ কোনো বাধা ঠেকিবে না—

তৈজস-নাড়ী	{	চেতাবহা (Sensory)
Nerve		কর্তব্যবহা (ইচ্ছাধীন Motor)
		মর্ষবহা (Sympathetic)

স্বক্ষমশরীর ।

স্থূলশরীরের সহিত স্বক্ষশরীরের মিল রহিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য; কেন না তাহা থাকিবারই কথা । মিল আছে, তাহা সকলেই জানে; কিন্তু “মিল আছে” জানিয়া, বসিয়া থাকিলে চলিবে না; মিলকোন্থানে কিরূপ, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করা চাই । আমরা দেখিতেছি মিল আপাদ-মস্তক খাপে-খাপে । এইমাত্র আমরা দেখিলাম যে, স্থূলশরীরের মূলপ্রদেগে শিকড় জাঁদিয়া রহিয়াছে (১) চেতাবহা, (২) কর্মবহা, (৩) মর্মবহা, এই তিন শ্রেণীর তৈঙ্গস-নাড়ী । ঐ তিন শ্রেণীর নাড়ীর মধ্য দিয়া তিনপ্রকার শক্তি স্ব স্ব গন্তব্যপথে পদসংক্রমণ করে; চেতাবহা'র মধ্য দিয়া পদসংক্রমণ করে দীশক্তি, কর্মবহা'র মধ্য দিয়া ইচ্ছাশক্তি, মর্মবহা'র মধ্য দিয়া জীবনী শক্তি । ঐ তিনপ্রকার শক্তির কর্মস্থান হ'ছে দশেন্দ্রিয়; বাসস্থান হ'ছে বুদ্ধি, মন, প্রাণ । দশেন্দ্রিয় বসিতে দশেন্দ্রিয়ের স্থূল আবরণ বুঝিলে চলিবে না—চক্ষুঃকর্ণাদি বুঝিলে চলিবে না । এটা দেখা চাই যে, দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎকালেও যেমন, স্বপ্নকালেও তেমন, দুই কালেই স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত হয়; আর সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির কপাট জাগ্রৎকালেই খোলা থাকে; স্বপ্নকালে বন্ধ থাকে । এখন কথা হ'ছে এই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির কপাট খোলা থাক্ বা না থাক্—এটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উভয় অবস্থাতেই শ্রবণকার্য শ্রবণেন্দ্রিয়েরই কার্য, দর্শনকার্য দর্শনেন্দ্রিয়েরই কার্য । ফল কথা এই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি কেবল দর্শন-

শ্রবণাদির স্থূল আবরণ, তা'রই তাহার। সাক্ষাৎ দর্শনশ্রবণাদি নহে । দর্শনশ্রবণাদি হ'ছে তলোয়ার, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি হ'ছে খাপ । ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই (শাস্ত্রেও লেখে তাই) যে, দশেন্দ্রিয় স্বক্ষশরীরেরই অঙ্গ—তবে কিনা বহিরঙ্গ; অন্তরঙ্গ হ'ছে প্রাণ, মন, বুদ্ধি; আর, হৃয়ের মধ্যবর্তী বন্ধনরজ্জু হ'ছে জীবনী শক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং দীশক্তি । স্বক্ষশরীরের বহিরঙ্গের এ-মুড়া হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যন্ত জ্ঞানপরিফুটনের কেমন যে সূচারু সোপানব্যবস্থা, তাহার একটা নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই স্বক্ষশরীরের কলকারখানার কার্যনির্বাহপদ্ধতির অনেকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে ।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য হ'ছে দ্যাখা । কিন্তু মহুয়ের দ্যাখা একরকমের ঝাখা; অপরাপর জন্তুদিগের ঝাখা আরেক রকমের ঝাখা; দুই রকমের এই দুই ঝাখার মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট । বহুরূপিনামক জন্তুর অষ্টগ্রহর অমনস্বভাবে চক্ষুরান্নলন করিয়া চাহিয়া থাকে, কিন্তু ঝাখে যে কি, তাহা তাহারাই জানে । নিদ্রিত ব্যক্তির নেত্র দৈবক্রমে অকৌশলিত হইলে তাহা যেমন পলকশূন্য অচল-ভাবে চাহিয়া থাকে মাত্র—বহুরূপীদের পলকশূন্য চক্ষের ঝাখা অনেকটা সেই রকমের ঝাখা । বহুরূপী জন্তুর চক্ষের চাহনি'র ভাব দেখিলে এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার নিকটে সম্মুখস্থিত দৃশ্যের কোনো ধবরই নাই । শিকারাবেধী ব্যাঘ্রের ঝাখা আবার আর-একরকম । শিকারাবেধী ব্যাঘ্র যখন

সম্মুখস্থিত যুগের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহার ভাষা লোভে এবং ক্রোধে দিগ্বিদিক-পূর্ণ হইয়া উঠে। ব্যাক্ত্রী আবার যখন শাবকের গাত্রলেহন করে, তখন তাহার ভাষা মেহমমতার গলিয়া পড়িতে থাকে। ও তিন-রকমের ভাষা'র কোনোটা'রই সঙ্গে মহুষ্যের ভাষার মিল থাকে না। মহুষ্যের ভাষা প্রবুদ্ধরকমের ভাষা—সে ভাষা'র উপরে মূঢ়তা-মত্ততা এবং বিকল্পের অধিকার কম, বুদ্ধির অধিকার বেশী। সে ভাষা'র কর্মক্ষেত্রে প্রাণমনকে নীচে দাবিয়া-রাখিয়া বুদ্ধি আপন'নার উচ্চ পদবীতে ভর দিয়া দাঁড়ায়। মনে কর, রাজি আগতপ্রায়—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—এমন সময়ে দেবদত্তনামক জনৈক পথিক মাঠের মাঝখানে দিয়া চলিতে চলিতে অনতিদূরে নিবিড় বট-অশ্বথের আড়ালে চাহিয়া দেখিল—প্রদীপ জলিতেছে। সেই প্রদীপের রশ্মিছটা দেবদত্তের চক্ষুর ভিতরে তৈজসী কম্পনক্রিয়া উৎপাদন করিল। তৈজসী কম্পনক্রিয়া চলিতে লাগিল প্রাণে। প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের দ্বারে ঘনঘন আঘাত পড়িতে লাগিল। প্রাণের ডাক শুনিয়া মন দৌড়িয়া আসিল। প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের সংযোগ হইবামাত্র প্রাণমনের সম্মিলন-ক্ষেত্রে আলোকদর্শনরূপিণী চেতনা (sensation) উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রেলগাড়ির অহরী যেমন নিশান ঘুরাইয়া বাষ্পধ্বীকে (এঞ্জিন-চালককে) গাড়ী চালাইতে সঙ্কেত করে, চেতনা'র উদ্ভাসন তেমনি-তরো একপ্রকার নিশান-ঘুরানো। তদ্বদ্বৈ বুদ্ধির এইরূপ জ্ঞান হয় যে, দৃশ্যমান অব-

তাসের (phenomenonএর) মধ্যে বস্তু একটা-কিছু আছে। “একটা কিছু আছে” এটা হ'চ্ছে সামান্য জ্ঞান। “সে বস্তু না জানি কি?” এইটি হ'চ্ছে বিশেষের জিজ্ঞাসা। “দেখি রোসো ভাবিয়া;—মাঠের চরমসীমার গাছপালার ঘেরা গ্রাম থাকিবারই কথা; গ্রামের প্রান্তভাগে চাসাদের বাসস্থান অবশ্যই আছে!” ইহার নাম ভাবনা। “বুঝিয়াছি—কোনো চাসা'র কুটীরে প্রদীপ জলিতেছে, তাহারই আলো গাছপালার ফাঁকের মধ্য দিয়া ছটুকিয়া বাহির হইতেছে।” ইহার নাম বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। চেতনার সঙ্কেত শিরোধার্য করিয়া বুদ্ধি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার্তে হইল বাহা, তাহা এই :—

(১) বুদ্ধির এপারে দেখা দিল—“বস্তু একটা আছে” এই সামান্য জ্ঞান।

(২) ওপারে দেখা দিল—“চাসার কুটীরে প্রদীপ জলিতেছে” এই বিশেষ জ্ঞান।

(৩) হুই পারের মাঝখানে দেখা দিল—ভাবনা-ক্রিয়া বা ধীশক্তির পরিচালনা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, “একটা কোনো বস্তু আছে” এইপ্রকার সামান্যজ্ঞানের দ্বার দিয়া আমরা আত্মসত্তা উপলব্ধি করি এবং “ঐ খানটিতে প্রদীপ জলিতেছে” এইপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের দ্বার দিয়া আমরা বস্তুসত্তা উপলব্ধি করি। শেষের এই কথাটি অতীব একটি গুরুতর কথা; উহার আত্মোপাস্ত রীতিমত পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। এইজন্য উহার পর্যালোচনাকার্য আগাম-বারের জন্য হাতে রাখিয়া দেওয়া হইল।

ঐচ্ছিকেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

শান্তিলতা ।—উপভাস । ক্রীউমেশচন্দ্র
ওগু প্রণীত । মূল্য ১/ এক টাকা ।

যিনি কেবল গল্পের হিসাবে পড়িবেন,
তাহাকে এই উপভাসখানি পড়িতে মন্দ
লাগিবে না । তাহার কারণ এই যে, ইহাতে
বর্ণিত ঘটনাবলী কৌতূহলোদ্দীপক এবং
তাহার পারস্পর্য্য সুবিস্তৃত । যদি পূর্ববঙ্গের
বাক্যব্যবহারপ্রণালীর পরিচয়হলগুলি—বড়
অল্প নহে—ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে
বলিতে পারা যায় যে, রচনা মোটের
উপর সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । সুতরাং
উপর-উপর পড়িয়া যাইতে কোন আয়াস
লাগে না । কিন্তু যিনি ভিতরে প্রবেশ
করিয়া চরিত্রচিত্রের বা সাহিত্যিক নিপুণতার
অনুসন্ধান করিবেন, অনেক ত্রুটি ও দোষ
তাহার চক্ষে পড়িবে ।

এই প্রায় ছইশত পাতার উপভাসে,
চরিত্র কেবল একটিমাত্র—সে গ্রন্থকার
স্বয়ং । অনেকগুলি স্ত্রী ও পুরুষের নাম
আছে বটে ; কিন্তু কেবল নামই আছে—
পৃথক পৃথক মানুষ নাই । উপভাসের নর-
নারীগুলি যে-ই যাহা বলিয়াছে ও করিয়াছে,
সে সকলই গ্রন্থকারের নিজের কথা ও
কার্য্য । উমেশবাবু বোধ হয় কথাবার্ত্তায়
এবং লেখার সংস্কৃতবচনের বুক্‌নি দিতে
কিছু অতিরিক্ত ভালবাসেন । সেইজন্যই
বোধ করি দেখিতে পাই যে, এই উপভাসের
স্রীপুরুষগুলি বখন-তখন, যেখানে-সেখানে,
বার-বার কাছে, সংস্কৃত ঝাড়িবার লোভ

সংবরণ করিতে পারে নাই । সংস্কৃত জানা
বাঁহার সম্ভব নহে, সে-ও সংস্কৃতবাক্যের
টুকরা ব্যবহার করিতে ছাড়ে না । সুরেশ-
বাবু তাহার কুড়িরে-পাওয়া মেয়েটিকে
জগদম্বা-গোয়ালিনীর হাতে সমর্পণ করিবার
সময় বলিয়া দিতে ভুলেন না যে—

“যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংহিতা ।”

ধনবানের দোষ কেহ ধরে না, এই কথা
গোয়ালিনীকে বুঝাইতে গিয়া বলেন—

“ব্রহ্মহাপি নরঃ পুংস্যো যন্তান্তি বিপুলং ধনং ।”

ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে আসিয়া সাংখ্য-
দর্শন ঝাড়ে—

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ ।”

নন্দদা ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়াছে ; সুতরাং
আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও বাইবেলে লিখিত
সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা প্রতিপাদন করিবার
অধিকার ত তাহার জন্মিয়াছেই, তদ্ব্যতীত
পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বয়ংবরা হইবার অধি-
কারও জন্মিয়াছে । অতএব নন্দদা তাহার
প্রাইভেট টিউটর নটবরবাবুকে রাজি সাড়ে
দশটার সময় অতি সংগোপনে নিজের
কামরায় ডাকাইয়া আনিয়া এবং বিবাহের
দ্রব্য চাপিয়া ধরিল । অস্ত্রাস্ত্র যুক্তিতর্কের
পর বলিল—“যিনি আমার এ হৃদয়রাজ্যের
রাজা হইবেন, তাহাকে আপনিই দেখিয়া-
তিনিয়া অভিষিক্ত করিব । আমার সবচে
তুমিই ‘সর্বদেবময়ো হরিঃ’ ।” আরও বলিল,
“বোহসি বোহসি নমোহস্ত তে”—অর্থাৎ
আমি তোমারি ; আর কাহারও হইব না ।

বাহার নামে এই উপন্যাসের নাম, এবং “মহু, গীতা, ভাগবত ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্র বাহার জিহ্বাগ্রলব্ধ,” সেই শান্তিলতা তাহার সংস্কৃতে এম্-এ-পাস্-করা স্বামীকে- বলিতেছে—“অবশ্য ‘পুরুষ কখনও মানুষ নয়’ তা আমি জানি, কিন্তু সকল মানুষ হৃদয়শূন্য হয়, ইহাও প্রকৃতির লক্ষণ নহে, কেন না—‘মৌক্তিক্যঃ ন গজে গজে’।” উমেশ-বাবু নিজে অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী; তাহার অভিমত—‘গুণই জাত, জাত আর জাত নয়।’ অতএব শিরোমণিঠাকুরের বিবাহ পত্নী, শূদ্রকন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিতে অনায়াসে সম্মত হইলেন। কি সঙ্গত, কি অসঙ্গত, সে বিষয়ে গ্রন্থকারের সাহিত্যবুদ্ধি বড় সজাগ নহে।

সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সুসংস্কৃত হইয়া বাহাতে অধঃপতিত হিন্দুজাতির পুনরুত্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই উপন্যাসখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু সে উদ্দেশ্য উপন্যাস লিখিয়া সিদ্ধ হইবে কি?

কলিনা। — পার্শ্বতীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস।
শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি. এ. বি. এল. প্রণীত।
মূল্য ১/০ দুই আনা।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের মূল কল্পনাটি বড়ই সুন্দর, কিন্তু তাহা বিকাশের অবকাশ পায় নাই। গল্পটি নিত্যস্তু ক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে, পড়িয়া কাহারও তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তবে ইহার তাৎপর্য্য সকলেরই মনে করিয়া রাখা উচিত। তাহা এই যে, যে স্থলে অবস্থাগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, সে স্থলে প্রেমসংঘটন সুখের বা মঙ্গলের হয় না—যে ক্ষুদ্র, সে শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়; যে মহৎ, সে মর্মান্তিক দুঃখের নিদারুণ ভার বুকে করিয়া বহন করিতে থাকে। এই অতি-ক্ষুদ্র গল্পটি পড়িয়া টেনিসনের ‘Lord Burleigh’ মনে পড়ে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন

সাহিত্যের আদর্শ ।

— ১০৪ —

লর্ড লিটন তাঁহার একখানি উপন্যাসে মানব-
সমাজের একটি ভাবী আদর্শচিত্র আঁকিবার
চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেই-আদর্শসমাজ-
ভুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নানারূপ অপূর্ণ কথাই
তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে সকল লইয়া
এখন আমরা আলোচনা করিতেছি না। তবে
একটি কথা তিনি এই বলিয়াছেন যে, সে দেশে
শেক্সপীয়ারের নাটক ও কবিতা লোকের পাঠ
করে, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিক একটা আনন্দ
ভিন্ন তাহারা আর-কিছু পায় না। আরব্য
উপন্যাসের গল্প পড়িয়া প্রবীণ ব্যক্তির
পক্ষে যে আনন্দলাভ সম্ভব, তদতিরিক্ত
আনন্দ শেক্সপীয়ার হইতে তাহারা পায় না।
ইহার অর্থ এই যে, যে সকল প্রমত্ত বাস-
নায় পড়িয়া আমরা আকুলি-বাকুলি করি,
শেক্সপীয়ারের মধ্যে এখন তাহাদের ভাষা
পাই, এইজন্তই তাহাকে আমরা এখন এত
পছন্দ করি; কিন্তু এমন একদিন উপস্থিত
হইতে পারে, যখন মানুষ বাসনানলে
সেইরূপ দগ্ধ হইবে না,—তখন শুধু গল্পপাঠের
যে আনন্দ, শেক্সপীয়ার তাহাই দিয়া ক্ষান্ত
থাকিবে। এখন আমরা ঋটিকার মধ্যে পড়িয়া

আছি, সুতরাং নরজীবনের কুটিল আবর্তের
কথার মধ্যে আপনাদের প্রাণের বেদনার
প্রতিধ্বনি পাইয়া সোৎসাহে প্রশংসা করি ;
কিন্তু যখন তরাকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ, লোভ, স্পর্ধা
প্রভৃতি নানবাস্তবঃকরণ হইতে চিরবিদায় লইবে
কিংবা সংপ্রবৃত্তির তেজে তাহার এক নিভৃত
কোণে গিয়া পড়িবে, তখন আমরা শেক্সপীয়ার-
সৃষ্ট জগৎকে আমাদের পরিচিত বলিয়া স্বীকার
করিলেও, তাহাকে আত্মীয় জগৎ বলিয়া
স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইব না। দৈত্যপুত্রী
দৃশ্যাবলী, দৈত্যগণের প্রভূত আশ্রয় ও বিক্রমের
কথা পড়িয়া আমরা যেরূপ ক্ষণকালের কোতু-
হল চরিতার্থ করিয়া আরব্যোপন্যাসখানি
ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখি, উহাকে
জীবনযাত্রার সহচর করিতে ইচ্ছা হয় না—
শেক্সপীয়ার এবং তাঁহার সমশ্রেণীর কবিবৃন্দও
এক সময়ে সেইরূপ হইয়া পড়িবেন, উহা-
দিগকে আমরা অন্তরঙ্গ ভাবিতে ভুলিয়া
যাইব।

যুরোপের সে দিন কবে আসিবে, তাহা জানি
না; কিন্তু আমাদের সে দিন আসিয়াছে
কিংবা আসিতে বিলম্ব নাই। আমাদের

কলেজে পড়িবার সময় ছাত্রমণ্ডলীর নিকট শেক্স্পায়রের কি দুর্নিবার প্রতাপ ছিল—বাস্তবিক-কালিদাস প্রভৃতিকে উড়াইয়া-দিয়া শেক্স্পায়রকে সাহিত্যজগতের মুকুটমধ্যমণি করিয়া রাখিতাম; কিন্তু এখন তাঁহার প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় পূজার ভাব বিচ্যুত না হইলেও মন যেন ক্রমশই হিন্দু আদর্শের সৌন্দর্য্যে বেশী আকৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল কবিতা ও নাটকে আর পূর্বলব্ধ আনন্দ ও আশ্রয় পাই না। মনে হয়, পাশ্চাত্য জগতের মন বড় কঠোর,—উহাতে নিয়ত স্পর্শা, জয়া-কাজ্জা ও অহঙ্কারবুদ্ধি একটা কঠিন ও হর্ভেজ আবরণ রচনা করিয়া রাখিয়াছে; নাটক ও কবিতা হইতে উহা শেলের মত তীক্ষ্ণাগ্র এমন একটা অস্ত্র চায়, যাহা হৃদয়ের কর্কশ বাহু ঝুট্টাকে ছেদন করিয়া তীব্র আঘাত সহ-কারে অন্তর্নিহিত রসের উৎসটা আবিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে। ভীষণ সংবর্ষ, তীব্র বাক্য, আলাময় ও হৃদয়ভেদী বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি তাহাদের হৃদয়ের করুণা জাগাইতে সমর্থ—স্বতরাং তাহাদের কবিতা ও নাটক ও কবিতায় নিরবধি সেইরূপ সামগ্রীই দিতেছেন। ইষ্টা-দের কবিতা হুঃখকে মূর্তিমান করিয়া উহার হস্তে অন্তর্দাহের প্রজলিত মশাল দিয়া বরণ করিয়া আনে,—তবে যদি একটুকু কারুণ্য জন্মে। শুধু করুণা জাগাইবার জন্ত, মনকে দ্রব করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা হুঃখের চিত্র আনিয়া উপস্থিত করেন। যে অন্তঃকরণে বেদনাবোধ লুপ্ত হইয়াছে, সেই অন্তঃকরণে বেদনা জাগাইবার জন্ত বিষপ্রক্রিয়ার জ্বালা ইহারা উৎকট হুঃখের চিত্র খুঁজিয়া বেড়ান।

আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত। অহঙ্কার, স্পর্শা প্রভৃতি রাজসিক বৃত্তি অপেক্ষা আনাদের প্রাচীন কবিগণ সাত্বিকগুণের মহিমা অধিক বুঝিয়াছিলেন। আমাদের দেশের লোকহৃদয় স্বভাবতই গার্হস্থ্যধর্মে দীক্ষিত—সংযম ও আত্মসংবরণে দক্ষ, শীলতা-প্রিয় এবং অতিশয় কোমল। এই কোমলতা এত বেশী যে, ইহাতে জীবনে আমাদেরগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ছেলের জন্ত, স্ত্রীর জন্ত, ভাই-ভগিনীর জন্ত আমাদের স্নেহাঙ্ক হৃদয়ে এত বাধা যে, জীবনসংগ্রামের পক্ষে আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি;—এই স্নেহভারা-ক্রান্ত হৃদয় শোক ও মমতায় একান্ত পীড়িত হইয়া যে ঔষধ খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাহার নাম নান্দ্যবাদ। সংসারের মমতাগুলি স্নিগ্ধ-লতার হায় আমাদের পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, আমাদের নড়িবার সাধ্য নাই, তাই আমাদের সম্বন্ধা বলিতে হয়—দারাপুত্র কেউ কিছু নয়। এই সতকতার দ্বারা আমরা পায়ের নিগড় ছিঁড়িতে চাই—আমাদের কোমল হৃদয়ে বলসঞ্চারের প্রয়াস পাই। আমরা ব্যথিত, এইজন্ত ব্যথাকে বড় ভয় করি। সংসারে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা অন্তত হটলে আমরা জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-ফল ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতির কল্পনা করিয়া মনকে আপাদ দিষ্ট,—ঈশ্বরের বিধান সর্ব্বত্রই শুভ। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়কেই কবি চক্ষের সম্মুখে পরিষ্কৃত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সেখানে কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল এবং বর্ণিত চরিত্রসকলের সমস্ত স্বস্বভাব আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে—সেখানে অন্ততপরিসমাপ্তি আমাদের

হৃদয়ে ধর্মবিশ্বাসের তন্ত্রীটার উপর সজোরে আঘাত দেয়। এইজন্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিয়োগান্ত-পরিণতাপ্তির এত প্রতি-কূলে। যে হৃৎ, স্থপির শুভবিধান প্রতিপন্ন না করে, সেই হৃৎকে আমরা বড় ভয় করি, তাহা আমাদের অন্তরাত্মা কখনই সহ্য করিতে চায় না।

যুরোপে গার্হস্থ্যম্বেহ আমাদের দেশের ছায় বিকাশ পায় নাই। ছেলেটি, হইলে সেখানকার লোক তাহাকে অপরের ক্রোড় কিংবা বোড়িং-গৃহ রাখিয়া নিশ্চিত হয়; স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক নালিশ করিয়া ছেদন করে; পিতা বয়ঃ-প্রাপ্ত পুত্রের ভার বহন করেন না; পুত্রের গৃহে পিতা আদিয়া আহার করিলে তাঁহাকে বিল-শোধ করিয়া যাইতে হয়; পুত্রকে জাপানে কিংবা পোপকেটেপেটলে পাঠাইতে তাহাদের হুঁচকানার লেশমাত্র হয় না। চুরা-কাঙ্ক্ষা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিলে তাহারা গৃহের ভাবনা একেবারে ভুলিয়া যায়। তাহারা যে পরিমাণে আত্মনির্ভরপরায়ণ, সেই পরিমাণে মেহকে হৃদয় হইতে দূরে রাখে; স্ত্রীর তাহাদের হৃদয়ে কোমলতা জাগাইবার জন্ত তীক্ষ্ণদার ছুরিকার প্রয়োগ ন। হৃৎকে অতিনাত্রার ফলাইয়া তাহারা একটু বেগনাবোধ করিতে চাহে; আমরা যাহাতে শিহরিয়া উঠি, তাহারা তাহাতে অল্পই উত্তেজিত হয়—এজন্ত বিয়োগান্ত না হইলে কবিদের সাহিত্যিক চেষ্টা সিক হয় না; গৃহ তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, এইজন্ত গৃহকে তাহারা খাঁটি বলিয়া চিত্রিত করে,—তাহাতে স্বথহৃৎের তীব্রমদিরার আবাদ কল্পনা করে। কিন্তু যাহাকে খাঁটি বলে,

তাহাই প্রকৃতরূপে তাহাদের নিকট মিথ্যা; কারণ উহা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। আর আমরা যাহাকে ‘মায়’ ‘মিথ্যা’ প্রভৃতি আখ্যা দিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা পাই, তাহা আমাদের নিবিড় বন্ধনে জড়ীভূত করিয়া রাখে। আমরা মায় বলিয়া যাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই, খাঁটি বলিয়া তাহা আমাদের ধরিয়া রাখিতে চাহে। হই সমাজের এই শিক্ষা-দীক্ষা—উদয়াস্তের ছায় হই বিরুদ্ধ দিকে।

ইহা ছাড়া আর-একটা কথা আছে। আমাদের সাহিত্য উচ্চনীতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। যে হৃৎ চিত্তকে উন্নত না করিয়া শুধু বেদনা দেয়, শুধু নিষ্ঠুরতা কি বর্ক-রতাকে জীবন্ত করে, তেমন হৃৎ আমাদের সাহিত্যে বর্ণনীয় নহে। উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা আখ্যায়ের চক্ষু-উৎপাতনের চেষ্টা, হাম্লে-টের পিতার নৃশংস হত্যা কিংবা হাম্লে-টের শোকোন্মাদ, এই সকল হৃৎখন্ড ঘটনা কেবল নিষ্ঠুরতা বা বর্করতাকে জাজল্যমান করি-তেছে। শুধু স্বভাব-অন্ধনের নামে উহা মার্জনীয় নহে; পশুজগতে যদি একটা স্বাভাবিক কবিদের উচ্ছ্বাস থাকিত, তবে সেই গাথা মনুষ্যজগতে কাব্য বলিয়া পরি-চিত হইবার স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু যে সকল হৃৎ সংপ্রবৃত্তির উন্মেষ করে—হৃদয়কে মহিমসী শক্তি প্রদান করে, আমা-দের প্রাচীন কবিগণ তাহাই বর্ণনীয় মনে করিয়াছেন। এই হৃৎখণ্ডিত সংসারে নানা-রূপ যন্ত্রণা উৎকটভাবে মনুষ্যসমাজকে নির-ন্তর আক্রমণ করিতেছে—তাহার উপর সাহিত্যে আবার অনর্থক একরাশ হৃৎখণ্ড স্থটি

করিয়া উদ্ভুক্ত কতে লবণপ্রক্ষেপের প্রয়োজন কি ? শুধু বেদনা জাগাইবার জন্ত কতকগুলি ছঃথকে সাহিত্যে বরণ করিয়া আনা—কবিশক্তির অপব্যয় । কিন্তু রামদনবাস, সীতা-বর্জন কিংবা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যবর্ণিত ছঃথ অত্যাধিক । তাহাতে প্রেম কি কর্তব্যবুদ্ধির মূলে জলসেক করিয়া উহাদিগকে পল্লবিত ও মুকুলিত করিয়া তোলে । এই হিতকর ছঃথকে আমাদের কবিগণ বরণ করিয়া লইয়াছেন, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কষ্ট, যুধিষ্ঠির বা ভীষ্মের ত্যাগজনিত ছঃথ—এ সমস্ত এক উন্নত কর্তব্যরাজ্যকে মহিমায়িত করিয়া দেখাইতেছে ; কবিগণ সেই সকল চিত্র সঙ্কল্পে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া আমাদের চক্ষের নিকট উন্মোচন করিতেছেন ।

মনে করুন, হাম্লেট কি ওথেলো নাটক;—ইহাতে কি দেখা যাইতেছে ?—কুটিলতা বা সন্দেহ কিরূপে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পায়—কিংবা শোক কিরূপে ক্ষিপ্ততার 'অভিমুখীন হয়—সেই মানসিক ক্রমটি গোচরীভূত করাই নাটকদ্বয়ের মূখ্য উদ্দেশ্য । অসংখ্য চরিত্রগুলির প্রবৃত্তির পথেই বিকাশ—হুই-একটি স্থলে সংঘর্ষ ও উন্নত কর্তব্যবুদ্ধি বা প্রেমের একটু আভাস পাওয়া যায় মাত্র । কবি এতগুলি ব্যাখ্যার অবতারণ করিয়া মনের উপর একটা কঠোর কর্ণন করিলেন মাত্র, কিন্তু ইহাতে কোন স্বফলের প্রাকসূচনা করিলেন কোথায় ? যখন কেহ ছঃথকে গলাধঃকরণ করিয়া নীলকণ্ঠের সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, তখন সেই ছঃথের ইতিহাস আমাদের গরীয়ান করিয়া তুলিতে পারে ; কিন্তু যখন ইঙ্গিতের প্রশ্নে বা দৈববিধানের

লুপ্ত ছঃথের অবস্থা মানুষকে ধ্বংস, থর্ক বা গিণ্ড করিয়া ফেলে, তখন সে পরিচয়ে আমাদের লাভ কি ? এইজন্ত আমাদের কাব্যসাহিত্যে উচ্চতর কর্তব্য কিংবা প্রেমের আদর্শ সজাগ করিয়া তুলিবার জন্ত যে সকল ছঃথের বর্ণনা আছে—তাহা উৎকট হইলেও মহোষধের তায় অমূল্যচিন্তকে নিরাস্য ও সবল করিয়া তোলে । কোন মহাদৃশ্য ঘোষণা করিবার জন্ত যেরূপ একটা ক্রমচর্চা দীর্ঘাকৃতি ইথিওপ্‌ শুভ্র বিজয়বার্তার নিশান লইয়া অগ্রদূতস্বরূপ সুন্দরসজ্জিত দলবলের পূর্বে উপস্থিত হয়, আমাদের মহাকাব্যের মহাবীরা ঘটনাবলির উচ্চলক্ষ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কবিগণ সেইরূপ ছঃথের বিকটমূর্ত্তি আঁকিয়া থাকেন—কিন্তু তাহার কুণ্ডলে প্রজ্ঞা ও কর্তব্যের দুইটি ইচ্ছার রত্ন জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া তাহার উপস্থিতিকে সাংক্য করিয়া দেয় । আমাদের প্রাচীনকাব্যবর্ণিত ছঃথের কালিনা সন্দেহাই কোন মহালাক্ষ্যের দৃষ্টান্তে চলে ও সেই লক্ষ্য দ্বিগুণতররূপে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়,—ঋধু বিভীষিকার দেখাইবার জন্ত তাহার আগমন হয় না । আনরা প্রবৃত্তি-আকৃষ্ট ছঃথের হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইবার জন্ত সতত আর্হ—নায়াবাদের শরণ লইয়া জালা ভুলিতে চাই, আর তাহারা নিরর্থক সেই ছঃথকে বরণ করিয়া মনে একটু কষ্ট বা বেদনাবোধ ও গার্হস্থ্যদগ্ধের চৈতন্য জন্মাইতে চায় । ইহাতে দেখা যায়, গার্হস্থ্যজীবনের শেষ শিক্ষা আমাদের হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা সেই শিক্ষার জন্ত লালায়িত ।

গার্হস্থ্যজীবনের শিক্ষা যে তাহাদের তেমন সম্পূর্ণতালাভ করে নাই, তাহাদের

শ্রেষ্ঠকবির রচনাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ভাব দৃষ্টান্তহলে লক্ষ্য করা যাক। ছহিহুমেহ আনাদের দেশে কি কল্যাণী কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে! আগমনী-সংবাদেব সঙ্গীতে সারা বঙ্গ ব্যাপিয়া চিরমঞ্চিত অপত্যস্নেহের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কেমন পবিত্র, বেদনাতুর ও সরস! শকুন্তলার আশ্রমভাগ হিন্দুগৃহে কথার স্থানটি কি, তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছে—লতা বেক্রপ একটা কুঞ্জের পাদপগুলিকে জড়াইয়া-ধরিয়া তাহা-দিগকে স্পর্শ করিয়া রাঢ়, সমস্ত গৃহটি সেই-রূপ কথার নানা আদর ও স্নেহকণার আশ্রিত ও স্নানীতল হইয়া থাকে। এই কল্প-স্নেহ শেক্সপীয়রের রচনায় অনেকদূরেই কেমন উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে। ডেমুডেননা সভ্যতলে দাঁড়াইয়া নির্লজ্জভাবে পিতাকে বলিল, “আপনি আমার পিতা, আগনার প্রতি আমার কর্তব্য আছে, কিন্তু এখানে আমার স্থান উপস্থিত। আমার মাতা যেমন তাহার পিতার অপেক্ষা আপনাকে অনেক বেশী ভাল বাসিয়াছেন, ইহাকেও সেই-রূপ আমি আপনার অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে পারি।” অবশ্য তাহাদের সমাজে জীলোকের শীলতার আদর্শ ভিন্নরূপ, কিন্তু পিতাকে ইহার অপেক্ষা একটু বেশী প্রিয়-ভাবণ কি ডেমুডেননার প্রকৃতির আধিক্যের উপযোগী হইত না? অন্তত পিতৃস্নেহের সহিত বাসিন্দার একটা নিদ্রার পরিণাম পিতার মনকে একরূপ গর্ষিতভাবে না করিলে বোধ হয় তাহাদের হিসাবেও শীলতার চিত্র উৎকৃষ্ট হইত! কর্ডেলিয়া ভয়ীগণের অতিরঞ্জিত স্নেহপ্রকাশে বিরক্ত হইয়া পিতাকে কঠোর

কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও ভাবী স্বামীর প্রীতির সহিত পিতার প্রতি ভাল-বাসার একরূপ অদৃশ্য তুলনা না করিলে বোধ হয় চলিত। মুক্তলজ্জ হইয়া পিতার নিকট স্বামীর ভালবাসার একরূপ তুলনায় শ্রেষ্ঠ-প্রতিপাদন বোধ হয় স্বভাবশাসিত কোন সমাজেই অনুমোদন করিবে না। আমাদের শত শত বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু একজনকে মুখের উপর যদি বলিয়া ফেলি যে, অমুককে তোমার অপেক্ষা আমি বেশী খাতির করি, তাহা কেমন বিনদূষ শুনার। জীলোকের পক্ষে পিতাকে স্বামীর নিকট একরূপ প্রকাশ-ভাবে খার কবিবার চেষ্টা শীলতাকে কতদূর অতিক্রম করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি নাট্যকার প্রয়োজন মনে করিয়া ইহার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হয়—সে ব্যাখ্যা কখনই গ্রহণ হইবে না। কারণ নাট্যকার চিত্রে কালিমা-বেশন করিলে নাটকের প্রকৃত গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। রোমিও টাইবন্টকে হত্যা করিয়া নিরাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইল, এই স্ত্র উপলক্ষ্য করিয়া জুলিয়েট টাইবন্ট ও রোমিওর প্রতি স্নেহ-তুল্যদণ্ডে মাপ করিতে বসিলেন এবং এই সিকান্তে উপস্থিত হইলেন যে, শত শত টাইবন্টের মৃত্যুও রোমিওর নিরাসনদণ্ডের সহিত তুলিত হয় না। জাতীয় মৃত্যুজনিত ব্যতিক্রম শোকও তাহার ক্ষমতায় স্থান পাইল না। এইরূপ তুলনাগুলি এত অযাচিত ও প্রগল্ভতাপূর্ণ যে, আমরা উহাতে জীজন-সুদৃশ শীলতার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হই। এতদ্বারা মনে হয়, তদেন্দীয় মহিলাকুল যে পরিমাণে স্বামীর বাহু আশ্রয় করিতে শিখিয়াছে, সেই পরিমাণেই পিতৃ-

গৃহের যত্নপ্রীতি ও স্বাভাবিক বন্ধনের প্রতি উদাসীন হইয়াছে; কিন্তু গার্হস্থ্যক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ফসল জন্মাইতে হইলে সর্বপ্রকার কোমলবৃত্তির যুগপৎ কর্ষণ আবশ্যিক, তাহা হইলে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ পূর্ণরূপে বিকাশ পাইবার সম্ভাবনা। শেক্স্পীর যে রমণী-প্রকৃতি আঁকিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের নহে। আমাদের পুরুষীকুল বেপখুমতী পুষ্পভারনতা লতার স্থায় প্রেমের উষাচ্ছটায় লালিত ও বর্ধিত হইয়া যে লাজলীলা, যে সংযম, যে মৌনমাধুরী প্রকাশিত করে, আমরা বলিতে বাধ্য—শেক্স্পীর সেধপ নারীচরিত্রের আভাস পান নাই। তাঁহার পুরুষচরিত্রগুলি বিক্রান্ত, কিন্তু উদ্ভ্রান্ত—তাহাদের শাস্তি ও সংযমের অভাব;—যে শাস্তি ও সংযমের ইচ্ছায় হিন্দু হিন্দগিরির ভূদগুণ অধিরোহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই, মৌনী হইয়া অনশনে জীবন কাটাইয়া দিয়াছে—যে শাস্তি ও সংযম রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্রে, যুদিষ্ঠির ও ভীষ্মের আচরণে অপূর্ণ মহিমায় ভর্তিরা উদ্ভিয়াছে, শেক্স্পীর তাহার আভাস দিতে পারেন নাই,—তাঁহার কবিতা উন্নত কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে না। কতক পরিমাণে বর্করযুগের দস্ত, তেজ ও অহঙ্কারের ছায়া

পড়িয়া তাঁহার কাব্য ও নাটকগুলিকে রাজসিকগুণের আধার করিয়াছে। উহাতে চূড়ান্ত প্রতিভা আছে, কিন্তু উদ্যম প্রতিভার শাসন নাই—উহাতে মানবপ্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতা ও অদম্য লীলা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা শীর্ণতা ও স্বভাবনয়তার ভূষিত হইয়া লৌক-হিতকর হয় নাই। “শিবেতরুক্ষতয়ে”—অকল্যাণক্ষয় আমাদের আলঙ্কারিকপণ কাব্যের একটা প্রয়োজন বা ফল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সরস্বতীর মঙ্গলময়ী মূর্তি আমাদের চক্ষে বড় আদরণীয়—তিনি যেমন স্নানরৌশ্রেষ্ঠা, তেমনই শুভ্রবসনা। আমাদের মহাকাব্যগুলির ভিত্তি সংযম, উহারা সাংঘিক-গুণের শুভ্রদীপ্তিতে সমস্ত অশুভঘটনাকে কল্যাণের মহিনায় মগ্নিত করিয়া দেখাই-তেছে। মনে হয়, সেই সকল কাব্য সমাজের যে স্তর উদ্ঘাটন করিয়াছে—শেক্স্পীরবর্ণিত সমাজের স্তর তাহার বহুনিম্নে। আমি শেক্স্পীরের জলন্তমর্য্যব্যং প্রতিভার কথা বলিতেছি না;—তাঁহার সময়ে যে সানাজিক অবস্থা তাঁহার কাব্যে প্রতিভাসিত, তাহারই কথা বলিতেছি; তাঁহার কবিদের অমর্যাদা করি নাই, তাহা করিবার সুযোগও কাহারও নাই।

চণ্ডালী ।



১

“হার মা, একি মা, আজি একি হ’ল, একি হ’ল তোর—
মুখে অন্ন নাই, নিশি কেঁদে কেঁদে করে’ দিলি ভোর ।
দেখ, বরষার স্নানি গরজি বরষি হ’ল শেষ—
এখনো—এখনো মাগো পড়ে’ আছ আলুথালু-বেশ ?
কোন্ মণি কোন্ সোনা কারে দাস কারে চাও দাসী—
বল কে সে—বল কি সে—এই দণ্ডে নিয়ে তারে আসি ।
জানিস্ নে মা তোহার কত গৃঢ় ভ্রমভ্রম জানে—
মানস করিলে—ধরা নিমেষেতে পদতলে আনে ?”
—কহিল চণ্ডালী-মাতা, অধিকারে,—কহিলে সম্ভাষি’—
(মাতা ও তনয়া দৌহে বৈশালীর প্রান্তগ্রামবাসী) ।
অধিকা চণ্ডাল-বালা—কোথা হ’তে পেল এত রূপ—
মোহনিয়া এ চিকুর, এমন নয়ন রসকূপ ?
এমন কপোলযুগ লাবণ্যাললিত ঠোঁট-ছুটি
এমন মোহন গ্রীবা—অনঙ্গের যেন ফুল-মুঠি ?
অলাঞ্জে বিচরে বালা সঙ্গিসাথে বাহিরে কি ঘরে—
কিবা রঙ্গময় ছাঁদে পা-ছুটি মাটিতে তা’র পড়ে !
বাহুটি বেড়িয়া তার বলয় নাহিক একখানি—
অভ্রুণ এ রূপেতে বড় আমি ভয়ঙ্কর মানি !
একি এ বলয়বন্ধবিমুক্ত, প্রমত্ত রূপোচ্ছ্বাস—
এ যেন চুপিতে চায় বায়ুবহ সকল আকাশ ।
প্রত্যেক চরণপাতে তানে তানে বাজিয়া নুপুর
উহার গতিরে কভু করে না ত সরম-মধুর !
ওই কণ্ঠতট হতে বিলম্বিয়া মণিময় হার
বক্ষোচ্ছল যৌবনেতে লাজ নাহি দেয় একবার !
বৈশালীর প্রান্তমাঠে বটমূলে বেণুকুঞ্জতলে,
ময়ূরচরিত পথে এ কিশোরী যত ফিরে চলে—

বেশ নাই, ভূবা নাই—এলাকেশ, মলিন বসন—
 চমকি' সবাই কহে—“চণ্ডালী এ ?—কি জানি, কেমন !”
 চণ্ডালী জননী তার কথারে নেহারি দেখে যত,
 চোখে তার আসে জল, ভাবে—“হায় ব্যথা পেলি কত !
 কোন্ যক্ষবালা তুই আইলি এ দীনহীন ঘরে—
 শৈশবে হারালি বাপে, কত কষ্টে দরিদ্রার ক্রোড়ে
 বাড়ি' এমনটি হ'লি !—মরি মরি—একি রূপ মা'র !
 এ ল'য়ে কোথায় যাব ?—রেখে দেব হৃদয়ে আমার !”
 —ভাবি' ভাবি' হিয়া গলি', নির্ভুরা সে চণ্ডালিনী কঁাদে—
 যতই স্বামীরে স্মরে অশ্রু আর কিছুতে না বাঁধে ।
 আলো প্রোচ চণ্ডালিনি কি যে তুই গেলি দরবিয়া—
 পক্ষা পুরুষ হতে ! কোদালি ও বুড়ি কাঁখে নিয়া
 বৈশালীনগরদেশে প্রান্তরে ভ্রমিতি তুই যাব,
 কপাল সিঁদূরে ভরি' তো'র নব-যৌবন-গরবে—
 রাখাল-কিশোর যত বাশরী-বিলাস বন্ধ করি'
 ভীকৃতায় ধীরে ধীরে বাশবন-আড়ে যেত মরি' !—
 প্রতিবেশী যত—তো'র ভয়ে সদা ছিল কম্পমান—
 কথার স্নেহ-সোহাগে একি তো'র দ্রবি' গেল প্রাণ ?
 শত আবদারে বালা জননী'র যত উদ্বেজিছে—
 স্নেহমুঢ়া চণ্ডালিনী সব-কিছু জোগায়ে আনিছে ।—
 সেই সে অধিকা আজি কি লাগিয়া করে' অভিমান
 ভূমিতলে পড়ে' আছে ?—চণ্ডালীর বাহিরায় প্রাণ !
 “উঠ উঠ মা আনার, উঠ উঠ হৃদয়পুতলি”—
 কথার শিয়রে বসি' সাধিতেছে শত কথা বলি' ।
 ঘরা উঠি' কঁাদি' হাসি' করতলপিঠে আঁখি মুছি'
 কহে বালা অভিলাষ—প্রভাতের রবিরশ্মিকটি
 মাটির দেয়াল'পরে খড়ে ঢাকা জানালার কাঁকে
 পড়িল আসিরা মুখে, অভিমানে-রাঙা চোখে-নাকে,—
 বিস্মৃত চূর্ণচিকুরে, রাঙা-হুটি-অধরোষ্ঠ'পর
 —(উপবাসে ক্ষীণ হ'য়ে বাহা আরো হরেছে হৃদয়)—
 —জানাইল আবদার—“নাগো, আনি গিরেছিহু কালি
 যে পথে তোমরা যাও মাঠ এড়ি' নগর বৈশালী—

বটতরুটির মূলে, কুপ হ'তে তুলিবারে জল ।--
 দারুণ মধ্যাহ্নবেলা, পুড়ি' যায় যেন নভতল—
 কলসিটি ভরে' আমি ধীরে ধীরে রাখিয়া পাবাগে
 চাহিয়া দেখিতেছিহু ছায়াভরা-বটপাতা-পানে
 উর্দ্ধদিকে—কচি কচি হইতেছে কোথাও বাহির,
 কোথাও সবুজ-গায় শতপাতা ঘেরি' একনীড় ।—
 কিছুই ছিল না মনে—সহসা তুষার হাহা করি'
 এক ভিক্স মহাজন এসে প'ল উঠিহু শিহরি' !
 একি রূপ মরি মরি ! একি রূপ আগুনসমান—
 তুষার শরীরখানি মুহমুহ তাহে কম্পমান—
 ঠিক যেন বহ্নিশিখা !—মাগো, আমি তুষা তাঁর তুলি'
 রহিলাম চাহি' শুধু হ্রদয়ন প্রাণপণ খুলি'—
 অহা !—চমকিয়া শেষে অঞ্জলিতে ঢেলে দিহু জল—
 হাসি', আলীকাদ করি' চলি গেলা হইয়া শীতল !
 —চলি গেল ? হায় মাগো—চলি গেল ? চলি গেল দূর ?
 আর ফিরিবে না সে কি ? যাব আমি তাহাদের পুর !
 নাহি মোর লাজভয়—চিনি আমি বনপথ চিনি,
 এখনি যাইব সেথা—যাই, আমি যাব একাকিনী—
 অথবা—মা, তোর সেই মস্ত মোরে দেগো শিখায়ে দে ।
 সারারাত্রি জাগি' জাগি' মস্ত্রে তারে আনিবই বেঁধে ।"
 —জননীর হুই হাত দৃঢ় চাপি' বসিলা অস্থির !
 চণ্ডালিনী কহে—“হায়, নাহি জানি কি কপালে লিখা !—
 তারা যে সম্রাসী ভিক্স মহাজন দেবতাসমান,
 সমস্ত সংসার তাঁরা নিমিষেতে করে তুচ্ছজ্ঞান—
 কি মস্ত্রে তাঁদেরে বাধি ? বাধিলেও, হায় অভাগিনি,
 ভিক্সর ভাঙিবি ব্রত ? হ'বি ঘোরনরকগামিনী ?"
 “অবৃত্ত নরকে যাব”—কহিলা কিশোরী গরজিয়া—
 “একবার তাঁরে শুধু এ ভুজবন্ধনমাঝে নিয়া
 যাব যেথা যেতে হয়, শিখায়ে দে মস্ত্র ছরা করি' ।"
 দাঁতে দাঁত চাপি' সাতা বসি' রয় কতক্ষণ ধরি' ।

- ২

ধরার ব্যথার ব্যথী 'ওই হের বসি' আছে সব—
 বৈশালীর বেণুবনে বৃদ্ধে ঘিরি' স্তম্ভিত-নীরব !
 বৃহৎ হৃদয়গুলি অধীর বৃহৎ বেদনায়—
 হোথা ক্ষুদ্র তৃষালোভ বিকার কভু না স্থান পায় !
 আজি ঝঙ্কা বহিতেছে গরজবিহ্যতজলে মাতি—
 আজি যথা নভস্তলে হুকারিছে পাগলিনী রাতি—
 তবু তার মাঝে সবে বৃদ্ধে ঘিরি' বসি' আছে স্থির—
 তেমনি ওদের হিয়া অকম্পিত ঝড়ে পৃথিবীর !
 জ্বর হানাহানি ঘেষ, যজ্ঞভূমে পশুঘাতমত
 লোকনিপীড়নমাঝে—উঁহারাই শুধু শান্তিপ্রত !
 —সে শাস্তি জগতজনে দীনতমে দিবে বিলাইয়া
 কি বৃহৎ করুণায় পরিপ্লুত 'ওই শত হিয়া !
 —অনাধিপণ্ডিক হেথা, হোথায় আনন্দ মহাত্মাণ—
 চৌদিকে কতই আর, ধ্যানমগ্ন, স্তিমিতনয়ন—
 বৈশালীর বেণুবনবিহারে বোধিসত্ত্বের ঘিরে'
 বসে আছে শুক হ'য়ে—গরজিছে ঝটিকা বাহিরে !
 —একি ?—আনন্দের মনে সর্বনাশী কি এল বিকার ?
 নীরব সে সম্মুখনে হিয়া নাহি মস্ত্র জপে আর !
 লালসার একি বাঁহু জ্বলি' ওঠে হৃদয়ের মাঝে
 সে আলোকে উদ্ভাসিতা অনিন্দিতা এ কে চিত্তে রাজে ?
 —সেই বটতরুমূল, আভরণহীনা সেই ছবি,
 সেই চমকিত চোখ !—নিখিল পুড়িছে—দীপ্ত রবি—
 তার মাঝে বটচ্ছায়ে তৃষাতুরে করে জলদান—
 বহ্নিবর্ণে কে লিখিল নিদারুণ এই ছবিখান
 ভিক্স আনন্দের বুকে ! দীতে দীত ঘরবি' সন্ন্যাসী
 নিজমর্গ হ'তে যেন আক্রোশে উৎসারি' রক্তরাশি
 চাহিল তুলিয়া যেতে !—হায় !—শেষে সংঘসভা ছাড়ি
 কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধঝটিকা বিদারি' !
 হাহা করি' চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন—
 বিশ্ব দাবাইয়া নত বারবার করে গরজন—
 আপনার সঙ্গে যুঝি' তেমনি ঝটিকা বুকে ধরি'

আনন্দ, প্রান্তরপথ চলিছেন অতিক্রম করি' ;
শাখাপত্র ওড়ে মুখে, ত্রিবজ্র বাহিয়া পড়ে নীর—
কি টানে চলিছে ভিক্স অধিকার স্বদূর কুটার !

হেথা হের চণ্ডালিনী কোন্ যজ্ঞ জালিয়া কুটারে,
পরি' এক বাঘছাণ, রক্তহৃত্র জড়াইয়া শিরে,
জ.হু পাতি' বসিয়াছে, পড়িতেছে মস্ত্র ভয়ঙ্কর—
সমুখে কেহই নাই । মা গেছে সরিয়া দূরপর !
একাকিনী অধিক। সে পত্ররাশি বহ্নিমাঝে ছাড়ি'
হৃ'হাতে চাপিছে বক্ষ যেন হিয়া দেবে বা উপাড়ি'—
সহসা করুণা এঁকি চিতে আসি' পশিল তাহার—
কহে চিত “ওহঁ, ওহঁ,—আসিতেছে, দেরি নাই আর’
ওই শুন ঝঙ্কারে !—পদধ্বনি মৃদু মনোহর—
ও বুঝি বাজিছে মোর গৃঢ়তম মরমভিতর !

আহা, আমি কিবা দিয়া বরিব হৃদয়রাজে আজি ?
এ মোর তৈরবীবেশে ?—না না, এই ফুলদলরাজি,—
শিরোভুষা, কর্ণভুষা করি' লই !—থাক্ সেও থাক্—
রব আমি চক্ষু মুদি ভূমিতলে বসিয়া অবাক্,
করজোড়ে !”— মুখখানি বুক'পরে পড়িল চলিয়া—
বাগ্র আরাধনাতরে কাঁপে হিয়া হানিয়া হানিয়া—
এমনি সঘনে বুঝি কেঁপেছিলা আদি অন্ধকার
পূর্বক্ষেণে জ্যোতিষ্ময় এ বিখ্যত্বন ফুটিবার ।

অকস্মাৎ মুক্তদ্বারে দীর্ঘমূর্তি দাঁড়াইল আসি'—

• ভ্রুকুটি-ভীষণ-মুখে “কি করিলি ?” গজ্জিলা সন্ন্যাসী ।

“কি করিলি ?”—বিদারিত মরণের ক্ষোভে তীব্রস্বর
বিচরিল গৃহমাঝে শব্দময়ী ঝঙ্কার ভিতর !

অন্ধকারে আশ্বহারা তরু যবে থাকে দাঁড়াইয়া—

কে জানে কেমন করি' শুক্লতায় কাঁপে তার হিয়া—

অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্র আসি' পড়ে শিরে তার,

• পুড়ায় দীরিমা ফেলে, তেমনি বাজিল অধিকার ।

মুহূর্ত্ত নীরবে চাহি' চমকিয়া দাঁড়াল অধিকা—

“হায়, আমি কি করিহু, কি করিহু—এ যে বহ্নিশিখা !

এরে আমি মোর হীন অন্তরের কালিমাধা মেঘে
 ঢাকিয়া ফেলেছি কিরে ?” হানে বন্ধ নিদারুণ বেগে !
 চকিত নয়ন স্থির, দুই বাহু ছলে’ স্পন্দহীন
 দাঁড়াইয়া রহে নারী পুস্তলিকা যেন চিত্রলীন !
 মর্মে বাজে হাহাকার বিখজোড়া বিয়াকুলধ্বনি—
 “হায় হায় কি করিছ !—কি করিছ !—জগতের মণি
 কোন্ মহাব্রতজনে পথচ্যুত করিলাম আমি ।”
 হৃদয়-ক্রন্দন-সনে বাহিরের ঝঙ্কার যামি’—
 সুর মিলাইয়া দিল—অধিকা তাহাই শুনে কানে—
 দাঁড়ায়ে নিস্পন্দদেহ—মূর্তি যেন অঙ্কিত পাষাণে !
 “কি করিছ !—কি করিছ ! হে তরুণ যতি মনোহর—
 মোর বাসনার টান লাগিছে কি তব হিয়া’পর ?
 কি করিছ !—কি করিছ ! হায়, আমি কেমনে আশ্রয়,
 দিব তব পদতলে ?—এ যে হিয়া ভস্ম লালসায় !”
 অধিকা দাঁড়ায়ে রহে—হেথা শাস্ত হ’য়ে এল ঝড়,
 আর না ডাকিল বায়ু—শিথিল বরষা ঝরঝর—
 গীতল পরশে কোন, ধীরে ধীরে এল জুড়াইয়া
 অধিকার হিয়াতল—কহিল সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
 “কোথা ? দেব, কোথা ফুল ? যেতে হ’ল ফিরে যেতে হ’ল—
 আজ ফিরে যাও যতি মাঝ আমি তব পদতল !
 ফুল ফুটাইব আমি এ হৃদয়ে বিজন সাধনে—
 এ হৃদয়পুষ্প ল’য়ে সেইদিন যাব আরাধনে ।”
 অধিকা দাঁড়ায়ে র’ল—পদতলে ধরণী তাহার
 আর না টলিছে যেন !—খুলি’ পড়ে কেশ বালিকার !
 বরষা ধামিয়া গিয়া একা বায়ু জাগিল তখন,
 দ্বার খুলি’ অধিকার যজ্ঞবল্লি নিভাল পবন !
 অন্ধকারে এলোমেলো উড়ে তার কুস্তল-অঞ্চল
 হু’চোখে দ্বিগুণ ধারে অধিকার বাহিরিছে জল !

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় ।

সারসত্যের আলোচনা ।

বিগত প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কল-কারখানা-সম্বন্ধে যে কয়েকটি জ্ঞাতবা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা আত্মপূর্ক্ক এই ;—

(১) চক্ষুশ্রোত্রাদির সারভূত দর্শেন্দ্রিয়ের উপর সোমার হইয়া রহিয়াছে প্রাণ-মন বুদ্ধি, এক কথাই, অন্তঃকরণ * ।

(২) অন্তঃকরণের হস্ত রাশিগুচ্ছ বাগানো রহিয়াছে—ত্রিবিধ শক্তি ; (১) জীবনী শক্তি প্রাণের হস্তে, (২) ইচ্ছাশক্তি মনের হস্তে, (৩) এবং ধীশক্তি বুদ্ধির হস্তে । ঐ তিনপ্রকার শক্তির স্থূল আবরণ হ'চ্ছে তিন-প্রকার তৈজস-নাড়ী ;—জীবনী শক্তির স্থূল আবরণ মর্ষবহা নাড়ী, ইচ্ছাশক্তির স্থূল আবরণ কর্মবহা নাড়ী, ধীশক্তির স্থূল আবরণ চেতাবহা নাড়ী ।

(৩) বাহন-ঐ যে স্বপ্ন দর্শেন্দ্রিয়, তাহা স্বপ্নশরীরের বহিরঙ্গ ; আর, সোমার-ঐ যে অন্তঃকরণ, তাহা স্বপ্নশরীরের অন্তরঙ্গ ।

স্বপ্নশরীর ঐ দ্বিবিধ অঙ্গের অঙ্গী ।

(৪) স্বপ্নশরীরের বহিরঙ্গের এ-মুড়া হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যন্ত একটা ক্রমাভিব্যক্তির সোপান-পথ রহিয়াছে । সেই সোপান-পথের মাঝের ধাপে প্রাণের সঙ্গে দোঁসর জোটে মন, এবং শেষের ধাপে মনের সঙ্গে দোঁসর জোটে বুদ্ধি ।

(৫) বুদ্ধির দুই অঙ্গ—(১) সামান্য-জ্ঞান এবং (২) বিশেষ জ্ঞান ।

পূর্ক্ক প্রবন্ধে এইখানে থামিয়া-দাঁড়াইয়া একটি কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছিল এই যে, দ্রষ্টা সামান্য-জ্ঞানের দ্বার দিয়া আত্মসত্তা উপলব্ধি করে, এবং বিশেষ-জ্ঞানের দ্বার দিয়া বস্তুসত্তা উপলব্ধি করে । শেষের এই কথাটির আত্মোপাস্ত ভাল করিয়া পর্য্য-লোচনা করিয়া দেখা যা'ক্ ।

প্রাণ, মন, বুদ্ধির উত্তরোত্তর ক্ষেত্রে
আগমন ।

যে সময়ে শকুন্তলা ছদ্মস্ত রাজার ধ্যানে তদগতচিত্তে নিমগ্না, সেই সময়ে যখন ছর্ক্ষাসা ঋষি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন প্রদীপের বড়িকায় যেমন করিয়া আগুন ধরানো হয়, তেমনি করিয়া ছর্ক্ষাসা ঋষির কোপপ্রদীপ্ত মুখরশ্মি শকুন্তলার চাক্ষুব তৈজস-নাড়ীতে কম্পন ধরাইয়াছিল, তাহাতে আর ভুল নাই । কিন্তু হইলে হইবে কি—সে তৈজস-কম্পন যেখানে আরক্ক হইয়াছিল, সেইখানেই আটক পড়িয়া রহিয়া গেল । প্রাণের অন্ধকারাবৃত বহিঃ-প্রাঙ্গণেই আটক পড়িয়া রহিয়া গেল, তাহার উর্দ্ধে মনের দীপালোকিত চেতনাগৃহে বাহিয়া উঠিতে পারিল না । যাহাই হো'ক্ না

* কি কারণে প্রাণকে অন্তঃকরণের কোঠায় স্থান দেওয়া বিধেয়, তাহা পূর্ক্কের এক প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে ।

কেন—শকুন্তলার নয়নারবিন্দে ছুঁয়াসা ঋষির
জটাভূটধারী ছবি যাহা পড়িয়াছিল, তাহাও
তো একপ্রকার চাক্ষুষ-ক্রিয়া? তাহারই নাম
আধা। কিন্তু সে দেখা একপ্রকার অন্ধকারে
ছায়া আধা, তাহা না-আধা'রই নামান্তর।
মন কিন্তু আশ্চর্য্য সোনার কাটি! মনের
সংস্পর্শমাত্রে চাক্ষুষ-ক্রিয়ার ঘুম ভাঙিয়া
যায়;—ঘুম ভাঙিয়া যায় বটে, কিন্তু
চক্ষুতে তবুও ঘুমের ঘোর লাগিয়া থাকে।
ফলে, মনের আধা একপ্রকার স্বপ্ন-আধা;
—তাহা প্রাণের আধা'র হ্রায় অস্ত্র আধাও
নহে, আর, বুদ্ধির আধা'র হ্রায় প্রবুদ্ধ আধাও
নহে—পরন্তু হ্রয়ের মাঝামাঝি। শুধু-কেবল
“দেখিতেছি-মাত্র” বলিলে যেরূপ আধা
বুঝায়, তাহাই মনের আধা! দেখিতেছি-
মাত্র রকমের আধা যে একপ্রকার স্বপ্ন-
আধা, তাহার প্রমাণ এই যে, স্বপ্নকালে যাহা-
কিছু দেখা যায়, তাহা দেখিতেছি-মাত্র ছাড়া
আর-কিছুই নহে। স্বপ্নকালে দ্রষ্টার শরীরে
চেতনা (sensation) যে থাকে না, তাহা
নহে; স্বপ্নের বন-ভ্রমণে গায়ে কাঁটা বিধিলে
স্বপ্নদর্শকের চেতন হয় খুবই—হয় না কেবল
চৈতন্য (self-consciousness)। স্বপ্ন-
কালে দ্রষ্টার একটিবারও এরূপ চৈতন্য হয়
না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্নকালে
দ্রষ্টার চেতনা (sensation) থাকে, কিন্তু
চৈতন্য (self-consciousness) থাকে না;
—আত্মবিস্মৃতি স্বপ্নের গলা-জড়ানারী সখী।
মণি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য অনেক বেশী,
এটা যখন সকলেরই জ্ঞান। কথা, তখন
এ কথা বলা বাহুল্য যে, চেতনার অপেক্ষা
চৈতন্যের মূল্য অনেক বেশী। চৈতন্য মনুষ্য

স্পর্শমণি! চৈতন্যের সংস্পর্শে মনের স্বপ্ন
ভাঙিয়া-গিয়া পূর্বমুহূর্তে যাহা দেখিতেছি-
মাত্র ছিল, পরমুহূর্তে তাহা জানিতেছি
হইয়া উঠে। চৈতন্য বুদ্ধিরই অন্তরঙ্গ। তাই
বুদ্ধির আধা মনের আধা অপেক্ষা আরো এক-
ধাপ উচ্চ অঙ্গের আধা। মনের আধা সচেতন,
কিন্তু সজ্ঞান নহে। বুদ্ধির আধাই সজ্ঞান
আধা। মন দেখে-মাত্র; বুদ্ধি দেখে-শুধু
না, সেই সঙ্গে জানে যে, আমি অমুক
বস্তু দেখিতেছি। আধা'র সঙ্গে এইরূপ
যখন জানা'র আধাসাক্ষাৎ হয়—চৈতন্যের
আধাসাক্ষাৎ হয়—তখন দ্রষ্টার চক্ষু হইতে
স্বপ্নের ঘোর চলিয়া যায়; স্বপ্নের ঘোর
চলিয়া গেলে সত্যাসত্যের খোঁজ পড়ে;
সত্যাসত্যের খোঁজ পড়িলে বুদ্ধি স্বকারণ্যে
প্রবৃত্ত হয়; স্বকারণ্য-সে আর-কিছু না—সত্যের
অবধারণা। ফল কথা এই যে, যেমন গৃহ-
বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়, তেমনি
প্রাণের অচেতন আধা মনে পৌঁছিলেই সচে-
তন আধা হয়, এবং মনের আত্মবিস্মৃতি রকমের
অজ্ঞান আধা বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই সজ্ঞান আধা
হয়। সজ্ঞান আধা'র কাষ্যক্ষেত্রে বুদ্ধির
দ্রই অঙ্গ একত্রে থাকে; এক অঙ্গ হ'চ্ছে
সামান্য-জ্ঞান, আর-এক অঙ্গ হ'চ্ছে বিশেষ-
জ্ঞান।

বুদ্ধির যুগলাঙ্গ।

বুদ্ধিপ্রদেশের কোনো-একটি ছোটোখাটো
জ্ঞানক্রিয়া ধরা যা'ক—যেমন “আমি জানি-
তেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখিতেছি”
এই একটি জ্ঞান-ক্রিয়া। এরূপ স্থলে আমার
জ্ঞান একযোগে দুইটি ব্যাপারে ব্যাপ্ত
হইতেছে; একটি ব্যাপার হ'চ্ছে আমি

জানিতেছি, আর-একটি ব্যাপার হ'চ্ছে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি। বুদ্ধির এই যে তথ্য, এটা তথ্য শুধু না—এটা একপ্রকার জানা। জানিতেছি'র সংস্পর্শগুণে দেখিতেছিও এক-প্রকার জানিতেছি হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাহা না হইবে কেন? পূর্বেই তো বলিয়াছি যে, জ্ঞান একপ্রকার স্পর্শমণি! জ্ঞানের সংস্পর্শগুণে দেখিতেছি যখন জানিতেছি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে জ্ঞান বলিব না তো আর কি বলিব? তাহা জ্ঞান তাহাতে আর ভুল নাই; তবে কিনা, তাহা বিশেষ একপ্রকার জ্ঞান; তা বহু, তাহা সামান্য-জ্ঞান নহে—নির্বিশেষ জ্ঞান নহে। কেন না, দেখিতেছি-ব্যাপারটি বিশেষ একপ্রকার জ্ঞানের ধর্ম—চাক্ষুষ-জ্ঞানের ধর্ম; তা বই, তাহা নির্বিশেষে (বা সামান্যত) সকল জ্ঞানের ধর্ম নহে—জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম নহে। জানিতেছিই সামান্যত সকল জ্ঞানের ধর্ম—জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম। তবেই হইতেছে যে, “আমি জানিতেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখিতেছি” এই মোট জ্ঞানক্রিয়াটাই অঙ্গ-দুইটির একটি হ'চ্ছে আমি জানিতেছি—এটা সামান্য-জ্ঞান; আর-একটি হ'চ্ছে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি—এটা বিশেষ-জ্ঞান।

আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা।

বুদ্ধির ঐ যে দুই অঙ্গ—সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে প্রথম অঙ্গটি অর্থাৎ সামান্য-জ্ঞান হুঁতাজ-করা কাগজের মতো বিমণ্ডিত। সামান্য-জ্ঞানে ব্যাপার একটি দেখিতে পাওয়া যায় বড়ই আশ্চর্য্য, তাহা এই :—

“আমি যে জানিতেছি” এটাও জানিতেছি, জানিতেছি-কে জানিতেছি। এ একপ্রকার চোরের উপরে বাটপাড়ি! সামান্য-জ্ঞান নিজেও যেমন, সামান্য-জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি, দুইই জানিতেছি ভিন্ন আর-কিছুই নহে। সামান্য-জ্ঞানকে যদি দ্বিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কি জানিতেছ?—তোমার জ্ঞেয়-বিষয় কি? সামান্য-জ্ঞান বলিবে যে, এইটি কেবল আমি জানিতেছি যে, আমি জানিতেছি; আমার জ্ঞেয়-বিষয়ই হ'চ্ছে আমি জানিতেছি। তবেই হইতেছে যে, সামান্য-জ্ঞানে আপনার নিকটে আত্মসত্তা হতঃপ্রকাশমান।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, জানিতেছিকেও যেমন, দেখিতেছিকেও তেমনি—দুটাই কেই জানিতে পারা যায় কেবল জ্ঞানে; তা বই, দুয়ের কোনোটিকেই চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞান-ক্রিয়াকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, দর্শন-ক্রিয়াকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জানিতেছি'র নিকটে প্রকাশ পায় “জানিতেছি” এবং “দেখিতেছি” দুইই; পক্ষান্তরে, দেখিতেছি'র নিকটে জানিতেছি তো প্রকাশ পায়ই না—তা ছাড়া, দেখিতেছি নিজেও প্রকাশ পায় না। জানিতেছি'র কাছে জানিতেছি প্রকাশ পায়, কিন্তু দেখিতেছি'র কাছে দেখিতেছি প্রকাশ পায় না। তবেই হইতেছে যে, “আমি জানিতেছি” এই সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে, “আমি গোলাপফুল দেখিতেছি” এই বিশেষ-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায় না। বিশেষ-জ্ঞানে—কি তবে প্রকাশ পায়? বস্তুসত্তা প্রকাশ

পায়। “আমি গোলাপফুল দেখিতেছি” এই বিশেষ-জ্ঞানে দৃশ্যমান গোলাপফুলের সত্যই প্রকাশ পায়।

কেহ বলিতে পারেন—“বিশেষ-জ্ঞানে দৃশ্য-মান গোলাপফুলের সত্য প্রকাশ পায়” এ বাহ্য তুমি বলিতেছ, এ কথা আমি মানি ; কিন্তু “সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায়” এ কথাটা আমার নিকটে তেমন প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। সত্য বটে যে, সামান্য-জ্ঞানে জ্ঞানের নিজ-সত্তা প্রকাশ পায়, কিন্তু জ্ঞানের নিজ-সত্তা তো আর আত্মসত্তা নহে, জ্ঞাতা’র নিজ-সত্তাই আত্ম-সত্তা।” ইহার উত্তরে পাতঞ্জল-যোগসূত্রের প্রসিদ্ধ বৃত্তি-কার ভোজরাজ কি বলিতেছেন—তাহা প্রণিধান কর।

পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের সমাধিপাদের নবম সূত্র এই যে, “শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তশ্চো বিকল্পঃ।” “শব্দ-জ্ঞানের পাছু-পাছু দৌড়ায় যে-একপ্রকার বস্তশ্চ অধ্যবসায় (অর্থাৎ জাঁকা অণ্ডরাজ), তাহারই নাম বিকল্প।” বৃত্তি-কার ইহার ভাবার্থ খোলসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছেন এইরূপ :—

বস্তনন্তুধ্যবসনপেক্ষমাণো যোঃধ্যবসায়ঃ স বিকল্প উচ্যতে। যথা পুরুষস্ত চৈতন্যং স্বরূপমিতি। অত্র দেবদত্তস্ত কণ্ঠ ইতি শব্দজন্যে জ্ঞানে বস্তু্য যোঃধ্যবসিতো জ্ঞেয়স্তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্য অবর্ত্ততেঃধ্যবসায়ঃ। বস্তন্তস্ত চৈতন্যমেব পুরুষঃ।”

ইহার অর্থ।—বস্তুটা যে কি, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যদি কোনো কথা শব্দের উপরে দাঁড় করানো হয়, তবে তাহারই নাম বিকল্প; যেমন, “পুরুষের (অর্থাৎ আত্মার) চৈতন্য” এই একটি কথা। আত্মার চৈতন্য বলিলে

বুঝায়—দেবদত্তের কণ্ঠের জ্ঞান চৈতন্য যেন আত্মার উপরে বাহির হইতে চাপানো হইয়াছে। বস্ত্ত চৈতন্যই আত্মা।

কট্টলাওদেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনকার হার্মিন্টনও তাহাই বলেন। চৈতন্য কিনা Selfconsciousness। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলেন—“সংবিৎ”ই (consciousness) আত্মা। তিন কালের তিন মহাপণ্ডিত একবাক্যে বলিতেছেন যে, চৈতন্যই আত্মা। এরূপ একটা সর্ববাদিসম্মত কথা’র ছল ধরিতে চেষ্টা না করিয়া উহার তাৎপর্য্য এবং মর্থ্য্য সবিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখাই শ্রেয়ঃ-কল্প। এ কথা তো কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, চৈতন্য আপনি আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। তবেই হইতেছে যে, চৈতন্য আপনিই জ্ঞান, আপনিই জ্ঞাতা, আপনিই জ্ঞেয়, তিনই একাধারে। অতএব এটা স্থির যে, চৈতন্যরূপী সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা স্বতঃপ্রকাশমান। তা ছাড়া, সাংখ্যসারনামক একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ লেখে যে,

“দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জ্ঞানেহমিতি ধীবলাৎ।”

“সামান্যতঃ ‘জানিতেছি’ এইরূপ বুদ্ধির বলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টার সত্তা সপ্রমাণ হয়।” আমরাও তাহাই বলিতেছি; বলিতেছি যে, দ্রষ্টা সামান্য-জ্ঞানের দ্বার দিয়া আত্মসত্তা উপলব্ধি করে।

সামান্য-বিশেষের পরস্পরাপেক্ষিতা।

উপরে দেখা গেল যে, বুদ্ধির জ্ঞানালোকে যখন সত্তা প্রকাশ পায়, তখন আত্মসত্তা এবং বস্ত্তসত্তা, দুইই একযোগে প্রকাশ পায়। আত্মসত্তা প্রকাশ পায় সামান্য-জ্ঞানে;

বস্তুসত্তা প্রকাশ পায় বিশেষ-জ্ঞানে।
তাহার মধ্যে একটি কথা আছে ; সেটি
এই :—

শুধু-কেবল মাথাটাকে অথবা শুধু-কেবল
ধড়টাকে যেমন সর্বাসঙ্গসম্পন্ন শরীর বলা
যাইতে পারে না, তেমনি, শুধু-কেবল সামান্য-
জ্ঞানকে অথবা শুধু-কেবল বিশেষ-জ্ঞানকে
সর্বাসঙ্গসম্পন্ন জ্ঞান বলা যাইতে পারে না।
সামান্য-জ্ঞানও যেমন, বিশেষ-জ্ঞানও তেমনি,
হুইই জ্ঞানের একান্ত-মাত্র ; তা বই, হুইয়ের
কোনটিই পূর্ণাবয়ব জ্ঞান নহে। সামান্য-জ্ঞান
চায় বিশেষ-জ্ঞানকে ; বিশেষ-জ্ঞান চায় সামান্য-

জ্ঞানকে। ধীশক্তির কার্য্যই হ'জে সামান্য-
জ্ঞানকে বিশেষ-জ্ঞান দিয়া ফোটাঁইয়া তোলা
এবং বিশেষ-জ্ঞানকে সামান্য-জ্ঞান দিয়া
শোধন করিয়া তোলা। বিষয়টি যেমন
গুরুতর, তেমনি হুইয় ; অতএব এবারে
এইখানেই সমাপ্তি করা বিধেয়। সামান্য-
বিশেষের মধ্যে, তথৈব আত্মসত্তা এবং বস্তু-
সত্তার মধ্যে, শক্তির কিরূপ চলাচল হয় ;
এবং হুইয়ের মধ্যে মর্য্যাস্তিক ঐক্যস্থত্রই বা
কিরূপ, এই সকল হুইয় বিষয় বারাস্তরের
আলোচনার জন্য হাতে রাখিয়া দেওয়া
হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি ।



২৬

তখনো বেলা যায় নাই, এমন-সময় ষ্টীমার চরে
ঠেকিয়া গেল। সেদিন অনেক ঠেলাঠেলিতেও
ষ্টীমার ভাসিল না। উঁচু পাড়ের নীচে জল-
চর পাখীদের পদাঙ্কখচিত এক-স্তর বালুকা-
ময় নিম্নতট কিছুদূর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া
নদীতে আসিয়া নামিয়াছে। সেইখানে
গ্রামবধূরা তখন দিনান্তের শেষ জলসঞ্চয়
করিয়া লইবার জন্য ষট লইয়া আসিয়াছিল।
তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রগল্ভা
বিনা অবগুষ্ঠনে এবং কোনো কোনো ভীক
ঘোমটার অন্তরাল হইতে ষ্টীমারের দিকে

চাহিয়া কোতুহল মিটাইতেছিল। ঊর্দ্ধনাসিক
স্পর্ধিত জলধানটার হুইঁপাকে গ্রামের ছেলে-
গুলি পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া চাঁৎকারস্বরে
ব্যঙ্গোক্তি করিতে করিতে নৃত্য করিতে-
ছিল।

ওপারের জনশ্রুত চরের মধ্যে সূর্য্য অন্ত
গেল। রমেশ জাহাজের রেলিং ধরিয়া
সন্ধ্যার আভাষ দীপ্যমান পশ্চিম দিগন্তের
দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। কমলা
তাহার বেড়া-দেওয়া রাঁধিবার জায়গা হইতে
আসিয়া কামরার দরজার পাশে দাঁড়াইল।
রমেশ শীঘ্র পশ্চাতে মুখ ফিরাইবে, এমন

সম্ভাবনা না দেখিয়া সে মুহূর্ত্তে একটু-আধটু কাশিল—তাহাতেও কোন ফল হইল না—অবশেষে তাহার চাবির গোছা দিয়া দরজার ঠক্ঠক্ করিতে লাগিল। শব্দ যখন প্রবল-তর হইল, তখন রমেশ মুখ ফিরাইল। কমলাকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া কহিল—“এ তোমার কি-রকম ডাকিবার প্রণালী ?”

কমলা কহিল—“তা, কি রকম করিয়া ডাকিব ?”

রমেশ কহিল, “কেন, বাপমায়ে আমার নামকরণ করিয়াছিলেন কিসের জন্ত,—যদি কোনো ব্যবহারেই না লাগিবে ? প্রয়োজনের সময় আমাকে রমেশবাবু বলিয়া ডাকিলে কতি কি ?”

আবার সেই একই-রকম ঠাট্টা ! কমলার কপোলে এবং কৰ্ণমূলে সন্ধ্যার অভার উপরে আরো একটুখানি রক্তিম আভা যোগ দিল ;—সে মাথা বাঁকাইয়া কহিল, “তুমি কি যে বল, তাহার ঠিক নাই ! শোন, তোমার খাবার তৈরি ; একটু সকাল-সকাল খাইয়া লও ! আজ ওবেলায় ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই ।”

নদীর বাতাসে রমেশের ক্ষুধাযোধ হইতেছিল। আয়োজনের অভাবে পাছে কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেইজন্ত কিছুই বলে নাই—এমন সময়ে অযাচিত আহ্বানের সংবাদে তাহার মনে যে একটা স্রুতের আন্দোলন তুলিল, তাহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল। কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির আসন্ন সম্ভাবনার সূচন—কিন্তু সে যখন জানিতেছে না, তখনো যে তাহার জন্ত একটি চিন্তা

জাগ্রত আছে,—একটি চেষ্টা ব্যাপ্ত রহিয়াছে,—তাহার সম্বন্ধে একটি কল্যাণের বিধান স্বতই কাজ করিয়া চলিয়াছে, ইহার গৌরব সে জন্মের মধ্যে অমুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু ইহা তাহার প্রাপ্য নহে, এত-বড় জিনিষটা কেবল ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—এই চিন্তার নিষ্ঠুর আঘাতও সে এড়াইতে পারিল না—সে শির নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কমলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—“তোমার বুঝি খাইতে ইচ্ছা নাই ? ক্ষুধা পায় নাই ? আমি কি তোমাকে জোর করিয়া খাইতে বলিতেছি ?”

রমেশ তাড়াতাড়ি প্রফুল্লতার ভাগ করিয়া কহিল—“তোমাকে জোর করিতে হইবে কেন, আমার পেটের মধ্যেই জোর করিতেছে। এখন ত খুব চাবি ঠক্-ঠক্ করিয়া ডাকিয়া আনিবে, শেষকালে পরিবেষণের সময় যেন দর্পহারী মধুসূদন দেখা না দেন !”

এই বলিয়া রমেশ চারিদিকে চাহিয়া কহিল—“কই, খাদ্যদ্রব্য ত কিছু গ্রেথি না। খুব ক্ষুধার জেরে থাকিলেও এই আসবাব-গুণা আমার হজম হইবে না—ছেলেবেলা হইতে আমার অন্তরকম অভ্যাস।”—রমেশ কামরার বিছানা প্রভৃতি অভুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

কমলা থিলথিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ থামিলে কহিল—“এখন বুঝি আর সবুর সহিতেছে না ? যখন আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিলে, তখন বুঝি ক্ষুধাভরা

ছিল না। আর যেমনি আমি ডাঃ-গলাম, অমনি মনে পড়িয়া গেল ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে। আচ্ছা, তুমি একমিনিট বোস, আমি আনিয়া দিতেছি।”

রমেশ কহিল—“কিন্তু দেরি হইলে এই বিছানাপত্র কিছুই দেখিতে পাইবে না—তখন আমার দোষ দিয়ে না।”

রসিকতার এই পুনরুক্তিতে কমলার কম আমোদবোধ হইল না।, তাহার আবার ভারি হাসি পাইল। সরল হাতোচ্ছ্বাসে ঘরকে স্খাময় করিয়া-দিয়া কমলা দ্রুতপদে খাবার আনিতে গেল। রমেশের কাষ্ঠ-প্রকৃত্যের ছন্দদীপ্ত মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় বাপ্ত হইল।

উপরে-শালপাত-ঢাকা একটা চাঙারি লইয়া অনতিকাল পরেই কমলা কামরায় প্রবেশ করিল। বিছানার উপরে চাঙারি রাখিয়া আঁচল দিয়া ঘরের মেজে মুছিতে লাগিল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “ও কি করিতেছ ?”

কমলা কহিল—“আমি ত এখনি কাপড় ছাড়িয়া ফেলিব।”—এই বলিয়া শালপাতা তুলিয়া পাতিল ও তাহার উপরে লুচি ও তরকারী নিপুণহস্তে সাজাইয়া দিল।

রমেশ কহিল—“কি আশ্চর্য! লুচির জোগাড় করিলে কি করিয়া ?”

কমলা সহজে রহস্য ফাঁস না করিয়া অত্যন্ত নিগূঢ়ভাব ধারণ করিয়া কহিল—“কেমন করিয়া বল দেখি ?”

রমেশ কঠিন চিন্তার ভাগ করিয়া কহিল—“নিশ্চয়ই খালসীদের জলখাবার হইতে ভাগ বসাইয়াছ।”

কমলা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল—“কখনো না! রাম বল।”

রমেশ খাইতে খাইতে লুচির আদিকারণ-সম্বন্ধে যত-রাজ্যের অসম্ভব কল্পনা দ্বারা কমলাকে রাগাইয়া তুলিল। যখন বলিল, “আরব্য উপত্যাসের প্রদীপওয়াল। আলাদীন বেলুচিস্থান হইতে গরম-গরম ভাজাইয়া তাহার দৈত্যকে দিয়া সওগাদ পাঠাইয়াছে,” তখন কমলার আর ধৈর্য্য কিছুতেই রহিল না,—সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “তবে যাও—আমি বলিব না।”

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল—“না না, আমি হার মানিতেছি। মাঝদরিয়ার লুচি—এ যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আমি ত ভাবিয়া পাইতেছি না—কিন্তু তবু খাইতে চমৎকার লাগিতেছে।”

এই বলিয়া রমেশ তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা ক্ষুধানিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সবেগে সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

স্টীমার চরে ঠেকিয়া গেলে, শুলভাওয়ার-পূরণের চেষ্টায় কমলা উমেশকে গ্রামে পাঠাইয়াছিল। স্থলে থাকিতে জলপানি-স্বরূপে রমেশ কমলাকে যে কয়টি টাকা দিয়া-ছিল, তাহারই মধ্য হইতে অল্প-কিছু বাঁচিয়া-ছিল, তাহাই দিয়া কিছু বি-ময়দা সংগ্রহ হইল। উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“উমেশ, তুই কি খাবি বল দেখি ?”

উমেশ কহিল—“মাঠাকুরুণ, দয়া কর যদি, গ্রামে গোয়ালার বাড়ীতে বড় সরেস দই দেখিয়া আসিলাম—কলা ত ঘরেই আছে, আর পরসা-হুয়েকের চিড়ে-মুড়কি হইলেই পেট ভরিয়া আজ ফলার করিয়া লই।”

লুক্ক বালকের ফলারের উৎসাহে কমলাও উৎসাহিত হইয়া উঠিল—কহিল,
“পরশা কিছু বাঁচিয়াছে উমেশ ?”

উমেশ কহিল—“কিছু না মা !”

কমলা মুক্ছিলে পড়িয়া গেল । রমেশের কাছে কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া টাকা চাহিবে, তাই ভাবিতে লাগিল । একটু পরে বলিল—
“তোমার ভাগ্যে আজ যদি ফলার না-ই জোটে, তবে লুচি আছে—তোমার ভাবনা নাই । চল, ময়দা মাথুবি চল !”

উমেশ কহিল—“কিন্তু মা, দই যা দেখিয়া আসিলাম, সে আর কি বলিব ।”

কমলা কহিল, “দেখ্ উমেশ, বাবু যখন থাইতে বসিবেন, তখন তুই তোমার বাজারের পরশা চাহিতে আসিস্ ।”

রমেশের আহার কতকটা অগ্রসর হইলে, উমেশ আসিয়া দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে মাথা চুলকাইতে লাগিল । রমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল । সে অকৌতুহিতে কহিল—
“মা, বাজারের পরশা—”

“তখন রমেশের হঠাৎ চেতনা হইল যে, আহারের আয়োজন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা করিলে চলে না । ব্যস্ত হইয়া কহিল—
“কমলা, তোমার কাছে ত টাকা কিছুই নাই । আমাকে মনে করাইয়া দাও নাই কেন ?”

কমলা নীরবে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল । আহারান্তে রমেশ কমলার হাতে একটি ছোট ক্যাশ্বাক্স দিয়া কহিল—“এখন-কার মত তোমার ধনরত্ন সব এইটেতেই রহিল ।”

এইরূপে গৃহিণীপনার সমস্ত ভারই আপনা হইতেই কমলার হাতে গিয়া পড়িতেছে, রমেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আবার একবার জাহাজের রেলিং ধরিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিল । পশ্চিম আকাশ দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের উপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া আসিল ।

উমেশ আজ পেট ভরিয়া চিড়ে-দই-কলা মাখিয়া ফলার করিল । কমলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার জীবনবৃত্তান্ত সন্নিহিত আয়ত্ত করিয়া লইল ।

বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ কানীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল—সে কহিল, “মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ, তবে আমি আর কোথাও যাই না ।”

মাতৃহীন বালকের মুখে মা-সন্তানগণ শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয়ের কোন্-এক গভীরদেশ হইতে জননী সাড়া দিল—কমলা স্নিগ্ধস্বরে কহিল—“বেশ ত উমেশ, তুই আমাদের সঙ্গেই চল !”

২৭

ভীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যা-বধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল । গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্তদিন চরিয়া বহুহংসের দল আকাশের স্তানায়মান সূর্য্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাজি-যাপনের জন্ত চলিয়াছে । কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া- গেছে ! নদীতে তখন নোকা ছিল না ;—একটিমাত্র বড় ডিঙি গাঢ় সোনালিসবুজ

নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা
বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল ।

রমেশ জাহাজের ছাদের সম্মুখভাগে
নবোদিত সুরূপক্ষের তরুণচাঁদের আলোকে
বেতের কেন্দ্রা টানিয়া-লইয়া বসিয়া ছিল । এই
শূন্য নদীতটের সন্ধ্যার উর্দ্ধদেশে চাঁদ যেমন
দিকপ্রান্তের কুহেলিকা হইতে নির্মল মধ্য-
কাশে আপনি ভাসিয়া উঠিতেছে—তেমনি
রমেশের সমস্ত চিত্তের গভীরতা হইতে একটি
মধুর স্মৃতি বিকীর্ণ মেঘজালের ভিতর দিয়া
আপনি নিঃশব্দপদে সকলের উচ্চে ভাসিয়া
উঠিতেছিল ।

কালিদাস বলিয়াছেন—রমণীয় দৃশ্য
দেখিলে এবং মধুর ধ্বনি শুনিলে জন্মান্তরের
ভালবাসাগুলি যেন মনে পড়িয়া যায় ।
কালিদাসের সেই শ্লোকটি মনে মনে আরতি
করিয়া রমেশ ভাবিতে লাগিল, ‘ইহজন্মের
মধ্যেই জন্মান্তর ঘটে । বেশাদিনের কথা নয়,
—একমাসও হইবে না—সেদিন ত আজ একে-
বারে গতজন্মের মতই গত । সেই দিনের মধ্যে
আজ প্রবেশের কোন পথই দেখা যাইতেছে
না—হঠাৎ মাঝখানে যেন একমুহূর্তে বহু-
শতাব্দী প্রবাহিত হইয়া সেদিনকে অতীত
পরপারের অন্তাচলচ্ছায়ার মধ্যে লইয়া
গেছে ।’ আজিকার এই নদীতীরের শরৎসন্ধ্যা
তাহার জগদ্বাপা বৃহৎ অবসানবেদনার
নিস্তরুতার রমেশের সেই গতজন্মকে আচ্ছন্ন
করিয়া ঐ শুককুলায় আব্রবনে, ঐ ভৃগুশূন্য
বালুতটে, এই তরঙ্গরেখাবিহীন বিপুল জল-
রাগের উপরে একাকিনী অবগুষ্ঠিতমুখে
কীর্ণজ্যোৎস্ন আকাশতলে দাঁড়াইয়া আছে ।

তাহার সেদিনের সহিত আজিকার

দিনের ক্ষণকালের মধ্যেই এত-বড় বিচ্ছেদ
হইয়া গেছে, তবু সেই অতীতলগ্নী বিশ্ব-
জগৎকে সেই চিরপরিচিত মূর্তিতে উদ্বেষিত
করিয়া তুলিতেছে । সেই ভাবগভীর মুখ,
সেই নির্মল ললাটের উপরে জলভারনয়
নবনীরদের মত শুভিত কেশরাজি, সেই
সুকুমার গ্রীবা, সেই তরুণ তনুদেহে কোমল
শাড়ীটির তরঙ্গিত অঞ্চলরেখা, সেই স্নিগ্ধ-
বিশস্ত দুষ্টির নিবিড় একাগ্রতা আজ সান্নাঙ্কের
মানিমা হইয়া, সন্ধ্যাতারার সূদূরতা হইয়া,
তরুপ্রচ্ছন্ন গ্রামের নিভৃত-নিস্তরু বিশ্রাম
হইয়া, জনশূন্য বালুতটের দিগন্তপ্রসারিত
পাতুরতা হইয়া বিশাল প্রকৃতির মুক-বৃহৎ
অব্যক্তভাষায় জলে-স্থলে-আকাশে,—চক্রে
অক্ষুট আলোকে ও বনের প্রগাঢ়চ্ছায়ায়,—
নদীর স্তিমিত-গোপন গতিতে ও তটভূমির
তিমিরচ্ছন্ন গভীর নিশ্চলতায় অপরূপভাবে
ভাষান্তরিত হইতে লাগিল এবং রমেশকে
‘অন্তরে-বাহিরে, আপাদমস্তকে, তাহার
চেতনার কুহরে-কুহরে আবিষ্ট করিয়া
ধরিল—অনির্কটনীয় বেদনায় তাহার হৃৎ-
পিণ্ডকে পীড়ন করিয়া তাহার বিদীর্ণ
শতচ্ছিন্ন হইতে প্রেমের সুধারসধারা
তীক্ষ্ণবেগে নিস্তরু নক্ষত্রলোকের মাঝখানে
উৎসারিত করিয়া দিল ।

পশ্চিম আকাশ হইতে সন্ধ্যার শেষ
স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া গেল ; চন্দ্রালোকের
ইজ্জতালে কঠিন জগৎ যেন গানে, যেন
স্বপ্নে, যেন কবির কল্পনারূপে বিগলিত হইয়া
আসিল । রমেশ আপনা-আপনি মৃদুস্বরে
বলিতে লাগিল—“হেম, হেম!”—সেই নামের
শব্দটিমাত্র যেন সুমধুর-স্পর্শরূপে তাহার

সমস্ত হৃদয়কে বারংবার বেঁটন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল—সেই নামের শব্দটি-মাত্র যেন অপরিমেয়-করুণারসার্ধ হইলি ছায়াময় চক্ষুরূপে তাহার মুখের উপরে বেদনা বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল। রমেশের সর্বশরীর পুলকিত এবং হুই-কু-অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তাহার গত হুই বৎসরের জীবনের সমস্ত ইতিহাস তাহার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল;—সমস্ত তুচ্ছকথা, ক্ষুদ্রঘটনা এক অপূর্ণ রাগিণীর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া তাহার বক্ষের মধ্যে কুহরিত হইতে লাগিল। হেমনলিনীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের দিন মনে পড়িয়া গেল। সেদিনকে রমেশ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যোগেন্দ্র যখন তাহাকে তাহাদের চায়ের টেবিলে লইয়া গেল, সেখান হেমনলিনীকে বলিয়া থাকিতে দেখিয়া লাভুক রমেশ আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। অল্পে অল্পে লজ্জা ভাঙিয়া গেল, হেমনলিনীর সঙ্গ অভ্যস্ত হইয়া আসিল, ক্রমে সেই অভ্যাসের বন্ধন রমেশকে বন্দী করিয়া তুলিল। কাব্যসাহিত্যে রমেশ প্রেমের কথা বাহ্য-কিছু পড়িয়াছিল, সমস্তই সে হেমনলিনীর প্রতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিল। আমি ভালবাসিতেছি মনে করিয়া সে মনে মনে একটা অহঙ্কার অনুভব করিল। তাহার সহপাঠীরা পরাক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভালবাসার কবিতার গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া মরে—আর রমেশ সত্যসত্যই ভালবাসে, ইহা চিন্তা করিয়া অল্প ছাত্রাদয়কে সে কৃপাপাত্র মনে করিত। রমেশ আজ আলো-

চনা করিয়া দেখিল, সেদিনও সে ভালবাসার বহির্দ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবনসমস্তাকে জটিল করিয়া তুলিল, তখন নানা বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম স্বাকারধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। এখন আর এ শাস্ত্রালোচনা নহে, খেলা নহে, এখন স্নেহঃখ নিরতিশয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, এখন প্রেম জীবন-মরণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সংসারের সকল সত্যের চেয়ে সে সত্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রমেশ তাহার হুই করতলের উপরে শির নত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্মুখে সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার ক্ষুধিত উপবাসী জীবন—দৃষ্টে সঙ্কটজালে বিজড়িত। এ জাল কি সে সবলে হুই হাত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবে না? ছিন্ন করিতেই হইবে—তাহার ইহজীবনের বাহ্য সর্বাপেক্ষা সত্য, বাহ্য সফলতা, তাহা লাভ করিতেই হইবে! তাহার কোন্ এক জায়গায় কাপুরুষতার ছিদ্র পাইয়া শনি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে—কতিন সত্যকে আশ্রয় করিয়া কোনো আপাত-ফলের দিকে না তাকাইয়া বাস্তবের ত্রায় আপনাকে মুক্তি দিতে হইবে!

এই বাঁলয়া সে দৃঢ়সঙ্কল্পের অব্যবহায়ে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, অদূরে আর-একটা বেতের চৌকির পিঠের উপরে হাত রাখিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে। কমলা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়া-

ছিলে, আমি বুঝি তোমাকে জাগাইয়া দিলাম ?”

অনুতপ্ত কমলাকে চলিয়া যাইতে উত্তত দেখিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল—“না, না কমলা, আমি ঘুমাই নাই—তুমি বোস, তোমাকে একটা গল্প বলি।”

গল্পের কথা শুনিয়া কমলা পুলকিত হইয়া চৌকি টানিয়া-লইয়া বসিল। রমেশ স্থির করিয়াছিল, কমলাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এত-বড় একটা আঘাত হঠাৎ সে দিতে পারিল না—তাই খালল, “বোস, তোমাকে একটা গল্প বলি।”

রমেশ কহিল—“সেকালে একজাত ক্ষত্রিয় ছিল, তাহারা—”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“কবেকার কালে ? অনে—ক-কাল আগে ?”

রমেশ কহিল—“হাঁ, সে অনেককাল আগে। তখন তোমার জন্ম হয় নাই।”

কমলা। তোমারি নাকি জন্ম হইয়াছিল ! তুমি নাকি বহুকালের লোক ! তার পরে !

রমেশ। সেহ ক্ষত্রিয়দের অন্তঃম ছিল, তাহারা নিজে বিবাহ করিতে না গিয়া তলোয়ার পাঠাইয়া দিত। সেহ তলোয়ারের সহিত বধুর বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া আবার বিবাহ করিত।

কমলা। না না, ছিঃ ! ও কি-রকম বিবাহ !

রমেশ। আমিও ও-রকম বিবাহ পছন্দ করি না—[কঙ্ক কি করিব—যে ক্ষত্রিয়দের কথা বলিতেছি, তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত নিজে

গিয়া বিবাহ করিতে অপমান বোধ করিত। আমি যে রাজার গল্প বলিতেছি, সে ঐ জাতের ক্ষত্রিয় ছিল। একদিন সে—

কমলা। তুমি ত বলিলে না, সে কোথাকার রাজা ?

রমেশ বলিয়া দিল—“মদ্রদেশের রাজা। একদিন সেই রাজা—”

কমলা। রাজার নাম কি আগে বল !

কমলা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লইতে চায়—তাহার কাছে কিছুই উহা রাখিলে চলিবে না। রমেশ এতটা জানিলে আগে হইতে আরো বেশি প্রস্তুত হইয়া থাকিত—এখন দেখিল, কমলার গল্প শুনিতে যতই আগ্রহ থাক্, গল্পের কোনো জায়গায় তাহার ফাকি সহ হয় না।

রমেশ হঠাৎ প্রস্নে একটু ধমকিয়া বলিল, “রাজার নাম রণজিৎ সিং।”

কমলা একবার আবৃত্তি করিয়া লইল—“রণজিৎ সিং, মদ্রদেশের রাজা। তার পরে ?”

রমেশ। তার পরে একদিন রাজা ভাটের মুখে গুলিলেন, তাহারি জাতের আর-এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে।

কমলা। সে আবার কোথাকার রাজা ?

রমেশ। মনে কর, সে কাঞ্চীর রাজা।

কমলা। মনে করিব কি ! তবে সত্য কি সে কাঞ্চীর রাজা নয় ?

রমেশ। কাঞ্চীরই রাজা বটে। তুমি তার নাম জানিতে চাও ? তার নাম অমর-সিং।

কমলা। সেই মেয়ের নাম ত বলিলে না ? সেই পরমা সুন্দরী কন্যা !

রমেশ । হাঁ হাঁ, ভুল হইয়াছে বটে ।
সেই মেয়ের নাম—তাহার নাম—ওঃ, তাহার
নাম চন্দ্রা—

কমলা । আশ্চর্য্য ! তুমি এমন ভুলিয়া
যাও ! তুমি ত আমারি নাম ভুলিয়াছিলে !

রমেশ । কোশলের রাজা ভাটের মুখে
এই কথা শুনিয়া—

কমলা । কোশলের রাজা কোথা হইতে
আসিল ? তুমি যে বলিলে মদ্রদেশের
রাজা—

রমেশ । সে কি এক জায়গার রাজা
ছিল মনে কর ? সে কোশলেরও রাজা,
মদ্রেরও রাজা ।

কমলা । ছই রাজ্য বুঝি পাশাপাশি ?

রমেশ । একেবারে গায়ে-গায়ে লাগাও ।

এইরূপে বারংবার ভুল করিতে করিতে
ও সতর্ক কমলার প্রশ্নের সাহায্যে সেই সকল
ভুল কোনমতে সংশোধন করিতে করিতে
রমেশ এইরূপভাবে গল্পটি বলিয়া গেল :—

“মদ্ররাজ রণজিৎসিং কাঞ্চীরাজের নিকট
রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানা-
ইয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন । কাঞ্চীর রাজা
অমরসিং খুসি হইয়া সম্মত হইলেন ।

“তখন রণজিৎসিংহের ছোট ভাই ইন্দ্রজিৎ-
সিং সৈন্তসামন্ত লইয়া নিশান উড়াইয়া
কাড়ানাকাড়া ছন্দুভিদামামা বাজাইয়া কাঞ্চীর
রাজ্যোদ্ভানে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন । কাঞ্চী-
নগরে উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল ।

“রাজার দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া শুভ দিনকণ
হির করিয়া দিল । ক্রক্কা ঘাদনীতিথিতে রাজি
আড়াই প্রহরের পর লম্ব । রাজ্যে নগরের
ঘরে ঘরে ফুলের মালা ছলিল এবং নীপাবলি

জলিয়া উঠিল । আজ রাজ্যে রাজকুমারী
চন্দ্রার বিবাহ ।

“কিন্তু কাহার সহিত বিবাহ, রাজকন্যা
চন্দ্রা সে কথা জানেন না । তাহার জন্ম-
কালে পরমহংস পরানন্দস্বামী রাজাকে
বলিয়াছিলেন, ‘তোমার এই কন্যার প্রতি
অশুভগ্রহের দৃষ্টি আছে, বিবাহকালে
পাত্তের নাম যেন এ কথা জানিতে না
পারে ।’

“যথাকালে তরবারির সহিত রাজকন্যার
গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেল । ইন্দ্রজিৎসিং
যৌতুক আনিয়া তাহার ভ্রাতৃবধূকে প্রণাম
করিলেন । মদ্ররাজ্যের রণজিৎ এবং
ইন্দ্রজিৎ যেন দ্বিতীয় রামলক্ষ্মণ ছিলেন ।
ইন্দ্রজিৎ আখ্যা চন্দ্রার অবগুপ্তিত লজ্জাক্রম
মুখের দিকে তাকাইলেন না—তিনি কেবল
তাঁহার নৃপুরবেষ্টিত সুকুমার চরণশৃঙ্গলের
অলঙ্করেখাটুকুমাত্র দেখিয়াছিলেন ।

“যথারীতি বিবাহের পরদিনেই মুক্তা-
মালার ঝালর-দেওয়া পালকে বধূকে লইয়া
ইন্দ্রজিৎ স্বদেশের দিকে যাত্রা করিলেন ।
অশুভগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে
কাঞ্চীরাজ কন্যার মস্তকের উপরে দক্ষিণহস্ত
রাখিয়া আলীকাদ করিলেন—মাতা কন্যার-
মুখচুখন করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে
পারিলেন না—দেবমন্দিরে সহস্র গ্রহবিপ্র
সন্ত্যয়নে নিষুক্ত হইল ।

“কাঞ্চী হইতে মদ্র বহুদূর—প্রায় এক-
মাসের পথ । দ্বিতীয়রাজ্যে যখন বেতসা-
নদীর তীরে শিবির রাখিয়া ইন্দ্রজিতের
দলবল বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমন-
সময় বনের মধ্যে মশালের আলো দেখা

গেল। ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য ইঞ্জিৎ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

“সৈনিক আসিয়া কহিল, ‘কুমার, ইহারাও আর-একটি বিবাহের যাত্রিদল। ইহারাও আমাদের অশ্রেণীয় ক্ষত্রিয়: অস্ত্রোদ্ধাহ সমাধা করিয়া বধূকে পতিগৃহে লইয়া চলিয়াছে। পথে নানা বিঘ্নভয় আছে, তাই ইহারা কুমারের শরণ প্রার্থনা করিতেছে। আদেশ পাইলে কিছুদূর পথ ইহারা আমাদের আশ্রয়ে যাত্রা করে।’

“কুমার ইঞ্জিৎ কহিলেন, ‘শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম। যত্ন করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।’

“এইরূপে দুই শিবির একত্র মিলিত হইল।

“তৃতীয় রাত্রি অমাবস্তা। সম্মুখে ছোট ছোট পাহাড়, পশ্চাতে অরণ্য। শ্রান্ত সৈনিকেরা বিস্তীর্ণ শব্দে ও অদূরবর্তী করণার কলধ্বনিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

“এমন সময়ে হঠাৎ কলরবে সকলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মদ্রশিবিরের ঘোড়া-গুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে—কে তাহাদের রজ্জু কাটিয়া দিয়াছে—এবং মাঝে মাঝে একএকটা তাঁবুতে আগুন লাগিয়াছে ও তাহার দীপ্তিতে অমাব্যাত্রি রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

“বুঝা গেল, দস্যু আক্রমণ করিয়াছে। মারামারি, কাটাকাটি বাধিয়া গেল—অন্ধকারে শত্রু-মিত্র ভেদ করা কঠিন। সমস্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—দস্যুরা সেই সুযোগে দুটোপাট করিয়া অরণ্যো-পার্শ্বতে অন্তর্ধান করিল।

“যুদ্ধ-অস্ত্রে রাজকুমারীকে আর দেখা গেল না। তিনি ভয়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একদল পলায়নপর লোককে স্বপক্ষ মনে করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন।

“তাহারা অল্প বিবাহের দল। গোল-মালে তাহাদের বধূকে দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া গৈছে। রাজকন্যা চক্ষাকেই তাহারা নিজেদের বধূ জ্ঞান করিয়া দ্রুতবেগে স্বদেশে যাত্রা করিল।

“তাহারা দরিদ্র ক্ষত্রিয়; কলিঙ্গ সমুদ্র-তীরে তাহাদের বাস। সেখানে রাজকন্যার সঞ্চিত অল্পপক্ষের বরের মিলন হইল। বরের নাম চেংসিং।

“চেংসিংয়ের মা আসিয়া বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। আত্মীয়স্বজন সকলে আসিয়া কহিল, ‘আহা, এমন রূপ ত দেখা যায় না!’

“মুগ্ধ চেংসিং নববধূকে ঘরের কল্যাণলক্ষ্মী বলিয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিল। রাজকন্যাও সতীধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধিতেন—তিনি চেংসিংকে আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

“নবপরিণয়ের লজ্জা ভাঙিতে কিছুদিন গেল। যখন লজ্জা ভাঙিল, তখন কথায়-কথায় চেংসিং জানিতে পারিল যে, বাহাকে সে বধূ বলিয়া ঘরে লইয়াছে, সে রাজকন্যা চন্দ্রা।”

২৮

কমলা রুদ্ধনিধাসে একান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—“তার পরে?”

রমেশ কহিল—“এই পথ্যন্তই জানি, তার পরে আর জানি না। তুমিই বল দেখি, তার পরে কি !”

কমলা। না না, সে হইবে না, তার পরে কি আমাকে বল !

রমেশ। সত্য বলিতেছি, যে গ্রন্থ হইতে এই গল্প পাইয়াছি, তাহা এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই—শেষের অধ্যায়গুলি কবে বাহির হইবে, কে জানে !

কমলা অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল—“যাও, তুমি ভারি দুষ্ট ! তোমার ভারি অন্যায় !”

রমেশ। যিনি বই লিখিতেছেন, তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর। তোমাকে আমি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, চেংসিংহের কি করা উচিত এবং ইহার শেষটা কি হইলে ভাল হয় ?

কমলা। আচ্ছা, চক্রা কি চেংসিংকে ভালবাসিয়াছে ?

রমেশ। গ্রন্থের ভাব দেখিয়া ত তাই বোধ হয়। কিন্তু ভাল বাসুক বা না বাসুক, এখন উপায় কি ? চক্রার যিনি আসল স্বামী, সেই মন্ত্ররাজের কাছে চক্রাকে পাঠাইয়া দিলে তিনি ত চক্রাকে গ্রহণ করিবেন না।

কমলা। তা ত করিবেন না—তা না-ই করিলেন—তাহাতে চক্রার কতি কি ! চক্রা যখন একবার চেংসিংকেই স্বামী বলিয়া জানিয়াছে, তখন অন্য লোকে তাহাকে ত্যাগ করে কি গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার কি আসে-যায়।

রমেশ। তুল কি আর সংশোধন করা যায় না ? যে তাহার স্বার্থ স্বামী নহে,

তাহার কাছ হইতে মন ফিরাইয়া-লওয়া বুঝি একেবারেই অসম্ভব !

কমলা। তুমি কি যে বল, তার ঠিক নাই—মন বুঝি একটা জিনিষপত্রের মত যে, বারবার তাহা দেওয়া-নেওয়া করা যায় ?

রমেশ। অচ্ছা বেশ, চেংসিং ত তাহাকে ধর্ম্মত জী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না ! সে ত তাহার বিবাহিতা নহে।

কমলা। আমি অমন বিবাহ ভাল বুঝিতে পারি না। মন্ত্র পড়িলেই বুঝি বিবাহ হয় ? তার পরে ত স্বামী-স্ত্রী বলিয়া দুজনের মন বোঝা চাই ! সেইটেই ত আসল !

রমেশ। আচ্ছা, মন্ত্ররাজ যদি খবর পাইয়া আসিয়া বলে, ‘চেংসিং, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ,—দাও, আমাকে ফিরাইয়া দাও !’

কমলা। তখন তাহার দুজনে কলিদের সমুদ্রের জলে একত্রে ডুব দিয়া মরিবে—রাজার সঙ্গে ত পারিয়া উঠিবে না !

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, চেংসিং কি চক্রাকে বলিবে যে, সে অন্যের স্ত্রী !”

কমলা কহিল—“বলিলই বা !”

রমেশ কহিল—“এই এক কথায় চেংসিংহের উপর সতী স্ত্রীর যে পবিত্র অধিকার, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে—তখন চক্রা সে ঘরে কেমন ভাবে থাকিবে ?”

কমলা কহিল—“সে ঘরে আর থাকিবে না, কিন্তু তবু ত চেংসিংকে সে—”

রমেশ। বাপের বাড়ীতেও যদি তাহার বাপ না লয় !

কমলা তখন নদীর দিকে চাহিয়া তাহিতে

মাগিল—অনেকক্ষণ পরে কহিল, “আমি জানি না, সে কি করিবে—আমি ত ভাবিয়া উঠিতে পারি না ! বোধ হয়, সে মরিবে !”

রমেশ কিছুক্ষণ শুক হইয়া রহিল—কহিল, “মরিবে জানিয়াও কি চেংসিং সকল কথা চক্ষাংকে প্রকাশ করিয়া বলিবে ?”

কমলা কহিল, “তুমি বেশ যা হোক, না বলিয়া বুঝি সমস্ত গোলমাল করিয়া রাখিবে ? চক্ষাংকে সে এক বলিয়া জানিবে, আর চক্ষাং বুঝি তাহাকে আর বলিয়া বুঝিবে ? সে যে বড় বিস্তী ! চক্ষাং মরুক বা বাঁচুক, সমস্ত স্পষ্ট হওয়া চাই ত !”

রমেশ যন্ত্রের মত কহিল—“তা ত চাই !”

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, “আচ্ছা কমল, যদি—”

কমলা । যদি কি ?

রমেশ । মনে কর, আমিই যদি সত্য চেংসিং হই, আর তুমি যদি চক্ষাং হও—

কমলা বলিয়া উঠিল, “তুমি অমন কথা আমাকে বলিয়ো না ; সত্য বলিতেছি, আমার ভাল লাগে না !”

রমেশ । না, তোমাকে বলিতেই হইবে।—তাহা হইলে আমারই বা কি কর্তব্য, আর তোমারই বা কর্তব্য কি ?

কমলা এ কথার কোনো উত্তর না করিয়া চৌকি ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল । দেখিল, উমেশ তাহাদের কামরার বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে । জিজ্ঞাসা করিল, “উমেশ, তুমি কখনো ভূত দেখি-
য়াছিস্ ?”

উমেশ কহিল, “দেখিয়াছি মা !”

তিনিই কমলা অনতিদূর হইতে একটা

বেতের মোড়া টানিয়া-আনিয়া বসিল—কহিল, “কি-রকম ভূত দেখিয়াছিলি বল !”

কমলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে রমেশ তাহাকে কিরিয়া ডাকিল না । চন্দ্রখণ্ড তাহার চোখের সম্মুখে ঘন বাঁশবনের অন্ত-রালে অদৃশ্য হইয়া গেল । ডেকের উপরকার আলো নিবাইয়া-দিয়া তখন সারং-খালাসিয়া জাহাজের নীচের তলায় আহার ও বিশ্রামের চেষ্টায় গেছে । প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রী কেহই ছিল না । তৃতীয়শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে জল ভাঙিয়া ডাঙায় নামিয়া গেছে । তীরে ভিমিরাচ্ছন্ন ষোপকাপ-গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অদূরবর্তী বাজারের আলো দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে লোকালয়ের কলগুঞ্জনধ্বনি বনভূমির বিল্লীময়কে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিতেছে । পরিপূর্ণ-নদীর ধরস্রোত নোঙরের লোহার শিকলে বন্ধার দিয়া চমিয়াছে এবং থাকিয়া-থাকিয়া জাহাজের ক্ষীতনাড়ির কম্পবেগ ধীরাক্রমে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে । দূর পারের অন্ধনিমগ্ন নিমজ্জন ঝাউবন, নিস্তরঙ্গ নদীর ধারা, এ পারের বনবেষ্টিত গ্রাম, সমস্তই অন্ধকারের মধ্যে অপরিব্যক্তভাবে সৃষ্টির আদিকালীন গর্ভবাসচ্ছাবর মত দেখা যাইতেছে ।

এই অপরিফুট বিপুলতা, এই অন্ধকারের নিবিড়তা, এই অপরিচিত দৃশ্যের প্রকাণ্ড অপূর্ণতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রমেশ তাহার কর্তব্যসমগ্রা উত্তেজ করিতে চেষ্টা করিল । রমেশ বুঝিল যে, হেমললিনী কিংবা কমলা, উভয়ের মধ্যে একজনকে বিশুদ্ধন দিতেই হইবে । উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিবার

কোনো মধ্যপন নাই। তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে—এখনো হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কমলাকে ত্যাগ করিলে এ জীবনে তাহার আর কোনো উপায় নাই।

মাছুষের স্বার্থপরতার অন্ত নাই। হেমনলিনীর যে রমেশকে ভুলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার রক্ষার উপায় আছে—রমেশের সম্বন্ধে সে যে অনন্তগতি নহে, ইহাতে রমেশ কোনো সাহসনা পাইল না, তাহার আগ্রহের অধীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি হেমনলিনী তাহার সম্মুখ দিয়া যেন খলিত হইয়া,--চিরদিনের মত অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, এখনো যেন বাহ বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারা যায়।

হুই করতলের উপরে সে মুখ রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। দূরে শূগাল ডাকিল, গ্রামে হুই-একটা অসহিষ্ণু কুকুর খেউ-খেউ করিয়া উঠিল। রমেশ তখন করতল হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা জনশূন্য অন্ধকার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া-গিয়া কহিল, “কমল, তুমি এখনো শুইতে যাও নাই? রাত ত কম হয় নাই!”

কমলা কহিল—“তুমি শুইতে যাইবে না?”

রমেশ কহিল—“আমি এখনি যাইব, পুৰদিকের কামরায় আমার বিছানা হই-
শুই। তুমি আর দেরি করিও না।”

কমলা আর-কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল। সে

আর রমেশকে বলিতে পারিল না যে, কিছুক্ষণ আগেই সে ভূতের গল্প শুনিয়াছে, এবং তাহার কামরা নির্জন।

রমেশ কমলার অনিচ্ছুক মন্দপদ-বিক্ষেপে অন্তঃকরণে আঘাত পাইল—কহিল, “ভয় করিও না কমল—তোমার কামরায় পাশেই আমার কামরা—মাকের দরজা খুলিয়া রাখিব।”

কমলা স্পষ্টভাবে তাহার শির একটুখানি উৎক্লিষ্ট করিয়া কহিল—“আমি ভয় করিব কিসের?”

রমেশ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া বাতি নিবাইয়া-দিয়া শুইয়া পড়িল—মনে মনে কহিল, “কমলাকে পরিত্যাগ করিবার কোনো পথ নাই, অতএব হেমনলিনীকে বিদায়! আজ ইহাই স্থির হইল, আর বিধা করা চলে না।”

হেমনলিনীকে বিদায় বলিতে যে জীবন হইতে কতখানি বিদায়, তাহা অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া রমেশ অনুভব করিতে লাগিল। তখন হেমনলিনীর প্রতি একটি অশ্রুপূর্ণ অভিমানে রমেশের সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে হেমনলিনী তাহার সম্পূর্ণ পর হইয়া গেছে, সেই ভবিষ্যতের হেমনলিনী তাহার বঙ্গনানেত্রের সম্মুখে উদ্ভিত হইল। রমেশের কথা এখন তাহাকে কেহ শ্রবণ করাইয়া দিলে তাহার লজ্জাবোধ হয়, হাসি পায়। রমেশের সহিত সম্বন্ধ এখন তাহার পক্ষে একসময়কার ছেলেরেলোমাত্র হইয়া উঠিয়াছে। রমেশের বিরুদ্ধে এখন তাহাকে নানা গোকে নানা কথা শুনাইয়াছে—হেমনলিনী জানিয়াছে যে, রমেশ কমলাকে

বিবাহ করিয়া তাহাদের কাছে গোপন করিয়াছিল। এ সমস্ত কথা শুনিয়াও হেম-নলিনী রমেশকে একবার অপবাদকালন করিবার অবকাশমাত্রও দিল না! রমেশের বিরুদ্ধে এত-বড় কথাটা সে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারিল! ইহার পরে সে যদি রমেশের অস্তিত্ব একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিত, তবে তাহা দয়ার কাজ হইত, কিন্তু ঘৃণার তাহাকে ভুলিতে দিবে না--রমেশের সহিত পূর্বসম্বন্ধ কঠিন লজ্জার দ্বারা খোদিত হইয়া তাহার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে! রমেশ আর বিছানায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিয়া বাহিরে আসিল—নিশীথিনীর অন্ধকারে একবার অনুভব করিয়া লইল যে, তাহারই লজ্জা, তাহারই

বেদনা অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চির-কালের জ্যোতির্লোকসকল শুদ্ধ হইয়া আছে—রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাস-টুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না—এই শরতের রজনীতে রমেশের এই মর্শা-স্তিক ব্যথা জগতের নিদ্রা-মহাসাগরকে কত-টুকুই বা নাড়া দিয়াছে! এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নিমুগ্ন গ্রামগুলির বনপ্রান্তচ্ছারায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে,—যখন রমেশের জীবনের সমস্ত দিকার আশানের ভঙ্গমুষ্টির মধ্যে চিরঐধ্যমরী ধরনীতে মিশাইয়া চির-দিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে!

ক্রমশ ।

মুক্তি ।



ডাক্তার অরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনাইন ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, 'তোমার কুইনাইন-সেবন কর্তব্য।' এই সময়ে যদি কেহ গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, 'কুইনাইন-সেবন মাস্তুষের কর্তব্য নহে, পরোপকারই মাস্তুষের কর্তব্য', তাহা হইলে বিগত হাস্যরসের সৃষ্টি হয় মাত্র, রোগীর কোন উপকার হয় না।

আজকাল গদ্যে পদ্যে বক্তৃতায় শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়া ঐক্য বা তাহা অপেক্ষাও উৎকট ব্যক্তিবিশিষ্ট ঘটনা হয়, কিন্তু তাহাতে

হাস্যরসের উদ্ভব কেন হয় না, বুঝিতে পারা যায় না।

প্রাচীনকালে আধাসমাজে কতকগুলি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবাদি সম্পাদিত হইত; উহাদিগকে যাগযজ্ঞ বলিত ও উহাদের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম। তৎকালে তৎসমাজে ঐ সকল অনুষ্ঠানের উপযোগিতার বিচার এখন কঠিন। একালে আমরা ধর্মশব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি ও গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করি ও কাব্য লিখি—'যজ্ঞে ধর্ম নহে, ধর্ম লোকহিত।' আর

তাহারা এইরূপ বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের আশঙ্কানাই বা কত !

শব্দের অপপ্রয়োগের এইরূপ আরও উদাহরণ আছে । আমাদের দর্শনশাস্ত্রে মুক্তি-শব্দটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় । খ্রীষ্টানদের স্বীকৃত salvation নামক একটা ব্যাপার আছে ; আজকাল অনেকে salvation অর্থে মুক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়া নানাবিধ উৎকট মুক্তির অবতারণা করেন ।

মুক্তি-শব্দের অর্থ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য । কিন্তু এইখানেই বলিয়া রাখা উচিত, মুক্তি অর্থে আর যাহাই হউক, উহা খ্রীষ্টানি salvation নহে ।

খ্রীষ্টানি salvation এর অর্থ কি ? খ্রীষ্টানিমতে মনুষ্যমাজ্জই জন্মাবধি পাপী । মনুষ্য আপনার পাপের ফলভোগ করিতে বাধ্য । মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা ও বিচারক খোদা * পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য ; নতুবা তাঁহার ভায়পরতা থাকে না । কিন্তু তিনি আবার করুণাময় । কাজেই তিনি করুণাবশে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইলেন ও মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও মনুষ্যজাতির প্রতীকরূপে আপনার শোণিতপাতদ্বারা মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । তাঁহার শোণিতধারায় মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইল । যে তাঁহার শরণাগত হইবে, বিচারের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া খোদাকর্তৃক গৃহীত হইবে, তাহাকে আর পাপের অবলম্ব্যবাহী শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না । সে তৎপরে চিরকাল ধরিয়া স্বর্গে

বা খোদা-সান্নিধ্যে বাস করিবে । মনুষ্যের এই পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তির ইংরাজি নাম salvation ; বাঙাল্য উহাকে ‘পরিজ্ঞাপ’ বলা যাইতে পারে । এইরূপে খ্রীষ্টানেরা খোদার ভায়পরতা ও করুণাময়তার সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন । মনুষ্যের পাপমোচন ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় খোদার রূপা ; যে অমৃতপুচিস্তে সেই রূপার ভিখারী হইয়া সেই করুণানিধান জ্ঞানকর্তার শরণাগত হয়, সেই পরিজ্ঞাপ পায় । এই ব্যাপারকে মুক্তি না বলিয়া পরিজ্ঞাপ বলাই অধিক সঙ্গত । খোদার অবতার বীণখ্রীষ্ট এই হিসাবে মানব-জাতির পরিজ্ঞাপকর্তা ।

খ্রীষ্টানসমাজে এই পরিজ্ঞাপের খিণ্ডরি কোথা হইতে আসিল, বলা দুষ্কর । অতি প্রাচীন ইহুদিসমাজে এইরূপ পরিজ্ঞাপ ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল কি না, সন্দেহের স্থল । ইহুদিরা আপনাদিগকে জেহোবা-দেবের অমৃগৃহীত জাতি বলিয়া জানিত । তাহারা প্রবলতর-জাতিগণ-কর্তৃক পুনঃপুনঃ নিগৃহীত হইয়াছিল । জেহোবার (জাহবে-নামক ইহুদিগণের রাষ্ট্রীয় দেবতার) আদেশলঙ্ঘনই তাহাদের এই নিগ্রহের ও বিপৎপাতের কারণ বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল । তাহাদের জাতীয় দুর্দশার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিয়া দাস্তানা পাইত । মনে করিত, ভবিষ্যতে মেশায়া জয়গ্রহণ করিয়া তাহাদের এই চিরন্তন দুঃখ মোচন করিবেন । এই মেশায়া কতকটা আমাদের কঙ্কি-অবতারের মত । ভগবান্ কঙ্কিরূপে অব-

* ইংরাজি God বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদের ইশ্বরশব্দে সর্বত্র তাহা বুঝায় না । এইজন্ত God এর ওপরে আরও খোদা-শব্দ ব্যবহার করা গেল ।

তীর্ণ হইয়া স্নেহনিবহ নিধন করিয়া সনাতন-ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ আমাদের পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। ইহুদিদিগেরও সেইরূপ আশা ছিল, মেশায়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদিগের জাতীয় দুরবস্থার অপ-নোদন হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ইহুদিগের মধ্যে প্রফেট নামে একশ্রেণীর লোক প্রচুর সম্মানভাজন হইয়া-ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবী মেশায়ায় অস্তিত্ব গুণ ও অস্তিত্ব কর্তব্য অর্পণ করিতেন। কিন্তু সাধারণ ইহুদিজাতির বিশ্বাস তাহাতে অধিক পরিবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই যখন মেরী-পুত্র যীশু জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে খ্রীষ্ট ও মেশায়া বলিয়া প্রচার করিলেন, অথচ ইহুদিজাতির আকাজিক জাতীয় হুঃখের অবসান হইল না, তখন অধিকাংশ ইহুদি তাঁহাকে মেশায়া বলিয়া স্বীকার করিল না। ইহুদিদের মধ্যে কেহ কেহ উহা স্বীকার করিয়া একটা দল বাধিল মাত্র। তৎপরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও তাঁহার ত্রাণকর্তৃত্ব ইহুদিসমাজের বাহিরে প্রচারিত করিয়া বৃহৎ খ্রীষ্টানসমাজের স্থাপনা করিলেন। এই খ্রীষ্টীয়সমাজ উনিশ-শত বৎসর ধরিয়া যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তা ও পাপমোচনকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। তাঁহাকে ত্রাণকর্তা বলা বাইতে পারে, কিন্তু মুক্তিদাতা বলা যায় না। কেন না, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে বাহ্যকে মুক্তি বলে, খ্রীষ্টানেরা সেরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন না। সেরূপ মুক্তি খ্রীষ্টানের শাস্ত্রে আছে কি না, জানি না।

যীশুর জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে গৌতমসিদ্ধার্থের জন্ম হইয়াছিল। তিনি একটা দেশবাসী সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করেন, ও তত্ত্বিন্ন গৃহস্থলোকেও দলে দলে তাঁহার সম্মত উপাসকশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছিল। গৌতমসিদ্ধার্থ অনেক সাধনার পর আপ-নাকে বুদ্ধ অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহা নির্বাণের একমাত্র পন্থা বলিয়া নিশ্চয় করেন, মানবজাতির নিকট সেই পন্থার নির্দেশ করিয়া যান। মানবজাতির দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল; তাঁহার প্রদর্শিত নির্বাণের পথ মানবজাতির সেই সনাতন দুঃখ দূরীকরণের একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। সেই দুঃখের কাথায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল এবং তিনি সেই দুঃখমোচনের উপায় আবিষ্কারের জন্য রাজ্যসম্পদ ত্যাগ ও ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিভ্রাজকরূপে বেড়াইয়াছিলেন। তিনি যে নির্বাণের পথ নির্দেশ করেন, তাহা ব্রাহ্মণশাস্ত্রসম্মত মুক্তির পথ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। তাঁহার নির্দিষ্ট নির্বাণকে আমরা মুক্তির সহিত এক পর্যায়ে গ্রহণ করিলে অধিক দোষ হইবে না। কিন্তু এই নির্বাণ বা এই মুক্তি কোন ব্যক্তি-বিশেষের অঙ্গগ্রহণ্য নহে। এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাক্রমে বা অঙ্গগ্রহণ্য মনুষ্যকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ এইরূপ মনুষ্যভাগ্যবিধাতা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহাই সন্দেহের স্থল। বৌদ্ধমতে মনুষ্য আপনার কর্মকল ভোগ করিতে

বাধ্য । সংকর্ষের ফল সদগতি ও সুখলাভ; অসংকর্ষের ফল অসদগতি ও দুঃখলাভ । কোন ব্যক্তি কোনরূপে এই কর্মফল হইতে অব্যাহতিলাভে অসমর্থ । মনুষ্য ইহজীবনে তাহার কর্মফল কতক ভোগ করে; কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলেও তাহার কর্ম তাহাকে ছাড়ে না । সে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারে, এক লোক ত্যাগ করিয়া অন্য লোকে যাইতে পারে । কিন্তু তাহার কর্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায় ।* এবং সেই দেহান্তরে ও লোকান্তরে কৃত কর্মের ফলভোগের জন্য তাহাকে আবার নূতন দেহ ধারণ বা নূতন লোকে বিচরণ করিতে হয় । ইহার নাম সংসার । নরদেহ-পরিভ্রাণের পর মনুষ্য দেবদেহ ধারণ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে । ভুলোক ত্যাগ করিয়া সে কিছুদিন স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে । কিন্তু এই দেবদেহপ্রাপ্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি মুক্তি নহে । সেখানেও কর্ম আছে ও কর্মপাশের বন্ধন আছে । সে বন্ধন হয় ত সোনার শিকলে বন্ধন; আর নরদেহের বন্ধন গোহার শিকলে বন্ধন । কিন্তু উভয়ই বন্ধনদশা । স্বর্গপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে না । সংকর্ম-ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির ও ফলভোগাবসানের পর তাৎকালিক কর্মফলে আবার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটিবে । কাজেই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিল না । সংকর্মই কর, আর অসংকর্মই কর, সংসারচক্রে পরিলম্বন করিতেই

হইবে; অমুক্তিত কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে । কোন দয়ালু পরিজ্ঞাতা এই সংসার-চক্রে হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না । সংসার হইতে অব্যাহতির উপায় নাই ।

তবে এক উপায় আছে । এই সংসার বস্তুর অবিজ্ঞা হইতে উৎপন্ন ভ্রান্ত জ্ঞানমাত্র, ইহা জানিলেই সকল দুঃখ দূর হইতে পারে । নির্ঝলজ্ঞানের বা দুঃখবিমুক্তির এই একমাত্র পন্থা এবং ইহা জ্ঞানের পন্থা । এই জ্ঞানমার্গ ভগবান্ তথাগত আবিষ্কৃত করিয়া ছিলেন । বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায়, এই লোক এতকাল ধরিয়া তমঃস্বপ্নাবগুষ্ঠিত হইয়া প্রমুগ্ধ অবস্থায় ছিল; ভগবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপ জালিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিলেন । মনুষ্য যে দেহধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, পুনঃপুনঃ কন্মবশে বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ইহার মূল অবিজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞান । যে প্রণালীদ্বারা বা প্রেক্ষিতা-দ্বারা বা ধারাক্রমে অবিজ্ঞা হইতে এই সংসারের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ । স্থলান্তরে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যার চেষ্টা করা গিয়াছে । ফল কথা, বাহ্য-কিছু পরিদৃশ্যমান বা অনুভূতমান, বাহ্য-কিছু প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তি—তাহার মূল অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব । স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, বাহ্য-কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা

* বুদ্ধদেব জন্মের অতিশয় শীকার করিতেন না, অথচ জীবের জন্মস্তরপ্রাপ্তি ও বিভিন্ন-দেহ-ধারণ নানিতেন; এই দুই বতের অনেকে সাময়িক করিতে পারেন না । ইংরাজি soul শব্দের অনুবাদে “আত্মা” শব্দ ব্যবহার করার এই বিপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে । বঙ্গা বাহুল্য, soul অর্থে আত্মা নহে ।

কেবল সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন।
উহার ক্ষিতরে কিছুই নাই। সমস্তই শূন্য
ও মরীচিকা। সংসার অস্তিত্বহীন। এই-
টুকু বুঝিলেই জ্ঞান্টি কাটিয়া যাইবে। তখন
বুঝিবে, জন্ম-মৃত্যু সবই মিথ্যা, ইহকাল-
পরকাল কিছুই নাই, সুখ-দুঃখও অস্তিত্বহীন।
এইটুকু বুঝিলেই নির্বাপন ঘটে বা মুক্তি
ঘটে। এইটুকু বুঝিলেই দুঃখ থাকে না ;
এইটুকু বুঝিলেই জন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে
হয় না। কেন না, দুঃখ অস্তিত্বহীন পদার্থ,
জন্মান্তরপরিগ্রহও ভ্রান্ত বিশ্বাসমাত্র। এই
ভ্রান্ত বিশ্বাসটাই অবিজ্ঞা, এই ভ্রান্তির
অপনোদনই নির্বাপন। ইহার ফল দুঃখ-
নাশ।

কাজেই ঐ জ্ঞানোদয় ভিন্ন নির্বাপনভাৱের
উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেই জ্ঞানোদয়
অতি কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছা করিলেই বা
চেষ্টা করিলেই সেই জ্ঞানের উদয় ঘটে না।
বিশজগৎটা জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ, ইহা মনে
করিলেই করা যায় না। অস্তিত্ব অনেক
বড় বড় লোকে যখন এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ
করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের
ত কথাই নাই। তবে সাধারণ মানুষের
কিরিবে কি ? তাহারা বখালাধ্য এই জ্ঞান
লাভের জন্ত চেষ্টা করিতে পারে ; এই জ্ঞান-
লাভের জন্ত যে সাধনা আবশ্যিক, তাহা ঘারা
এই জ্ঞানের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। বুদ্ধ-
প্রদর্শিত আষ্টাদিক মার্গ অবলম্বন করিয়া
সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংজ্ঞা দ্বারা আত্মো-
ন্নতিবিধানের পর শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্ সমাধি-
বলে ঐ জ্ঞানলাভের জন্ত প্রস্তুত হইতে
পারে। মুক্তি আয়াসলভ্য ; উহা জানীর

প্রাপ্য। আষ্টাদিক মার্গ অবলম্বন করিতে
জাতিবর্ণনির্কিঁশেবে সকলেরই অধিকার
আছে, এবং ঐ পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থার চলিলে
ফললাভের সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অধিকার
থাকিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

* ভগবান্ বুদ্ধগৌতম এইরূপে মুক্তির পথ
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এইহেতু
মুক্তির পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কিন্তু
তিনি আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার
করেন নাই। বিতুচ্ছ বৌদ্ধমতে কোন মনুষ্য
বা কোন দেবতা অতঃপরপূর্ব্বক কাহাকেও
মুক্তি দিতে পারেন না ; সেইজন্য বিতুচ্ছ বৌদ্ধ-
মতে মুক্তিদাতা কেহ থাকিতে পারে না।
বিনা অবিদ্যানাশে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা
নাই। কাজেই মুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনা-
সাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে বুদ্ধপ্রদর্শিত
ত্রিশরণমার্গ আশ্রয় করিলে সেই সাধনার পথ
পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। কিংবা এতটুকু
বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ
আশ্রয় না করিলে মুক্তির পথ জানিবার
উপায় থাকে না, অতএব মুক্তিলাভের
উপায় থাকে না। বুদ্ধদেবই জগৎকে মুক্তির
পন্থা দেখাইয়াছেন। যাহারা অন্য পন্থা
দেখাইয়াছেন, তাহারা বৌদ্ধগণের মতে ভ্রান্ত।

বৌদ্ধগণ ভগবান্কে ভবব্যাদির চিকিৎসক,
বৈদ্যরাজ, জ্ঞানসিদ্ধ, দয়্যাসিদ্ধ ইত্যাদি
বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। এই করুণা-
নিধান মহাপুরুষের উপাসনা বৌদ্ধসমাজে
প্রবর্তিত হইরাছিল। কিন্তু তাহার রূপা-
মাত্রে যে মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা বিতুচ্ছ
বৌদ্ধমতের বীকার্য্য নহে।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্কিঁশেবে সকলের

সমুখে আপনান্ন মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্বসাধারণের জন্য মুক্তির পন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু মুক্তিকে অনার্যসংলভ্য বলেন নাই। কিন্তু সর্বসাধারণ অর্চিতে তাঁহাকে মুক্তিদাতার স্বরূপে গ্রহণ করিল। যিনি মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে মুক্তিদাতা, সর্বসাধারণে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। করুণাময় ও মুক্তিদাতৃ, উভয়ের আধারস্বরূপ হইয়া ভগবান্ বৌদ্ধসমাজে অর্চিতে পুজিত হইতে লাগিলেন। উত্তরকালে মহাবানী বৌদ্ধেরা বিবিধ কাল্পনিক বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। সংসারতাপক্লিষ্ট মানব সর্বদাই সংসারক্লেশ হইতে ও জরামরণ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্মণ এই উদ্ধারলাভের কোন সহজ পন্থা দেখান নাই। মহাবানী বৌদ্ধেরা অতি সহজ পন্থা দেখাইয়া দিল। মহাবানীদের কল্পিত বোধিসত্ত্বগণ মূর্তিমৎকরণস্বরূপ। তাঁহারা মানবকে ছুঃখসাগর হইতে তরাইবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। সৌগতমার্গের আশ্রয় লইয়া বোধিসত্ত্বগণের শরণাগত হইলে, তাঁহাদের করুণার ভিখারী হইলে, তাঁহাদের উপাসনা করিলে, কাহাকেও এই সংসারতাপ হইতে উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। বোধিসত্ত্বগণের সহকারে তাঁহাদের পণ্ডীতানীরা বিবিধ দেবতা কল্পিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দ্বয়ার নিধান। তাঁহার শক্তি ভারদেবী সংসারবতাব্রিণী। তাঁহাদের শরণাগত হইয়া সংসারসাগর হইতে অনন্তরাসে উদ্ধার পাইবে। এইরূপে উপাসকের সিদ্ধিদানে ও সংসারক্লেশনিবারণে

সর্বদা উদ্যত অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমার বৌদ্ধগণের উপাসনামন্দিরসকল পূর্ণ হইতে লাগিল। দলে দলে বৌদ্ধ উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেদমার্গব্রষ্ট বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও বৌদ্ধগৃহস্থ উপাসকে দেশ পূর্ণ হইল। মহাধান আশ্রয় করিয়া সংসারবারিষি উত্তীর্ণ হইবার জন্য দলে দলে যাত্রী আসিয়া কুটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণশাসিত আর্য্যসমাজ হইতে সনাতন বৈদিকমার্গ লোপ পাইতে বসিল।

দেখা গেল, খ্রীষ্টানগণের স্বীকৃত পরি-
ত্রাণের পন্থার সহিত বৌদ্ধস্বীকৃত নির্বাণের
পন্থার আদৌ কোন মিল ছিল না। কিন্তু
কালের পরিণতিতে উভয়ই প্রায় ভুল্যমূল্য
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পন্থার পরি-
ণতিসাধনে বৌদ্ধপন্থার কোন প্রভাব ছিল
কি না, ইহা একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক
সমস্যা। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস ও আচারানু-
ষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধ বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের
অদ্ভুত সোসাদৃশ্য দেখিলে এই প্রভাব অস্বী-
কার করিবার উপায় থাকে না। কাহারও
কাহারও মতে মিশরদেশের খেরাপিউটগণ
ও ইহুদিদেশের এসিনিগণ বৌদ্ধসম্প্রদায়
মাত্র। ব্যাপটিষ্ট জোহন বৌদ্ধ ছিলেন এবং
বীণ্ডজীষ্ট বৌদ্ধমতই ইহুদিসমাজে প্রচার
করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা ইহা স্বীকার করিতে
নারাজ। নারাজ হইবারই কথা। প্রত্নতাত্ত্বি-
কেরা ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহেন। মাক্সমুলার
বলিয়াছেন, বিনা ঐতিহাসিক প্রমাণে
খ্রীষ্টানির উপর বৌদ্ধের প্রভাব স্বীকার্য্য
নহে। চীনদেশে ও তিব্বতদেশে খ্রীষ্টানেরা
প্রবেশ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ
আছে। তদ্বারা খ্রীষ্টানি আচারানুষ্ঠান

বৌদ্ধদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারক খ্রীষ্টানের দেশে বাস করিয়া বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিল, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই বৌদ্ধ আচার্য্যগণ খ্রীষ্টানকর্তৃক অঙ্কুরিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

কথাটা ঠিক। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত কোন ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে না। আমরা ঐতিহাসিক নহি। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মুখেই শুনিতে পাই, মহারাজ অশোক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, এপাইরস প্রভৃতি যবনদেশে বৌদ্ধমতপ্রচারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন; পরবর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ গ্রীক ও রোমক নৃপতিগণের সভায় দূত পাঠাইতেন; প্রাচ্যদেশের সহিত ভারত-বর্ষের বহুদিন হইতে বিস্তৃত বাণিজ্যসম্পর্ক প্রচলিত ছিল; যবন নরপতিরা ভারতবর্ষের সম্রাটদিগকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেন; বর্তমান বিচারে এইগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া কেন গৃহীত হয় না, ঠিক বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টান পরিজ্ঞাতত্বের মূলকথা, খোদার করুণা-ব্যতীত পাপাত্মা মানবের মুক্তির সম্ভাবনা নাই, এবং তিনি মানবপ্রেমের বশীভূত হইয়া, অল্প অবতীর্ণ হইয়া, যেচ্ছাক্রমে মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীণাও তঁহার অবতার এবং তিনিই মনুষ্যের পরিজ্ঞানকর্তা। বুদ্ধদেব জীবনের অন্তিম বিধাৎ কখন আর নাই করুন, কাহারও করুণা

দ্বারা মনুষ্য আপন কর্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। একমাত্র জ্ঞানের পক্ষা ত্তির মুক্তির দ্বিতীয় পক্ষা তিনি দেখান নাই। তবে সেই পক্ষা তিনি নিজে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন মাত্র; মুক্তিদাতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই; এবং পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন নাই যে, খ্রীষ্টানের পরিজ্ঞান ও বুদ্ধের নির্বাণ-মুক্তি একবিধ পদার্থ নহে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যে ক্ষমতার স্পর্শ করেন নাই, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। তাঁহাকে জীবের করুণাময় পরিজ্ঞানকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। বুদ্ধগণের ও বোধিসত্ত্বগণের ও বুদ্ধশক্তিগণের শরণগ্রহণ ও উপাসনা সংসার হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির সহজ উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। এমন কি, বুদ্ধের বুদ্ধমুখে বলাইয়াছিলেন, “কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্ত বিমুচ্যতাং তু লোকঃ” (ভয়-বার্তিক ১১৬।১৩)—কলির বশে জীব যে সকল পাপকর্মের অমুষ্ঠান করে, সেই পাপের ভার আমার উপর পতিত হউক, জীব সেই পাপভার হইতে মুক্ত হউক—দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত এই উক্তির সহিত দয়াময় বীণা-খ্রীষ্টের উক্তির অধিক প্রভেদ নাই। এই উক্তিকে খাঁটি খ্রীষ্টানি মত বলিলে অত্যাতি হইবে না। “আমি অতি দীনহীন, সুই অতি পাপী, প্রভু নিজগুণে দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর”—আধুনিক বৈষ্ণবেরা এ কথা আধুনিক বুদ্ধের নিকট শিথিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। বৌদ্ধসম্প্রদায়

ইহা ঐষ্টানের নিকট পাইরাছিলেন অথবা ঐষ্টানেরা ইহা বৌদ্ধগণের নিকট পাইরা-
ছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তাহার বিচার
করিবেন।

বুদ্ধপ্রচারিত নির্বাপনতত্ত্বের সহিত
ব্রাহ্মণের স্বীকৃত বৈদান্তিক মুক্তিতত্ত্বের
মৌলিক পার্থক্য নাই। কিন্তু ঐষ্টপ্রচারিত
পরিজ্ঞাপনতত্ত্বের সহিত ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু
কালক্রমে বুদ্ধের নির্বাপনতত্ত্ব কিরূপে বিকৃত
হইয়া ঐষ্টানি পরিজ্ঞাপনতত্ত্বের সাদৃশ্য গ্রহণ
করিয়াছিল, তাহা দেখা গেল। ব্রাহ্মণশাসিত
বেদপন্থী সমাজও এই বিকার হইতে অব্যাহতি
লাভ করে নাই। মহাবানী, মন্ত্রবানী, বজ্রবানী
—বিবিধ বৌদ্ধসম্প্রদায়প্রবর্তকগণ যখন
মন্ত্রায় ও সহজে ভবসমুদ্র তরাইবার জন্য আপন
আপন ডিঙি হাঙ্গির করিয়া যাত্রাধিগকে
টানাটানি করিতে লাগিল, তখন বেদপন্থীর
জাহাজের জন্য পাথেরসংগ্রহে কাহারও
আর প্রযুক্তি থাকিল না। সদাচার ধ্বংস-
মুখে পতিত হইতে চলিল; বর্ণ্যভ্রমধর্ম
বিলুপ্ত হইতে চলিল; ব্রাহ্মণের যজ্ঞভূমির
উপরে বৌদ্ধগণের চৈত্য ও বিহার প্রতিষ্ঠিত
হইল; হোমাদি নির্বাপিতপ্রায় হইয়া অনাৰ্য্য
দেবদেবার প্রতিমার দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল;
দেশবিদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণের
আনাট অনাৰ্য্য অল্পতানে আৰ্য্যসমাজ কলু-
ষিত হইতে চলিল; বৌদ্ধাবহারমধ্যে
ব্রাহ্মণ্যাসন, সন্ন্যাস্যাসন ও শাস্ত্রশাসনের
বহির্ভূত নরনারী দলবদ্ধ হইয়া নানাবিধ
কুশলিত বীতংস অশ্রুতান প্রবর্তন করিয়া
কোরিক্ক তান্ত্রিকভার সৃষ্টি করিয়া কর্ণধার-
হীন সূক্তজের তত্ত্বগিথানিকে মদ করিবার

উদ্দেশ্য করিল। তখন সেই ঘোড়ের গতি
কিরাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত
সন্ধিস্থাপন করিয়া কঠোর বৈদিকমার্গকে
শিথিল করিয়া সংসারতাপ হইতে পরিজ্ঞাপনের
সহজ পন্থা নির্দেশ দ্বারা সনাতনধর্মকে রক্ষা
করিতে বাধ্য হইলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি প্রজাপতি,—বিরাট ও হিরণ্য-
গর্ভের সহিত ক্রমশ লোকলোচন হইতে
অন্তর্ধান করিলেন। ক্রতুমূর্ত্তি কপর্দী পিনাক-
পাণি আপনার ধর্ম্মশের পরিত্যাগ করিয়া
অবলোকিতেশ্বরের অমুকরণে আত্মোষ
শকরমূর্ত্তিতে পুনর্গঠিত হইলেন। জাতকোক্ত
বুদ্ধাবতারগণের অমুকরণে নারায়ণের
অবতারনিচয় কল্পিত হইল। গোপাবল্লভ
মারাত্তের স্থলে গোপীবল্লভ বশোদাহুল্লাল
উপাসকের ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।
উপনিষদের উমা, হৈমবতী ও ক্রতুভগিনী
অধিকা, ধূম্রবর্ণী কালী-করালাদি যক্ষাদির
সপ্ত জিহবার সংকারে, একদিকে বেদান্ত-
প্রতিপাদ্য নাথিলপ্রপঞ্চের জনারজী মহা-
মারার ও অন্ত্রদিকে শবরজবিড়ম্বিতা চামু-
ণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া, জ্ঞানজননী
মহেশ্বরপত্নীরূপে বুদ্ধমাতা প্রজাপতিরমিতার
সহিত ও বুদ্ধশক্তি তারাদেবীর সহিত মিশিরা
গেলেন। সিততারা, উগ্রতারা ও নীলতারা,
—বজ্রেশ্বরী, বজ্রবারাহী ও উচ্ছ্রিটচাঙালিনীর
সহিত উপাসনান্নাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
গৌরী-পদ্মা-শচী-মেধাদি মাতৃকাগণ ইজ্রাগী-
কোবেরী প্রভৃতি শক্তিগণের ও উগ্রচণ্ডা-
প্রচণ্ডাদি নারিকাগণের পার্শ্বে আসির গ্রহণ
করিলেন। দেবগুরুবাহিত্য পুরাতনী বাগ-
দেবতা বীণাপুঙ্ক্তের সহিত জগদম্বালা ও

সরিয়াকলস গ্রহণ করিলেন। অবিভা-
নাশিনী কামবিজয়িনী মহাবিভা কামোপরি-
স্থিতা আত্মভাতিনী ছিন্নমস্তার মূর্তি পরিগ্রহ
করিলেন। ভাগবত-পাকুরাজ-পাণ্ডপত প্রভৃতি
বিবিধ সম্প্রদায় আপন আপন ইষ্টদেবতার
প্রসাদলাভই সংসার হইতে উদ্ধারের এক-
মাত্র সহজ উপায় বলিয়া প্রচারিত করিতে
লাগিল। অবশেষে যখন ‘হরেন্দ্রমৈব কেবলঃ’
কলিকগুণনাশের ও পতিত-উদ্ধারের সহজ-
তম পন্থাস্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন
অধঃপতিত ধিক্কৃত বৌদ্ধনামে পরিচিত
হওয়া আর কেহ আবশ্যক বোধ করিল না।

এ কালের পুরাণতন্ত্রে দেবদেবীর উপা-
সনা ও দেবদেবীর প্রসাদলাভ চতুর্ধর্গ-ফল-
প্রদ ও মোক্ষহেতু বলিয়া অকাতরে নির্দিষ্ট
হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই
মোক্ষ দর্শনশাস্ত্রের মোক্ষ নহে। সম্প্রদায়-
প্রবর্তক আচার্য্যগণের মধ্যে হাঁহারা সাবধান,
তাহারা অনেকটা বুঝিরা কথা কহেন।
ইষ্টদেবতার সালোক্য-নামীপ্য প্রভৃতি তাহারা
প্রার্থনা করেন; সাযুজ্যসংক্ষে ভয়ে ভয়ে
কথা কহেন; আর নির্লিপ্যমুক্তির নাম শুনি-
লেই তাহারা চমকিয়া উঠেন। মুক্তি, যাহার
‘বেদান্তসম্মত পন্থা জীবন্তকালের একতানিরূপণ,
তাহা আধুনিক ভক্ত বা প্রেমিক উপাসকের
শিরঃপীড়াজনক’। মাগের ছেলে রামপ্রসাদ
চিনি খেতে ভালবাসিতেন, চিনি হ’তে
চাহিতেন না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অনেকে
দণ্ডের সহিত তাদৃশ উক্তির সমর্থন করিয়া-
ছেন। এ বিষয়ে ঐষ্টানের সহিত আধুনিক
বেতবাদী-হিন্দুর বড় পার্থক্য নাই।

বৌদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় যখন সমাজের ধর্মের

তরশিধানি বিপ্লুত হইয়া বাইবার উপক্রম
হইরাছিল, সেই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের
জন্ম হয়। তিনি অগাধ বিদ্যাবলে ও অগাধ
বীশক্তিবলে বেদান্তপ্রতিপত্ত মুক্তিতত্ত্বের
পুনঃপ্রচার করেন। তৎকালে বৌদ্ধ, জৈন,
পাকুরাজ, পাণ্ডপত, নগ্ন রূপণক, কাপালিক
প্রভৃতি বিবিধ সদাচারভ্রষ্ট বেদমার্গচ্যুত
সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদকোলাহলে ভারত-
বর্ষের আধ্যাত্মিক “কাকসমাকুল বটবৃক্ষের
ভায়” মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করা-
চার্য্য এই-সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণের
সহিত জীবনব্যাপী বিচারসময়ে-প্রবৃত্ত হইয়া
শ্রুতিসম্মত মুক্তিতত্ত্বের উদ্ধার করেন। তৎ-
কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত মুক্তিতত্ত্বের নামান্তর
অদ্বয়বাদ।

এইখানে বলা উচিত, শঙ্করাচার্য্যকৃত
বেদান্তব্যাখ্যা সকল আচার্য্য গ্রহণ করেন
নাই। তাহারা অন্তরূপে বেদান্তশাস্ত্রের
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদের ভাষা
অতি প্রাচীন ভাষা; সর্বস্থানে উহার অর্থ-
বোধ হুঁকর নহে। আবার ঐ ভাষা অনেক-
স্থলে কবিতার ভাষা, কোথাও বা হেঁয়ালির
ভাষা। কাজেই বেদান্তদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রকৃত
অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে মতবৈধনিবারণের
উপায় নাই। অধুনাতন কালে প্রাচীনভাষার
নানা অর্থ আবিষ্কার করা চলিতে পারে।
ঘটিয়াছেও তাহাই। ‘আচার্য্যগণের মধ্যে
যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি প্রতিবাক্য-
মধ্যে সেই মতের অমুখ্যারী অর্থ আবিষ্কার
করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং যে এই-
রূপ পক্ষপাত করেন নাই, তাহাও বলা যায়
না। তিনি অদ্বয়মতের পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি একটা নির্দিষ্ট পন্থাকে যুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। প্রতিবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন নবপ্রচারিত বা নবাবিকৃত মত গৃহীত হওয়া উচিত নহে, ইহা তাঁহার ঐক-বিশ্বাস ছিল। সেইজন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেকস্থলে প্রতিবাক্যের আশ্রমতের অত্যাচারী অর্থ করিতে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায়। তথাপি ইহাও মানা যাইতে পারে, বেদান্তবাক্যের প্রকৃত মর্থ শব্দর যেমন বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়া-ছিলেন, আর কেহ তেমন পারেন নাই। অন্তত আমাদের সেইরূপ বিশ্বাস।

শব্দপ্রচারিত বেদান্তব্যাখ্যা বেদান্ত-সম্বন্ধ হউক আর না হউক, এবং শব্দ-প্রচারিত অদ্বয়বাদ সত্য হউক আর না হউক, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। শব্দের ব্যাখ্যা পরবর্তী বহু দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারত-বর্ষের জ্ঞানিসমাজে তৎপ্রচারিত অদ্বয়বাদ স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অন্তরে প্রচারিত অস্ত্র কোন বাদ স্বেচ্ছাপ্রতিষ্ঠা-লাভ করে নাই। অদ্বয়বাদীরা যুক্তিশব্দে কি বুঝিতেন, আমাদের এস্থলে তাহাই আলোচ্য। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁহারা যাহাকে যুক্তির পথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তির প্রকৃত পথ বা প্রকৃষ্ট পথ না হইতে পারে। তাঁহারা বেদান্তবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত অর্থ না হইতে পারে। অদ্বয়মতাত্মকারী যুক্তির তাৎপর্য্য কি, উপস্থিত আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য।

শব্দপ্রচারিত যুক্তির অর্থসম্বন্ধে ও অদ্বয়-বাদের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে নানাবিধ আলো-চনা দেখা যায়। ইংরাজি-বাঙলা নানাবিধ গ্রন্থে এই অদ্বয়মতের আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই হতাশ হইতে হই-য়াছে, স্বীকার করিলে অত্যাশ্রিত হইবে না। এই সমস্ত প্রচলিত আলোচনার সারসংকলন করিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়।

প্রচলিতব্যাখ্যাভূমারে অদ্বয়বাদী এক-মাত্র নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই একমাত্র নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইংরাজিতে ইহার Universal Soul নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইহাই বেদান্তবীকৃত ঈশ্বরপদের বাচ্য। তবে অস্ত্র শব্দের স্বীকৃত ঈশ্বরে ও বেদান্তবীকৃত ঈশ্বরে প্রভেদ আছে। খ্রীষ্টানাদির ঈশ্বর সগুণ; বৈষ্ণববাদি সাম্প্রদায়িকগণের এবং নেয়াত্রিকাদি দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরও সগুণ। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর—ইহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়—তিনি নিগুণ।

এই নিগুণ পরমাত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্যপদার্থ;—তত্ত্ব আর সমস্তই মিথ্যা। এই যে প্রকাণ্ড জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা মিথ্যা। ইহা সেই ব্রহ্মেরই মায়া হইতে উৎপন্ন। এক আপনার মায়া দ্বারা এই মিথ্যা-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সত্যবস্ত পরমাত্মা ও তাঁহার মায়া-কল্পিত এই মিথ্যা-জগৎ ব্যতীত দেহধারী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না? বেদান্ত এ বিষয়ে কি বলেন? এই জীবাত্মাকে ইংরাজিতে Individual Soul বলা হয়।

জীবাশ্মের ভোগের জন্য এই বিশ্বজগৎ বর্তমান; জীবাশ্মা কাজেই ভোক্তা, কর্তা, স্রষ্টা, হ্রষ্টা রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু ইহা জীবাশ্মের বৃদ্ধির কারণ। জীবাশ্মা বস্তুতই পরমাশ্মার সহিত এক পদার্থ। পরমাশ্মা নিগুণ, কাজেই তিনি কর্তা, ভোক্তা, স্রষ্টা, হ্রষ্টা হইতে পারেন না। জীব অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশে আপনাকে পরমাশ্মা হইতে ভিন্ন মনে করিয়া আপনাকে স্রষ্টা, হ্রষ্টা, কর্তা, ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব আপনাকে পরমাশ্মার সহিত এক বলিয়া জানিতে পারে; তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত হইলে জীবাশ্মা পরমাশ্মার বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন উহাকে আর কর্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া স্রষ্টা-হ্রষ্টা ভোগ করিতে হয় না। তখন আর উহাকে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না।

ব্রহ্ম ও জীব এক; এ কিরূপ ঐক্য? প্রচলিতমতানুসারে উভয়েই এক বস্তুতে নিম্নিত। তবে ব্রহ্ম নিরূপাধিক; আর জীব সোপাধিক। মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, জলরাশির সহিত বুদ্বুদের যেরূপ সম্বন্ধ, পরমাশ্মার সহিত—Universal Soul-এর সহিত—জীবাশ্মার—Individual Soul-এর কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও আকাশ, বস্তুত একই পদার্থ; কেবল ঘট-রূপী উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে উহা পৃথক্ দেখায়। বুদ্বুদ ও জল একই পদার্থ; কেবল-ভিতরে বাহু থাকায় বুদ্বুদকে জল হইতে পৃথক্ দেখায়। কিন্তু ঘটটি ভাঙিয়া ফেলিলে ঘটের অন্তর্গত

আকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায়; বায়ুটুকু বাহির হইয়া গেলে বুদ্বুদ যেমন জলরাশিতে মিশিয়া যায়; তখন উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকে না; সেই-রূপ অজ্ঞানরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলেই জীবাশ্মা পরমাশ্মার মিশিয়া যায়; তখন আর উহা স্বতন্ত্র থাকে না। অজ্ঞান-উপাধি থাকাতে উহাকে কর্তা, ভোক্তা, স্রষ্টা, হ্রষ্টা বলিয়া,—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, বোধ হইতেছিল। অজ্ঞানের বিলোপে উহা নিগুণ নিরূপাধিক চৈতন্যস্বরূপে লীন হইয়া যায়। উহাকে তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া চেনা যায় না। ইহার নাম মুক্তি।

বলা বাহুল্য, এই মুক্তিলাভের পর পুনর্জন্ম ঘটে না; কেন না, জন্মমরণ-আধিব্যাধি, এ সমস্ত অনিত্য অবাস্তব দেহের ধর্ম; নিগুণ পরমাশ্মার পক্ষে এ সকলের সম্ভাবনা নাই।

প্রচলিতব্যাখ্যানুসারে ইহাই অমরবাদ। জীব ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন; অর্থাৎ উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। ব্রহ্মও যেমন নিত্য, নির্বিকার, নির্বিশেষ, নিগুণ; জীবও তদ্রূপ; তবে অবিজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে অন্তরূপ মনে করে। যতদিন মনে করে, ততদিন সে কর্মপাশবদ্ধ হইয়া পুনঃপুন জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। সেই অবিজ্ঞাটা কাটিয়া গেলে জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায়—তখন মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

ভয়ে ভয়ে বলিতেছি; খুব সম্ভব যে, পাঠকগণের অধিকাংশেরই ইহাই অমরবাদ বলিয়া ধারণা আছে। এবং এইরূপ ধারণা

আছে বলিয়াই দ্বৈতবাদী আচার্যগণ অদ্বৈত-বাদের উপর খড়গহস্ত। 'এ কি স্পর্শ! জীব আর ব্রহ্ম কখন কি একজাতীয় পদার্থ হইতে পারে? উভয়ের একাত্মতা কি সম্ভবপর? কেঁপেই হউক, ব্রহ্ম হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-স্থিতি লয় ঘটতেছে। সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সহিত ক্ষুদ্র, সন্ধীর্ণ, পরিমিত, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাদির অধীন জীবের একাত্মতা-স্বীকার—ইহা বাতুলের প্রলাপ। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টের, অপরিমেয়ের সহিত পরিমিতের ঐক্য বা একাত্মতা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সেবা-সেবকসম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। আর মুক্তি অর্থে যাহাই হউক, উহাকে ব্রহ্ম-স্বরূপপ্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না; বড় ভোয় ব্রহ্মসান্নিধ্যলাভ, ব্রহ্মসালোক্যলাভ ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদীর মুক্তি দ্বৈতবাদীর প্রার্থনীয় নহে; ঐ মুক্তি কেবল মিথ্যাভিমানী অবিদ্বানের মিথ্যা আশ্কালাভ।

মুক্তির ও অদ্বৈতবাদের ঐরূপ অর্থ ধরিয়া দ্বৈতবাদী এইরূপে গর্জন করেন। কিন্তু তাঁহার গর্জন সম্পূর্ণ নিরর্থক। অকারণে তিনি হাওয়ার সহিত বুদ্ধ করিয়া বলকয় করেন। কেন না, অদ্বৈতবাদের যে অর্থ উপরে দেওয়া হইল, আমাদের বিশ্বাস উহা প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নহে। মুক্তিতে যে অর্থ আরোপ করিয়া দ্বৈতবাদী আশ্কালাভ করেন, আমাদের বিশ্বাস মুক্তির অর্থ তাহা নহে।

বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অদ্বৈতবাদ বলিয়া বিবৃত হইল, তাহা অদ্বৈতবাদ নহে; তাহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ মাত্র। এবং উপরোক্ত শঙ্করাচার্য এই প্রচ্ছন্ন দ্বৈত-

বাদেরই নিরাসের জন্যই আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে মত শঙ্করাচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আরোপ করা হয়, তাহা তাঁহাদের মত নহে। বরং সেই মত নিরাসের জন্যই তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম।

Individual Soul আর Universal Soul, এই দুই ইংরেজি তর্জমা হইতেই এই ভ্রমের কথা বুঝা যায়। Individual Soul বলিতে বুঝায়, দেহধারী জীবের আত্মা; আর Universal Soul বলিতে বুঝায় একটা বৃহত্তর আত্মা—পরিমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর অগম্যাপী আত্মা। উভয়ের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধের তুল্যা। একটা অসীম, অপরিমেয়, উপাধিবর্জিত, অনির্দোষ; আর একটা সসীম, পরিমেয়, উপাধিবিশিষ্ট, নির্দোষ। উভয়ে অভিন্ন অর্থাৎ একজাতীয় পদার্থে, একই বস্তুতে নির্মিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায়, জীবাত্মা পরমাঙ্গার অংশ; জীব ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি যে, এই Universal Soul ও Individual Soul খণ্ডিত ব্যাখ্যাটা অদ্বৈতবাদ নহে; ইহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ।

তবে বিদ্রোহ: অদ্বৈতবাদ কি? দেখা যাক।

অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না; বিজাতীয়, সজাতীয়, স্বগত কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না। এক অন্তের সংশ্লিষ্ট বলিলে ভুল হয়; উভয়ই সর্বভৌতভাবে এক। কিন্তু কিনা জীব অর্থে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম অর্থে জীব। পরমাঙ্গা অর্থে জীবাত্মা ও জীবাত্মা অর্থে

পরমাশ্রা। আশ্রা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—এই বাক্যের অর্থ আশ্রার অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দ বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিয়া সর্বত্র ‘আশ্রা’ শব্দ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু এই কথা বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে হাহাকার উঠিবে। জীবাত্মা পরমাশ্রার অংশ—ইহা বরং ছিল ভাল; জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে এক—আশ্রার অপর নামই ব্রহ্ম—ইহা যে আরও বিষম কথা! একপাশে বলে, সে যে বাতুলেরও অধম!

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা হেতু আছে; কিন্তু সেই হেতু তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত। তাঁহারা বেদান্তের ব্রহ্মশব্দকে গোড়া হইতে একটা নির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্মশব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। এবং আপনারা যে অর্থে ব্রহ্ম-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থবাচ্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর ঐরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। বস্তুত তাঁহাদের আতঙ্কের কারণ নাই। তাঁহারা যে অর্থে ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ করেন, অদ্বয়বাদী সে অর্থে প্রয়োগ করেন না; অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তাঁহাদের ব্রহ্ম নহে। সুতরাং অদ্বয়বাদীর ব্রহ্মসম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর উক্তি তাঁহাদের ব্রহ্মকে স্পর্শমাত্র করে না। সুতরাং, তাঁহাদের আতঙ্ক ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। তাঁহাদের প্রতিবাদও অদ্বয়বাদীকে স্পর্শ করে না। তাঁহাদের লড়াই হাওয়ার সহিত।

অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তবে কি? তিনি যাহাই হউন, কোনরূপ সত্ত্ব ঈশ্বর নহেন। খ্রীষ্টানেরা এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, নির্মাতা;

বিধাতা, অসীমশক্তিশালী, জ্ঞানবান, করুণা-নিধান, এক নিরাকার ব্যক্তির—Person—এর—অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মকে যথাসাধ্য সেই খ্রীষ্টানি সৃষ্টিকর্তার নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত—অন্তত অদ্বয়বাদপ্রতিপাত্ত ব্রহ্মের সহিত—তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িকেরা ও দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা ও ঐশ্বরকারণিকেরা ঐরূপ একজন সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করেন—তবে খ্রীষ্টানেরা তাঁহাতে যে সকল গুণ অর্পণ করেন, ইহারা সকলে সেই সকল গুণ অর্পণ করিতে চাহেন না। অনেকের মতে তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ও সত্ত্বগুণ; আবার অনেকের মতে নিগুণ অথবা শুদ্ধচেতন-স্বরূপ। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইহারই সৃষ্টি অথবা ইহারই মায়া। কংহারও মতে ইনিই Universal Soul, জীব ইহারই অংশ; মুক্তির পর জীব ইহাতে লীন হইয়া যান। কেহ বা সে কথা বলিতে গেলে মারিতে আসেন। এই Universal Soul—এই জীব হইতে স্বতন্ত্র “ঈশ্বর”-যিনিই হউন, ইনি অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম নহেন; এবং যাহারা অদ্বয়বাদকে প্রতিবাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে ইনি উপনিষৎপ্রতিপাত্ত স্রষ্টাসম্মত ব্রহ্ম নহেন।

তবে এই অদ্বয়বাদীর ব্রহ্মশব্দের অর্থ কি? অদ্বয়বাদীর ব্রহ্মশব্দের অর্থই আশ্রা। ইনি আর কেহই নহেন—ইনি আশ্রা—তোমরা যাহাকে জীবাত্মা বল বা জীব বল, ইনি সেই জীবাত্মা বা জীব। অদ্বয়বাদমতে

পরমান্বার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 'পর-
মান্বা' নাম যদি নিতান্তই ব্যবহার করিতে
হয়, উহা জীবাত্মার সহিত এক, অভিন্ন ও
সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আর একবার এইখানে বলিয়া রাখি,
অদ্বয়বাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহার আলোচনা
এ প্রসঙ্গের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। অদ্বয়বাদী
ব্রাহ্ম কি অব্রাহ্ম, সে কথা তুলিবারই কোন
প্রয়োজন নাই। বিগত অদ্বয়বাদ স্বীকার্য
হউক আর না হউক, তাহাতে আপাতত
কিছুই যায়-আসে না। বিগত অদ্বয়বাদ
কি, তাহা বুঝিয়া দেখাই বর্তমান আলো-
চনার একমাত্র লক্ষ্য।

এই অদ্বয়বাদকে খাটি Idealism বলিয়া
অনেকে নির্দেশ করেন। বার্কলির idea-
lismএর সহিত ইহার মিল আছে, আবার
প্রভেদও আছে। বার্কলি প্রতীয়মান জড়-
জগতের পারমার্থিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার
করিতেন না। অদ্বয়বাদীও স্বীকার করেন
না। উভয়েরই মতে প্রতীয়মান জগৎ
প্রত্যক্ষসমষ্টিমাত্র। এই প্রত্যক্ষস্বরূপ জগৎ
যে চেতন পদার্থের সমীপে প্রতীত হয়,
তাহার নাম আত্মা। বার্কলি ও অদ্বয়বাদী,
উভয়েরই এই চেতন আত্মার অস্তিত্ব
স্বীকার করেন। তাঁহাদের উভয়ের নিকট
এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী চেতন আত্মার
অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চেতন সাক্ষী
না থাকিলে জগৎ কেবল অসম্বন্ধ প্রত্যক্ষপর-
ম্পরায়, কণিক বিজ্ঞানের সমষ্টিতে পরিণত
হইত। বার্কলির ভাষায় এই চেতন আত্মাই
রূপ দেখে ও শব্দ শুনে ও আপনাকে রূপের
দ্রষ্টা ও শব্দের শ্রোতা বলিয়া জানে; চেতন

আত্মা না থাকিলে রূপ হয় ত থাকিত, শব্দ
হয় ত থাকিত; কিন্তু রূপ শব্দ শুনিতে পাইত
না ও শব্দ রূপ দেখিতে পাইত না; রূপের
সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক থাকিত না;
বৌদ্ধগণ জগৎকে কণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি বা
প্রত্যক্ষপরম্পরা বলিয়াই জানেন; তাঁহারা
এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।
ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে হিউম স্বীকার
করেন না। হিউম স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন,
অনেক পণ্ডিতের নিকট এই সাক্ষী আত্মা
স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাঁহারা সেই আত্মাকে
প্রত্যক্ষ দেখিতে পান; আমি কিন্তু এই
আত্মাকে কখনই দেখিতে পাই নাই।
আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া কেবল একটা-না-
একটা প্রত্যক্ষ দেখি,—শীতাতপ, আলো-
আঁধার, সুখ-দুঃখ, এইরূপ একটা-না-একটা
প্রত্যক্ষ দেখি; এই প্রত্যক্ষ, এই কণিক
বিজ্ঞানই আমার পক্ষে সর্বস্ব; সুসুপ্তির
সময় যখন এই প্রত্যক্ষগুলি লীন হইয়া যায়,
তখন আমিও থাকি না। বার্কলির সহিত
ঐ পর্যন্ত অদ্বয়বাদীর মিল আছে। কিন্তু
তাহার পরে আর মিল নাই। অদ্বয়বাদীর
মতে আত্মা বহু নহে, আত্মা একমাত্র। সে
কোন আত্মা? আমিই যে আত্মা। অত
মধ্যে আত্মার পারমার্থিক অস্তিত্ব আরোপে
অদ্বয়বাদী কুণ্ঠিত। তাহার কারণ কতকটা
বুঝা যায়। তোমার দেহ আমার প্রত্যক্ষ-
বিষয়। সেই প্রত্যক্ষ-বিষয় দেহ দেখিয়া ও
তাহার আকার-ইন্দ্ৰিয় দেখিয়া তোমার
আত্মার অস্তিত্ব আমি অনুমান করিয়া থাকি।
তোমার দেহ প্রত্যক্ষ-বিষয়—তোমার আত্মা
প্রত্যক্ষ-বিষয় নহে, অনুমান-বিষয় মাত্র।

কিন্তু তোমার দেহেরই পারমাণ্বিক অস্তিত্ব যখন আমি স্বীকার করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অনুমিত আত্মারও পারমাণ্বিক অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। অল্পত আমার আত্মা যেরূপ আমার উপলব্ধির বিষয় ও আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, তোমার আত্মা সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে; 'স্বতঃসিদ্ধ' বস্তুও নহে। এটখানে বার্কলির সহিত অদ্বয়বাদীর প্রভেদ। কেবল বার্কলি কেন, সাংখ্যাদর্শনসম্মত পুরুষের সহিত যদি বৈদান্তিক আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়— তাহা হইলে এখানে সাংখ্যের সহিতও বৈদান্তীর ভেদ। সাংখ্য বহুপুরুষবাদী; বৈদান্তী একপুরুষবাদী বা একাত্মবাদী। বৈদান্তের আত্মা আমার আত্মা—অর্থাৎ আমি। তদ্বিহীন অথ কোন আত্মার অস্তিত্ব বৈদান্ত স্বীকার করেন না। এই আত্মার নাম জীবাত্মা বা জীব।

এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্বজগৎ-নামক একটা কল্পিত পদার্থকে আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ও তাহার প্রতি আমার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুখঃখ ভোগ করিতেছি। এই বিশ্বজগৎ আমার নিকট নিয়মিত সুব্যবস্থা জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। এই জগতের মধ্যে শীতগ্রীষ্ম, দিব্যরাত্রি নিয়মমত পরিবর্তিত হয়। গ্রহনক্ষত্র নিয়মমত উদিত ও অস্তগত হয়। আশ্বনে হাত পোড়ে, অগ্নে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি বিবিধ নিয়ম ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলা এই জগতে আমি দেখিতে

পাই। এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝান একটা সমস্যা। হিউম এবং বৌদ্ধ, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা নাই; কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরামাত্র আছে। উহাদের মধ্যে একটা পৌরুষাপর্য্যায়সম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রত্যয়ের পর আর একটা প্রত্যয় আসিয়া থাকে। অল্পভোজন-রূপ প্রত্যয়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তিনামক প্রত্যয় উপস্থিত হয়, এইমাত্র—কিন্তু উপস্থিত হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কেন না, উভয় প্রত্যয়ই ক্ষণস্থায়ী। একের সহিত অল্পের ঐ পৌরুষাপর্য্যায়সম্বন্ধ ব্যতীত অথ কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঐরূপ ঘটিয়া থাকে; ঐরূপ যে ঘটতেই হইবে, ঐরূপ কোন কারণ নাই। কেন অল্পরূপ না ঘটিয়া ঐরূপই ঘটে, এ প্রশ্ন নিরর্থক—কেন না, ঐরূপ না ঘটিয়া অল্পরূপ ঘটিলেও ঠিক সেই প্রশ্নই উঠিত। আত্মাফল ভূমিতে কেন পড়ে, অগ্নিস্পর্শে কেন যন্ত্রণা হয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না; আত্মাফল যদি উল্কগামী হইত, অগ্নিস্পর্শে যদি আরাম হইত, তাহা হইলেও কেন তেমন হয়, এই প্রশ্ন উঠিত; তাহারও উত্তর দিতে পারিতাম না। যখন একরূপ-না-একরূপ ঘটতেই হইবে, তখন যাহা ঘটতেছে, তাহাই মানিয়া লও। কেন একরূপ হইল, কেন ওরূপ হইল না, এ তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, উহা অবিজ্ঞা। হিউম বলেন, ও সকল প্রশ্নের উত্তর নাই; উহা হের্নালি।

বার্কলি জগতের এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্যাকারণশৃঙ্খল বুঝাইবার জন্য এক বৃহৎ চেষ্টনপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহাকে Universal Soul বা Active Reason এইরূপ একটা নাম দেওয়া হয়। বার্কলি খ্রীষ্টান ছিলেন; তিনি বলেন, এই বৃহৎ চেষ্টনশ্রম পদার্থই খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর বা খোদা—এবং ইনিই প্রতীয়মান-জগতে নিয়মের, ব্যবহারের ও কার্য্যাকারণশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা। জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর সেই বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর তৎকল্পিত বিশ্বজগতে স্বেচ্ছায় কতিপয় নিয়মের প্রাতিষ্ঠা করিয়াছেন ও প্রত্যয়গুলিকে কার্য্যাকারণশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; সেইজন্ত একের পর অন্যটি ঘটে। তিনি যেরূপ বিধান করিয়াছেন, সেইরূপই ঘটে; অন্তরূপ বিধান করিলে অন্তরূপই ঘটিত। সেইজন্ত পরিমিত সন্ধীর্ণ জীবাত্মা সেইরূপই ঘটিতে দেখে, অন্তরূপ ঘটিতে দেখে না। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া যথাকালে সূর্য্য উঠে, যথাকালে ঋতুপরিবর্তন হয়, যথাকালে জীবের জন্মমরণ ঘটে, যথানিয়মে স্তম্ভভূতের আবির্ভাব-তির্য্যোক্ত্যবয়ব—প্রত্যয়সমষ্টিরূপ প্রত্যক্ষ জগৎচক্রের নেমি যথানিয়মে আবর্তন করে।

প্রতীয়মান বাহ্যজগতে কার্য্যাকারণশৃঙ্খলার ও নিয়মের হেতুপ্রদর্শনের জন্য বার্কলি তাহার ঐশ্বরিক আশ্রয় কল্পনা করিয়াছিলেন। অচেতন জড়জগতের প্রত্যয়স্বরূপ উপাদানগুলি আমরা নির্দিষ্টবিধানমত সজ্জিত ও বিস্তৃত দেখিতে পাই। কে তাহা-দিগকে এইরূপে সাজাইল? এই সম্ভ্রাম ও বিস্তার কেবল যে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা আছে,

তাহা নহে; উহাতে একটা উদ্দেশ্যের, একটা লক্ষ্যের, একটা designএর পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের শ্রোত যথানিয়মে চলিয়াছে—কিন্তু একটা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। দেখ, সেই প্রাচীনকালের কুস্মাটিকাকার নীহারিকা হইতে কেমন সুন্দর সুব্যবস্থা সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ধরাগুঠে কেমন বিবিধ জীবের, বিবিধ উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে; কেমন নূতন উৎকৃষ্ট জীব পুরাতন অপকৃষ্ট জীবের স্থান গ্রহণ করিয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত এই অত্যান্ত মহুঘোর উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। সমগ্র জগদ্বস্তুরি যেমন তারে-তারে চাকায়-চাকায় গাঁথা; এখানের চাকাখানি কেমন ওখানের চাকাখানিকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে। লাপ্লাসের ধাঁশক্তি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, সৌরজগৎরূপ বিশাল যন্ত্রটি কেমন স্থিতিশীল; এতগুলি বৃহৎ জড়পিণ্ড পরস্পরকে কক্ষাচ্যুত কারবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সকলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আপন নির্দিষ্ট কক্ষাপথেই প্রাতি-নিবৃত্ত হইতেছে। জগদ্বস্তুর এই বৃহৎ উদ্দেশ্য, এই design, এই বড়হাতের-Purpose, মন্দমতিকে বুঝাইবার জন্য মহা-মহাপণ্ডিতে মিলিয়া এতগুলো Bridge-water Treatiseই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। যন্ত্রটির নিয়মাণেই কেমন মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আজি যে উন্নত স্পাদিত মহাব্যজাতি ধরাগুঠে অতুল মহিমায় বিচরণ করিতেছে, যেন কত-কোটি বৎসর পূর্বে হইতেই তাহার উৎপত্তির জন্ত পরামর্শ চলিতেছিল। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালাস

এই বুদ্ধবস্তু প্রতাপন করিতে চাহেন, মনুষ্যকে কেজ্জগত করিয়া তাহার মহিমা বাড়াইবার জন্তই এত-বড় ব্রহ্মাণ্ডের কারখানাটা এত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। জড়জগৎকে প্রত্যয়সমষ্টি বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই প্রত্যয়সমষ্টিকে এমন ভাবে এমন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইল কে? তাহারা আপনা হইতে ঐরূপে সজ্জিত হইয়াছে, আপনা হইতে, আপনাদিগকে ঐরূপ উদ্দেশ্যের অভিযুক্ত করিয়া ঐরূপে যথানিয়মে ব্যবস্থিত করিয়া লইয়াছে, এরূপ বলিলে নিতান্ত অত্যাচার হয়। কণিক-বিজ্ঞানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মন মানে না। অচেতন জড়ে অথবা অচেতন প্রত্যয়ে এরূপ ক্ষমতা স্বীকার করিতে পারা যায় না। হিউম বলেন, ঐরূপ না হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞরূপও হইতে পারিত। যাহা, হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর; কেন হইয়াছে, এরূপ প্রশ্ন কারও না। কিন্তু হিউমের এ উত্তরেও মনের তৃপ্তি হয় না।

জড়জগৎকে ঐরূপ নিয়মে স্থাপনের জন্ত, ঐরূপ একটা উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইবার জন্ত, একজন নিরামকের প্রয়োজন, একজন ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন, একজন উদ্দেশ্যবান, ইচ্ছাশালী, সর্বাঙ্গীন্দ্রিয়, সর্বাঙ্গ চেতনপুরুষের প্রয়োজন; একজন Personএর প্রয়োজন। হংরাঙ্গিতে ইংকে বলে—Argument from Design. বাকালি এইজন্ত সর্বাঙ্গ সর্বাঙ্গীন্দ্রিয় চেতন বৃহৎ আত্মার, অর্থাৎ চেতন্ত্বময় জীব হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর চেতন্ত্বময় ঈশ্বরের, কল্পনা করিয়া-

ছেন। ইতর লোকে এইজন্ত জগৎরূপ-বৃহৎষ্ট-নির্মাতা বৃহৎ-কুন্তকারুপী ঈশ্বরের কল্পনা করে। চেতনাসম্পন্ন জীবের ঐরূপ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগের, ঐরূপে একটা উদ্দেশ্যের অনুকূলে সাজাইবার ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়াই এই বৃহৎ উদ্দেশ্য সমাধানের জন্ত বৃহৎ চেতন্ত্বের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। এখন অবয়বাদী বৈদান্তিক এক্ষেত্রে কি বলেন, দেখা যাউক।

অবয়বাদী বৈদান্তিকও জড়জগতে এই ক্ষমতা অর্পণে কুণ্ঠিত। প্রত্যয়সমষ্টি আপনা হইতে আপনাকে ঐরূপে বিহ্বস্ত ও ব্যবস্থিত করিবে, ইহা তিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদান্তমতে প্রত্যয়সমূহ জড়পদার্থ বা অচেতন পদার্থ। আমরা আজকাল যাহাকে জড়পদার্থ বলি, বৈদান্তিক তত্ত্বাতীত অন্ত্যন্ত পদার্থকেও জড়পদার্থ বলিতেন। একালে যাহাকে matter বলে, বেদান্তমতে তাহা প্রত্যয়মাত্র—তাহা ত অচেতন জড় বটেই। তন্নিম্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থও বেদান্তিকের ভাষায় জড়পদার্থ—কেন না, উহাদের নিজের চেতনা নাই। আত্মাই চেতন। আত্মা যাহা দেখে, যাহা শুনে, বা যদ্বারা দেখে, যদ্বারা শুনে, সে সকলই অচেতন জড়। চন্দ্র, সূর্য, গাছপালা প্রভৃতি যাহা দেখা যায়, যাহা প্রত্যক্ষগোচর, তাহা ত অচেতন জড় বটেই; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকলের সাহায্যে আত্মা এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করে, তাহারাও অচেতন জড়। তাহাদের নিজের চেতনা নাই। তাহারা আপনারা আপনাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র আত্মাই চেতন্ত্বরূপ। আত্মাই স্বপ্রকাশ;

আর-সকলই তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয় । কাজেই জগদ্বস্ত্র আপনা হইতে নিয়মিত, অসংঘত, অসঞ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, উদ্দেশ্যাকুল হইতে পারে না ; উহাকে সাজাইতে-গোছাইতে, উদ্দেশ্যাকুল করিতে চेतন আত্মার প্রয়োজন । কিন্তু সে কোন্ আত্মা ? বার্কলি বলিবেন যে, সে বিশ্বাত্মা—বৃহৎ ঐশ্বরিক আত্মা—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময় চৈতন্তরূপী ঐশ্বর—তিনি ঐরূপে সাজাইয়াছেন বলিয়া ইতর সঙ্গীর্ণ-পরিমিত জীবাত্মা ঐরূপ সজ্জিত দেখে । হিউম এইখানে আসিয়া বলিবেন, ‘আচ্ছা, জড়জগতের সৃষ্টির জন্ত, জড়জগৎকে সূনিয়ত করিয়া সাজাইবার জন্ত, যদি একজন চेतনপুরুষের নিঅন্তই প্রয়োজন হয়, তবে তজ্জন্ত ঐশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন কি ? অজ্ঞ কোন চेतনপুরুষেও সেই বিধানক্ষমতা, সেই নিয়মরচনার ক্ষমতা অর্পণ করিতে ক্ষতি কি ?’ “Not only the will of the Supreme Being may create matter, but for aught we know *a priori*, the will of any other being might create it.” বৈদান্তিক হিউমের বহুশত বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন ; তিনিও জোরের সহিত এইখানে আসিয়া বলেন, ‘রহ, তজ্জন্ত জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর আত্মার কল্পনার প্রয়োজন দেখি না ; আমাকে ছাড়া আর আত্মা নাই এবং আমিই সেই সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ চৈতন্তরূপী মহেশ্বর । আমিই এই প্রতীয়মান বিশেষ ঐরূপ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—আমিই আমার কল্পিত জগৎকে ঐরূপ উদ্দেশ্যাকুল করিয়া সাজাইয়াছি—আমিই জগতের স্রষ্টা,

কর্তা ও বিধাতা—আমিই পরমাত্মা ও আমিই ব্রহ্ম ।

কথাটা ঠিক হউক আর নাই হউক, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর হইতে পারে না । বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি আমি—সোহম—অহং ব্রহ্মস্মি । ইহা শ্রুতিসম্মত মহাবাক্য । ‘ইহার অর্থ লইয়া গণ্ডগোল নিফল । ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট । ইহার সত্যতা লইয়া তর্ক তুলিতে পার—এই মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তাহা লইয়া বিচার করিতে পার ; কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া বিসংবাদের কোন অবকাশ নাই ।

বিশুদ্ধাধ্যবাদী শঙ্করাচার্য্য বেদান্তবাক্যের যে এই অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা মহত্ব স্থল হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে । আত্মা অর্থে আমি, ইংরেজিতে যাহাকে I-ego বলে বা Self বলে, তাহাই ; এবং আমার অপর নাম ব্রহ্ম । এই ব্রহ্মকে যদি পরমাত্মা বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্মা ; আমা ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমাত্মা কিছুই নাই । ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—ইহাই জীবব্রহ্মের অভেদবাদ । আমা ছাড়া জীব নাই—আমা ছাড়া ব্রহ্ম নাই—আমিই জীব ও আমিই ব্রহ্ম । যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা । কিন্তু ইহা বলিলেই অমনি কোলাহল উঠিবে । রামানুজস্বামী হইতে বার্কলি পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন । কেহ লাঠি বাহির করিবেন, কেহ ভুকুটা করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জন করিবেন । বলিবেন, ‘এ কি বাতুলের প্রলাপ, এই সঙ্গীর্ণ, সঙ্গীম, পরিমিত, কর্ণপাশবদ্ধ, সংসারচক্রে

ঘূর্ণমান, জরামরণশীল, দুর্বল, ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্ধা যে, সে জগৎকর্তৃত্ব, জগদ্বিধাতৃত্ব, সর্বশক্তিমানতার স্পর্ধা করে। এই “minute philosopher, not six feet high”—এই ব্যক্তি বিশ্বভুবনপতির সিংহাসন গ্রহণ করিতে চাহে! হা হতোহস্মি! হা দক্ষোহস্মি!!

অদ্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, ‘কে বলিল যে, আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্শপাশবদ্ধ, জরামরণশীল? কে বলিল, আমি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্‌ নহি? কেন আমাকে ঐক্লপে পরিমিত বিবেচনা করিব? ঐক্লপ যদি মনে করি, তাহা আমার অবিজ্ঞা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের উদয় হইলেই বুঝিব, অখিল প্রপঞ্চের স্রষ্টা, বিধাতা, নিয়ন্তা আমিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অত্র ব্রহ্ম নাই। কে বলিল, আমি সুখদুঃখভোগী পরিমিতশক্তি জীবমাত্র? এই প্রপঞ্চ যখন আগারই কল্পনা, উহা যখন আমারই প্রত্যয়, এই হূলদেহ, এই জন্ম-জরা-মরণ, এই সুখ-দুঃখ, এ সমস্তও তখন আমারই কল্পনা। বস্তুত আমি এ সকল হইতে মুক্ত; নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখুণ্ডানন্দমদ্বয়ম্, সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ-যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ। এইটুকু না জানিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত মনে করাই অবিজ্ঞা। এইটুকু জানারই নাম অবিজ্ঞার ধ্বংস—তাহার পারিভাষিক নাম মুক্তি।’

প্রতিপক্ষ বলিবেন, ‘ইহা অদ্বয়বাদীর নিতান্তই গায়ের জোয়। জীবের সঙ্কীর্ণতা মানিব না বলিলেই কি চলিবে? এক-মুষ্টি অন্ন যাহার জীবনের ভিত্তি, তাহার মুখে এমন কথা বাতুলের প্রলাপ।’ কাজেই প্রতিপক্ষকে

নিরস্ত করিতে হইলে অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির তাৎপর্য আর-একটু স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যদর্শনে যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; একের নাম Subject বা বিষয়ী; অপরের নাম Object বা বিষয়। যে উপলব্ধি করে, সে বিষয়ী; যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা বিষয়। এই বিষয়ী আমি—অহং-পদবাচ্য; আর এই বিষয় তুমি—ত্বংপদবাচ্য। তুমি-শব্দে কেবল আমার সম্মুখবর্তী তোমাকে মাত্র বুঝায় না। তুমি বলিতে, তিনি, সে, রাম-শ্রাম-হরি, বাঘ-ভালুক, কীটপতঙ্গ, গাছ-পালা, চন্দ্রসূর্য্য, লোট্র-ইষ্টক, সবই বুঝায়। কেন না, এ সকলই কোন-না-কোন সময়ে তোমার স্থলবর্তী হইয়া আমার উপলব্ধির বিষয় বা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে বা হইতে পারে। কাজেই এ সকলই বিষয়শ্রেণিভুক্ত। এমন কি, আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এ সকলও আমি কোন-না-কোন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কাজেই এ সকলও বিষয়স্থানীয়। এই সমগ্র বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বস্তুকে অর্থাৎ তোমাকে, তাঁহাকে, রাম-শ্রাম-হরিকে, আমারই মত চেতনাসম্পন্ন বলিয়া মনে করি; আর চন্দ্রসূর্য্য, গাছপালা, লোট্র-ইষ্টকাদিকে চেতনাহীন বলিয়া মনে করি। উহা কেবল লোকব্যবহারের জন্ত; উহা ব্যাবহারিক সত্য। উহাতে আমার জীবনযাত্রার সুবিধা হয়, এইমাত্র; কিন্তু আমার জীবনযাত্রাই ব্যবহারমাত্র—সুতরাং পারমার্থিকভাবে অসত্য। বিষয়ী আমিই একমাত্র চেতনপদার্থ—আর আমি ছাড়া যাহা-কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর বা অদৃশ্যমান-

গোচর, যাহা আমার বিষয়, তাহা চেতনাহীন পদার্থ। উহার কোন অংশে যদি চৈতন্য কল্পিত হয় বা অল্পমিত হয়, সে আমারই কল্পনা বা অল্পমান মাত্র; কাজেই সেই চৈতন্যের স্বাধীন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। আপাতত এই বিষয়ী আমাকে জীব-আখ্যা দেওয়া যাউক ও আমা-ছাড়া সমস্ত বিষয়কে জগৎ-আখ্যা দেওয়া যাউক।

এই জীবের ও এই জগতের পরস্পর সম্বন্ধ কি? আপাতত মনে হয়, জগৎ আমার বাহিরে স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। সাংখ্যবাদী তাহাই বলেন; জড়বাদিগণও তাহাই বলেন। আরও মনে হয়, এই বিষয়ের সহিত আমার নিত্য আদানপ্রদান-কারবার চলিতেছে; শব্দস্পর্শগন্ধাদি বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার চেতনায় আঘাত করিতেছে; তজ্জন্ত আমার স্বেচ্ছা-ভোগ ঘটতেছে। মনে হয়, আমি সর্বতোভাবে বিষয়ের অধীন ও বিষয়ের বশীভূত; বিষয়ের কোন কোন ক্রিয়া আমার প্রাণবাত্মের অমুকুল; কিছু বা প্রতিকূল। যাহা অমুকুল, তাহা আমার উপাদেয়; যাহা প্রতিকূল, তাহা আমার হেয়। উপাদেয়কে গ্রহণ করিবার জন্য, হেয়কে বর্জন ও পরিহার করিবার জন্য, আমি সর্বদা কর্মশীল, তদর্থ আমার কর্মোদ্বেগগুলি সর্বদা চেষ্টাশীল ও কর্মপর। এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন। বিষয়ের সহিত আমার যে ক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণে আমি আমার জন্মকাল বলি; বিষয়ের সহিত কারবার বর্তমান চলিতে থাকে, ততদিন আমার বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয়

ঘটে; ও যে সময়ে কারবার থামে, সেই সময়কে মৃত্যুকাল বলিয়া নির্দেশ করি। এই সমগ্রকাল ধরিয়া আমি বিষয়াধীন থাকিয়া হেয়বর্জন ও উপাদেয়গ্রহণে চেষ্টা করি। বিষয়াধীন হইয়া আমাকে বিবিধ কর্ম করিতে হয় ও সেই সকল কর্মের যথানিয়মে ফলভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পরেই যে আমার সহিত বিষয়ের কারবার চিরকালের জন্য থামে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত তৎপরেও অল্প স্থানে অল্প দেহ ধারণ করিয়া আমাকে অল্প কর্ম করিতে হয় ও তাহার ফলস্বরূপ স্বেচ্ছা-ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ আমার জন্মের পূর্বেও সম্ভবত অল্পস্থানে অল্পদেহে বিষয়ের সহিত আমার কারবার চলিয়াছিল; তাহার স্মৃতি এখন বর্তমান নাই। কিন্তু তাহার ফলভোগ হয় ত অত্মাপি করিতে হইতেছে। এইরূপ মনে না করিলে, জন্মাস্তরকৃত কর্মের ফল বলিয়া না বুঝিলে, এ জন্মের সকল স্বেচ্ছা-ভোগের হেতুনির্দেশ হয় না। জগৎপ্রণালীর নৈতিক সামঞ্জস্য—moral justification—ঘটে না।

এইরূপে বিষয়ের সহিত আমার এই কারবারের আরম্ভ, আমার এই স্বেচ্ছা-ভোগ, আমার এই কর্মপরতা, কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কবে শেষ হইবে, তাহাও বলা দুষ্কর। এই জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী বিষয়-বিষয়ীর পরস্পর আদান-প্রদান—ইহার নাম সংসার। ইহাতে কখন বা আমি বিষয়কে আত্মজীবনের অমুকুল করিয়া লইয়া সুখী হই, কখনও বা বিষয়-কর্তৃক পরাভূত হইয়া দুঃখভোগ করি। চক্রনেমির আবর্তনের সহিত আমার এই

দশাবির্ণায়েকে উপমিত করা চলে। আমাকে আমি এই সংসারচক্রে ঘূর্ণমান, পরিমিত, কর্মবন্ধনবদ্ধ বিষয়াধীন জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ঐ বিষয় সর্বতোভাবে আমা হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বহিঃস্থ, ও আমা অপেক্ষা সর্বতোভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস। উহা আপন নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার প্রভুত্ব নাই; কখন বা আমি চেষ্টা দ্বারা নিয়মকে আমার অঙ্গুল করিয়া লই বটে, কিন্তু সেই নিয়ম সর্বতোভাবে আমার অনধীন ও শেষ পর্যন্ত উহা আমাকে পরাভব করে; তখন আমি জগদ্ব্যস্তের চাকার তলে দলিত, পিষ্ট, অভিভূত হইয়া থাকি।

আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ আপাতত আমার ঐক্য বোধ হয়। বোধ হয়, জীব ক্ষুদ্র, জগৎ বৃহৎ। জীব জগতের অধীন এবং জগতের অধীনতাবশে স্বথঃস্বাভাবী ও জরামরণশীল। বৈদান্তিক এইখানে আসিয়া বলেন, ‘যাহা মনে করিতেছ, তাহা ভুল। জীবের স্বভাব ঐক্য নহে, জগতের স্বরূপ ও ঐক্য নহে; এবং উভয়ের সম্বন্ধ যাহা ভাবিতেছ, ঠিক তাহার উল্টা। ঐ যে জগৎ, ঐ যে বিষয়, উহার পারমাণ্বিক অস্তিত্ব নাই; উহা বিষয়ীর অর্থাৎ আমার কল্পিত পদার্থ। পরমার্থত উহা স্বপ্নবৎ অলৌক পদ’। এ কথা যে বৈদান্তিক একা বলেন, তাহা নহে। ইহা প্রাচ্য দার্শনিকের আকিমথুরি নহে। বার্কলি ও হিউম্ হইতে জন্ ট্যুয়ার্ট মিল্ ও টমাস্ হুম্‌স্‌ হক্‌সলী পর্যন্ত সকলেই জগতের পারমাণ্বিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি কাটিতে যিনি সাহস করিবেন,

তিনি করুন। আমরা সেই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা তাঁহাদের সহিত মানিয়া লইব—বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহা বিষয়ীর কল্পনামাত্র। বিষয়ী উহাকে সৃষ্টি করিয়া আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে।

এইখানে সৃষ্টিশব্দ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল। ইংরেজিতে যাহাকে creation বলে, আজকাল আমরা সৃষ্টিশব্দ সেই অর্থে ব্যবহার করি। ইংরেজি creation শব্দে কখনও গঠন বা নির্মাণ বুঝায়, কখনও অভিব্যক্ত করা বা মূর্ত্যাস্তর দেওয়া বুঝায়, আবার কখনও বা স্বভাব হইতে ভাব-পদার্থের উৎপাদন বুঝায়। কিন্তু বিষয়ী যে অর্থে বিষয়কে সৃষ্টি করে, আমি যে অর্থে আমার জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা ঐক্য creation বলিলে বুঝায় না। এই সৃষ্টি-শব্দের অর্থ কি, তাহা ৬ উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহার সাংখ্যদর্শনপুস্তকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। এস্থলে তাঁহার ভাষা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন সংবরণ করিতে পারিলাম না। “স্বজ্-ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ভাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ নির্মিত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্বারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেক্রমে স্থলভূতের আবির্ভাব হয়—তাঁহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। যেমন গুটিপোকায় রেশমের কোরা নির্মাণ করিয়া আপনাকে তদ্ব্যবস্থ করে, তক্রপ নয়নারী যে প্রক্রিয়া

দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্তজগতের বা স্থলভূতসংসারের) তত্ত্ব দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি" (সাংখ্যদর্শন ৩৬ পৃঃ) । আমরাও সৃষ্টি-শব্দ ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিলাম । বটব্যালমহাশয়ের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, তিনি সাংখ্যমত বুঝাইতেছেন ; আমরা বেদান্তমত বুঝাইতেছি । সাংখ্য বহু জীবের, বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন । বৈদান্তিক এক জীবের, এক পুরুষের, এক আত্মার অস্তিত্ব মানেন । বটব্যাল-মহাশয় বেদান্তে 'নরনারী' বলিয়াছেন, বেদান্তী সেখানে কেবল জীব অথবা 'আত্মা'-শব্দ ব্যবহার করিবেন । অপিচ সাংখ্য জ্ঞেয়-নামক পদার্থের—প্রকৃতির—স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন ; তবে এই জ্ঞেয়প্রকৃতি তাঁহার মতে প্রতীয়মান জগৎ নহে ; উহা কোন অনি-রূপা বস্তু, বাহ্য আত্মার বা পুরুষের সরিধানে আসিয়া আত্মার সৃষ্টিক্রমতাবলে পরিদৃশ্যমান প্রতীয়মান জগতে পরিণত হয় । বেদান্ত সেই স্বতন্ত্র অনিরূপা জ্ঞেয়প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না । কাজেই বিনি বৈদান্তিক, তিনি বটব্যালমহাশয়ের ভাষা একটু বুঝাইয়া বলিবেন, 'যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনায় জ্ঞানরাশিকে আপনাই হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, আপনাই হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয়-পদার্থে পরিণত করে, তদ্বারা ব্যক্তজগতের নির্মাণ করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে বেক্রমে স্থল ও হ্রস্ব ভূতসমষ্টি বিষয়ের আবির্ভাব হয়, —তাঁহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি ।'

বেদান্তমতে জ্ঞেয়, ব্যক্ত, প্রতীয়মান জগ-জ্ঞেয় স্বরূপ কি, তাহা বলা হইল । উহা

আত্মারই সৃষ্ট, আত্মারই করিত ; উহার ব্যাক-হারিক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমাণবিক অস্তিত্ব নাই । এ বিষয়ে প্রাচ্যদর্শন ও প্রতীচ্যদর্শন একমত ।

তৎপরে কথা, আত্মার স্বরূপ কি ? পূর্বেই বলিয়াছি, কণিকবিজ্ঞানবাদী প্রাচ্য দার্শ-নিক ও হিউম্ ও হক্‌সলির দ্বারা প্রতীচ্য দার্শনিক এই আত্মারও অস্তিত্ব মানেন না । বেদান্ত উহার অস্তিত্ব মানেন ; ভুলই হউক আর ঠিকই হউক, মানেন ; এবং বলেন, এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ ; ইহার অস্তিত্ব-প্রতিপাদনের জন্ত কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই । এখন এই আত্মার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয় । বেদান্তমতে আত্মাই যখন বিশ্বজগতের সৃষ্টি-কর্তা এবং সেই বিশ্বজগৎ যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত-নিরমাহুসারেই অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে, তখন আত্মাকেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ জৈশ্বর বলিতে হয় । বেদান্ত তাহাই বলিয়াছেন । বেদান্ত আত্মা-কেই পুনঃপুন ঐ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন । আত্মা সর্বজ্ঞ—নতুবা অনা-গত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া জগদব্যব চালান সম্ভবপর হইত না ; আত্মা সর্বশক্তিমান্, নতুবা পরিদৃশ্যমান জগতে বাহ্য-কিছু বিদ্যমান, সে সকলেরই তৎকর্তৃক সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না । এইরূপে আত্মার সর্বজ্ঞতা ও সর্ব-শক্তিমত্তা আরোপ করিয়া বেদান্ত আত্মাকে অর্থাৎ আমাকে জৈশ্বর এই নাম দিয়াছেন । এখন বলা বাহুল্য, এই বেদান্তের জৈশ্বর ঐষ্টানসমাজের বা ব্রাহ্মসমাজের স্বীকৃত জৈশ্বর নহেন । নৈহারিকাদি ঐশ্বর্যকারিণী

নিকেরা জীব হইতে স্বতন্ত্র যে জগৎকারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, এ ঈশ্বর সে ঈশ্বরও নছেন। বৈষ্ণবদিগের ভাষা সকল সময়ে বুঝা যায় না। বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও অনেক স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত জীবের ভিন্নত্ব ও সেব্যসেবকস্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার একপ ভাবায় কথা কহিয়াছেন যে, তাঁহারা বেদান্ত-স্বীকৃত আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাহা বলা হুকার। বৈষ্ণবগণের চতুর্বাহত্বের সহিত বৈদান্তিক অদ্বয়ত্বের সমন্বয়চেষ্টা দেখিয়াছি। তবে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃগণের নিকট এই সমন্বয়চেষ্টা অসম্বোধিত হইবে কি না, জানি না। অস্ত্রের পক্ষে বাহাই হউক, অদ্বয়মতে আমিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগতের স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহর্তা। পরিনৃশ্রমান চরাচরের “জন্মাদি” আমা হইতেই।

এইরূপে বেদান্ত আত্মার জগৎকারণত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে ঈশ্বরপদবাচ্য করেন ও সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি তাঁহাতে অর্পণ করেন। আবার অস্ত্রদিকে তিনিই আত্মাকে সর্বগুণবিবর্জিত নিরুপাধিক শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এই একটা মৃদাসমত্তা। আত্মাকে নিরুপাধিক বলার তাৎপর্য্য আগে বুঝা যাউক। আমি আছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। ইহা আমার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সেই আমি কিংবদন্ত, আমি কেমন, ইহা বুঝাইবার ও বলিবার ভাষা পাওয়া যায় না। কেন না, বাহা-কিছু জ্ঞান-গম্য, তাহাই ভাষা দ্বারা প্রকাশযোগ্য ও

বর্ণনীয়; কিন্তু বাহা জ্ঞানগম্য, তাহা বিষয়-শ্রেণীভুক্ত, তাহা বিষয়ী নহে। কাজেই আত্মার অর্থাৎ বিষয়ীর যদি কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম থাকে, তাহা হইলে আত্মা বিষয়ী না হইয়া বিষয়ের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কাজেই কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম, কোন ভাষায় বর্ণনীয় গুণ, আত্মায় আরোপ করা চলে না। কাজেই আত্মাকে ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। বাক্য মনের সহিত আত্মাকে না পাইয়া, আত্মার স্বরূপপ্রকাশে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। বড় জোর, তাহা বিশুদ্ধচেতনাস্বরূপ, এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু সেই চেতনা আবার কি, তাহা বুঝান চলে না।

এইরূপে বেদান্ত আত্মাকে নিঃশূণ, নিরুপাধিক, অনির্কীচ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। হিউমের ভ্রায় প্রপঞ্চমাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিয়া বণেন, ‘যাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না, বুঝি না, বুঝাইতেও পারি না, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার উপায় নাই, তাহার অস্তিত্বস্বীকার বুঝা জন্ম না।’ ঋণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রায় সেই কথাই বলেন। তিনি বলেন, ‘যদি বাস্তবিকই সেইরূপ কোন অনির্কীচ্য পদার্থ থাকে, ও তাহার নামকরণ নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহাকে শূন্য বলাই ভাল।’ বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, ‘আমি উহাকে শূন্য বলিতে প্রস্তুত নহি। শূন্য বলারও যে ফল, নাস্তি বলারও সেই ফল। উহা নাস্তি, ইহা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। উহা নাস্তি নহে; আমি জানিতেছি, উহা অস্তি; উহার অস্তিত্ব

সমক্ষে আমি যেমন নিঃসংশয়, অল্প কোন পদার্থের অস্তিত্বসম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসংশয় নহি। অথচ উহা কেমন, তাহা ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না।'

ভাষা দ্বারা বর্ণনীয় নহে, বুঝাইবার ভাষা পাই না, অতএব নাই—নাস্তিকগণের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ। বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে পারি না, এরূপ উদাহরণ অনেক আছে। একটা মোটা উদাহরণ দিব। মনে কর, সবুজ রঙ; সবুজ রঙ কাকে বলে, তাহা আমি জানি; উহা আমার একটা পরিচিত প্রত্যয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ত, তাহাকে সবুজ রঙ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার কোন আশা নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অন্ধ নহে, অথচ সবুজ রঙ কখনও দেখে নাই, তাহাকেও আমি বর্ণনা দ্বারা সবুজ রঙ কি, তাহা বুঝাইতে পারিব না। তবে একটা গাছের পাতা তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাই সবুজ রঙ। জন্মান্তকে যেমন রঙ বুঝান যায় না, তেমনি জন্মবধিরকে শব্দ বুঝান চলে না। সেইরূপ চেতনা কি, তাহা আমি জানি, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি উপলব্ধি করি; উহার একটা নাম দিতেও পারি; কিন্তু অন্ধকে বুঝাইতে পারি না। হিউমের মত ধিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন নাই, তাহাকে আমরা ধোর করিয়া উহা উপলব্ধি করাইতে পারি না। আবার আত্মা যদি একের অধিক বহু থাকিত, যদি আত্মার সদৃশ বা সমধর্মী অল্প-কিছু থাকিত, তাহা হইলেও সেই বস্তু নাস্তিককে দেখাইয়া বলা হইতে পারিত, ইহাই আত্মা, অথবা

আত্মা ইহারই মত। কিন্তু আত্মা বহু নহে; উহার সদৃশ বা সমধর্মী অল্প কোন বস্তু নাই। উহা এক অদ্বিতীয় চেতন পদার্থ; জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। কাজেই যতক্ষণ নিজে না বুঝিবে, ততক্ষণ উহার স্বরূপ বুঝাইবার উপায় নাই।

তবে গোল এই যে, বেদান্ত এক মুখে আত্মাকে নিগূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অল্প মুখে আবার তাহাকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ জগৎকারণ দৈশ্বর বলিয়া বিবৃত করেন, এ কিরূপ? ইহার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ঐ প্রকাণ্ড উপাধি বর্তমান থাকিতে আত্মাকে নিরূপাধিক বলিব, একি ব্যাপার? একবার বলিতেছি, আমি জগতের স্রষ্টা; আবার বলিতেছি, আমি গুণবজ্জিত; এ কিরূপ ব্যাপার?

বেদান্ত এইরূপে উত্তর দেন। বেদান্ত বলেন, এই সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি ভূয়া উপাধি—উহা অধ্যাস। যাহা বা নহ, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নহে; উহাকে সর্প মনে করা অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ। আত্মায় কোন গুণ নাই, কোন উপাধি নাই; উহাতে যে সর্বজ্ঞতাদি উপাধি আরোপ করা হয়, উহাও অধ্যাস বা মিথ্যা ধর্মের আরোপ। রজ্জু সর্পের মত দেখাইলে উহা সর্প হয় না; আত্মা সোপাধিক দেখাইলেও উহা সোপাধিক হয় না; প্রকৃতপক্ষে উহা নিরূপাধিক। উপাধি কেবল ভ্রম।

কি সর্বনাশ! প্রতিপক্ষ বলিবেন, 'তবে এতক্ষণ ধরিয়া এত চিন্তাধ্বনি সহকারে প্রতিপক্ষ সহ এত বিতণ্ডার পর, আত্মাকে

জগৎকর্তা বলিয়া সপ্রমাণ করিবার পরি-
শ্রমের প্রয়োজন কি ছিল ? এই যে প্রতি-
পাদন করিলে, “বিশ্বজগতের কর্তা আর-কেহ
নহে, আমি স্বয়ং ; বিশ্বজগতের আমিই সৃষ্টি
করিয়াছি ; আমিই আমার উদ্দেশ্যানুরূপ
করিয়া চালাইতেছি” ; এসব কি অনর্থক ?
এতক্ষণ বলিতেছিলে সত্য ; এখন বলিতেছ
মিথ্যা ; তোমার কথার মানে বোঝাই দায়
হইল । তোমার কোন কথাই গ্রহণ করিব ?

বেদান্তী বলেন, ‘বন্ধু হে, একটু স্থির হও ।
আমার ভাষাটা হেঁয়ালি-গোছের হইতেছে
বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে হেঁয়ালি
ধাকিবে না । ভাষাটা বড় অদ্ভুত জিনিষ ;
সত্য-মিথ্যা, এই শব্দ-দুটাই অনেকসময়
গুণগোল বাধায় । যাহাকে সত্য বলা যায়,
তাহা এক হিসাবে সত্য, অল্প হিসাবে মিথ্যা ।
যাহাকে মিথ্যা বলা যায়, তাহা একার্থে মিথ্যা,
অল্প অর্থে সত্য । মনে কর মরীচিকা—
মরুভূমিতে জলভ্রম—ইহা সত্য না মিথ্যা ?
এক হিসাবে ইহা সত্য । যাহাকে আমরা
জল বলি, তাহা একটা প্রত্যয়মাত্র বা কতি-
পয় প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র—কতিপয় প্রত্যয়
বুগপৎ বুদ্ধির সমীপস্থ হইলে উহাকে জল বলা
যায় । বস্তুত জল বলিয়া আমার বাহিরে
কিছু নাই । কিন্তু জলবুদ্ধি আছে, জলের
প্রত্যয়টা আছে । মরীচিকাতে যে প্রত্যয়
জন্মাইয়াছে, উহা জলেরই প্রত্যয় । যতক্ষণ
ঐ প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা জলেরই
প্রত্যয়—যে প্রত্যয়সমষ্টিকে আমি জল নাম
দিই, উহা সেই প্রত্যয়সমষ্টি । কাজেই উহা
সত্য ; অন্তত যতক্ষণ মরীচিকা থাকে,
যতক্ষণ ঐ জলপ্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা

সত্য । তার পর যখন অল্প প্রত্যয় উপস্থিত
হইয়া পূর্বপ্রত্যয়কে ধ্বংস করে, জলপ্রত্যয়
নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বলা যায়, ঐ পূর্ববর্তী
প্রত্যয় মিথ্যা । যতক্ষণ ঐ জলপ্রত্যয় ছিল,
ততক্ষণ উহা সত্যই ছিল ; ততক্ষণ তুমি মাথা
খুঁড়িলেও আমি উহাকে জলের প্রত্যয় ভিন্ন
অল্প প্রত্যয় বলিতাম না । এখন যখন সে
প্রত্যয় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথ্যা বলিতে
প্রস্তুত আছি । এতক্ষণ উহাকে সত্য বলিতে-
ছিলাম, কিন্তু এখন জানিতেছি, উহা স্থায়ী
সত্য নহে, উহা তাৎকালিক সত্য । যাহা
স্থায়ী সত্য নহে, তাহাকে তৎকালে যে সত্য
মনে করিয়াছিলাম, তাহারই নাম অধ্যাস ।
এখন নূতন প্রত্যয় আবির্ভাবের পর নূতন
বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, অধ্যাস কাটিয়া গিয়াছে ।
সেইরূপ রজ্জুকে যখন সর্প বোধ হয়, ঐ বোধও
একটা প্রত্যয় ; তৎকালে উহা সত্য । কিন্তু
সর্পবুদ্ধি কাটিয়া গেলে জানিতে পারি, ঐ বুদ্ধি
তাৎকালিক সত্যমাত্র । এইরূপ স্বপ্ন এক
হিসাবে সত্য, অল্প হিসাবে মিথ্যা । যতক্ষণ
স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ উহার মত সত্য আর
কিছুই নাই । কাহারও সাধ্য নাই, উহা
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ; কিন্তু প্রবুদ্ধ অর্থাৎ
জাগরিত হইলে সে অধ্যাস যায় ; তখন উহা
সত্য নহে, জানিতে পারি ।

‘আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গেলেও
সত্য-মিথ্যা ঠিক এইরূপেই বুঝিতে হইবে ।

‘এই যে জড়জগৎ, যাহা আমার বাহিরে
আমি দেখি, উহাও একার্থে সত্য, অল্প অর্থে
সত্য নহে । যতক্ষণ উহাকে আমি আমার
বাহিরে আদ্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখি,
ততক্ষণ উহা সত্য—কাহার সাধ্য উহাকে

মিথ্যা বলে। তখন উহা সত্য—উহা তাৎ-
কালিক সত্য—উহা ব্যবহারিক সত্য—কেন
না, উহা কতকগুলি ইঞ্জিয়লব্ধ বুদ্ধিগোচর
প্রত্যয়ের সমষ্টি। উহার এই সত্যতা স্বীকার
করিয়াই আমার জীবনযাত্রা চলিতেছে;
নতুবা আমার জীবনই বা কোথায় থাকিত,
আমার জগৎই বা কোথায় থাকিত! যতক্ষণ
উহাকে ঐরূপ সত্য মনে করি, ততক্ষণ
উহার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্ত, উহা কোথা
হইতে আসিল বুঝাইবার জন্ত, উহার নির্দ্বি-
তায়, উহার সৃষ্টিকর্তার, অস্তিত্বকল্পনা আব-
শ্যক হয়। তা ত হইবেই। উহা যখন
সত্য—তাৎকালিক সত্য, তখন উহার উৎ-
পত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ অহুসধান করিতেই
হইবে। তখন আমরা অত্র কারণের সন্ধান না
পাইয়া, প্রচলিত কারণের অসঙ্গতি দেখাইয়া,
আত্মাকেই উহার কারণ বলিয়া, আত্মাকেই
জগতের স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া নির্দেশ করি।
যতক্ষণ এই জগৎ সুব্যবস্থ স্থানীয় উদ্দেশ্য-
সুধারী বৃহৎ যন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, ততক্ষণ
যাহাকে সেই যন্ত্রের নির্দ্ব্যস্ততা ও চালক মনে
করা যায়, তাহাকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান
প্রভূতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হই।
অচেতন জড়জগৎ যখন আপনাকে আপনি
উদ্দেশ্যসুখে চালাইতে পারে না, তখন যে
একমাত্র চেতনপদার্থকে আমি জানি, সেই
চেতন আত্মাকেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
বলিয়া নির্দেশ করি। জড়জগৎ যে হিসাবে
সত্য, আত্মার সর্বজ্ঞত্বাদিও ঠিক সেই হিসাবে
সত্য। ইহাতে বিশ্বদ্বন্দ্বপ্রকাশের কারণ নাই।

‘কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড়জগৎ
বঙ্গদর্শন, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তখন

বুঝিতে পারি—উহা একটা অধ্যাসমাত্র।
যাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাতে যখন
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করিরাছি, তখন সেই
আরোপ কেবল অধ্যাস। তখন বুঝিতে
পারি, যাহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম,
উহা তাৎকালিক ব্যবহারিক সত্যমাত্র, স্থায়ী
পারমাণবিক সত্য নহে। সেই কল্পিত জগতে
যে নিয়মের, যে ব্যবস্থার, যে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব
দেখিতেছিলাম, জগৎই যখন কল্পনা, তখন
সে সকলই কল্পনা। জগৎই যখন অধ্যাস,
সে সকলই তখন অধ্যাস। তখন সেই মিথ্যা-
জগতের স্রষ্টা, বিধাতা, নিয়ন্তা কল্পনারই বা
প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাহার আবার
সৃষ্টি কি? তাহার আবার নিয়ন্তা কি? ঐ
সকল বিশেষণ তখন অর্থশূন্য হইয়া পীড়ায়।

‘ব্যাক্য পুত্র যেমন অর্থশূন্য, বোড়ার
ডিমের যেমন অর্থ হয় না, অস্তিত্বহীন পদা-
র্থের সৃষ্টিকর্তা, তেমনই অর্থশূন্য। জানোদরে
এই অর্থশূন্যতা বুঝিতে পারি। তখন আর
আত্মার কর্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপের
আবশ্যকতা থাকে না। জগৎকে সত্য ধরি-
য়াই আত্মাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, অতএব
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বলিতেছিলাম। জগ-
তের সত্য যখন ব্যবহারিক সত্য হইল,
তখন আত্মারও ঈশ্বরত্ব ব্যবহারিকভাবে
সত্য। লোকব্যবহারের জন্ত, জীবনযাত্রার
সুবিধার জন্ত, আমি জগৎকে সত্য ও
আত্মাকে জগতের কর্তা বলিয়া নির্দেশ
করিরাছিলাম। জগৎকে যদি সত্য বল,
আত্মাকেই উহার কর্তা বলিতে হইবে। অতঃ
কর্তা কাহাকেও বুঝিয়া পাওয়া যায় না।
কিন্তু যখন অধ্যাসের লোপ হয়, তখন

কেই মিথ্যা বলিয়া জানি, তখন আত্মাতে আর জগতের কর্তৃত্ব আরোপের প্রয়োজন থাকে না। যাহা নাই, তাহার আর কর্তা কি? কাজেই ব্যবহারিক হিসাবে আত্মা ঈশ্বর ও সোপাধিক; পরমার্থত আত্মা কর্তৃত্ব-হীন, নিঃশূণ ও নিরূপাধিক।'

অবশ্যমতে আমি পরমার্থত উপাধিশূন্য, কিন্তু ব্যবহারত উপাধিযুক্ত। এক ভাবে দেখিলে আমার কোন গুণ নাই, কর্তৃত্ব পর্য্যন্ত নাই, অতভাবে দেখিলে আমিই জগৎ-কর্তা। এই জগৎকর্তৃত্বরূপ উপাধি, বাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মৎকল্পিত সৃষ্টিপ্রণালীর ব্যাখ্যা করি, ইহার পারিভাষিক নাম মায়া। বেদান্তের ভাষায়, আত্মা মায়া-পাধিক হইলে ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ আমি আমাতে মায়া নামক উপাধি আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি। ঐশ্বর্যজালিকে মায়াবী বলে, সে ব্যক্তি যে ক্ষমতায় দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া শূন্যমধ্যে বরষাড়ী নির্মাণ করে, কাটাযুগে কথা কহার, আমগাছে নারিকেল ফলায়, সেই ক্ষমতার নাম মায়া। বাহ্যজগৎ এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ইশ্বরজাল; কাজেই যে পুরুষ সেই ইশ্বরজাল উৎপন্ন করে, সে মায়াবী, সে মায়া নামক উপাধিযুক্ত। ঐশ্বর্যজালিকের উৎপাদিত ঐ সকল অদ্ভুত দৃশ্যের বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই; ঐশ্বর্যজালিকেরও বস্তুগত্যা আমগাছে নারিকেল ফলাইবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞানলোকে ঐশ্বর্যজালিকে যে অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করে, ঐশ্বর্যজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই নাই। তবে যে সে ঐরূপ আশ্চর্য্য কৌশল দেখায়, তাহা দর্শকগণেরই অজ্ঞতার ফল। যে জানে,

সে ঐশ্বর্যজালিকের মায়ার প্রভাবিত হয় না; সে ঐ সকল কৌশলকে মিথ্যা দৃষ্টিভ্রম বলিয়াই জানে ও ঐশ্বর্যজালিকেও অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করে না। সেইরূপ আত্মা যে জগতের সৃষ্টি করে, সে জগৎও অলৌকিক পদার্থ; যে ইহা জানে না, সে প্রভাবিত হয়; তাহার নিকট আত্মা মায়াবী, অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পদার্থ; আর যে জগৎকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া জানে, সে জানে, আত্মায় ঐরূপ ক্ষমতার আরোপ আবশ্যক নহে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিঃশূণ ও উপাধিশূন্য। যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে না, সে বদ্ধ; আর যে জানিয়াছে, সে মুক্ত।

বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি, তাহা এখন বুঝা বাইবে। উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা বুঝা গেল। বিষয় একটা অধ্যাস; উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে। বিষয়ীর ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উভয়বিধ অস্তিত্বই আছে; তবে ব্যবহারত উহা মায়াবলে জগতের সৃষ্টিকর্তা, অতএব সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান; কিন্তু পরমার্থত উহা উপাধিরহিত, নিষ্ক্রিয়, কর্তৃত্বহীন। এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ হইতে পারে? আমি আমাকে সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অধীন, সসীম, সসীর্ণ, অখণ্ডস্থতাগী, জরামরণশীল ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহা অধ্যাসমাত্র। প্রকৃত সম্বন্ধ ঠিক ইহার বিপরীত। আমিই বরং জগতের স্রষ্টা নিরুপাধি বিধাতা বলিলে ঠিক হয়। আমিই জগৎকে ঐরূপভাবে গড়িয়াছি ও ঐরূপভাবে চালাই-তেছি, তাই জগৎ ঐরূপ দেখায় ও ঐরূপ চলে। এইরূপ বলিলে বরং ঠিক হয়।

কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পরমার্থত আমি ঐরূপ কিছুই করি না। আমি ঐরূপ করি বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধস্বাত্মক। আমি কিছুই করি না। ঐন্দ্রজালিক কাটাযুগে কথা কহায় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহাও বোধস্বাত্মক; ঐন্দ্রজালিক তাহা করে না। অতএব আমি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জীব।

এ পর্যন্ত যে আত্মার কথা বলা গেল, যাহাকে বিষয়ী বা জীব এই নাম দেওয়া হইল, সে আমি; আর কেহই নহে। আমিই একমাত্র জীব, এবং এই জীবই ব্রহ্ম, এই আমিই ব্রহ্ম। এখন জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে, জীবাত্মাই যদি একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ, জীবই যখন ব্রহ্ম, তখন আবার ‘পরমাত্মা’-নামটা বেদান্তের ভাষায় ব্যবহৃত হয় কেন? আত্মা বা জীবাত্মা বা জীব শব্দ ব্যবহারেই যখন সকল কাজ চলে, তখন ‘পরমাত্মা’-নামক আর-একটা আত্মার কল্পনা করিয়া শেষে সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদপ্রতিপাদনরূপ উৎকট পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পরমাত্মার নাম আদৌ উঠে কেন? পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন, তবে পরমাত্মা এই পৃথক্ নামকরণের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন কি, তাহা শারীরকভাষ্যের আরম্ভেই একটি কথা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। ভাব্যকার যাবতীয় পদার্থকে বিষয়ী ও বিষয়, এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—বিষয়ী আমি, আর বিষয় আমা-ছাড়া আর সব। এই দুয়ের সম্বন্ধ আলো আর আঁধারের মত সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই আমাদের

বোধ হয়। যাহা বিষয়ী, তাহা বিষয় নহে; যাহা বিষয়, তাহা বিষয়ী নহে। যে দেখে, সেই বিষয়ী; যাহা দেখা যায়, তাহা বিষয়। কিন্তু তার পরেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এই বিষয়ী অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আমি যেমন তোমাকে জানি, রামকে জানি, শ্যামকে জানি, তেমনি আমি আমাকেও জানি। আমাকে আমি জানি না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। আমি একদিকে জ্ঞাতা, অন্তর্দিকে আমারই জ্ঞেয়; আমিই আমার অহংবৃত্তির গোচর। যাহা জ্ঞানগম্য, যাহা জানা যায়, তাহাকেই যদি বিষয় বলা যায়, তাহা হইলে আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। পাশ্চাত্যদর্শনেও Ego-নামক আমাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এককে বলা হয় Empirical Ego—অর্থাৎ বিষয় আমি; অন্তকে বলা হয় Pure Ego বা Transcendental Ego—অর্থাৎ বিষয়ী আমি। বেদান্তশাস্ত্রে এই বিষয়-আমার বা জ্ঞানগম্য-আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা; আর এই বিষয়ী আমার বা জ্ঞাতা আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা।

এই উভয় আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি? বলা বাহুল্য, ইনিও যে আমি, উনিও সেই আমি। আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা আমি ও কর্তব্য আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি। ইহাতে মত্বৈধের সম্ভাবনা নাই। অথচ অন্তভাবে দেখিলে উভয়কে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিরূপে, দেখা যাক্।

আমরা একাধারে বিষয়ী ও বিষয়—ভাব্য-কারের এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। এই বিষয়ীর নাম পরমাত্মা ও বিষয়স্বরূপে প্রতীয়মান আত্মার নাম জীবাত্মা। আমিই আমাকে দেখি; যে আমি দেখে, সে পরমাত্মা; যে আমাকে দেখা যায়, সে জীবাত্মা। এই জ্ঞাতা আমি নিষ্কিকার, নিষ্ক্রিয়; আর জ্ঞানের বিষয় আমি পরিবর্তনশীল, বিকারশীল, জড়ের বাতপ্রতিঘাতে মুহূমান, জড়জগৎকর্তৃক অভিভূতমান, অরামরংগাল, কর্মপর, সংসারে দ্রমমাণ। এইরূপে দেখিলে উভয়ে ভিন্ন, আবার উভয়েই এক। পরমাত্মাও যে, জীবাত্মাও সে, বেদান্তের এই কথাটার উপরেই দ্বৈতবাদীর যত আক্রোশ। কিন্তু এই আক্রোশের কোন কারণই নাই। পূর্বেই বলা গিয়াছে, দ্বৈতবাদী হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করেন। অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির সরল অর্থ যে, বিষয়ী আমি ও বিষয় আমি একই ব্যক্তি। যে দেখে ও বাহাকে দেখে, সে একই ব্যক্তি। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমিই আমাকে দেখি, এখানে দেখা-ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম, উভয়েই এক অভিন্ন ব্যক্তি। ইহারই নাম অদ্বয়বাদ। আমি একজন বাতীত আর দুই জন নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ইংরেজিতে personal identity নামে একটা কথা আছে। উহার অর্থ কালিকার আমি ও আজিকার আমি একই ব্যক্তি। কিন্তু এই ঐক্য জ্ঞেয়-আমার ঐক্য; জ্ঞাতা আমার ঐক্য নহে। কাল আমি আমাকে যেদ্রুপ দেখিয়াছিলাম, আজ ঠিক সেইরূপ

দেখিতেছি না, কিন্তু বস্তুগত্যা সেই আমি অবিকৃত আছে, ইহা বুঝানই ঐ উক্তির তাৎপর্য।

উভয়েই এক; কেন না, কালও যে আমি ছিলাম, আজও ঠিক সেই আমিই আছি। দেখিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ের ঐক্যে কেহ সন্দেহ করেন না। বাণ্যের আমি ও যৌবনের আমি ও আজিকার যুগ আমি, একই আমি; সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। বোধ হইতেছে যেন আমার কত পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ পূর্বেও যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি।

জ্ঞেয়-আমার বিকারসত্ত্বেও এই ঐক্য অর্থাৎ personal identity কিরূপ ঐক্য, তাহা লইয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঐক্যকে ঐক্য বলা যাইতে পারে না। কাল যে গাছটি দেখিয়াছিলাম, আজও সেই গাছটি দেখিয়া আমি বলি, উহা সেই একই গাছ। কালিকার গাছে ও আজিকার গাছে এই ঐক্য প্রকৃত ঐক্য নহে। কাল উহাতে যে পাতা, যে ফুল ছিল না, আজ সে পাতা, সে ফুল জন্মিয়াছে। কাল উহাতে যটা ডাল ছিল, তাহা আজ নাই; ঝড়ে একটা ডাল ভাঙিয়াছে। কালিকার গাছ ও আজিকার গাছ সর্বাংশে এক নহে, উহা অংশত এক। পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে ঐ পরিবর্তন ধীরে ধীরে ক্রমশ ঘটিয়াছে। একবারে অধিক পরিবর্তন হইলে হয়ত বলিতাম, এ গাছ সে গাছ নহে, তাহার স্থলে আর-একটা গাছ কেহ বসাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ক্রমিক পরিবর্তন, এই আংশিক

পরিবর্তন ঘটিতে দেখিলে আমরা তাহা না বলিয়া বলি, সেই গাছই আছে। কিন্তু বস্তুত সেই গাছ নাই। কাজেই কালিকার গাছের ও আজিকার গাছের ঐক্য সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। সেইরূপ কালিকার আমার ও আজিকার আমার ঐক্য পুরা ঐক্য— যোল-আনা ঐক্য— নহে। কাল যে আমাকে জানিতাম সে আমি ও আজ যে আমাকে জানিতেছি সে আমি, কখনই সর্বতোভাবে এক আমি নহে। কাল আমি সুখী ছিলাম, আজ আমি দুঃখী; কাল আমি ধনী ছিলাম, আজ গরিব; কাল আমি মূর্খ ছিলাম, আজ পণ্ডিত। তবে কতক মিলও আছে। কালিকার আমার যে যে গুণ ছিল, আজিকার আমার তাহার অনেক আছে; তবে সব নাই। কাজেই জেয়-আমার এই ঐক্য পূর্ণ ঐক্য নহে, উহা আংশিক ঐক্য। আমার এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে, ক্রমশ ঘটিয়াছে; সেই-জন্ত আমি বলি, সে আমি ও এ আমি এক আমি। কিন্তু এই একের অর্থ প্রায় এক; পুরা এক নহে। এ বিষয়ে যিনি আলোচনা চাহেন, তিনি হক্সলির লিখিত হিউমের জীবনবৃত্তান্তের ঐ অংশ পাঠ করিবেন।

আজ আমি যেমন আছি, কাল আমি কি ঠিক তেমনিটি ছিলাম? আমার স্থিতি কি বলে? আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে, কাল আমি হৃৎথে অভিভূত ছিলাম; শোকে স্ত্রিয়মাণ ছিলাম; আজ আমার সে অবস্থা নাই। সে অবস্থার স্থিতি আছে বটে; কিন্তু হৃৎথের সে তীব্রতা নাই। আবার কাল আমার জ্ঞানের সীমা যতদূর বিস্তৃত

ছিল, আজ তদপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে আমি ম্যাক্বেথ পড়িয়া ফেলিয়াছি; ইতোমধ্যে অয়চন্দ্র ও শ্রামচাঁদের সাহিত আমার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে; ইতোমধ্যে আমি দূরবীণ দিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; ইতোমধ্যে আমি রায়-বাহাদুর খেতাব পাইয়া উল্লসিত হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কালিকার আমি আর আজিকার আমি ঠিক সমান নহি। কাল আমার সহিত জগতের ঘাতপ্রতিঘাত নৈরূপ চলিয়াছিল, আজ ঠিক সেরূপ চলিতেছে না। কাল আমি আমাকে যে ভাবে, যে মূর্তিতে জানিতাম, আজ আমি আমাকে ঠিক সে ভাবে, সে মূর্তিতে জানিতেছি না। এইরূপ বাল্যকালের আমাতে ও যৌবনের আমাতে ও বাক্ক্যের আমাতে, সুখ আমাতে ও রুগ্ণ আমাতে, সুখী আমাতে ও দুঃখী আমাতে অনেক প্রভেদ। এই প্রভেদ আমার জ্ঞানগম্য। অতি শৈশবকালে যখন আমি নাতুক্রোড়ে বেড়াইতাম, সেকালের স্থিতিটুকু সেকালের-আমার যে অস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে, সেই আমি ও আজিকার প্রৌঢ়, দৃশ্য, কন্দপর আমি, কত ভিন্ন। তার আগে আরও শৈশবে আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা ত মনেই হয় না; স্থিতি কোন কথাই বলে না; অথচ তখনও আমি ছিলাম। কেমন ছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না; এমন ছিলাম না, তাহা নিশ্চয়। কাজেই যে আমি আমার বিষয়, সে আমি নিত্যপরিবর্তনশীল; সে আমি কাল একরকম ছিলাম, আজ অন্তরকম আছি; সম্ভবত আগামী

কাল অন্তরূপ হইব। ক্রমে ক্রমে সেই আমার পরিবর্তন ঘটিতেছে। কোন ছুট ক্রমে সে আমার মূর্তি ঠিক একরকম থাকে না। বলা বাত্য়, এই নিত্যপরিবর্তনশীল আমি বিষয়-আমি। এই আমি আমার জ্ঞানগম্য; ইহাকে আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, মনে করিতেছি। এই জ্ঞেয়-আমার বৈদান্তিক নাম-জীব। জীব নিত্যপরিবর্তনশীল, এবং এই পরিবর্তনের হেতু অব্যবহা করিলে দেখা গাইবে, বায়ু জড়জগতের সত্ত্বিত ঘাত-প্রতিঘাতই তাহার এই বিকারের হেতু। বায়ুজগতের অধীন বলিয়াই জীব কখনও স্থবী, কখনও চঞ্চল, কখনও মর্গ, কখনও পণ্ডিত, কখনও চরু, কখনও সবল, কখনও শিশু, কখনও বৃদ্ধ। জীবের এই বিকারপন্থা সত্য বলিয়া এখন মানিয়া লওয়া গেল।

কিন্তু তার পরে প্রশ্ন, জ্ঞেয়-আমি সবিকার, কিন্তু জ্ঞাতা আমিও কি সবিকার? যে আমি আমার এই পরিবর্তনের সাক্ষী, সেইহা বসিয়া-বসিয়া দেখিতেছে, তাহারও কি বিকার আছে, পরিবর্তন আছে? সেও কি জড়জগতের অধীন? এ বিষয়ে অহং-প্রত্যয় কি বলে?

অহং-প্রত্যয় বলে না। কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়া জীবের এই পরিবর্তন-পরম্পরা ঘটতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই। এই নিত্যপরিবর্তনশীল বিদ্যা-আমার পশ্চাতে আর এক আমি বসিয়া-বসিয়া স্থিরভাবে এই সকল পরিবর্তন নিরীক্ষণ করিতেছে—সেই আমার স্পন্দন নাই। তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন

বিকার নাই, পরিবর্তন নাই। সে বসিয়া-বসিয়া এই বিষয়-আমার নিরন্তর পরিবর্তন দেখিতেছে, নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, নির্বিকার ভাবে দেখিতেছে;—এই নিত্য পরিবর্তনের সে চিরন্তন বিন্দ্র সাক্ষী, অথচ এই পরিবর্তনব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, উদাসীন সাক্ষী আমি, বিষয়ী আমি; সে সর্বদা বিষয়-আমাকে নিমিষে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াছে। জড়-জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষয়-আমি নাচিতেছি, কাঁদিতেছি, হাসিতেছি,—কখন চোতন ও জাগ্রত, কখন স্বপ্নাবস্থ, কখন বা স্রবপ্ত—কীড়াপর, কন্দলীল,—ছাখী, স্থখী,—রাগী, দেবী, সৈয়ী, ঘলী,—এখন এমন, তখন তেমন,—কাল এইরূপ, আজ অন্তরূপ;—এই বিষয়-আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ, সদা-জাগ্রত, সদা-প্রকাশমান থাকিয়া এই কীড়ার, এই চাকলোর, এই বিকারের নিত্যসাক্ষী। বৈদান্ত্যশাস্ত্রে এই বিষয়-আমার নাম পরমায়া।

বিষয়-আমি ও বিষয়-আমি, উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা যথাসক্তি বুঝাইলাম। বিষয়-আমি আজ যেমন আছে, কাল তেমন ছিল না; যৌবনে যেমন, বাল্যে তেমন নয়, যৌবনে আবার অন্তরূপ। জন্মের পূর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না, কে বলিতে পারে? যদি থাকে, কিরূপ ছিল, তাহা আমি জানি না। শৈশবের অতি অস্পষ্ট স্মৃতি বর্তমান আছে। কিন্তু জন্মান্তর যদি থাকে, সেই পূর্বজন্মের স্মৃতি কিছুই নাই। তখন আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ

বৎসর, পঞ্চাশত বৎসর পূর্বে আমি কেমন ছিলাম, আমি ছিলাম কি ছিলাম না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অথচ সেই পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চাশত বৎসর পূর্বে বিষয়রূপী জড়জগৎ কিরূপ ছিল, তাহা আমি কতক বলিতে পারি। প্রত্যক্ষপ্রমাণে বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমানবলে বা শাস্ত্রপ্রমাণবলে বলিতে পারি। সে সময়ে আমার জন্মের পূর্বে, জগতের সৃষ্টি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হইতেছিল, কোথায় কি ঘটিতেছিল, তাহা আমার জ্ঞানের বিষয়। তাহা আমি, বিষয়ী আমি—এখান হইতে অল্পট দেখিতে পাইতেছি। ঐ ক্লাইব পলাশী-বাগানে লড়াই করিতেছেন,—ঐ জয়চন্দ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন,—ঐ দিখি-জয়ী সেকন্দার সসৈন্তে সিদ্ধনদ পার হইতেছেন,—ঐ আর্ঘ্যগণ হলহলকে গোধনসঙ্গে ভারতপ্রবেশ করিতেছেন,—ঐ ধরাপৃষ্ঠে মাষ্টোডন মেগাথীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই,—ঐ মহাসাগরে বৃহৎ কুম্ভীর, বৃহৎ মীন চরিয়া বেড়াইতেছে, শুভ্র-পায়ী তখনও আবির্ভূত হয় নাই: ঐ উত্তপ্ত ধরাপৃষ্ঠ মুহুমুহ ভূকম্পে আন্দোলিত হইতেছে, তখন প্রাণীর আবির্ভাব হয় নাই;—ঐ সৌরনীহারিকা সৌরজগতের পরিধি পৃথাস্ত ব্যাপিয়া ঘূর্ণমান, কেহ তাহা দেখিবার নাই;—কিন্তু আমি এখান হইতে বসিয়া-বসিয়া তাহা দেখিতেছি;—আমি জড়জগতের এই কলব্যাপী পরিবর্তনের সাক্ষী। বিষয়ী আমি এইখানে বসিয়া নির্বিকারভাবে, নির্নিমেষে, উদাসীনের মত বিষয়-আমার অতীত যৌবনের অতীত

শৈশবের, 'রাত্রিদিন দুকধুক তরঙ্গিত হুঃখমুখ' এর অবেক্ষণ করিতেছি; আবার বিষয়-আমি বধন ছিলাম না, অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকানা নাই, তখন বিষয় জড়জগৎ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিরূপে ঘুরিতেছিল, ফিরিতেছিল, অভিযুক্ত হইতেছিল, তাহাও এখানে বসিয়া-বসিয়া দেখিতেছি। সে কোন্ কালের কথা—স্বর্ঘ্যমণ্ডল তখন ছিল না—চন্দ্রমণ্ডল তখন ছিল না—আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত না—অচেতন ঘূর্ণমান জড় নীহারিকা, তাহাও হয় ত তখন ছিল না—আসীদিদং তমোভূতম্—সেই জগতের আদিম অবস্থা—তার পর কতকাল অতীত হইয়া গেল, মাস গেল, অন্ড গেল, যুগ গেল, কল্প গেল, আমি এইখানে বসিয়া নির্বিকার নিষ্ক্রিয় প্রশান্ত নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ চেতনা-স্বরূপ আমি এইখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। সনগ্র অতীতের আমি সাক্ষী—আমি বিষয়ী—আমি আত্মা—আমি পরমাত্মা—অগ্নি ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মস্মি।

এখন বেদান্তের অভিপ্রায় অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জড়জগৎ ত বিষয়, উহা অধ্যাস উহা মায়া। কাহার মায়া? উত্তর আমার মায়া। আমার অস্তিত্ব আমি যত সহজে মানিব, জড়জগতের অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না। কিন্তু সেই আমিই বা কিং-স্বরূপ? বেদান্ত বলেন, আমারও দুই সৃষ্টি—আমিও একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। আমি আমাকেই দেখি। যে দেখে, সে বিষয়ী; যাহাকে দেখে, সে বিষয়। যে বিষয়ী, তাহার নাম দাও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; যে বিষয়, তাহার

নাম দাঁও জীবাত্মা বা জীব । জীবাত্মা নিত্য-বিকারশীল ; জড়জগতের অধীনতায় উহাতে কেবলই বিকার ঘটিতেছে । পরমাত্মা নির্বি-কার ; সে জীবাত্মাকে সমুখে রাখিয়া তাহার এই বিকারপরম্পরা উদাসীনভাবে দেখি-তেছে । অতএব হই ভিন্ন বলিয়াই আপা-তত বোধ হয় । অথচ হই অভিন্ন । হই আমিই এক আমি । আমি আমাকে দেখি, এ স্থলে যে কর্তা, সেই কর্ম্ম । আমি আমা-কেই দেখি—অন্ত কাহাকেও দেখি না । আমি যখন স্মৃণী হই, তখন আমি আমাকেই স্মৃণী মনে করি, অথকে স্মৃণী মনে করি না । ইহা অতি সহজ কথা । দ্রষ্টা আমি ও দৃশ্য আমি, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, ব্রহ্ম ও জীব, উভয়ই এক, সমতোভাবে এক । ইহাই জীবব্রহ্মের, অভেদবাদ । ইহাই অদ্বয়বাদ । অদ্বয়বাদ আর কিছুই নহে । ইহাতে রাগ করিবার কিছুই নাই ।

বর্তমান পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মধ্যে উইলিয়ম জেম্সের নাম খ্যাতিলাভ করিতে চলিয়াছে । ইনি এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব । * আশা করি, বেদান্তের অভিপ্রায়, যাহা বুঝাইবার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করা গেল, তাহা যদি এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে ; তাহার Text-book of Psychologyর দ্বাদশ অধ্যায়ে এই আত্ম-তত্ত্বের বিচার আছে । তিনি গোড়াতেই আরম্ভ করিয়াছেন —“Whatever I may be thinking of, I am always at the same time more or less aware of myself, of my personal existence. At

the same time it is I who am aware ; so that the total self of me, being as it were duplex, partly known and partly knower, partly object and partly subject, must have two aspects discriminated in it, of which for shortness we may call one the *Me* and the other the *I*.” (পৃ: ১৭৬) । ইহার অর্থ, আমি যেমন অন্ত বিষয় জানি, তেমনি আমাকেও জানি । এবং সে কে জানে ? আমিই জানি । জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম আমার নাম দেওয়া হইল *Me*—বেদান্তের বিষয়-আমি অথবা জীব । আর কর্তা আমার নাম হইল *I*—বিষয়ী আমি অথবা ব্রহ্ম । তৎপরে বলিতেছেন—“I call these ‘discriminated aspects’ and not separate things, because the identity of *I* with *me*, even in the very act of discrimination, is perhaps the most ineradicable dictum of common sense, and must not be undermined by our terminology here.” (পৃ: ১৭৬) । অর্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, একই আমি—ভিন্ন-ভাবে দেখিলেও উহারা ভিন্ন নহে—ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন হইতে পারে না । ইহাই বেদান্তের অদ্বয়বাদ । বেদান্তও বলেন, যে জীব, সেই ব্রহ্ম । জ্ঞেয়-আমি জীব ও জ্ঞাতা আমি ব্রহ্ম ; কিন্তু উভয়ই এক । হই নাম বলিয়া হই নহে ।

ঐ জ্ঞেয়-আমার স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জেম্স্ বলিয়াছেন যে, এই জ্ঞেয়-আমার এক

—personal identity—পুরা ঐক্য নহে। এই জেয়-আমি বস্তুত বিকারশীল। “If in the sentence “I am the same that I was yesterday,” we take the ‘I’ broadly, it is evident that in many ways I am *not* the same. As a concrete Me, I am somewhat different from what I was : then hungry, now full ; then walking, now at rest ; then poorer, now richer ; then younger, now older ; etc. So far, then, my personal identity is just like the sameness predicated of any other aggregate thing. It is a conclusion grounded either on the resemblance in essential aspects, or on the continuity of the phenomena compared. The past and present selves compared are the same just so far as they *are* the same, and no further.” (পৃষ্ঠা ২০১—২০২)। অর্থাৎ কালিকার গাছ আর আজিকার গাছ, যেমন এক গাছ হইলেও পুরা এক গাছ নহে, সেইরূপ কাল যে আমাকে জানিতাম ও আজ যে আমাকে জানিতেছি, উহার। এক আমি হইলেও পুরাপুরি এক নহে।

কাজেই জেয়-আমি বিকারশীল। কিন্তু জ্ঞাতা আমার স্বরূপ কি ? লেখকের মতে —“The ‘I’ or ‘Pure Ego,’ is a very much more difficult subject of inquiry than the Me. It is that

which at any given moment *is* conscious, whereas the Me is only one of the things which it is conscious *of*. In other words, it is the *Thinker*. Is it the passing state of consciousness itself, or is it something deeper and less mutable ? The passing state we have seen to be the very embodiment of change. Yet each of us spontaneously considers that by ‘I’, he means something always the same. This has led most philosophers to postulate behind the passing state of consciousness a permanent substance or Agent whose modification or act it is. The Agent is the thinker. ‘Soul’ ‘transcendental Ego’ ‘Spirit’ are so many names for this more permanent sort of Thinker.” (পৃ: ১৯৫—১৯৬)। অর্থাৎ যে জ্ঞাতা আমি জেয়-আমার বিকারের ও চাকল্যের সাক্ষী, সে যেন নির্বিকার। সেই Permanent Agent এর বৈদান্তিক নাম পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। বৌদ্ধ অথবা হিউম এই সাক্ষীকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের মতে ঐ passing state of consciousness—কণিক বিজ্ঞানই—সমস্ত।

এই জ্ঞাতা আমি নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে বিষয়ে জেমসের সিদ্ধান্ত কি ? তিনি বুদ্ধের দিকে, না বৈদান্তের দিকে ? তাঁহার প্রশ্ন—“Does

there not then appear an absolute identity [with regard to the thinker] at different times ? That something which at every moment goes out and knowingly appropriates the Me of the past, and discards the non-me as foreign, is it not a permanent abiding principle of spiritual activity identical with itself wherever found ? ” (পৃ: ২০২) ।
 প্রশ্নের উত্তরে তিনি বুদ্ধের দিকে ঝোঁক দিয়া বলিয়াছেন—“The states of consciousness are all that psychology needs to do her work with. Metaphysics or Theology may prove the soul to exist ; but for psychology the hypothesis of such a substantial principle of unity is superfluous” (পৃ: ৩০৩) । অর্থাৎ মনো-বিজ্ঞানের পক্ষে ঐ কণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নিক্সিকার আত্মার বা পরমাত্মার অস্তিত্ব-স্বীকার আবশ্যক নহে। কেন না, “Successful thinkers numerically distinct, but all aware of the same past in the same way, form an adequate vehicle for all the experience of personal unity and sameness which we actually have.” (পৃ: ২০৩) অর্থাৎ পরস্পর অস-
 বদ্ধ পূর্বাগত কণিক-বিজ্ঞানের প্রবাহ বর্ত-মান ; প্রত্যেক কণিক-বিজ্ঞান তাহার পূর্ব-বর্তী কণিক-বিজ্ঞানের নিকট হইতে তাহার

অতীত প্রত্যাবিষ্কার সমষ্টি ধার করিয়া লয় ; ইহা মনে করিলেই আত্মাকে কেন এক ও নিক্সিকার বলিয়া বোধ হয়, তাহা বুঝা যাইবে। ইহা খাঁটি বুদ্ধের কথা। বৈদ্য-শিক্ষক বলেন, তথাস্ত, কণিক বিজ্ঞান পর-পর উপস্থিত হইয়া পূর্ব-বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান-সমষ্টি উদরসাৎ বা আত্মসাৎ করিয়া লয়, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এখানে থামা চলিবে না। কেন না, ঐ “পর-পর” কথাটায় গোল আছে। পর-পর বলিলেই একটা কালক্রমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মনে আসে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা, এই পারস্পর্য, ব্যাপারধানা কি ? আমি যেমন জড়জগৎকে আমার সম্মুখে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেশে বিস্তীর্ণ মনে করি, কিন্তু সেই দেশ কেবল কল্পিত দেশ ; দর্পণের পশ্চাতে কল্পিত দেশের সহিত বা স্বপ্নদৃষ্ট দেশের সহিত উহার পারমাণবিক ভেদ নাই ; সেইরূপ এই ক্ষণে বসিয়াই জেয়-আমাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করিয়া একটা অতীত কালের কল্পনা করি—মনে করি, কাল আমি এমনি ছিলাম, পরও আমি ইহা করিয়াছি, চল্লিশবৎসর আগে আমি মাতৃকোড়ে বেড়াইতাম—তারও আগে আমি ছিলাম না, তবে আমার পিতাপিতামহ ছিলেন, ম্যামথ-ম্যাটোডন ছিল—ইত্যাদি। এই কালও ত আমারই একটা কল্পনা। দেশও যেমন কল্পনা, কালও তেমনি কল্পনা। দেশ কাল উভয়ই আমার আমাকে দেখিবার বিবিধ রীতি। দুইটা ভিন্ন রকমের উপায়। আমার বাহিরে যেমন দেশও নাই, তেমনি কালও নাই। আমার দেশব্যাপ্তি কেহই স্বীকার করিলি বন না। আমার কালব্যাপ্তিই

বা কেন স্বীকার করিব ? বস্তুত আমি দেশেও ব্যাপ্ত নহি, কালেও ব্যাপ্ত নহি ।

বস্তুগত্যা আমি এখন এইরূপে বর্তমান, এইটুকু স্বীকার করিতে আমি বাধ্য । পূর্ব-বর্তী ক্ষণ বা পরবর্তী ক্ষণ, অতীত বা ভবিষ্যৎ, স্বীকারে আমি বাধ্য নহি । আমি অতীত-কাল কল্পনা করিয়া তাহার কিয়দংশমাত্র ব্যাপিয়া আমাকে বর্তমান মনে করি ; কিন্তু মনে করি মাত্র । আমি অনাগত কালের আশা করিয়া তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া বর্তমান থাকিব, এইরূপ প্রতীকার রহিয়াছি—কিন্তু উহা আমার আশামাত্র ও প্রতীকামাত্র । সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, আশা ও প্রতীকা । পরমার্থত উহা অস্তিত্বহীন । জ্ঞেয়-আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে ; কিন্তু জ্ঞাতা আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব নাই ।

কালই যেখানে কল্পনা—উহা জ্ঞাতা আমি কর্তৃক জ্ঞেয়-আমিকে ছড়াইয়া দেখিবার একটা কল্পিমাত্র—সেখানে কালের পরস্পরা—ইহা আগে, ইহা পরে—এই সকল উক্তি লোকব্যবহারমাত্র । উহা ব্যবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে । বিষয়ী আমি—সাক্ষী আমি—জ্ঞাতা আমি—পরমাত্মা আমি—ব্রহ্ম আমি—কালোপাধিশূন্ত ; আমি কালের বাহিরে ।

তাই যদি হইল, তবে আমি permanent—নিত্য কি না, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না । নিত্য বলিলেই কালব্যাপক বুঝায় । কিন্তু জ্ঞাতা আমি কালব্যাপক নহি, নিত্যও নহি । আমি এখন আছি, ইহা ঠিক । অতীত কালে সেই আমি ছিলাম কি না, ভবিষ্যতে

আমি থাকিব কি না, এ প্রশ্নের অর্থ হয় না ।

এইরূপ উত্তর যে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেম্সের কতক সংশয় ছিল । তাই তিনি হাতে রাখিয়া বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর এইরূপ ; তবে Metaphysics কিংবা Theology অন্তরূপ উত্তর দিতে পারেন । বেদান্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন না । মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যবহারিক শাস্ত্র ; জেম্‌স্‌ স্পষ্টাক্ষরে উহাকে natural science এর অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন । পরমার্থস্বামী বেদান্তের মতে সাক্ষী পরমাত্মা এখন বর্তমান—অতীতে উহা বর্তমান ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । কেন না, অতীত ও ভবিষ্যৎ পরমাত্মাতে অবস্থিত । পরমাত্মা স্বয়ং কালোপাধিবর্জিত ; উহা অদ্বয় ; উহা অখণ্ড । উহার একটুকরা কাল ছিল, একটুকরা আজ আছে, এমন মনে করা চলে না । অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি বলেন—“This *Me* is an empirical aggregate of things objectively known. The *I* which knows them cannot itself be an aggregate.” (পৃঃ ২১৪) । জ্ঞেয়-আমাকে ধণ্ড ধণ্ড করা বাইতে পারে ; কিন্তু জ্ঞাতা আমাকে ধণ্ড ধণ্ড করিয়া ভাবা চলে না । অপিচ, “For psychological purposes it (the *I*) need not be an unchanging metaphysical entity like the Soul, or a principle like the transcendental Ego, viewed as out of time.” (পৃঃ ২১২) । বেদান্তী বলেন,

তথ্য, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উহাই যথেষ্ট ; কিন্তু পারমাণবিক শাস্ত্রের পক্ষে উহাকে unchanging entity বলিতে চাহি না— কেন না, unchanging বলিলে কালব্যাপ্তি আসে ; তবে উহাকে out of time বলিতে পারি।

এখন বুঝা যাইবে, বেদান্ত কেন একমুখে পরমাত্মাকে নিত্য নির্বিকার বলেন, পরে আবার যেন সহসা সাবধান হইয়া বলেন, না, না, ব্রহ্ম তাহাও নহেন। যাহার নিকট অতীত ভবিষ্যৎ অর্থশূন্য, তাহাকে নিত্য বলাও চলে না। ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশে— অবশেষে, ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়াই নিরন্ত থাকিতে হয়।

আশা করি, এখন অবস্থাবাদের তাৎপর্য বুঝা গেল। আমি আমাকে জানি। যে জানে, সে নিরূপাধিক ব্রহ্ম। যাহাকে জানে, সে সোপাধিক জীব ; সে ক্ষুদ্র, চঞ্চল, বিকারশীল, জরামরণের অধীন। অথচ উভয়ই এক। যে জানে ও যাহাকে জানে, সে একই ব্যক্তি। যে নিরূপাধিক, সেই আবার সোপাধিক, এই সমস্তাপূরণের উপায় কি ? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন, ঐ উপাধি কল্পিত উপাধি। মায়াকল্পিত জগতের যখন পারমাণবিক অস্তিত্ব নাই, তখন সেই জগতের অধীনতা প্রকৃত অধীনতা নহে। ঐরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র। আবার কাল যখন একটা কল্পিত উপাধি, তখন জীবের যে কালব্যাপ্তি, যে পরিবর্তন, যে বিকার দেখা যায়, উহাও কল্পিত। কাজেই জীব বিকারশীল নহে, চঞ্চল নহে, ক্ষুদ্র নহে। বিকারশীল বোধ হয়, কিন্তু উহা বোধমাত্র।

উহা ব্রাহ্মি। এই ব্রাহ্মির নামান্তর অবিন্যা। ঐ বুদ্ধি জ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব। জ্ঞানাভাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল মনে করি, ও উহাকে দেশ কুড়িয়া কল্পিত জগতের অধীন এবং কাল কুড়িয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণশীল ভাবি। জ্ঞানোদয়ে জানিতে পারি, উহা তেমন নহে। কেন না, আমিই আমাকে জানি ; এখানে জ্ঞাতা আবারও যেমন কোন উপাধি নাই, জ্ঞেয়-আমারও তেমনি কোন বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না। কেন না, উভয় আমিই এক আমি। ইহা যে জানে, সে মুক্ত। যে জানে না, সে বদ্ধ।

মোট কথায় এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয় ? জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়। এই গোড়ার কথাটুকু মানা কঠিন। জড়বাদী ও বৈতবাদী এইখানে আসিতে পিছলিয়া পড়েন। এইটুকু পর্যন্ত আসিলে আর বাকি সব আপনি আসে। জগৎ কল্পনা, কিন্তু সেই কল্পনার ব্যবস্থা দেখি, শৃঙ্খলা দেখি। সেই ব্যবস্থার শৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কল্পনা করিতে চেতন সৃষ্টিকর্তা—Personal God—আবশ্যক। এইজন্য বার্কলি জীব হইতে স্বতন্ত্র চেতনস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। হিউম্ বলিয়াছেন, ঐ জাগতিক ব্যবস্থা কেন এমন, তাহা জিজ্ঞাসায় লাভ নাই। বৌদ্ধও সেই পথে গিয়াছেন। বেদান্ত বলেন, ওজস্ত স্বতন্ত্র চেতন ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্যক নহে। যে একমাত্র চেতন পরমার্থকে আমরা জানি, তাহাকেই জগৎকর্তৃষ দ্বিত

কোন বাধা নাই। সেই জগৎকর্তৃষের নাম মায়া। আত্মাতে মায়া আরোপ করিলে উহার জৈবরস জন্মে; উহা সৃষ্টিকর্ম হয়। তবে জগৎ যেমন অধ্যাস, সেই মায়াও তেমনি অধ্যাস। আবার যদি তর্ক উঠে, এই ক্ষুদ্র জীব, যে জগতের অধীন, সে জগতের কর্তা হইবে কিরূপে; তদুত্তরে বলা হয়, এই ক্ষুদ্র আত্মার আরোপের প্রয়োজন কি? আমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করি বটে, জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয়-আমাকে বিকারশীল মনে করি বটে, কিন্তু তাহা ভুল, তাহা অবিদ্যা। ক্ষুদ্র জগতের অধীনতার ফল; জগৎই যখন কর্তা, তখন সেই ক্ষুদ্রও কর্তানামাত্র, অবিদ্যামাত্র। বতকণ সেই ভুল থাকে, অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণই আমি বদ্ধ। যখন সেই ভুল যায়, তখনই আমি মুক্ত।

কাজেই এই মুক্তির উপায় জ্ঞান—এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি ঘটিবে—মরণকালের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। জীবন থাকিতেই মুক্তি ঘটিবে—জীবমুক্তিই মুক্তি।

সচরাচর বলা হয়, মুক্তির পর আর সুখ-দুঃখ থাকে না, মুক্তির পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই সকল বাক্যও সরল-ভাবে গ্রহণ করা উচিত। মুক্তির পর অর্থাৎ জীবমুক্তির পর সুখদুঃখ কেন থাকিবে না? সুখদুঃখ থাকিবে বৈ কি। বেদান্ত বলেন, প্রারম্ভ ও সঞ্চিত কর্মের ফল ভুগিতেই হইবে। মুক্ত হইলেও যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, আগুনে হাত পড়িবে, বাঘের সম্মুখে পড়িলে পলাইতে হইবে। বেদান্তের ভাব্য প্রারম্ভ ও সঞ্চিত কর্মের ফল ভুগিতেই হইবে; তবে সেই সকল আর আমাকে বাধিতে

পারিবে না; ফলভোগী হইয়াও আমি নির্গুণ থাকিব। সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে, সুখদুঃখের বোধ ঘটিবে; তবে জ্ঞানোদয়ের পর সেই সুখকে ও সেই দুঃখকে কেবল মিথ্যা-সুখ ও মিথ্যা-দুঃখ বলিয়া, কেবল স্বপ্নভূত সুখদুঃখের মত বলিয়া, জানিব। মুক্তির পূর্বে উহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, এখন উহা ব্যাবহারিক সত্যমাত্র বলিয়া জানিব।

আর জন্মান্তরপরিগ্রহ? মুক্তপুরুষকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না, এই বাক্যের মর্ম কি? যে মুক্ত, তার পক্ষে দেহটাই অধ্যাস; তার পক্ষে দেহধর্ম মরণঘটনাটাই অধ্যাস; তার পক্ষে মরণ একটা প্রত্যয়-মাত্র। মরণই যেখানে নাই, সেখানে আর জন্মান্তরপরিগ্রহ কি? তাহার পক্ষে ইহ-লোকই বা কি, আর পরলোকই বা কি? স্বর্গ, নরক, পরকাল, এমন কি, সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার নিকট অবিদ্যমান। জড়-জগৎই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত বোধ হয়। অবিদ্যাগ্ৰস্ত জীব আপ-নাকে কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখে, কিন্তু অবিদ্যামুক্ত জীব, যে বিষয়ী ব্রহ্মের সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন, সে স্বয়ং দেশকালনির-পেক্ষ। তাহার পক্ষে সমুখ-পশ্চাৎ নাই, তাহার পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ, উত্তর নদীই অর্থশূন্য।

মুক্তপুরুষ কর্ম করিবেন কি না, ইহার উত্তরও এখন সহজ হইবে। প্রারম্ভকর্ম ও সঞ্চিতকর্মের ফলভোগে সে যেমন বাধ্য, তেমনি সে তাহার ব্যাবহারিক ইহজীবনে হেরবর্জন ও উপাস্যের গ্রহণ করিতেও বাধ্য।

যখন বুধা পাইলে আহার করিতে হইবে, তখন গার্হস্থ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কথা গারে জড়াইয়া ধর্মকে ফাঁকি দিলে চলিবে না। ‘কুর্কমেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ’—কর্ম্ম করিয়াই শতবৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে—বদ্ধ ও মুক্ত, উভয়ের প্রতি বেদান্তের এই আদেশ। মুক্তের কামনা নাই, কেন না, তাঁহার নিকট পরকাল অর্থশূন্য। কাজেই মুক্তের কর্ম্ম নিকাম কর্ম্ম; উহা তাঁহাকে বাধিতে পারে না।

মুক্তির অর্থ বুঝা গেল ও মুক্তির উপায়ও বুঝা গেল। মুক্তির উপায় জ্ঞান—মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অল্প অর্থে প্রযুক্ত অল্পরূপ মুক্তির অল্প পন্থা থাকিতে পারে; কিন্তু বেদান্তে যে মুক্তির কথা বলে, সেই মুক্তির জন্ত কেবল জ্ঞানের পন্থা; ইহার জন্ত কণ্ম আবশ্যক নহে, ইহার জন্ত ভক্তি আবশ্যক নহে। তাহা বলিলে কর্ম্মের বা ভক্তির নিন্দা করা হয় না। কর্ম্মের পন্থার বা ভক্তির পন্থার অল্প স্থলে অল্প উদ্দেশ্যে সার্থকতা আছে; সেখানে জ্ঞানের পন্থা কিছুই নহে। মুক্তির জন্ত কিন্তু জ্ঞানের পন্থা। সেই জ্ঞান কোন mystic জ্ঞান নহে; উহার কোন esoteric অর্থ নাই। উহা নির্মল শুভ্র বিশুদ্ধ জ্ঞান—সেই জ্ঞানলাভের জন্ত নিত্যানিত্যবস্ত্তবিশেষ, ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ ও শমদমাদিসাধনা আবশ্যক; প্রবণমনাদি সেই জ্ঞানলাভে সাহায্য করে; প্রতিবাক্য ও গুরুবাক্য তাহাতে সাহায্য করে। ইহার অর্থ অতি সরল অর্থ—ইহার তিতর কোন বুদ্ধবিকি নাই।

বেদান্তের স্থল কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক।

(১) একমাত্র চেতনপদার্থ বর্ত্তমান—উহা আমি—উহার অস্তিত্ব জ্ঞানগম্য ও স্বতঃসিদ্ধ। উহা দেশকালনিরপেক্ষ নিগুণ নিরুপাধিক পদার্থ। কাজেই উহার স্বরূপ ভাষা দ্বারা অপ্রকাশ্য। ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ অভাববাচী বিশেষণে উহা বুঝাইতে হয়।

(২) এই আমি আমার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড দেশের কল্পনা করিয়া সেই দেশে কল্পিত জড়জগৎকে প্রক্ষেপ করি; কল্পিত-দেশমধ্যে তাহাকে ব্যবস্থা করিয়া সাজাই। এখানে সূর্য্য রাখি, ওখানে চন্দ্র রাখি, এখানে পৃথিবী রাখি ইত্যাদি; ও সেই সূর্য্যচন্দ্রপৃথিবীকে বাঁধা নিয়মে ঘুরাই।

পুনশ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত কালে আমার সৃষ্ট জগৎকে প্রক্ষেপ করি। তাহার কিয়দংশকে বলি অতীত, কতকটাকে বলি বর্ত্তমান, ও বাকিটাকে বলি ভবিষ্যৎ।

পুনশ্চ, এই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত জগৎকে একটা উদ্দেশ্যের অস্তিমুখে পরিচালনা করি।

(৩) এই দেশকালে সজ্জিত ব্যবস্থানুযায়ী ও উদ্দেশ্যানুসারী জগতের সৃষ্টির জন্ত আত্মাতে যে ক্ষমতা আরোপ করা হয়, উহার নাম দেওয়া হয় মায়া। কিন্তু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই সৃষ্টিক্ষমতাও সেখানে আরোপমাত্র বা অধ্যাসমাত্র। উক্ত-মায়া-আরোপে নিরুপাধিক আত্মা সোপাধিক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু সে-ও প্রত্যয়-

মাত্র। এই নোপাধিকরণে প্রতীত অর্থাৎ মারাত্মক আঘাত নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর—কেননা, ইনিই কল্পিত জগতের কল্পনাকারক, সৃষ্ট জগতের সৃষ্টিকর্তা। জগতের কল্পিত প্রকাণ্ড ও বৃহৎ দেখিয়া তাহার সৃষ্টিকর্তাভেদেও, অর্থাৎ ঈশ্বরেও, সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা প্রতীতি আরোপ করা হয়।

(৪) আর একটি অদ্ভুত কথা এই যে, আমি যেমন আমা হইতে পৃথক্ জড়জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বা ঈশ্বর মনে করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমিই আবার আমাকে আমা হইতে পৃথক্রণে দেখিতে পাই। উক্ত কল্পিত জড়জগৎ যেমন আমার জ্ঞানগম্য বিষয়, এই আমিও তেমনই আমার জ্ঞানগম্য বিষয়। অধিকন্তু, এই বিষয়-আমাকে আমি আমা হইতে পৃথক্ দেখিয়া তাহার সহিত সংকল্পিত জড়জগতের একটা সম্বন্ধ আরোপ করি। আমাকে সর্বাংশে সেই জগৎ হইতে কৃত্রিম, সেই জগতের বশতাপন্ন, সেই জগতের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য হেয়বর্জনে ও উপাদেয়গ্রহণে সর্বদা ব্যাকুল ও তদর্থ ক্রিয়ালীল, জড়জগতের আঘাতসহ ও সেই আঘাতে পরিবর্তনশীল, স্রষ্টাঃখভোগী, জরামরণশীল বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল। এই ভ্রান্তির নাম দেওয়া হয় 'অবিজ্ঞা';—বস্তুত জড়জগৎই মিথ্যা ও জড়জগতের সহিত আমার এই কল্পিত সম্বন্ধও মিথ্যা। আমি বিকারশীল বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইলেও এই জ্ঞানগম্য-আমি জ্ঞাতা আমি হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন। বিষয়-আমাকে যে বিষয়ি-

আমি হইতে পৃথক্ বোধ করি ও বিষয়-আমাকে কল্পিত জগতের অধীন মনে করি, তাহা ভুল, তাহা অবিজ্ঞা।

(৫) কাজেই যিনি আত্মা, অর্থাৎ যে অনির্কীচ্য চৈতন্ত্যস্বরূপ পদার্থকে 'আমি'নাম দেওয়া হয়, তিনিই একদিকে ঈশ্বর, অজ্ঞদিকে জীব। মায়ার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগৎকর্তা, জগতের প্রভু ঈশ্বর; আর অবিজ্ঞার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগতের অধীন, জগতের দাস জীব। কিন্তু স্বরূপত যে ঈশ্বর, সেই জীব।

(৬) এই তব জানিলেই মুক্তি ঘটে; অর্থাৎ জগৎকে কল্পনামাত্র বলিয়া বুঝা যায় ও জীবকে তাহার অনধীন বলিয়া বুঝা যায়। তখন স্রষ্টাঃখ, ইহ-পরকাল, জন্মমরণ, সংসার, সমস্তই প্রত্যয়মাত্র বলিয়া জানা যায়। তখনই পূর্ণ জাগরণ হয়; তাহার পূর্বে স্বপ্ন। কাজেই যে মুক্ত, সে বুদ্ধ।

(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই অবিজ্ঞার আরোপ করিয়া সেই জগতের দাসত্ব করি, তাহার উত্তর বোধ করি নাই। এখানে সকলেই নিরুত্তর। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব; বৈক্য বলেন, উহা আমার লীলা বা খেলা; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাস্য করিও না। পরমেশী প্রজাপতি ইহার উত্তরে ঋষিমুখে বলাইয়াছেন—

ইহং বিশ্বষ্টিতং আবদ্ধং
যদি বা নশে যদি বা ন।

যো অভ্যাস্যকঃ পরমবোমন্
সো অন্ন বেষ যদি বা ন বেষ ।

এই সৃষ্টি বাহ্য হইতে আবির্ভূত হই-
রাছে, তিনিই ইহা করিয়াছেন বা তিনি

ইহা করেন নাই ; যিনি পরমবোমন্ অব-
স্থান করিয়া ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই জাহ্ন
জানেন, অথবা তিনিও তাহা জানেন
না ।

শ্রীরামেশ্বরস্বন্দর ত্রিবেদী ।

দিন ও রাত্রি ।*



সূর্য্য অস্ত গিয়াছে । অন্ধকার অবধঃগতনের
অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু
অস্তহিত হইয়াছে । রাত্রিকাল আসন্ন ।

এই রাত্রিই মিলনের প্রকৃত সময়—
উৎসবের আনন্দ এখনই ঘনীভূত হইতে
থাকে ।

এই আনন্দরজনীর আরম্ভকালে আমা-
দের উৎসবদেবতাকে প্রণাম করিয়া মনকে
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি এই যে, দিন
এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে
একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে
তালে আঘাত করিয়া বাইতেছে—ইহারা
আমাদের চিন্তাবীণায় কি রাগিণী ধ্বনিত
করিয়া তুলিতেছে ? এইরূপে প্রতিদিন
আমাদের মধ্যে যে এক অপক্লপ ছন্দ রচিত
হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোন বৃহৎ অর্থ
নাই ? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়ি-
স্পন্দনের জ্বাৰ দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থান-
পতনের স্তম্ভিষাভের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি,
আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-

অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য্য
কি গ্রথিত হইয়া বাইতেছে না ? তটভূমির
উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন
বহিয়া বাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে
সে আবার জল হইতে জাগিয়া-উঠিয়া শস্ত-
বপনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও
শরতের গতান্বাত তটভূমির স্তরে স্তরে কি
নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না ?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ,
রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যাস, ইহার
পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাত্যাস-
বশত যেন বঞ্চিত না হই ! সূর্য্য একসময়ে
হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি
বন্ধ করিয়া-দিয়া চলিয়া যায়—রাত্রি নিঃশব্দ-
করে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায়
বিধলোকের সহস্র অনিমেঘ-নেত্রের সম্মুখে
উদঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে
সামান্য ব্যাপার নহে ।

এই অন্ধকালের পরিবর্তন কি বিপুল, কি
আশ্চর্য্য ! কি অনায়াসে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই

* গত ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্তৃক পঠিত ।

বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পরদর্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোন বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো ভীত আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্তের আরম্ভের মধ্যে কি দ্বিধা শান্তি, কি সৌম্য সৌন্দর্য্য।

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড় হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টায় সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জরী করিবার চেষ্টায় নিহত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্মোদযোগের আকর্ষণই জগতের আর-সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন-সমন নীলাবরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করম্পর্শ করিবারাজ আমাদের পরস্পরের বাহুপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অজ্ঞাত করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদের আদ্যিককে বাহা দেয়, রাত্রি

ভক্তমাজ যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অতাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিব্য জিনিষ আছে এবং বাহা দেয়, তাহা বহুমূল্য। সে যে কেবল স্থিতির দ্বারা আমাদের কতিপয় পূরণ করে,—আমাদের ক্রান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাজ, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত বাহাদিগকে ভালবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারে। জগতে আমাদের বর্ষার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম;—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ব্রহ্ম।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভূত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ। বন্ধুদের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিব্যস্থানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন

শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইঞ্জিয়বোধ, সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়— আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক ঘর, আমরা আর পাই; এবং ঘর বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিব্যক্ত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে ধ্বংস করে বলিয়াই প্রেম এবং শাস্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোক-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্ক-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অধিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের ঘর উদ্ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদের গকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদের গকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইরূপ রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়।

এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাড়কে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোকনির্বাণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উন্মোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্রান্তি স্থিতিস্থায় মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে, যে নিত্যক মহাকারগর্ভ হইতে একএকটি উজ্জল দিবস নীলসমুদ্র হইতে একএকটি কেনিল তরঙ্গের ছায়া একবার আকাশে উথিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকাত্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদের গকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদের গকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অধঃ নীলাঞ্জল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সম্ভান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখেনা-শোনেনা, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অহুভব করে—সেই অহুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—তবু অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শাস্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শযাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বকের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া

করুণ করি। তখন নিজের অভাব, নিজের বক্তি, নিজের কাজ বাড়িয়া-উঠিয়া অনশ্বরের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেব না, অত্যাশ্রিত্তেবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক্-পৃথক্ করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দ-তার মধ্য দিয়া নিখিলের নিখাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্য-জ্ঞাত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিরের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃত-নিপুণ অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকন্দের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যমুখের ভিখারী হইয়া দাঁড়াই—বলি, জননি, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কষ্টের শক্তি, পথের পাথর প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কন্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ কর, মার্জনা কর, গ্রহণ কর! তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-রান করিয়া ত্রিভুজপংখিধন কাল উজ্জলবেশে নির্মল-ললাটে প্রভাত-আলোকে দগ্ধরমান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার মানি মাঝে, আমার ক্রান্তি দূর হয়—তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সবদলের কল্যাণ হউক কল্যাণ হউক, যেন

বলিতে পারি—সকলের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি,—তাঁহার বাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে বাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদের কক্ষশালায় প্রেরণ করিয়া ছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদের কাছে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন! প্রাতঃকালে তিনি আমাদের ভাব দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভাব লইতেছেন। প্রত্যাহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদের কাছে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদের কাছে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অধিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতি-দিন চিত্রিত হইতেছে।

আমাদের কাব্যো-গানে আত্মবিস্ময়বাসনের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা কেবল অবগানেরই দিকটা দেখিয়া বিবাদের নিখাস ফেলি—পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যাহ দিব্যবাসনে এত-বড় যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়কণা উদ্বাহিত হইতেছে,

তাহাতে ত কিছুই বিশিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া ত হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশাস পড়িতেছে ।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে । দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজল্যমান করিয়া তুলে—আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেটন রচনা করে,—সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড় যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না । দিনের বেলাতেও ত আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই ? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে দ্বিগুণভর অন্ধকারময় করিয়া রাখে । তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেটন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্দয় বিচিত্ররহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই ? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকটে অগোচর রাখিয়া দেয় ।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখ-

হঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন-সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য্য অন্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদেরিগকে অন্ধলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয় । তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলি অভাব, কেবলি শূন্যতা ? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই ? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না ? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবদ্ধ জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না ? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকালে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না ? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া,—পৃথক্ করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই । আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তরতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তি-

গন্ত সৌম্যর মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে ।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অমুরূপ । ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ—কর্ম-শালা হইতে মাতৃকোড়ে আত্মসমর্পণ—পরম্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মসম-ভূতি ।

শক্তি আপনাকে ঘেঁষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে । শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার । প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে,—লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে । বিশ্বের সমস্ত ভাঙার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে । তাই আমরা কিছুই জানি না—কোথা হইতে এই নিঃশেষ-বিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্কারণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত বীশক্তি চিন্তে চিন্তে জাগ্রত হইতেছে । আমরা জানি না—এই পুরাতন জগতের ক্লাস্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-কর-স্পর্শে মুছিয়া-গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে, জানি না—কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে । জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে,—সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া

যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ ! সৃষ্টির মধ্যে এই প্রেমই শুভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত—আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতি-মুহূর্ত্তে বলপ্রেরণ, প্রতি-মুহূর্ত্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে ।

হে মহাতিমিরাবগুষ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ভায় শাবকদিগকে সুকোমল মেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে, নিগূঢ়ভাবে অমুভব করিতে চাহি । তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লাস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করিয়া দিচ্—আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকার-গুণকে ধ্বংস করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান্ করুক ।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সৃষ্টির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণ-চ্ছায়ার লুপ্তিত হইলাম । আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব ; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিন্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব ; কোনো চেষ্টা করিব

না, কেবল তোমার ইচ্ছার আমার ইচ্ছাকে
বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না,
কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার
প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে—

“আনন্দাচ্ছোব খমিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ।”

ঐ দেখিতেছি, তোমার মহাকরকার রূপের
মধ্যে বিশ্বভূবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল
বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হই-
য়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোট ছোট
চাকল্য, আমাদের নিজরূপে তুচ্ছ আন্দোলন
আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎ রূপে দেখা
দেয়।—কিন্তু আকাশের ঐ যে নক্ষত্রসকল,
যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই
করিতে পারি না, যাহাদের উজ্জ্বলিত
আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্প-
নাকে পরাস্ত করিয়া দেয়,—তোমার মধ্যে
তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন ত কিছুই
নহে, তোমার অকরকার বসনাঞ্চলতলে,
তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা
স্তম্ভপাননিরত সুপ্তিশিশুর মত নিশ্চল, নিস্তব্ধ।
তোমার বিরূপিতা ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও
স্থির, তাহাদের হৃৎসহ তীব্রতেজ মাধুর্যরূপে
প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাজ্যে আমার
তুচ্ছ চাকল্যের আশ্চর্য, আমার ক্ষণিক
তেজের আভিমান, আমার ক্ষুদ্র হৃৎকের
আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না,—তোমার
মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত
আবৃত্ত করিলাম, সমস্ত শাস্ত করিলাম, তুমি
আমাকে গ্রহণ কর—আমাকে রক্ষা কর,—

“বস্তে দক্ষিণঃ মুখং তেন মাং পাহি দিত্যম্ ।”

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা
করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে
জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত
হইতে চাই; আমি সুখহৃৎকে অবজ্ঞা
করিতে চাহি না, সুখহৃৎকে তোমার মঙ্গল-
হস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে
চাই। মৃত্যু বধন আমার কর্মশালার দ্বারে
দাঁড়াইয়া নীরবসঙ্কেতে আহ্বান করিবে,
তখন যেন তাহার অহুসরণ করিয়া, জননি,
তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্ক-
হৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই,—শ্রীতি
লইয়া যাই,—কল্যাণ লইয়া যাই,—বিরোধের
সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যান্নানে জুড়াইয়া
যায়, সমস্ত বাসনার পক্ষ যেন ধোঁত হয়,
সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে
যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি !
যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল
নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ব-
বিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া
যেন দিন হইতে রাত্রি, জীবন হইতে মৃত্যুতে,
আমার অক্ষমতা হইতে তোমার করুণার
মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিতে
পারি ! ইহা যেন মনে রাখি—জীবনকে
তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও
তুমিই আমার প্রিয় করিবে,—তোমার
দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ
করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে
ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে,—তোমার
আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার
অকরকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

নারী ।



(১)

উষার কিরণপাতে হেরি তোমা' পেলব কলিক।
কুসুমিত কিশোরী বালিকা।
স্নিতবিকসিত মুখে জাগাইয়া রাখ অমুখন
প্রিয় তব পিতার ভবন
নদীকূলে সন্ধ্যাকালে শিবপূজারতা কুতূহলা
হে কুমারি কুমুমকুন্তলা ।

(২)

পূর্বাঙ্কে নেহারি তোমা' নব-পটাস্বর-পরিহিতা
মুগ্ধমুখী অগ্নি বিলজ্জিতা
নবীন প্রণয়ডোরে বদ্ধ কর তব প্রাণপতি
নববধূ অগ্নি তুমি সতি ।
জননীর বক্ষ হ'তে ছিঁড়ি তারে লহে গো দুর্কার
কমনীয় হু'বাহ তোমার ।

(৩)

মধ্যাহ্নে নেহারি তোমা' মৃতিমতী জননীর বেশে
গৃহাঙ্গনে দাঁড়াইলে হেসে
ঘেটুকু আপন প্রেমে হরেছিলে লক্ষগুণ তার
হাস্তমুখে দাও অনিবার
শাস্তি আর মেহরূপে করে পড় শতধা হইয়া
নিজ হৃৎকল্লপ পাশরিয়া ।

(৪)

প্রদোষে নিরখি তোমা' শুভ্রবেশা তাপসী গম্ভীরী
ধ্যানপরায়ণা অগ্নি ধীরী
জগতের বহু উর্কে নিত্য তুমি রহ আনন্দিতা
অগ্নি পূণ্যকুমুমভূষিতা
কল্যাণ করুণহস্তে নিত্য তুমি কর বরবণ
আশীর্বাদে নবীন জীবন ।

(৫)

হে কুমারি তব স্নিগ্ধ বিকশিত হাসিত বদন
হবে মম নয়ননন্দন

হে ক্রিশোরি তব প্রেম তুচ্ছ করি বিশ্ব চরাচর
হবে কি গো আমার নির্ভর
হে জননি ! তব স্নেহ আলোকিত করিয়া জ্বলন
বহি' লবে আমার জীবন
তাপসিনি ! দিবসান্তে শ্রান্ত শির চরণে তোমার
সঁপি' দিব কল্যাণি আমার ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

উৎখান ।—শ্রী—কাব্যানন্দ প্রণীত । মূল্য
১০ তিন আনা ।

এখানি একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক ।
আমাদের দীনতা-হীনতা, দুঃখ-দারিদ্র্যের
কথা বোধ হইতেছে কাব্যানন্দমহাশয়ের
বুকে বড় বাজিয়াছে । তাহি তিনি তাঁহার
মর্গপীড়ামূলক এই ছন্দোবদ্ধ দরখাস্ত অভি-
যেকোৎসব উপলক্ষে সম্রাটের দরবারে পেশ
করিয়াছেন । ভরসার স্থল এই যে, দরখাস্ত-
খানি ঠিকানায় পৌছিতে না ।

মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে—“শিশু পুত্র,
কতক অভিমান, কতক রোষ, চোখের কোণে
কতখানি অশ্রু, কতখানি রোষরাগ লইয়া
যে ভাবে পিতার নিকট আন্ধার জানাঘ,
'উৎখান' বা 'Appeal to the Emperor'
সেই ভাবের মূল লইয়া সৃষ্ট । পুত্রের সে
অভিমান, সে রোষ, পিতার কৃষ্টির কারণ
না হইয়া কৃষ্টির কারণই হয়, এবং পিতা
পুত্রের আন্ধারে বা আপীলে তাহার অভাব
পূর্ণ করিয়া থাকেন ; উৎখানের আপীলও

সেই মূলের উপর স্থাপিত ।” বেশ কথা ;
কিন্তু খেড়ে ছেলে যদি নিজের অভাব নিজে
পূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল পিতার
কাছে বা আর কাহারও কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান
করে, তাহা অসহনীয় । তদ্ব্যতীত, এক্ষেত্রে
আন্ধার পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই ।
সম্রাট ইচ্ছা করিলেও আমাদের অভাব
মোচন করিতে পারেন না ; তাহা তাঁহার
সাধ্যাতীত । সে ভারটা আমাদের নিজে
লইতে হইবে । তাহা যেদিন পারিব, সে-
দিন বিশ্ববিধাতাও আমাদের প্রতি মুখ
তুলিয়া চাহিবেন । যতদিন না পারিব,
ততদিন—যাহার প্রবৃত্তি হয়, সে কাব্যানন্দ-
মহাশয়ের হ্রায় অরণ্যে রোদন করিবার স্লথ
উপভোগ করিতে পারে ।

পুস্তকখানির গুণাগুণসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,
স্বথের ভারত-বিলাপ বা ভারতভিক্ষা সচরাচর
যেমন হইয়া থাকে, ইহাও তাহাই—বিশেষতঃ
কিছু দেখিলাম না । ইহার মধ্যে ‘উপক্রম’-
শীর্ষক কবিতাটির প্রশংসা করা যায় ।

স্নেহময়ী ।—শ্রীস্বরেজনাথ গোস্বামী
বি. এ ; এল্. এম্. এল্. প্রণীত । মূল্য ১
এক টাকা ।

এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বুঝি-
য়াছি যে, গ্রন্থকার একজন সহৃদয় ব্যক্তি ।
সংসারের রোগ-শোক, হঃখ-দারিদ্র্য, অনাচার-
অত্যাচার দেখিয়া গ্রন্থকার ব্যথিত । এই
সকলের প্রতিবিধান বা প্রশমনকল্পে একটি
'সেবকের দল' কল্পনা করিয়া তিনি এই
উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন । গ্রন্থকারের
উদ্দেশ্য যে প্রশংসনীয়, ইহা সকলকেই স্বীকার
করিতে হইবে ; তবে, উপন্যাসের দ্বারা যে
একরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন উপায় হয়, এমন
আমাদের মনে হয় না ।

উপন্যাসখানির একটু বিশেষত্ব আছে ।
উপন্যাসের নায়িকার রূপের মহিমাকীর্তন
শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে ।
এখন কিছুদিন রূপের মাহাত্ম্যকে অব্যাহতি
দিয়া আমাদের উপন্যাসলেখকেরা গুণের
গৌরব কীর্ত্তি করিয়া তৎপ্রতি লোকচিত্ত-
আকর্ষণের চেষ্টা করিলে ভাল হয়—সমা-
জেরও মঙ্গল হয়, আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া
বাঁচি । বর্তমান স্থলে, আর্থর্ হেল্পসের
'রিয়ালমা' নামক উপন্যাসের অনুকরণে,
গ্রন্থকার স্বরেজনাথবাবু এই উপন্যাসের নায়ি-
কাকে কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপা, কিন্তু সর্বগুণালঙ্কতা
করিয়া গড়িয়াছেন । গুণবতী, আর্ন্তসেবা-
পরায়ণা, মাতৃভাষাহু প্রাণিতা হইতে হইলেই
যে কুরূপা হইতে হইবে, এমন কোন কথা
নাই ; তবে, সম্ভবত স্বরেজনাথবাবু নূতন পথ
ধরিয়াছেন বলিয়াই খানিকটা আড়ম্বর-

বাহ্য্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়া-
ছেন ।

এই উপন্যাসে ঘটনার কল্পনার ও অব-
তারণায় শিল্পনৈপুণ্যের অভাব পরিলক্ষিত
হয় । উৎকৃষ্ট উপন্যাসে যে সকল গুরুতর
ঘটনা ঘটে, তাহার দৃঢ় বশেষ্ট আয়োজন
উপন্যাসের মধ্যেই সন্নিবেশিত থাকে । এই
পুস্তকে তাহার অভাব দেখা যায় । দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ শরচ্চন্দ্রের গোপন-বিবাহ ও বিধুভূষণের
আত্মহত্যার চেষ্টার উল্লেখ করা বাইতে
পারে । পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়-
গ্রাহী । গ্রন্থকারের বর্ণনাশক্তিও প্রশংসনীয় ;
এই পুস্তকের দশম পরিচ্ছেদ তাহার পরিচয়-
স্থল । উচ্চ অঙ্কের উপন্যাস না হইলেও
লোককে ইহা পড়িতে অনুরোধ করিতে
পারি । সচরাচর বাঙলা উপন্যাসের অনেক
উর্দ্ধে ইহার স্থাননির্দেশ করা বাইতে পারে ।

হত্যাকারী কে? — উপন্যাস । শ্রীপাঁচ-
কড়ি দে প্রণীত । মূল্য ১০/০ দশ আনা মাত্র ।

এখানি একখানি ডিটেক্টিভের গল্প, এবং
সে হিসাবে, ইহাতে বিবৃত ঘটনার সমাবেশে
এবং অনুসন্ধানের প্রণালীতে কারিকরির
পরিচয় পাওয়া যায় । অক্ষয়বাবু যে একজন
অদক্ষ ডিটেক্টিভ, ইহা গ্রন্থকার দেখাইতে
সমর্থ হইয়াছেন । তবে, গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা
করি, একরূপ পুস্তকে কাব্যরসাবতারণার চেষ্টা
কেন ? বিশেষত ফাঁসীর আসামী যোগেশ-
চন্দ্রের মুখে তাহা বড়ই অসঙ্গত । পুস্তকখানির
কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ভাষাও প্রশংসাহী ।
শুনিলাম, মূল্য যদিও দশ আনা লেখা আছে,
কিন্তু পাঁচ আনা করিয়াই ইহা বিক্রীত হয় ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

ধর্মপ্রচার ।*



‘এস আমরা ফললাভ করি’ বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনি পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সহুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না—বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে নিয়মের অন্তর্থা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যাদ অল্প উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে, গৃহ-সজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে—কিন্তু তাহা আমাদের যথাথ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অল্পপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা মনে করি, দল বাধিলেই বৃক্ষ ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি, দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অহুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব চেয়ে

প্রধান—কি করিব, কে করিবে, সেটা বড় একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

পূর্বে যে বৃক্ষের উপমা দিয়াছি, সেটা পুনরায় উত্থাপন করিব। বৃক্ষ প্রকৃতির নিয়মে বীজ হইতে বাড়িয়া-উঠিয়া পরিণতিলাভ করে। সে ত একস্থানে শুক্ক হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সেই পরিণতিলাভের মধ্যেই, সেই শুক্কতার মধ্যেই একটা প্রচারের নিয়ম আছে। সেই নিয়মে ক্রমশ সেই বৃক্ষ হইতে সুবিপুল অরণ্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। গাছ হইয়া উঠাই যদি তাহার সর্বপ্রধান কাজ না হইত, তবে আপনাকে প্রচার তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। যৈ শান্তি, যে শুক্কতার মধ্যে থাকিলে পরিপূর্ণ রসাকর্ষণের ব্যাঘাত হয় না—বৃক্ষের সেই শান্তি, সেই শুক্কতা ভাবী অরণ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। উৎসাহের উদ্দাম

চাঞ্চল্য তাহার পক্ষে সফলতার কারণ নহে। তাহাকে গভীরভাবে শিকড় নামাইতে হইবে, তাহাকে বিস্তীর্ণভাবে ডালপালা মেলিতে হইবে, তাহাকে ধীরভাবে সমস্ত পল্লব দিয়া সূর্য্যালোক গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হইলে তাহার পরে যাহা ফল ফলিবার, তাহা ফলিবে।

কিন্তু বর্তমানকালে আমাদের ধর্মচর্চার গভীরতা যে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, আমাদের ধর্মসমাজের চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ‘এস আমরা সভা করি, এস আমরা প্রচার করিতে বাহির হই,’ এই বলিয়া আমরা পরস্পরকে উত্তেজিত করি এবং প্রভূতপরিমাণ অপরিণত শক্তির অপব্যয় করিয়া থাকি।

শুদ্ধমাত্র নিষ্ফলতাই যদি ইহার পরিণাম হইত, তবে ইহাকে আমি তত অধিক ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতাম না। কৃষিকার্য্য যে কিছুই জানে না, সে যদি উৎসাহসহকারে বীজবপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে কেবল ফসল না জন্মিয়াই অনিষ্ট করে, তাহা নহে, বীজও নষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক সত্যকে যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা জীবনের মধ্যে লাভ না করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি এই সত্য-প্রচারের ভার লইলে কেবল যে প্রচার-কার্য্য ব্যর্থ হয়, তাহা নহে, সত্য গ্লান হয়, সত্য অসত্য হইয়া উঠে।

হুভার্গ্যক্রমে ধর্মপ্রচারের অধিকার-সম্বন্ধে আমরা বড় অধিক চিন্তাই করি না। ধর্মের পুরাতন কথাগুলিকে ধেমন-তেমন করিয়া পুনঃপুন আবৃত্তি করিয়া বাইবার জন্ত ইচ্ছা, অবকাশ এবং কাঁপটুতা থাকিলে

আর বেশি-কিছুর প্রয়োজন হয় না, এই-রূপ আমাদের ধারণা। সকল কষ্টের অপেক্ষা ধর্মপ্রচারের ব্যবসায়ে যোগ্যতার প্রয়োজন অল্প আছে, আমাদের ব্যবহারে এইরূপ প্রমাণ হয়। মনে করি, উৎসাহ এবং অহমিকাই প্রচারকের পক্ষে যথেষ্ট সম্বল। মনে করি, প্রচারের অভাবেই দেশে ধর্মের অবনতি হইতেছে সাধনা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে নহে।

মহুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং ‘ঈশ্বর আছেন’ এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে—তাহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন। একদিন সরস্বতীনদীতীরে তপোবনচ্ছায়ায় ভারতের ঋষি উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—

“শৃণুস্ত বিবে অমৃতস্ত পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তত্বঃ—
বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণঃ জমদগ্নঃ পরশ্রাম।
তমেব বদিত্বাতিশ্রুত্বামেতি নানাঃ পশ্বা বিদ্যাতে অরনায়”

হে দিব্যধামবাসি অমৃতের পুত্রগণ, সকলে শোন—আমি সেই জ্যোতিষ্ময় তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি—তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মুক্তির অস্ত্র কোনো পথ নাই।

ইহা নূতন সত্যের কথা নহে, ইহা নূতন উপলব্ধির কথা। ঋষির এই উপলব্ধির উচ্ছ্বাসই আমাদের পক্ষে স্পর্শ করে, সচেতন

করে, আমাদের বোধশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলে। পুরাতন মহাসত্য এইরূপ নব নব উপলব্ধির দ্বারাতেই মনুষ্যের মধ্যে সজীব হইয়া, নূতন হইয়া বিরাজ করে।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না—সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুল-গুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারে যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; গাঁহাদের অভ্যদয় বসন্তের ছায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণ-সমীরণ মহাসমুদ্রবল্ক হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ণ করিয়া তোলেন—অতি পরিচিতকে নিজজীবনের নব নব বর্ণে, গন্ধে, রূপে সজীব, সরস, প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্গদিগন্ত হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

অতএব নূতন আবিষ্কার মানুষের কাছে নত গৌরবের, পুরাতনকে উপলব্ধি মানুষের কাছে তদপেক্ষা অল্প গৌরবের নহে। মনুষ্য-সমাজে কাব্যের সমাদর তাহার প্রমাণ। যাহা-কিছু মানুষের চিরকালের সামগ্রী, কাব্য তাহাকেই মানুষের উপলব্ধির কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখে। এই যে হর্গোদয়-সূর্যাস্ত, এই যে নিশীথনক্ষত্র-সভার নিস্তক্কতা, এই যে ঋতুপর্যায়ের প্রাণ-ময় সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্য, এই যে জন্মমৃত্যুর নিশেদ গীতায়াত, স্বপ্নছঃথের অনন্ত আবর্তন, প্রবৃত্তির তরঙ্গলীলা, স্নেহপ্রেমের অবসানহীন সংখ্যাবিহীন সংসারব্যাপী আকর্ষণপাশ,

ইহাদের দ্বারা আমরা নিরন্তর বেষ্টিত হইয়া আছি—অথচ নিয়ত অভ্যাসে ইহাদের অপরিমেয় রহস্য, ইহাদের অপরিমীম বিন্ময়করতা আমাদের স্পর্শ করে না। সংসারে মাঝে মাঝে এমন লোক জন্মে, অভ্যাস যাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, নিখিল বিশ্বের রসসমুদ্র তাহার প্রত্যেক তরঙ্গের দ্বারা বাহার চিন্তকে অব্যবহিতভাবে আহত করে, জাগ্রত করে, ধ্বনিত করিয়া তোলে; সেই কবির অমৃতভূতির তিতর দিয়াই, আমরা যে বিশ্বের মধ্যে আছি, সেই বিশ্বকে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করি; যাহা চিরদিনের স্নলভতম সামগ্রী, তাহা যে কি পরম পদার্থ, তাহা জানিতে পারি; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহাকে প্রতিদিন পাইয়া প্রতিদিনই হারাইয়াছি, সেই মহাশ্রী নিখিলের রসস্পর্শ আমাদের বোধগম্য হয়।

কিন্তু বাহার স্বভাবত এই নূতন-অমৃতভূতির ক্ষমতা নাই, সে যদি কেবলমাত্র হিত-কামনায় অথবা যশঃপ্রার্থী হইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে সে অনিষ্ট করে। চির-পুরাতন তাহার হাতে চিরনবীন না হইয়া জীর্ণতর হইয়া উঠে। কবির হস্তে যে ভাষা ভাবের যৌবনসঞ্চার করে, অকবির হস্তে সেইগুলিই ভাবকে জরাজীর্ণ করিয়া তুলে। সেই শব্দবিশ্বাস পাঠকদের অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং সেই অভ্যস্ত প্রাণহীন শব্দের বেষ্টিনে ভাবের সজীবতা থাকে না।

ধর্মপ্রচারসম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে খাটে। আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র

অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে সকল কথা অভ্যস্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাবাবিভ্রাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার স্থায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি—কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপে ধর্ম যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা বাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

এইরূপে অবোধ্যতার হস্তে ধর্ম যখন অসত্য হইয়া উঠে, তখন নানা ছদ্মমুখ দেখা দিতে থাকে। তখন সাম্প্রদায়িক ধর্ম শান্তির পরিবর্তে বিরোধ, রসের পরিবর্তে তর্ক, বিনয়ের পরিবর্তে দাস্তিকতা আনিয়া উপ-

স্থিত করে। তখন সঙ্কীর্ণতা এমনি বেটন করিয়া ধরে যে, ঔদার্য্যকে ধর্মবিরোধী বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণেই ইতিহাস দেখিলে দেখা যায়, ধর্মের নামে সংসারে যত অশান্তি, যত অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন স্বার্থের নামেও হয় নাই। এবং আজও প্রতিদিন দেখিতে পাই, সভ্যনামধারী বড় বড় জাতি নিদারুণ স্বার্থসংগ্রামে ধর্মকে আপনার দলভুক্ত ও ঈশ্বরকে আপনার পক্ষপাতী বলিয়া ঘোষণা করিতে লেশমাত্র সন্দেহ অনুভব করে না।

ধর্মকে বাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে তেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গভী আঁকিয়া একটা বিশেষ লামানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হলু-মুল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না,—ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গভী রক্ষা করিবার জন্ত সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গভীর রক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে তত্ত্ব তাহাদের গভীর সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না; যদি করে, তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃত্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিলোলকে তাহারা

শরুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে—পাছে ধর্মদীমানার মধ্যে মাহুধ আপন হাত, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়—বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশঃ সু-পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত রক্ষের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অল্প সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্বেষ-ভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যের নাকথান গৃহাবচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র বাহ্য সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ত্রৈক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্ত আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র বাহ্য মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্য তাহার অন্ত-স্থিত—তাহাই যথাযথভাবে মনুষ্যের ছোট-বড়, অন্তর-বাহ্যের সন্ধাংশের পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্য সত্য হইতে স্বাধীন হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গিজ্জার গাওর মধ্যে নিক্ষেপিত করিয়া-দিয়া অল্প যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শদ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সকলশীল অমঙ্গলের

সৃষ্টি হইতে থাকে। আপাতত ধর্মের প্রয়োজন নাই, আপাতত সত্য অব্যবহার্য্য, কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া যথাসময়ে ধর্মকে স্বীকার করিলেই চলিবে, একথা যদি আমরা স্পষ্ট না-ও বলি, প্রতিদিন কণ্ঠের দ্বারা বলিয়া থাকি। ইহার কারণ, ধর্মকে আমরা আংশিক করিয়া, খণ্ডিত করিয়া, সুদূর করিয়া, সম্প্রদায়গত, মতগত, বিশেষ-অনুষ্ঠান-গত কারয়া রাখি—তাহাকে পূজার বিষয় বলিয়া জানি, ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। সংসারে যেমন একএকটি প্রযুক্তি চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত একএকটি ভোগ্য-বিষয় আছে, ধর্মকে সেইরূপ ভক্তিবৃত্তির বিলাসপরিভূষিত উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগ্যোজন বলিয়াই জানি। সেই সময়টা বক্তৃতা, সঙ্গীত, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির দ্বারা একটা ভাবাবেগ উৎপাদন করিয়া ধর্মসাধন করিলাম বলিয়া একটা আশ্রম অনুভব করি এবং পরক্ষণেই সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষণিক সংঘম, সেই ভক্তিবৃত্তির ক্ষণিক উত্ত-মের শাসনপাশ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া সর্বপ্রকার শৈথিল্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকি।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন্স নহে, তাহা মনুষ্যের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, বুদ্ধ হইতে বাহিন্য, ব্যবসায় হইতে নিক্ষেপিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মনুষ্যের আশ্রম-আমোদ হইতে, কাব্যকলা হইতে, জ্ঞানাবজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার

জন্ত সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্ম্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্ত নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম্মসাধনের জন্ত। এইরূপে ধর্ম্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অথও তাৎপর্য্য দান করিয়াছিল। সেইজন্ত ভারতবর্ষে, যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অমুপযোগী ছিল—ধর্ম্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অমু সফলতা দ্বারা ধর্ম্মের বিচার চলিত না।

এইজন্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলভের দ্বারা মহুবাঙ্কলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থ-তনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলভ, রাজকর্ম্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম্ম, সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা, তখন ব্রহ্মচর্য্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু অধুনা ব্রহ্মলভকেই আমরা জীবনের একমাত্র সম্পূর্ণতা ও লক্ষ্য বলিয়া যখন জ্ঞান করি না—যখন আমরা ধনমানের অর্জনকে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরকে, ভোগ-স্বথের চরিতার্থতাকেই সকলের উচ্ছেদ রাখিয়াছি, এমন কি দেশহিত-লোকহিতকে যখন আমরা দেশের অনুবর্তনস্বরূপে অন্ধভাবে পালন করিয়া বাই—ব্রহ্মের সহিত

যুক্ত করিয়া তাহার নিত্যসত্যতা দেখি না, তাহার বিশুদ্ধিরক্ষা করি না, তাহাকে সঙ্গীর্ণ করিয়া নষ্ট করি—কুদ্রের অমুরোধে বৃহৎকে, উপস্থিতের অমুরোধে চিরন্তনকে, স্বাদেশিকতার অমুরোধে মহুবাঙ্ককে, প্রয়োজনের অমুরোধে কল্যাণকে বিসর্জন দিই, তখন স্বভাবতই ব্রহ্মচর্য্যের স্থান ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করে, তখন সমস্ত জীবনের সাধনার পরিবর্তে দলবদ্ধ সাপ্তাহিক উপাসনাই প্রধান হইয়া উঠে এবং তখন ব্রহ্মসাধনার মূল্য এতই কমিয়া যায় যে, যে ইচ্ছা বেদীতে আরোহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা বলিয়া গেলে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না। “অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে”—যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাকেই যদি পরা বিদ্যা বলিয়া জানিতাম, প্রতিদিনের কর্ম্মে সেই অক্ষর পুরুষকে সমস্ত জীবনের মধ্যে লাভ করাই যদি একমাত্র লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতাম—যদি আমাদের প্রার্থনা সত্য হইত, আমাদের লক্ষ্য ঐব হইত, তবে নিজে নিজে ব্রাহ্মনাম ধরিয়া, ব্রহ্মনামের ধ্বজা তুলিয়া সঙ্গীতন করিয়া, প্রচারকণ্ঠে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া অমু সকল সমাজের চেয়ে আপুনাগিকে বড় মনে করিয়া আনন্দিত থাকিতাম না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায়, সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। যুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে, তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই যুরোপ দেশজয় করে, ঐশ্বর্য্য-লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবা-

কার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিক্কাম হইয়াছে। এই জন্ত যুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পার্লিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ্যাদিক্রির জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সকলেই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন যুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সজুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অধিকৃত ছিল—এবং যে ঋষিরা লক্কাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

“বেদাহমেতঃ পুরুষঃ মহাত্মঃ।

• মাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরমাত্মঃ।

যাহারা বলিয়াছিলেন—

“আনন্দঃ ব্রহ্মণো বিধানু ন বিভেতি কুতশ্চন”

তাহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ব্রহ্ম বলিতে আমাদের পিতামহরা যতখানি বুঝিয়াছিলেন, আমরা যদি ততখানি না বুঝি, ব্রহ্মসাধনাকে ঠাহারা যতদূর ব্যাপক করিয়া দেখিয়াছিলেন, আমরা যদি ততদূর দেখিতে প্রস্তুত না থাকি, তবে একদিন ধরিয়া প্রচুর আড়ম্বরে আমরা এক

নিষ্ফলতার চর্চা করিয়া আসিতেছি! তবে ঠাহাদের উচ্চারিত পবিত্র মন্ত্রগুলি লইয়া আমরা একি বালালীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছি! একি বিক্রম! একি ব্যঙ্গ! আমাদের দেশের দ্বিজদিগের উপনয়নক্রীড়া, আমাদের দেশের আধুনিক লোকাচার ও গার্হস্থ্যধর্ম, ইহাই কি আমাদের পৈতৃকধর্মের বিকৃত-অনুকরণ-মূলক যথেষ্ট বিকল্পতা নহে—আবার ব্রাহ্মসমাজও কি প্রাচীননামের সহিত আধুনিক অসঙ্গতি যোগ করিয়া আর-এক নূতন প্রহসনের অবতারণা করিবেন?

ধর্মকে যে আমরা সৌখিনের ধর্ম, ব্রহ্মকে যে আমরা সৌখিনের ব্রহ্ম করিয়া তুলিব;—আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের একপার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না;—আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকুপরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে ঠাহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকুপরিমাণ ধর্মের ব্যবহা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আস্বাবের সঙ্গে ভারতের স্তম্ভহং ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কি বলিয়াছেন? ঠাহারা বলেন—

“ঈশা বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন তাজেন ভূজীথা মা গুণঃ কস্ত বিজ্ঞানম্ ॥”

‘বিশ্বজগতে বাহা-কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি বাহা দান করিয়াছেন, তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অস্ত্রের ধনে লোভ করিবে না।’

ইহার অর্থ এমন নহে যে, ‘ঈশ্বর সর্ববাপী’ এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

“ঈশা বাস্তমিদং সর্বম্”—ইহা কাজের কথা—ইহা কাল্পনিক কিছু নহে—ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি—‘ঐহারা বলিয়াছেন—

“তোমাদের ব্রহ্মলোকে যেবাং তপো ব্রহ্মচর্যাং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।”

‘এই যে ব্রহ্মলোক অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে—ইহা তাঁহাদেরই, তপস্তা বাহাদের, ব্রহ্মচর্যা বাহাদের, সত্য বাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।’ অর্থাৎ বাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্তা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপন-রহস্য নহে—“ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শাস্তং তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূত্বঃসুব্রহ্মৈতদুপাশ্রিতং তপঃ”—ঋতই তপস্তা, সত্যই তপস্তা, শ্রুত তপস্তা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তপস্তা, দান তপস্তা, কৰ্ম তপস্তা এবং ভূলোক-ভূবলোক-স্বলোকবাপী এই যে ব্রহ্ম, ইহার উপাসনাই তপস্তা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল, তেজ, শাস্তি, সম্ভ্রাব, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কৰ্ম দ্বারা স্বার্থপাণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে, আত্মায়-পরে, লোকলোকা-ন্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

এরূপ উপলব্ধি কখনই শুদ্ধমাত্র ভাবের দ্বারা, সম্প্রদাহে সম্প্রদাহে শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা হইতে পারে না, ইহা প্রতিদিনের কন্ডের দ্বারাই সম্ভবপর। পরের সেবা না করিয়া আমরা কেবল দূরে বসিয়া ধ্যান করিয়া পরকে আপনার করিতে, আপনার বাঁগিয়া জানিতে পারি না। পরকে যে পরিমাণে আপনার করিব, সেই পরিমাণেই ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বকে উপলব্ধি করিব—সেই উপলব্ধিই সত্য উপলব্ধি—তাহা আমাদের অন্তরগত আত্ম-রচিত কুহেলিকা মহে। এই উপলব্ধির পরিমাণ পাওয়া যায়, ইহাকে পরীক্ষা করিতে পারি—এই উপলব্ধির আদর্শ গ্রহণ করিলে

আত্মপ্রবঞ্চনার আর উপায় থাকে না। নিখিলের মধ্যে সত্যভাবে আমি ব্রহ্মকে পাই-তেছি কি না, আমার প্রতিদিনের কর্মই তাহার প্রমাণ। উপনিষদ্ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি “সর্বমেবাবিবেশ” —সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। পরের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রবেশাধিকার কতখানি বাড়িল, ইহার দ্বারাই আমাদের আত্মার মধ্যে আমরা ব্রহ্মভূতির পরিমাণ যথার্থভাবে নির্ণয় করিতে পারি। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া আনি, তবে ব্রহ্ম হইতেই আমাদের মনকে সঙ্কুচিত করি। আমরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মনামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া হিন্দুসমাজের অপর অংশকে সেই চিত্তের সাহায্যেই হৃদয়ের স্থান হইতে বঞ্চিত করি, তবে ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রহ্মকেই দূরবর্জন করিয়া রাখি। “সর্বমেবাবিবেশ” — আমরা যথার্থ আত্মীয়ভাবে যতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিব, ততদূর পর্য্যন্তই আমাদের ব্রহ্মলাভ। আমরা ধৈর্য্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, কমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গল-তাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না —পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ভীতির উদ্ভেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না—বৈষয়িকতার বন্ধন, ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের প্রলোভনপাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না—এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুষ্কর, সেই উত্তম আত্মাভি-

মান বংশীরববিসৃষ্ট ভুজঙ্গের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি—ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কতদূর পর্য্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি। ব্রহ্মকে যে পরিমাণে স্বীকার করিব, অহঙ্কারকে সেই পরিমাণেই খর্ব্ব করিতে হইবে।

ব্রহ্মের সাধনা আমাদের দেশে ত নূতন সাধনা নহে। যাহারা ব্রহ্মকে লাভ করাকেই যথার্থ লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা যে সাধনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি কি প্রজ্ঞা হারাইতে হইবে? আমরা—যাহারা ব্রহ্মকে তেমন করিয়া সর্বতোভাবে চাহিতেছি না, আমরাই কি সাধনার নব নব প্রণালী কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করিবার অধিকারী? যদি সত্য-সঙ্কল্প সত্যচারী সাধুদিগের বহুকালের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধারূপ করা সম্ভব বোধ করি, তবে যে মন্ত্রকে আর্ধ্য গৃহিণী বৈদের সারভূত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গায়ত্রীমন্ত্রের সাহায্যে দিনের মধ্যে অন্তত একবার বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিশ্বসবিতার সহিত আমাদের যোগ অহুত্ব করিয়া লইতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মমূলে জীবনের সুর বাধিয়া লওয়া। ওঁ ভূবঃ স্বঃ —গায়ত্রীর এই যে ব্যাহতি-অংশ—এই ব্যাহতির দ্বারা একবার পৃথিবী-অস্তরিক্শ, একবার নিখিলভুবনকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে,—নিজেকে সমস্ত সর্বাঙ্গীণীমা হইতে মুক্ত করিয়া এই লোক-

লোকান্তরপরিবেষ্টিত বিশ্বের সহিত যুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে—অনন্ত দেশকালের সহিত, জল-স্থল-আকাশের সহিত, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের সহিত আপনাকে একাত্ম করিয়া অনুভব করিতে হইবে। তাহার পরে তত্ত্ব হইয়া বলিতে হইবে—তৎসবিত্ত্ববরণ্যং ভর্ণো দেবস্ত ধীমহি—যে নিখিললোকের সহিত আমি সম্মিলিত, এই নিখিলের যিনি সবিভা—এই নিখিল অহরহই তাঁহার রশ্মি-বিকিরণ, তাঁহারই শক্তি ধ্যান করি—এই ভূত্বঃ স্বঃ—এই নিখিল ভূবনই তাঁহার অবি-রাম শক্তির প্রকাশ। এই শক্তিকে যে ধ্যানদ্বারা সর্বত্র অনুভব করিব, সেই ধ্যানের শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের ধী-প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহা হইতেই। বাহিরে বিশ্ব তাঁহারই বিকিরণ, অন্তরে চৈতন্য তাঁহারই প্রেরণ। তাঁহারই প্রেরিত এই ধী দ্বারা আমরা সর্বত্র তাঁহারই শক্তি দেখিতেছি—তাঁহারই প্রেরিত এই ধী'র সহায়তায় আমরা সূর্য্যকে তাঁহারই দ্বারা দীপ্ত, বায়ুকে তাঁহারই দ্বারা নিখসিত, পৃথিবীকে তাঁহারই দ্বারা দৃঢ় বলিয়া জানিলাম—তাঁহারই প্রেরিত এই ধীমুদ্রে আত্মার সহিত নিখিলকে ও নিখিলের সহিত নিখিলসবিত্ত্বকে সম্মিলিত করিয়া ধ্যান করিলাম।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে—ইহা আরম্ভ-মাত্র। এই ভূত্বঃস্বলোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া যে ধ্যান করা—অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র সেই সর্বশক্তিমানের শক্তিকে মনন করিয়া নগুরা, ইহা ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধনমাত্র। তাহার পরে সংসারের মধ্যে, প্রাত্যহিক

ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনাকে বিশেষভাবে বিচিত্রভাবে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এককে অনেকের মধ্যে, ক্রমকে চঞ্চলের মধ্যে, মঙ্গলকে স্তম্ভঃস্থের মধ্যে পদে পদে ধারণা করিয়া লইতে হইবে। তবেই এই উপাসনা অন্তরে-বাহিরে সত্য হইয়া উঠিবে। ইহাকে সুদূর ভাবলোকের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া আমাদের মানবত্বের অধিকাংশ হইতেই, আমাদের নিকটতর প্রত্যক্ষ-তর জীবন হইতেই, বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকে না এবং সংসারও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে।

আমরা বিশ্বের অন্তঃসর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না—তাঁহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকামের সম্বন্ধও নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কণ্ঠে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্ত মানুষের মধ্যেই পূর্ণতর-ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব-পর। নিখিল নানবাস্ত্যার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। “সর্ব-ভূতাস্তরাণ্য” ব্রহ্ম এই মানুষের জোড়েই আমাদের কাছে আসিয়া আসিয়া ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তম্ভরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদের চিরকালসঞ্চিত প্রাণ, বুদ্ধি, প্রীতি ও উত্তম নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য্য ভাবার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের

অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্য-কাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজ-ভাণ্ডারে আমাদের জ্ঞান জ্ঞান ও ধর্ম প্রতি-দিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে । এই মানব-জ্ঞান মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানব-সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অংকুর রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিস্বপ্নের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতির সশ্চর্য্যভাবে অমুভব করিতে পারা আমাদের অমুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য । আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, সদয়বৃত্তি, কর্মবৃত্তি—আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয় । এইজন্ত ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্য ছাড়া আর কোথাও নাই । মাতা যেমন একমাত্র স্নাতুলগ্নকেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত ঠাহর অগ্রাগ্র বিচিত্র সঙ্গ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য্য—তেমনি ব্রহ্মনাথের নিকট একমাত্র মনুষ্যের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান এই সঙ্গের মধ্য দিয়াই আমরা ঠাহাকে জানি, ঠাহাকে প্রীতি করি, ঠাহার কর্ম করি । এই-জন্ত মানবসংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোট-বড় সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানু-

ষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা । অল্প উপাসনা আংশিক—কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,—সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না । মানুষই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ—এবং সেই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষের মধ্যে ব্রহ্মেরই আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষতম করিয়া জানা মানবজীবনের চরম চরিতার্থতা । তাহা যদি না জানি, সংসারের সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে, জন্মমৃত্যু-স্বপ্নঃখ-লাভক্ষতির মধ্যে সেই নিত্যকে, সেই ধ্রুবকে যদি লাভ না করি, তবে স্নেহপ্রেমদয়াকে মোহ এবং সংসারকে মায়াগরীচিকা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে এবং প্রতি মুহূর্তের আকর্ষণকেই প্রতিমুহূর্তে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য না করার কোন কারণ থাকিবে না । মনুষ্য-ত্বকে, মানবসংসারকে যদি সর্বান্তঃকরণে সেই ভূমার দ্বারা আবৃত দেখি, তবে বিশ্বমানবের সহিত প্রত্যেক মানবের নিত্যসঙ্গ, সত্যসঙ্গ যথার্থভাবে উপলব্ধি করি, তবে নিরন্তর সেই সঙ্গ বাহিয়া ব্রহ্মের আনন্দধারা পান করি—অসত্য অগ্রাগ্র আমাদের চিত্ত হইতে দূর হয় এবং কদাচ কাহা হইতেও আমরা ভয়-প্রাপ্ত হই না ।

এইরূপে বিশ্বসংসারের মধ্যে ব্যাপকভাবে ও মানবসংসারের মধ্যে বিশেষভাবে ব্রহ্ম-লাভের সাধনাকে ব্রাহ্মসমাজ খর্ষ করিয়া আনিয়াছেন কেন ?

এ কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ বাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া

লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাজ বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজ-রচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্ম-লাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষ-কালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। এখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে, সে কথা স্বীকার করিতে কষ্ট-বোধ হয়। তখন আমাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিস্তারকেই ধর্মবিস্তার বলিয়া মনে করি— ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কাছে প্রায় এক কথা হইয়া দাঁড়ায়, সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেই আমরা ব্রাহ্ম হইলাম বলিয়া জগতের অন্তসকলের সহিত বিশেষত্ব অনুভব করি। ইহার ফল হয় এই যে, ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্বাভাবিক প্রকৃষ্টক্ষেত্র যে বিশ্ব-সংসার—তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টিই থাকে না—ব্রাহ্মসমাজ তাহা অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠে—এবং এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া ছাড়া ব্রহ্মোপাসনাকে আমরা গণ্য করিতেই চাই না। ইহা হইতে ধর্মের বৈবক্ষিকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুপ্তগণ যে ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ব্রাহ্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অত্যাশ্রয় দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দির-সংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে

মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হইয়া উঠে। দলা-দলির আশ্রয় কিছুতেই নেবে না, কেবলি বাড়িয়া চলিতে থাকে। যখন ব্রহ্মের প্রচার ভুলিয়া গিয়া আমাদের ব্রহ্মকে প্রচার করিতে চাই, যখন মানুষকে ভুলিয়া গিয়া আমাদের সমাজকে বড় করিয়া দেখি, যখন মঙ্গলকে আমাদের রূত না বলিতে পারিলে সুখবোধ হয় না; তখন ধর্মসমাজের দ্বারা-তেই ধর্মের যথার্থ বিপর্যয়দশা উপস্থিত হয়। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই বে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই, ব্রহ্মকে যেন বিশেষচিন্তুধারী ব্রহ্মব্যবসায়ীদের একাধিকৃত পণ্যদ্রব্যের মত না দেখি। আমরা যেন নিজের সমাজের উন্নতিতেই ব্রহ্মের মহিমা প্রত্যক্ষ না করি—সকল সমাজের মধ্যেই ব্রহ্মের 'অমোঘশক্তি' কার্য্য করিতেছে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া ও লক্ষ্য করিয়া আমরা যেন সমস্ত মানবের গৌরবে আপনাদিগকে মহীয়ান্ জ্ঞান করিতে পারি। ব্রহ্ম ধত্ত—তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্ব-জীবে ধত্ত—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি”—‘হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?’ ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—“স্বৈ মহির্ষি”—‘আপন মহি-মাতে-’। তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অহুভব করিতে হইবে—আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

জ্ঞানতৃপ্ত প্রশান্তায়া যে গুরু, যিনি আপন সার্থকজীবনের প্রজ্জলিত হোমাগ্নি-শিখার দ্বারা আমাদের চিত্তে সহজেই ব্রহ্মাগ্নি সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন, আমি সেই গুরুর আসনে বসিয়া কোনো কথা বলিতেছি না—সুতরাং আমার কথার যতটুকু মূল্য, তাহা আপনারা বিচার করিয়াই গ্রহণ করিবেন, ইহা জানিয়াই সাহস করিয়া আমার চিস্তিত বিষয়কে আপনাদের নিকটে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত করিলাম। আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পথ দিয়া চলিয়াছি, সে পথে এতদিন কিছু লাভ করি নাই বলিলে অতুক্তি হইবে—কিন্তু সম্প্রতি আমরা এমন একটি সংশ্লিপ্স স্থানে আসিয়া পড়াইয়াছি, যেখানে পুনর্বার ভাল করিয়া দিগ্‌নির্ণয় করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই অল্পভব করিয়া যে ভাবনা, যে নিষ্কলতার আশঙ্কা মনে জন্মিয়াছে, সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিবার যে আকুলতা মনে উদয় হইতেছে, তাহারই তাড়নায় আমি এই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজকাল যে অপরি-তৃপ্তি, যে অসন্তোষের ভাব সুস্পষ্ট দেখা যাই-তেছে, তাহার প্রধান কারণ, ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘকাল ভাঙনের কাজেই বিশেষলক্ষ্য রাখি-য়াছে, গড়নের কাজে মন দিতে পারে নাই। লড়াইয়ের দিনে বিচ্ছেদবিরোধ, আঘাত-প্রতিঘাতই সর্বপ্রধান হইয়া উঠে—রক্ষণ ও গঠনের জন্ত শাস্তি ও প্রীতির প্রয়োজন। যতদিন আমরা কেবল সৈন্তের ভাবে, আঘাত-কারীর ভাবেই সমাজে থাকিব, ততদিন

আমাদের জীবন অনেকটা-পরিমাণে কৃত্রিম হইতেই বাধ্য। ততদিন আমরা আমাদের চতুর্দিকের সহিত মিলনের সহজ পুত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া অনৈক্যের কেবল ছুটি-একটি কারণকেই চোখের সম্মুখে খাড়া করিয়া, তাহাকেই অপরিমিত বৃহৎ করিয়া, আপনা-দিগকে চারিদিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র করিয়া, জাতীয় প্রাণসঞ্চারের স্রমহৎ প্রবাহ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছি। একপক্ষে অধিককাল চলে না। টবের মধ্যে যেটুকু মাটি থাকে, তাহাতে সৌখীন ফুলগাছ কিছুকাল শোভা দিতে পারে—কিন্তু বনস্পতি তাহাতে বাড়ে না, তাহাতে বাঁচে না। তাই ব্রাহ্মসমাজের শাখাপ্রশাখার মধ্যে শীর্ণতা, তাহার পুষ্পপল্লবের মধ্যে শুষ্কতা উত্তরোত্তর অধিক করিয়া দেখা দিতেছে। এইরূপে চিরস্থায়ী বিরোধের ভাবে পৈতৃকসমাজের মধ্যে আপনাদিগকে প্রাণপণে পৃথক্ করিয়া রাখিলে স্বাস্থ্য কখনই থাকে না, ধর্ম প্রত্যাহই পীড়িত হইতে থাকে। যে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা এই বিচ্ছেদবিরোধ প্রাবল্য হইয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—যে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বালুতটকে উদ্বেলিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ের উদার প্রবাহ দেশের সর্বত্র অব্যাহত হইতে পারে, আমি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসমাজে নহে, আমাদের সমাজে, হিন্দুসমাজে, সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্তমনে প্রার্থনা করি। আমি জানি, মন্তোচ্চারণই ব্রহ্মোপাসনা নহে, সাকার-নিরাকার-বাদসম্বন্ধে বিশেষ কোনো মতকে স্বীকার করাই ব্রহ্মোপাসনা নহে। আমি জানি, হিন্দুসমাজে

যাঁহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রীতির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মঙ্গলকর্ষ দ্বারা, একাগ্রনিষ্ঠা দ্বারা, পবিত্র-জীবনের দ্বারা সংসারের মধ্যে ব্রহ্মকে সত্য-ভাবে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতেছেন। অতএব সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আছি বলিয়াই স্বাতন্ত্র্যজনিত যে একটা কৃত্রিম দম্ব উপস্থিত হয়—যে দম্ব সত্য হইতে, ব্রহ্ম হইতে আমাদের গকে নিরস্ত করে, সেই দম্ব হইতে যেন আমাদের গকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারি—এবং চতুর্দিকের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের ঐক্যযোগে অকুণ্ঠিতহৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করি—সকলকেই যেন বুঝিতে পারি—কোথাও যেন আমাদের বাধা না থাকে।

বিরোধের ভাবের মধ্যেই ভিত্তি নিহিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া অতিসতর্কতাবশত সর্বদা তাহাকে শঙ্কায়িত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এটা ব্রাহ্মমতের বিরোধী, ওটা পৌত্তলিকতার গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ বাচবিচার করিতে করিতে সে আপনাকে এমন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাধ্যিয়াছে যে, আপনাকে কুশ করিয়া, নীরস করিয়া আনিয়াছে। ‘ইহা নয়, ইহা নয়’ বলিয়া কেবলি বর্জন করিয়া করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে কেবল ‘নেতি’র প্রধান কঙ্কালমাত্র করিয়া তুলিলে, তাহা আমাদের হৃদয়কে ভুগু করিতে পারে না—তাহার ‘ইতি’র অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—তাহা বর্ণগন্ধরসবিরল। এই শুদ্ধতা অমূল্য করিয়া ত্বর্ঘ্যচিত্তে আনি অল্প সেই ব্রহ্মের উপাদান প্রার্থনা করি—যিনি রূপরসকে পরিহার করেন না, সমস্ত রূপরসই যাঁহার অন্তর্গত—সমস্তকেই যিনি আবৃত

করিয়া আছেন। অগ্নি-বায়ু-জল-চন্দ্র-সূর্য্য বৈদিক ঋষিদের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিফলিত ভক্তির সামগাধা নানা সুরে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা এই পরমবিস্ময়সাবহ বিশ্ব-জগৎকে জড়পিণ্ড বলিয়া দেখেন নাই। ইহার বিরাট প্রাণ তাঁহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, বিশ্বের আত্মা তাঁহাদের আত্মাকে আব্বান করিয়াছে। আমরা এই আশ্চর্য্য নিখিলের মধ্যে, এই অনির্কটনীয় রহস্যপুঞ্জের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চরণ করিতেছি, যেন কোথাও মহিমা কিছুই নাই। যেন ব্রহ্মকে কেবল স্বরচিত বাক্যের মধ্যে, স্বপ্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ ভিত্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও ভক্তি করিবার নাই। ইহাতে যে নম্রতা-বিহীন শুদ্ধতার চর্চা করা হয়, তাহাতে “রসো বৈ সঃ” সেই রসমুদ্রের নাথখানে থাকিয়াও আমাদের হৃদয় উদ্ধৃত, কঠিন। আমাদের জীবন সঙ্কীর্ণ ও নিফল হইতে থাকে। আমরা যেন অগ্নিকে, জলকে, ওষধি-বনস্পতিকে শুষ্ক বলিয়া জ্ঞান না করি। আমরা যেন এই বিশ্বভুবনকে প্রাণের দ্বারা, আত্মার দ্বারা, বিশ্বের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তাহাকে আমাদের জ্ঞানের এক শুদ্ধকোণে না ফেলিয়া রাখি। তাহাকে ‘ঐশা বাসু’—তাহাকে ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিতে পারি। একদিন দেখিয়াছিলাম, একজন ক্রান্ত কৃষক দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে “মা” বলিয়া নদীর জলে অবগাহন করিয়াছিল। তাহার সেই উচ্ছ্বসিত মাতৃসম্বোধন আমার কাছে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহা কল্পনা নহে, রূপক নহে—যিনি সত্যই

মা, মার মধ্যে যিনি মা হইয়া আছেন, যিনি চিরন্তন মা, তিনিই এই শীতল নদীদ্বারার মধ্যে সেই কণ্ঠকান্ত তাপিতকে অভিবিক্ত করিয়া-
ছিলেন—এই নদীপ্রান্তের মধ্যেই স্তম্ভদায়িনী
স্নেহপ্রাণিনী মা প্রত্যক্ষ। সেইখানেই যদি
বিশ্বমাতাকে প্রণাম করি, তবে তাঁহাকে
সত্য প্রণাম করা হয়। সুপক্ক ফল যখন
সুধারসে আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে, তখন
সেই মধুর স্বাদের মধ্যে যদি জননীর স্নেহ
লাভ করিতে পারি, তবে সেই লাভের মধ্যেই
ব্রহ্মানন্দলাভ সত্য। সেই ‘রসো বৈ’কে
বক্তৃতার অলঙ্কারে নহে, প্রকৃতভাবেই
প্রভাতে-সন্ধ্যায়, গিরিনদীকাননে, স্বাদে-
গন্ধে-বর্ণে-রূপে যখন প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া
সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে-মহিমায় সমস্ত জগৎকে
দেদীপ্যমান দেখিব—তখনই আমাদের
উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনা নাম দিবার অধি-
কার লাভ করিব—তখন সমস্ত তর্কবিতর্ক,
বিরোধবিদ্বেষ, চারিদিকের সহিত সমস্ত
বিচ্ছেদ অনায়াসে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত
কাটিয়া যাইবে।

যাহা বলিতেছি, এ কথা নূতন নহে—ব্রহ্ম
সাক্ষাৎ হইছেন, এ কথা পুরাতন; ইহা ভারত-
বর্ষের বনস্পতি বটবৃক্ষের ছায় প্রাচীন।
কিন্তু সেই বটবৃক্ষ যদি আপনাকে প্রাত-
মুহুর্তে নবীন না করিতে পারে, তাহার পল্লব
যদি দিনে দিনে নূতন না জন্মে, তাহার
রসসঞ্চার যদি প্রতিক্ষণে নূতন না হয়, তবে
তাঁহা মৃত কাষ্ঠমাত্র। ব্রহ্মমন্ত্রকে আমাদের
সমগ্র জীবনের সহিত, আমাদের সমগ্র
সমাজের সহিত যদি অহরহ যুক্ত করিয়া
রাখি, তবেই তাহাকে অহরহ নবীন রাখিয়া

তাঁহার ফলচ্ছায়া, তাহার স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য
ভোগ করিতে পারিব। তাহাকে সত্যরূপে
রক্ষা করিলেই সে আমাদের সত্যভাবে
রক্ষা করিবে।

এই কথা স্বীকার করিলেই ইহার উপায়
অন্বেষণ ও অবলম্বন করিতে হইবে। সে
উপায় কোনো অবহেলাকৃত ব্যাপার নহে,
সে উপায় অবকাশের দিনে ক্ষণকালীন
আয়োজনমাত্র নহে। জীবনের আরম্ভ
হইতে শেষ পর্য্যন্তই তাহার উদ্দেশ্য। সেই
উদ্দেশ্যে আমাদের প্রবৃত্ত হইতে হইবে।
প্রথমে শিক্ষা, পরে চর্চা ও পরে সম্ভোগ—
প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে সংসারধর্ম্ম ও পরে
ব্রহ্মসহবাস,—প্রথমে উদ্দেশ্য, পরে সাধনা
ও পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজে বথার্থভাবে
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে—আর ত কোন
সংক্ষিপ্ত কৌশল জানি না।

অতএব বিশ্বজগতে ও মানবসংসারে বথার্থ
ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রকৃত সাধনা বালককালের
ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা ই আরম্ভ করিতে
হইবে। তখন হইতে সংযম-নিয়মের দ্বারা
সবল-নিয়ন্ত্রণ হইয়া, চিন্তাকে শাস্ত ও প্রসন্ন
করিয়া, অন্তঃকরণকে ভক্তিপ্রদ্বাদ্বারা জগতের
মধ্যে সজীব-সরস-ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, কল্যাণ-
কর্ম্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান দ্বারা মঙ্গলভাবে
জীবনের মধ্যে সহজ করিয়া তুলিয়া, অহিংসা
ও দয়াপ্রেমের দ্বারা সকল চেতনজীবের
সহিত যুক্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্যবিলাসকে তুচ্ছ
জানিয়া, লোকভয়-মৃত্যুভয়কে স্থগা করিয়া,
ত্যাগনিষ্ঠ আত্মদমনের দ্বারা ধৈর্য্যবীৰ্য্য শিক্ষা
করিয়া, তবে আমরা সত্যভাবে সংসারের
মধ্যে মানবজীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির দ্বারা

সার্থক করিতে পারি । নতুবা বথেক্ষাচারের মধ্যে, ভোগৈখ্যের আশ্রয়িতার মধ্যে, নানা আকর্ষণের বিক্ষেপবিক্ষোভের মধ্যে, আমাদের আধুনিক সমাজের অসত্য ও অর্থহীন অসঙ্গতির মধ্যে ভূমার প্রতি অন্ত-রাত্মার একাগ্রলক্ষ্যস্থাপনের শিক্ষা, সকল রঙ্গের মধ্যে সেই রসস্বরূপের অনিন্দ আনন্দ-নের অভ্যাস আমাদের কখনই ঘটবে না । তাহা যদি না ঘটে, তবে দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-

নাম নিজেরা গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মনামপ্রচারের আড়ম্বর আমাদের পক্ষে অশোভন, অসঙ্গত, অসত্য হইবে—জগতের মধ্যে যাহা পূর্ণতম সত্য, জীবনের মধ্যে যাহা চরমতম সফলতা, তাহাকে আমরা কেবল সভা করিয়া, নিয়ম করিয়া, বক্তৃতা করিয়া সঙ্গীর্ণ করিব, মিথ্যা করিব, ধ্বংস করিব ও স্পর্ধাসহকারে, উদ্ধম-সহকারে, বিপুল আয়োজন সহকারে সম্প্রদায় বাঁধিয়া আত্মঘাতী হইব ।

হে বিপদ, এস ।

(১)

হে বিপদ, এস !

সম্মল আনতচক্ষু ভীতিবিকম্পিত বক্ষে
রাখি দৃষ্টি, এস দেবি, এস ।
পতি-পুত্র-সর্বস্বহারা, অনাথ-বিধবা-পারা,
গালে হাত দিয়া, সতি, কাছে এসে বোস ।

(২)

সম্ভ্রান্তা কালিন্দীর জলে
সন্ধ্যাসন্ধ্যা, হে বিপদ, তব মুখ-কোকনদ,
বিবাদ বুলায় হস্ত সে নীল উৎপলে !
নীহারিকা-মুক্তাহার তোমার ও অশ্রুধার,
প্রীতি-রাকা-শশী হাসে স্তম্ভর আঁচলে !

(৩)

এস, দেবাজনা !

র্যাকেলের খরদৃষ্টি হেন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি
হেরে নাই !—ভূমি মম অপূর্ব ম্যাডোনা !
শিশু প্রীষ্টে কোলে করি, এস রাজরাজেশ্বরী,
শোভা-সাগরের অগ্নি কমল-অসিনা !

(৪)

এস, নন্দরাণি !

হেন যশোদার কথা কে শুনেছে কবে কোথা ?

ভাগবতে নাহি হেন সুধামাথা বাণী !

শ্রীহরিরে কোলে করি এস রাজরাজেশ্বর,

কি ফুল-সরোজ ওই চরণ-স্থানি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

গণেশপূজা ।

অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে “সিদ্ধিদাতা গণেশ” শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকমহাশয় আমাদের দেবমন্দিরে গণপতির আবির্ভাবের যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে । তিনি গণপতিকে যত আধুনিক বলিতে চাহেন, গণপতি ততটা আধুনিক নহেন । খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর বহুপূর্বে গণপতি পূজা পাইতেন, তাহা অস্ব-মানের কারণ আছে ।

ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে “গণপতি” এই নাম দেখা যায় । যথা—দ্বিতীয়মণ্ডলে ত্রয়ো-বিংশতিতম-মুক্ত-মধ্যে ঋক্—

গণানাং ভা গণপতিং হবামহে

কবিঃ কবীনাং পুত্রঃ প্রবন্তমন্ ।

জ্যেষ্ঠরাজঃ ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতি

আ নঃ শৃণুয়তিভিঃ সীদ সাদনম্ ॥

এই ঋকের গণপতি কিন্তু আমাদের বিদ্য-রাজ গণপতি নহেন । উক্ত ঋকের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি । তাহাকেই “গণানাং গণপতিং” বলা হইতেছে । ভাষ্যকার সারণও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

“হে ব্রহ্মণস্পতি, গণানাং দেবাদিগণানাং সম্বন্ধিনং গণপতিং স্বীয়ানাং পতিং...ভা ভাং হবামহে আহুয়ামঃ ।”

এই গণপতি আমাদের গণেশ না হইলেও গণপতি উপাধিটা অতি প্রাচীন, তাহা পাওয়া গেল ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে আমাদের গণেশকে পাওয়া যায় । ঐ আরণ্যকের অন্তিম অর্থাৎ দশম প্রপাঠক যাজ্ঞিকী উপ-নিষৎ নামে পরিচিত । ঐ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকেই কতিপয় দেবতার উদ্দেশে কয়েকটি গায়ত্রীমন্ত্রের উল্লেখ আছে । মন্ত্র-কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—

১। পুরুষস্ত বিদ্ব সন্যাস্ত মহাদেবস্ত ধীমহি ।

ভন্নো রজঃ প্রচোদয়াৎ ॥

২। তৎপুরুষায় বিদ্বহে মহাদেবায় ধীমহি ।

ভন্নো রজঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৩। তৎপুরুষায় বিদ্বহে বজ্রভুভায় ধীমহি ।

ভন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

৪। তৎপুরুষায় বিদ্বহে বজ্রভুভায় ধীমহি ।

ভন্নো নশিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

- ৫। তৎপুরুষায় বিম্বাহে মহাসেনায় ধীমহি ।
তন্নঃ বয়ং ধুঃ প্রচোদয়াৎ ॥
- ৬। কাত্যায়নায় বিম্বাহে কঙ্কুমারী ধীমহি ।
তন্নো হুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম দুইটির উদ্দিষ্ট মহাদেব; পরবর্তী তিনটির উদ্দিষ্ট গণেশ, নন্দি, কার্তিকের ও শেষটির উদ্দিষ্ট দেবতা “কাত্যায়ন”, “কঙ্কুমারী”, “হুর্গি”। বলা বাহুল্য, ইনি গণেশজননী কাত্যায়নী হুর্গা।

গণেশের উদ্দিষ্ট তৃতীয় মন্ত্রটির সম্বন্ধে সায়ণের ভাষ্য এইরূপ :—

“বীজাপুরগদেক্কাশ্মুকেত্যগমপ্রসিদ্ধমুক্তিধরং বিনায়কং প্রার্থয়তে। তৎপুরুষায় * * * প্রচোদয়াদিতি। গজসমানবস্তু যেন দীর্ঘন্তু তুণ্ডন্তু রক্তকলসাদিবারণার্থং বক্রবৃন্দং। দন্তিঃ মহাদন্তঃ।

অতএব স্বীকার্য্য যে, যাজ্ঞিকী উপনিষদের সময়ে বক্রতুণ্ড মহাদন্তদেবতার পূজা প্রচলিত এবং ইহার সহিত মহাদেবের সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল।

এখন যাজ্ঞিকী উপনিষদের কাল লইয়া তর্ক চলিতে পারে। মোক্ষমূলর এককালে বলিয়াছিলেন, আরণ্যকসমূহ স্বতন্ত্ররূপে পূর্ববর্তী, অর্থাৎ তাঁহার মতে ৬০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। একালের মতে বৈদিক সাহিত্যের কাল আরও পিছাইয়াই গিয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু যাজ্ঞিকী উপ-

নিষদের প্রাচীনত্বে কিছু সন্দেহ আছে। ঐ উপনিষৎ আরণ্যকের মধ্যে “খিলরূপ” বা পরিশিষ্টভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার পূর্ববর্তী তিন প্রপাঠক অর্থাৎ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠক তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে গণ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য লিখিয়াছেন; তৎপরবর্তী যাজ্ঞিকী উপনিষদের লেখন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও যাজ্ঞিকী উপনিষদে আকাশপাতাল ভেদ। পাতা উন্টাইলেই ভেদ স্পষ্ট দেখা যায়। যাজ্ঞিকী উপনিষদকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলাই কঠিন; উহা মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ—পাতের সময় মনে হয়, বেদ পড়িতেছি না, তন্ত্র পড়িতেছি। সায়ণাচার্য্যের সময়ে দ্রাবিড়দেশে চলিত যাজ্ঞিকী উপনিষদে চৌষষ্টি অমুবাক বর্তমান ছিল। অন্ধ্রদেশে আশা, কর্ণাটে চূয়াত্তর, মত্ভত্র উননব্বই অমুবাক প্রচলিত ছিল। কাজেই বুঝা যাইতেছে, উহাতে কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাড়িয়া গিয়াছে। সায়ণ স্বয়ং দ্রাবিড়ানুগা চৌষষ্টি অমুবাকের ভাষ্য করিয়াছেন।

সন্দেহের এই সকল কারণ থাকিলেও যখন যাজ্ঞিকী উপনিষৎ বহুকাল হইতে অপৌরুষেয় প্রতিবাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তখন ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর তুলনায় বহুপ্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নৌকাডুবি ।

২৯

পরদিন কমলা যখন ঘুম হইতে জাগিল, তখন ভোর রাত্রি। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। মনে পড়িয়া গেল, সে জাহাজে আছে। আশে আশে উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিল, নিম্নতল জলের উপর স্থল একটুখানি শুভ্র কুরাশার আচ্ছাদন পড়িয়াছে—অন্ধকার পাখুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্বদিকে তরঙ্গশ্রেণীর পশ্চাতের আকাশে স্বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীর পাথুর নীলধারা জেলে-ডিঙির শাদা-শাদা পালগুলিতে খচিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কি-একটা গূঢ়বেদনা পাড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশির-বাস্পাঘরা উষা কেন আজ তাহার আনন্দ-মুগ্ধ উদ্‌ঘাটন করিতেছে না? কেন একটা অগ্রজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কৃত্রিম বাহিয়া চোখের কাছে বারবার আকুল হইয়া উঠিতেছে? এই নদীতীরের দৃশ্য কাল তাহার পুলাকিত কোতুলকে কেবলি দোলা দিতেছিল, রাত্রির মধ্যে কি-এমন পরিবর্তন হইল, বাহাতে বাহিরের স্থানে তাহার হৃদয় আর সাড়া দিল না?

হঠাৎ কমলার মনে হইল, সে অত্যন্ত একলা; তাহার কেহ নাই। কালও রমেশের সঙ্গে তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া ছিল, আজ গাঝধানে যেন একটা ফাঁক হইয়া গেছে।

বৃন্ত শিথিল হইয়া আসিলে ফুলটি যেমন ভয়ে ভয়ে থাকে, বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে আজ কমলা তেমনি একটা ভয় অহুভব করিতে লাগিল। তাহার শ্বশুর নাই, শাশুড়ি নাই, সঙ্গিনী নাই, স্বজন-পরিজন কেহই নাই, একথা কাল ত তাহার মনে ছিল না—ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে, বাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশমাত্র তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র?

কমলা অনেকক্ষণ দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নদীর জলপ্রবাহ তরল স্বর্ণস্রোতের মত জলিতে লাগিল। খালাসিয়া তখন কাজে লাগিয়াছে, এজিন্‌ থক্-থক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—নোঙর-তোলা ও জাহাজ-তেলাঠেলির শব্দে অকালজাগ্রত শিশুর দল নদীর তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এমন-সময় রমেশ এই গোলমালে জাগিয়া-উঠিয়া কমলার খবর লইবার জন্য তাহার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা চকিত হইয়া, আঁচল যথাস্থানে থাকা-সম্বন্ধে তাহা আর-একটু টানিয়া আপনাকে যেন বিশেষভাবে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিল।

রমেশ কহিল, “কমলা, তোমার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়াছে?”

এই প্রশ্নে কেন যে কমলার রাগ হইতে পারে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না। কিন্তু হঠাৎ

রাগ হইল। সে অন্তরিক্তে মুখ করিয়া কেবল মাথা নাড়িল মাত্র।

রমেশ কহিল—“বেলা হইলে লোকজন উঠিয়া পড়িবে—এইবেলা তৈরি হইয়া লও না!”

কমলা তাহার কোন উত্তর না করিয়া একখানি কৌচানো শাড়ী, গাম্ছা ও একটি জামা চৌকির উপর হইতে তুলিয়া-লইয়া ক্রতপদে রমেশের পাশ দিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

রমেশ যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কমলাকে এই যন্ত্রটুকু করিতে আসিল, ইহা কমলার কাছে কেবল যে অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হইল, তাহা নহে, ইহা যেন তাহাকে অপমান করিল। রমেশের আত্মীয়তার সীমা যে কেবল খানিকটা-দূর পর্য্যন্ত, এক জায়গায় আসিয়া তাহা যে বাধিয়া যায়, ইহা সহসা কমলা অনুভব করিতে পারিয়াছে। তাই তাহারও মনের মধ্যে একটা রাশ টানিবার ভাব আসিয়াছে। রমেশের নিকট হইতে সে যে আপনাকে কোন্ সীমায় কতদূর প্রত্যা-
হরণ করিয়া আনিবে, ইহাই ভাবিয়া তাহার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে। কোনো তর্কযুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্পষ্ট চিন্তা না করিয়াও রমেশের সহিত সখ্যতার মধ্যে কমলা একটা শূন্যতা, একটা লজ্জাজনক দৈন্ত অনুমান করিতেছে। ইতিপূর্বে রমেশের কাছে সে যেরূপ সহজ-স্বাভাবিক-ভাবে ছিল, আজ তাহা কমলা আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না। শ্বশুরবাড়ী কোনো গুরুজন তাহাকে লজ্জা করিতে শেখায় নাই—মাথায় কোন্ অবস্থায় ঘোমটার পরিমাণ কতখানি

হওয়া উচিত, তাহাও তাহার অভ্যস্ত হয় নাই—কিন্তু রমেশ সম্মুখে আসিতেই আজ যেন অকারণে তাহার বুকের ভিতরটা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

রমেশেরও মন আজ ভাল ছিল না। সে যে একটা অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, ভাল-মন্দ যাহা হোক একটা পরিণামের আভাস সে যে দেখিতে পাইতেছে না, কেবল অদৃষ্টের আঘাত খাইয়া চলিয়াছে, নিজের জোরে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, এ ভাবনা তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, ভাগ্য যদিও প্রতিকূল ছিল সন্দেহ নাই, তথাপি নিজের স্বভাব-গত দুর্ব্বলতাই তাহাকে এই বিপাকের মধ্য-প্রোতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কোনো-একটা সময়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া একটা গন্তব্যপথ অবলম্বন করা উচিত ছিল। সে সময়টা কখন আসিয়াছিল এবং সে পথটা কি, তাহা রমেশ এখনো ঠিকমত নির্ণয় করিতে পারে না—কিন্তু ইহা তাহার কাছে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, যদি তাহার চরিত্রে দ্বিধা-বিহীন বল যথেষ্ট থাকিত, তবে সে সময়ও তাহার অগোচরে পার হইয়া বাইত না,—সে পথও তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইত। আজ সে বে-ভাবে চলিয়াছে, তাহা নিতান্তই ঘৃণার হান্তজনক—তাহা পুরুষোচিত নহে। আজ তাহার কোনো কর্তব্য নাই, কোনো সঙ্কল্প নাই,—গতি আছে, গন্তব্য নাই,—যত দিন বাইতেছে, ততই তাহার জীবন একটা অদ্রুত নিফলতার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। সঙ্কটের সময় নিজের সমস্ত শক্তি খাটাইবারই একটা সুখ আছে—কিন্তু

সকট ঘনাইতেছে, অথচ শক্তি কোন কাজ করিতেছে না, নিজের হাত হইতে সমস্ত রাশ খসাইয়া-দিয়া চোখ-বাঁধা ঘোড়ার মজ্জি অহুসারে থানাখন্দের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, পুরুষের পক্ষে এমন দিক্কার আর কিছুই নাই। রমেশ তাহার উদ্দেশ্যহীন নদীযাত্রায় আপনাকে কাপুরুষ বলিয়া বারবার লাঞ্চিত করিতে লাগিল। রমেশ মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিল— “তুমি যে অত্যাচার কর নাই” ইহাই তোমার মাস্তানার কারণ নহে—তুমি কাপুরুষ— কাপুরুষের ভাগ্যে সফলতা নাই— কাপুরুষ, সস্তুরণশক্তিহীন মজ্জমান ব্যক্তির ত্যায় নিজেকে ও নিজের সমস্ত আশ্রয় ও আশ্রিতকে অতলের দিকে টানিয়া লইয়া যায় ।’

মান সারিয়া কমলা তখন তাহার কান্ধারায় আসিয়া বসিল, তখন তাহার দিনের কন্ড তাহার সম্মুখবর্তী হইল। কাঁধের উপর হইতে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা লইয়া কাপড়ের পোট্‌ম্যাটে গুলিতেই তাহার মধ্যে ছোট ক্যাশ্বাক্সটি নজরে পড়িল। এই ক্যাশ্বাক্সটি পাইয়া কাল কমলা একটি নুতন গোরব প্লাত করিয়াছিল। তাহার হাতে একটি স্বাধীন শক্তি আঁগিয়াছিল। তাই সে বহুত্ব করিয়া ব্যাক্সটি তাহার কাপড়ের তোরঙ্গের মধ্যে ঢাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কমলা সে ব্যাক্স হাতে তুলিয়া লইয়া উল্লাসবেশ করিল না। আজ এ ব্যাক্সকে ঠিক নিজের ব্যাক্স মনে হইল না ইহা-রমেশেরই ব্যাক্স। এ ব্যাক্সের মধ্যে কমলার পূর্ণস্বাধীনতা নাই। সুতরাং এ টাকার ব্যাক্স কমলার পক্ষে একটা ভারমাত্র।

রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল— “খোলা ব্যাক্সের মধ্যে কী হইয়ািলির সন্ধান পাইয়াছ ? চূপচাপ বসিয়া যে ?”

কমলা ক্যাশ্বাক্স তুলিয়া-ধরিয়া কহিল— “এই তোমার ব্যাক্স ।”

রমেশ কহিল— “ও আমি লইয়া কি করিব !”

কমলা কহিল— “তোমার যেমন দরকার, সেই বুঝিয়া আমাকে জিনিষপত্র অনাইয়া দাও ।”

রমেশ। তোমার বুঝি কিছুই দরকার নাই ?

কমলা ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া কহিল, “টাকায় আমার কিসের দরকার !

রমেশ হাসিয়া কহিল, “এত-বড় কথাটা কয়জন লোক বলিতে পারে ! যা হোক, যেটা তোমার এত অনাদরের জিনিষ, সেইটেই কি পরকে দিতে হয় ? আমি ও লইব কেন ?”

কমলা কোনো উত্তর না করিয়া মেজের উপর ক্যাশ্বাক্স রাখিয়া দিল।

রমেশ কহিল, “আচ্ছা কমলা, সত্য করিয়া বল, আমি আমার গল্প শেষ করি নাই বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?”

কমলা মুখ নীচু করিয়া কহিল, “রাগ কে করিয়াছে ?”

রমেশ। রাগ যে না করিয়াছে, সে ঐ ক্যাশ্বাক্সটি রাখুক—তাহা হইলেই বুঝিব, তাহার কথা সত্য।

কমলা। রাগ না করিলেই বুঝি ক্যাশ্বাক্স রাখিতে হইবে ? তোমার জিনিষ তুমি রাখ না কেন ?

রমেশ। আমার জিনিষ ত নয়—দিয়া

কাড়িয়া লইলে যে মরিয়া ব্রহ্মদৈত্য হইতে হইবে! আমার বুঝি সেই ভয় নাই?

রমেশের ব্রহ্মদৈত্য হইবার আশঙ্কায় কমলার হঠাৎ হাসি পাইয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল—“কখন না। দিয়া কাড়িয়া লইলে বুঝি ব্রহ্মদৈত্য হইতে হয়? আমি ত কখনো ভুঁই নাই।”

এই অকস্মাৎ হাসি হইতে সন্ধির স্তত্রপাত হইল। রমেশ কহিল—“অন্তের কাছে কেমন করিয়া শুনিবে? যদি কখনো কোনো ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পায়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্য-মিথ্যা জানিতে পারিবে।”

কমলা হঠাৎ কুতূহলী হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা, ঠাট্টা নয়—তুমি কখনো সত্যকার ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ?”

রমেশ কহিল—“সত্যকার নয়, এমন অনেক ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছি! ঠিক খাঁটি জিনিষটি সংসারে ধূলভ।”

কমলা। কেন, উমেশ যে বলে—

রমেশ। উমেশ? উমেশ ব্যক্তিটি কে?

কমলা। আঃ, ঐ যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে বাইতেছে, ও নিজে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছে।

রমেশ। এ সমস্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে আমি উমেশের সমকক্ষ নহি, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রহ্মদৈত্যসম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

ইতিমধ্যে বহুচেষ্টায় খালাসির দল জাহাজ ভাসাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছু দূর গেছে, এমন সময়ে নাথার একটা চাঙার লইয়া একটা লোক তাঁর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাত তুলিয়া জাহাজ থামাইবার জন্ত অহুস

করিতে লাগিল। সারেং তাহার ব্যাকুলতার দৃকপাত করিল না। তখন সে লোকটা রমেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া “বাবু বাবু” করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। রমেশ কহিল, “আমাকে লোকটা ষ্টীমারের টিকিট বাবু বলিয়া মনে করিয়াছে।”—রমেশ তাহাকে দুই হাত ঘুরাইয়া জানাইয়া দিল, ষ্টীমার থামাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

হঠাৎ কমলা বলিয়া উঠিল, “ঐ ত উমেশ! না না, ওকে ফেলিয়া যাইয়ো না—ওকে তুলিয়া লও!”

রমেশ কহিল, “আমার কথায় ষ্টীমার থামাইবে কেন?”

কমলা কাতর হইয়া কহিল, “না, তুমি থামাইতে বল বল না তুমি—ভাঙা ত বেশি দূর নয়!”

রমেশ তখন সারেংকে গিয়া ষ্টীমার থামাইতে অমুরোধ করিল। সারেং কহিল, “বাবু, কোম্পানির নিয়ম নাই।”

কমলা বাহির হইয়া গিয়া কহিল—“উহাকে ফেলিয়া বাইতে পারিবে না—একটু থামাও! ও আমাদের উমেশ!”

রমেশ তখন নিঃশব্দত্ব ও জুলাপাণ্ডিত্যের সহজ উপায় অবলম্বন করিল। পুরস্কারের আশ্রমে সারেং জাহাজ থামাইয়া উমেশকে তুলিয়া-লইয়া তাহার প্রতি বহুতর ভৎসনা প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে ভ্রঞ্জেপমাত্র না করিয়া কমলার পায়ের কাছে ঝুড়িটা নামাইয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এমনি ভাবে হাসিতে লাগিল।

কমলার তখনো বন্ধের ক্ষোভ দূর হয়

নাই । সে কহিল, “হাস্টিস্ যে! জাহাজ যদি না ধামিত, তবে তোর কি হইত?”

উমেশ তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কুড়িটা উজাড় করিয়া দিল। এক-কাঁদি কাঁচকলা, কয়েক-রকম শাক, কুমড়ার ফুল ও গোটকতক বেগুন বাহির হইয়া পড়িল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, “এ সমস্ত কোথা হইতে আনিলা?”

উমেশ, সংগ্রহের বাহা ইতিহাস দিল, তাহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক নহে। গতকল্য বাজার হইতে দাধপ্রভৃতি কানতে যাইবার সময় সে গ্রামস্থ কাহারো বা চালে, কাহারো বা ক্ষেতে, এই সমস্ত ভোজ্যপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছিল। আজ ভোরে জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে তাঁদের নামিয়া এইগুলি যথাস্থান হইতে চয়ন-নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কাহারো সম্মতির অপেক্ষা রাখে নাই।

রমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—“পরের ক্ষেত হইতে তুই এই সমস্ত চুরি করিয়া আনিয়াছিস?”

উমেশ কহিল, “চুরি করিব কেন? ক্ষেতে কত ছিল, আমি অন্ন এই-কটি আনিয়াছি বই ত নয়, ইহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে?”

রমেশ। অন্ন আনিলে চুরি হয় না? লম্বীছাড়া! যা, এ সমস্ত এখান থেকে লইয়া যা!

উমেশ করুণনেত্রে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “মা, এইগুলিকে আমদের দেশে পিড়িং-শাক বলে, ইহার চুড়ি বড় সরেশ হয়! আর এইগুলো বেতো-শাক”—

রমেশ দিগন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “নিরো বা তোর পিড়িং-শাক! নহিলে আমি সমস্ত নদীর জলে-ফেলিয়া দিব।”

এ সপক্ষে কর্তব্যনিরূপণের জন্ত সে কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা নইয়া যাইবার জন্ত সঙ্কেত করিল। সেই সঙ্কেতের মধ্যে করুণামিশ্রিত গোপন-প্রসন্নতা দেখিয়া উমেশ শাকসব্জিগুলি কুড়াইয়া চুপড়ির মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রমেশ কহিল, “এ ভারি অত্যাশ! ছেলেটাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়া না!”

রমেশ চিঠিপত্র লিখিবার জন্ত তাহার কামরায় চলিয়া গেল। কমলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেকেন্ডক্লাসের ডেক্ পারাইয়া জাহাজের হালের দিকে যেখানে তাহাদের দওয়া-টাকা রাখার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই-খানে উমেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সেকেন্ডক্লাসে যাত্রী কেহ ছিল না। কমলা মাথা-গায়ে একটা রূপার জড়াইয়া উমেশের কাছে গিয়া কহিল—“সেগুলো সব ফেলিয়া দিয়াছিস্ নাকি?”

উমেশ কহিল, “ফেলিতে যাইব কেন? এই ঘরের মধ্যেই সব রাখিয়াছ।”

কমলা রাগিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “কিন্তু তুই ভারি অত্যাশ করিয়াছিস! আর কখনো এমন কাজ করিস্ নে! দেখ দেখি, ঈশ্বরের যদি চলিয়া যাইত!”

এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কমলা উদ্ধতবরে কহিল, “আন, বঁটি আন!”

উমেশ বঁটি আনিয়া দিল। কমলা সবেগে উমেশের আহত তরকারি কুটিতে প্রবৃত্ত হইল।

উমেশ । মা, এই শাকগুলার সঙ্গে সর্ষে-বাটা খুব চমৎকার হয় ।

কমলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, “জাম্বা, তবে সর্ষে বাটু !”

এমনি করিয়া উমেশ বাহাতে প্রশ্রয় না পায়, কমলা সেই সতর্কতা অবলম্বন করিল । বিশেষ গম্ভীরমুখে তাহার শাক, তাহার তরকারি, তাহার বেগুন কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দিল ।

হায়, এই গৃহচ্যুত ছেলেটাকে প্রশ্রয় না দিয়াই বা কমলা থাকে কি করিয়া ? শাক-চুরির গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা কমলা ঠিক বোঝে না—কিন্তু নিরাশ্রয় ছেলের নির্ভর-লালসা যে কত একান্ত, তাহা ত সে বোঝে । ঐ যে কমলাকে একটুখানি খুঁসি করিবার জন্ত এই লক্ষ্মীছাড়া বালক, কাল হইতে এই কয়েকটা শাক সংগ্রহের অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, আর-একটু হইলেই ঈমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইহার করুণা কি কমলাকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে ?

কমলা কহিল, “উমেশ, তোর জন্তে কাল-কের সেই দই কিছু বাকি আছে, তোকে আজ আবার দই খাওয়াইব, কিন্তু খবরদার, এমন কাজ আর কখনো করিস্‌নে !”

উমেশ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিল—“মা, তবেইসে দই তুমি কাল খাও নাই ?”

কমলা কহিল, “তোর মত দইয়ের উপর আমার অত লোভ নাই ! কিন্তু উমেশ, সব ত হইল, মাছের জোগাড় কি হইবে ? মাছ না পাইলে বাবুকে খাইতে দিব কি ?”

উমেশ । মাছের জোগাড় করিতে পারি না, কিন্তু সেটা ত মিনি পয়সায় হইবার জো নাই ।

কমলা পুনরায় শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল । তাহার সুন্দর ছুটি ক্র কুঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—“উমেশ, তোর মত নিরোপ আমি ত দেখি নাই ! আমি কি তোকে মিনি পয়সায় জিনিষ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি ?”

গতকল্য উমেশের মনে কি করিয়া একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, কমলা রমেশের কাছ হইতে টাকা আদায় করাটা সহজ মনে করে না । তা ছাড়া, সবসুদ্ধ জড়াইয়া রমেশকে তাহার ভাল লাগে নাই । এই-জন্ত রমেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবল সে এবং কমলা, এই দুই নিরুপায়ে মিলিয়া কি উপায়ে সংসার চালাইতে পারে, তাহার গুটিকতক সহজ কৌশল সে মনে মনে উদ্ভাবন করিতেছিল । শাক-বেগুন-কাঁচকলা-সম্বন্ধে সে এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু মাছ-টার বিষয়ে এখনো সে যুক্তি স্থির করিতে পারে নাই । পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে সামান্য দই-মাছ পর্য্যন্ত—জোটানো যায় না, পয়সা চাই—সুতরাং কমলার এই অকিঞ্চন ভক্ত-বালকটার পক্ষে পৃথিবী সহজ জায়গা নহে ।

উমেশ কিছু কাতর হইয়া কহিল, “মা, যদি বাবুকে বলিয়া কোনমতে গম্ভা-পাঁচেক পয়সা জোগাড় করিতে পার, তবে একটা বড় ধুই আনিতে পারি !”

কমলা উত্তরিয়া হইয়া কহিল, “না না, তোকে আর ঈমান হইতে নামিতে দিব না, এবার

তুই ডাঙার পড়িয়া থাকিলে তোকে কেহ আর তুলিয়া লইবে না ।”

উমেশ কহিল, “ডাঙার নামিব কেন ? আজ ভোরে খালাসিদের জালে খুব বড় মাছ পড়িয়াছে—এক-আধটা বেচিতেও পারে !”

গুলিয়া দ্রুতবেগে কমলা একটা টাকা আনিয়া উমেশের হাতে দিল—কহিল—“বাহা লাগে দিয়া বাকি ফিরাইয়া আনিম্ ।”

উমেশ মাছ আনিল, কিন্তু কিছু ফিরাইয়া আনিল না, বলিল, “একটাকার কমে কিছু-তেই দিল না ।”

কথাটা যে খাঁটি সত্য নহে, তাহা কমলা বুঝিল—একটু হাসিয়া কহিল, “এবার প্রীমার খামিলে টাকা ভাড়াইয়া রাখিতে হইবে ।”

উমেশ গভীরমুখে কহিল, “সেটা খুব দরকার । আস্ত টাকা একবার বাহির হইলে ফেরানো শক্ত ।

আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রমেশ কহিল, “বড় চমৎকার হইয়াছে ! কিন্তু এ সমস্ত জোটাইলে কোণা হইতে ? এ যে রুই-মাছের মুড়ো !”—বলিয়া মুড়োটা সমস্তে তুলিয়া-ধরিয়া কহিল—“এ ত স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মজ্জিম নয়—এ যে সত্যই মুড়ো—বাহাকে বলে রোহিতমংগু, তাহারি উত্ত-মাছ ।”

যখন গুলি, উমেশ ইহার সংগ্রহকর্তা, তখন কণ্ঠকালের জন্ত মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—“তা হোক, জিনিবটা ভাল—শাঙ্গে আছে—ক্রীড়কঃ হুজুলাদপি, উমেশাদপি রোহিতম্ । কিন্তু ও ছেলেটা—”

কমলা । দুমি এখন খাও ত । আমি তাকে খুব করিয়া ঝুঁকিয়া দিয়াছি ।

এইরূপে সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজন বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল । রমেশ “ডেক্”—এ আরাম-কেন্দারায় গিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার মনোযোগ দিল । কমলা তখন উমেশকে খাওয়াইতে বসিল । মাছের চচ্চড়িটা উমেশের এত ভাল লাগিল যে, তাহার ভোজনের উৎসাহটা কৌতুকাবহ না হইয়া ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল । উৎকণ্ঠিত কমলা কহিল, “উমেশ, আর খাসনে । তোর জন্ত চচ্চড়িটা রাখিয়া দিলাম, আবার রাজে খাইবি ।”

এইরূপে দিবসের কর্ণে ও হাস্তকৌতুকে প্রাতঃকালের হৃদয়ভারটা কখন যে দূর হইয়া গেল, তাহা কমলা জানিতে পারিল না ।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল । সূর্যের আলো বাঁকা হইয়া দীর্ঘতরঙ্গটায় পশ্চিম-দিক্ হইতে জাহাজের ছাদ অধিকার করিয়া লইল । স্পন্দমান জলের উপর বৈকালের মন্দীভূত রোদ্দ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে । নদীর হই তীরে নবীনশ্রাম শারদশকুন্দের মাল-খানকার সঙ্গীর্ণ পথ দিয়া গ্রামরমণীরা গা ধুইবার জন্ত ঘট কক্ষে করিয়া চলিয়া আসিতেছে ।

কমলা পানসাজা শেষ করিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখহাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যার জন্ত যখন প্রস্তুত হইয়া লইল, সূর্য তখন গ্রামের বাঁশবনগুলির পশ্চাতে অস্ত গিয়াছে । জাহাজ সেদিনকার মত টেশন্-ঘাটে নোঙর ফেলিয়াছে ।

আজ কমলার রাজের রজনব্যাপার ভেমন বেশি নহে । সকালের অনেক তর-কারি এ বেলা কাজে লাগিবে । এখন-সন্ধ্য

রমেশ আসিয়া কহিল—মধ্যাহ্নে আজ গুরু-
ভোজন হইয়াছে, এ বেলা সে আহার করিবে
না ।

কমলা বিমর্ষ হইয়া কহিল—“কিছু খাইবে
না ? শুধুকেবল মাছভাজা দিয়া—”

রমেশ সংক্ষেপে কহিল—“না, মাছভাজা
থাক্ !” বলিয়া চলিয়া গেল ।

কমলা তখন উমেশের পাতে সমস্ত মাছ-
ভাজা ও চচ্চড়ি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল ।
উমেশ কহিল, “তোমার অন্ন কিছু রাখিলে
না ?”

সে কহিল—“আমার খাওয়া হইয়া
গেছে ।”

এইরূপে কমলার এই ভাসমান ক্ষুদ্র-
সংসারের একদিনের সমস্ত কৰ্ত্তব্য সম্পন্ন
হইয়া গেল ।

জ্যোৎস্না তখন জলে-স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।
তীরে গ্রাম নাই—ধানের ক্ষেতের ঘন-কোমল
সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ
অজস্র বিরহিণীর মত জাগিয়া রহিয়াছে ।

জাহাজের ছাদে একলা বসিয়া রমেশের
হৃদয় এই উদাস আকাশের মাঝখানে হাহা-
কার করিয়া উঠিয়াছে । বাহা হারাইয়াছে,
বাহা পাইবার নছে, জীবনের যে অংশ ব্যর্থ
হইয়াছে, তাহার শূন্যতা, তাহার বিপুলতা
রাত্রের অপরিফুটতার মধ্যে সমস্ত অন্ধকার
জড়িয়া অসীম আকার ধারণ করিয়াছে ।

আজ মধ্যাহ্নে সে একলা বসিয়া হেম-
নলিনীকে একখানি পত্র লিখিতেছিল ।
তাহাতে এই কথা বলিয়াছিল যে, ‘আমার
গৃহে যে আমার স্ত্রী আছে, এ কথা লোকের
বলিবার অধিকার আছে—এমন কি, একটি

বালিকা এখনো আমাকে স্বামী বলিয়া জানে ।
আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে চলিয়াছি ।
অথচ আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই ।
এরূপ অদ্ভুত ভ্রম, এরূপ অসঙ্গত ব্যাপার যে
কেমন করিয়া ঘটিতে পারে, তাহা আমি
তোমাকে জানাইতে পারি । কিন্তু শুদ্ধমাত্র
আমার কথার উপরে বিশ্বাস করিতে হইবে ।
তাহার অন্ন প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নহে, প্রমাণ
লইবার চেষ্টাও নানাকারণে অশ্রায় হইবে ।
সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে কেবল আমার কথা-
মাত্র তোমাকে বিশ্বাসস্থাপন করিতে বলিব,
তোমার উপরে আমার এমন দাবী আছে
কি না, জানি না । যদি সেই দাবী স্বীকার
করিতে পার, তবে তোমাকে সমস্ত কথা
খুলিয়া লিখিব—নতুবা আমার অপবাদ
আমারি থাকিবে এবং আমার বিনা অপরাধের
চরমদণ্ড তোমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া
তোমাকে অপরাধী করিব না । ঈশ্বর
তোমাকে সুখী করুন !”

কোনো একটু জ্বরগার পৌঁছিয়া এই
চিঠি রমেশ ডাকে দিবে বলিয়া স্থির করিয়া-
ছিল । কিন্তু আজ এই জনশূন্য নিঃশব্দ
সন্ধ্যাবেলায় এই চিঠির ভবিষ্যৎ উত্তরের মধ্যে
রমেশ লেশমাত্র আশার কারণ দেখিতে পাইল
না । তাহার মনে হইল, সে যেন প্রতিকূল
উত্তর পাইয়াছে—যেন হেমনলিনী ঘৃণা করিয়া
উত্তর দেয় নাই ।

তীরে টিনের ছাদ দেওয়া যে ক্ষুদ্রকূটীরে
দীপান-আপিল, সেইখানে একটি শীর্ণদেহ
কেরানী টুলের উপরে বসিয়া ডেকের উপর
ছোট কেরোসিনের বাতি লইয়া খাতা
লিখিতেছিল । খোলা দরজার ভিতর দিয়া

রমেশ সেই কেরানীটিকে দেখিতে পাইতে-
ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ অবিতেছিল,
'আমার ভাগ্য যদি আমাকে ঐ কেরানীটির
মত একটি সমীর্ণ অণুচ সুস্পষ্ট জীবনযাত্রার
মধ্যে বাঁধিয়া দিত—হিসাব লিখিতাম, কাজ
করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি
ধাইতাম, কাজ সারিয়া রাজে বাসায়
গাইতাম—তবে আমি বাঁচিতাম—আমি
বাঁচিতাম!'

হেমন্তলিনী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে,
তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাকে অপ-
বাদফালনের অবসরমাত্র দিতেছে না,
আত্মীয়হীনতার মৃতদেহের মত তাহাকে
একটা অকুল অনিশ্চয়তার শ্রোতের মধ্যে
ভাসাইয়া দিয়াছে, এই কথা বারবার মনে
করিয়া রমেশের বক্ষ অনিশ্চিত দীর্ঘশ্বাসে
ক্ষীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে আপিলব্বরের আলো নিবিয়া
গেল। কেরানী ঘরে তালা বন্ধ করিয়া হিমের
ভরে মাথায় রূপার মুড়ি দিয়া নির্জন শত-
ক্ষেত্রের মাঝখানে দিয়া ধীরে ধীরে কোন্
দিকে চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না।

রমেশ তাহার সামনের টেবিলের উপরে
ছইহাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া পড়িল—শব্দ-
বিহীন জ্যোৎস্নারাত্রির পাণ্ডুবর্ণ স্বদূর-
ব্যাপিতা তাহাকে একটা আকার-আয়তন-
শূন্য পরিণামহীন নৈরাশ্রের মধ্যে নিরুদ্দেশ
করিয়া দিল।

কমলা যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া
আহাজার রেল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া
ছিল, রমেশ তাহা জানিতে পারে নাই। কমলা
মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যাবেলায় রমেশ তাহাকে

ডাকিয়া লইবে। এইজন্ত কাজকর্ম সারিয়া
যখন দেখিল, রমেশ তাহার খোঁজ লইতে
আসিল না, তখন সে আপনি ধীরপদে আহা-
জের ছাঁদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু
তাহাকে হঠাৎ ধমকিয়া দাঁড়াইতে হইল,
সে রমেশের কাছে যাইতে পারিল না।
চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপরে পড়িয়া-
ছিল—সে মুখ যেন দূরে,—বহুদূরে; কমলার
সহিত তাহার সংস্রব নাই। রমেশ যেন কম-
লার পক্ষে দিগন্তের মেঘের মত—মনে হয়,
যেন মাঠ পার হইলেই তাহার নাগাল পাওয়া
যাইবে—কিন্তু মাঠ পার হইয়া দেখা যায়, সে
যেমন দূরে ছিল, তেমনি দূরেই আছে।
আজ দিনের বেলা কাজকর্ম-কথাবার্তার
মধ্যে রমেশকে যথেষ্ট নিকটবর্তী বলিয়াই
মনে হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় শুদ্ধতার
মধ্যে রমেশ কোথায় চলিয়া গেছে? এখন
তাহার কাছে যাইতে ভয় করে কেন? ধ্যান-
মগ্ন রমেশ এবং এই সজিবিহীনা বাগিকার
মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীরের দ্বারা
আপাদমন্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাজি
ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে
দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে!

রমেশ যখন ছইহাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া
টেবিলের উপরে মুখ রাখিল, তখন কমলা
ধীরে ধীরে তাহার কামুরার দিকে গেল।
পায়ের শব্দ করিল না, পাছে রমেশ টের
পার বে, কমলা তাহার সন্ধান লইতে
আসিয়াছিল।

কিন্তু তাহার শুইবার কামরা নির্জন,
অন্ধকার—প্রবেশ করিয়া তাহার বুকের
ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, নিজেকে একান্তই

পরিভ্রমণ এবং একাকিনী বলিয়া মনে হইল—সেই ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটা একটা-কোনো নির্ভর অপরিচিত জন্তুর হাঁ-করা মুখের মত তাহার কাছে আপনার অন্ধকার মেলিয়া দিল। কোথায় সে যাইবে? কোন্‌খানে আপনার ক্ষুদ্র শরীরটি পাতিয়া-দিয়া সে চোখ বুজিয়া বলিতে পারিবে, ‘এই আমার আপনার স্থান?’

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই কমলা আবার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিবার সময় রমেশের ছাড়াটা টিনের তোরঙ্গের উপর পড়িয়া-গিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া রমেশ মুখ তুলিল এবং চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দেখিল, কমলা তাহার শুইবার কামরার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কহিল—“একি কমলা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি এতক্ষণে শুইয়াছ! তোমার কি ভয় করিতেছে নাকি? আচ্ছা, আমি আর বাহিরে বসিব না—আমি এই পাশের ঘরেই শুইতে গেলাম—মাকের দরজাটি বরঞ্চ খুলিয়া রাখিতেছি।”

কমলা উদ্ধতভাবে কহিল—“ভয় আমি করি না।” বলিয়া সবেগে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং যে দরজা রমেশ খোলা রাখিয়াছিল, তাহা সে বন্ধ করিয়া দিল। বিছানার উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া মুখের উপরে একটা চাদর ঢাকিল সে যেন জগতে আর-কাহাকেও না পাইয়া কেবল আপনাকে দিয়া আপনাকে নিবিড়ভাবে বেটন করিল। রমেশ মনে করিয়াছিল, এতক্ষণে কমলা শুইতে গেছে—এ ছাড়া কমলাসঙ্গে আর-কিছু তাহার মনে করি-

বার ছিল না! কমলা দিনের বেলা কাজ করিবে এবং সন্ধ্যা হইলেই শুইতে যাইবে—কমলার আর-কিছুই প্রয়োজন নাই! রমেশ মনে করিয়াছে, কমলার ভয় করিতেছে! রাগে-লজ্জায় কমলা ঘুমাইতে পারিল না—তাহার চোখ-হুটা জ্বলিতে লাগিল, চোখে জল আসিল না। তাহার সমস্ত হৃদয় বিজোহী হইয়া উঠিল। যেখানে নির্ভরতাও নাই, স্বাধীনতাও নাই, সেখানে প্রাণ বাঁচে কি করিয়া?

রাত্রি আর কাটে না। পাশের ঘরে রমেশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিছানার মধ্যে বনলা আর থাকিতে পারিল না। আন্তে আন্তে বাহিরে চলিয়া আসিল। জাহাজের রেলিং ধরিয়া তাঁরের দিকে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—চাঁদ পশ্চিমের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। দুই ধারের শৃঙ্খলজের মাঝখান দিয়া যে সঙ্কীর্ণপথ অদৃশ্য হইয়া গেছে, সেই দিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল, ‘এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যাহ আপন ঘরে যায়!’ ঘর!—ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল! একটুখানি মাত্র ঘর—কিন্তু সে ঘর কোথায়! শৃঙ্খলী ধুধু করিতেছে—প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত স্তব্ধ! অনাবশ্যক আকাশ—অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অস্তহীন বিশালতা অপরিণীম অনাবশ্যক—কেবল তাহার একটিমাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।

এমন-সময় হঠাৎ কমলা চমকিয়া উঠিল—কে একজন তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

“ভয় নাই মা, আমি উমেশ। রাত বে অনেক হইয়াছে, ঘুম নাই কেন !”

এতক্ষণ যে অশ্রু পড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু দিয়া সেই অশ্রু উছলিয়া পড়িল। বড় বড় ফোঁটা কিছুতে বাধা মানিল না, কেবলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘাড় বাঁকাইয়া কমলা উমেশের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিল। জলভার বহিয়া মেঘ ভাসিয়া বাইতেছে,—যেমনি তাহারি মত আর-একটা গৃহহারা হাওয়ার স্পর্শ লাগে, অমনি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়ে;—এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা বস্ত্রের কথা। শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুকের ভিতর অশ্রুর ভার আর রাখিতে পারিল না। একটা-কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

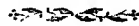
পীড়িতচিত্ত উমেশ কেমন করিয়া সাধনা দিতে হয়, তাবিয়া পাইল না। অবশেষে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিল—“মা, তুমি যে সেই টাকাটা দিয়াছিলে, তার থেকে সাত-আনা বাঁচিয়াছে।”

তখন কমলার অশ্রুর ভার লঘু হইয়াছে। উমেশের এই খাপছাড়া সংবাদে সে একটু-খানি স্নেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা বেশ, সে তোমার কাছে রাখিয়া দে। যা, এখন শুতে বা !”

চাঁদ গাছের আড়ালে নামিয়া পড়িল। এবার কমলা বিছানায় আসিয়া যেমন শুইল, অমনি তাহার দুই শ্রান্তচক্ষু ঘুমে বুজিয়া আসিল—প্রভাতের রোদ্দর যখন তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল, তখনো সে নিদ্রায় মগ্ন।

ক্রমশঃ ।

মনুষ্যত্ব ।



“উত্তীর্ণত! জাগ্রত !” উত্থান কর, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু “উত্তীর্ণত, জাগ্রত” এই বাক্য বার-বার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা, প্রত্যেক দুঃখ, প্রত্যেক বিচ্ছেদ, কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া বে বন্ধার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই

ঝঙ্কত হইয়া উঠিয়াছে—“উত্তীর্ণত, জাগ্রত,”—“উত্থান কর, জাগ্রত হও !” অশ্রুশিশিরদ্রোত আমাদের নব জাগরণের জন্ত নিখিল জ্ঞান-মেঘনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ণ বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে ! কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে !

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্তুত হইয়া ওঠ !' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিখজ্জগতের অন্ত-গূঢ় আনন্দকে বর্ণে, গন্ধে, শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কম-নীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অল্প কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোন অবস্থায় বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ-সার্থকতায় আত্মোপাস্ত প্রকৃত হইয়া উঠিয়াছে !

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্ববাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না ? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সঙ্কুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কি আঁকড়িয়া রাখিতেছে ? প্রভাতে তরুণ সূর্য্য আসিয়া-অরুণ-করে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে—'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবস্থিত করিয়া দাও !' রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমন করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদঘাটন করিয়া দাও—আম্রার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্তে বিস্তৃত বিশ্বের সম্মুখীন কর !' নিখিল জগৎ প্রতি-ক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আরা-

দিগকে এই কথাই বলিতেছে—'আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফের, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখচ্ছৈর্যের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া ধর !'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতের ফুলের মত করিয়া এমন সহজে, এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারিদিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে ? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে, তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে ? পুষ্পের মত আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, কত-কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন অদীর্ঘ-যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকায়ে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মহুশ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ-সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর জ্বায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া, কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া, কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা

দ্বারা আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া স্থষ্টি করিতে থাকে ; অবশেষে যখন সে আপনার নীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান্ একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয় । বাবা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বির্যাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না ।

দুঃখ আছে - সংসারের দুঃখের শেষ নাই । সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা । মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মত অসঙ্গত কিছুই হইতে পারিত না । এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে । মহতেরই গোরব দুঃখ । বিশ্বসংসারের মধ্যে মহুষ্যই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান—অশ্রদ্ধাশ্রদ্ধেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে । পুষ্ণের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখ-নামা সঙ্গীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা আনন্দজনী—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না ।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বগন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে । কারণ, “ভূমিব হুং, অন্নে সুখমাস্তি”—‘অন্নে আমাদের আনন্দ নাই ।’ বাহ্যতে আমাদের ধর্মতা,

আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে । বাহ্য আমরা বীৰ্য্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, বাহ্য অনাদ্যনের—তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—বাহ্যকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয় । মহুষ্য আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীৰ্য্যের দ্বারা ই লভ্য । প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্কতোভাবে গ্রহণ করিত না । কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা হ্রলভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা হ্রলভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা হ্রলভ, তাহা নানাভিযুখী প্রবৃত্তির সংক্ষেপের দ্বারা হ্রলভ । এই হ্রলভ মহুষ্যকে অজ্ঞান করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অহুভব করিতে থাকে । সেই অহুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ । ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয় । ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের উর্দ্ধে তাহার মৃত্যু, মৃত্যুর উর্দ্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা । এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উত্তম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়বে আবদ্ধ হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে । সেইজন্ত উপনিষৎ বলিয়াছেন—‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’—‘এই আত্মা

(জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বল-
হীনের দ্বারা লভ্য নহেন ।’ সমগ্র শক্তিকে
সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য
ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ
করিবার উপায় হয় ।

এইজন্তই পুষ্পের পক্ষে পুষ্প যত সহজ,
মাহুঘের পক্ষে মাহুঘ্য তত সহজ নহে ।
মাহুঘ্যের মধ্য দিয়া মাহুঘকে যাহা পাইতে
হইবে, তাহা নিশ্চিত অবস্থায় পাইবার নহে ।
এইজন্তই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত
আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে—“উত্তীর্ণত !
জাগ্রত ! প্রাণ্য বরান্ নিবোধত ! ক্ষুরদ্য
দ্বারা নিশিতা হ্রতয়্যা, হৃগং পথন্তং কবম্বো
বদন্তি !”—“উঠ, জাগ ! যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত
হইয়া বোধলাভ কর ! সেই পথ শাগিত
ক্ষুরদ্বারের ন্যায় হৃগম, কবিরী এইরূপ
বলেন ।’

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-
পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহা-
দের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত
হইয়া উঠিয়াছে, তখন মাহুঘ আপন হৃগম পথ,
আপন হৃঃসহ হৃঃধ, আপন বৃহৎ অসমাপ্তির
গৌরবে মহত্তর, বিচित्रতর আনন্দের গীত
কি গাহিবে না ? যে প্রভাতে তরুণতার
মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের
হিল্লোল, পাখীর গান এবং ছারালোকের
স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্গর প্রভাতে
মাহুঘের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র
—সেই রমণীয় প্রভাতে মাহুঘকেই বন্ধ-
পয়িকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের ছরহ জর-
চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্রেশকে
বরণ করিয়া লইতে হইবে, স্থখহৃঃধের

উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী
বাহিতে হইবে—কারণ, মাহুঘ মহৎ, কারণ,
মাহুঘ্য স্বকঠিন, এবং মাহুঘের যে পথ, “হৃগং
পথন্তং কবম্বো বদন্তি ।”

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের
শেষ দেখি, তবে হৃঃধকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত
উৎকট হইয়া উঠে—তাহার সামঞ্জস্য থাকে
না । তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে ?
কেনই বা বহন করিবে ? কিন্তু যেমন নদীর
এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অস্তদিকে
সুদীর্ঘ-তট-নিরাক্রম অবিরাম-বুধ্যমান জলধারা,
তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক-
দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অস্তদিকে
সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে,
তবে এই গতির কোনই তাৎপর্য থাকে না,
আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অকৃত উন্মত্ততা
হইয়া দাঁড়ায় । ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের
সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি ।
শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ “বদ্যং
কর্ম প্রকৃক্কীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ,” যে-যে
কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করি-
বেন—“ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম,
চেষ্টা এবং শাস্তি, হৃঃধ এবং আনন্দ । ইহাতে
একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও
অস্তদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষ
বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্রমে
বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ
লাভ করি ।

প্রেম ত কিছু না দিয়া ব্যচিত্তে পারে
ন । আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি
একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের
মধ্যে বিসর্জন দিলাম কি ? তবে তক্তি

তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া ? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তব্য— তাহাই আমাদের দিবার জিনিষ। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,—যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তব্য মানন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তব্য বস্তুর সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতায় পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের—সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিফলিত হইয়া মুক্তিলাভ করিতেছে—এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাঃখের এক আনন্দ-অবসান,—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্ম আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত হঃখের স্বাক্ষর একটি আনন্দ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম বাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ বিধি হই। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ হঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ—প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্তমান করিয়া রুত্ব হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি আগ্রহ হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম হঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা

আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলঙ্কৃত করিবে;—ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে হঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে, ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই হঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই—বলরক্ষা হয় না—আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক্ হইতে, তোমার দিক্ হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আগুনকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে আগ্রহ নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অন্ততঃশ্রদ্ধের মধ্যে অভিলম্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ভায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ কর!

বঙ্গমঙ্গল ।

[খণ্ডকাব্য ।]

প্রথম সর্গ ।

(মন্ত্রণা ।)

অর্জন করিতে বশ, কর্জন স্মজন
কেমনে গর্জন করি হেলায়ে তর্জনী
আদেশিল সাধুশীল সচিবপ্রধান
রিজলিরে রিজলিউশন লিখিবারে ;
বর্ণিব সে স্বর্ণকীর্তি । এ অর্ণবে হায়
কিরূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে ?
তুমি যদি হে ভারতি, নাহি ধর হাল ?
খাটুনিও নাহি বেনী পাটুনীর কাজে ।
থাকিলেও ক্ষতি কিবা ? কার্যাহীন তুমি
হবেই ত অচিরাত নূতন বিধানে ;
আগে থেকে দাঁড়-টানা শিখে রাখা ভাল ।
পার কর বীণাপাণি, কাব্য-কালাপানি ।

হিমালয়ে সিমলার তুঙ্গশৃঙ্গ যথা .
নির্জনে মার্জন করে পর্জন্ত আপনি,
কর্জন বসিয়া তথা কনক-আসনে
ভাষেন অমৃতবাণী বাণী-বিড়ম্বিনী,
সস্তাষি সচিবে, মিত্রে, পাঞ্জে, কোতোয়ালে ।
“বিদ্যায়িত্তে ভারতীয়ে মাকুতির রথে,
পূর্ণ আজি আয়োজন ; চূর্ণ আন্দোলন ।
হে পাত্র । পড়িয়া শাস্ত্র গাজ দাহ কারো
নাহি হবে ; রবে সবে নীরবে জগতে ।
ছল-ধরা যোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হবে তাহা গুপ্ত-বিধির প্রচারে ;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে ।

শাজির কুলিশ দিব পুলিশের হাতে ;
 আঁট ঢাল, কোতোয়াল, শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিরা ।
 সচিব ! রচিত আমি অস্ত্র নব-বিধি,
 ঠাণ্ডা করি দেশ ; তুমি পাণ্ডা হও তার ।
 শুনি সে অমৃতবাণী জয়ধ্বনি করি
 উঠিল সচিববৃন্দ ; বন্দী গাহে গান ।

(বন্দীর গান ।)

করিয়ে দরবার	জেরবার
	করেছ রাজাগণে ।
রহিবে নামছাপা	(ধামাচাপা)
	পুলিস কমিশনে ।
ইউনিবেরসিটি,	বরষাট
	অস্ত্র না যেতে যেতে,
করিবে ভারতীয়	মতি স্থির,
	কুণোর বাতাসেতে ।
‘শুণ বিল্‌ থুলি’	বিল্‌কুল্‌-ই
	মহিমা জারি হোলো ।
প্রভুর জয়গানে	একতানে
	সকলে হরি বলো ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

(উল্লোগ ।)

“সমুদ্রাধা ইতিবৃত্ত প্রভৃতবে জারি
 করিলে সচিব তুমি ; বাঁচিল বাঙালী ।
 অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যে ছিল তিন দেশ ;
 একসঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গর্হিত ।
 বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কর
 কালাপালা করি’ কর্ণ । জালা দূর হবে,
 কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিরা ।”
 উচ্চারিরা কথাগুলি হস্তে ল’য়ে ছুরি
 ‘দক্ষ সার্জনের মত দাঁড়াল কর্জন ।

কহিলা সচিব তবে মুক্ত করহুগে :—

“ছুরি হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি ;

কিবা যদি ধড় হ’তে বতস্রিতে মাখা

শকা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?”

বধি রসনার লক্ষ ভৎসনাবচন,

কহেন খেতাব-পতি :—“অঙ্গচ্ছেদ অতি

সোজা কথা ; মজা ওতে আছে বহুবিধ ।

উহাতে চীৎকার করা ভাবপ্রধানতা ।

বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা, শিখাব এবার,

থাকে প্রাণ, ধড়-মুণ্ড বিভক্ত করিলে ।

যতটুকু যাবে কাটা, ঠিক ততখানি

এনে দিব অস্ত্র দেহ হইতে কাটিয়া ;

সবগুলো হবে তাজা সমান সমান ।

বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ ;—প্রত্যঙ্গ ত সেটা ।

কলিঙ্গ কিঙ্কর জুড়ি উৎকলের সাথে

কর নব-দেহ-সৃষ্টি । ভাবার একতা

অত্যন্ত আশ্চর্যরূপে হইবে সাধিত ।”

“তথাস্তু” বলিয়া সবে, শির করি নত—

রত হল নব-বিধি করিতে প্রচার ।

হুক্মারে মেদিনী ফাটে । উঠিল রোদন-

বুদ্ধিহীন-বঙ্গমুখে, অঙ্গচ্ছেদভরে ।

(রোদনধ্বনি ।)

মাথাটা কাটা গেলে

বাঁচিব জানি খাটি

শোভিব নব ডালে,

দেহটা দিলে ছাঁটি ।

মঙ্গল হবে থাসা,

বিশেষ আছে জানা ;

অঙ্গলে পাবে থাসা,

অঙ্গের হুটো জানা ।

অবোধ মোরা ভুলো,

কাঁদিয়া মরি ভুল :

বঙ্গটা বঙ্গে রাখো

করুণা করি প্রভু ।

তৃতীয় সর্গ ।

(সিদ্ধি ।)

—তুণকচ্ছন্দ—

অন্ন-হস্ত লাট, মত্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে ।

সাধ্য কার আজি তার জীব্য-কার্য্য রোধিবে ?

মত্ত-পুত লাট-দুত দেশ দেশ ধাইল ;

ভেদমত্ত—বেদতত্ত—কণ্ঠ তার গাইল ।

হর্ষ-নেত্র পাত্মমিত্র লক্ষবাক্ষ কাঁপিল ।

ঘোর রোল গণ্ডগোল ; বঙ্গধণ্ড কাঁপিল ।

রাজ্যখণ্ড, লণ্ডভণ্ড হৈল তার ভ্রুঃখ কি ?

খণ্ড-শূন্ত ভেদ-পূর্ণ রৈল লাট-বাক্যাটি ।

দেব সর্ষ লাট-গর্ষ হেরি পুষ্প বর্ষিল ;

বঙ্গ-মুণ্ড দেহ-পিণ্ড ছাড়ি ভূমি পর্ষিল ।

স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ষ সাক্ষ ; লাট ষাড় নাড়িল ।

তুণকের ছন্দ ঢের বর্ণনার ঝড়িল ।

মাথাটা গেল যবে, জাথে সবে

দেহটা ঠাণ্ডা !

কেহ বা ভাবে মনে সংগোপনে

গেছে বা প্রাণটা ।

উড়ের মাথা ছুড়ে

দিল ধড়ে,

তবুও নড়ে না !

আসাম দিল খাসা

লখা নাসা,

খাস যে পড়ে না ।

টিপির নাড়ী তার

ফেরেজার

কহেন লাটকে,

“আবার দেহটিতে

পায় দিতে

মাথাটা আটকে ?”

কহেন লাট যে সে কড়াভাবে :—

“কোরো না বিজ্জ্বিজ্জ !

জুড়িয়া দিগল মাথা, রবে কোথা

আমার Prestige ?”

খণ্ড হ’ল বঙ্গদেশ,

খণ্ড কাব্য হ’ল শেষ ;

বঙ্গের মঙ্গল আজি সাধিল কর্জুন ।

শ্রীবঙ্গমঙ্গল গায় বঙ্গবাদী জন ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

সার সত্যের আলোচনা ।

সার সত্যের আলোচনা একপ্রকার সাগর-মহন । তাহার সংক্ষেপে একদিক্ হইতে অমৃত এবং আর-একদিক্ হইতে হলাহল, দুই দিক্ হইতে দুই মহাতেজস্বী বস্তু বর্মহির হইয়া পড়ে । দেবতার হলাহলকে অমৃতের গুণে অমৃত করিয়া তোলেন ; অশুরেরা অমৃতকে হলাহলের গুণে হলাহল করিয়া তোলে । অমৃতও বেগুন, বিষও তেমনি, দুইই ভাল, দুইই মন্দ । সদ্ব্যবহারের হস্তে দুইই ভাল ; অসদ্ব্যবহারের হস্তে দুইই মন্দ । বিষকে সোপান করিয়া অমৃতে উত্থান করা হইলে বিষের সদ্যবহার করা হয় ; এরূপস্থলে বিষ খুবই ভাল । পক্ষান্তরে, অমৃতকে সোপান করিয়া বিষে অবতরণ করা হইলে অমৃতের অসদ্যবহার করা হয় ; এরূপস্থলে অমৃত বিষেরই সছোদর । বিষ কি ? না, দ্বন্দ্ব-কলহ—বিচ্ছেদ—এবং দুঃখ-তাপ । অমৃত কি ?

না শাস্তি, ঐক্য এবং আনন্দ । এ তো গেল ভাবের কথা ; কাজের কথা হ’লে এই যে, বিষকে ভয় করিয়া অমৃতকে লাভ করিতে হইবে, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া শাস্তিতে পৌঁছিতে হইবে, বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়া আনন্দময় কোষে উত্থান করিতে হইবে ।

বিজ্ঞানময় কোষ হুঙ্করশরীরের চরম সীমা-প্রদেশ । তাহার পরেই আনন্দময় কোষ । বিজ্ঞানময় কোষের অধীশ্বরী হ’চ্ছেন বুদ্ধি ।

বিগত প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, বুদ্ধির প্রধান অঙ্গ দুইটি—সামান্ত-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞান । আর, সেই সঙ্গে এটাও দেখানো হইয়াছে যে, সামান্ত-জ্ঞানে আত্ম-সত্তা প্রকাশ পায় এবং বিশেষ-জ্ঞানে বস্তুসত্তা প্রকাশ পায় । সামান্ত-জ্ঞান এবং বিশেষ-

জ্ঞানের মধ্যে খুবই যুদ্ধ চলিতেছে—মাকাতার আমল হইতে যুদ্ধ চলিতেছে। আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা'র মধ্যেও তথৈবচ। দর্শন-রাজ্যে যতপ্রকার বিবাদ-কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে এবং ঘটতেছে—যেমন সামান্ত্র-বিশেষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আত্ম-সত্তা এবং বস্তুসত্তা'র মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কার্য্য এবং কারণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কর্ত্তা এবং কর্ত্তের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবংবিধ সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র গোড়া'র স্বত্র হ'চ্ছে বিজ্ঞানের ভেদবুদ্ধি। সেই ভেদবুদ্ধিকে জয় করিয়া আনন্দময় কোষের সামঞ্জস্য, শাস্তি এবং আনন্দে সম্মুখান করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষকে জয় করিয়া অমৃত উত্থান করা।

ভেদবুদ্ধিটি সামান্ত্রা নারী নহেন—তিনি বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের সন্ধিস্থানে নির্নির্জন-নয়নে পাহারা দিতেছেন। যাত্রী দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলেন—“দাঁড়াও ! কে তুমি—অদ্বৈতবাদী না দ্বৈতবাদী ? সাকারবাদী না নিরাকারবাদী ?” যাত্রী যদি বলে—“আমি অদ্বৈতবাদী,” তবে তাহাকে তিনি অতলম্পর্শ সমুদ্র দেখাইয়া বলেন—“গলায় পাথর বাঁধিয়া ঐ ঠাঁই ঝাঁপ দেও !” যাত্রী যদি বলে—“আমি দ্বৈতবাদী,” তবে দুই দিকের দুই প্রবল স্রোতের মধ্যবর্তী ঘূর্ণাচক্র দেখাইয়া তাহাকে বলেন—“ঐখানে যাও !” যাত্রী যদি বলে—“আমি সাকারবাদী,” তবে তাহাকে তিনি কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষণ দেখাইয়া বলেন—“ঐখানে গিয়া মাথা ধোঁড়ো !” যাত্রী যদি বলে—“আমি নিরাকারবাদী,” তবে তাহাকে তিনি প্রজ-

লিত হত্যাশন দেখাইয়া বলেন—“উহার মধ্যে বাঁপ দিয়া পড়িয়া ধোঁয়া হইয়া আকাশে মিশিয়া যাও !” এ-বাদীই হউন, ও-বাদীই হউন, আর যে-বাদীই হউন—ভেদবুদ্ধির বজ্র-কটাক্ষে পড়িলে বাদি-প্রতিবাদী উভয়েরই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়। ভেদবুদ্ধির হস্তে সত্যবাদী ব্যতীত আর কোনো বাদীরই পরিভ্রাণ নাই। যাত্রী যদি সত্যসত্যই অমৃত-নিকেতনের প্রয়াসী হ'ন, তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—“অদ্বৈতবাদ কাহাকে বলিতেছ, তাহাও আমি জানি না ; দ্বৈতবাদ কাহাকে বলিতেছ, তাহাও আমি জানি না—জানিতে চাহি-ও না ; আমি এখানে বাদ্যবাদ করিতে আসি নাই—পথ ছাড়ো !” এই বলিয়া তিনি ভেদবুদ্ধিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হ'ন, আর, তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্ত অমৃত-নিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মহলে সামান্ত্র-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞানের মধ্যে যুগ্মাযুক্তি আরম্ভ হইয়াছে কখন হইতে ? বিজ্ঞান-স্বর্ঘ্যোদয়ের বহুপূর্বে সারা-ইউরোপ যে সময়ে মধ্যমাদের তামসী রজনীতে নিমগ্ন ছিল, সেই সময় হইতে। তখনকার কাল ছিল মঠধারী সন্ন্যাসী পণ্ডিত-গণের প্রাচুর্য্যকাল। সেই সময়ে, সামান্ত্র-জ্ঞান বিশেষ-জ্ঞানকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া-দিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসনে চড়িয়া বসিল।

সামান্ত্র-জ্ঞানের বিষয়গুলো আবছায়া-রকমের পদার্থ। দেখিলে মনে হয়, একপ্রকার ভূতের নাচ। সেগুলো নির্বিশেষ-শ্রেণীর বস্তু—ফাঁকা বস্তু—বা ককিকা। যেমন—সাধারণ

বৃক্ষ ! বটবৃক্ষ নহে, অশ্বখবৃক্ষ নহে, ওষধি নহে, বনস্পতি নহে, কোনোপ্রকার বিশেষ বৃক্ষ নহে ; অথচ বৃক্ষ ! সাধারণ বৃক্ষ ! নির্বিশেষ বৃক্ষ ! পাশ্চাত্য মধ্যমাকের একদল পণ্ডিত বলিতেন যে, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ যেমন বাস্তবিক পদার্থ, নির্বিশেষ বৃক্ষও ঠিক তেমনি-তরো একটা বাস্তবিক পদার্থ ; ইহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল—বস্তুবাদী Realist । আর-একদল পণ্ডিত বলিতেন—নির্বিশেষ বৃক্ষ একটা মানসিক ভাবমাত্র, তা বই তাহা দৃষ্টমান বৃক্ষের জ্ঞায় বাস্তবিক পদার্থ নহে ; ইহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল ভাববাদী conceptualist । তৃতীয় আর-একদল পণ্ডিত বলিতেন—নির্বিশেষ বৃক্ষ দৃষ্টমান বৃক্ষের জ্ঞায় বাস্তবিক পদার্থও নহে, মনঃকল্পিত আশ্রয়বৃক্ষের জ্ঞায় মানসিক ভাবও নহে । নির্বিশেষ বৃক্ষ শুধুই-কেবল একটা নাম । ইহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল নামবাদী । তিনদল পণ্ডিত পরস্পরের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে দাঁড়াইলেন—

(১) বস্তুবাদীর দল,

(২) ভাববাদীর দল,

(৩) নামবাদীর দল ।

সামান্য-জ্ঞানের রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল । যেমন কর্ত্ত তেমনি ফল ! বিশেষ-জ্ঞান সামান্য-জ্ঞানের সহোদর ভ্রাতা । সামান্য-জ্ঞান আপনার সেই ভ্রাতাটিকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে ! এ পাপের ফল হাতে-হাতে কলিবে, তাহাতে আর আশ্রয় কি ? সামান্য-জ্ঞানের রাজ্য এখন রসাতলে বাইবার উপক্রম হইতেছে, সেই দুখ্য সময়টিতে বেকন্

জয়গ্রহণ করিলেন । বেকন্ বিশেষ-জ্ঞানকে জিতাইয়া দিলেন । বেকনের লেখনীর চোটে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সামান্য-জ্ঞান বেকনের শরণ যাজ্ঞা করিলেন । বেকন্ ছই ভ্রাতাকে ডাকিয়া আপনাদের মধ্যে রাজ্য আধাআধি ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিলেন । বিশেষ-জ্ঞানের ভাগে পড়িল ব্যবহারিক সত্য ; সামান্য-জ্ঞানের ভাগে পড়িল পারমার্থিক সত্য । ছই ভ্রাতার ছই পৃথক্ রাজ্য হইল বটে, কিন্তু ছই রাজ্যের সীমা-নির্দেশ লইয়া দৌহার মধ্যে বিবাদ বাড়িল বই কমিল না । সজ্জনপ্রেষ্ঠ কান্ট ছই রণোত্তর ভ্রাতার মাঝখানে পড়িয়া বিবাদ মিটাইতে গেলেন ; লাভের মধ্যে হইল কেবল—ছই দিক্ হইতে গোচাধুঁচি পাইয়া বিবাদ-নলের চতুর্গুণ প্রজ্বলন । একা-বীর কান্ট কি করিবেন ! তাঁহার দোষ নাই ! তিনি ছিলেন হাড়ে-হাড়ে সত্যপ্রিয়—বিবাদপ্রিয় আদবেই না । তিনি দেখিলেন যে, আসলে ছই দলের মধ্যে বিবাদের কোনো কারণ নাই । দেখিলেন যে, একই-সত্যের একদল পণ্ডিত দেখিতেছেন এ-পৃষ্ঠ, আর-একদল পণ্ডিত দেখিতেছেন ও-পৃষ্ঠ । তারতবাসী হিমালয়ের দক্ষিণ-পৃষ্ঠের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতেছে, ইহাই হিমালয় ; তিরুত-বাসী হিমালয়ের উত্তর-পৃষ্ঠের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতেছে, ইহাই হিমালয় । কিন্তু হিমালয়ের ছই পৃষ্ঠ কিছু-আর ছই হিমালয় নহে । হিমালয়ের ছই পৃষ্ঠ একই হিমালয়ের ছই পৃষ্ঠ । হইলে হইবে কি—সারা-ইউরোপ ডেববুড়ির প্রধান কটলা-হান । একা-বীর, কান্ট, ক-দিক্ নামলাই-

বেন ? দেবানুগ্রহে কাণ্টের মনোমধ্যে অভেদ-জ্ঞানের অন্ধুর গজাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা বাড়িতে পাইল না। চারিদিকের ভেদবুদ্ধির কাঁটা-বনের পাল্লায় পড়িয়া তাহা মাথা তুলিতে-না-তুলিতেই কণ্টকাবাত্তে মুসড়িয়া পড়িল। কাণ্টের আসল ভিতরের কথাটি যে কি, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ-জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্ত-জ্ঞান কীকা, তথৈব, সামান্ত-জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ-জ্ঞান অন্ধ। পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রে প্রজ্ঞার একটা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে স্বাভাস্তরা। সত্য-ভরা জ্ঞানই জ্ঞান ; তা বই, ফাঁকা-জ্ঞানও যেমন, অন্ধ-জ্ঞানও তেমনি, দুইই অজ্ঞানেরই নামান্তর। তবেই হইতেছে যে, বিশেষ-জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্ত-জ্ঞান জ্ঞানই নহে ; তথৈব, সামান্ত-জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ-জ্ঞান জ্ঞানই নহে। কাণ্ট এটা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, কাগচের যেমন দুই পৃষ্ঠ—জ্ঞানেরও তেমনি দুই পৃষ্ঠ। একপিট-ওয়ালা কাগচও অসম্ভব, একপিট-ওয়ালা জ্ঞানও অসম্ভব। কিন্তু হইলে হইবে কি—কাণ্টের মনোমধ্যে যখন অভেদজ্ঞান মাথা তুলিয়াছে, তাহার পর-ফলেই ভেদবুদ্ধির শিলাঘটিতে তাহা ধরা-বলুণ্ডিত হইয়াছে। তার সাক্ষী—

অভেদ-জ্ঞানের উদ্দেশ্য।

“The understanding cannot see, the senses cannot think ; by their union only can knowledge be pro-

duced.—বুদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয় চিন্তা করিতে পারে না ; দুয়ের ঐক্যসংগ্রেহেই জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবে।

ভেদবুদ্ধির আক্রমণ।

But this is no reason for confounding the share which belongs to each in the production of knowledge. On the contrary, they should always be carefully separated and distinguished.—জ্ঞান যদিচ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দুয়ের সংযোগাত্মক ঐক্যের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া দোহার (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির) দুই পৃথক্ শ্রেণীর কার্যকারিতাকে একসঙ্গে জড়াইয়া থিচুড়ি পাকাইবার কোনো কারণ নাই, পরস্তু জ্ঞানের উৎপাদনে কাহার কিরূপ কার্যকারিতা, তাহা পৃথক্ করিয়া অবধারণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।

বলা বাহুল্য যে, কাণ্ট শ্বেষোক্তপ্রকার অদ্বৈতবাদে অর্থাৎ দুয়ের দুইতরো কার্যকারিতার পার্থক্য-সাধনে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা পারিবেন ? তিনি তো আর সিদ্ধপুরুষ নহেন। এ কথা খুবই ঠিক যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না ; কিন্তু সেই তালির উৎপাদনে দুই হাতের কাহার কিরূপ কার্যকারিতা, তাহা তালি-ধ্বনির মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। কাণ্ট বলিয়াছেন—জ্ঞানের মূল উপাদান দুই ভাগে বিভক্ত—দেশকালের বৈচিত্র্য এবং সংবিতের যোগপ্রধান একত্ব। Synthetic unity of apperception। তাহার মধ্যে দেশকালের বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়ের

দেওয়া, আর, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে এক নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিস্তৃত হইয়া সংবিতের একত্র প্রতিপাদন করে, সেই “যোগসূত্রটা” বুদ্ধির দেওয়া। কাণ্ট দেশকালের বৈচিত্র্যকে ইন্দ্রিয়ের কটিকে আটক করিয়া রাখিবার মানসে সেই প্রবল অশ্বটাকে বুদ্ধিক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া রাখিতে কত-না চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত অশ্বটা কিছুতেই বাগ মানিল না। কাণ্টের অভিপ্রায়-মতে দেশকাল গোড়ায় ছিল form of the senses ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-ক্ষেত্র, চরমে হইল pure intuition বুদ্ধিবৃত্তির অধ্যবসায়-ক্ষেত্র। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কাণ্ট ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যথেষ্ট—কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এই এই স্থলে কাণ্ট ভেদ-বুদ্ধির পক্ষ গ্রহণ করিয়া অভেদজ্ঞানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; আর, সেই দোষেই অন্তান্ত স্থলে তিনি ভেদবুদ্ধিকে পরাজয় করিয়া প্রকৃত সত্যে পৌছিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অভীষ্টফলে বঞ্চিত হইয়াছেন।

ভেদবুদ্ধি ভাল বই মন্দ নহে; কেন না, গোড়ায় তাহা আবশ্যক। কিন্তু তাহা যে-ক্ষেত্রে যে-পরিমাণে আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে ভাল, তাহার অধিক পরিমাণে ভাল নহে। তা ছাড়া, তাহা গোড়ায় ভাল, কিন্তু চরমে ভাল নহে। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করিয়া অভেদ-জ্ঞানে উত্থান করিতে হইবে—এটা যখন স্থির, তখন কাজেই সোপানের ব্যবস্থা-পারিপাট্যের অন্ত

ভেদবুদ্ধি খুবই ভাল। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করা ভাল, কিন্তু গম্যস্থান করা ভাল নহে। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ বা কলকারখানার যুগ বা কলীয় যুগ বা কলিযুগ এ-যাবৎ-কাল উন্নতি-লাভ করিয়া আসিয়াছে; এক্ষণে, ভেদ-বুদ্ধিকে গম্যস্থান করিয়া হর্গতির দিকে পদ-নিষ্ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধুনা-তন সুসভ্যসম্মত সমাজে উচ্চ-নাচের প্রভেদ, ধনি-দরিদ্রের প্রভেদ, পণ্ডিত-মূর্খের প্রভেদ, আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিকের প্রভেদ, মাতা ছাড়াইয়া সপ্তমে উঠিয়াছে। এ প্রভেদ মিথ্যা এবং কৃত্রিমতার বালির বাঁধের উপরে নির্লজ্জভাবে মাথা উঁচা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ-সভ্যতা গিয়াছে, কাক্সিক-সভ্যতা (chivalric সভ্যতা) গিয়াছে, এক্ষণে আসিয়াছে বৈশ্ব-সভ্যতা (Mercantile সভ্যতা)। ইহার পরে হয় তো আসিবে শূদ্র-সভ্যতা—সেই পামরিগী সভ্যতা, বাহার মূল মন্ত্র হ’চ্ছে শক্তের দাসত্ব এবং অশক্তের উপরে প্রভুত্ব। তাহার পরে পূর্ব্বদিকে যখন ব্রাহ্মণ-সভ্যতার অরুণ-জ্যোতি দেখা দিবে, তখন কলির রাত্রি পোহাইবে—ইহা বিধির লিখন। বলিগাম “ব্রাহ্মণ-সভ্যতা”। পাঠক হয় তো মনে করিবেন যে, মনুষ্য আশঙ্কের সভ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই বল হইতেছে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা। পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন—মুলেই না! মনুষ্য সময়ে ব্রাহ্মণ-সভ্যতার অন্তিমদশা খনইয়া আসিয়াছিল, তাহা অব্রাহ্মণোচিত বিধানব্যবস্থাতেই সপ্রকাশ। শূদ্রের প্রতি “মর্মান্তিক” বিবেচ্য ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ নাই। শূদ্রের কর্ণে বেদ:

মন্ত্র প্রবেশ করিলে দ্রবীভূত তপ্ত শীবা দিয়া কর্ণে ছিপি আঁটিয়া-দেওয়া দোদণ্ডপ্রতাপ রাজার বিধ্বন হইতে পারে—কিন্তু তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান হইতে পারে না। যখন সরস্বতীনদীর মুখে অবস্ফুৰ্ত্তন ছিল না—যখন জাতিভেদ রাজশাসনের আজ্ঞাধীন ছিল না—যখন পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতবাদ-দ্বৈতবাদ, সাকারবাদ-নিরাকারবাদ প্রভৃতি বাদাবাদ এবং মতামতের সংগ্রামক্ষেত্র ছিল না, পরন্তু সৰ্বলোকের মঙ্গল-কামনার উৎস ছিল—সেই সময়ে যে এক দেবপুত্রীয় সভ্যতা ব্রহ্মাবর্তের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি যে, রাত্রি পোহাইবার সময় পূর্বে তাহা উদয়াচলে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, এবং রাত্রি পোহাইলে আবার তাহা উদয়াচলে অভ্যুত্থান করিবে।

এখনকার কালের রাক্ষসী সভ্যতা ভেদ-বুদ্ধির বালির বাঁধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সভ্যতা কল-কারখানার সভ্যতা; দয়া-ধর্মের সভ্যতা নহে, মনুষ্যত্বের সভ্যতা নহে। ভেদবুদ্ধি সোপানমাত্র : তা বই, তাহা গম্যস্থান নহে। অভেদ-জ্ঞানই গম্যস্থান। কিন্তু ভেদবুদ্ধি এক্ষণে সোপান হইয়াই সন্তোষ মানিতেছে না; ভেদবুদ্ধি এক্ষণে আপনাকে গম্যস্থান এবং আদর্শ করিয়া দাঁড় করাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; মরিবার পূর্বে মরণ-কামড় দিবার জন্ত বিকট দশন বাহির করিতেছে। সর্বনাশকের দলবল (Nihilistএর দলবল) গোকুলে বাড়িতেছে। এ সভ্যতা মায়ীচর্যাক্রমের মাতা মরীচিকা; বৈহ্যাতী তন্ত্রী মায়ামুগ্ধ; রেলগাড়ি পুস্পক-

বিমান। প্রকৃত সভ্যতা হ'চ্ছেন মনুষ্যত্ব-রূপিণী সীতাদেবী। সে সীতাদেবী এক্ষণে কোথায়? তাঁহার পরিত্যক্ত অলঙ্কার ভারতের পর্কতে-প্রান্তরে, অরণ্যে-নগরে, গ্রামে-পল্লীতে ধূলায় পড়িয়া কাদিতেছে। রেলগাড়িতে চড়িয়া দ্রুতগমনের জন্ত অথবা বৈহ্যাত আলোকে রাত্রিকে দিন করিবার জন্ত কিছু-আর মনুষ্য সৃষ্ট হয় নাই! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব যদি গেল; দয়াধর্ম গেল—সত্য গেল—স্বার্থ গেল—ক্ষমা গেল; অর্থলোলুপত্ব এবং নীচত্ব যদি সভ্যতার আদর্শ-পদবীতে নিশান তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত না হইল; তবে বৈহ্যাতী তন্ত্রীতেই বা কি হইবে, রেলগাড়িতেই বা কি হইবে! সংবাদপত্র-সহস্রের মিথ্যা-গর্ভোক্তি রাক্ষসী সভ্যতাকে দৈবী সভ্যতা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে—Devilizationকে Civilization করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে; কিন্তু তাহা করিয়া লাউ কি? সত্য কি এতই লঘু-সামগ্রী যে, তাহা সংবাদপত্রের উল্লসিত মিথ্যার ঝঞ্ঝাবায়ুতে উড়িয়া যাইবে!

প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য, তাহা এই—ভেদবুদ্ধি খুবই ভাল যদি তাহা সোপান হইয়াই ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু যদি তাহা গম্যস্থানের উচ্চশিখরে ঝাঁড়াইয়া আপনাকে আদর্শরূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহা ভয়ানক কালকূট। প্রসঙ্গক্রমে এবারে কতকগুলি মনের আক্ষেপ লেখনীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বারাস্তরে স্মরণশরীর হইতে কারণশরীরে—বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে প্রয়াণ করিবার পন্থা অব্বেষণ করা যাইবে।

ঐবিজ্ঞাননাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

জননী-জীবন ।—শ্রীবিপ্রদাস মুখো-
পাধ্যায় প্রণীত । মূল্য ৯/০ দশ আনা মাত্র ।

অসাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞ নেপোলিয়ন বলিভেন, ফ্রান্সের মঙ্গল ও গৌরবের জন্তু স্ফূর্ততার স্বায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নহে । শুধু ফ্রান্স বলিয়া কেন, সকল দেশ, সকল সমাজের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য । শৈশবের শিক্ষা মাতার উপরই নির্ভর করে, এবং শৈশবের শিক্ষাই সকল শিক্ষার মূল । সেই সময়ে যে বীজ উগ্ঠ হয়, তাহার ফল জীবন-ব্যাপী, জীবনান্তস্থায়ী । সুতরাং সমাজমাত্রেয়ই মঙ্গলের জন্তু স্ফূর্তনীর যেমন প্রয়োজন, এমন প্রয়োজন আর কিছুই নহে । কেমন করিয়া স্ফূর্তনা হইতে হয়, কেমন করিয়া শিশুপালন করিতে হয়, কোন্ কোন্ বিষয়ে সতত সাবধান হইতে হয়, স্নেহাধিক্যবশত জননীগণ কি কি ভুল সচরাচর করিয়া থাকেন, এই সকল এবং এইরূপ বিষয়ের অনেক সহপদেশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সুতরাং পুস্তকখানি যে স্ত্রীলোক-মাত্রেয়ই পাঠ্য, এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে । ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, কিন্তু কতকটা শিথিলতা পরিদৃষ্ট হয় । তবে, এমনও হইতে পারে যে, পুস্তকখানি স্ত্রীলোক-দিগের জন্তু লিখিত বলিয়া খানিকটা অনাবশ্যক বিস্তার গ্রন্থকার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ।

হুই-এক-স্থলে অসঙ্গতিদোষ দৃষ্ট হয় ।

“কমলের মধু খেয়ে মন যার ভুলে ।

সে কি আর উড়ে যার শিমুলের ফুলে ?”

এই প্রকার পুস্তকে এরকম কবিতা সাজে না । গ্রন্থকার যে হিসাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কবিতার অর্থ তাহা নহে ।

অশ্রুধারা । শ্রীঅম্বকুলচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায় প্রণীত । মূল্য ১০/০ ছয় আনা মাত্র ।

কেহ কেহ জীবিতাবস্থাতেই নিজের সমাধি-প্রস্তর-লিপি লিখিয়া রাখেন । পত্নী জীবিত থাকিতেই তাহার তিরোভাব কল্পনা করিয়া অম্বকুলবাবু বিরহের কান্নাটা কাঁদিয়া রাখিলেন । অবশ্যকরীয় কাজ বেলাবেলি সারিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য । কি জানি, যদি অতঃপর তেমন সুযোগ না-ই ঘটে । অম্বকুলবাবু যে দূরদর্শী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

‘গ্রন্থকারের নিবেদনে’ প্রকাশ, তাহার কোন বন্ধু এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহাকে পুস্তক প্রকাশের জন্তু অম্ব-
রোধ করিয়া বলেন—“আপনার গৃহলক্ষ্মী আপনার গৃহে এখনও সশরীরে বিরাজমানা । জ্বর না করুন, তিনি যদি আপনার পুর্বে পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন, তিনি জীবিত অবস্থায় তাহা আনিতে পারিয়া আপনার আদরের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন ।” আহা, তাই হোক । গ্রন্থরচনার ইহার অধিক সফলতা আর কি হইতে পারে ?

পুস্তকের ভাষা উচ্ছাসের ভাষা বটে; তবে এস্থলে বিরহটা নাকি প্রকৃত নহে, কাল্পনিক, তাই এমন সাধের উচ্ছাসেও কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়—যেন টানিয়া বুনিতে হইয়াছে ।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ।

বঙ্গদর্শন ।

নৌকাডুবি ।

৩০

শ্রান্তির মধ্যে পরের দিন কমলার দিবসারম্ভ হইল । সেদিন তাহার চক্ষে সূর্য্যের আলোক ক্রান্ত, নদীর ধারা ক্রান্ত, তারের তরঙ্গগুলি বহুদূরপথের পথিকের মত ক্রান্ত ।

উমেশ যখন তাহার কাছে সহায়তা করিতে আসিল, কমলা শ্রান্তকণ্ঠে কহিল, “যা উমেশ, আমাকে আজ আর বিরক্ত করিস্ নে !”

উমেশ অল্পে ক্রান্ত হইবার ছেলে নহে । সে কহিল, “বিরক্ত করিব কেন না, বাটুনা পাটিতে আসিয়াছি ।”

সকালবেলা রমেশ কমলার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া স্ফীক্সা করিয়াছিল “কমলা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে ?”

এরূপ প্রশ্ন যে কতখানি অনাবশ্যক ও অসঙ্গত, কমলা কেবল তাহা একবার প্রবল গ্রীবা-আন্দোলনের দ্বারা নিরন্তরে প্রকাশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল ।

রমেশ বৃষ্টি, সমস্তা-ক্রমশঃ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে । অতিশীঘ্রই ইহার একটা শ্বেব-মীমাংসা হওয়া আবশ্যক । হেমলিনীর সঙ্গে একবার স্পষ্ট বোঝাপড়া

হইয়া গেলে কর্তব্যনির্ধারণ সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল । কিন্তু রমেশের নিকট এখন তাহাদের বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ । সে বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারে উদ্ধতস্বভাব যোগেনের সঙ্গে একটা প্রবল বাগবিতণ্ডা ও অপমানের সম্ভাবনা মনে পড়িলে রমেশের সমস্ত চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ রমেশ কল্পনা করিয়া লইয়াছে, সে বাড়ীতে এখন তাহার স্বপক্ষে কেহই নাই—থাকিবার কথাও নয়—রমেশের ব্যবহারে সন্দেহ না করিবে, এমন আশা শিশুর কাছেও করা যায় না । এমন জায়-গায় সমস্ত বিরোধের সূত্রে নিজের জোরে অসঙ্কোচে গিয়া দাঁড়াইবে, রমেশের সেরূপ প্রকৃতিই নয় ।

তাই সে হেমলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, দেখানা আর একবার পড়িয়া দেখিল । পছন্দ হইল না—ইহার মধ্যে জোর নাই—হতাশের হাল ছাড়িয়া দিবার ভাবেই লেখা । রমেশ যখন নিরপরাধ, তখন হেমলিনীর তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—ইহার অস্তথা হইতেই পারে না । এ বিশ্বাস পাইবার যখন তাহার অধিকার আছে, তখন

সমস্ত বিরোধের, সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণের
মুখে তাহাকে এ বিশ্বাস যুদ্ধ করিয়া জয়
করিয়া লইতে হইবে। হেমনলিনী যদি
তাহাকে ভাল না বাসে, না বাসুক; যদি
ইতিমধ্যে তাহাকে সন্দেহ করিয়া, ঘৃণা করিয়া
হেমনলিনী আর কাহারো সহিত বিবাহের
প্রস্তাবে সম্মত হইয়া থাকে, তা হউক; কিন্তু
একবার তাহাকে সব কথা শুনিতেই হইবে,
তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, তাহার
পরে হইলেন যে যাহার আপন আপন পথ
নির্ধাচন করিয়া লইবে।

এই বলিয়া রমেশ আবার চিঠি লিখিতে
বসিল। একবার লিখিতেছে, একবার
কাটিতেছে, এমন-সময়—“মহাশয়, আপনার
নাম?”—“তিনি চমকিয়া মুখ তুলিল।
দেখিল, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ত্রৈলোক্য, পাকা
গোঁক, ও মাথার সামনের দিক্টার পাংলা
চুলে টাকের আভাস লইয়া সম্মুখে উপস্থিত।
রমেশের একান্ত নিবিষ্ট চিত্তের মনোযোগ
চিঠির চিন্তা হইতে অকস্মাৎ উৎপাটিত হইয়া
ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

“আপনি ব্রাহ্মণ? নমস্কার। আপনার
নাম রমেশবাবু—সে আমি পূর্বেই খবর
লইয়াছি—তবু দেখুন, আমাদের দেশে নাম-
জিজ্ঞাসাটা পরিচয়ের একটা প্রণালী। ওটা
ভদ্রতা। আজকাল কেহ কেহ ইহাতে
রাগ করেন। আপনি যদি রাগ করিয়া
থাকেন ত শোধ তুলুন! আমাকে জিজ্ঞাসা
করুন, আমি নিজের নাম বলিব, বাপের
নাম বলিব, পিতামহের নাম বলিতে আপত্তি
করিব না।”

রমেশ হাসিয়া কহিল—“আমার রাগ এত

বেশি ভয়ঙ্কর নয়, আপনার একবার নাম
পাইলেই আমি খুসি হইব।”

“আমার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী।
পশ্চিমে সকলেই আমাকে ‘খুড়ো’ বলিয়া
জানে। আপনি ত হিম্মতি পড়িয়াছেন?
ভারতবর্ষে ভরত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা—
আমি তেমন সদন্ত পশ্চিমমুন্স্কের চক্রবর্তী
খুড়ো। এখন পশ্চিমে যাইতেছেন, তখন
আমার পরিচয় আপনার অগোচর থাকিবে
না। কিন্তু মশায়ের কোথায় যাওয়া
হইতেছে?”

রমেশ কহিল—“এখনো ঠিক করিয়া
উঠিতে পারি নাই।”

ত্রৈলোক্য। আপনার ঠিক করিয়া
উঠিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু জাহাজে উঠিতে ত
দেরি সহ্য নাই।”

রমেশ কহিল—“একদিন গোয়ালন্দে
নামিয়া দেখিলাম, জাহাজে বাণী দিয়াছে।
তখন এটা বেশ বোঝা গেল, আমার মন স্থির
করিতে যদি-বা দেরি থাকে, কিন্তু জাহাজ
ছাড়িতে দেরি নাই। সুতরাং যেটা তাড়া-
তাড়ির কাজ, সেইটেই তাড়াতাড়ি সারিয়া
ফেলিলাম।”

ত্রৈলোক্য। নমস্কার মহাশয়! আপনার
প্রতি আমার ভক্তি হইতেছে। আমাদের
সঙ্গে আপনার অনেক প্রভেদ। আমরা
আগে মতি স্থির করি, তাহার পরে জাহাজে
চড়ি—কারণ আমরা অত্যন্ত ভীক্সবাব।
আপনি যাইবেন, এটা স্থির করিয়াছেন, অথচ
কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করেন নাই,
এ কি কম কথা! পরিবার সঙ্গেই
আছেন?

‘হাঁ’ বলিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রমেশের মুহূর্তকালের জ্ঞান খটকা বাধিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া চক্রবর্তী কহিলেন—“আমাকে মাপ করিবেন—পরিবার সঙ্গ আছেন, সে থবরটা আমি বিশ্বস্তহস্তে পূর্বেই জানিয়াছি। বোমা ঐ ঘরটাতে রাখিতেছেন, আমিও পেটের দায়ে রান্নাঘরের সন্ধানে সেইখানে গিয়া উপস্থিত। বোমাকে বলিলাম, ‘না, আমাকে দেখিয়া সঙ্কোচ করিও না—আমি পশ্চিমমুখকের একমাত্র চক্রবর্তী-খুড়ো।’ ‘আহা, না যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।’ আমি আবার কহিলাম, ‘না, রান্নাঘরটি যখন দখল করিয়াছি, তখন অন্ন হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে না, আমি নিঃস্বপ্না।’ মা একটুখানি মধুর হাসিলেন, বুঝিলাম প্রসন্ন হইয়াছেন, আজ আর আমার ভাবনা নাই। পাক্কিতে শুভক্ষণ দেখিয়া প্রতিবারই তা বাতির হঠ, কিন্তু এমন সৌভাগ্য ফিরাবে ঘটে না। আপনি কাজে আছেন, আপনাকে আর বিরক্ত করিব না। যদি অহুমতি করেন ত বোমাকে একটু সাহায্য করি। আমরা উপস্থিত থাকিতে তিনি পড়াহস্তে বেড়ি ধরবেন কেন? না না, আপনি লিখুন—আপনাকে উদ্বিগ্ন হইবে না। আমি বুড়ো-দুঃস্থ, আমি পরিচয় করিয়া লইতে জানি।”

এই বলিয়া চক্রবর্তী খুড়া বিদায় হইয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গিয়াই কহিলেন, “চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে—ঘট্টা যা হইবে, তা মুখে তুলিবার পূর্বেই বুঝা যাউতেছে। কিন্তু অন্নলটা আমি রাখিব না—পশ্চিমের গল্পমে যাহারা বাস না করে, অন্নলটা তাহারা ঠিক দরদ দিয়া রাখিতে

পারে না! তুমি ভাবিতেছ—বুড়াটা বলে কি—কৈতুল নাই, অন্নল রাখিব কি দিয়া? কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে কৈতুলের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। একটু সবর কর, আমি সমস্ত জোঁগাড় করিয়া আনিতেছি।”

বলিয়া চক্রবর্তী কাগজে-মোড়া একটা ভাঁড়ে কানুন্দি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কহিলেন, “আমি অন্নল যা রাখিব, তা আজকের মত থাইয়া বাকিটা তুলিয়া রাখিতে হইবে, মজিতে ঠিক চারদিন লাগিবে। তার পরে একটুখানি মুখে তুলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে, চক্রবর্তী খুড়ো দেখাকও করে বটে, কিন্তু অন্নলও রাখে। যাও মা, এবার যাও, মুখহাত ধুইয়া লওগে! বেলা অনেক হইয়াছে। রান্না বাকি যা আছে, আমি শেষ করিয়া দিতেছি। আগুনের তাতে মা’র মুখ যে একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিছু সঙ্কোচ করিও না—আমার এ সমস্ত অভ্যাস আছে মা—আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল—তাহারই অল্পটি সারাইবার জ্ঞান অন্নল রাখিয়া আমার হাত পাকিয়া গেছে। বুড়ার কথা শুনিয়া হাসিতেছ—কিন্তু ঠাট্টা নয় মা, এ সত্য কথা।”

কমলা হাসিমুখে কহিল, “আমি আপনার কাছ থেকে অন্নল-রাধা শিখিব।”

চক্রবর্তী। ওরে বাস্কে! বিজ্ঞা কি এত সহজে দেওয়া যায়! একদিনেই শিখাইয়া বিজ্ঞার গুমর যদি নষ্ট করি, তবে বীণাপাণি অপ্ৰসন্ন হইবেন। ছাচরদিন এ বৃদ্ধকে খোঁসামোদ করিতে হইবে। আমাকে কি করিয়া খুসি করিতে হয়, সে তোমাকে

ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে না—আমি
নিজে সমস্ত বিস্তারিত বলিয়া দিব। প্রথম
দফার আমি পানটা কিছু বেশি খাই, কিন্তু
সুপারি গোটা-গোটা থাকিলে চলিবে না।
আমাকে বলীভূত করা সহজ ব্যাপার না—
কিন্তু মার ঐ হাসি-মুখখানিতে—কাজ অনেকটা
অগ্রসর হইয়াছে। আহা, এমন হাসি ত
আমি কোথাও দেখি নাই! ওরে, তোর
নাম কিরে!”

উমেশ উত্তর দিল না। সে রাগিয়াছিল
--তাহার মনে হইতেছিল, কমলার স্নেহ-
রাজ্যে বৃদ্ধ যেন তাহার সরিক হইয়া-আগিয়া
উপস্থিত হইয়াছে। কমলা তাহাকে মৌন
দেখিয়া কহিল, “ওর নাম উমেশ।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “এ ছোকরাটি বেশ ভাল।
একদমে ইহার মন পাওয়া যায় না, তাহা
স্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু দেখো মা, আমি
তোমাকে লিখিয়া-পড়িয়া দিতে পারি, এর
সঙ্গে আমার বনিবে। কিন্তু আর বেলা
করিয়ে না, আমার রান্না হইতে কিছুমাত্র
বিলম্ব হইবে না।”

কমলা যে একটা শূন্যতা অনুভব করিতে-
ছিল, এই বৃদ্ধকে পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেল।
তাহার প্রথম পরিচয়ের কৃত্তিত স্মিতহাস্ত
দেখিতে দেখিতে সকৌতুক কলহাস্তে পরিণত
হইল।

রমেশও এই বৃদ্ধের আগমনে এখনকার
মত কতকটা নিশ্চিত হইল। সে বুঝিয়াছিল,
কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধটা কমলার
কাছেও প্রেমলিকা হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও
কমলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তবুও রমেশের
ব্যবহারে সে একটা-কি বেতাল-বেহুর অমু-

ভব করিতেছিল—এমন অবস্থায় পরস্পরে
মধ্যে একটা সহজভাব রক্ষা করা উত্তরোত্তর
দুরূহ হইয়া উঠে। প্রথম কয়মান যখন
রমেশ কমলাকে আপনার স্ত্রী বলিয়াই জানিত,
তখন তাহার আচরণ, তখন পরস্পরের বাধা-
বিহীন নিকটবর্তিতা এখনকার হইতে এতই
তফাৎ যে, এই হঠাৎ প্রভেদ বালিকার মনকে
আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। এমন
সময়ে এই চক্রবর্তী আসিয়া রমেশের দিক্
হইতে কমলার চিন্তাকে যদি খানিকটা বিক্ষিপ্ত
করিতে পারে, তবে রমেশ আপনার হৃদয়ের
ক্ষতবেদনার অথও মনোযোগ দিয়া বাঁচে।

“রমেশবাবু!”

“আজ্ঞে!”

“আপনারা বড়লোক—গোলাপজল অব-
শ্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজ্ঞা দেখুন
দেখি, একটু নমুনা আপনার জন্ত আনিলাম
--গন্ধটা কি-রকম?”

গোলাপজলের সম্বন্ধে রমেশের ব্যুৎপত্তি
যে সাধারণের চেয়ে কিছুমাত্র বেশি ছিল, তাহা
নহে, কিন্তু সে বলিল—“বাঃ চমৎকার! এ
কোথায় পাইলেন?”

চক্রবর্তী কহিলেন—“এ আমার নিজের
কারখানায় চোলাই করা। আপনারা ত
নাশ্বের পরিচয় লওয়া আবশ্যক বোধ করেন
না—কাজেই আমাকে নিজের পরিচয় নিজেই
দিতে হয়। আমি গাজিপুর্নে থাকি। সেখানে
আমি গবর্মেন্ট স্কুলে পঞ্চমশ্রেণীতে অঙ্ক
কষাই। কবিরাজিও করি। একটা দোকানও
রাখিয়াছি—তাহাতে বিলাতি জিনিষ থাকে
—সাহেবরা আমাকে ভালবাসে—সবাই
আমার খরিদার। যে বৎসর সুবিধা দেখি,

নিজে কিছু গোলাপজল প্রস্তুত করাইয়া লই। আমার মত লোক, যাহার কোনো যোগ্যতা নাই, তাহারো এমনি পাঁচরকম উপায়ে দিন চলিয়া যাইতেছে। আপনার গোলাপজলের আবশ্যক হইলে আমাকে স্মরণ করিবেন—খাঁটি জিনিষ পাইবেন।”

রমেশ বৃদ্ধকে সাহায্য ও থুসি করিবার জন্তু কহিল—“গোলাপজল নহিলে আমার চলেই নু। অন্তত ছ-বোতল চাই—আপনার সেরা যা আছে—”

বৃদ্ধ চোখ টিপিয়া কহিলেন—“তবে আপনাকে একটা গোপনীয় কথা বলি, আর কাহাকেও ফাঁস করিবেন না। প্রথমশ্রেণীর গোলাপজলের দাম আটটাকা, দ্বিতীয়শ্রেণী চারটাকা, তৃতীয়শ্রেণী দুইটাকা। তিনটেই জিনিষ অবিকল এক—কিন্তু দায়ে পড়িয়া দান তফাৎ করিতে হয়—কারণ জগতে এক-শ্রেণীর নির্কোষ সকলে নয়।”

রমেশ হাসিয়া কহিল—“আমাকে তৃতীয়-শ্রেণীর নির্কোষের দলেই ফেলিবেন—আমি বহুমূল্য নির্বুদ্ধিতার পক্ষপাতী নই।”

চক্রবর্তী কহিলেন—“মাপ করিবেন, অমন কথা বলিবেন না—আপনি যেটাকে বহুমূল্য নির্বুদ্ধিতা বলিলেন, সেটা অশ্রদ্ধার বিষয় নহে। ছটাকার জিনিষ চোখ বুজিয়া যাহারা আটটাকা দিয়া কিনিতে পারে, সেসকল দরাজ মেজাজ রাজা-মহারাজার ঘরেই মেলে। যাহারা ঠকিতে ভয় করে, তাহারাই ঠিকদরে জিনিষ কিনিতে ব্যস্ত। মশায়, দাম কা'কে বলে? কোনো জিনিষের কি দাম আছে? যে বেশি দিতে পারে, সেই বেশি দাম দেয়! ভগবান যদি দিন দিতেন, তবে আপনাকে

সত্যকথা বলিতেছি, আমি প্রথমশ্রেণীর নীচে এক পা নাবিতাম না! বলিব কি মশায়, আমার প্রাণটা বেয়াকুব, পেটের দায়ে নিতান্ত বুদ্ধিমান হইয়া বসিয়া আছি।”

রমেশ হাসিতে হাসিতে কহিল—“বলে নু কি?”

চক্রবর্তী। তা সত্যই বলিতেছি! এই দেখুন না, যে পর্যন্ত বোমাকে দেখিয়াছি—আমার প্রাণ বলিতেছে, সমস্ত কারখানাটা উজাড় করিয়া অন্তত একবার খাঁটি গোলাপজলে মালম্মীকে অভ্যেক্ষন করাইয়া দেউলে হইতে পারিলে জীবন সার্থক হইত। অথচ দেখুন, আপনাকে ছ-বোতল গোলাপজল বারোটাকায় বিক্রি করিবার জন্তু আত্ম-পরিচয় দিয়া উমেদারি করিতে আসিয়াছি। যাই বলুন রমেশবাবু, বোমার মত অমন মিষ্ট হাসিটুকু আমি কোথাও দেখি নাই। কেবল মাকে হাসাইবার জন্তু আজ সকালবেলা হইতে যে কত ভাঁড়ামিই করিয়াছি, তার আর সংখ্যা নাই। বোমার হাসিবারও ক্ষমতা আছে—যা বলি, তাতেই হাসিয়া ওঠেন—তার সেই শাদা হাসিতে আমার মন যেন গঙ্গাজলের ধারায় ধুইয়া যায়।

বলিতে বলিতে স্নেহের আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।

এমন-সময় অদূরে তাহার কাম্রার ঘরের কাছে আসিয়া কমলা দাঁড়াইল। তাহার মনের ইচ্ছা, কস্মিন্দীন দীর্ঘমধ্যাহ্নটা সে চক্রবর্তীকে একাকী দখল করিয়া বসে। চক্রবর্তী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—“না না মা, এটা ভাল হইল না! এটা কিছু-তেই চলিবে না।”

কমলা কি ভাল হইল না, কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য ও কুষ্ঠিত হইয়া উঠিল। বুদ্ধ কহিলেন—“ঐ যে ঐ জুতাটা ! মাঝগি। তোমাদের পা-তুখানিকে বলে চরণকমল, মুচি-বেটার। যদি ঐ চরণ চামড়া দিয়া ঢাকিতে আরম্ভ করে, তবে পরশুরাম এবার কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আর-কিছু করিবেন না। পৃথিবীকে সাতাশবার নিমুচি করিয়া দিবেন, এ আমি নিশ্চয় লিখিয়া-পড়িয়া দিতে পারি ! রমেশবাবু, এটা আপনা-কড়কই হইয়াছে। যা বলেন, এটা আপনারা অধ্যয় করিতেছেন—দেশের মাটিকে এই সকল চরণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, তা' হইলে দেশ মাটি হইবে। রামচন্দ্র যদি সীতাকে “ডসনে”র বুট পরাইতেন, তবে লক্ষণ কি চোন্দবৎসর বনে ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতেন ননে করেন ? কখনই না। আহা ! কেবল ঐ কোমল পাদপদ্মের দিকে চাখিয়াই ত রাজার ছেলের প্রাণটা ভক্তিতে সরস হইয়া ছিল। না, এই বুদ্ধ সম্ভানের এই আন্দারটি রাপিতে হইবে—ঐ পা-তুখানি ঢাকিলে চলিবে না ! এ ত মেমসাহেবের পা নয় যে, লক্ষ্মীর লুকাইবে,—এ যে লক্ষ্মীর চরণ—এ তজের আনন্দের জন্ত, এ মুচির রোজুগানের জন্ত নয় !”

কমলা বড় মুকিলে পড়িয়া গেল। সে পূর্বে কোনোকালে জুতা পরে নাই। রমেশই তাহাকে জুতা পরাইয়াছে। খুশিয়া ফেলিতে পারিলে সে ত বাঁচে—কিন্তু চক্রবর্তীর কাছে চরণের গুণ শুনিয়া সে লক্ষ্মীর তাহার পা-তটি লইয়া কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

চক্রবর্তী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

“জুতা-পরা দেখিলে বড় ভয় হয় না, পাছে হঠাৎ কোন্ একদময়ে দেখিব—ঐ নীপার সিঁদুরটুকুর উপরে একটা টুপি চড়িয়াছে। সত্য বলিতেছি, মাথার উপরে ঐ শাড়ীর ঘের-টুকু না দেখিলে নিজের মাকে বিগাতা বলিয়া ভ্রম হয়।”

লক্ষ্মীর কমলার মুখ ফণকালের জন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। এক দিন রমেশ তাহাকে টুপিও পরাইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যাতার এই শাসন সে অদিকক্ষণ বিরোধার্গ্য করিতে পারে নাই—সেই স্পঞ্জিত টুপিটা কলিকাতাসহরের বহুতর বিস্তৃত পদার্থের সজ্জিত ভিন্নবিভিন্ন অবস্থায় মানিসিপাল-রথযোগে ধাপাব মাঠ-লোক গ্রাস্ত হইয়াছে। পোন্টীর সহিত ক্যাশানের সেই সেদিনকার ফণকালীন বিরোধব্যাপার স্মরণ করিলে আজো কমলার লক্ষ্মী রাপিনার স্থান থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরে থাকিবার সময় দ্বারে পড়িয়া জুতা-পরাটা হাজার অভ্যাস হইয়া গেছে।

কমলার মুখের ভাব দেখিয়া রমেশ মুচ্কিয়া হাসিতে লাগিল। বুদ্ধ কহিলেন—“আমার কথা শুনিয়া রমেশবাবু হাসিতেছেন—মনে মনে ঠিক পড়ক করিতেছেন না ! না করিবারই কথা। আপনারা জাহাজের বাঁশী শুনিতেই আর থাকিতে পারেন না, একেবারেই চড়িয়া বসেন, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছেন, তাহা একবারো ভাবেন না। আমরা সেকালের লোক, কেবলমাত্র বাঁশীর ডাকেই উপকূল-তাগ করি না, আগে গম্য-স্থানটা ঠাহর করিয়া রাখি। হাহুন্—যেন কাঁদিতে না হয়, এই প্রার্থনা করি।

রমেশ হাসিয়া কহিল—“হাসি-জিনিষটা

সবন্ধে খুড়ো-মশায়ের পক্ষপাত আছে, সেটা বেশ দেখা গেল ।”

রমেশের এই কথায় বুদ্ধ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“ঠিক বলিয়াছেন রমেশ-বাবু ! আমার পক্ষপাত আছে—আছে বটে ! ভগবান্ আমাদের মুখে হাসি দিয়া যে একটা মন্ত ভুল করিয়াছেন, গৌফ চাপা দিয়া ঢাকিবার চেষ্টায় সেটা তিনি নিজেই এক প্রকার দাঁকার করিয়াছেন !”

রমেশ কহিল—“খুড়ো. আপনিই না হয় আমাদের গৃহস্থানটা ঠিক করিয়া দিন না । জাহাজের বাঁশটার চেয়ে আপনার পরামর্শ পাকা হইবে ।”

চক্রবর্তী কহিলেন—“এই দেখুন. আপনার বিবেচনাশক্তি এরি মধ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে—অথচ অল্পক্ষণের পরিচয় ! তবে আত্ম. গাজিপুরে আত্ম. না. সেখানে গোলাপের ক্ষেত আছে, আর সেখানে তোমার এই বুদ্ধ ভক্তটাও থাকে । যাবে না গাজিপুরে ?”

রমেশ ও কমলার মুখের দিকে চাহিল । কমলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল । চক্রবর্তী কহিলেন “দেখেছেন রমেশ-বাবু. আর উপায় নাই ! মাতৃস্নেহ জালে মাটিকা পড়িয়াছে ! এখন আমি যদি বলি আমার বাড়ী মক্কায়, মাঝে মক্কায় টানিয়া-পইয়া বাইতে পারি, তা সেখানে গোলাপের ক্ষেত থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হয় ! কেমন, ঠিক কথা কি না ?”

বুদ্ধের উৎসাহে কমলা হাসিতে লাগিল । চক্রবর্তী রমেশের গা টিপিয়া আস্তে আস্তে কানে কানে কহিলেন—“দেখিবেন রমেশ-

বাবু, লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বৌমা আমার হাসিতেছেন—একেবারে কোহিনূর—এ আমি আপনাকে লিখিয়া-পড়িয়া দিতে পারি ।”

কমলার এই অজস্র মাধুর্য্যে রমেশ যে অন্ধ ছিল, তাহা নহে—কিন্তু পরের কাছে তাহার তব শুনিয়া এই মাধুর্য্যের হৃদয়ল্যতা রমেশের মনোবোগকে আজ যেন আরো বেশি করিয়া টানিয়াছে ! কমলার সরল হাসিটুকু যে সুন্দর, তাহা রমেশ পূর্বেই অনেকবার দেখিয়াছে ; তাহাকে কোনো ছুতায় হাসাইতে সে ভালও বাসে, কিন্তু এই বুদ্ধ স্তাবকের চোখ দিয়া এই হাসিকে সে যেন আজ দ্বিগুণ করিয়া দেখিয়া লইল ।

চক্রবর্তী কহিলেন—“মা, এই দরজাটার কাছে দাঁড়াইয়া মনে মনে কি ভাবিতেছেন, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি । বলিব ? মার নিতান্ত ইচ্ছা, এই দুপুর-বেলাটার আমাকে লইয়া ঘরের মধ্যে বসেন—আমাকে লইয়া একটু হাসেন, একটু গল্প করেন । তোমার ও বাড়নাড়া আমি বিশ্বাস করি না । যদি বল, আমি কেমন করিয়া মনের কথা জানিতে পারিলাম. আমরা মন যে ঐ কথাটাই বলিতেছে । তোমরা হাতে একটু সময় পাইলেই একটা কাহাকেও প্রশ্ন দিয়া মাটি না করিয়া থাকিতে পার না । ছোট ছেলে যদি নিতান্ত কোলের কাছে না থাকে, তবে আমার বয়সের এক-আধটা অর্ধাঙ্গীন থাকিলেও উপস্থিতির মত কাজ চলিয়া যায় । রমেশবাবু, একটু মাপ করিবেন—আপনাকে এতক্ষণ অনেক অবুজি ও সংপরাশ দিয়াছি—এখন আমি ছুটি লইব—মা উত্তরোত্তর অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন । কিন্তু মা, পান

একটু বেশি করিয়া সাজা হইয়াছে ত ? মনে আছে ত, তোমার এই কীর্ণদস্ত পোষাটির খুব চিকণ সুপারি না হইলে চলে না। কোথায় রে, উমেশ কোথায় ? শুনে যা, শুনে বা ! তোর খাওয়া হইয়াছে ত ? এখন এখানে মায়ের দরবার বসিবে—সব ক’টি সভাসদ একত্র হওয়া চাই !”

এইরূপে উমেশ এবং চক্রবর্তীতে মিলিয়া লজ্জিত কমলার কামরায় সভাস্থাপন করিল। রমেশ একটা দৌর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরেই রহিয়া গেল। মধ্যাহ্নে জাহাজ ধক্ধক করিয়া চলিয়াছে। শারদরৌদ্ররঞ্জিত ছই তীরের শাস্তিময় বৈচিত্র্য স্বপ্নের মত চোখের উপর দিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ধানের ক্ষেত, কোথাও বা নৌকা-লাগানো ঘাট, কোথাও বা বালুর তীর, কোথাও বা গ্রামের গোয়াল, কোথাও বা গজের টিনের ছাদ, কোথাও বা প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দুটি-চারটি পারের ঘাটী। এই শরৎমধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে কামরার ভিতর হইতে যখন ক্ষণে ক্ষণে কমলার ত্রিধ্ব কোতুক-হাস্ত রমেশের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। সমস্তই কি সুন্দর, অথচ কি সুদূর ! রমেশের আর্ন্ত জীবনের সহিত কি নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন ! বৃদ্ধ চক্রবর্তীর মত একজন অপরিচিত ব্যক্তি, উমেশের মত একজন লক্ষীছাড়া গৃহহীন, ইহারাও আজ এই শরৎমধ্যাহ্নের বিপুল মধুচক্রের একটি নিস্তব্ধ মধুকোষের কাছে নিঃসঙ্কোচে আনন্দে গুণ্ণগুণ্ণ করিতেছে, ইহারাও আজ এই চারিদিকের সামঞ্জস্যের

মধ্যে সুন্দরভাবে যোগ দিয়াছে, এই শাস্তির মধ্যে, মাধুর্যের মধ্যে ইহাদের কোথাও অনধিকার নাই—কিন্তু রমেশ নির্দ্বন্দ্বিত, বহিষ্কৃত ! তাহার ব্যাকুল প্রাণুটা এই চারিদিকের সহিত মিলিয়া এক হইয়া আজিকার এই নিভৃতমধ্যাহ্নে একটি হাসির দ্বারা, শ্রীতির দ্বারা, একটি কল্যাণময়ী মধুরিমার দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্ত কাদিতেছে—আর তাহার কানে আসিতেছে বহুদূর আকাশের চিলের ডাক, ঈমারের চক্রাহত জলের কলধ্বনি এবং কমলার হাস্তকুজিত আনন্দ-কণ্ঠস্বর !

৩১

কমলার এখনো অল্প বয়স—কোনো সংশয়, আশঙ্কা বা বেদনা স্থায়ী হইয়া তাহার মনের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে পারে না। সে এখনো আপন মনের উপরে বুক দিয়া চাপিয়া-পড়িয়া নিজের সুখদুঃখে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তা’ দিবার অভ্যাস লাভ করে নাই। তাই শরতের আকাশের মত তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে কালো মেঘ অশ্রুজলে গলিয়া-পড়িয়া দেখিতে দেখিতে প্রসন্ন হাসির আলোকে মিলাইয়া নির্মল হইয়া যায়।

রমেশের ব্যবহারগত্থকে এ কয়দিন সে আর কোনো চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। শ্রোত বেখানে বাধা পায়, গৈই-খানেই যত আবর্জনা আসিগা জমে—কমলার চিন্তাশ্রোতের সহজ প্রবাহ রমেশের আচরণে হঠাৎ একটা আয়গায় বাধা পাইয়াছিল, সেইখানে আবর্ত রচিত হইয়া নানা কথা বারবার একই জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্তীকে লইয়া হাসিয়া, বকিয়া,

বুঁধিয়া, খাওয়াইয়া কমলার জদয়স্রোত আবার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল—আবর্ত কাটির গেল, বাহা-কিছু জমিতেছিল এবং ঘুরিতেছিল, তাহা সমস্ত ভাসিয়া গেল। সে আপনার কথা আর কিছুই ভাবিল না।

আখিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারি মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহীণপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে একএকটি সরল কনিতার পৃষ্ঠার মত উল্কাইয়া গাইতে লাগিল।

কর্ণের উৎসাহে দিন আরম্ভ হইত। উমেশ আজকাল আর ঈমার ফেল করে না—কিন্তু তাহার বড়ি ভর্তি হইয়া আসে। ক্ষুদ্র ঘরকন্নার মধ্যে উমেশের এই সকালবেলাকার বড়িটা একটা পরম কোতূহলের বিষয়। “এ কিই, এ যে লাউ-ডগা। ওমা, সজনের খাড়া তুই কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিলা? এই দেখ দেখ, খুড়ো-মশায়, টক-পালং যে এই খোট্টার দেশে পাওয়া যায়, তাহা ত আমি জানিতাম না!” বড়ি লইয়া রোজ সকালে একরূপ একটা কলরব উঠে। যেদিন রমেশ উপস্থিত থাকে, সেদিন ইহার মধ্যে একটু বেহুস লাগে—সে চৌর্য সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা উত্তেজিত হইয়া বলে, “বাঃ, আমি নিজের হাতে উহাকে পরস্যা গিয়া দিরাছি!”—

রমেশ বলে—“তাহাতে উহার চুরির—বিধা ঠিক বিজ্ঞ বড়িয়া যায়! পরস্যাটাও চুরি করে, শাকও চুরি করে!”

এই বলিয়া রমেশ উমেশকে ডাকিয়া বলে—“আচ্ছা, হিসাব দে' দেখি!”

তাহাতে তাহার একবারের হিসাবের সঙ্গে আর একবারের হিসাব মেলে না। ঠিক দিতে গেলে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক বেশি হইয়া উঠে। ইহাতে উমেশ লেশমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সে বলে, “আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব, তবে আমার এমন দশা হইবে কেন? আমি ত গোমস্তা হইতে পারিতাম, কি বলেন দাদাঠাকুর?”

চক্রবর্তী বলেন, “পরের পাপের এত স্পন্দ হিসাব যদি আমরা রাখিব, তবে চিত্র-গুপ্ত যমের মাইনে খাইতেছে কিসের জন্ত? রমেশবাবু, আহারের পর আপনি উহার বিচার করিবেন, তাহা হইলে সুবিচার করিতে পারিবেন—আপাতত আমি এই ছোঁড়াটাকে উৎসাহ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। উমেশে, বাবা, সংগ্রহ করার বিছা কম বিছা নয়—অল্প লোকেই পারে। চেষ্টা সকলেই করে—কৃতকার্য কয়জনে হয়? রমেশবাবু, গুণীর মর্যাদা আমি বুঝি। সজনে-খাড়ার সময় এ নয়, তবু এত ভোরে এই বিদেশে সজনের খাড়া কয়জন ছেলে জোগাড় করিয়া আনিতে পারে বলুন দেখি! মশায়, সন্দেহ করিতে অনেকেই পারে—কিন্তু সংগ্রহ করিতে হাজারে একজন পারে!”

রমেশ। খুড়ো, এটা ভাল হইতেছে না, উৎসাহ দিয়া অভায় করিতেছেন।

চক্রবর্তী। ছোঁড়াটা চুরি করিয়াছে কি না, নিশ্চয় জানা নাই, সুতরাং দণ্ড দেওয়া অসম্ভব; কিন্তু ও যে সজনের খাড়া আনি-

রাছে, তাহা একবারে প্রত্যক্ষ, স্মরণ্য উৎসাহ না দিয়া কি করি ! ছেলেটার বিচ্ছেদ বেশি নেই, যেটাও আছে, সেটাও যদি উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় ত বড় আক্ষেপের বিষয় হইবে—অন্ততঃ যে করদিন আমরা ঈমারে আছি। ওরে উমেশ, কাল কিছু নিম্নপাতা জোগাড় করিয়া আনি—যদি উচ্ছেদ পাস, আরো ভাল হয়—মা, স্ক্রুনিটা নিতান্তই চাই—আমাদের আয়ুর্কর্মে বলে—থাক, আয়ুর্কর্মের কথা থাক, এদিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। উমেশ, শাক গুলো বেশ করে' ধুয়ে নিয়ে আয় !

রমেশ এইরূপে উমেশকে লইয়া যতই সন্দেহ করে,—খিটখিট করে, উমেশ ততই যেন কমলার বেশি করিয়া আপনায় হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী তাহার পক্ষ লওয়াতে রমেশের সহিত কমলার দলটি যেন বেশ একটু স্বতন্ত্র হইয়া আসিল। রমেশ তাহার স্বল্প বিচারশক্তি লইয়া একদিকে একা, অন্যদিকে কমলা, উমেশ এবং চক্রবর্তী তাহাদের কর্মসূত্রে, মেহসূত্রে, আমোদ-আহ্লাদের সূত্রে অনিষ্টভাবে এক। এই দলের মধ্যে, আপনাকে মিলাইবার ক্ষমতা রমেশের নাই—সে চিন্তা করে, তর্ক করে, কর্তব্যের মধ্যে, সম্বন্ধের মধ্যে স্বল্প স্বল্প রেখায় গণ্ডী আঁকে, কোনো কার্যগত আপনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিতে পারে না। চক্রবর্তী আসিয়া অবধি তাহার উৎসাহের সংক্রামক উত্তাপে রমেশ কমলাকে পূর্ণাপেক্ষা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছে, কিন্তু তবু দলে মিশিতে পারিতেছে না। বড় জাহাজ যেমন ডাঙার ভিত্তিতে চার, কিন্তু জল কম বলিয়া তাহাকে

তফাতে নোঙর ফেলিয়া দূর হইতে তাকাইয়া থাকিতে হয়, এদিকে ছোট ছোট ডিঙি-পাল্লী-গুলো অনায়াসেই তীরে গিয়া ভিড়ে, রমেশের সেই দশা হইয়াছে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, রাশিরাশি কালো মেঘ দলে দলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস এলোমেলো বহিতেছে। বৃষ্টি এক-একবার আসিতেছে, আবার এক-একবার ধরিয়া-গিয়া রৌদ্রের আভাসও দেখা যাইতেছে। মাৎগঙ্গার আঁচ আর নৌকা নাই, ছ একখানা যা দেখা যাইতেছে, তাহাদের উৎকণ্ঠিত ভাব পট্টব বৃদ্ধা যায়। জলাধিনী মেয়েরা আজ ঘাটে অধিক বিচলিত করিতেছে না। জলের উপরে মেঘবিচ্ছুরিত একটা রক্ত্র আলোক পড়িয়াছে এবং কণে কণে নদীনার এক তার হইতে আর-একতার পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিতেছে।

ঈমার বখানিধমে চলিয়াছে। জ্যোৎস্নার নানা অলংকার মধ্যে কোনমতে কমলার রাধাবাড়া চোখে লাগিল। চক্রবর্তী আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “মা, ওবেলা যাহাতে রাধিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি খিচুড়ি চড়াইয়া দাও, আমি ইতিমধ্যে রুটি গড়িয়া রাখি।”

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে আজ অনেক বেলা হইল। দম্কা হাওয়ার জোর ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। নদী ফেনাইয়া ফেনাইয়া ফুলিতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত গেল কি না, বুঝা গেল না। সকাল-সকাল ঈমার নোঙর ফেলিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন

মেঘের মধ্য হইতে বিকালের পাংশুবর্ণ হাসির মত এক একবার জ্যোৎস্নার আলো বাহির হইতে লাগিল। তুমুলবেগে বাতাস এবং মূলধরুরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

কমলা একবার ভলে ভুঁপিয়াছে—ঝড়ের ঝাপটকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। রমেশ আসিয়া তাকে আশ্বাস দিল—
“ঈশ্বারে কোনো ভয় নাই কমলা। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাওতে পার, আমি পাশের ঘরেই জাগিয়া আছি।”

দ্বাপের কাছে আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন—
“নালঙ্ঘ্য ভয় নাই, ঝড়ের দাপের সাধ্য কি, তোমাকে স্পর্শ করে।”

ঝড়ের দাপের সাধ্য কতদূর, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন, কিন্তু ঝড়ের সাধ্য সে কি, তাহা কমলার অগোচর নাই—সে তাড়াতাড়ি দ্বাপের কাছে গিয়া বাতাসের কহিল “খুড়ো-মশায়, তুমি ঘরে আসিয়া বেস।”

চক্রবর্তী সম্বোধন কহিলেন, “তোমাদের যে এখন শোবার সময় হইল না, আমি এখন—”

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমেশ সেখানে নাই—অশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—“রমেশ-বাবু এষ্ট ঝড়ে গেলেন কোথায়? শাক-চুরি ত তাঁহার অভাদ্য নাই।”

“কে ও, খুড়ো নাকি? এষ্ট যে আমি পাশের ঘরেই আছি।”

পাশের ঘরে চক্রবর্তী উঁকি মারিয়া দেখিলেন, রমেশ বিছানার অন্ধশয়ান অবস্থায় আলো জালিয়া বই পড়িতেছে।

চক্রবর্তী কহিলেন, “বোমা যে একলা ভয়ে সারা হইলেন! আপনার বই ত ঝড়কে

ডরায় না, ওটা এখন রাখিয়া দিলেও অস্তায় হয় না। আহুন এ ঘরে!”

কমলা একটা ছুনিবার আবেগবশে আশ্ব-বিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীর হাত দৃঢ়-ভাবে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—“না, না খুড়োমশায়! না, না।” ঝড়ের কল্লোলে কমলার এ কথা রমেশের কানে গেল না, কিন্তু চক্রবর্তী বিস্মৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রমেশ বই রাখিয়া এ ঘরে উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, “কি চক্রবর্তী-খুড়ো, ব্যাপার কি? কমলা বুঝি আপনাকে—”

কমলা রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “না, না, আমি উঁহাকে কেবল গল্প বলিবার জন্য ডাকিয়া ছিলাম।”

কিসের প্রতিবাদে যে কমলা “না” “না” বলিল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এহ “না”র অর্থ এই যে, যদি মনে কর আমার ভয় ভাঙাইবার দরকার আছে—না, দরকার নাই! যদি মনে কর আমাকে সঙ্গ দিবার প্রয়োজন—না, প্রয়োজন নাই! সে কাহারো কাছ হইতে কোনো আবশ্যক দাবী করিতে রাজি নহে। সে এ কথা নিজে স্পষ্ট বোঝে না, কিন্তু না বুঝিয়াও সকলপ্রকার এক-তরফা সম্বন্ধের বন্ধন দূরে ফেলিয়া দিতে চায়। দরকার যদি ছইপক্ষেরই থাকে, তবে সে দরকারের মধ্যে কোনো দৈন্ত থাকে না—কিন্তু কেবল কমলারই দরকার আছে, আর-কাহারো কোনো দরকার নাই—আর-সকলে বই পড়িবে, সন্ধ্যাবেলায় আকাশে তাকাইয়া বসিয়া থাকিবে, টেবিলে ষাড় গুঁজিয়া আপ-

নার চিন্তা আপনার মধ্যে পরিপাক করিবে—
এ প্রকারের সম্বন্ধ কমলা আপনার সংশ্লিষ্ট
হইতে সবেগে বৃজ্জন করিতে চায়। এ সব
কথা সে এ করদিন ভুলিয়া ছিল, আজ এই
ঝড়ের রাত্রে সমস্ত জাগিয়া উঠিল। বিপ-
দের সময়, বাহাদুরের কোনো সম্বন্ধ নাই,
তাহারাও একত্র হয়, বাহাদুরের সম্বন্ধ আছে
তাহারা—বেশ কথা, তাহারাও যদি স্বতন্ত্র
থাকিতে চায়, তবে কমলা রাত্রে জাগিয়া-
বসিয়া চক্রবর্তী-খুড়ার কাছে গল্প শুনিবে—
কেহ ঘেন না মনে করে, গল্প-শোনা ছাড়া
আর-কাহারো কাছে তাহার আর-কিছু
প্রয়োজন আছে! না, না, কিছুতেই
না!

পরক্ষণেই কমলা কহিল, “খুড়ামশায়,
রাত হইয়া বাইতেছে, আপনি শুইতে যান,
একবার উমেশের খবর লইবেন, সে হয় ত
ভয় পাইতেছে!”

দয়জার কাছ হইতে একটা আওয়াজ
আসিল, “মা, আমি কাহাকেও ভয় করি
না।”

উমেশ মুড়িমুড়ি দিয়া কমলার দ্বারের
কাছে বসিয়া আছে। কমলার হৃদয় বিগ-
লিত হইয়া গেল—সে তাড়াতাড়ি বাহিরে
গিয়া কহিল, “ইয়ারে উমেশ, তুই এই ঝড়-জলে
ভিজিতেছিস কেন? লম্বীছাড়া কোথাকার,
বা, খুড়ামশায়ের সঙ্গে শুইতে যা!”

কমলার মুখে লম্বীছাড়া-সম্বোধনে উমেশ
বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া চক্রবর্তী-খুড়ার সঙ্গে
শুইতে গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, “যতক্ষণ না ঘুম
আসে, আমি বসিয়া গল্প করিব কি?”

কমলা কহিল, “না, আমার ভারি ঘুম
পাইয়াছে।”

রমেশ কমলার মনের ভাব যে না বুঝিল,
তাহা নয়, কিন্তু সে আর বিরক্তিকর করিল না—
কমলার অভিমানক্লম্ম মুখের দিকে তাকাইয়া
সে ধীরে, ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিছানার মধ্যে স্থির হইয়া ঘুমের অপে-
ক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পারে, এমন শান্তি
কমলার মনে ছিল না। তবু সে জোর
করিয়া শুইল। ঝড়ের বেগের সঙ্গে জলের
কল্লোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। খালাসিদের
গোলমাল শোনা বাইতে লাগিল। মাঝে
মাঝে এঞ্জিনবরে সারেঙের আদেশস্বর
বশতী বাজিয়া উঠিল। প্রবল বায়ুবেগের
বিরুদ্ধে জাহাজকে স্থির রাখিবার জন্ত নোঙর-
বাধা অবস্থাতেও এঞ্জিন ধীরে ধীরে চলিতে
থাকিল।

কমলা বিছানা ছাড়িয়া, কামরার বাহিরে
আসিয়া দাঁড়াইল। কণকালের জন্ত বৃষ্টির
বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবদ্ধ
জন্তর মত চীৎকার করিয়া দিথিদিকে ছুটিয়া
বেড়াইতেছে। মেঘসমূহও গুরুচতুর্দশীর
আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমুষ্টি
অপরিমুতভাবে প্রকাশ করিতেছে! তীর
স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না, নদী ঝাপসা দেখা
বাইতেছে, কিন্তু উজ্জৈ-নিম্নে, দূরে-নিকটে,
দৃশ্য-অদৃশ্য একটা মুঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ
আন্দোলন যেন অকুতমুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া
ঘমরাহের উজ্জতধ্বজ কালো মহিষটার মত
মাথা-ঝাঁক দিয়া-দিয়া উঠিতেছে।

এই পাগল রাজি, এই আকুল আকাশের
দিকে চাইয়া কমলার বুকের ভিতরটা যে

তুলিতে লাগিল, তাহা ভয়ে কি আনন্দে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে, তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বপ্ন সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকেও বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা কমলার হৃদয়-বেগেরই মত অব্যক্ত। একটা কোন অনির্দিষ্ট, অমূর্ত মিথ্যার, স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্নবিছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশপাতালে এই মাতামাতি, এই যৌবগর্জিত ক্রন্দন! পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল “না” “না” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিলীধরাজে ছুটিয়া আসিতেছে—একটা কেবল প্রেতও অস্বীকার!—কিসের অস্বীকার? তাহা নিশ্চয় বলা যায় না—কিন্তু না, কিছুতেই না, না, না, না!

৩২

পরদিন প্রাতে ঝড়ের বেগ কিছু কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে থামে নাই—নোঙর তুলিবে কি না, এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই, উদ্বিগ্নমুখে আকাশের দিকে তাকাইতেছে।

সকালেই চক্রবর্তী রমেশের সন্ধানে কমলার পাশের কামরায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রমেশ তখনো বিছানায় পড়িয়া আছে, চক্রবর্তীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ঘরে রমেশের শয়নাবস্থা দেখিয়া চক্রবর্তী গতরাত্রির ঘটনার সঙ্গে

মনে মনে সমস্তটা মিলাইয়া গইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল রাত্রে বুঝি এই ঘরেই শোওয়া হইয়াছিল?”

রমেশ এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া কহিল—“এ কি হর্বোগ আরম্ভ হইয়াছে! কাল রাত্রে খুড়োর ঘুম কেমন হইল?”

চক্রবর্তী কহিলেন, “রমেশবাবু, আমাকে নির্বোধের মত দেখিতে, আমার কথাবার্তাও সেই প্রকারের, তবু এই বয়সে আমাকে অনেক দুরূহ বিষয়ের চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলোর মীমাংসাও পাইয়াছি—কিন্তু আপনাকে সব চেয়ে দুরূহ বলিয়া ঠেকিতেছে!”

মহর্ষের জন্ত রমেশের মুখ দ্বিধা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আশ্বাসবরণ করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল—“দুরূহ হওয়াটাই যে সব সময়ে অপরাধের, তা' নয় খুড়ো! তেলেণ্ড-ভাবার শিশুপাঠও দুরূহ, কিন্তু ত্রৈলোক্যের বালকের কাছে তাহা জলের মত সহজ। তাহাকে না বুঝিবেন, তাহাকে তাড়াতাড়ি দোষ দিবেন না এবং যে অক্ষর না বোঝেন, কেবলমাত্র তাহার উপরে অনিমেঘ চকু রাখিলেই যে তাহা কোনোকালে বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা করিবেন না।”

বুদ্ধ কহিলেন, “আমাকে মাপ করিবেন রমেশবাবু! আমার সঙ্গে যাহার বোঝাপড়ার কোনো সম্পর্ক নাই, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই দুষ্টতা। কিন্তু পৃথিবীতে দৈবাৎ এমন একএকটি মানুষ মেলে, দৃষ্টিপাতমাত্রই যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়—তার সাক্ষী, আপনি ঐ দেড়ে সারেংটাকে জিজ্ঞাসা করুন,—বৌমার সঙ্গে ওর আত্মীয়সম্বন্ধ ওকে

এখনি স্বীকার করিতে হইবে—ওর ঘাড় করিবে—না করে ত ওকে আমি মুসলমান বলিব না। এমন অবস্থায় হঠাৎ মাঝখানে তেলেগুভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুকিলে পড়িতে হয়। আপনি এক্ষেত্রে ঐ ভাষাটা নিজের জানেন বলিয়া আমার ব্যাথাটা বুঝিতেছেন না—কিন্তু রমেশবাবু, আপনি যদি মালক্মীর ঐ কাঁচা-সোনার মুখখানি এখন দেখিতেন এবং তার পরেই হঠাৎ তেলেগুভাষার একখানা ছকোঁধ মেঘ আসিয়া ঐ চাদমুখ ঢাকিয়া ফেলিবার জো করিত, তবে আপনি কি করিতেন বলুন দেখি! শুধু শুধু রাগ করিলে চলিবে না রমেশবাবু, কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন!”

রমেশ কহিল, “ভাবিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ত রাগ করিতে পারিতেছি না—কিন্তু আমি রাগ করি আর না করি, আপনি ত্রুংখ পান আর না পান, তেলেগুভাষা তেলেগুই থাকিয়া যাইবে—প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম নিরম।”—এই বলিয়া রমেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

এই ঘটনার পর চক্রবর্তীর সহিত কমলার সম্বন্ধ স্নেহে, করুণায়, অকথিত বেদনায় আরো যেন গভীর হইয়া আসিল। তাহা বুঝিবার জো নাই, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিছু করা যায় না, প্রতিকার করিবার চেষ্টা মনে আসে, কিন্তু উপায় ভাবিয়া পাওয়া অসাধ্য হয়, সেইজন্য সমস্ত প্রতিহত উত্তম অন্তরে অবরুদ্ধ যেরূপেই অহরহ লালন করিতে থাকে।

ইতিমধ্যে রমেশ চিন্তা করিতে লাগিল, গাজিপুরে যাওয়া উচিত কি না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, অপরিচিত স্থানে বাসস্থাপন

করার পক্ষে বৃদ্ধের সহিত পরিচয় তাহার কাজে লাগিবে। কিন্তু এখন মনে হইল, পরিচয়ের অল্পবিধাও আছে। কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ,—আদোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া উঠিলে একদিন তাহা কমলার পক্ষে নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। তার চেয়ে যেখানে সকলেই অপরিচিত, যেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই, সেইখানে আশ্রয় লওয়াই ভাল।

গাজিপুরে পৌঁছিবার আগের দিনে রমেশ, চক্রবর্তীকে কহিল, “খুঁড়া, গাজিপুর আমার প্র্যাক্টিসের পক্ষে অল্পকূল বলিয়া বুঝিতেছি না, আপাতত কাশিতে যাওয়াই আমি স্থির করিয়াছি।”

রমেশের কথার মধ্যে নিঃসংশয়ের স্বর শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, “বারবার ভিন্ন-ভিন্ন-রকম স্থির করাকে স্থির করা বলে না—সে ত অস্থির করা। যা হউক, এই কাশি যাওয়াটা এখনকার মত আপনার শেষ স্থির?”

রমেশ সংক্ষেপে কহিল—“ঐ!”

বৃদ্ধ কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং জিনিবপত্র বাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলা আসিয়া কহিল, “খুঁড়োনশায়, আজ কি আমার সঙ্গে আড়ি?”

বৃদ্ধ কহিলেন, “কগড়া ত দুইবেলাই হয়, কিন্তু একদিনও ত জিতে পারিলাম না!”

কমলা। আজ সে সকাল হইতে তুমি পলাইয়া বেড়াইতেছ?

চক্রবর্তী। তোমরা যেম আমার চেয়ে বড়-রকমের পলায়নের চেষ্টায় আছ, আর আমাকে পলাতক বলিয়া অপবাদ দিতেছ?

• কমলা কথাটা না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ কহিলেন, “রমেশবাবু তবে কি এখনো তোমাকে বলেন নাই? তোমাদের যে কাশি যাওয়া শির হইয়াছে।”

শুনিতা কমলা ‘হাঁ-না’ কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল, “থুড়োমশায়, তুমি পারিবে না, দাঁও, তোমার বান্ধ আমি সাজাইয়া দিই।”

কাশি-বাওয়া-সম্বন্ধে কমলার এই ঔদাসীন্তে চক্রবর্তী ঈদয়ের মধ্যে একটা গভীর আঘাত পাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, “ভালই হইতেছে, আমার মত বয়সে আবার নূতন জাল জড়ানো কেন?”

ইতিমধ্যে কাশী বাওয়ার কথা কমলাকে জানাইবার জন্য রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, “আমি তোমাকে খুঁজিতে ছিলাম।”

কমলা চক্রবর্তীর কাপড়চোপড় ভাঁজ করিয়া গুছাইতে লাগিল। রমেশ কহিল, “কমলা, এবার আমাদের গাজিপুরে যাওয়া হইল না। আমি স্থির করিয়াছি, কাশীতে গিয়া প্রাকটিক করিব। তুমি কি বল?”

কমলা চক্রবর্তীর বান্ধ হইতে চোখ না তুলিয়া কহিল, “না, আমি গাজিপুরেই যাইব। আমি সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়াছি।”

কমলার এই দ্বিধাহীন উত্তরে রমেশ কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল কহিল, “তুমি কি বল? একলাই যাইবে নাকি?”

কমলা চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাহার মৃদুচক্ৰ তুলিয়া কহিল, “কেন, সেখানে ত থুড়োমশায় আছেন!”

কমলার এই কথায় চক্রবর্তী কুণ্ঠিত হইয়া

পড়িলেন—কহিলেন, “মা, তুমি যদি সন্তানের প্রতি এতদূর পক্ষপাত দেখাও, তাহা হইলে রমেশবাবু আমাকে ছুচক্ষে দেখিতে পারিবেন না।”

ইহার উত্তর কমলা কেবল কহিল, “আমি গাজিপুরে যাইব।”

এ সম্বন্ধে যে কাহারো কোন সম্মতির অপেক্ষা আছে, কমলার কণ্ঠস্বরে এক্রপ প্রকাশ পাইল না।

রমেশ কহিল, “থুড়ো, তবে গাজিপুরই স্থির।”

ঝড়জলের পর সেদিন রাত্রে জ্যোৎস্না পরিকার হইয়া ফুটিয়াছে। রমেশ ডেকের কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—“এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্তা অত্যন্ত দুঃখ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরদূরত্ব করা দুঃখ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলাই আমার স্ত্রী—আমি ত উহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্র-পড়া হয় নাই বলিয়াই কোনো সঙ্কোচ করা অন্তায়। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধূরূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া-দিয়া সেই নির্জন সৈকতদ্বীপে স্বয়ং গ্রহিণীবদন করিয়া দিয়াছেন—তাহার মত এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে?”

হেমনলিনী এবং রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাধা, অপমান, অবিখ্যাস কাটিয়া যদি রমেশ জয়ী হইতে পারে, তবেই সে মাথা তুলিয়া হেমনলিনীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয়—জিতবার কোনো আশা থাকে না। কেমন করিয়া

প্রমাণ করিবে ? এবং প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা লোকসাধারণের কাছে এমন কদর্যা এবং কমলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক-আঘাতকর হইয়া উঠিবে যে, সে সমস্ত মনে স্থান দেওয়া কঠিন ।

অতএব ছুর্কলের মত আর বিধা না করিয়া, সত্কাচ না করিয়া কমলাকে জী

বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিকে শ্রেয় হইবে । হেমলিনী ত রমেশকে ঘৃণা করিতেছে—এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সংপাত্রে চিত্তসমর্পণ করিতে আকুল্য করিবে । এই ভাবিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা সেইদিক্কার আশাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল ।

ক্রমশঃ ।

বন্ধন ।

সেদিন যে তুমি গিয়েছিলে খুলে চুলটি
ছালায়ে মোহন করেছে কমল-ফুলটি
একটি ক্ষুদ্র পাপড়ি তাহার
খ'সে প'ড়েছিল বন্ধে আমার
বেগে বহেছিল পরশে বাহার
আমার হৃদয়-ধমনি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

কি যেন কানেতে বেজেছিল কোনো কথা কি
শুনিতে তাহাই আজি এ মরমব্যাথা কি ?
সব কাজে আজি এ মোর পরাণ
ব্যাকুল শুনিতে তব প্রেমগান
কর মোরে আজি কর আহ্বান
বাহি এস তব তরণি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

একবার শুধু মিলাও আঁখিতে আঁখিটি
কর মোরে তব স্বর্ণলীচা পানিটি

বন্ধ করহ শৃঙ্খলে তব
তোমার বন্দী চিরদিন র'ব
অনিমেবে তব মুখ অভিনব
হেরিব দিবসরঞ্জনি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

এমনি রহিব চিরদিন মোরা ছজনায়
তুমি গো মুক্ত আমি বাধা তব পিঞ্জরায়
অক্ষয় থাক্ এ মোর বাধন
অনন্ত হোক্ এ প্রেমসাধন
আশা-ভরা মোর আকুল কাদন
চেয়ে আছে তব সরণি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার সত্যের আলোচনা

কান্টের মূলমন্ত্র ।

দেশীর দর্শনকারদিগের মূলমন্ত্র ওকার ;
কান্টের মূলমন্ত্র Synthetic unity of
apperception অর্থাৎ সংবিতের যোগাত্মক
ঐক্য । এই মূলমন্ত্রটির প্রভাবে কান্ট
অভেদজ্ঞানের দ্বারোপাস্তে উপনীত
হইলেন । তবে যে, কেন তিনি অভেদ-
জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না— তাহা
আশ্চর্য্য যদিচ খুবই, কিন্তু তাহার একটি
নিগূঢ় কারণ আছে ; তাহা এই :—

ভেদবুদ্ধির উপত্যকা হইতে যিনি অভেদ-
জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে

চাহেন, তাঁহার উচিত একটি বিষয়ে সাবধান
হওয়া—পথের মাঝে থামিয়া-দাঁড়াইয়া তিনি
যেন পশ্চাদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন ।
কান্ট, অভেদজ্ঞানের দ্বারোপাস্তে উপনীত
হইয়াই চোকাটে ঠোকর থাইয়া থামিয়া
দাঁড়াইলেন ; তাহার কিয়ৎপরে বেগি তিনি
পশ্চাদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, আর
অগ্নি ভেদবুদ্ধির মায়াযুগ তাঁহার জ্ঞানচক্রে
ধাঁদা লাগাইয়া হড়্ হড়্ করিয়া তাঁহাকে
নীচে টানিয়া-লইয়া চলিল । ইহারই নাম
কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি । বাহাই
হউক না কেন— যোগাত্মক ঐক্যের জায়

অমনতরো আর-একটা অভেদজ্ঞানের কপাট খুলিবার অব্যর্থসন্ধান-চাবি খুঁজিয়া বাহির করা সোজা কথা নহে। কিন্তু সে চাবিটি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা আছে শক্তস্থানে—‘বিগ্গলজ্ঞানের সমালোচনা’ নামক দর্শন-গ্রন্থে। বহুপূর্বে ধাত্মীমুখে শুনিয়াছিলাম যে, কোনো ক্ষুধাতুর পরিব্রাজক রান্ধস-পুরীর রাজদ্বারে অতিথি হইলে তাহাকে খাইতে দেওয়া হয় লোহার কড়াই-ভাজা ! তেমনি, কালে-ভদ্রে যদি কোনো সত্যপথের পথিক জ্ঞানের লোভ সামলাইতে না পারিয়া কাণ্টের দর্শনগ্রন্থের মলাট-কপাট উদঘাটন করিয়া ভিতরে উঁকি দিতে সাহসী হ’ন, তবে ঠিক লোহার কড়াই-ভাজা না হউক—তাহারই সহোদর-শ্রেণীর দস্তনিষ্পন্ন সারালো সামগ্রী তাহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বন্ধপত্রিকর পরিবেষক যদি বলেন—“আর চাই ?”, তবে ক্ষুধার্ত অতিথি পরিবেষকের কার্যপট্টভার প্রতি আল্লাদপ্রকাশ করিয়া বলেন—“দিবে দেও ! অধিকন্তু ন দোষায় ;” কিন্তু কাণ্টের দ্বারের অতিথি তাহা বলেন না। তিনি কাঠহাসি হাসিয়া কীদো-কীধো স্বরে বলেন—“যৎ স্বপ্নং তন্মিষ্টম্।” সহবাত্রিগণের সহিত কাণ্টের দর্শনমন্দিরে অতিথি হইয়া আমিও এক্ষণে ক্রমে বৃদ্ধিতে পারিতেছি যে, ‘অধিকন্তু’ বড় যে ‘ন দোষায়’, তাহা নহে, পরন্তু ‘মরণায়’ ! অতএব “যৎ স্বপ্নং তন্মিষ্টম্,” এইটিই ঠিক ! পোষ্টাই সামগ্রী অন্নস্বপ্নই ভাল ! আমি তাই পরিবেষকের দলে মিশিয়া সহবাত্রিগণের পাতে-পাতে এক-আধ বুটার অনধিক কাণ্টীয় অন্ন

খুব বিবেচনার সহিত সুসাবধানে বিলি করিয়া মনে করিয়াছি, কিন্তু তাহা সম্বোধিতোস্তা’রা হয় তো ছই-গ্রাস মুখে উঠাইতে-না-উঠাই-তেই বলিবেন—“যথেষ্ট হইয়াছে”—যৎ স্বপ্নং তন্মিষ্টম্।”

সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য।

কাণ্ট যে বলিয়াছেন “সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য,” তাহা বস্তুটা কি ? বস্তুটা হ’চ্ছে—পূর্বের এক প্রবন্ধে যাহাকে আমি বলিয়াছি নিখিলবিশ্বের সার্বাত্মিক ঐক্য। আমি তো এইরূপ বলিতেছি, কিন্তু কাণ্ট নিজে কিরূপ বলেন ? কাণ্টের নিজের কথার তিনি নিজে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব-প্রথমে বিবেচ্য। কাণ্টীয়-দর্শনের মোট কথাটার স্থূল-তাৎপর্য-সম্বন্ধে কাণ্ট তাহার নিজের যেরূপ অভিপ্রায় নিজে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার চূষক বিবরণ এই :—



(ক্ষেত্র দেখ)

একত্ব হ’চ্ছে সংবিতের একত্ব (consciousness-এর একত্ব) ; যোগ হ’চ্ছে কল্পনার যোগ ; বৈচিত্র্য হ’চ্ছে দেশকালের বৈচিত্র্য। ভেদবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া কাণ্ট প্রথমে বৈচিত্র্য, যোগ এবং একত্ব, তিনকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক পৃথক পাত্রে বিভক্ত করিলেন ;—বৈচিত্র্য গুলেন দেশকাল-পাত্রে, যোগ গুলেন কল্পনা-পাত্রে, একত্ব গুলেন সংবিত-পাত্রে। তাহার পরে, একত্ব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যবর্তী সেই-যে কল্পনা-মূলক যোগ, সেই কল্পনা-মূলক

যোগের গায়ে সংবিতের একত্ব সজ্জাতিত করিয়া একমেটে যোগকে দোমেটে করিয়া গড়িয়া তুলিলেন, আর, সেই দোমেটে যোগের নাম দিলেন বুদ্ধির যোগ । কাণ্টের অভি-প্রায়ানুসারে, কল্পনার যোগ সংবিতের একত্ব হইতে আপনাকে অলগ রাখে ; বুদ্ধির যোগ সংবিতের একত্বকে মাথার মুকুট করিয়া মস্তকে ধারণ করে । কাণ্ট এটাও কিন্তু বলেন যে, ও-দুই পৃথক্-শ্রেণীর যোগের মধ্যে কেবল একমেটে-দোমেটে'র প্রভেদ, তা বই—বস্তুত. কোনো প্রভেদ নাই । কথাটা আর-কিছু না—গৃহবিড়াল বনে গেলেই যেমন বনবিড়াল হইয়া ওঠে, কল্পনার যোগ তেমনি সংবিতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই বুদ্ধির যোগ হইয়া ওঠে । ফলে, সংবিতের ঐক্য একপ্রকার স্পর্শমণি ; তাহার স্পর্শ-মাত্রে একমেটে যোগ দোমেটে হইয়া ওঠে—কল্পনার যোগ-বুদ্ধির যোগ হইয়া ওঠে । কাণ্টের এই কঠোর বৈজ্ঞানিক-দাঁচার কথাটিকে লৌকিক-দাঁচার সভ্যতাব্য পরিচ্ছদ পরিধান করানো আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে—কেন না, রাস্তার লোকে যদি উহাকে চিনিতে না পারিয়া একটা অদ্ভুত সঙ্ঘটাওয়ার, আর, সেইরূপ ভ্রান্তির বশতাপন্ন হইয়া উহার গায়ে ধুলিনিক্ষেপ করিতে উদ্বৃত হয়, তবে তাহা আমার প্রাণে সহিবে না । অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক ।

আরব্য-উপজ্ঞাসের আবুলহোসেন যখন কালিকের সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়া-ছিলেন, তখন তাঁহার কালিকের আমি এবং আজিকের আমি'র মধ্যে একত্বের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল খুবই । বাপাতিটা যে কি, তাহার

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে তিনি আবু-থবু বনিয়া গিয়াছিলেন ; তাহার পরে বিপুল সাম্রাজ্যের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে সত্য-সত্যই রাজরাজেশ্বর মনে করিতে লাগিলেন । রাজা যেরূপে বসেন-দাঁড়ান, ভাবেন-চিন্তেন, বিচার করেন, আদেশজ্ঞাপন করেন, সমস্তই সম্ভ-সম্ভ তাঁহার মনোমধ্যে কল্পনার যোগস্থত্রে গ্রথিত হইয়া-হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারার বহিয়া চলিতে লাগিল । আবুলহোসেনের কালিকের আমি'র সংস্রব হইতে তাঁহার আজিকের আমি'র দূরে সরিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র তাঁহার কল্পনার বা মনোরথের ঘোঁটনা এবং যোজনা এই দুই ছুড়ি-ঘোড়া উন্মত্তবেগে ছুটিতে লাগিল ; আর, মাঝে-মাঝে থমকিয়া-দাঁড়াইয়া পশ্চাতে পা ছুঁড়িয়া বুদ্ধি-সারথির চক্ষে রাশি-রাশি ধুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তাহার দুইদিন পরে যখন কালিক রাজা-ধিরাজ আবুলহোসেনের যুম ভাঙাই-বার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ভাঙাইয়া দিলেন, তখন আবুলহোসেনের বুদ্ধির হাড় বাতাস লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার সুখবল্লভ ভ্রম হওয়াতে তাঁহার সাধের মনোরথ স্বর্গ হইতে রসাতলে নিপতিত হইয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল । যাহাই হোক না কেন—আবুলহোসেনের পরশ-তরবার আমি এবং অজ্ঞকলোর আমি'র মধ্যে অখণ্ডনীয় একত্ব ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল ; আর, তাহা যখন হইল, তখন তাঁহার নিকটে বিপত দুইদিনের সমস্ত প্রেহেলিকা দুধকে-দুধ জলকে-জল হইয়া গেল । পূর্বদিনে আবুল-হোসেনের মনোমধ্যে আজিকের সঙ্গে কালি-

পরশের যোগস্থলের খেই হারাইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে সংবিতের ঐক্য প্রত্যাবর্তন করাতে সেই হারা-সন্ধানস্থত্র খুঁজিয়া পাইতে আবুলহোসেনের একমুহূর্তও বিলম্ব হইল না। আজি-কালি-পরশের বিচিত্র ঘটনাবলীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংবিতের ঐক্যমূলক এই যে যোগ, ইহাকেই বলেন কান্ট—বুদ্ধির যোগ। এখন তো আবুলহোসেনের মনে বুদ্ধির যোগ মাথা তুলিয়া-উঠিয়া আজি-কালি-পরশের সমস্ত বৃত্তান্তের উপরে আলোকনিষ্কোপ করিতেছে; কিন্তু গতকল্য, তাহার মনোমধ্যে ঘোটনা এবং বোজনা, এই দুই প্রমত্ত-ঘোটক সাংবিত ঐক্যের লাগাম ছিঁড়িয়া কেমন উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা তো দেখিয়াছ। তাহাকেই বলেন কান্ট—কল্পনার যোগ। তাই বলি যে, যোগফণী বখন মণি হারাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করে, তখন তাহারই নাম কল্পনার যোগ; পক্ষান্তরে, যোগফণীর মাথায় বখন মণি অলুঙ্গল করিতে থাকে, তখন তাহারই নাম বুদ্ধির যোগ। সে মণি কি? না, Synthetic unity of apperception সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। মণিটার মূল্য কান্ট রীতিমত বাচাই করিয়া দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আজি বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশীয় দর্শনকারেরা বুদ্ধি এবং শাস্ত্রের বাজারে তাহা তর-তর করিয়া বাচাই করিয়া দেখিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহা সাত-রাজার ধন বাসিন্দা; সাত রাজা হ'লেম তুহু'ব প্রভৃতি

সপ্ত লোকের সপ্ত লোকপাল; আর, সাত-রাজার ধন হ'লে সপ্তলোক বা নিখিল বিশ্বত্রক্ষাণ্ড। কেহ হয় তো বলিবেন, “পাগলের মতো কি বলিতেছ? সংবিতকে বলিতেছ—নিখিল বিশ্বত্রক্ষাণ্ড!”

“হাঁ, তাই আমি বলিতেছি! সংবিত নিখিল বিশ্বত্রক্ষাণ্ডই বটে! কিন্তু এ কথার অর্থ এবং তাৎপর্য এখন না—ইহার পরে ধীরে ধীরে ক্রমশ প্রকাশ্য।”

কান্টের ইতস্তত ।

গোড়াতেই বলিয়াছি যে, কান্টের মূলমন্ত্র Synthetic unity of apperception সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য; আর, আমাদের দেশীয় দর্শনকারদিগের মূলমন্ত্র ওকার। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল নামে। তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দৃষ্টব্য এই যে, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যকে যদি কেবলমাত্র একটা দার্শনিক-ছিন্নসত্তা-রূপে (abstract entity রূপে) গ্রহণ করা যায়, তবে তাহার সমস্ত গৌরব-মাহাত্ম্য সেই দণ্ডে ধুলিসাৎ হইয়া যায়। ইউরোপীয় দর্শনকারদিগের পাল্লায় পড়িয়া উহার ভাগ্যে ঘটিয়াছেও তাই! আমাদের দেশের দর্শনকারেরা যে, সংবিতের প্রকৃত মর্যাদা অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের লেখনীর ছই-এক আঁচড়েই সপ্রকাশ। তাঁর সাক্ষী পঞ্চদশীর গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

মাসিকবৃক্ষকল্পে পতাপমোষনেকথা।

নোদেতি নাত্মমেত্যা সংবিতো, বহুপ্রভা ।

মাস, অঙ্গ, বৃক্ষ, কল্প, অনেকখা বাতায়ত করিতেছে— তাহার মধ্যে একাকী কেবল আপন প্রভার আপনি প্রকাশমানা সংবিত

না-জ্ঞানে উদয়—না-জ্ঞানে অস্ত। সংবিতের শেবোক্তপ্রকার বিশ্বব্যাপী সার্বস্বিকতা কাণ্ট্‌ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন; আর তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সংবিতের ঐক্যকে কাঁকা ঐক্য না বলিয়া বলিয়াছেন—যোগাত্মক (Synthetic) ঐক্য। কাণ্ট্‌ বুঝিয়াছিলেন, এটা সত্য—কিন্তু বুঝিয়াও বোঝেন নাই। কাণ্টের মনোমধ্যে এইরূপ ইতস্তত ঘটাইবার কর্ত্তী হ'চ্ছেন আর-কেহ না—ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধি। কাণ্ট্‌ যে-অর্থে 'যোগাত্মক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই এইরূপ বুঝায় যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংবিতের যোগস্থজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্বন্ধ। এমন কি, কাণ্ট্‌ এ কথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের গোড়া-বন্ধনের কর্ত্তী একাকিনী কেবল সংবিৎ। হুঃখের বিষয় এই যে, কাণ্ট্‌ তাহার অন্তরের নিগূঢ় কথাটি পষ্ট করিয়া বলিতে গভীমসী এবং ইতস্তত করিয়াছেন বড্ড বেশীমাত্রা। কাণ্ট্‌ বলিয়াছেন যে, সংবিতের ঐক্যানুরণের পূর্বে যোগের সংঘটনকার্য বা যোজনা-কার্য কল্পনাকর্ত্তক অজ্ঞাতসারে—অন্ধভাবে—সম্পাদিত হইয়া থাকে। কাণ্ট্‌কে "জিজ্ঞাসা করি যে, জ্ঞাতা-কর্ত্তক যে কার্য অজ্ঞাতসারে করা হয়, সে কার্যের কর্ত্তা জ্ঞাতা নিজে, অথবা প্রকৃতি, অথবা আর-কেহ? সুপ্তব্যক্তি যদি ঘুমের ঘোরে সহ-শারী ব্যক্তিকে প্রহার করে, তবে প্রহার করিল .যে—সে কে? সুপ্তব্যক্তি নিজে, অথবা তাহার প্রকৃতি, অথবা আর-কেহ? যদি বল যে, সুপ্তব্যক্তি নিজে; তবে

প্রকারান্তরে বলা হয় যে, সুপ্তব্যক্তি তাহার সেই নিজের কার্যের জন্ত নিজে দায়ী, অতএব তাহাকে পুলিশে দেওয়া উচিত। যদি বল যে, সুপ্তব্যক্তি তাহার 'সে অজ্ঞানরূপে কার্যের জন্ত দায়ী নহে—অথচ সে কার্য তাহার নিজেরই কার্য; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, অন্ধ প্রকৃতির কার্যও জ্ঞাতার নিজের কার্য। সাবধান! সম্মুখে একটা প্রবল ঘূর্ণার পাক ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে! সে ঘূর্ণার পাক এইরূপ :—

প্রথম কথা ।

কল্পনার একমেটে যোগ সাংবিত ঐক্যের আয়ত্ত বহির্ভূত ।

দ্বিতীয় কথা ।

অথচ সে যোগের সংঘটন-ক্রিয়া—অর্থাৎ যোজনা-ক্রিয়া—জ্ঞাতা-কর্ত্তক অজ্ঞাতসারে প্রবর্তিত হয় ।

তৃতীয় কথা ।

এটা যখন স্থির যে, কাল্পনিক যোজনা-ক্রিয়া জ্ঞাতা-কর্ত্তক অজ্ঞাতসারে প্রবর্তিত হয়, তখন ঐপ্রকার যোজনা-ক্রিয়ার ফল যে একমেটে যোগ, তাহাও অবশ্য জ্ঞাতার একমেটে আপাদমস্তক ওতপ্রোত। শেক্সপীয়ার বলিয়াছেন "there is method in madness" থ্যাপাগির মধ্যেও একত্বের বাধুনি আছে। সে একত্ব, অবশ্য, জ্ঞাতারই একত্ব। একমেটে কাল্পনিক যোগের নিষ্পাদন-কার্যেও জ্ঞাতার একত্বের হস্ত তবে আছে? জ্ঞাতার একত্বই তো সংবিতের একত্ব! যদি বল যে, সংবিতের একত্ব স্বতন্ত্র—জ্ঞাতার একত্ব স্বতন্ত্র; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, আমার জ্ঞানের কার্য আমার

আপনার কার্য্য নহে। অতএব তুমি বধন বলিতেছ যে, একমেটে কালনিক যোগের নিষ্পাদন-কার্য্যেও জ্ঞাতার একত্বের হস্ত আছে, তখন তাহাতেই আপনা-আপনি প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সে কার্য্যে সাংবিত ঐক্যের হস্ত আছে। তবেই হইতেছে যে, কল্পনাপ্রধান একমেটে যোগক্ষেত্রেও সংবিতের ঐক্য আবিপত্য বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু গোড়ায় তুমি বলিয়াছ যে, কল্পনার একমেটে যোগ সাংবিত ঐক্যের আয়ত্ত-বহির্ভূত (প্রথম কথা দেখ)। এই তো দেখিতেছি যে, তোমার কথার ল্যাজার সঙ্গে মুক্তার মিল নাই।

কান্টের ভ্রায় অত-বড় একজন দার্শনিক পণ্ডিতের অমন একটা স্পষ্ট অসঙ্গতি-দোষ এ-দেশীয় লোকের চক্ষে খুবই আশ্চর্য্য ঠেকে, কিন্তু ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধির চক্ষে উহা ধর্ভ-বোর মধ্যেই নহে। ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধির ওকালতির বাক্‌ঝাপটে অমনতরো গণ্ডা-গণ্ডা অসঙ্গতি-দোষ অবলীলাক্রমে পার পাইয়া যায়।

ওকালতির নমুনা।

সব সত্যই আপেক্ষিক সত্য—কোনো সত্যই ঠিক সত্য নহে; অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক সত্য না হইলেও মহামূল্য আপেক্ষিক সত্য, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই! আমিও বলি যে, “বুমপাডানী মাসী-পিসী”র ভ্রায় তাহা মহামূল্য ছেলে-ভুলানিয়া সত্য!

বারাস্তরে আমি দেখাইব যে, কান্ট ভেদবুদ্ধির কুহকে মুগ্ধ হইয়া সাধ করিয়া ঐ পাকচক্র-খেলনে-ওলালা অসঙ্গতি-সম্পর্টাকে ছুঁ দিয়া গ্রন্থমধ্যে পুঁষিয়াছেন! কান্টের উচিত ছিল, গোড়াতেই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের একত্ব (যোগ এবং বৈচিত্র্যের বস্তুগত একত্ব) প্রতিপাদন করা। তাহা না করিয়া—গোড়াতেই তিনি ভেদবুদ্ধির উকিলী-ফন্দিতে ঘাড় পাতিয়া-দিয়া জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছেন। শেষে তাই আপনার কাঁদে আপনি পড়িয়া নাকালের একশেষ হইয়াছেন।

• শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামায়ণ ও সমাজ।

আমাদের সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হইবার পরেই যৌথ-পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। যৌথ-পরিবারের শিক্ষানীতিও শৃঙ্খলার দিকে। এই শিক্ষা ব্যক্তিগত সুখ ও বিলাস-চেষ্টার প্রতিকূলে এবং উহা পরার্থ-ত্যাগ-স্বীকারের প্রবর্তক। যৌথ-পারিবারিক

জীবন শাস্তি লক্ষ্য করে এবং ইহা বিরুদ্ধ-উপাদানবিশিষ্ট চরিত্রগুলিকে গড়িয়া-পড়িয়া এক ছাঁচে পরিণত করিতে চেষ্টা পায়। যেকোনো বিভিন্ন বাস্তবের স্রষ্টা চড়াইয়া বা নাবাইয়া একটি একতান বন্ধায়ের সৃষ্টি হয়, পারিবারিক শাস্তি ও সাম্য-

রক্ষার জন্ত সেইরূপ একপরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় প্রবৃত্তির সহজ গতি কতকপরিমাণে পরিবর্তিত করিতে হয়—এক প্রীতির তীর্থে বিরুদ্ধ প্রকৃতিসমূহের স্মৃতি মিলন ঘটয়া থাকে। সামঞ্জস্য ও শান্তির জন্ত একটা অবিরাম চেষ্টার গার্হস্থ্যজীবন সুরক্ষিত থাকে এবং এক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নৈতিক সুরক্ষা হইয়া থাকে—কারণ প্রত্যেকের আত্ম-দমনের চেষ্টা না হইলে শান্তির আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না।

যে জলরাশির স্বাভাবিক গতি আছে, তাহা আপন নির্মলতা রাখিয়া চলিতে পারে; কিন্তু জল দাঁড়াইয়া গেলে উহা পঙ্কিল ও নানারূপে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। যৌথ-পরিবার যতদিন স্বতাবের অঙ্গুলে গতিশীল থাকে, ততদিন ইহার জ্বালা হিতকর প্রভাব আর-কোনরূপ সামাজিক অবস্থার হইতে পারে না, কিন্তু গতি স্থির হইলে ইহাও অনিষ্ট-কর হইয়া উঠে। জীবনকে নিয়মিত করিবার অত্যধিক চেষ্টার সঙ্গে স্বাভাবিক শক্তির যে অপচয় ঘটে, তাহাতে অদম্য উৎসাহ, স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতার বিকাশ ভালরূপ হয় না, এবং গুরুজনের আত্মগত্যা প্রতিভাবিকা-শের পক্ষে পদে পদে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। লোকে যে পরিমাণে সহিষ্ণু হয়, সেই পরি-মাণে তাহার নিজের মতের প্রতি আস্থা ও স্বীয় শক্তির উপর বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়;—যৌথ-পরিবারে ঘেহের অঙ্গুলীন সর্কাপেক্ষা বেশী, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহাতে ছদয় এমন কৌমল হইয়া পড়ে এবং এত অসঙ্গত চুচিন্দা ও সাবধানতা উৎপন্ন হয় যে, মহৎ উদ্দেশ্য-

গুলি পদে পদে বাধা পায়। আমাদের দেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনোন্মুখ ব্যক্তির মা, খুড়ী, মাসী, ভগিনী ভাবিয়া আকুল হন এবং ছেলেটি একটু দৌড়াইয়া খেলিতে ছুটিলে স্নেহাতুর আত্মীয়গণ শিশুর অনিষ্টা-শকা করিয়া তাহার পাদক্ষেপ-নিয়মনের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, এক পরি-বারের বহুলোক একত্র হইয়া অহরহ শিশুর জীবনরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে, অমনি স্বতাবও যেন একটি ক্রুর হস্ত দেখিবার জন্তই স্বীয় হিতকর বিধানগুলি লইয়া কার্যক্ষেত্র হইতে অপস্থত হয়। এদিকে নানারূপ অকর্মণ্য উপদেশের হিড়িকে শিশুগুলি নিশ্চেষ্ট বুদ্ধমুষ্টির মত হইয়া যায়, আর সেই সঙ্গে অকাল-পকতা প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক ক্ষুদ্রি হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া পড়ে। শিশুকাল হইতে আমরা নিজের জন্ত ভাবিতে শিখি না, অপরে আমাদের ভাবনাগুলি ভাবিয়া দেয় এবং পিতামহী-মাতামহীর প্রণোদিত জীবনরক্ষার সাবধানতা আমরণ পশ্চাতে থাকিয়া আমা-দিগকে সর্ববিষয়ে কাপুরুষ করিয়া তোলে। শিশুকালে পা বাড়াইতে গেলেই আত্মীয়বর্গ যে আশকা দেখাইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা ঘনীভূত হইয়া আমাদের উজ্জ্বল মুখ মুচুড়াইয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার উচ্চকাঙ্ক্ষার জন্ত আমাদের একান্তরূপে অযোগ্য করিয়া ফেলে। মুখে আমরা যতই পুরুষকারের গর্ব করি না কেন, অনেকসময় যে বাত্মকালে হাঁচি শুনিলে অন্তরাধিষ্ঠিত পঞ্চভূত ভয়ে শিররিয়া উঠেন, সে সময়ে সন্দেহ নাই।

যৌথ-পরিবার এখন একান্তরূপে কৃত্রিম

হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবের প্রয়োজন হইতেই পারিবারিক এই বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন এই বহুপূর্বপ্রবর্তিত প্রথা স্বভাবকে বহুদূরে ফেলিয়া একান্ত কৃত্রিমতার দিকে বুঁকিয়াছে। আমরা আতপগৃহের তরুণবয়সের স্ত্রী কতকটা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি; স্বভাবের মুক্তক্ষেত্র যে আমাদের আদিম ও প্রকৃত বাসস্থান, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি;—কিন্তু তথাপি একথা স্থির যে, আমরা যতদূরেই স্বভাবকে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করি, স্বভাব একদিন এই কৃত্রিম ও মিথ্যা মমতার বন্ধনবিশারী সমাজ হইতে তাহার স্বীয় সামগ্রী হরণ করিয়া লইবে; মৃত্যুর দিনে আমাদের মনে পড়িবে—যাহা শুভ, মৃত্যুর বিনিময়েও তাহাই আশ্রয় করি আমাদের উচিত ছিল; ভীতিদায়ক কৃত্রিম মেহের স্বর এই ক্ষুদ্রগৃহের প্রাচীরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে—তাহার উর্কে উঠিতে পারিবে না, কিন্তু যে কল্যাণময়ী বাণী স্বর্গ হইতে মহাশয়ের কর্ণে নিরন্তর অভিষাত করে, সেই শুভ আদেশ গ্রাহ্য করিয়া নির্ভীকভাবে কার্য্য করাই আমাদের সর্ব্বাবস্থায় শ্রেয়স্কর। মৃত্যু অতি ভীষণ, কিন্তু তাহার অপ্রার্থিত আলিঙ্গন অতি ভীষণ-ব্যক্তিকেও একদিন স্বীকার করিতে হইবে,—কর্তব্যসম্পাদনে মৃত্যুর স্ত্রী মহান্ মহিমা আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু প্রথম যখন যৌথ-পরিবার-প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহার অনতিপরে উহা এমন একটি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, যখন সমাজ স্বভাবের চিল্লিত পথে চলিয়া স্বীয় বিধান রচনা করিত। এইজন্ত ব্যক্তিগত-কর্তব্য-

শিক্ষার পক্ষে যৌথ-পরিবার-প্রথা তখন একান্ত উপযোগী হইয়াছিল এবং উহাতে কৃত্রিমতার লেশস্পর্শ হইতে পারে নাই। যখন পিতৃ-মেহ ও মাতৃমেহ শুভ মন্যাকিনীর স্ত্রী জীবনকে উর্ব্বরতা ও স্বাস্থ্যের শ্রী প্রদান করিত, অথচ তাহা মহাকর্তব্যগুলি সম্পাদনের কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিত না; যখন প্রেম যাহা চায়, দাম্পত্যবিধি প্রেমকে সেই অভীষ্ট বর দিয়া এক পুষ্পস্থলে অভিষিক্ত করিয়া রাখিত,—জন্মের প্রগাঢ় বন্ধনই অঞ্চল-বন্ধনের বাহ্যিক অমুষ্ঠানকে পবিব্রজভাবে প্রকাশিত করিত; এখন যেরূপ বিবাহবন্ধ দুইটি ভাগ্যহীন ব্যক্তি দুই ভিন্নমুখে তাকাইয়া পরস্পরের অনৈক্যজনিত ক্ষোভে দীর্ঘ-স্থানে জীবন কাটাইয়া দেয়,—স্বয়ংবর, গাধার্ক বিবাহ প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত থাকায় দাম্পত্যের তখন এরূপ নিষ্ঠুর বিক্রম সংঘটিত হইতে পারিত না,—যখন ভ্রাতৃত্বভক্তি, পিতৃভক্তি ও স্বামিভক্তি সম্বন্ধে চাণক্যপণ্ডিত নানারূপ শ্লোক সম্বলন করেন নাই ও পৌরাণিকগণ সাধারণকে সে পথে প্রবর্তিত করিবার সাধু উদ্দেশ্যে স্বর্গ ও নরকের জল্পনায় নিরত হন নাই, অথচ ঐ সকল বুদ্ধি স্বভাবতই সতেজ ও হৃন্দর ছিল,—প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সংকর্ষের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি, ইহা হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে সমস্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্ত যৌথ-পরিবার-প্রথা উৎকৃষ্ট-রূপে মনুষ্যসমাজের উপযোগী ছিল।

সেইরূপ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা সমাজের কোনকালে হইয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু

সমাজ যে এইরূপ এক মহিমায় মণ্ডিত শাস্তি-ময় নিকেতনে পৌঁছিতে পারে, রামায়ণ-কাব্যে সেই সম্ভাবনা বাথার্থ্যে পরিণত হইয়া অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়া আছে । মনুষ্যের সংপ্রযুক্তিনিচয়ের বিকাশ করিবার জন্ত একটি মহাবিদ্যালয় আবশ্যক,—বর্তমান যুরোপীয় সমাজ সেই বিদ্যালয়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই । সেই বিদ্যালয় স্বভাবের ছন্দে, উদার ধর্মশীতির ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে—সর্গীয় পবিত্র আলোক এবং প্রাণসদ্বারী বায়ুতে নিরোধ করিয়া প্রাচীর তুলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না । রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্যালয় ।

এখানে দেখিতে পাই, রামদীতার প্রেম স্বাভাবিক প্রণয়যুগ্মের প্রেম; উহা অবাধ, অপ্রমেয় ও সুন্দর, দাম্পত্যবিধি উপা পবিত্র করিয়া আকারিত করিয়াছে মাত্র । বিবাহ-প্রণয় সামাজিক বলপ্রয়োগ দ্বারা হই বিকল প্রকৃতির যে অবিরত মিলনচর্চা চলিতেছে এবং সহস্র নীতি ও ধর্মের শ্লোক দুঃখে সদয়দ্বারে প্রতিহত হইয়া নিরন্তর দাম্পত্য-জীবনকে যে সংসহ বাণায় বাণিত করিতেছে, রামদীতার দাম্পত্য তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ দৃশ্য দেখাইতেছে । এখানে স্বাভাবিক শীলতা সীতাকে পুরুষমহিলার কমনীয় সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে—কিন্তু স্বামী-বাহু অবলম্বন-পূর্বক বনযাত্রায় যে নির্ভীক অপূর্ব প্রেমের মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে, তাহা খর্ব করিবার লজ্জা কোন প্রতিবেশিনী স্বীয় রসনা দংশন করিয়া দাঁড়ান নাই এবং দম্পতির এই ব্যবহার নির্লজ্জতার চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া

করিয়া আত্মসম্মতিগণের গণ্ড লঙ্ঘার আরম্ভ হইয়া উঠে নাই । স্বভাব বাহা চাহে, সমাজ এখানে তাহাই অমুমোদন করিতেছে । এখানে স্বাভাবিক প্রেম দাম্পত্যবিধিবদ্ধ হইয়া পুণ্য-মঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বভাববিধি ও সমাজবিধানের পরম একতা দেখা যাইতেছে । বিশ্ব-নিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে বাহাদিগকে আমাদের পরমসহায় ও দক্ষিণবাহুর ত্রায় অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে সম্বন্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকসময় কি নিষ্ঠুর ঔদাস্য ও স্নেহ-ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, অথচ বিষদৃষ্ট অঙ্গুলীর ত্রায় এখন তাঁহারা বুদ্ধ থাকিয়া গার্হস্থ্যজীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট এবং নানাপ্রকার অনর্থ উৎপন্ন করিতেছেন । কিন্তু ভরত ও লক্ষণের স্নেহাভুগ বশত কি সুন্দর ও স্বাভাবিক । হঠাৎ কোন অবস্থার তাড়নায় এক ভ্রাতা অপরের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির জন্তও 'অবস্থাবিশেষে' মানুষ প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে, কিন্তু ভরত ও লক্ষণের মত জীবনসমর্পণের দৃষ্টান্ত বিরল । প্রাণদান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক ; প্রাণ একবার বই দেওয়া যায় না,—যদি বহুবার প্রাণ দেওয়ার কোন পথ থাকে, তবে তাহাকেই জীবনদান বলা যাইতে পারে । ভরত ও লক্ষণ এইপ্রকারে জীবনদান করিয়াছিলেন । যৌথ-পরিবারের শিক্ষা ভিন্ন এই ভাবের জীবনোৎসর্গ সম্ভবপর নহে । স্বভাবের সঙ্গে যে-সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, সে-সমাজে স্নেহ একরূপভাবে বিকাশ পায় না । এই স্থানেও দৃষ্ট হয়, কাব্যবর্ণিত সামাজিক জীবন স্বভাবের সঙ্গে

সহজ মিশ্রণের প্রীতিচ্ছটা হাতিতেছে।
 বাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়ের অবস্থায় প্রাণের
 রক্ত দিয়া শিশুকে প্রতিমুহূর্তে শত বিপদ
 হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ত্যাগ ও
 স্নেহের মধ্যে ভগবদ্দয়া মূর্তিমতী,—পিতৃ-
 মাতৃভক্তিতে ঈশ্বরের পদে প্রদত্ত অঞ্জলীর
 পুষ্পগুলি সত্ত্ব বিকাশ পাইয়া উঠে। যৌথ-
 পরিবারেই এই বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ পাইবার
 সুবিধা। রামের পিতৃভক্তিতে দেখা যায়,
 সমাজ স্বভাবপ্রদত্ত ভাবগুলি সুন্দররূপে
 বিকশিত করিতেছে মাত্র। কৌশল্যা যখন
 রামকে বলিতেছেন—“তোমাকে বনে যাইতে
 নিবেদ্য করিবার আমার শক্তি নাই,—তুমি
 স্বচ্ছন্দমনে বনে গমন কর,—যে ধর্ম তুমি
 আশ্রয় করিলে, সেই ধর্ম তোমাকে রক্ষা
 করিবেন;” কিংবা সুমিত্রা যখন লক্ষ্মণকে
 বলিতেছেন—“বৎস, হঠমনে বনে যাত্রা কর,
 রামকে দশরথ বলিয়া মনে করিও, সীতাকে
 আমার জ্ঞান মনে করিও এবং অরণ্যকে
 অবোধ্যা বলিয়া জানিও;” তখন মনে হয়,
 অবোধ্যার সামাজিক শিক্ষা মাতৃস্নেহের সম্পূর্ণ
 বিকাশ করিয়াও স্বভাবের উন্নতধর্ম হইতে
 বিচ্যুত হয় নাই। এখনকার মাতৃবর্ণের আশঙ্কা
 হইতে সেই সকল স্নেহকল্পিত অথচ সুধীর
 আশিববাণী কত অধিক গৌরব প্রকাশ করি-
 তেছে। নিজের অপেক্ষা মহাশুণশালী কোন
 ব্যক্তির ভালবাসা পাইলে তাঁহাকে পূজা করি-
 য়ার জন্য স্বভাবতই চিত্ত উবেল হইয়া উঠে।
 এই স্বাভাবিক বৃত্তি গার্হস্থ্যজীবনে অমূল্য্য্যার
 দ্বারা বিকশিত হয়। হস্তমানের চরিত্রে আত্ম-
 গত্যসম্পর্ক গৌরবাবিত হইয়া উঠিয়াছে,—
 অবোধ্যার উচ্চ নৈতিকপ্রভাব বর্ধকর জাতি-

গণের মধ্যেও উচ্চকর্তব্যের অমূল্য্য্যার
 জন্মাইতেছে। যে দিক্ হইতেই দেখা যাউক,
 রামায়ণকাব্যে সমাজ ও স্বভাবের এক অপূর্ণ
 শুভমিলন দৃষ্ট হয়; মহাশুণ একত্র বাস করিয়া
 যে উন্নতি ও সংশিক্ষালাভের প্রয়াসী ছিল,
 প্রকৃতি যেন এস্থলে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রদান
 করিয়াছেন। আকাশের নীল প্রান্তভাগ
 যেরূপ সুদূর শ্রামাভ তরুণীরেব সঙ্গে একত্র
 মিশিয়া যায়, ব্যবচ্ছেদরেখার প্রতীতি
 হয় না, রামায়ণবর্ণিত সমাজ ও স্বভাবের
 নিয়ম সেইরূপ যেন এক বর্ণে এক ভাবে
 মিশিয়া গিয়াছে। এই কাব্যের এই অপূর্ণত্ব
 ইহার দ্বিধিজন্ম-কিরীট-স্বরূপ—এ বিষয়ে
 ইহার সমকক্ষ আর কোন কাব্য নাই।
 মহাভারতের সময় যৌথ-পরিবার সংযোগ
 অপেক্ষা অধিকতররূপে বিয়োগের মুখে
 আসিয়া পড়িয়াছিল,—জ্ঞাতিবিরোধ মহাভার-
 তের আখ্যানভাগ কণ্টকিত করিয়া রাখি-
 য়াছে; কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ও যজ্ঞবংশের
 ধ্বংসে এই কথা সপ্রমাণ। এখন সমাজ
 ও স্বভাব আর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে
 বদ্ধ করিয়া রাখে নাই, সমাজের অত্যর্থে
 স্বভাবের স্বর্গ ক্রমশ সরিয়া পড়িতেছে—
 শাস্ত্রের ভেদ্বিতে তাহা দর্শনীয় হইয়া উঠি-
 য়াছে—সমাজ নিম্নে পড়িয়া মাটির দিকে
 ধাবিত হইতেছে—মানুষ আর স্বভাবের
 সম্মুখবর্তী হইয়া দাঁড়াইতে সাহস পাইতেছে
 না,—কর্তব্যের আলোর তীব্রতায় তাহার চক্ষু
 অন্ধ হইয়া যায়,—এখন সে দৃষ্টি নিম্নদিকে
 আবদ্ধ রাখিয়া ধুলির ক্রীড়নক লইয়া ব্যস্ত
 হইয়াছে। গতনোশুণ পর্ণশালাকে ধেমন
 নানারূপ কৃত্রিম অবলম্বন দ্বারা সমুন্নত

রাখিতে হয়, আমাদের স্বার্থশিথিল আশঙ্কা-
জীর্ণ মেহের গৃহকে সেইরূপ এখন নানারূপ
শাস্ত্রবচনের অবলম্ব দ্বারা কোনরূপে রক্ষা
করিতে হইতেছে—কিন্তু গৃহটি বাসের পক্ষে
একান্ত অসুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে । এখন
আমরা গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শকাব্য রামা-
য়ণ পাইয়াছি, পারিবারিক স্নেহ স্বাভাবিক-
ভাবে বিকাশ পাইয়া কিরূপ উন্নতধর্মমূলক
হইতে পারে, রামায়ণ পড়িয়া তাহা জানিতে
পারিতেছি—কিন্তু রামায়ণকার এই মহাশপ্ন
কোথায় পাইয়াছিলেন? নিশ্চয়ই সমাজ
এই উন্নত ভিত্তির উপর একবার দাঁড়াইয়া-
ছিল । জলবিষে যেরূপ গগন-মেদিনীর
প্রতিচ্ছায়া কুটিয়া উঠে, ক্ষুদ্র মনুষ্যসমাজেও
তখন সেইরূপ সনাতন ধর্ম ও নীতির প্রতি-
ফলন হইয়াছিল—রামায়ণবর্ণিত সমাজ স্বপ্ন
বলিয়া বোধ হয় না, উহা তৎকালীন সমাজের
স্বার্থ অবস্থা ।

মনুষ্যের কতকগুলি এমন বিপদ আছে,
যাহা হইতে সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না—
মৃত্যু, শোক, নানাপ্রকার নৈরাশ্র ও ব্যাধি
চিরদিনই তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে ।
এই সমস্ত স্বাভাবিক দুঃখ ও বিপদ মনুষ্য-
জীবনকে বিরিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমা-
দের আধুনিক সমাজের শিক্ষাদীক্ষা এরূপ যে,
তাহাতে আমাদের বিপদে বিমুগ্ধ করিতে
সর্বদাই অভ্যস্ত করিতেছে । কল্যাণ যাহার
একটি পদ ডাক্তারে ছেদন করিয়া দিবে,
তাহাকে কুশকণ্টকের আশঙ্কায় আতঙ্কিত
করিয়া দুঃদশী বলিয়া যিনি পরিচিত হইতে
চান, তাহার নির্ভর্য্যতার পরিচয়ই তাহাতে
প্রকট হইয়া উঠে । এদেশে সাবধানতার

প্রতি প্রীতির মাত্রা বড় বৃদ্ধি পাইতেছে ।
হয় ত কোন নিগূঢ় শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বের
মহাভিষেকরাজ আমাদের স্বর্ণপাত্রকে মৃৎপাত্র
পরিণত করিবেন, ময়ূরের পক্ষ হইতে হয় ত
একটি একটি করিয়া পালক তুলিয়া লইবেন,
যাহা একান্ত যত্নে রক্ষণীয়, তাহাকেই হয় ত
নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হরণ করিবেন ; সুতরাং
এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত
না করিয়া, যাহা কর্তব্য—যাহা শ্রেয়, কেবল
তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুঃখকে মাথায়
তুলিয়া লইতে হইবে । এইরূপ স্বেচ্ছা-বৃত্ত
দুঃখেই মনুষ্যের মহত্ব ।

রামায়ণ-কাব্য অপূর্ণ সামাজিক কাব্য ।
উহা যৌথ-পরিবারের প্রীতিসমুদ্রের উচ্ছলিত
লীলা দেখাইতেছে, কিন্তু মানবগৃহের উর্দ্ধে
আশ্বাস ও শাস্তির যে জয়হৃদ্বিধ্বনি শ্রুত
হইয়া থাকে, তাহারই অভয় ও নিত্য-উদ্দী-
পনাময় রব উহার চরিত্রবর্গকে কার্য্যে প্রবৃত্ত
করিতেছে । উহাতে হিন্দুগৃহের পবিত্র-
প্রেমের চরমকথা উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ
আধুনিক হিন্দুগৃহের কাপুরুষতা ও ভীকৃত্য
উহাকে স্পর্শ করে নাই । মাহাত্ম্যের দিব্য-
ছাতিমণ্ডিত হইয়া উহার পাত্রবর্গ একটি
চিরন্তন সহজ কর্তব্যের পথ দেখিতেছিলেন,
—রাজপ্রাসাদের বন্দিতানমুখরিত শুকালোপ-
নির্নাদিত কক্ষের স্বর্ণাস্তরণময় কোমল শয্যা
এবং বস্ত্র হুণ্ডিলভূমি ও ইস্ত্রীমূলস্থ তৃণশয্যা
তাঁহাদের নিকটভূল্য ছিল । বরঞ্চ সাধুগুপ্তিত
চিত্রকূটের অরণ্য অযোধ্যার শোভাসম্পদ
অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়াকর্ষী হইয়া উঠিয়াছে,
—অযোধ্যাবাসী রাজকুমার অপেক্ষা দণ্ডকা-
রণ্যের কৌপীনসার সন্ন্যাসীর চিত্র আমাদের

নিকট সমধিক শোভন ও প্রীতিপ্রদ । হিন্দুর গৃহে এই অত্যন্ত কর্তব্যের পতাকা ফিরিয়া আসুক,—যে স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্যজীবনী কর্তব্যের স্বর্গীয়চ্ছটার অভাবে আজ জগৎজুর অন্তরালে অবস্থিত, তাহার উপর আর একবার মহালক্ষ্য ও উন্নত কর্তব্যের জ্যোতীরশি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ুক ;—রামায়ণকাব্যের গার্হস্থ্যজীবন যেমন উজ্জ্বল হইয়াছে, সেইরূপে আমাদের বর্তমান জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া আমাদের স্নেহ, দয়া, বিশ্বপ্রেম—যাহা সেই একটিমাত্র আলোকের স্পর্শ প্রতীক্ষা করিতেছে—কর্তব্যের নবোদিত আলোক লাভ করিয়া জগতের চিরারাম্য মূর্তিতে আবিস্কৃত হইবে । এখন আমরা কর্তব্যে পরায়ুত, তাই কেহ বিশ্বাস করিতে পারি না যে, এই কাপুরুষতাকলঙ্কিত জাতীয়জীবনের অভ্যন্তরে কতকগুলি এমন লংপ্রবৃত্তি বিকাশ পাইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্তর বিরল । আমাদের ক্রমা শক্রমিত্রকে সমভাবে বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করে ; বৈষ্যবগণ কাহাকেও ক্রমা করিবার অধিকারই স্বীকার করেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে সর্বদা সকলের কর্মাই বলিয়াই মনে করেন । সম্মান ও অসম্মান, উভয়ের পাদসমাজে প্রণাম, এ কথা এই ভারতবর্ষের লোকেই বলিতে পারিয়াছেন । আমাদের দয়া কেবল মানুষের মধ্যে আবদ্ধ নহে—সর্বভূতের জন্ত তাহার উদার ও যুক্ত পরিবেষণ,—কীটপতঙ্গতরুপুষ্পের প্রতিও তাহা বিমুখ নহে । আমাদের অধিগণ গলিতপত্র আহার করিয়া ধর্মব্রত পালন করিতেন, শকুন্তলা আপনার পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশরাশির শোভাসংবর্ধনের জন্ত একটি

পল্লবকেও বৃক্ষচ্যুত করিতে পারিতেন না—এ সকল কবিকল্পনা নহে,—বিশ্বপ্রেম এমনই উদার কোমলতার হিন্দুর হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল । এখনও এদেশের গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহের সামান্য পরিচারকদিগকেও অগ্রে ভোজন করাইয়া আপনারা সর্বশেষে খাইয়া থাকেন । বিধবাগণের কঠোর ত্যাগের ছবি এখনও আমাদের চক্ষুর উপর বিরাজ করিতেছে । আধুনিক সভ্যতার বিলাসকলা-বিড়ম্বিত রমণীমণ্ডলীর নিকট নিবৃত্তির এই নির্মল আদর্শ কি চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে ? আমরা “জাতি” এই শব্দের অর্থ বুঝি নাই, nationality কথা বিদেশীয় ; আমরা পক্ষপাতহুই ক্ষত্র গভীর সৃষ্টি করি নাই, আমাদের নীতি ও শিক্ষাদীক্ষা উদার, বিশ্বজনীন, প্রশস্ত । “সত্যত অভাগত গুরু” “অহিংসা পরম ধর্ম”, প্রভৃতি কথাগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমরা জাতি কি বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করি না, আমাদের শিক্ষানীতি সমগ্র জগৎকে লক্ষ্য করে । আমাদের প্রেম, আমাদের ক্ষম, আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত নহে—জাতিগত নহে—উহা সর্বজনীন, উহা উদার বায়ুতলের ত্রায় বিশ্বব্যাপক,—বিশ্বরক্ষার চিরন্তন নিয়মাবলীর মধ্যে গণ্য । আমাদের ধর্ম কে না জানে—পিতাপুত্রের সহকের ভিতরে, বান্ধবতার ভিতরে, দাম্পত্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিতরে, বাৎসল্যের রূপে, সখ্যের রূপে, মাধুর্যের রূপে, দাত্তের রূপে সর্বদা প্রত্যক্ষ । তাহার উচ্চ শাস্তিনিয়ম বেদান্তধর্ম ; সে রাজ্য কলহহুই, স্বার্থপুট, বাধের নায় লুক মহাভারতের অত্যাচার—যেখানে আমাদের হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ,

এই শাস্তি ও ধর্মের রাজ্য যেন সেইখানে । ফেলিয়া মনুষ্যের যে গভীর, সৌম্য ও ইহার পরম পরিতৃপ্তি মনুষ্যকে চিরমৌনীর করুণার মূর্তি প্রদর্শন করে, তাহা জগতে করিয়া ফেলে, ইহা সমস্ত ভেদবুদ্ধি মুছিয়া-অতুলনীয় ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ।

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় ।

জীবনে যে ভাগবান্ পুরুষ সফলতালাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জলতর হইয়া উঠে । তাহাকে সেমন হারাষ্ট, তেমন লাভও করি । মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অণুচ অমরতালাভের পূর্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না । যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্ত অপেক্ষা করিয়া ছিল, তাহাদের বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না । মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল ।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত

নহে । সে তাহার যে অল্প-কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে । কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা নাও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই ।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহ-মাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না ।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সমর্থ পায় নাই, তাহার প্রাণ তাহাকে এখন কে দিবে ? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না । তাহার অল্পম

হৃদয়মাধুর্য্য, তাহার অকৃত্রিম করুণাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথাই উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে হুঃসহ।

তাহার জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্তান্ত কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্তমান জীবনের সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল—সে সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে—সেগুলি কেবল আমারি নিকটে সত্য—অতএব সেই কথাকয়টি কেবল আমি রাখিলাম—তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ ও তাহার কবিতাটি এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

সত্যীশের শেষ রচনাটি ‘তাজমহল’ নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মমতাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি—ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাখিয়া যায়। পৃথিবীতে সকল সমাপনের মধ্যেই জরা এবং বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়, সম্পূর্ণতা আমাদের কাছে ক্ষুদ্র সীমতারই প্রমাণ দিয়া থাকে। অতুল সৌন্দর্য্য-সম্পদও আমাদের কাছে মায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ, আমরা তাহার বিকৃতি,

তাহার শেষ দেখিতে পাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বিকশিত হইয়াছে, সে মুহূর্ত্তের শেষ কোথায়? অনন্তের মধ্যে তাহা অনন্ত হইয়া আছে—তাহা শেষ হয় নাই। অকাল-সমাপ্তিতে এই নিঃশেষবিহীনতা আমাদের চিত্তভঙ্গীকে সুদীর্ঘ অমুরগনে-ঝঙ্কত করিতে থাকে।

মমতাজের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম অপরি-তৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে—তাজমহলের সুষমাসৌষ্টবের মধ্যে কবি সত্যীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য্য-অমুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়া ছিল।

সত্যীশের তরুণ জীবনও সমুখবর্তী উজ্জল লক্ষ্য, নবপরিষ্কৃত আশা ও পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ গত মাঘী পূর্ণিমার দিনে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু আমি, তাহার পাণের পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

পত্র ।

ব্রহ্মবিদ্যালয়,
বোলপুর।

* * * * *

আমি এই চিঠিতে ‘তাজমহল’ বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।

দেখিয়াছি, তাজমহল দুটি ভাবে মনকে

কর। দিনের আলোকে, মলিন নর-
নারীর মধ্যে, ধূলা, শুক যমুনা, রেলের চীং-
কার, ইংরাজের মূর্তিমান্ কর্মবেগ রেল-
গাড়ির দোড়ের মধ্যে, কালের পরিহাসপূর্ণ
লীলার মধ্যে—তাজমহলটাকে বড়ই বাহ্যিক
বলিয়া মনে হয়। সমস্ত মনুষ্যের সঙ্গে
সহানুভূতির রসে এই মন্দিরের রঙীন লতা-
পাতা উপচিত নয়। সমস্ত সংসারের সঙ্গে
সমভূমিতে না দাঁড়াইয়া কবরটি যেন একটা
উচ্চ জমির উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহার Har-
monious সৌন্দর্য, ইহার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা,
ইহার বিরল চিত্রবিলাস—সমস্ত লইয়া ইহা
যেন আমাদের কাছে বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে
চায়। বিশেষত বুদ্ধগয়ায় পুজার ভাবে
আচ্ছন্ন নরনারীর ভক্তিপূর্ণ লীলার তরঙ্গায়িত
অশোক-রেলিংএর চিত্রমালা আগে দেখিয়া
আসিয়াছিলাম বলিয়া তাজমহলের বিলাসের
ভাবটাতে এত ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনে
হয়, চারিদিক হইতে সমস্ত বাজার, সমস্ত
লোক উঠাইয়া দিয়া একটি নির্জন প্রান্তরের
মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাজমহলের ক্ষান্ত-
উৎসার উৎসমুখগুলির রুদ্ধ শোকের প্রতি
কতকটা সম্মান করা হয়।

এটা বড় নিষ্ঠুর ভাব। কিন্তু রাতে
স্বপ্নের মধ্যে তাজের Perfect harmonyটি
যখন মনকে জড়াইয়া ধরে, তখন তাজকে
আর নির্জীবভাবে, পাণিবভাবে দেখিবার জো
নাই। তখন তাজকে বাহ্যিকবর্জিত একটি
নিগূঢ়-গীতের মত করিয়া অনুভব করিতে
ইচ্ছা হয়। বিশেষত আমি যখন দূরে আছি,
তখন সেই ভাবেই তাজকে বেশি মনে
পড়ে। আমি সেই ভাবটিই আমার

কবিতাটিতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা
করিয়াছি।

* * * * *

এই গেল আমার মনের কথাটা—এখন
কবিতার সৌন্দর্য কতদূর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে
আপনার কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবার দিল্লি, আগ্রা, গয়া, কাশী প্রভৃতি
স্থান দেখিয়া মনে আরও অনেক ভাব উঠি-
য়াছে—বাস্তবিক ৮ দিনের মধ্যে যেন
খানিকটা বাড়িয়া উঠিয়াছি। * * *

বুদ্ধগয়ায় যখন অশোক-রেলিং দেখিলাম
—রাঙা পাথরে বক্ষ আঁকা, বক্ষী আঁকা—
নানা করুণার দৃশ্য আঁকা—বাড়িটি
গাছপালায় ঢাকা, নির্জন—চারিদিকে
শূণ্য—একজন জাপানী penitent আপন
হইতে প্রেরিত বুদ্ধের কাছে থাকে—
তিব্বত হইতে, সিমলা হইতে গরীব-হুঃখী
আসিয়া বাস করিতেছে—বর্ণা হইতে কত-
গুলি ঘণ্টা উপহার পাঠাইয়াছে—তখন মনে
হইল, এই ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা
গ্রামের মধ্যে একটি করুণার উৎস আছে—
কক্ষে কলস লইয়া সমস্ত এসিয়া-মুসল্লী
সেখানে তুষা মিটাইতে আসিয়াছে।
মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বৌদ্ধ-
মূর্তি দেখিয়া হৃদয় এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল
যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্বে কখনো
অনুভব করি নাই।

কিন্তু বুদ্ধদেব আজ স্তম্ভিত। আপনি
যে হিমালয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সেইরূপ আজ
—“সে প্রচণ্ড গতি অবসান।” এই প্রচণ্ড
করুণার উৎসটির স্তম্ভিত গাভীরোগ্য নাড়া
প্রাণে অনুভব করিয়াছি। অতীতকার পৃথিবীর

সহিত মিল নাই—চতুর্দিকে নূতন রাগিণী উঠিয়াছে—তাই বৃদ্ধদেবও যেন ধরণীর বন্ধ-কোটরে প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যে “মন্দির” লিখিয়াছেন—“রচিয়াছিছ দেউল একখানি”—তাহাতে আপনি এই বৃদ্ধদেবকে বাহির হইয়া আসিতে ডাক দিয়াছেন—বিশ্বের কর্ণের মধ্যে, আনন্দকোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে সার্থক হইতে আহ্বান করিয়াছেন—তাহা যেদিন হইবে, সেদিন সত্য-সত্যই পৃথিবীতে নূতন আলো আবির্ভূত হইবে। আমি ঐ গানের অর্থ ভালরূপেই বুঝিয়াছি। কারণ, উহার আগের পর্দা হইতে যে একটি গান উঠিতেছে, তার স্বর শুনিয়া এবার আমাকে অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে, যেন পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যসাধারণের হৃদয় একটি নারী—এবং দিবাসবাদবাহী মহাপুরুষগণ ঐ নারীর প্রাণের প্রিয়। পুরুষ আসিয়া নারীকে যখন ভালবাসে, তখন নারী এক অপূর্ণ আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। বৃদ্ধদেবের ভালবাসার ডাকে অশোকপ্রমুখ নারীহৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল—কল্যাণকর্মে উৎসব বিস্তার করিয়া, কলাকাণ্ডে মঙ্গলভূষা পরিয়া ঐ নারী পুরুষটিকে হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু কালের লীলার ক্রমে সেই আনন্দ-মিলনের উৎসব থামিয়া থেল। আজ যেন বৃদ্ধগণের পাহাড়গুলির মধ্যে শুক নৈরঞ্জন

ও মাহীর তীরে ছায়াঢাকা গ্রামটিতে পা ছড়াইয়া সেই নারী অন্ধের মত, অবচনার মত মন্দিরবন্ধকোটরে সেই পুরষের ছবি লইয়া বসিয়া আছে। আজও তাঁর অবসন্ন হস্ত বশ্মা এবং জাপান এবং তিব্বত হইতে সমাগত কাঙালার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে—কিন্তু “সে প্রচণ্ড গতি অবসান!” ফন্ডর মধ্যে যে অপরিচ্ছন্ন নরনারী কাপড় ধুইতেছে, তাদের সঙ্গে ঐ নারীর হৃদয়ের কোনো যোগ আছে? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—কে যে সাহেব বিনা অপরাধে তাঁর এক চাপরাশি ছাড়াইয়া দিতে হুকুম করিতেছে, তার হৃদয়ে উহার কোনো প্রেরণা সঞ্চারিত হয়? তা ছাড়া, আমরা যে স্বচ্ছন্দ-মনে নানা বাজে কল্পনা লইয়া বেড়াইতেছি এবং সাহেবের রেলের তলে পড়িয়া মারা যাইতেছি, আমাদের সঙ্গেই বা তাহার কোথায় যোগ? স্তম্ভিত প্রকাণ্ড পাথরের বৃদ্ধমুষ্টি-গুলি এবং অন্ন একটুকু অংশকের রেলিং এখনো যা বজায় আছে—তার আনন্দ-হিল্লোলিত ভক্তিতর্ঙ্গিহৃদয় ছবিগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় এইরকম একটা চুঃখের ভাবেই নাড়া পাইয়াছে! এই স্তম্ভিত পাথর মনের মধ্যে এমন একটি অবগাদের মেঘ ঘনাইয়া আনে যে, চোখের জলে আর কিছুই দেখা যায় না—আর উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য যেন থাকে না।

* * * * *

তাজমহল ।



মর্শরকবর নহে—নহে কভু নহে ।
স্বরগের ফুলরাশি চিত্ত মোর কহে ।
নন্দনবনের গাছে
যেই ফুল ফুটে আছে
তারি একরাশ সেথা স্তূপ হরে রহে,-
মর্শরের নিরমাণ নহে কভু নহে ।

নীল নদী যমুনার বক্ষ উজলিয়া
নন্দনেরি পুষ্পরাশি পড়েছে ঝরিয়া ।
ফুলেরি নিখাস লভি'
নিভেছে সে জীব-রবি,
কুসুমেরি ধার তাজ গিরেছে মরিয়া !
নন্দনেরি ফুল সেথা পড়েছে, ঝরিয়া ।

শুভ্রতরু ঋষিবর চলেছিল কবে
ঝঙ্কারিয়া 'স্বরবীণা পূর্ণিমা-নভে ।
শাজাহাঁর অঙ্কে লীন
মমতাজ সেই দিন
স্বপ্ন দেখেছিল এক প্রণয়-উৎসবে,—
বীণাধ্বনি বেজেছিল পূর্ণিমা-নভে ।

বহুনাকল্লোল কানে এসেছিল তার—
ভাবিল সে এ রজনী না পোহাক্ আর !
অমনি তাহাই হ'ল
বীণা হ'তে খসে প'ল
শ্রেমসবী মরণের চিহ্ন ফুলহার !
পূর্ণিমা রাত্রি সেই পোহাল না আর ।

তাই তার মৃতমুখে স্মৃতির স্বপন
 ফুটেছিল চক্ৰকলাসম বিমোহন ।
 সহস্র বিলাপে তাই
 হান্তরুটি মুছে নাই,
 হাসি ঘিরে ঘুরিয়াছে আকুল কাদন—
 তার মুখে ফুটে আছে স্মৃতির স্বপন ।

সে স্মৃতিহাসির তুলা নন্দনেরি ফুল,—
 একরাশি ঢেলে গেছে স্মরনারীকুল ।
 নাড়িয়া মন্দারশাখা,
 পারিজাতে দিয়ে ঝাঁকা,
 যমুনার তটভূমি করেছে আকুল !
 সে স্মৃতিহাসির তুলা স্মরণেরি ফুল ।

পাতশাহ গিরি ভাঙি' আনিয়া পাথর
 রচচ্ছে কি একখানি ধবল কবর ?
 আমি দেখি নাই তাহা,
 দিবালোকে সবে যাহা
 নেহারি প্রশংসাবাণী কহে বহুতর—
 আমি দেখি নাই সেই মর্শ্মরকবর !

চৌদিকে উড়িছে ধূলি, দীপ্ত ভাস্ক শিরে,
 লাঙল ঢালায় চাষী বালুবন্ধ চিরে,
 শুষ্ক নীর যমুনার,
 তাহারি অদূরে আর
 দীনহীন বিমলিন নরনারী ফিরে,—
 শকটস্থসিত ধূম উঠে নভ ঘিরে ;—

আমি দেখি নাই সেই মর্শ্মরকবর !
 জ্যোৎস্নাচন্দ্রের রসে রাজি অরুণর—
 তাহারি হাসির মত
 আখো চাঁদ অবনত

নিরখে পঞ্জিত শুভ ফুট ফুলধর,—
ভরপুর যমুনার নীল কলেবর,—

সেই দেখিয়াছি আমি, কুসুমের স্তূপ
হাসিজ্যোৎস্নামাধুরীতে ধৌত অপরূপ !

শুনিয়াছি সুরবীণ—

চিত্তের মাঝারে লীন
আজ্ঞো আছে—চিরদিন রহিবে স্বরূপ ।
সেই দেখিয়াছি আমি কুসুমের স্তূপ ।

নগ্নরকবর নহে—নহে কভু নহে—
কুসুমের রাশি সে যে চিত্ত মোর কহে !

নন্দনবনের গাছে

যেই ফুল ফুটে আছে

তারি সেথা একরাশ স্তূপ হয়ে রহে ।

আগ্রাপ্রান্তরে ।

ছিন্নপাখা মৈনাকের মত চারিধার

ভ্রগ্ন সারে-সার

পড়ি আছে পরিশ্রান্ত ধূলার ধূসর কান্ত

তীরে যমুনার—

ছিন্নপাখা মৈনাকের মত সারে-সার ।

শুষ্ক বৃক্ষজ্যে হৃদয়ে কবরে কেল্লায়

ধ্বংসরাশি ভায় !

মর্শরে পাথরে স্বর্ণে সফেদ শোণিত বর্ণে

রাগিণী মিলায়—

সৌন্দর্য্যই শূন্যের মৃতাঙ্গীত গায় ।

এই ধূলি-বিপাণ্ডুর প্রান্তরের মাঝে
 যেন বসি আছে
 অন্ধ এক নিশাচরী কিবা দিবা বিভাবরী
 বিনাশের কাজে
 ধূলি-বিপাণ্ডুর এই ধ্বংসরাশিমাঝে !

সে কতু জাগিবে নাক চিররাত্রিচরী,
 হেথা রবে পড়ি'—
 শত শত ইন্দ্রপুর সে শুধু করিবে চুর
 মুষ্টিমাঝে ধরি'—
 নিশ্বাসে উড়াবে ধূলি প্রান্তর-উপরি !

তারি পদপ্রান্ততলে আমি পড়ে' আছি,—
 মনে লয় আজি
 অতীত পাতালপুরে প্রতাপের বহুদূরে
 কর্ণে উঠে বাজি ;—
 সেই গানে কান দিয়া পড়ে' আছি আজি !

রক্তমাখা শতদল হৃদয় আমার
 ব্যথায় বিদার—
 ছিন্ননাল হেথা পড়ি ধূলে যায় গড়াগড়ি
 উঠিবে না আর !

এই ধূলিপুঞ্জ'পরে সমাধিশয়ন
 করেছে রচন !
 আনো আনো হৃনির্মল নীল যমুনার জল
 কর প্রক্ষালন

বাঁচাও হৃদয়ে ঢালি বারি সঞ্জীবন !

হে জননি, সঞ্জীবনি, অমৃত পিরাও !
 ধূলা মুছে দাও !

সমাধিশয়ন হ'তে 'তুলি' মোর ধরি হাতে
 বনান্তে পাঠাও !

হে জননি, কবরের ধূলি মুছে দাও !

গণেশের পূজা ।

ত্রিবেদী মহাশয়ের সমালোচনা পড়িয়া
‘বী’ হইলাম। প্রাচীন কথার অমু-
ক্ষানে অনেক সন্দেহ থাকিয়া যায়;
যেহেতু এই প্রকার সমালোচনা বড় উপ-
যোগী। ত্রিবেদী মহাশয়ের সুযোগ্য অমুসন্ধান
যখন গণেশের ইতিহাসে অল্প কোন পুরাতন
কথা পাওয়া যায় নাই, তখন আমার
ইতিহাসটা ঠিক হইয়াছে বলিয়া আনন্দিত
হইতেছি। যে উপনিষৎখানির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত
হইয়াছে, উহা অত্যন্ত অক্ষাটীন। ওখানিতে
যে উপনিষদের কোন লক্ষণ নাই, তাহা
ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন। ওখানি যে
পৌরাণিকযুগের গ্রন্থ, তাহাতেও ভুল নাই;
কারণ সমুদায় পৌরাণিক দেবতাদের নাম
এবং একালের স্বরূপগুলি উহাতে আছে।
পৌরাণিকযুগের দেবতাগুলি বৈদিক নহেন
বলিয়াই পরবর্তী সময়ে উহাদিগকে
বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক চাতুরীর
খেলা হইয়া গিয়াছে। উপনিষদের নাম দিয়া
বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে ‘আল্লার’ নামেও
উপনিষৎ প্রস্তুত হইয়াছিল। ‘আল্লা’ কথাটা
না থাকিলে উহার সময় লইয়াও গোল
উঠিতে পারিত।

শিব যখন সমুদায় পৌরাণিক অবয়বে
পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কতকগুলি
প্রাচীন বৈদিক শ্লোকের সহিত একালের
রচনা মিশ্রিত করিয়া এবং স্থানে স্থানে বৈদিক

রচনারীতির অনুকরণ করিয়া রুদ্রাধ্যায় লিখিত
হইয়াছিল। সায়ণাচার্য চতুর্দশ শতাব্দীতে
এখানিরও ভাষ্য লিখিয়াছেন। সকল
দেবতাদের জন্তই ঐরূপ গ্রন্থ রচিত হইয়া-
ছিল। বাহ্যভয়ে দৃষ্টান্ত দিলাম না।

গণেশের নামে প্রথমত দ্রাবিড়দেশে
একখানি বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হয়;
সেখানি গণেশাথর্কশীর্ষ। অথর্কবেদের সহিত
যুক্ত করিয়া গণেশের কথা বলিবার
বিশেষ কারণ ছিল। বেদগ্রন্থে ভূতপ্রেতা-
দির পূজা নাই; কিন্তু অথর্কবেদে আছে।
ঐ সকল ভূতপ্রেতপূজার উৎপত্তির ইতিহাস
সমরাস্ত্রে লিখিব। এই ভূতপ্রেতপূজার জন্ত
অথর্কবেদ বহুকাল পর্য্যন্ত আখ্যাদের অগ্রাহ্য
ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ ভূতপ্রেতের পূজা
করিতেন, তাহাদিগকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত
হইতে হইত। মনুর তৃতীয় অধ্যায়ের
১৬৪ শ্লোকে আছে যে, ঐ সকল ভূতযাজক
ব্রাহ্মণেরা অপাংক্ত্যে হইবেন। এই ভূত-
গুলির নামই ছিল ‘গণ’। মনুসংহিতার
“গণানাঞ্জেব যাজকঃ” কথার অর্থ করিতে
গিয়া একালের টীকায় লিখিত হইয়াছে,
“বিনয়্যকাদিগণবাগকুৎ।” গণেশের উৎপত্তি
ঐ ভূতের বংশে বলিয়া, পরম্পরায় ঐ গণটা
বিনায়কের সঙ্গে অচ্ছেদ্য রহিয়া গিয়াছেন।
গণেশ যখন দেবতা হইলেন, তখন
তাঁহার জন্ত অথর্কবেদ নইয়া জাল অথর্ক-

শীর্ষ প্রস্তুত হইল। এখানির অক্ষাটীনতা অতি সহজেই উপলব্ধ হয়। ৮ম শতাব্দীর পরবর্তী পুরাণের পরে যে ওখানি রচিত, তাহা অক্ষরদ্বারা গণেশনামের গুণবর্ণনা হইতে, এবং অন্যান্য দেবতার উপন্যাসে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে। এই মাহাত্ম্যাবর্ণনা-প্রণালী প্রথমত তন্ত্রেই উদ্ভূত হইয়াছিল। বৈদিক কথার সহিত একালের সংস্কৃত কথাগুলির বিষম সংযোগ দেখিয়াই জাল-রচনা ধরা পড়ে।

নারায়ণোপনিষৎ গণেশাবলীর্ষের ও পর-বর্তী। উহা হইতে ছোটটি কথ্য পর্য্যন্ত তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে যেমন এক-দিকে অগ্নির 'লালীল'নাম আছে, অন্যদিকে আবার তেমনি সম্পূর্ণ একালের শব্দ লইয়া রচনা হইয়াছে। উহাতে পৌরাণিক গরুড়, নন্দি প্রভৃতি ত আছেই, তা ছাড়া এমন কথ্য আছে, বাহাতে উহার অক্ষাটীনতা অবশ্যই স্বীকৃত হইবে।

'কঙ্ককুমারী' কথ্যটা ত্রিবেদী মহাশয় নিজেই তুলিয়াছেন। পার্শ্বতীর কুমারী কল্পনা করিয়া পূজা তান্ত্রিকযুগের একটা বিশেষ-

ষত্ব। কোন প্রাচীন গ্রন্থে ঐ কল্পনা পারিবে না। তান্ত্রিকপদ্ধতি যে ত্রি-নিকট হইতে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হই-সে কথাও পরে লিখিবার সঙ্কল্প আ-যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, গণেশ-শীর্ষাদির সময় নিরূপিত হয় নাই নারায়ণোপনিষৎ প্রাচীন কি অ-তাহা সম্পূর্ণ স্থির হয় নাই; তাহা ওখানি লইয়া গণেশের ইতিহাস লেখ-না। কারণ যে গ্রন্থ উপনিষৎ বলিয়া-রিত হইয়াও এদেশে উপনিষৎ বলিয়া-হয় নাই, তাহার প্রামাণিকতা অতি-তাহার পর আবার যখন ঐ গ্রন্থের-পাঠ্য কথ্য অথ কোন প্রাচীন গ্রন্থে-যায় না, তখন আর ওখানি গ্রন্থ-কোন নামাংসা করা চলে না। প্রাচীন কারণে হইলে অথ প্রাচীনগণে-পাওয়া চাই, অথবা অথ কোন সা-অন্তত তাহার নিদর্শন পাওয়া-সেগুলির অভাবে এবং ত্রিবেদী মহা-নিজের প্রদর্শিত কারণগুলির জন্ত-অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র অজু

গণেশপ্রসঙ্গ ।

দেখিতেছি আমার অজুসজ্ঞানের সুযোগ্যতা-টুকু বাতীত অন্তবিষয়ে লেখকমহোদয়ের সহিত আমার মতভেদ যৎসামান্য। নারায়ণোপনিষদের তারিখটা ঠিক হইলেই

গণেশঠাকুরের বয়সের কতকটা 'ফি' পাওয়া যায়। লেখকমহাশয়ের মা উপনিষৎখানি গ্রীষ্টের অন্তত আটশত-পরের। অসম্ভব নহে। ঐ উপনিষ

ডিম্বা আমার যতদূর ধারণা হইয়াছে, হার উপর লেখকমহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণ-লি চাপাইয়াও উহা যে গ্রীষ্মের আটশত মসর পূর্বে হইতেই পারে না, তাহাও আমি পণ করিতে প্রস্তুত নহি। কাজেই হাজার-ডেক বৎসর উভয়ের মধ্যে তফাত দাঁড়ায়। রতবর্ষের পুরাতত্ত্বের বিচারে হাজার-ডেক বৎসরের তফাত ধর্তব্যই নহে। কাজেই আমাদের মতভেদ যৎসামান্য।

লেখকমহাশয়ের অবলম্বিত বিচারপ্রণালী ক্ষিপ্ত আশঙ্কাজনক। গণপতিঠাকুর অর্কান; অতএব যে গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে, তাহা অর্কান; অতএব ঐ অর্কান গ্রন্থে। গণেশঠাকুরের উল্লেখ দেখা যায়, ব ঠাকুরও অর্কান।—এই বিচারপ্রণালী ক্ষিপ্ত আশঙ্কাজনক।

কাজেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতাজ্ঞকে অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী ধরিয়া ইয়া যে বৈদিকগ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ আছে, তাহাও অষ্টমশতাব্দীর পরবর্তী, রূপ এক নিম্নাঙ্গে নির্দেশ করিতে সাহস না। বিশেষত পুরাণের ও তন্ত্রের উৎপত্তি গনু সময়ে হইয়াছে, তাহারই যখন ঠিকানা হই।

পুরাণ বেদের সময়েও ছিল, আবার না যায় বোপদেবও পুরাণ রচনা করিয়া লেন। তান্ত্রিক আচারের প্রাচুর্য্য চরিত্রেও দেখি, আবার আকবার-বাদশার মিলেও দেখি।

“বৈশ্বানরার বিগ্রহে লালীলার ধীমহি তন্মো যিঃ প্রচোদয়াৎ”—নারায়ণোপনিষদের এই শ্লোকের ‘লালীল’ নাম গণেশাথর্কশীর্ষ

হইতে গৃহীত হইতে পারে; তাহার উল্লেখ হইতে পারে। সায়ণ যখন ঐ মন্ত্রের ভাষ্য দেন নাই, তখন উহাকে প্রাক্কিণ্ড ধরিয়াও নারায়ণোপনিষদের প্রাচীনত্ব বজায় থাকিতে পারে। আর গণেশাথর্কশীর্ষেরই যখন তান্ত্রিক জানি না, তখন ঐ বিচারও নিরর্থক। আকবারের আমলে জাল উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল মানিলেও উপনিষৎমাত্রই জাল হয় না। যে কয়খানা উপনিষৎ প্রতি-শাস্ত্রনাম্যে সন্যবাদিসম্মতিক্রমে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার প্রাচীনত্বসন্দেহের পূর্বে আরও পাকা প্রমাণ আবশ্যক।

প্রতিশাস্ত্রকে জাল হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এ দেশে যেমন যত্ন হইয়াছিল, অন্য কোন দেশে কোন সময়ে কোন শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্ত তেমন যত্ন হয় নাই। ইহা সাহেবলোকেরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যে কোন ব্যক্তি একটা রচনা করিয়া উহাকে চতুরাননের মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিচয় দিলেই তাহা প্রতিবাক্য বলিয়া গৃহীত হইত না, যিনি প্রাচীন-শাস্ত্রের কিছু সংবাদ রাখেন, তিনিই ইহা বিশেষরূপে জানেন।

জাল উপনিষৎ আজিও রচিত হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রতিবাক্য বলিয়া গণ্য হওয়া সহজ হইবে না।

ফলে নারায়ণোপনিষৎ কতদিনের, তাহা যখন স্থির করিবার সম্ভ্রতি কোন উপায় দেখিতেছি না, এবং তৎসম্বন্ধে লেখক-মহাশয়ের ও আমার মতে ভেদ যৎসামান্য, তখন এ বিষয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

তবে একটা কথা বক্তব্য আছে। পাশ্চাত্য

শক্তিভেদের ভারতবর্ষটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে অবলম্বিত প্রণালীটা কতকটা এইরূপ :— ধরিয়া লও, পলাশীর লড়াইয়ের পূর্বে ভারতবর্ষে কিছুই ছিল না; যিনি বলিতে চাহেন, অমুক জিনিষটা তৎপূর্বে ছিল, প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। এই বিষয় ভার মাথায় লইয়া পুরাতত্ত্বব্যবসায়ীকে কিছু-দূর চলিয়াই ক্লান্ত হইয়া থামিতে হয়। আবুল-ফজল, আলবিরুনি, ফাহিরাং, মেগাস্ট্রিনি স্ পর্য্যন্ত অতিকষ্টে ঠেলিয়াই সেইখানে থামিতে

হয়। কেন না, মহাভারতে উল্লেখ অবেদে উল্লেখ আছে, বলিতে গেলেই মহ বা বেদ পলাশীর লড়াইয়ের পূর্বে ছি না, এই আর একটা নূতন বোঝা চাপে। এই প্রণালীটা বোল-আনা নিক, এবং এতদ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তও শু হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে গোড়ায় পৌছিতে পারিয়াছি, শপথে কিছু বেশীমাত্রায় সাহস হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রি

গ্রন্থ-সমালোচনা ।

যুগধর্ম ।—শ্রীঅমৃতলাল সেন গুপ্ত কর্তৃক
বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।
মূল্য ১০ তিন আনা ।

গ্রন্থকার বলেন যে, আখ্যা ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্ত যুগানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের জন্ত নির্দিষ্ট সাধনা কলি-যুগের চর্য্যল জীবের পক্ষে অসাধ্য। তাহাদের পক্ষে হরিনামকীর্ত্তনই একমাত্র সাধনা ও নিস্তারের উপায়। বৃহন্নরদীয় পুরাণ-কর্ত্তা বলিয়াছেন—

হরেনামী হরেনামী-হরেনামীষ কেবলম্ ।

কলৌ নাত্যেব নাত্যেব নাত্যেব পতিরনাথ ।

এই যুগধর্ম্ম কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে? অমৃতলালবাবু মহাশয় দূরে থাকুক, ব্রহ্মরুদ্রাদি দে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন ন উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্ত স্মরণ ম। তৃত্তলে অবতীর্ণ হইতে হয়। কল্লিযু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হই এবং তিনিই এ যুগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই পুস্তকের সার কথা। চৈব অবতার বলিয়া-মানেন এবং উপাস্য বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ লোকের অগ্রতুল নাই। তাঁহা এই পুস্তকের আদর হইবে বলিয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখো

